(সাহিত্য-সংহিতা)

('সাহিত্য-সভার' মাসিক পত্রিকা)

তৃতীয় খণ্ড, ১৩০৯ সাল।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্. এ., বি. এল্.,
এফ্. আর্. জি. এস্.
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা
১০৬।১ নং, গ্রে ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রকাশিত।
৫৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট "বকুলগু প্রেস্" হইতে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩৲ (তিন) টাকা মাত্র।

১৩০৯ সালের (৩য় বৎসরের) "সাহিত্যসংহিতার" সূচী।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১	অধ্যাত্ম-তত্ত্ব	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ...	২১২, ৫৭৮
২	অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী	শ্রীআব্‌দুল্‌ করিম্‌ ...	১৯৯
৩	অহঙ্কার (কবিতা)	শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৮৮
৪	আত্ম-মেধ (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, ...	৪০০
৫	ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ এক	শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত ...	৪১১
৬	ঈশ্বর-তত্ত্ব	শ্রীআশুতোষ দেব, এম্‌, এ	৪৫, ৭৬, ৩৭০, ৪৩৭
৭	কামরূপের ঐতিহাসিক বিবরণ	শ্রীগৌরীদত্ত মিশ্র বিদ্যাভূষণ ...	৩২
৮	কাল-তত্ত্ব-সমীক্ষা বা পঞ্চাঙ্গ-নির্ণয়	শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য ...	৪০১
৯	কাল ও কালী	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ...	৫৮৯
১০	কোজাগর পূর্ণিমায় (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, ...	৩৩৫ *
১১	জীবের স্বাধীনতা বা অদৃষ্ট-বাদ	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন	১৪৬, ৩৮৯, ৫৪২
১২	জপজী	শ্রীঅশুতোষ দেব, এম্‌,এ, এফ,টি,এস্‌	১৫৭, ২৫৭
১৩	থিওসফি	ঐ ...	৫৬১
১৪	দান-সাগর	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ (*)	
১৫	দার্শনিক মতের সমালোচনা	মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ...	২৩৩, ৩৫৮
১৬	ধম্মপদ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	শ্রীচারুচন্দ্র বসু	২৬, ৬৫, ১৮৮, ২৮০, ৪১৯, ৫৭৩
১৭	ন্যায়দর্শনের ইতিহাস	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্‌, এ, ...	১১
১৮	নাগার্জ্জুন	ঐ	১৫৪
১৯	প্রতীচ্য-মায়াবাদ	শ্রীআশুতোষ দেব, এম্‌, এ, এফ, টি, এস্‌,	১৭৫
২০	পঞ্চাঙ্গ-তত্ত্ব বা কাল-সমীক্ষা	শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য ...	৫৫২
২১	পুরী যাইবার পথে	শ্রীচুণীলাল বসু রায় বাহাদুর এম্‌, বি, এফ্‌, সি, এস্‌	৬৩৩

* "সাহিত্য-সংহিতায়" মুদ্রিত ৩৪৫ পত্রাঙ্ক, মুদ্রাকরের প্রমাদ। ৩৪৫ স্থলে ৩৩৫ হইবে।

(*) "সাহিত্য-সংহিতার" সহিত "দানসাগরের" পত্রাঙ্কের ঐক্য নাই। পৃথক্‌ পত্রাঙ্ক দিয়া উহা মুদ্রিত হইয়াছে। "সাহিত্য-সংহিতার" গ্রাহকগণ ও "সাহিত্য-সভার" সভ্যগণ, উহাকে পৃথক্‌ করিয়া লইবেন।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক		পত্রাঙ্ক
২২	বৈষ্ণবধর্ম্ম (শ্রীচৈতন্ত-যুগ)	শ্রীভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী, এম্, এ		১২৫
২৩	বঙ্গভাষার অবস্থান-গীতি (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ	...	২২২
২৪	বীজগণিত (চক্রবাল)	শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য	...	৩১৪
২৫	বাণভট্টের জীবন-চরিত	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	...	৩৪৫
২৬	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ	...	৪৫৭
২৭	বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কি না ?	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	...	৫০০
২৮	‘বেতালে’ বহু রহস্ত	শ্রীচন্দ্রনাথ বসু. এম্, এ, বি,এল	...	৬০৫
২৯	ভুলিব কেমনে ? (পদ্য)	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ	...	৬৪
৩০	মৎস্ত-মাংস-ভোজন	শ্রীকেদারনাথ ভারতী	...	৫৪
৩১	মুক্তা ও শঙ্খ	শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৯০
৩২	মহাবিদ্যা-স্তুতি-গীতং	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	...	৪৫৫
৩৩	মহাসমাধি (পদ্য)	শ্রীআশুতোষ দেব, এম্, এ, এফ, টি, এস্		৬৩২
৩৪	মালবিকাগ্নিমিত্র (সমাপ্ত)	শ্রীঅঃ	...	৬৬৮
৩৫	যবন-জাতি	শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত	...	৪৭৬
৩৬	যোগ-দর্শন	শ্রীআশুতোষ দেব, এম্, এ, এফ, টি, এস্		২৮৮
৩৭	শূন্যপ্রাণ (কবিতা)	ঐ	...	৪৫০
৩৮	স্বম্রাট্ জহাঁগীরের স্ব-লিখিত আত্ম-জীবন-বৃত্তান্ত	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	...	৩২০
৩৯	‘সাহিত্য-সভার’ কার্য্যবিবরণ	——		২৩০, ৩৪১*, ৬৮৩
৪০	সাংখ্য-দর্শনের ইতিহাস	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ	...	২৭৩
৪১	সংযুক্তার পত্র (পদ্য)	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৪৫২
৪২	হিন্দু-বৈবাহিক বিজ্ঞান	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ		১১০, ২২৫, ৩৩১ †, ৩৮২, ৪২৪

* “সংহিতায়” মুদ্রিত ৩৫১ পত্রাঙ্ক মুদ্রাকরের প্রমাদ।

† ‘সংহিতায়’ মুদ্রিত ৩৪১ পত্রাঙ্ক, মুদ্রাকরের প্রমাদ। ৩৩১ পত্রাঙ্কই নির্ভুল।

পাঠকগণ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রাঙ্কের এই ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা

সাহিত্য-সংহিতা।

(‘সাহিত্য-সভার’ মাসিক পত্রিকা)।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস,

“SAHITYA SABHA.”

PATRON :—

The Hon’ble Sir JOHN WOODBURN, M. A.,

K. C. S. I., C. S., &c., &c.

Lieutenant-Governor of Bengal.

মহামান্য বঙ্গেশ্বর বাহাদুর, সার জন্ উড্বরন্, এম, এ,

কে, সি, এস্, আই, সি, এস্, মহোদয়

“সাহিত্য-সভার” অভিভাবক হইয়াছেন।

কলিকাতা

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, “সাহিত্য-সভা” হইতে প্রকাশিত।

২০।১ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, আলফ্রেড প্রেসে

শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

☞ “সাহিত্য-সভার” সভ্যেরা বিনা মূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন।

সাহিত্য-সভার পুস্তকালয়।

"সাহিত্য-সভার পুস্তকালয়ে" ইংরাজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহুসংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বিস্তর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রাচীন অথচ প্রয়োজনীয় পুঁথিও সংগৃহীত হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"সাহিত্য-সভার" সভ্যগণ এবং "সাহিত্য-সংহিতার" গ্রাহকগণ অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ, যথাসময়ে সভার কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,

সাহিত্য-সভার সহযোগী সম্পাদক।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক।
চিনি ...	শ্রীযুক্ত রায় ডাক্তার চুনিলাল বসু বাহাদুর।	১
ন্যায়দর্শনের ইতিহাস	,, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, ।	১১
ধর্ম্মপদের মূল ও ব্যাখ্যা	,, বাবু চারুচন্দ্র বসু।	২৬
কামরূপের ঐতিহাসিক বিবরণ	,, পণ্ডিত গৌরীদত্ত মিশ্র, বিদ্যাভূষণ।	৩২
ঈশ্বরতত্ত্ব ...	,, বাবু আশুতোষ দেব এম, এ, ।	৪৫
মৎস্যমাংস ভোজন	,, পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী।	৫৪
ভুলিব কেমনে? ...	,, বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ।	৬৪

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় রচিত "মালা" "অশ্রুমালা" ও "অঞ্জলি" নামক এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থ বিক্রয়ার্থ "সাহিত্য-সভায়" আছে। উক্ত পুস্তকত্রয় "সাহিত্য-সভার" সভ্যগণকে ।/০ পাঁচ আনা মূল্যে প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সাহিত্য-সভার কার্য্যালয়ে (১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীটে) অনুসন্ধান করিবেন। আর মফঃস্বলের সভ্যগণ ডাক মাশুল সহ মূল্য পাঠাইলে প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক মাশুল /০ এক আনা। ২৪শে আষাঢ় সন ১৩০৯।

শ্রীঅধরচন্দ্র রীত।

সভার কর্ম্মচারী।

সাহিত্য-সংহিতা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, বৈশাখ। [১ম সংখ্যা

চিনি।

সংপ্রতি বিলাতে চিনি ও চিনিমিশ্রিত কতিপয় খাদ্যের উপর শুল্ক সংস্থাপিত হইয়াছে। চিনির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং দরিদ্র লোকেরা আবশ্যকমত চিনি ব্যবহার করিতে কদাপি সমর্থ হইবে না। চিনি আমাদিগের একটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য; চিনি কম ব্যবহার করিলে আমাদিগের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে কি না, তাহাই সংক্ষেপে এস্থলে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিছু দিন হইল, ব্রিটিশ মেডিক্যাল জর্ণ্যালে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি জ্ঞাতব্য বিষয় সেই প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

অতি প্রাচীন কাল হইতে চিনির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। চিনি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে মৌচাক হইতে মধু সংগৃহীত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র যথেষ্টপরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

ইক্ষু ও বিট্‌পালম এই দুইটি পদার্থ হইতে সচরাচর প্রায় সমস্ত চিনিই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই দুইটি পদার্থের মধ্যে ইক্ষুই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে তাঁহার সেনাপতি নিয়ার্কস ভারতবর্ষ হইতে আকগাছ গ্রীসে লইয়া যান; তদবধি ইউরোপে আকের চাস আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচ্যদেশে আকের চাস কতদিন পূর্ব্বে প্রথম আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

বিট্‌পালম হইতে চিনি প্রস্তুত করা অধিক দিনের কথা নহে। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌গ্রাফ্ নামক একজন জর্ম্মণিদেশীয় রসায়নবিৎ বিট্‌পালম হইতে চিনি প্রথম প্রস্তুত করেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সময়ে ফ্র্যান্সে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রথমে বিট্‌পালমের চাস আরম্ভ হয়। আজ কাল ইউরোপে বিট্‌পালম হইতে প্রায় সমস্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে।

এদেশে ইক্ষুব্যতীত খেজুর, তাল প্রভৃতি কয়েকটী বৃক্ষের রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইক্ষু (ও খেজুর—সং) হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাই সাধারণতঃ এদেশে চিনি বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইংরাজীতে ইহাকে Cane sugar কহে। বিট্‌পালম্ হইতে যে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে Beet sugar কহে। ইহা দানা-বিশিষ্ট এবং দেখিতে দো-বরা চিনির ন্যায়। দুগ্ধে যে চিনি থাকে, তাহার নাম দুগ্ধশর্করা। ইংরাজীতে ইহাকে Sugar of milk বা Lactose কহে। যব অঙ্কুরিত হইলে তাহার মধ্যে যে এক প্রকার চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাকে যবশর্করা কহে। ইহার ইংরাজী নাম Maltose। ভাত, রুটি প্রভৃতি শ্বেতসারঘটিত খাদ্য সুপরিপাকের নিমিত্ত আমরা Maltine বা Extract of Malt নামক যে ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্মধ্যে যবশর্করা প্রচুরপরিমাণে অবস্থিতি করে। আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের মধ্যে যে চিনি থাকে, তাহাকে দ্রাক্ষাশর্করা কহে। ইহার ইংরাজী নাম Glucose বা Grape sugar। বহুমূত্ররোগে আমাদের শরীর হইতে দ্রাক্ষাশর্করা (Grape sugar) মূত্রের সহিত অল্প বা অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকজাতীয় শর্করা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বাহুল্যভয়ে এস্থানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা গেল না।

সকল চিনিই কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, এই তিনটী মূল পদার্থের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন। পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চিনিতে এই তিনটী মূল পদার্থের পরিমাণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। চিনি খাইলে, উহা আমাদিগের রক্তের সহিত মিলিত হয়, এবং মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া কার্ব্বণিক এসিড বাষ্প ও জলে পরিণত হয়। এইরূপে শরীরের অভ্যন্তরে দগ্ধ হইবার সময় তাপ উৎপন্ন হয়, এবং উক্ত তাপের কিয়দংশ শক্তিতে পরিণত হয়। ঐ তাপ দ্বারা আমাদিগের শারীরিক তাপ সংরক্ষিত হয়, এবং

উক্ত শক্তির সাহায্যে আমরা সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হই। আক বা বিট্‌পালমের চিনি খাইলে মুখের মধ্যে উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। পাকাশয়ে গমন করিলে চিনির কিয়দংশমাত্র পাকস্থলীর রসের সহিত মিলিত হইয়া দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হয়, পরে অন্ত্রমধ্যে উপস্থিত হইলে অন্ত্রস্থিত রসের সহিত মিলিত হইয়া অবশিষ্টাংশ দ্রাক্ষাশর্করায় পরিবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে রক্তের সহিত মিলিত হইয়া অন্ত্র হইতে রক্তবাহিনী শিরা দ্বারা যকৃতে নীত হয় এবং গ্লাইকোজেন (Glycogen) নামক অন্যপ্রকার পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া যকৃৎ মধ্যে অবস্থিতি করে। প্রয়োজনমত এই গ্লাইকোজেন তাপ ও শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত শরীরমধ্যে পুনর্ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুমূত্র রোগে দ্রাক্ষাশর্করাকে গ্লাইকোজেনে পরিবর্ত্তিত করিবার কার্য্য যকৃৎদ্বারা সুসম্পন্ন হয় না. সুতরাং কিয়দংশ চিনি যকৃৎ হইতে নির্গত হইয়া রক্তের সহিত সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয় এবং মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

চিনির প্রধান গুণ এই যে, ইহা অতিসহজে পরিপাক হইয়া শীঘ্রই শরীরমধ্যে শোষিত হইয়া থাকে। ভাত, ডাল, রুটি, আলু প্রভৃতি শ্বেতসারসংযুক্ত যে কোন পদার্থই আমরা ভক্ষণ করি না কেন, ঐগুলি প্রথমতঃ মুখস্থিত লালা এবং অন্ত্রস্থিত অপর পাচক রসদ্বারা চিনিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরে শরীরমধ্যে শোষিত হয়; কিন্তু চিনি ব্যবহার করিলে উহা একেবারেই শরীরমধ্যে শোষিত হইয়া থাকে, সুতরাং শ্বেতসারযুক্ত পদার্থকে চিনিতে পরিবর্ত্তিত করিতে যে যান্ত্রিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, চিনি খাইলে সেইটুকু বাঁচিয়া যায়।

মৎস্য, মাংস, রুটী, ডাল, ভাত, তরকারি, ফল প্রভৃতি যে কোন খাদ্যই ভক্ষিত হউক না কেন, ঐগুলির কিয়দংশের একেবারেই পরিপাক হয় না। অপরিপাচ্য পদার্থ মলমূত্রের সহিত আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। চিনি খাইলে উহার সমস্ত অংশই সহজে জীর্ণ হইয়া যায়, কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং অজীর্ণ পদার্থকে শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিবার জন্য শারীরিক যন্ত্রদিগকে যে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, এবং তজ্জন্য তাহাদিগের বৃথা বলক্ষয় হইয়া থাকে, চিনি ব্যবহার করিলে তাহা হয় না। চিনি হইতে চর্বি (fat) প্রস্তুত হয়। চর্বি শরীরমধ্যে সঞ্চিত থাকে, এবং

প্রয়োজনমত উহাদ্বারা তাপ ও শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। চিনি দ্বারা মাংসপেশী ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের অযথাক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে। চিনি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখরোচক প্রিয় খাদ্য; মুখরোচকতা-গুণ ইহার পরিপাকসম্বন্ধে সবিশেষ সহায়তা করে। মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি সকল খাদ্যই স্বল্পকালমধ্যে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু চিনি, যতদিনই রাখা হউক না কেন, অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

চিনি যে শুদ্ধ অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তাহা নহে; অনেকানেক খাদ্যের সহিত অধিকপরিমাণে মিশ্রিত থাকিলে, উহাদিগকে নষ্ট হইতে দেয় না। আপনারা অনেকেই বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ (Condensed milk) ব্যবহার করিয়া থাকেন। দুগ্ধের সহিত প্রচুরপরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া ঘন করিলে Condensed milk প্রস্তুত হয়। ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। চিনির দ্বারা নানাবিধ ফলের মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে; দেশী মোরব্বা বা বিলাতী জ্যাম্ অনেক দিন থাকিলেও নষ্ট হয় না। মিশ্রী, বাতাসা, ওলা, কদ্‌মা প্রভৃতি চিনির রস হইতে নির্ম্মিত সামগ্রী বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিলেও নষ্ট হইয়া যায় না, এবং এক দেশ হইতে দেশান্তরে যাইবার সময় অধিকপরিমাণে সঙ্গে লইয়া গেলে পথে সুখাদ্যের অপ্রতুল হয় না।

পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অধিকপরিমাণে চিনি খাইলে দেহ স্থূল হয়। কায়িকপরিশ্রমসাপেক্ষ কোনও কর্ম্ম করিতে হইলে, যে শারীরিক বলের প্রয়োজন, তাহা চিনি বা চিনির উৎপাদক ময়দা, চাউল প্রভৃতি পদার্থদ্বারা যত অধিকপরিমাণে উৎপন্ন হয়, মৎস্য মাংস প্রভৃতি আমিষখাদ্য দ্বারা সেরূপ হয় না। বিখ্যাত অধ্যাপক পেটেৎকফার বলেন যে, যখন শারীরিক পরিশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তখন আমিষভক্ষণ শ্রেয়ঃ; কিন্তু যে কার্য্যে অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য চিনি বা চিনির উৎপাদক খাদ্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন যে, সুদৃঢ় ও পরিপুষ্ট মাংসপেশী প্রস্তুত করিবার জন্য আমিষভক্ষণের প্রয়োজন, কিন্তু সেই সকল মাংসপেশী পরিচালনার নিমিত্ত যে শক্তির আবশ্যকতা হয়, তাহা চিনি বা চিনির উৎপাদক খাদ্য হইতে উৎপন্ন

হইয়া থাকে। জাপানে গরু ও ঘোড়ার পরিবর্ত্তে মানুষে গাড়ী টানিয়া থাকে; গাড়ি টানা অত্যন্ত পরিশ্রমের কার্য্য। এই সকল লোকে গাড়ি টানিবার সময়ে যথেষ্টপরিমাণে অন্ন আহার করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, ভাত না খাইলে অল্প পরিশ্রমেই তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে সময় গাড়ী টানিবার প্রয়োজন হয় না, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে, সেই সময় তাহারা মাংস আহার করে।

অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, ইংরাজেরা অধিক পরিমাণে চিনি ব্যবহার করেন বলিয়া তাঁহারা ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বলিষ্ঠ, শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু। এক জন ইংরাজ গড়ে দিনে দেড় ছটাক চিনি ব্যবহার করিয়া থাকে। জর্ম্মণেরা ইংরাজের ন্যায় তুল্যবলশালী, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। একজন জর্ম্মণ দিনে তিন কাঁচ্চা মাত্র চিনি ব্যবহার করে, কিন্তু চিনি কম খাইলেও উহারা যথেষ্টপরিমাণে বিয়ার পান করিয়া থাকে। বিয়ার নামক সুরায় যবশর্করা (Maltose) অধিকপরিমাণে অবস্থিতি করে, এবং ইহা দ্বারাই চিনির অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। রুশিয়া, ইতালি ও স্পেনের অধিবাসিগণ চিনি অত্যল্পপরিমাণে ব্যবহার করে। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে ইতালি ও স্পেনের অধিবাসিগণ এই কারণে অলস ও নিরুদ্যম এবং রুশিয়ার অধিবাসিগণের মধ্যে উদ্যমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবাসিগণ যত অধিকপরিমাণে চিনি ব্যবহার করে, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে; কোন জাতি তত অধিক চিনি ব্যবহার করে না; তথাপি যে ভারতবাসী দুর্ব্বল, নিরুৎসাহ ও উদ্যমহীন, তাহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিলে বাহির হইতে পারে।

মসো নামক একজন ডাক্তার যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পরিশ্রম করিতে করিতে মাংসপেশীর যে দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়, তাহা চিনি খাইলে যেরূপ শীঘ্র অপনীত হয়, এবং মাংসপেশীসমূহ পুনরায় যেরূপ কার্য্যক্ষম হয়, সেরূপ আর কোনও খাদ্যদ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যায় না। ইহার কারণ এই যে, চিনির ন্যায় অপর কোনও খাদ্যই অত শীঘ্র শরীরমধ্যে শোষিত হইয়া তাপ ও বলে পরিবর্ত্তিত হয় না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যে কার্য্যে অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেই কার্য্য

করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প চিনি খাওয়া উচিত; চিনি দ্বারা অত্যধিক পরিশ্রমজনিত স্নায়ুর অবশ্যম্ভাবী অবসাদ দূরীকৃত হয়।

আরবদেশবাসিগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। তাহারা গৃহকার্য্য ও বাণিজ্যের নিমিত্ত উষ্ট্র ব্যবহার করিয়া থাকে। উষ্ট্রের ন্যায় পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু জীব অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আরবদেশবাসী মনুষ্যের ও উষ্ট্রের প্রধান খাদ্য খেজুর, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাহারা খেজুর ভিন্ন অন্য কিছুই খায় না। খেজুরে শতকরা ৫৮ ভাগ চিনি আছে।

সুমাত্রাদ্বীপবাসীরা বাণিজ্যার্থে বহু দিবসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া সমুদ্রের উপর যাতায়াত করে। নৌকার দাঁড়টানা অত্যন্ত পরিশ্রমের কার্য্য; তাহারা শুদ্ধ ভাত ও আক খাইয়া এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

ওয়েষ্টইণ্ডিজ্ দেশ আকের চাসের জন্য বিখ্যাত; আকের ক্ষেত্রে নিগ্রো-দিগকে সমস্ত দিন অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়। দেখা যায় যে, তাহারা সমস্ত দিন আক খাইতেছে এবং ক্ষেত্রের কার্য্য করিতেছে; তাহারা বলে যে, আক খাইতে খাইতে কার্য্য করিলে তাহারা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, এবং তজ্জনিত শারীরিক ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করে না।

আরও দেখা গিয়াছে যে, ঘোড়াকে চিনি খাওয়াইলে উহারা অধিক পরি-শ্রম করিতে পারে। যাঁহারা বাইসিকেলে অধিকদূর ভ্রমণ করেন, তাঁহারা বলেন যে, চিনি ব্যবহার করিলে অধিক দূর ভ্রমণজনিত ক্লান্তি যে পরিমাণে বিদূরিত হয়; সুরা, মাংস প্রভৃতি কোনও উত্তেজক খাদ্যই, সেরূপ পরিমাণে অধিকদূর ভ্রমণজনিত ক্লান্তি দূর করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা আল্পস্ পর্ব্বতে আরোহণ করেন, তাঁহারা পূর্ব্বে পর্ব্বতারোহণের সময় সুরা উত্তেজকরূপে ব্যবহার করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা সুরার পরিবর্ত্তে চকোলেট্, জ্যাম্ প্রভৃতি চিনিঘটিত পদার্থ ব্যবহার করিয়া অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন। হলণ্ডের ব্যায়াম-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিগণ এক্ষণে প্রচুরপরিমাণে চিনি ব্যবহার করিতেছে; দেখা গিয়াছে, যে সকল বালক অধিকপরিমাণে চিনি ব্যবহার করে, তাহারা অন্যান্য বালক অপেক্ষা অধিকক্ষণ ব্যায়াম

ও নৌকাচলন করিতে সমর্থ হয়। এবং এই সকল কার্য্যে তাহারা সবিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

খৃ ১৮৯৮ সালে জর্ম্মণি দেশের সৈন্যবিভাগে সুরা এবং চিনি এই উভয় পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি শ্রমসাধ্য কার্য্যের পক্ষে অনুকূল, তদ্বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। এক স্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী অন্যস্থানে কুচ করিবার সময় কতকগুলি সৈন্যকে সুরা, অপর কতকগুলিকে চিনি দেওয়া হইয়াছিল, এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে সুরা বা চিনি কিছুই দেওয়া হয় নাই। যাহারা সুরাপান করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ সৈনিকই এক উদ্যমে শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই; তাহারা ক্লান্ত ও ভ্রমণে অক্ষম হইয়া পথিমধ্যে বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যাহারা সুরা বা চিনি কিছুমাত্র খায় নাই, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই শেষসীমা পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অতিশয় ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিল। কিন্তু যাহারা গমনের সময় চিনি ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারা সকলেই উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তির সহিত শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল, কেহই শারীরিক ক্লান্তি বা অবসাদ সবিশেষ অনুভব করে নাই। তাহাদিগের নাড়ীর গতি ও শ্বাসক্রিয়া উপরিউক্ত অপর দুই শ্রেণীর লোকের ন্যায় স্বাভা-বিক অপেক্ষা অধিক দ্রুত হইতে দেখা যায় নাই। তাহারা বলে যে, ভ্রমণের সময় মধ্যে মধ্যে এক এক ডেলা চিনি গালে ফেলিয়া দিলেই তাহাদিগের তৃষ্ণা নিবারিত হইত, এবং তাহারা শরীরমধ্যে বলের সঞ্চার অনুভব করিতে পারিত। এই পরীক্ষার ফলস্বরূপ অধুনা জর্ম্মণ সৈন্যগণকে খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণে চিনি দেওয়া হইয়া থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ উত্তরমেরুর আবিষ্কারক ন্যান্‌সেন্ (Nansen) বলেন যে, তিনি উত্তরমেরু পরিভ্রমণের সময়ে এই বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যে, উক্ত শীতপ্রধান দেশে ব্র্যাণ্ডি পান বিশেষ অনিষ্টকর। তিনি সবিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ব্র্যাণ্ডির পরিবর্ত্তে মিষ্ট ফল ও চিনি-ঘটিত পদার্থ খাইতে দিলে তাঁহার নাবিকেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারিত, এবং মেরুপ্রদেশের শীতের দারুণ কষ্ট তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করিত না।

চিনি এরূপ পুষ্টিকর সুখাদ্য হইলেও উহার অপব্যবহারে বিলক্ষণ অনিষ্ট

সংসাধিত হয়। অত্যন্ত অধিকপরিমাণে চিনি বা চিনির উৎপাদক খাদ্য ভক্ষণ করিলে দেহ স্থূল ও উদর স্ফীত হইতে দেখা যায়, এবং অধিক দিন অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে চিনির কিয়দংশ মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এইরূপে বহুমূত্র রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে। ভারতবাসিগণ অধিকাংশ সময়েই চিনির অপব্যবহার করিয়া থাকেন; আমরা যে সকল খাদ্যদ্রব্য সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাতে চিনি বা চিনির উৎপাদক পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। আমরা রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম করিলে এই অত্যধিকপরিমাণ চিনি শরীরমধ্যে শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু ব্যায়াম বা পরিশ্রমঘটিত কোনও কার্য্য করিতে আমরা একেবারেই পরাঙ্মুখ, সুতরাং কালসহকারে সমস্ত চিনি আমাদের শরীরমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া কিয়দংশ মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। মূত্রের সহিত এইরূপে চিনি নির্গত হইলে, যে রোগ উপস্থিত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে গ্লাইকোসুরিয়া (Glycosuria) কহে। এই রোগ প্রকৃত বহুমূত্র (Diabetes) রোগের ন্যায় অনিষ্টকারক নহে। কারণ খাদ্যের পরিবর্ত্তনে এই রোগের সবিশেষ উপশম হইয়া থাকে। খাদ্যে চিনি বা চিনির উৎপাদক পদার্থের পরিমাণ কমাইয়া দিলেই মূত্রে চিনির ভাগ কমিয়া যায়, অথবা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া থাকে; কিন্তু এই রোগের প্রতিকার প্রথম হইতে না করিলে কিছুদিনের মধ্যে দুশ্চিকিৎস্য প্রকৃত ডায়াবিটিজ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের কৃষকাদি শ্রমজীবীদিগের খাদ্য আমাদিগের খাদ্যেরই অনুরূপ, কিন্তু তাহারা যথেষ্টপরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদিগের মধ্যে বহুমূত্র রোগ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদিগের অবিবেচনার নিমিত্ত চিনির ন্যায় উৎকৃষ্ট খাদ্যও অখাদ্যে পরিণত হইয়া থাকে।

এ দেশে একদিকে যেমন অনেকেই অধিকপরিমাণ চিনি খাইয়া থাকেন, তেমনই অপর কতকগুলি লোকে চিনিকে নিতান্ত অনিষ্টকর পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন; এমন কি, অনেকে একেবারেই চিনি ব্যবহার করিতে সম্মত নহেন। আমি এ সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক গল্প শুনিয়াছি। আমার একজন বন্ধু অপর এক ব্যক্তিকে একটী মিঠা পান খাইতে দিয়াছিলেন; মিঠা পানে চিনি না

থাকিলেও উহা আস্বাদনে ঈষৎ মিষ্ট। ঐ ব্যক্তি পান মুখে দিয়াই সমস্ত ফেলিয়া দিলেন, এবং মুখ ধুইয়া বলিলেন যে, পান নিশ্চয়ই চিনি দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনি চিনিকে অত্যন্ত অনিষ্টকারক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং তজ্জন্য তিনি চিনির ব্যবহার একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনায়, "কৃষ্ণ কাল বলিয়া, কোন কাল জিনিষ দেখিবনা" রাধিকার এইরূপ প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চিনির সদ্ব্যবহারে আমরা অশেষ উপকার প্রাপ্ত হই। বালকেরা চিনি বা গুড় খাইতে বড়ই ভালবাসে; তাহাদিগের শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত চিনি একটী প্রশস্ত খাদ্য। অনেক সময়ে ভ্রমবশতঃ বালকদিগকে যথেষ্টপরিমাণে চিনি খাইতে না দিয়া আমরা তাহাদিগের শারীরিক উন্নতির প্রতিবন্ধকতা সাধন করিয়া থাকি।

যক্ষা, পুরাতন জ্বর প্রভৃতি যে সকল রোগে শরীর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, রোগীকে অধিক পরিমাণে চিনি খাইতে দিলে ঐ ক্ষয় কম হয়, রোগীর ওজনবৃদ্ধি হয়, এবং শরীরে বল ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়। রক্তহীনতা (Anœmia) রোগে চিনি একটী মহোপকারক খাদ্য।

বালকগণের ন্যায় বৃদ্ধেরাও চিনির বিশেষ পক্ষপাতী। বৃদ্ধবয়সে চিনি একটী মহোপকারক খাদ্য। সকলেই জানেন যে, বৃদ্ধবয়সে শরীরের উত্তাপজনকতা শক্তি কমিয়া যায়, এজন্য শারীরিক তাপের হ্রাস হয়। চিনি খাইলে শরীরে তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং হীনবল শারীরিক যন্ত্রগুলিকে তাপোৎপাদনের নিমিত্ত অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না।

বহুদিন পর্য্যন্ত কোন রোগভোগ করিয়া আরোগ্যলাভ করিবার মুখে চিনি একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য; আমরা এই সময়ে রোগীর জন্য (Malt) মল্ট্ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ সুফল লাভ করিয়া থাকি। Maltএ চিনি (যবশর্করা) ব্যতীত এমন একটী পদার্থ আছে, যাহা শ্বেতসারযুক্ত খাদ্যপরিপাকের সহায়তা করে। এজন্য মল্ট্ ব্যবহার করিয়া আমরা উপকার প্রাপ্ত হই।

দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি সহজে চিনি পরিপাক করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আর Malt ব্যবহার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মল্টের ব্যবহার অধিক ব্যয়সাপেক্ষ।

কেহ কেহ বলেন যে, অধিক চিনি খাইলে নানাবিধ দন্তরোগ উৎপন্ন হয়। এই বিশ্বাসটী যে সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসিগণ চিনি অত্যধিকপরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের দন্ত পৃথিবীর অপরাপর অনেকজাতি অপেক্ষা সুসজ্জিত, সুদৃঢ় এবং রোগবিহীন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে নিগ্রোরা চিনি অধিকপরিমাণে ভক্ষণ করে, ইহাদের মধ্যে দন্তরোগ মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

বালকদিগের ছর্দ্দি কাসি হইলে চিনি বা গুড় অধিক খাইতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ চিনি আধকপরিমাণে ব্যবহার করিলে ছর্দ্দি শীঘ্র সারিতে চায় না। অল্পপরিমাণ চিনি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন খাইতে দিলে অনিষ্ট হয় না।

বেশী মোটা হইলে চিনির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। চিনি পরিত্যাগ করিলে উদরস্ফীতি (ভুঁড়ি) কমিয়া যায়, এবং শরীর অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইয়া স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। যাঁহাদিগের মূত্রের সহিত চিনি নির্গত হয়, চিনি ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে কোন মতেই বিধেয় নহে। মোটা লোকের বাত (Gout) হইলে চিনির ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। এরূপ স্থলে চিনি বিষের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু বাতগ্রস্ত রোগী ক্ষীণদেহ হইলে, চিনি তত অনিষ্ট করে না।

চিনির খাদ্যগুণসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা উপরে বলা হইল। এরূপ উপকারক খাদ্য লোকে যত অধিক ব্যবহার করিতে পারে, ততই মঙ্গল। যাহাতে দরিদ্রগণ ইহা সুলভমূল্যে ও সহজে পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সমাজহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ন্যায়দর্শনের ইতিহাস।

দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতীত আত্মা, জগৎ, কার্য্য, কারণ, পরলোক, সুকৃত, দুষ্কৃত, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ প্রভৃতি কোন পদার্থেরই প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। হিন্দুদর্শনের বহুবিধ মত থাকিলেও ছয়টী প্রধান। সেই ছয়টী প্রধান দর্শনের নাম—সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত। উক্ত ষড়্দর্শনের মধ্যে ন্যায়দর্শনের মত অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মবিচারে পরিপূর্ণ। যুক্তিমার্গই নৈয়ায়িকগণের প্রধান অবলম্বনীয়। কি আত্মতত্ত্ব, কি মোক্ষতত্ত্ব, সকল বিষয়েরই বিনিশ্চয়ার্থ তাঁহারা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যে শাস্ত্রে ন্যায় বিচারিত হইয়াছে, তাহাকে ন্যায়শাস্ত্র বলে।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, ও নিগমন এই পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট বাক্যের নাম ন্যায়। নিম্নে এই পাঁচটী অবয়ব প্রদর্শিত হইতেছে :—

প্রতিজ্ঞা—এই পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট।

হেতু—(১) অন্বয় হেতু—যেহেতু, ইহাতে ধূম আছে।

(২) ব্যতিরেক হেতু—যদি ইহাতে ধূম না থাকিত, তাহা হইলে এরূপ হইত না।

উদাহরণ—(১) অন্বয় উদাহরণ—যেমন পাকশালা, (ইহাতে ধূমের সত্তা)।

(২) ব্যক্তিরেক উদাহরণ—যেমন জলাশয় (ইহাতে ধূমের অভাব)।

উপনয়—(১) অন্বয় উপনয়—যে যে স্থলে বহ্নি আছে, সেই সেই স্থলে ধূম আছে।

(২) ব্যতিরেক উপনয়—যে যে স্থলে বহ্নি নাই, সেই সেই স্থলে ধূম নাই।

নিগমন—অতএব পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট।

ন্যায়দর্শনে এই পঞ্চাবয়বের বিশদ লক্ষণ ও পরীক্ষা বিবৃত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থে আত্মা, মনঃ, ক্ষিতি, ইত্যাদি পদার্থের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, উহাই অধুনা প্রাচীন ন্যায় বা সংক্ষেপতঃ ন্যায়শাস্ত্রনামে অভিহিত। আর যে সকল গ্রন্থে পদার্থের লক্ষণ লিখিত হয় নাই, কিন্তু যাহাতে কেবল তর্কের নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, উহাই নব্যন্যায় বা তর্কশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ন্যায়দর্শনের অপর নাম আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, মহর্ষি গৌতম প্রাচীন ন্যায়ের (বা ন্যায়শাস্ত্রের) প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। ইহাঁকে, কেহ কেহ গোতম নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। শ্রীহর্ষপ্রণীত নৈষধচরিত কাব্যের ১৭শ সর্গে কলি বলিতেছেনঃ—

মুক্তয়ে যৎ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গোতমং তং বিজানীত যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥

যে মহামুনির শাস্ত্রে লিখিত আছে, মুক্ত্যবস্থায় জীবাত্মা সুখদুঃখরহিত হইয়া পাষাণবৎ হন, তাঁহাকে গোতম বলিয়া জান। তাঁহার নাম যেরূপ, তিনি প্রকৃতও তাহাই (একটী গোতম বা প্রধান গো)।

গৌতমের অপর নাম অক্ষপাদ। কাহারও কাহারও মতে বৈশেষিক-দর্শনের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ ও ন্যায়দর্শনের প্রবর্ত্তক অক্ষপাদ একই ব্যক্তি।

মহর্ষি-গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান এই ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। এই ষোড়শ পদার্থের সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমে মানবের মুক্তিলাভ হয়। মহর্ষি গৌতম মুক্তির প্রণালীবর্ণনস্থলে লিখিয়াছেন, "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ" ন্যায়োক্ত ষোড়শ পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলে, মিথ্যা জ্ঞানের নাশ হয়, তদনন্তর ক্রমে দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে। জীবাত্মার ইহাই মুক্তাবস্থা।

ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রমাণচতুষ্টয়দ্বারা প্রমেয়সমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয়, মনঃ, আত্মা, সুখ, দুঃখ, প্রেত্যভাব ইত্যাদি প্রমেয়-পদবাচ্য। প্রতিবাদীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে হইলে, অথবা স্বয়ং কোন দুরূহ পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যে সকল যুক্তি বা তর্ক অবলম্বন করিতে হয়, সংশয়, প্রয়োজন প্রভৃতি অপর চতুর্দ্দশ পদার্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

ন্যায়সূত্রে যে সকল তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, ঐ সমুদয় যে গৌতমের উদ্ভাবিত, এরূপ বলিতে পারা যায় না। যে সময়ে উপনিষদ্ সকল প্রকাশিত

হয়, ঐ সময় হইতেই নানা দার্শনিক মত এদেশে প্রচলিত হইতে থাকে। বোধ হয়, গৌতম উহার কোন কোন মত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া স্বীয় সূত্রে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গৌতমসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের ১৪শ সূত্র যথাঃ—

ক্ষীরবিনাশে কারণানুপলব্ধিবৎ দধ্যুৎপত্তিবচ্চ তদুৎপত্তিঃ।

ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়ের ১ম পাদের ২৪ সূত্র যথাঃ—

উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ন ক্ষীরবদ্ধি।

বৈশেষিকসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদের ৪র্থ সূত্র যথাঃ—

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়বিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছা দ্বেষপ্রযত্নাশ্চ আত্মনোলিঙ্গানি।

ন্যায়সূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের ১০ম সূত্র যথাঃ—

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানানি আত্মনো লিঙ্গমিতি।

এই সকল স্থলে গৌতম, কণাদ ও ব্যাস ইহাঁরা একইপ্রকার যুক্তি ও দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, ঐ সকল যুক্তি ও দৃষ্টান্ত গৌতম, কণাদ ও ব্যাসের সময়ে ও তৎপূর্ব্বেও লোকসমাজে সবিশেষ প্রচলিত ছিল। গৌতমপ্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রচলিত মতসমূহের সংস্কারসাধন করিয়া স্ব স্ব দর্শনের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

কতকাল হইল ন্যায়দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ১৬শ অধ্যায়ে অণু ও পরম-মহতের উল্লেখ আছে, এবং ঐ স্থলে ভাগবতকার পরমাণুকে জগতের মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরক-সংহিতায় বাদ, প্রতিজ্ঞা, স্থাপনা, প্রতিষ্ঠাপনা, হেতু, উপনয়, নিগমন, উত্তর, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, শব্দ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঔপম্য, সংশয়, প্রয়োজন, সব্যভিচার ছল, প্রতিজ্ঞাহানি, নিগ্রহস্থান প্রভৃতি ন্যায়োক্ত পারিভাষিক শব্দের উদ্দেশ ও লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে সময়ে চরক-সংহিতা বিরচিত হয়, তখন ন্যায়সূত্র সর্ব্বত্র প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতে মহর্ষি ব্যাস লিখিয়াছেন, "আমি আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র অবলোকন করিয়া উপনিষদ্‌সকলের সারসংগ্রহ করিয়াছি।" ইহাদ্বারা প্রতীতি হয়, মহর্ষিব্যাসের পূর্ব্বেও ন্যায়দর্শনের

প্রচলন ছিল। Goldstucker (গোল্‌ডষ্টুকার) পাণিনিব্যাকরণের যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় লিখিত আছে যে, উক্ত ব্যাকরণের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি উভয়েই ন্যায়সূত্র জানিতেন। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, কাত্যায়ন ভগবান্ উপবর্ষের শিষ্য ও রাজা নন্দের অমাত্য ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে নন্দবংশীয় রাজগণ মগধে রাজত্ব করিতেন। অতএব কাত্যায়নও ঐ সময়ের লোক এবং ন্যায়দর্শনপ্রবর্ত্তক গৌতম উহার অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। আর শবরস্বামী মীমাংসাভাষ্যে * ভগবান্ উপবর্ষের একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, উপবর্ষ গৌতমের ন্যায়সূত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভগবান্ উপবর্ষ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব ন্যায়দর্শনকার যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়।

ন্যায়সূত্রের যে সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে বাৎস্যায়নভাষ্যই সর্ব্বপ্রাচীন। বাৎস্যায়নের অপর নাম পক্ষিলস্বামী। ইনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন সহজ উপায় নাই। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ইহাকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। জৈন হেমচন্দ্র স্বীয় অভিধানচিন্তামণিনামক কোষগ্রন্থে লিখিয়াছেন, বাৎস্যায়ন ও চাণক্য একই ব্যক্তি। অভিধানচিন্তামণির বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কুটিলশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥

"বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কুটিল, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত ও অঙ্গুল এই সকল একই ব্যক্তির নাম।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয়, সাহিত্যসভার কোন অধিবেশনে "প্রাচীন ভারতের দৈনিক আচারনামক" প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, কামসূত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়ন ও ন্যায়ভাষ্যপ্রণেতা বাৎস্যায়ন এবং চাণক্য একই ব্যক্তি। যদি চাণক্য ও বাৎস্যায়ন একই ব্যক্তি হয়েন, তাহা হইলে, তিনি খৃঃ

* মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই মহোদয়ের সংস্করণ শবরভাষ্য (Bibliotheca Indica, page 10.)

পূঃ ৩২৭ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আলেক্‌জাণ্ডারের সমসাময়িক, সুতরাং খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। আমার বোধ হয়, বাৎস্যায়ন ও চাণক্য এক ব্যক্তি নহেন, এবং অভিধানচিন্তামণির বচন অমূলক। নানাপ্রকার প্রমাণদৃষ্টে আমার প্রতীতি হয়, বাৎস্যায়ন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর লোক। বাৎস্যায়ন স্থানে স্থানে ন্যায়সূত্রের বিভিন্ন-প্রকার অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন (যথা ন্যায়সূত্র ১।১।৫)। ইহাতে বোধ হয়, বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও ন্যায়সূত্রের কোন কোন ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থ এক্ষণে অপ্রাপ্য।

বাৎস্যায়নের পরেই আমরা সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগাচার্য্যের উল্লেখ করিতে পারি। দিঙ্‌নাগ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন। সুবিখ্যাত টীকাকার মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথ মেঘদূতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্" এই শ্লোকাংশে কালিদাস স্বীয় প্রতিপক্ষ দিঙ্‌নাগাচার্য্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। দিঙ্‌নাগ ও কালিদাস উভয়েই তিব্বতরাজ হ্লা—থো—থো—রি র সমসাময়িক, সুতরাং খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিব্বতদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ পণ্ডিত লামা তারানাথ "ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস"-নামকগ্রন্থে লিখিয়াছেন, দিঙ্‌নাগ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কাঞ্চীনগরে সিংহবক্ত্র গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নাগদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত হন, ও সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দিঙ্‌নাগের ন্যায় তার্কিক প্রাচীন ভারতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রমাণসমুচ্চয় নামক একখানি স্বতন্ত্র তর্কগ্রন্থ ও ন্যায়ভাষ্যনামে গৌতমসূত্রের এক ভাষ্যগ্রন্থ বিরচন করেন। তাঁহার মত অধিকাংশস্থলেই বাৎস্যায়নভাষ্যের বিরোধী।

বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, দিঙ্‌নাগাদি বৌদ্ধদার্শনিকগণের তর্কজালদ্বারা উহা সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উদ্যোতকরাচার্য্য ন্যায়বার্ত্তিক বিরচন করেন। স্বীয় বার্ত্তিকের প্রারম্ভে উদ্যোতকর লিখিয়াছেন :—

যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ
কুতার্কিকধ্বান্তনিরাসহেতোঃ করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ ॥

মুনিপুঙ্গব অক্ষপাদ জগতে শান্তিসংস্থাপনের অভিপ্রায়ে যে শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, দিঙ্‌নাগাদি কুতার্কিকগণের মোহনিবারণের নিমিত্ত আমি সেই শাস্ত্রের বার্ত্তিক রচনা করিব।

বস্তুতঃ দিঙ্‌নাগের মতসমূহ নিরাকৃত করিবার জন্যই উদ্যোতকর গৌতম-সূত্রের বার্ত্তিক লিখিয়াছিলেন। ন্যায়বার্ত্তিক গ্রন্থে দিঙ্‌নাগ ভদন্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভদন্ত শব্দের অর্থ মাননীয়। ইহা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের সম্মানসূচক উপাধি। পালি গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ বুদ্ধদেবকে ভদন্ত বা ভন্তে এই নামে সম্বোধন করিবেন। মহাপরিনিব্বাণ-সুত্ত নামক পালিগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণলাভের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে স্বীয় শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "হে শিষ্যগণ আমার মৃত্যুর পর তোমরা পূজার্হ ব্যক্তিকে পূজা ও স্নেহভাজন ব্যক্তিকে স্নেহ করিবে। নবীন সন্ন্যাসিগণ প্রাচীন সন্ন্যাসিগণকে ভদন্ত বা ভন্তে এই নামে সম্বোধন করিবেন" ইত্যাদি। কাত্যায়ন স্বীয় পালিব্যাকরণের নামকপ্পের চতুর্থ কাণ্ডে লিখিয়াছেন :—"ভদন্তস্স ভদ্দন্ত ভন্তে" অর্থাৎ ভদন্ত শব্দের সম্বোধনে ভদ্দন্ত, ভন্তে ও ভদন্ত এই তিন পদ সিদ্ধ হয়।

মহাপণ্ডিত দিঙ্‌নাগ ভদন্ত নামে পরিচিত ছিলেন। উদ্যোতকরাচার্য্য অনেক স্থলেই এই ভদন্তকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রের বার্ত্তিকে দৃষ্ট হয়, প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ লইয়া ভদন্তের সহিত উদ্যোতকরের ঘোর মতভেদ। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৬ষ্ঠ সূত্রের বার্ত্তিকপাঠে জানা যায়, দিঙ্‌নাগ উপমান প্রমাণ স্বীকার করিতেন না, ৭ম সূত্রের বার্ত্তিকে দৃষ্ট হয়, তিনি আপ্তোপদেশকেও একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। উদ্যোতকর উপমান ও আপ্তোপদেশ উভয়েরই প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। উদ্যোতকর একস্থানে লিখিয়াছেন, "অহো প্রমাণাভিজ্ঞতা ভদন্তস্য" আহা ভদন্তের কি প্রমাণজ্ঞান! অপর স্থলে লিখিয়াছেন, "কো হ্যন্যো ভদন্তাৎ বক্তুমর্হতি।" ভদন্তভিন্ন অপর কে এরূপ বলিতে পারে! ইত্যাদি।

বস্তুতঃ হিন্দু নৈয়ায়িক উদ্যোতকর বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগের মতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বাসবদত্তাগ্রন্থে সুবন্ধু কবি লিখিয়াছেন :—

"ন্যায়স্থিতিমিবোদ্যোতকরস্বরূপাম্" ন্যায়শাস্ত্রের সংস্থাপনের জন্য উদ্যোতকর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে সুবিখ্যাত বৌদ্ধনৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তির আবির্ভাবে উদ্যোতকরাচার্য্যের গৌরব অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়। ধর্ম্মকীর্ত্তি ন্যায়বিন্দু-নামে একখানি স্বতন্ত্র তর্কগ্রন্থ ও ন্যায়বার্ত্তিক নামে গৌতমসূত্রের একখানি বার্ত্তিক গ্রন্থ বিরচন করেন। দিঙ্‌নাগভাষ্যের অভ্রান্ততাপ্রতিপাদনই ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বার্ত্তিকবিরচনের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্মকীর্ত্তিও অসামান্য তার্কিক ছিলেন। তিনি উদ্যোতকরের মত খণ্ডন করিয়া দিঙ্‌নাগের মত-সংস্থাপনের নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি তিব্বতরাজ স্রন্‌সন্ গোম্পের সমসাময়িক, অতএব খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক।

খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু দার্শনিকগণ ধর্ম্মকীর্ত্তির মত নিরাকরণ করিতে প্রয়াস করেন, এবং অন্যপক্ষে সমন্তভদ্র, অকলঙ্কদেব, প্রভাচন্দ্র প্রভৃতি বৌদ্ধদার্শনিকগণ ধর্ম্ম-কীর্ত্তির মতসংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। মীমাংসক সুরেশ্বরাচার্য্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের বার্ত্তিকে ধর্ম্মকীর্ত্তির মত নিরাকরণ করিয়া লিখিয়াছেন :—

ত্রিষ্বেব ত্ববিনাভাবাদিতি যৎ ধর্ম্মকীর্ত্তিনা।
প্রত্যজ্ঞায়ি প্রতিজ্ঞেয়ং হীয়েতাসৌ ন সংশয়ঃ ॥

অনুপলব্ধি, স্বভাব ও কার্য্য এই তিনটী অবিনাভাব সম্বন্ধের লিঙ্গ, ধর্ম্ম-কীর্ত্তির এই প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়ই বর্জ্জন করিতে হইবে। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে হিন্দু দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্রের অভ্যুদয়ে ধর্ম্মকীর্ত্তির কীর্ত্তি অনেকপরিমাণে অস্তগত হয়। বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়সূচীনিবন্ধ নামে একখানি স্বতন্ত্র ন্যায়গ্রন্থ ও ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা নামে একখানি গৌতমসূত্রের টীকা বিরচন করেন। ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকার প্রারম্ভে বাচস্পতি লিখিয়াছেন :—

ভগবান অক্ষপাদ নিঃশ্রেয়সবিষয়ক যে ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ভগবান্ পক্ষিলস্বামী তাহার ব্যুৎপাদনের নিমিত্ত ভাষ্যবিরচন করেন।

তবে আবার উদ্যোতকরের বার্ত্তিক লিখিবার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা নিরাকরণের অভিপ্রায়ে তিনি বলিয়াছেন, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি অর্ব্বাচীনগণের কুতর্করূপ অন্ধকারদ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় অক্ষপাদের শাস্ত্র তত্ত্বনির্ণয়ের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত নহে। এই অন্ধকার অপনয়ন করিবার জন্য উদ্যোতকর বার্ত্তিক লিখিয়াছেন ও আমি বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা বিরচন করিলাম।

ন্যায়সূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ৫ম সূত্রের তাৎপর্য্যটীকায় বাচস্পতিমিশ্র, ধর্ম্মকীর্ত্তি ও দিঙ্‌নাগ উভয়েরই মত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং প্রায় সর্ব্বত্রই সমালোচনাচ্ছলে লিখিয়াছেন :—

"ভ্রান্তো ভদন্তদিঙ্‌নাগঃ"। ভদন্ত দিঙ্‌নাগের মত ভ্রমপূর্ণ।

ন্যায়সূচীনিবন্ধগ্রন্থের প্রারম্ভে বাচস্পতি লিখিয়াছেন :—

ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসুবৎসরে ॥

সুধীগণের সন্তোষের নিমিত্ত শ্রীবাচস্পতিমিশ্র ৮৯৮ শকে অর্থাৎ ৯৭৬ খৃঃ অব্দে এই ন্যায়সূচীনিবন্ধ বিরচন করেন।

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, বাচস্পতিমিশ্র খৃষ্টীয় ১০ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। কথিত আছে, তিনি মিথিলাপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হিন্দুনৈয়ায়িক উদ্যোতকরকে, দিঙ্‌নাগ, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বাচস্পতি ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত টীকার প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাম্।
উদ্যোতকরগবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ ॥

কুনিবন্ধরূপ দুস্তরপঙ্কমগ্ন অতিজীর্ণ উদ্যোতকরবাক্যসমূহের সমুদ্ধারের জন্য আমি কোনও পুণ্য অভিলাষ করি।

যখন বাচস্পতিমিশ্র হিন্দুন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, প্রায় ঐ সময়েই বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য। ধর্ম্মকীর্ত্তি গৌতমসূত্রের যে বার্ত্তিক বিরচন করিয়াছিলেন, ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য তাহার এক টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি ন্যায়বিন্দুগ্রন্থেরও একটী বিশদ ব্যাখ্যা বিরচন করেন। এই ব্যাখ্যার নাম ন্যায়বিন্দুটীকা। ধর্ম্মোত্তর ন্যায়-বিন্দুটীকার প্রারম্ভে বুদ্ধদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন :—

জয়ন্তি জাতি-ব্যসন-প্রবন্ধ-প্রসূতিহেতোর্জগতো বিজেতুঃ।
রাগাদ্যরাতেঃ সুগতস্য বাচো মনস্তমস্তানবমাদধানাঃ ॥

জন্ম, জরা প্রভৃতি দুঃখনিবহের উৎপাদক সংসারকে যিনি জয় করিয়াছেন, যাঁহার বাক্য মানসিক অন্ধকারনিচয়কে দূরীভূত করে, এবং রাগদ্বেষাদি রিপুসমূহকে যিনি সমুচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সেই বুদ্ধদেবের বাক্য সর্ব্বত্র জয় লাভ করুক।

ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য যে কেবল দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তির মত সমর্থন করিয়াছেন এরূপ নহে, যে যে স্থলে তাঁহাদের আপাততঃ পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, তাহারও সামঞ্জস্যসংস্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মোত্তরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। অধ্যাপক পিটার্স‌ন সাহেব কাম্বের শান্তিনাথনামক জৈন মঠে ন্যায়বিন্দুটীকার যে হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা ১২২৯ সংবৎ বা ১১৭৩ খৃঃ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য ১১৭৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

বাচস্পতিমিশ্রের কিঞ্চিৎ পরে উদয়নাচার্য্য মিথিলাপ্রদেশে আবির্ভূত হইয়া বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করেন। উদয়ন, বাচস্পতি-মিশ্রকৃত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকার এক টিপ্পনী বিরচন করেন, উহার নাম ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধি। তিনি কুসুমাঞ্জলি ও আত্মতত্ত্ববিবেক-নামক অপর দুই খানি উপাদেয় ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। আত্মতত্ত্ববিবেকের অপর নাম বৌদ্ধাধিকার বা বৌদ্ধধিক্কার। ইহাতে বৌদ্ধমত সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে। কথিত আছে, বৌদ্ধগণ উহার প্রত্যুত্তরচ্ছলে ন্যায়ধিক্কার নামে এক গ্রন্থ বিরচন করেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্থির করিয়াছেন, উদয়ন দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সংপ্রতি কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাকে ১০ম শতাব্দীর লোক বলিয়া বিবেচনা করেন। লক্ষণাবলীনামক গ্রন্থে লিখিত আছে :—

তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষুদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্ ॥

৯০৬ শকে বা ৯৮৪ খৃঃ অব্দে উদয়ন সহজবোধ্য লক্ষণাবলীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, বাচস্পতিমিশ্র ৯৭৬ খৃঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন, এবং এক্ষণে দৃষ্ট হইল, উদয়ন ৯৮৪ খৃঃ অব্দের লোক। সুতরাং বাচস্পতি ও উদয়নের মধ্যে ৮ বৎসরের ব্যবধান অর্থাৎ উভয়েই পরস্পর সমসাময়িক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি উহাঁরা এক কালের লোক হইতেন, তাহা হইলে বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকার উপর উদয়ন ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকাপরিশুদ্ধিনামক টিপ্পনীগ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। অতএব আমার বোধ হয়, উদ্ধৃত বচনটী অমূলক। পরবর্ত্তী কোন পণ্ডিত ঐ বচন রচনা করিয়া থাকিবেন। অথবা লক্ষণাবলীগ্রন্থপ্রণেতা উদয়ন কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। আমার বোধ হয়, তাৎপর্য্যটীকা-পরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা উদয়নাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে মিথিলাপ্রদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে জয়ন্তস্বামী ন্যায়মঞ্জরীনামক একখানি প্রাচীন ন্যায়ের গ্রন্থ বিরচন করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহাকে জরন্নৈয়ায়িক নামে অভিহিত করিয়াছেন। জয়ন্ত বাচস্পতিমিশ্রের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব তিনি বাচস্পতির পরে ও গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্ব্বের লোক। জয়ন্তস্বামীর পুত্র অভিনন্দ কাদম্বরীকথাসার রচনা করিয়াছিলেন। জয়ন্তের প্রপিতামহের নাম শক্তি। তিনি কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড়ের অমাত্য ছিলেন।

জয়ন্তস্বামী ধর্ম্মকীর্ত্তি ও ভদন্ত উভয়েরই মত খণ্ডন করিয়াছেন। ৭ম আহ্নিকে বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদপরীক্ষাস্থলে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

নাস্ত্যাত্মা ফলভোগমাত্রমথচ স্বর্গায় চৈত্যার্চ্চনং
সংস্কারাঃ ক্ষণিকা যুগস্থিতিভৃতশ্চৈতে বিহারাঃ কৃতাঃ।
সর্ব্বং শূন্যমিদং বসূনি গুরবে দেহীতি চাদিশ্যতে
বৌদ্ধানাং চরিতং কিমন্যদিয়তী দম্ভায় ভূমিঃ পরা ॥

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ফলভোগের নিমিত্ত কোন নিত্য আত্মা নাই, অথচ স্বর্গলাভের আশয়ে তাঁহারা চৈত্যবন্দন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, অথচ যুগযুগান্তস্থায়ী বিহার নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা বলেন, সমস্তই শূন্য, অথচ উপদেশ দেন, "গুরুকে ধন দান করা কর্ত্তব্য"। বৌদ্ধদিগের চরিত্রের কথা আর কি বলিব, ইহারা দম্ভের উৎকৃষ্ট আধার।

উদয়ন ও জয়ন্ত বৌদ্ধদিগকে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী হইতে ১৩শ শতাব্দীপর্য্যন্ত এক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণের মধ্যে যে মহাসমর ঘটিয়াছিল, এবং যাহাতে এক পক্ষে বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, জয়ন্তস্বামী প্রভৃতি হিন্দুনৈয়ায়িকগণ এবং অপরপক্ষে দিঙ্‌নাগাচার্য্য, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য নিষ্কলঙ্কদেব, সমন্তভদ্র, প্রভাচন্দ্র প্রভৃতি বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণ অদম্য উৎসাহে ও প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মহাসমরে হিন্দুন্যায় ও বৌদ্ধন্যায় উভয়েরই মহানিষ্টাপাত ঘটিয়াছিল। এই মহাযুদ্ধের পর বৌদ্ধন্যায় ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ভারত হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয়, এবং প্রাচীন হিন্দুন্যায়েরও বিলোপ ঘটে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর পর হইতে ভারতে প্রাচীন ন্যায়ের আলোচনা একেবারে রহিত হয়। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ন্যায়-শাস্ত্র সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করে। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গেশ উপাধ্যায় মিথিলাপ্রদেশে আবির্ভূত হইয়া তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থ প্রকাশপূর্ব্বক নৈয়ায়িক-গণের মধ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করেন। তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, কেবল এই চারিটী প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে। উহাতে প্রাচীনন্যায়োক্ত আত্মা, দেহ, মন, মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ কোন লক্ষণ বা বিচার লিপিবদ্ধ হয় নাই। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ— "জগৎকে দুঃখপঙ্কে নিমগ্ন দেখিয়া উহার উদ্ধারের অভিলাষে পরমকারুণিক মুনি গৌতম অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে পূজ্যতম আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, উক্তশাস্ত্রে বর্ণিত প্রমাণাদি পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়সলাভ হয়।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রমাণভিন্ন অপর কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় নাই। আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব ইত্যাদি প্রাচীন ন্যায়ের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, কিন্তু তর্কের আড়ম্বরই নব্যন্যায়ের

প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িল। নব্য নৈয়ায়িকগণ কেবল বাক্য লইয়া বিচার, উহার লক্ষণ ও পরীক্ষা, তাহার সমর্থন বা খণ্ডন ইত্যাদি বিষয়ে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তর্কমার্গের আশ্রয় লইয়া ধীশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সহিত তর্কযুদ্ধই নব্যন্যায়ের এই অবস্থার কারণ। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্যন্যায়ের সংস্থাপক নহেন। দিঙ্‌নাগের প্রমাণসমুচ্চয় ও ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দুই নব্যন্যায়ের আদিম গ্রন্থ। দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রণালী এবং গঙ্গেশের প্রণালী একইরূপ। প্রমাণসমুচ্চয়গ্রন্থে দিঙ্‌নাগ কেবল প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ লইয়া বিচার করিয়াছেন। ন্যায়বিন্দুগ্রন্থে ও ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রত্যক্ষ ও অনুমান ভিন্ন অপর কিছুরই আলোচনা করেন নাই। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ উপমান ও শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ঐ দুইটী প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট আছে। হিন্দু নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তত্ত্বচিন্তামণি বা প্রমাণচিন্তামণিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ, ও ৭ম শতাব্দীতে ধর্ম্মকীর্ত্তি অবিকল ঐ পদ্ধতির আশ্রয় করিয়া যথাক্রমে প্রমাণসমুচ্চয় ও ন্যায়বিন্দু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে বৌদ্ধনৈয়ায়িকগণই নব্যন্যায়ের জন্মদাতা। নব্যন্যায়ের দোষ বা গুণের নিমিত্ত তাঁহারাই দায়ী।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থই ভারতীয় নৈয়ায়িকগণের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই প্রমাণচিন্তামণি গ্রন্থের অসংখ্য টীকা রচনা করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকখানির উল্লেখ করিলাম :—

(১) পক্ষধরমিশ্রকৃত—মণ্যালোক।
(২) বাসুদেবসার্ব্বভৌমকৃত—সার্ব্বভৌমনিরুক্তি।
(৩) রঘুনাথশিরোমণিকৃত—চিন্তামণিদীধিতি।
(৪) মথুরানাথতর্কবাগীশকৃত—চিন্তামণিরহস্য।
(৫) হরিরামতর্কালঙ্কারকৃত—চিন্তামণিটীকা ইত্যাদি।

এই সকল টীকার মধ্যে রঘুনাথশিরোমণিকৃত চিন্তামণিদীধিতিই সর্ব্বপ্রধান। রঘুনাথশিরোমণি বাসুদেবসার্ব্বভৌমের শিষ্য। বাসুদেবের চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। প্রথম চৈতন্যদেব। ইনি ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সাধন করেন। দ্বিতীয়, দায়ভাগের টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন। তৃতীয় প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। চতুর্থ শিষ্য সুবিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি। শিরোমণি তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থের দীধিতিনামক যে টীকা রচনা করিয়াছিলেন, অনেক নৈয়ায়িক আবার উক্ত দীধিতির টীকা রচনা করিয়াছেন। কয়েকখানির নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশকৃত—দীধিতিটীকা।
(২) মথুরানাথতর্কবাগীশকৃত—দীধিতিরহস্য।
(৩) হরিরামতর্কালঙ্কারকৃত—দীধিতিটীকা।
(৪) জগদীশতর্কালঙ্কারকৃত—দীধিতিটীকা।
(৫) রঘুদেবভট্টাচার্য্যকৃত—দীধিতিটীকা।
(৬) গদাধরভট্টাচার্য্যকৃত—দীধিতিটীকা।
(৭) রুদ্রভট্টকৃত—রৌদ্রী। ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন তর্কামৃত, শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, ইত্যাদি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অসংখ্য ন্যায়গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। ঐ সমস্তের বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে।

খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী হইতে খৃঃ পরবর্ত্তী ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত আড়াই হাজার বৎসরের বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই—সমগ্র ভারতে দুইখানি মূল হিন্দুন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। প্রথম গৌতমকৃত ন্যায়সূত্র, দ্বিতীয় গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণি। এতদ্ব্যতীত যে সকল ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয় টীকা টিপ্পনী মাত্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন, ন্যায়সূত্রপ্রণেতা গৌতম খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে, মহর্ষি গৌতম শ্বেতবরাহকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্ম

গ্রহণ করেন। বাল্মীকিরামায়ণে এক গৌতমের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি অহল্যার স্বামী, তাঁহারই অভিসম্পাতে দেবরাজ সহস্রলোচন হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই মহোদয় টোল রিপোর্টে সারন্ জেলার অন্তর্গত রেভেলগঞ্জের নিকট গটনা গ্রামে গৌতম টম্‌সন্ পাঠশালার উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারও মতে ঐ স্থানই ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতমের জন্মভূমি। কেহ কেহ বলেন, মগধ হইতে মিথিলা যাইবার পথে বক্‌সর নগরীর সন্নিহিত ভাগীরথীতীরে গৌতমের আশ্রম ছিল। অন্যেরা বলেন, দ্বারভাঙ্গা নগরী হইতে সীতামাড়ীর অভিমুখে যে রেলপথ গিয়াছে, তাহারই সন্নিকটে গৌতমের আশ্রম ছিল। উহারই অনতিদূরে একখণ্ড পাষাণ পতিত রহিয়াছে, লোকে বলে ঐ স্থান গৌতমের আশ্রম এবং ঐ প্রস্তরখণ্ডই অহল্যার পাষাণদেহ। ইহা দ্বারভাঙ্গা নগরী হইতে তিন ক্রোশ উত্তরপূর্ব্ব কোণে। পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মিথিলায় যে প্রকার ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চ্চা, তাহাতে মিথিলাই যে ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতমের জন্মভূমি, ইহা বহুলপরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য।

দ্বিতীয় প্রধান ন্যায়গ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণি। উহার রচয়িতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে মিথিলাপ্রদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বহুকাল ব্যাপিয়া মিথিলা ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল। গৌতম ও গঙ্গেশ ব্যতীত বাৎস্যায়ন, বাচস্পতিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, পক্ষধরমিশ্র প্রভৃতি অসংখ্য নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলা প্রদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতে মিথিলা-বিদ্যালয় ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মিথিলার এই প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থাকে।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে রঘুনাথ শিরোমণি প্রাদুর্ভূত হইয়া নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপে উহার প্রচার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের আদি নৈয়ায়িক কে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ কেহ বলেন, কুসুমাঞ্জলির অন্যতম ব্যাখ্যাকার রামভদ্র সার্ব্বভৌমের পূর্ব্বের কোন নৈয়ায়িকের নাম পাওয়া যায় না। বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী

নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ-ন্যায়ের প্রাধান্য সমগ্র ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এমন কি, মিথিলার ছাত্রগণও নবদ্বীপে না পড়িয়া ন্যায়ের পাঠ সাঙ্গ করিতে পারেন না। নবদ্বীপে যে সকল নৈয়ায়িক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এবং অপর কয়েক জনের নাম নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম—

হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিরাম তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, জয়রাম তর্কালঙ্কার, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রুদ্রনাথ ন্যায়বাচস্পতি, শিবরাম বাচস্পতি, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির দীধিতিনামক টীকা প্রচারিত করিবার পর নবদ্বীপ তর্কালোচনার প্রধান স্থান হইয়া পড়ে। তদবধি কাশী, মিথিলা, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, ত্রৈলঙ্গ ও পঞ্জাব প্রভৃতি নানা দেশ হইতে ন্যায়জিজ্ঞাসু ব্যক্তিবর্গ নবদ্বীপে সমাগত হইয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিতে থাকেন।

রঘুনাথ জন্মাবধি একচক্ষুহীন ছিলেন। যখন তিনি মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে যান, তখন মৈথিল ছাত্রগণ তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে, কো ভবান্ একলোচনঃ ?

ইন্দ্র সহস্রলোচন, শিব ত্রিলোচন, অপর সকলেই দ্বিলোচন। এক-লোচনবিশিষ্ট আপনি কে ?

তিনি একচক্ষুহীন ছিলেন বলিয়া লোকসমাজে কাণভট্টশিরোমণি-নামে খ্যাত হন। রঘুনাথ নিজে বুঝিতেন, তিনি অসামান্য প্রতিভা লইয়া জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এইজন্য তিনি স্থানে স্থানে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আত্মতত্ত্ববিবেকের টীকায় তিনি বলিয়াছেন :—

বিদুষাং নিবহৈর্যদৈকমত্যান্নিরটঙ্কি যদদুষ্টং যচ্চ দুষ্টং।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব॥

পণ্ডিতগণ একমত হইয়া যাহা দুষ্ট বা অদুষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কল্পনাধিনাথ রঘুনাথ বলিতে আরম্ভ করিলে, সে সমস্তই অন্যরূপ জানিবে, অর্থাৎ দুষ্ট বিষয়ও অদুষ্ট, এবং অদুষ্ট বিষয়ও দুষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

বস্তুতঃ রঘুনাথ অনন্যসাধারণ তর্কশক্তির পরিচয় দিয়া নবদ্বীপের গৌরব সমগ্রভারতে প্রচারিত করিয়াছিলেন। যত দিন সংসারে তর্কবিদ্যার আলোচনা থাকিবে তত দিন তাঁহার দীধিতিগ্রন্থ কথনই বিলুপ্ত হইবে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ধর্ম্মপদের মূল ও ব্যাখ্যা।

পণ্ডিতবগ্‌গো ছট্টো।

নিধীনং ব পবত্তারং যং পসেস্ বজ্জদস্‌সিনং।
নিগ্‌গয্‌হবাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে।
তাদিসং ভজমানস্‌স সেয্যো হোতি ন পাপিয়ো॥ ১॥

অন্বয়,—নিধীনং পবত্তারং ব বজ্জদস্‌সিনং নিগ্‌গয্‌হবাদিং মেধাবিং যং পস্মে, তাদিসং পণ্ডিতং ভজে; তাদিসং (পুগ্‌গলং) ভজমানস্‌স সেয্যো হোতি ন পাপিয়ো (হোতি)।

সংস্কৃত,—নিধানস্য প্রবর্ত্তারং ইব বর্জ্জ্যদর্শিনং 'নিগৃহ্যবাদিনং' মেধাবিনং যং পশ্যেৎ তাদৃশং পণ্ডিতং ভজেৎ; তাদৃশং পুরুষং ভজমানস্য শ্রেয়ঃ ভবতি ন পাপীয়ঃ ভবতি।

'নিগ্‌গয্‌হবাদি'—অর্থাৎ 'যিনি দোষ দেখিলে তাহার প্রশ্রয় না দিয়া ভৎর্সনা করেন'।

অনুবাদ,—গুপ্তধনপ্রদর্শকের ন্যায় যিনি সত্যধর্ম্ম প্রদর্শন করেন, যিনি বর্জ্জনীয় বিষয় দেখাইয়া দেন, যিনি দোষ দেখিলে ভৎর্সনা

করেন, যিনি মেধাবী, এরূপ ব্যক্তি যাঁহাকে দেখিবে, তাঁহাকে পণ্ডিত-জ্ঞানে অনুসরণ করিবে; তাদৃশব্যক্তিকে ভজনা করিলে অমঙ্গল হয় না, মঙ্গলই হয়।

ওবদেয্যানুসাসেয্য অসব্‌ভা চ নিবারয়ে।
সতং হি সো পিয়ো হোতি অসতং হোতি অপ্পিয়ো॥ ২॥

অন্বয়,—(পণ্ডিতো) ওবদেয্য অনুসাসেয্য অসব্‌ভা চ নিবারয়ে, হি সো সতং পিয়ো হোতি, অসতং অপ্পিয়ো (হোতি)।

সংস্কৃত,—পণ্ডিতঃ অববদেৎ, অনুশিষ্যাৎ 'অসভ্যাৎ' (অন্যায়াচরণাৎ) চ নিবারয়েৎ, স হি সতাং প্রিয়ো ভবতি, অসতাং চ অপ্রিয়ো ভবতি।

'অসব্‌ভা'—এখানে 'অসভ্য' শব্দের অর্থ 'যাহা করা ঠিক নহে।' ইহাই উহার মূল অর্থ।

অনুবাদ,—পণ্ডিত ব্যক্তি তিরস্কার করিবেন, শাসন করিবেন, অন্যায়াচরণ হইতে নিবৃত্ত করিবেন। ইহাতে তিনি নিশ্চিত সৎলোকের প্রিয়পাত্র হইবেন, এবং অসৎলোকের অপ্রিয় হইবেন।

ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে।
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে॥ ৩॥

অন্বয়,—পাপকে মিত্তে ন ভজে, পুরিসাধমে (মিত্তে) ন ভজে, কল্যাণে মিত্তে ভজেথ, পুরিসুত্তমে (মিত্তে) ভজেথ।

সংস্কৃত,—পাপকানি মিত্রাণি ন ভজেৎ, পুরুষাধমানি (মিত্রাণি) ন ভজেৎ; কল্যানাণি মিত্রাণি ভজেৎ, পুরুষোত্তমানি (মিত্রাণি) চ ভজেৎ।

অনুবাদ,—পাপীকে মিত্র করিবে না, পুরুষাধমকে মিত্র করিবে না; ধার্ম্মিককে মিত্র করিবে, পুরুষোত্তমকে মিত্র করিবে।

ধর্ম্মপীতী সুখং সেতি বিপ্পসন্নেন চেতসা।
অরিয়প্পবেদিতে ধম্মে সদা রমতি পণ্ডিতো॥ ৪

অন্বয়,—ধর্ম্মপীতী সুখং বিপ্পসন্নেন চেতসা সেতি; পণ্ডিতো অরিয়প্প-বেদিতে ধম্মে সদা রমতি।

সংস্কৃত,—ধর্ম্মপীতী সুখং বিপ্রসন্নেন চেতসা শেতে; পণ্ডিত আর্য্য-প্রবেদিতে ধর্ম্মে সদা রমতে।

অনুবাদ,—ধর্ম্মপানকারী সুখে প্রসন্নান্তঃকরণে বাস করেন; পণ্ডিত আর্য্যগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত ধর্ম্মে সর্ব্বদা বিচরণ করেন।

উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা উসুকারা নময়ন্তি তেজনং।
দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা অত্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা॥ ৫॥

অন্বয়,—নেত্তিকা হি উদকং নয়ন্তি, উসুকারা তেজনং নময়ন্তি, তচ্ছকা দারুং নময়ন্তি, (তথা) পণ্ডিতা অত্তানং দময়ন্তি।

সংস্কৃত,—নেতৃকা হি উদকং নয়ন্তি, ইষুকারাস্তেজনং নময়ন্তি, তক্ষকাঃ দারু নময়ন্তি, (তথা) পণ্ডিতা আত্মানং দাম্যন্তি।

অনুবাদ,—মৃত্তিকা খননকারিগণ জলকে (ইচ্ছানুরূপ) লইয়া যায়, বাণ-প্রস্তুতকারীরা বাণকে (যেরূপ ইচ্ছা) নমিত করে, ছুতারেরা কাঠকে (ইচ্ছানুযায়ী) নমিত করে, (সেইরূপ) পণ্ডিতগণ আপনাকে (যেরূপ ইচ্ছা) দমন করেন।

সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্ঞন্তি পণ্ডিতা॥ ৬॥

অন্বয়,—যথা একঘনো পেলো বাতেন ন সমীরতি, এবং পণ্ডিতা নিন্দাপ-সংসাসু ন সমিঞ্ঞন্তি।

সংস্কৃত,—যথা একঘনঃ শৈলঃ বাতেন ন সমীরতি, এবং পণ্ডিতাঃ নিন্দা-প্রশংসাসু ন সমিঙ্গন্তি (বিচলিতা ভবন্তি)।

অনুবাদ,—যেমন রন্ধ্রহীন ঘন পর্ব্বত বায়ুতে বিচলিত হয় না, সেইরূপ পণ্ডিতগণ নিন্দা ও প্রশংসাতে বিচলিত হন না।

যথাপি রহদো গম্ভীরো বিপ্পসন্নো অনাবিলো।
এবং ধম্মানি সুত্বা ন বিপ্পসীদন্তি পণ্ডিতা॥ ৭॥

অন্বয়,—যথাপি গম্ভীরো বিপ্পসন্নো অনাবিলো রহদো, এবং পণ্ডিতা ধম্মানি সুত্বা ন বিপ্পসীদন্তি।

সংস্কৃত,—যথাপি গম্ভীরঃ প্রসন্নঃ অনাবিলঃ হ্রদঃ, এবং পণ্ডিতা ধর্ম্মাণি শ্রুত্বা বিপ্রসীদন্তি।

অনুবাদ,—পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, গভীর নিস্তরঙ্গ, স্থির হ্রদের ন্যায় প্রশান্ত হইয়া থাকেন।

সর্ব্বস্স বে সপ্পুরিসা চজন্তি ন কামকামা লপয়ন্তি সন্তো।
সুখেন ফুট্‌ঠা অথবা দুখেন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্সয়ন্তি॥ ৮॥

অন্বয়,—সপ্পুরিসা সব্বস্ত বে চজন্তি, সন্তো কামকামা (সন্তো) ন লপয়ন্তি সুখেন অথবা দুখেন ফুটঠা পণ্ডিতা উচ্চাবচং ন দস্সয়ন্তি।

সংস্কৃত,—সৎপুরুষাঃ সর্ব্বত্র বৈ চয়ন্তি সন্তঃ (সাধবঃ) কামকামাঃ (সন্তঃ) ন লপন্তি; সুখেন অথবা দুঃখেন স্পৃষ্টাঃ পণ্ডিতা উচ্চাবচং পশ্যন্তি।

পণ্ডিত ব্যক্তি সকলপ্রকার অবস্থার মধ্যে সৎপথে অগ্রসর হন, সুখের নিমিত্ত অধীর হন না। দুঃখেতে ম্রিয়মাণ বা আনন্দে উল্লাসিত হন না।

অনুবাদ,—

Good people walk whatever befall, the good do not prattle, longing for pleasure; whether touched by happiness or sorrow, wise people never appear elated or depressed.

ন অত্তহেতু ন পরস্স হেতু ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্ঠং।
ন ইচ্ছেয্য অধম্মেন সমিদ্ধিমত্তনো স সীলবা পঞ্ঞবা
ধম্মিকো সিয়া॥ ৯॥

অন্বয়,—(যো) ন অত্তহেতু ন (চ) পরস্স হেতু ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং (ইচ্ছে) ন রট্ঠং ইচ্ছে, ন অধম্মেন অত্তনো সমিদ্ধিমিচ্ছেয্য, স সীল বা পঞ্ঞবা ধম্মিকো (বা) সিয়া।

সংস্কৃত,—য নাত্মহেতোঃ ন চ পরস্য হেতোঃ পুত্রমিচ্ছেৎ, ধনম্ ইচ্ছেৎ রাষ্ট্রমিচ্ছেৎ, ন অধর্ম্মেণ আত্মনঃ সমৃদ্ধিমিচ্ছেৎ, স সীলশ্চ প্রাজ্ঞশ্চ ধার্ম্মিকশ্চ স্যাৎ।

অনুবাদ,—যিনি আপনার কিম্বা পরের জন্য পুত্র বা ধন বা রাজ্য কিছুই ইচ্ছা করেন না, যিনি অধর্ম্মদ্বারা আপনার সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন না, তিনি সচ্চরিত্র, জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক হয়েন।

অপ্পকা তে মনুসেসু যে জনা পারগামিনো।
অথায়ং ইতরা পজা তীরমেবানুধাবতি॥ ১০॥

অন্বয়,—মনুসেস্সু যে জনা পারগামিনো তে অপ্পকা, অথ ইতরা প্রজাঃ (জনা ইতি যাবৎ) তীরমেবানুধাবতি।

সংস্কৃত,—মনুষ্যেষু যে জনাঃ পারগামিনঃ তে অল্পকাঃ, অথ ইতরা প্রজাঃ (জনা ইতি যাবৎ) তীরমেবানুধাবন্তি।

অনুবাদ,—মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বাণরূপ সাগরের পারগামী হয়েন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক, অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ কেবল তীরে দৌড়তে থাকে।

যে চ খো সম্মদক্খাতে ধম্মে ধম্মানুবত্তিনো।
তে জনা পারমেস্সন্তি মচ্চুধেয্যং সুদুত্তরং ॥ ১১ ॥

অন্বয়,—যে চ খো, ধম্মে সম্মদক্খাতে (সতি) ধম্মানুবত্তিনো, (হোন্তি) তে জনা সুদুত্তরং মচ্চুধেয্যং পারমেস্সন্তি।

সংস্কৃত,—যে চ খলু ধর্ম্মে সম্যগাখ্যাতে সতি ধর্ম্মানুবর্ত্তিনো ভবন্তি, তে জনাঃ সুদুস্তরস্য মৃত্যুধেয়স্য পারমেষ্যন্তি।

অনুবাদ,—কিন্তু, ধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইলে, যাহারা ধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহারা নিশ্চিত সুদুস্তর যমরাজ্য অতিক্রম করিবে।

কন্হং ধম্মং বিপ্পহায় সুক্কং ভাবেথ পণ্ডিতো।
ওকা অনোক্ং আগম্মা বিবেকে যৎথ দূরমং ॥ ১২ ॥
তত্রাভিরতিমিচ্ছেয্য হিত্বা কামে অকিঞ্চনো।
পরিয়োদপেয্য অত্তানং চিত্তক্লেসেহি পণ্ডিতো ॥ ১৩ ॥

অন্বয়,—পণ্ডিতো কন্হং ধম্মং বিপ্পহায় সুক্কং (ধম্মং) ভাবেথ, ওকা অনোকং আগম্ম যৎথ দুরমং তত্র বিবেকে অভিরতিং ইচ্ছেয্য; কামে হিত্বা অকিঞ্চনো (সন্তো) পণ্ডিতো চিত্তক্লেসেহি অত্তানং পরিয়োদপেয্য।

সংস্কৃত,—পণ্ডিতঃ 'কৃষ্ণং ধর্ম্মং' বিপ্রহায় 'শুক্লং ধর্ম্মং' ভাবেথ, ওকাৎ গৃহাৎ অনোকং আগম্য 'যত্র দূরমং' আনন্দহীনত্বং (এবাস্তীতি মূর্খৈরনুমন্যতে) তত্র 'বিবেকে' অভিরতিং ইচ্ছেৎ; কামান্ হিত্বা অকিঞ্চনঃ (সন্) পণ্ডিতঃ 'চিত্তক্লেশৈঃ' আত্মানং পর্য্যবদাপয়েৎ

'কৃষ্ণং ধর্ম্মং'—See below.

'যত্র দূরমং'—

'বিবেকে'—বর্গ শ্লোক দেখ।

'চিত্তক্লেসেহি'—

'কন্হংধম্মং' 'সুক্কং ধম্মং—

পণ্ডিত ব্যক্তি সংসারের (কৃষ্ণবর্ণ) দুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া (শুক্লবর্ণ) বৈরাগ্যপূর্ণ শান্তিময় জীবন যাপন করেন ও ভিক্ষুব্রত অবলম্বন ক্লেশকর ও মোহোৎপাদক বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বিবেক আশ্রয়-পূর্ব্বক চিত্তের আনন্দে জীবন অতিবাহিত করেন।

যেসং সম্বোধি অঙ্গেসু সম্মা চিত্তং সুভাবিতং।
আদানপটিনিস্সগ্‌গে অনুপাদায় যে রতা।
খীনাসবা জুতীমতা তে লোকে পরিনিব্বুতা ॥ ১৪ ॥

পণ্ডিত বগ্‌গো ছট্টো।

অন্বয়,—যেসং চিত্তং সম্বোধি অঙ্গেসু সম্মা সুভাবিতং, আদানপাটিনিস্সগ্‌গা যে অনুপাদায় রতা, খীনাসবা জুতীমতা তে লোকে পরিনিব্বুতা।

সংস্কৃত,—যেষাং চিত্তং 'সম্বোধ্যঙ্গেষু' (স্মৃত্যাদিসপ্তসম্বোধ্যঙ্গেষু) সম্যক্ সুভাবিতং (সুপ্রতিষ্ঠিতং), 'আদান প্রতি নিঃসর্গাঃ' (আসক্তিত্যাগাঃ, ত্যক্তরাগাইত্যর্থঃ) যে 'অনুপাদায়' (হীনাসক্তয়ঃ ভুত্বা) রতাঃ (রমন্তি, আনন্দমনুভবন্তীর্থঃ) ক্ষীণাসবাঃ জ্যোতির্ম্মন্তঃ, তে লোকে (ইহলোকে এব) পরিনিবৃতাঃ (মুক্তাঃ) 'সম্বোধ্যঙ্গেষু'—

যাহাদের চিত্ত সপ্ত বোধিজ্ঞানে সুপ্রষ্ঠিত, যাহারা বাসনাতে আবদ্ধ না হইয়া, চিত্তে আনন্দ উপভোগ করেন, যাঁহারা মনের দুর্ব্বলতা জয় করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি এই লোকেই শাশ্বত আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

কামরূপের ঐতিহাসিক বিবরণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত কামরূপ একটী স্বতন্ত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য।

তথাচ প্রমাণং যোগিণীতন্ত্রে। করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিবাকরবাসিনীং উত্তরস্যাং কুঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্তু পশ্চিমে। ১৭। তীর্থশ্রেষ্ঠাদীক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকা। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি। কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥ অপিচ। হরকোপাগ্নিদগ্ধস্ত কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ। অত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপমতঃ স্মৃতম্। শিবের কোপানলে যে কাম ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। ভস্মীভূত হইয়াও যে প্রদেশে তিনি পুনরায় জীবিত হইয়াছিলেন সেই প্রদেশকে কামরূপ কহে। তথা। ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শতযোজনং। কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্। ২১॥ কামরূপের রাজধানী গৌহাটী, ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় কূলে অবস্থিত। গৌহাটীর পুরাতন নাম "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" তস্য প্রমাণ যথা মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণস্য অযোধ্যাকাণ্ডে। যোজনানি চতুঃষষ্ঠী বরাহোনাম পর্ব্বতঃ। সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ংপুরং। তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকোনাম দানব॥ মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ কাব্যে তথা। চম্পকোত্তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ। তদ্‌গজালানতাং প্রাপ্তে সহকারোঃ গুরুক্রমঃ॥৮১॥ ন প্রসেহে সরূদ্ধার্কমধারাবর্ষদুর্দ্দিনং। রথবর্ত্ম রজোপ্যস্য কুতএব পতাকিনীং। তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডল বিক্রমং। ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈঃ অন্যানুপরুরোধ যৈঃ॥ ৪৩॥ কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদৈবতং। রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ পাদয়োঃ। ৮৪। এই নগর বিস্তীর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ নৈসর্গিকশোভায় পরিপূর্ণ এবং পরমরমণীয়। গৌহাটির রাজপথ সকল প্রশস্ত ও পরিষ্কার। এই স্থানটী আসামের সকল প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রধানকেন্দ্রস্থান। এখানে রাজকীয় প্রধান প্রধান আফিস, আপিল আদালত স্কুল কালেজ আছে। এখানকার লোকের লিখিত ও কথিত ভাষা আসামী, তাহারা আসামী ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। আসামীও বঙ্গভাষায় সাধারণ অনেক শব্দে মিল থাকিলেও ইহাদের ব্যাকরণের

সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে। তাহা তুলনা করিলে দেখা যায় যে এই দুই ভাষার মূল যখন সংস্কৃত তখন ইহাদের সাদৃশ্য থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট যখন আসাম প্রদেশে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তখন রেভারেণ্ড এম, ব্রন্সন সাহেব তাঁহার প্রণীত আসামী ভাষার অভিধানের ভূমিকায় এই কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্রের অধিত্যকা-বাসীরা আসামী ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে। আসাম প্রদেশে আসামী ভাষা অতি পুরাতন কাল হইতে অখণ্ড প্রবাহে প্রচলিত রহিয়াছে। আর ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, কুশাসন প্রভৃতি ভূরি ভূরি দুর্ঘটনার মধ্যেও আসামী ভাষার কোন ক্ষতি বা পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া শাণবংশীয় অনার্য্য আহম রাজাদের অধীনে থাকিয়াও আসামী ভাষায় নিজের প্রভাব অপ্রতিহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্রহ্মবাসী মুছলমান, কাছারী প্রভৃতির প্রবল আক্রমণে আসাম দেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া ও নিজ আসামী ভাষাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইবে আসামীরা মাতৃভাষাকে কতদূর ভালবাসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজগবর্ণমেণ্টের মনে এমন একটী ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আসামী ভাষা এবং বঙ্গভাষা বুঝি একই। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহে ও কোর্টে বঙ্গভাষা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা আসামবাসী জনসাধারণের উন্নতি ও শিক্ষাতে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। আসামীরা নিজ মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী বঙ্গভাষা ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সুযোগ্য চিফকমিশনার অনারেবল স্যার এইচ, জে, এস, কটন কে, সি, এস, আই, আই, সি, এস, মহোদয়ের আসাম শাসনের সুফলে এবং মহাত্মা ডাক্তার ডব্লিউ, বুথ, এম এ, আই, এস, ডি, মহোদয় আসাম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহে আরও বহুলরূপে আসামী ভাষা প্রচলিত করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তবে এইখানে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, মাতৃভাষাই বা কি অর্থাৎ মাতৃভাষা কাহাকে বলা যায়? তদুত্তরে আমার নিজের

কিছুমাত্র মতামত প্রকাশ না করিয়া বাবু চণ্ডীচরণ বানার্জি স্বর্গীয় ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের জীবনীতে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিলে যথেষ্ট হইবে ঃ—

"জননীর সুকোমল অঙ্কে শয়ন করিয়া স্তন্য পান করিতে করিতে মানুষ যে ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মা বলিয়া ডাকিতে শিখে, যাঁহার সরল সুমিষ্ট শব্দ সকল উচ্চারণ করিতে করিতে জিহ্বার প্রথম জড়তা কাটিয়া যায়, ক্ষুদ্র জীবনের শোক দুঃখ প্রকাশ করিয়া শিশু যে ভাষায় কান্দিয়া থাকে, বাল্যকালের ক্রীড়া কৌতুক আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়া লোকে যে ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে, মানুষ যে ভাষায় হাঁসিয়া আটখানা হয়, কান্দিতে কান্দিতে মানুষ যে ভাষায় হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয়, আপনার দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া অন্তরের তীব্রজ্বালা জুড়াইয়া থাকে তাহাই তাহার মাতৃভাষা"।

অতিপুরাতনকাল হইতে আসাম, বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার পার্থক্য ছিল যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের বাল্যসুহৃদ যৌবনসখা বিজ্ঞবর বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক বক্তৃতার প্রথমেই লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন পর্য্যটক (হাউ এন্‌থ সঙ) ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়া, বাঙ্গালা বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতক অংশের একই ভাষা দেখিয়া গিয়াছেন। কেবল আসাম ও উড়িষ্যায় উক্ত ভাষা হইতে কিছু পৃথক ছিল। ইহা মাগধী প্রাকৃত ভাষোৎপন্ন এক প্রকার পুরাতন হিন্দী ভাষা ছিল। হিন্দী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাই ঐ একই ভাষা হইতে সমুৎপন্ন। তাই ইহার প্রাচীন কবিগণের ভাষা অত্যধিক হিন্দী মিশ্রিত। বিদ্যাপতি মৈথিল হিন্দু কবি। তাঁহার ভাষা না প্রাকৃত না বাঙ্গালা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবিগণের দ্বারা বিদ্যাপতির কৃত কবিতাগুলি বাঙ্গালা আকার ধারণ করিয়াছে। ডাক্তার গ্রীয়ারসন্‌ বলেন ৪০০ চারিশ বৎসর হইল আসামী ভাষাই মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি অনেক পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আসামী ভাষায় আরও পুরাতন অনেক পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(নবযুগ ২৭ জুন, ১৮৯৬)। কামরূপ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীধর কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রভৃতি ৫০০শ ৬০০শর পূর্ব্বে আসামী ভাষার যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা অদ্যাপি আসামের সর্ব্বত্র পঠিত হয়। আসামী ভাষার পরম সুহৃদ আসাম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রত্নতত্ত্ব কর্ম্ম বিভাগের সুযোগ্য ডিরেক্টর মহাত্মা মিঃ ইয়ে, গেইট আই, সি, এস, মহোদয় লেগুরিকোর্ডের রিপোর্টে আসামী ভাষার বিষয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আসাম প্রদেশের অতি পুরাতন তাম্রফলক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা মহানগরীতে এসাইটীক সোসাইটী নামক সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই তাম্রফলক প্রভৃতিতে কামরূপ প্রদেশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে কামরূপ প্রকৃতির নিকুঞ্জকানন। সেই কাননের মধ্যে গৌহাটি প্রকৃতি দেবীর পূজাগৃহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নগরের প্রান্তভাগে অরণ্যাবৃত পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত ও সুশোভিত। মধ্যস্থলে নির্ম্মল সলিলপ্রবাহী ব্রহ্মপুত্র নদ, নদের বক্ষঃস্থলে ভস্মাচল নামক এক অপূর্ব্ব গিরি উমানন্দ নামক শিবের মন্দির মস্তকে বহন করতঃ স্রোতের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। উমানন্দের চরিধারে ব্রহ্মপুত্রনদের তরঙ্গমালা হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে মধ্যস্থিত গিরিবরকে আপনাদের শীতল স্পর্শে একেবারে যেন জ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিয়াছে। নদের পার্শ্বস্থ পাহাড়রাজি উমানন্দের সহজ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করতঃ আপনাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া একেবারে যেন জ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা সকলে যেন প্রকৃতির কোন এক মোহনরাজ্যের নিমন্ত্রণে আহূত হইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে উমানন্দের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আপনাদের গন্তব্যস্থান ভুলিয়া গিয়া একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, ইংরাজরাজপুরুষেরা ইদানীন্তন এই অপূর্ব্ব পাহাড়কে (পিকক্‌ আয়লেণ্ড অর্থাৎ ময়ূরদ্বীপ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছে। ভবিষ্যতে এই পাহাড়ের উপর দিয়া ধূমোদ্গীরণকারী বাষ্পীয়যানদ্বারা ব্রহ্মপুত্রের পারাপার হইবার প্রস্তাবনা চলিতেছে। উমানন্দের সন্নিকটে উর্ব্বশীকুণ্ড নামে ব্রহ্মপুত্রনদের মধ্যস্থলে একটী মহাতীর্থ স্থান। তাহাতে বিষ্ণুপদচিহ্ন আছে। এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে এবং

বিষ্ণুপদে পিণ্ডাদি অর্পণ করে। ইহাতে একটী পুরাতন প্রবাদ আছে যে বরাহরূপী ভগবানের ঔরসে পৃথিবীর রজঃস্বলাবস্থায় নরকাসুরের জন্ম হয়। নরক অতিশয় রিপুপরবশ ছিল। কোন এক সময় নরক দিগ্বিজয় করিতে গিয়া ষোড়শ সহস্র দেবকন্যা হরণ করিয়া উর্ব্বশীর গুহাতে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নরকাসুর যখন সমরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখন নরকের রক্ষিত সেই ষোড়শ সহস্র দেবকন্যা শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি আসাম প্রদেশের লোকের বিশ্বাস। নরকের পুত্র ভগদত্তের কন্যা ভানুমতীকে অন্ধ রাজতনয় দুর্য্যোধনের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। যখন কুরু-পাণ্ডবের তুমুল সংগ্রাম হয়, তখন ভগদত্ত মহারাজ কৌরবপক্ষাবলম্বন করিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। ইহা মহাভারতে বিশেষ বর্ণিত আছে। উমানন্দের সম্মুখস্থ ব্রহ্মপুত্রের ঘাটের শোভা কি মনোরম। তাহাতে অসংখ্য বৃহৎ বৃহৎ সদাগরী নৌকা এবং ধূমোদ্গীরণকারী শ্বেতবর্ণ বাষ্পীয় পোত বিরাজ করিতেছে। তীরে রাজপথ, তাহার পার্শ্বে স্থানে স্থানে সুরম্য চতুঃশালা বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষের কোনও নদনদীর দুই পার্শ্বে এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌহাটীর পশ্চিম পার্শ্বে দেড় ক্রোশ দূরে পুণ্যসলিল ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ কূলে সুপ্রসিদ্ধ নীলাচল বা কামাখ্যাপর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে নীলনামে একটি বানরের অধীনে এই পাহাড় ছিল। সেইজন্য ইহাকে লোকে নীলাচল কয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এই সার্দ্ধ এক ক্রোশ পথ অতি সুন্দর ও অতি পরিষ্কার হইয়াছে। গৌহাটি হইতে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার কিঞ্চিৎ পরেই অরণ্যের আরম্ভ। ক্রমে ক্রমে একই অরণ্য অত্যন্ত নিবিড় হইয়া রাস্তার দুই-ধারে বিস্তৃত হইয়াছে। মনুষ্যের যতদূর দৃষ্টি চলে পাহাড় জঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বনের দুইপার্শ্বে স্থানে স্থানে সাধু সন্ন্যাসীদিগের অপূর্ব্ব আশ্রম আছে। সেই আশ্রমগুলি সুন্দর সুন্দর পুষ্প, বৃক্ষ ও লতায় পরিপূর্ণ এবং পরিশোভিত। রাস্তার দক্ষিণদিকে অরণ্যের মধ্যে একটি শুভ্রবর্ণের গেইট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত ভূগোল রঘুবংশাদিতে বিশেষতঃ ফাহিয়ান, হুয়েন সাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কামরূপ কামাখ্যার রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত আছে। সেই

গেইট অতিক্রম করিয়া প্রায় একক্রোশ রাস্তা ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে হয়। ইহাই নীলাচলের প্রথম চড়াই। তাহার পর একশত হস্ত দূরে ঠিক সম্মুখদিকে আর একটি গেইট দেখা পাওয়া যায়। দুই গেটের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে কামাখ্যাদেবীর মন্দির। ইহাই ৫২টি পীঠের একটি পীঠ। এই স্থানে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা গীতা, ভাগবত পুরাণ, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। অর্দ্ধক্রোশ উপরে উঠিবার জন্য নরকাসুরের আদিষ্ট বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত বিচিত্র সোপান বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পথের দুইপার্শ্বে গহনবন। সেই বনের ভিতর নানাজাতীয় সুন্দর সুন্দর বিহঙ্গমগণের কাকলী-লহরী শ্রুতিসুমধুর শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। এই বনে বানর, অজগরসর্প, মহিষ, শার্দ্দূল, ভল্লূক, বন্যমানুষ প্রভৃতি হিংস্রশ্বাপদকুল বাস করে। এই বনের কোথায় শেষ হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। চারিদিকে কেবল বিচিত্র গহন কানন সমূহ ও শৈলমালা দর্শন করিয়া পথিকের মন আনন্দিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হয়। স্থানে স্থানে ফল-পুষ্প-শোভিত সুন্দর সুন্দর বৃক্ষসমূহ আছে। কামাখ্যা পর্ব্বতে উঠিবার সময় দুইধারে পাথরে খোদিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, নৃসিংহ, হনুমান প্রভৃতির মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কামাখ্যাদেবীর মন্দির হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ। এইখানে নানাস্থান হইতে যাত্রী আসিয়া থাকে। সময় সময় যাত্রীর এত আধিক্য হয় যে তাহাতে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায় না।

এই কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের আয়তন বৃহৎ এবং কারুকার্য্য সুশোভিত। কালিকা পুরাণ প্রভৃতিতে উল্লেখ আছে যে "কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা যত্র তিষ্ঠতি। মনোহর গুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী। তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম নবিদ্যতে।" কামরূপ কামাখ্যার এই নামটি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকের নিকট পরিজ্ঞাত। ইহার পূর্ব্বে সৌমার পীঠ, পশ্চিমে করতোয়া নদী, দক্ষিণে গাড়ো পর্ব্বত, উত্তরে ভোটের পর্ব্বত। নীলাচলের উপরে এই সকল দেবালয় আছে। যথা কেদার, কামেশ্বর, কমলেশ্বর, গণেশ, সিদ্ধেশ্বর, যোগেশ্বর, যাগেশ্বর, মহেশ্বর, টৌকরেশ্বর, মণিকর্ণেশ্বর, কামাখ্যা, গুপ্ত কামাখ্যা, দশ মহাবিদ্যা, ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলামুখী, ছিন্নমস্তা,

ত্রিপুরা, জয়দুর্গা, সিদ্ধেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, অপর্ণা, মহাকালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রভৃতি ৫২টি পীঠ বিদ্যমান আছে। এই নীলকূটের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সর্ব্বজন বিদিত শ্রীভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির, এই অপূর্ব্ব মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় ১৮৯৭ সালের জুন মাসের প্রবল ভূমিকম্পে ভূতলশায়ী হইয়াছিল। সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গেশ্বর, প্রবীণ,উদারচেতা, উদ্যমশীল, ব্রাহ্মণকুলগৌরবরবি পণ্ডিত প্রবর অনরেবল মহারাজাধিরাজ স্যার শ্রীযুক্ত রমেশর সিংহ কে,সি,এস,আই, বাহাদুর অনেক অর্থ ব্যয় বহন করিয়া সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সিদ্ধেশ্বরী, প্রভৃতি আরও কয়েকটি মন্দির ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। তাহাও তিনি নিজব্যয়েনির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীভুবনেশ্বরীদেবীর মন্দির হইতে যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেরই অতুল শোভা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নীলাচলের পূর্ব্ব প্রান্তে গৌহাটি সহর। নীলাচল হইতে সমগ্র সহরটি একেবারে দৃষ্টিপাত করা যায়। উত্তরদিকে শুভ্ররেখাবৎ ব্রহ্মপুত্রনদের সলিল প্রবাহিত ওপারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। শেষে তুষার-শোভিত গিরিরাজ হিমালয়। অপরপার্শ্বে নবগ্রহ ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত। নবগ্রহের পর্ব্বতের নাম চিত্রাচল। তাহাতে একটি শূন্যছাদ মন্দিরের মধ্যে মধ্যস্থলে সূর্য্য, সূর্য্যের চারিধারে বৃত্তাকারে গ্রহগণ সংস্থাপিত। নবগ্রহের মন্দির দেখিলে উহাকে কামরূপের অতি প্রাচীন-তম রাজা-মহারাজাদিগের মানমন্দির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের তত্বাধীনে আছে।

নবগ্রহের পাহাড়ের সন্নিকটে ছত্রাকার নামে একটি শৈল আছে। তথায় সুপ্রসিদ্ধ ছত্রাকার দেবালয়, এবং মঙ্গলচণ্ডীকা বিদ্যমান আছে। এই স্থানটি অতি রমণীয়। নীলাচলের পশ্চাদ্ভাগ একটির পর আর একটী সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া খোসিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বত শ্রেণীতে গিয়া পরিণত হইয়া গগনমার্গে মিশিয়াছে। নীলাচল হইতে সমগ্র কামরূপের নৈসর্গিক শোভা ও সৌন্দর্য্য অবলোকন করিলে হৃদয়ের বিচিত্র পবিত্রভাবের উদয় হয়। বস্তুতঃ প্রকৃতি এখানে যেরূপে মোহিনী বেশে সুশোভিতা। তাহাতে এই সকল পাহাড়রাজী ধর্ম্মসাধনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। এবং ইহাতে নদী পর্ব্বত দেবালয় একত্র৹ সমবেত হইয়া ধার্ম্মি-কের মনের পরম সাত্বিক ভাবের উদ্রেক করে। কামাখ্যামন্দিরের নিম্নভাগ

নরকাসুরের নির্ম্মিত বলিয়া লোকে বলে। উপরের অংশ কুচবিহারাধিপতি মহারাজ বিশ্বসিংহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৌহাটির মধ্যস্থলে শুক্রেশ্বর নামক একটি পর্ব্বত বিরাজ করিতেছে। সেই পাহাড়ের গুহায় শুক্রমুনি-সংস্থাপিত শিবের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তথাচ প্রমাণং পুরাণে। যঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষনামকে পুরবরে লৌহিত্যতীরে শিবঃ। শ্রীশুক্রেশ্বরসংজ্ঞয়াস্তি-বিদিতঃ শুক্রেণসংপূজিতঃ॥ তাঁহার সন্নিকটে বুদ্ধজপীজনার্দ্দনের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। শুক্রেশ্বরের সন্নিকটে বাণেশ্বর নামক একটি শিবের মন্দির আছে। শুক্রেশ্বর পাহাড়ের উপরে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপিত একটি প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দির আছে। সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিত কামরূপ প্রদেশের প্রসিদ্ধ কবি পণ্ডিতপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্তাচার্য্য ধীরেশ্বর কবিরত্ন। ইনি একজন প্রতিভাশালী খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত। সুদূর আসাম প্রদেশে অদ্যকার দিনেও প্রাচীনতম ভারতীভাষা সংস্কৃতের চর্চ্চাথাকা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ধীরেশ্বর আচার্য্যই জলন্ত প্রমাণ। যদিও রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের লিপিতে তাহার কোন আভাষ পাইবার যো নাই তথাপি তিনি যে প্রকার সহজে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকেন এবং লীল-মঞ্জরী, বৃত্তমঞ্জরী প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থরচনা করিয়াছে, এবং দেশ ভ্রমণকারী সংস্কৃতপণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী, তদীয় ভ্রাতার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতি যাঁহার বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যথেষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আজকালকার ইংরাজী শিক্ষার দিনেও সুদুর আসাম প্রদেশে দেবভাষা সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা চলি-তেছে। গৌহাটির দক্ষিণ পার্শ্বে বশিষ্ঠাশ্রম নামে একটি মহাতীর্থ। সেই খানে সন্ধ্যা, ললিতা, কান্ত নামে তিনটি ক্ষুদ্র প্রবাহিণী কল কল স্বরে প্রবাহিত হইতেছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে মহর্ষি বশিষ্ঠ এখানে তপোবন নির্ম্মিত করিয়া তপস্যার দ্বারা সুরলোক হইতে সন্ধ্যা, ললিতা, কান্তাকে আহ্বান করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। এইখানে অনেক যাত্রীর গমনাগমন হইয়া থাকে। ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তটে সুপ্রসিদ্ধ অশ্বক্রান্ত দেবালয়, এই খানে মৎস্য কূর্ম্মাদি দশ অবতারের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই স্থানটি

যোগিনী তন্ত্রে সকলতীর্থের প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাচ প্রমাণং অশ্বক্রান্ত সমস্তীর্থো নাস্তি ব্রাহ্মাণ্ডগোচরে, লৌহিত্যস্যোত্তরে তটে সদা বসতি জাহ্নবী। পূর্ব্বের উল্লিখিত উর্ব্বশী কুণ্ডে যেমন বিষ্ণুপাদ বিহিত এখানে তদ্রূপ বিষ্ণুপদ অঙ্কিত আছে। সমগ্র কামরূপের লোক এইখানে আসিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া থাকে। এই স্থানটী অতি পবিত্র রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পশ্চিমদিকে হাজো নামক সুপ্রসিদ্ধ নগরে প্রস্তর নির্ম্মিত হয়গ্রীবমাধবের মন্দির। প্রবাদ আছে যে হয়াসুরকে বিনাশ করিয়া এইখানে ভগবান অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহাঁকে হয়গ্রীবমাধব বলিয়া থাকে, তাহার সন্নিকটস্থ পাহাড়রাজীতে কেদারেশ্বর, কমলেশ্বর, কামেশ্বর, সাক্ষিগণেশ, গোকর্ণমুনির প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি এবং বরাহকুণ্ড প্রভৃতি পঞ্চতীর্থ বিদ্যমান আছে। এই সকল তীর্থপর্য্যটন করিলে মানবদেহ পবিত্র হয় বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে। প্রবন্ধবিস্তৃতির ভয়ে এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে উৎসুক হইয়া রহিলাম ইতি।

শ্রীগৌরীদত্ত মিশ্র বিদ্যাভূষণ।

(আসাম।)

(তাম্র ফলক।)

ওঁ স্বস্তি।

ভবতু ভবতিমিরভিদুরস্তেজো রৌদ্রং প্রশান্তয়ে জগতঃ।
পরিবর্ত্ততে সমগ্রং ... ... নে যৎ॥
সুরকরিমদচন্দ্রকিতং সলিলং লৌহিত্যবারিধেরমলম্।
কৈলাসকটক মৃগমদ বাসিতমপহরতু দুরিতম্বঃ (১)॥
প্রলয়পয়োধৌ মগ্নামুদ্ধরতো বসুমতী মুপেন্দ্রস্য।
নরক ইতি সূনুরাসী দসুরসুহৃৎ ক্রোড়রূপভৃতঃ॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়তুঙ্গং যেনাপহৃতং যশো মহেন্দ্রস্য।
অদিতেঃ কুণ্ডলযুগলং কপোলদোলাইতং হরতা (২)॥

* তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধপূগং কৃষ্ণাগুরুস্কন্ধনিবেশিতৈলম্।
স কামরূপে জিতকামরূপঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যং পুরমধ্যুবাস।
মদান্ধগন্ধদ্বিপকর্ণতালনৃত্যন্ময়ূরোপবনে স তস্মিন্।
বসন্ সমাসাদ্য মুরারিচক্রং রণে রণৈষী দিবমারুরোহ॥
ভূপালমৌলিমণিচুম্বিতপাদপীঠস্তস্যাত্মজোঽভূদ্ভগদত্তনামা।
* রাজা প্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণো (৪) বর্ণাশ্রমাণাং গুরুরেকবীরঃ॥
উপগতবতি সুরলোকং তস্মিংস্তস্যানুজোঽভবদ্ভূমেঃ।
পতিরচলভক্তিরীশে যং প্রাহুর্ব্বজ্রদত্ত ইতি কবয়ঃ॥
তদ্বংশে বনবপ্রাং পরিখীকৃতসাগরাং মহীং ভুংক্ত্বা।
অস্তঙ্গতেষু রাজসু সালস্তম্ভোঽভবন্নৃপতিঃ॥
পালক বিজয় প্রভৃতিষু সম ... তস্য বংশ্যেষু।
অভবদ্ভুবি নৃপচন্দ্রো দ্বিষজ্জ্বরোহর্জ্জরো নাম॥
অহমহমিকয়া বিবন্দিষূণাং ... ... লঘুপ্রভাপ্রতানৈঃ।
ন মুকুটমণয়ো বিভান্তি রাজ্ঞাং রবিকর-সম্বলিতা ইব প্রদীপাঃ॥
তস্যাত্মজঃ শ্রীবনমালদেবো রাজা চিরন্তক্তিপরোভবেঽভূৎ।
বিশালবক্ষাস্তনুবৃত্তমধ্যঃ পিনদ্ধকণ্ঠঃ পরিঘাভবাহুঃ॥
ন ক্রুদ্ধং বিকৃতাস্যং নচ হসিতং নচ বচঃ শ্রুতন্নীচাৎ।
নচ কিঞ্চিদুৎক্রমহিতং মহিতং শীলং সদৈব যস্যাভূৎ॥
যেনাতুলাপি সতুলা জগতি বিশালাপি ভূরিকৃতশালা।
পংক্তিঃ প্রাসাদানামকৃতাবিচিত্রাপি সচ্চিত্রা॥
তস্যাত্মজঃ শ্রীজয়মালদেবঃ ক্ষীরাম্বুরাশেরিব শীতরশ্মিঃ।
বভূব, যস্যাস্খলিতং ভ্রমন্তি যশাংসি কুন্দেন্দুসমপ্রভাণি॥
মন্ত্রিমান্ বনমালোঽপি রাজা রাজীবলোচনঃ।
অবেক্ষ্য বিনয়োপেতং তনূজম্প্রাপ্তযৌবনম্॥
ছত্রং শশধরধবলং চামরযুগলান্বিতম্প্রদায়াস্মৈ।
অনশনবিধিনা বীরস্তেজসি মাহেশ্বরে লীনঃ॥
প্রাপ্তরাজ্যেন তেনোঢ়া রাজ্ঞা শ্রীবীরবাহুনা।
* কুলেন কান্ত্যা বয়সা অথানামাত্মনস্সমা॥

যেনোদপাদি তস্যামরণাবিব পাবকঃ প্রয়োগবিদা।
বলবর্ম্মেতি প্রথিতঃ শ্রীমত্তনয়স্সমগ্রগুণযুক্তঃ ॥
অসিতসরোরুহচলদলনিভনয়নঃ পীনকন্ধরস্সুভুজঃ।
অভিনবদিনকরকরহতবিদলিতনয়ননলিনকান্তিসচ্ছায়ঃ ॥
গচ্ছতি তিথিমতি কালে স কদাচিৎ কর্ম্মণাং বিপাকবশাৎ।
রাজা রুজাভিভূতোলঙ্ঘিতভিষজো রণে স্তম্ভঃ ॥
নিঃসারং সংসারং জললবলোলঞ্চ জীবিতং পুংসাম্।
বিগণয্য বীরবাহুঃ কর্ত্তব্যমচিন্তয়চ্ছেষম্ ॥
অথ পুণ্যেহহনি নৃপস্তনয়ন্তমুদগ্রবিগ্রহং বিধিবৎ।
কেসরিকিশোরসদৃশং সিংহাসনমৌলিতামনয়ৎ ॥
তদনন্তরমধিগম্য প্রাজ্যং তদ্রাজ্যমাজ্যমিব বহ্নিঃ।
বলবর্ম্মাপি দিদীপে প্রোৎসারিতসকলরিপুতিমিরঃ ॥
অভবজ্জয়করিকুম্ভস্খলিতোর্ম্মেরমলবারিধেস্তস্য।
লৌহিত্যস্য সমীপে তদেব পৈতামহং কটকম্ ॥

তত্র শ্রীমতি হরপ্যেশ্বরনামনি কটকে কৃতবসতিরুৎখাতাসিলতা-মরীচিনিচয়মেচকিতেন বাহুনা বিজিতসকলদিকৃচক্রবালো ধীরঃ প্রধনে, ভীরুরযশসি, তীক্ষ্ণো রিপুষু, মৃদুতরো গুরুষু, সত্যবাগবিসম্বাদী, কৃত্বাবিকত্থনঃ, স্থূললক্ষ্যো মাতাপিতৃপাদানুধ্যানধৌতকল্মষঃ, পরমেশ্বরঃ পরমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীবলবর্ম্মদেবঃ কুশলী ॥ * ॥

দক্ষিণ-কূলে দিগ্জিন্নাবিষয়ান্তঃপাতিনী ধান্যচতুস্সহস্রোৎপত্তিমতী হেঙসিরাভিধানা ভূমিঃ। অস্যাস্সন্নিকৃষ্টবর্ত্তিনো যথাযথং সমুপস্থিতব্রাহ্মণাদি-বিষয়করণব্যবহারিকপ্রমুখজানপদান্, রাজরাজ্ঞীরাণকাধিকৃতানন্যাংশ্চ যথা-কালভাবিনোপি সর্ব্বান্ সম্মাননাপূর্ব্বং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। ইতি বিদিতমস্তু ভবতাম্ভূমিরিয়ং বাস্তুকেদারস্থলজলগোপ্রচারাকরাদ্যুপেতা যথাস্বং স্বস্বসীমোদ্দেশপর্য্যন্তা। রাজ্ঞীরাজপুত্ররাণকরাজবল্লভমহল্লক-প্রোঢ়িকাহাস্তিবন্ধিকনৌকাবন্ধিকচৌরোদ্ধরণিকদাণ্ডিকদাণ্ডপাশিকঔপরিকরিক ঔৎখেটিকচ্ছত্রবাসাদ্যুপদ্রবকারিণামপ্রবেশা ॥

কাণ্বঃ কৃতী কাপিলগোত্রদীপো গালাধরো নাম বভূব ভট্টঃ।
বিদ্যাতপস্সম্পদুপাত্তসম্যগ্বিবেকবিধ্বস্তসমস্তদোষঃ ॥
দেবপ্রিয়ো দেবধরস্সুজন্মা তস্যাপি পুত্রঃ সুকৃতাত্মনোহভূৎ।
অধ্বর্য্যুণা যেন কৃতং বিভজ্য বৈতানিকং কর্ম্ম নিরাকুলেন ॥
গৃহীতবিদ্যস্সুগৃহীতনামা গৃহাশ্রমাবাপ্তিপরো গৃহিণ্যা।
অযুজ্যতাসৌ প্রভয়েব ভানুরুষস্সু শামায়িকয়া মনস্বী ॥
অহস্ত্রিযামপ্রতিমং প্রসক্তমন্যোন্যসাপেক্ষমিদং হি যুগ্মম্।
লেভে সুতং নাশিতদোষমেনমালোকমর্কাদিব বিশ্বমেতৎ * ॥
অয়মিহ বিনীয়মানঃ শ্রুতয়ঃ সম্যগ্ধরিষ্যতে সর্ব্বাঃ।
শ্রুতিধরইতি নাম্না সৌপিত্রঃ প্রথিতোহথ লোকেষু ॥
স সমাবৃত্তো গুরুতো গৃহধর্ম্মবিধিৎসুরাগতস্সাধুঃ।
কালে বিষুবত্যর্থী ধর্ম্মরতঃ পণ্ডিতঃ কথানিষ্ঠঃ ॥
তস্মৈ বিপ্রায় ময়া স্নাত্বা সম্যক্সমাধিনা দত্তা।
যদিহ ফলং তৎপিত্রোর্ম্মমাপি লোকোত্তরং ভূয়াৎ ॥

অস্যাস্সীমা পূর্ব্বেণ কোপ্যঃ। গোসন্তারশ্চ। পূর্ব্বদক্ষিণেন জম্বু-শ্রীফলবৃক্ষঃ। দক্ষিণেন বৃহদালিঃ। সুবর্ণবটবৃক্ষশ্চ। দক্ষিণপশ্চিমেনাম্রবৃক্ষঃ। পশ্চিমেন বৃহদালিঃ শাল্মলীবৃক্ষশ্চ। পশ্চিমোত্তরেণ বৃহদ্বটবৃক্ষঃ ... ... বাপী চ। উত্তরেণ বাপ্যর্দ্ধম্। উত্তরপূর্ব্বেণ পুষ্করিণী জটীবৃক্ষশ্চেতি।

নরকাসুরস্য বংশম্।

নরক
ভগদত্ত
ধর্ম্মপাল
চন্দ্রপাল
অরিমথ

ধর্ম্মদন্তী   অবন্তি   জয়ন্তি
ধনিরাণি
মনসিংহ

লাভসিংহ   অনিরুদ্ধ
মঞ্জুলসিংহ

মকরধ্বজ   সুন্দরসিংহ   কামদেব সিংহ   নবসিংহ   ধর্ম্মসিংহ
ধনেশ্বরী
রূপসিংহ

রামসিংহ   জয়সিংহ   মাণিকসিংহ

বীরসিংহ   ধর্ম্মসিংহ   পাতালসিংহ   ভুবনসিংহ

বলরামসিংহ   ডুমাণসিংহ   ধীরসিংহ   উপেন্দ্রসিংহ

ললিতরামসিংহ   গোবিন্দসিংহ

মোহনসিংহ   মণীন্দ্রসিংহ

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বরতত্ত্ব।

(গুরুশিষ্যের কথোপকথন।)

শিষ্য। গুরুদেব! ঈশ্বর-তত্ত্বসম্বন্ধে আজ কিছু উপদেশ দিন।

গুরু। বৎস! আজ যাহা জানিতে চাহিয়াছ, তাহা বড়ই জটিল। তোমার বোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। চতুর্ব্বেদ, ষড়্‌দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ এবং জৈন ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ও তৌরেত, জব্বুর, ইংজীল, কোরাণ ও বাইবেল আদি জগতের সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক, মনুষ্যের মস্তকের উপর ঈশ্বর ও পরলোকের ভয় ও স্বর্গাদির লোভ চাপাইয়া, সংসারের মর্য্যাদা স্থির রাখিবার জন্য, শুভাচারে প্রবৃত্ত ও অশুভাচারে নিবৃত্ত করিতে চাহে। বিবেকহীন মনুষ্য শ্রুত ও পঠিত বাক্যকে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়, যুক্তি কিম্বা প্রমাণের সাহায্যে উহাদিগের সত্যাসত্য বিবেচনা করেনা। কিন্তু বুদ্ধিমান ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ যুক্তি ও প্রমাণভিন্ন শ্রুত ও পঠিত বাক্যকে সত্য বলিয়া মানেন না, এবং যাঁহারা সত্যের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারাই পরাবিদ্যার অধিকারী।

শিষ্য। পরাবিদ্যা কাহাকে বলে?

গুরু। বিদ্যা দুই প্রকার,—পরা এবং অপরা। যে বিদ্যা দ্বারা মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয় না, তাহাকে পরাবিদ্যা বলে, এবং যে বিদ্যার দ্বারা মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইয়া মন ব্যাকুল হয়, তাহাকে অপরা বিদ্যা বলে। মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত আছে,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্‌বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহ অথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ পরা ও অপরা ভেদে বিদ্যা দুই প্রকার বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষকে তাঁহারা অপরা বিদ্যা বলিয়া থাকেন। এবং যে বিদ্যাদ্বারা অবিনাশী ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলে।

যদি বেদাদি সমুদয় গ্রন্থ অপরা বিদ্যার ভিতর পরিগণিত হয়, তবে উহাদিগের দ্বারা কিরূপে নিঃসন্দেহ জ্ঞান হইতে পারে?

শিষ্য। বেদাদি গ্রন্থে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা ও হর্ত্তা, এবং জীবের পাপপুণ্যানুসারে নরক ও স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। সুতরাং এই জ্ঞানের উপর মনুষ্যের কিরূপে সন্দেহ হইতে পারে?

গুরু। অপরা বিদ্যার অধিকারীর ইহার উপর কিছুই সন্দেহ হয় না। কিন্তু পরা বিদ্যার অধিকারীর ইহার উপরে অনেক সন্দেহ উঠিয়া থাকে। তাহা আমি তোমায় ক্রমশঃ দেখাইতেছি। প্রথমে তুমি আমাকে, ঈশ্বর কাহাকে বল, তাহার উত্তর দাও।

শিষ্য। আমি ঈশ্বরকে অনাদি, অনন্ত, কায়রহিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসমর্থ, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণ, পবিত্র ও ইচ্ছাহীন বলিয়া শুনিয়াছি।

গুরু। যদি ঈশ্বর কায়শূন্য ও জন্মমরণহীন হইলেন, তবে কেমন করিয়া তুমি তাঁহার নিশ্চয় কর?

শিষ্য। আমরা দেখিতে পাই যে, নির্ম্মাণকর্ত্তা ভিন্ন কিছুই নির্ম্মাণ হয় না, সুতরাং সুন্দর সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়মে পরিচালিত এই যে জগৎ আমরা দেখিতেছি, ইহারও অবশ্য কেহ নির্ম্মাণকর্ত্তা আছেন, এবং সেই নির্ম্মাণ-কর্ত্তাকে আমি ঈশ্বর বলি।

গুরু। জগতের নির্ম্মাণকর্ত্তাকে যদি তুমি ঈশ্বর বলিয়া জান, তবে দেখাও যে ঈশ্বর জগতের কোন্ কোন্ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জীব সকল আপন পিতামাতা হইতে সৃষ্ট হইতেছে; বৃক্ষ সকল আপনার বীজ হইতে উৎপন্ন হইতেছে; ঘট, পট, গৃহ, কূপ ইত্যাদি মনুষ্য নির্ম্মাণ করিতেছে। এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব অনাদি বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কেমন করিয়া উহা ঈশ্বরের নির্ম্মিত বলা যায়? আবার দেখ, তুমি বলিয়াছ যে, নির্ম্মাণকর্ত্তা ভিন্ন কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তোমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের যে একজন নির্ম্মাণকর্ত্তা আছেন, তাহা তোমায় স্বীকার করিতে হয়।

শিষ্য। যদিও আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি যে, জীব তাহার মাতা-

পিতা হইতে, এবং বৃক্ষ তাহার বীজ হইতে উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু আদিতে যে পিতামাতা, বীজ ও পঞ্চতত্ত্ব ছিল, তাহাদিগকে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং আমি সেই বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করি, যাহার আকার বা রূপ আছে, কিন্তু আমি প্রথমেই বলিয়াছি ঈশ্বর নিরাকার, সুতরাং তাঁহার কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই।

গুরু। আদিম পিতা, মাতা, বীজ ও পঞ্চতত্ত্বের কর্ত্তাকে যদি তুমি ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লও, তবে মনে এই দুই বিশেষ সন্দেহের উদয় হয়,— (১), আদিতে যে মাতাপিতা ও বীজ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা কোন্ ইচ্ছাতে সৃষ্টি করিয়াছেন? (২) কোন্ উপকরণ দ্বারা তিনি ঐ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন?

তুমি প্রথমে মানিয়াছ যে, নির্ম্মাণকর্ত্তা ভিন্ন কিছুই নির্ম্মিত হয় না, এবং এখন বলিতেছ যে, ঐ বস্তুই নির্ম্মিত হয় যাহার আকার আছে, তাহা হইলে পবন ও আকাশের নির্ম্মাণকর্ত্তা যে ঈশ্বর, তাহা কিরূপে বলা যায়, কারণ উহাদের তো কোন আকার নাই?

যদি বল, যে ঈশ্বরের কোন ইচ্ছা নাই। তাহার উত্তরে আমি ইহা বলি যে, জগতে ইচ্ছা বিনা কোন কার্য্যই দেখা যায় না। সুতরাং ঈশ্বর যে আদিম মাতা ও পিতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অবশ্য কোন ইচ্ছা নিহিত আছে। যদি বল যে ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু আমি ঐ ইচ্ছা জানিনা, তাহা হইলে ঈশ্বরকে সেই ইচ্ছার পূরণ করিতে হয় ইহা মানিতে হয়। আরও জিজ্ঞাস্য যে ঐ ইচ্ছা নিজের জন্য কিম্বা অপরের জন্য হয়?

যদি আপনার জন্য ঐ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি পূর্ণ ও ইচ্ছাহীন কেমন করিয়া হইলেন? এবং যদি পূর্ণ না হয়েন, তবে সর্ব্বব্যাপী কেমন করিয়া হইলেন? যদি বল যে অপরের নিমিত্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা হইলে যখন জগৎ ছিল না, তখন অপর আর কে ছিল? যদি বল, যে আপনার প্রতাপ প্রকাশ না করিবার জন্য ঐ ইচ্ছা হইয়াছিল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার প্রতাপ প্রকাশ না করিলে কি হানি হইত? যদি বল, যে দয়ালু হইয়া আপনার দয়া প্রকাশ করিবার জন্য তিনি জগৎ রচনা

করিয়াছেন, তাহা হইলে যদি জগৎ নির্ম্মিত না হইত, তবে কাহার উপর তিনি দয়া করিতেন। একতো তাঁহার দয়া তাঁহারই দুঃখদায়ক হয়, কারণ তিনি এক তিলের জন্য অবসর পান না, এবং আরও দেখ, যে সিংহ, সর্প বৃশ্চিকাদি হিংস্র জন্তু সকল রচনা করিয়া তিনি জগতের উপর কিরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন?

আরও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কোন্ বস্তু দ্বারা তিনি আদিম মাতা, পিতা, বীজ ও পঞ্চতত্ত্বের রচনা করিয়াছেন, কারণ উপাদানভিন্ন কোন বস্তুই উৎপন্ন হয় না? যদি বল, যে পঞ্চতত্ত্বের পরমাণুসকল নিত্য এবং উহাদিগকে স্থূল করিয়াই এই জগৎ রচনা করিয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কেন রচনা করিয়াছেন। যদি বল, যে জীব অনাদি এবং উহার কর্ম্মও অনাদি, এবং ঐ কর্ম্মফলভোগের জন্য ঈশ্বর পরমাণুসমূহ মিলাইয়া স্থূল করিয়া জগৎ রচনা করিয়াছেন! আবার দেখ, এই জগতেরও অনেকবার সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে মানিতে হয় যে, বারংবার এই জগতের রচনা ও ধ্বংসের দ্বারা জীবের কর্ম্ম ঈশ্বরের দুঃখদায়ক হইয়াছে।

যদি বল, যে ঈশ্বর এই সঙ্কেত একেবারে বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, সৃষ্টির পর প্রলয় হইবে এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টি হইবে, এবং এই নিত্যচক্রে জীব কর্ম্মফল ভোগ করে, সুতরাং ঈশ্বরের নূতন নূতন সঙ্কল্প আর মানিতে হয় না, তাহা হইলে শুন। সৃষ্টি প্রলয়ের ধারা যদি তুমি অনাদি বলিয়াই মান, তবে এই সঙ্কেত বাঁধিবার সময় কিরূপে নির্দ্ধারণ করিবে, কারণ যে সময় সঙ্কেত বাঁধা হইয়াছে স্থির করিবে, তাহার পূর্ব্বে সৃষ্টির অভাব মানিতে হইবে। যদি পূর্ব্বে সৃষ্টি ছিল এইরূপ মান, তবে কিরূপে এই সঙ্কেত বাঁধিবার কাল স্থির করিবে?

যদি বল, যে রচনা করিবার জন্য ঈশ্বরের অন্য উপাদানের প্রয়োজন নাই, কিন্তু "একোহং বহুঃ স্যাং" এই শ্রুতির বাক্যানুসারে ঈশ্বর আপনি জগতের রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরকে নিরাকার মানিয়া, এখন কিরূপে সাকার বলিতেছ?

যদি বল, যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, এইহেতু জগৎ রচনার জন্য তাঁহার কোন

সাধন এবং সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না, তিনি নিজে যাহা চাহেন তাহা নিজ শক্তি দ্বারা উৎপন্ন করিয়া লয়েন, তাহা হইলে যদিও সর্ব্বশক্তিমানের সাধন ও সামগ্রীর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু তাহাতে যে কার্য্য-রচনার ইচ্ছা আছে, তাহা মানিতে হয় এবং তাহা হইলে পূর্ব্বকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়।

যদি বল, যে মনুষ্যের বুদ্ধি অতি তুচ্ছ এবং উহার দ্বারা জগৎ কবে হইয়াছে, কেন হইয়াছে, কি উপাদানে হইয়াছে প্রভৃতি মহান্ ঈশ্বরের ব্যবহার বুঝা যায় না, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই তুচ্ছ বুদ্ধি দ্বারা কেমন করিয়া তুমি স্থির কর যে ঈশ্বর সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন?

যদি বল যে জগতে কিছুরই অস্তিত্ব নাই, উহা ভ্রমের উপর চলিতেছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, কাহার ভ্রম—ঈশ্বরের না জীবের? যদিবল, যে ঈশ্বরের ভ্রম, তবে ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বল কেন? যদি জীবের ভ্রম বল, তবে জীব কি জগৎ হইতে ভিন্ন, যে জীবের ভ্রমের উপর জগৎ ভাসিতেছে? সমস্ত জীবের নাম কি জগৎ নহে? আবার দেখ জীব নিত্য ও সত্য সুতরাং সত্যের ভ্রম কিরূপে হয়?

যদি বল, যে আমার বুদ্ধি অতি তুচ্ছ, আমি আপনার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে অসমর্থ, কিন্তু জগতের বেদাদি সমস্ত গ্রন্থ ঈশ্বরের বাণী বলিয়া কথিত হয় বলিয়াই আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে শুন। প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, যে জীব কি পদার্থ এবং শরীর ত্যাগ করিয়া জীব কোথায় যায়।

শিষ্য। যিনি অজর, অমর, এবং যিনি পায়ের নখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত সকল শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যিনি নিরাকার এবং যিনি শরীরের ভিতর আছেন বলিয়াই আমাদের জ্ঞানশক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই আমি জীব বলি।

গুরু। যখন মূর্চ্ছাদ্বারা অথবা কোন উন্মাদক দ্রব্যের সংযোগে এই দেহ হইতে জ্ঞান-শক্তির লোপ হয়, তখন জীবাত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় ইহাই মানিতে হয়। যদি বল যে উন্মাদক দ্রব্যের সংযোগে জীবাত্মার ব্যাকুলতা জন্মে এবং এই জন্যই জ্ঞান-শক্তির লোপ হয়, তাহা হইলে তুমি উহাকে নিরাকার বলিয়া উহার সহিত অন্য দ্রব্যের সংযোগ কিরূপে মান?

এই সংযোগের দ্বারা আত্মার সহজধর্ম্ম জ্ঞান-শক্তির যে নাশ হয়, এই যুক্তি সংগত নহে।

শিষ্য। যেমন নিরাকার পবনের সহিত দুর্গন্ধ দ্রব্যের সংযোগ হইয়া পবনকে দুর্গন্ধ করিয়া দেয়, সেইরূপ নিরাকার আত্মার সহিত মাদক দ্রব্যের সংযোগের দ্বারা জীবনকে ব্যাকুল করিয়া দেয়।

গুরু। তোমার এই যুক্তি ঠিক নহে, কারণ দুর্গন্ধ দ্রব্য পবনকে দুর্গন্ধ করে না, কিন্তু উহার সূক্ষ্ম পরমাণু সকল পবনের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যখন মনুষ্যের নাসিকায় উপস্থিত হয় তখন সুর্য্যালোকে পবনের দুর্গন্ধ আছে, ইহাই বলে। পবন নির্লেপ, কিন্তু যদি কোন দ্রব্যের সংযোগে উহার সহজধর্ম্ম স্পর্শের ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে উহা দুষিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

আবার দেখ, তুমি যে জীবকে অজর ও অমর বল, ইহা যুক্তিদ্বারা তিষ্ঠে না, কারণ দেহভিন্ন উহার স্বতন্ত্র স্থিতি নাই এইরূপই প্রতীতি হয়, সুতরাং দেহের সহিত উহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় ইহা মানিলে কোন দোষ হয় না। যদি বল, যেরূপ ঘটের উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত ঘটাকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মারও বিনাশ হয় না, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যেরূপ ঘটের উৎপত্তি ও বিনাশের পূর্ব্বে ও পশ্চাতে আকাশের ভিন্ন স্বরূপ দেখা যায়, সেইরূপ জীবাত্মার কিরূপ ভিন্ন স্বরূপ দেখা যায়?

তুমি উহাকে নখ হইতে শিখা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বলিয়াছ, তোমার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নখ ও রোম কর্ত্তন করিলে আমাদের দুঃখ কেন হয় না? যদি বল, যে উহা দেহতেই ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু নখাদিতে নাই, তাহা হইলে যদি হাত ও পা কাটা যায়, তবে জ্ঞানের কোন অংশের তো হীনতা দেখা যায় না। যদি বল, যে যেরূপ ইন্ধনের কোন্ অংশ কাটিলে উহার ব্যাপ্ত অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ ধর্ম্মের কিছুই ন্যূনতা হয় না, সেইরূপ দেহ হইতে হস্ত ও পদ বিচ্ছিন্ন করিলে ব্যাপ্ত জীবাত্মার কোন স্বরূপের হ্রাস হয় না; তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, যেরূপ কর্ত্তিত ইন্ধনের দুই খণ্ডে ব্যাপ্ত অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ তুল্য প্রতীত হয়, সেইরূপ ছিন্নহস্ত ও পদে

আত্মার জ্ঞান-শক্তি, দেহের ভিতর আত্মার জ্ঞান-শক্তির ন্যায় তুল্য হওয়া উচিত। যদি বল, যে জীবাত্মা সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, কিন্তু জ্ঞান-শক্তির প্রতীতি ঐ স্থানে হয় যেখানে মন নামে ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। তাহা হইলে তুমি কি ইহা মানিতে চাও যে, মন অণুমাত্র দ্রব্যবিশেষ এবং দেহের কোন এক বিশেষ স্থানে বিদ্যমান আছে? তাহা হইলে মুখে মিষ্ট দ্রব্য দিলে কিম্বা পায়ের নিম্নস্থান ক্ষত হইলে, কিরূপ সুখ দুঃখের অনুভব হয়?

সকলের ভিতর যে জীবাত্মা আছে তাহা এক কি বিভিন্ন? ইহার উত্তরে তুমি কি বলিতে চাও? যদি বল এক, তাহা হইলে একব্যক্তি ঘোড়ার উপর চড়িয়া বিনা প্রেরণায় তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছায় না কেন,—যদিও উভয়ের সঙ্কল্প একরূপ? যদি বল ভিন্ন, এবং মনের ভিন্নতার দ্বারা সঙ্কল্পের ও ভিন্নতা হয়, তাহা হইলে জীবাত্মা মন হইতে ভিন্ন কি না? যদি বল, সকল দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা আছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে উহাদের সহিত জীবাত্মা উৎপন্ন হয়, কি পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকে? যদি বল, দেহের সহিত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহার উপাদান যে পিতার বীর্য্য, ইহা মানিতে হয় এবং তাহা হইলে দেহের ন্যায় উহারও নাশ হয় ইহাও মানিতে হয়।

যদি বল, দেহের পূর্ব্বে উহা বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে বল, কোথায় ছিল।

আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, পাপ, পুণ্য কি পদার্থ যাহার দ্বারা জীবাত্মার নরক ও স্বর্গ ভোগ হয়?

শিষ্য। পরস্ত্রীগমন, পরস্বহরণ, মিথ্যালাপ, নিষ্ঠুরতা, কপটতা ও অহংকারাদি কুকর্ম্ম সকলকে পাপ বলে এবং সত্য, দয়া, দান, সংযম, তপ, ব্রত, যোগ, যজ্ঞ, নাম, স্নান পরোপকারাদি সুকর্ম্মকে পুণ্য কহে।

গুরু। পাপ পুণ্যের ফল মনুষ্যের আত্মাই কি কেবল ভোগ করিয়া থাকে, অথবা পশু পক্ষীরা ও পাপপুণ্য করিয়া থাকে এবং উহাদিগের ফলও ভোগ করে? যদি বল, মনুষ্যের আত্মাই কেবল পাপ পুণ্য করিতে সমর্থ হয়, এবং উহার ফল ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বে এই

প্রশ্নের মীমাংসা কর যে আত্মা এই দেহ হইতে ভিন্ন কি না? এবং ভিন্ন হইয়া ফল ভোগ করে কি না? কোন কোন ব্যক্তি জীবাত্মার কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার জন্য, সপ্তদশ পদার্থ হইতে নির্ম্মিত অপর একটী সূক্ষ্ম বা অতিবাহক শরীরের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু ঐ রূপ অঙ্গীকার করিবার আমি কোন কারণ দেখিতেছি না। অনেকে দেহ বিনা আত্মার স্থিতি কঠিন বিবেচনা করিয়া, পূর্ব্বদেহের কর্ম্মফল জীবাত্মা অন্যদেহে ভোগ করেন, ইহার স্বীকার করেন। কিন্তু ঐ যুক্তিও ঠিক নহে, কারণ পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেহে প্রবেশ করিবার মধ্যে যে ক্ষণ অতিবাহিত হয়, ঐ সময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মার স্থিতি মানিতে হয় এবং দেহ ছাড়িয়া এরূপ কি বস্তু থাকিতে পারে এবং উহার ঐরূপ অস্তিত্বেরই বা প্রমাণ কি?

যদি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন কর যে, উহা জলৌকার ন্যায় পশ্চাতের চরণ উঠাইয়া সম্মুখে স্থাপন করে, তবে আমি বলিব যে, এই যুক্তি ও ঠিক নহে, কারণ, জলৌকা যে স্থান হইতে চরণ উঠাইয়া অপর স্থানে রাখে— এই দুই স্থান অতি নিকটবর্ত্তী, কিন্তু জীবাত্মার ব্যবহারে এইরূপ কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যখন জীবাত্মা একদেহ হইতে নির্গত হয়, তখন ঐ মৃতদেহের নিকটে অপর একটী নূতন দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি বল যে, পশুপক্ষীদিগেরও আত্মা পাপপুণ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার এইবাক্য সত্য নহে, কারণ উপরে তুমি পাপপুণ্যের যে নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহা উহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না।

পুনশ্চ, তুমি স্বর্গ ও নরক কাহাকে কহিয়া থাক?

শিষ্য। আকাশ কিম্বা পাতালের কোন স্থানবিশেষকে।

গুরু। যদি স্বর্গ ও নরক আকাশের কিম্বা পাতালের কোন এক স্থান হয়, তাহা হইলে উহারা কাহারও নিকট এবং কাহারও দূরে পড়ে। যাহারা নিকটে থাকে, তাহারা দেহ ছাড়িয়াই শীঘ্র সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, কিন্তু যাহারা দূরে আছে, তাহাদিগের ঐস্থানে আসিতে কিঞ্চিৎ সময় কাটিয়া যায়। তাহারা সুখের কিম্বা দুঃখের কোন্ অবস্থাতে ঐ সময় যাপন করে? এবং কোন্ কর্ম্মফলে তাহারা ঐ অবস্থা ভোগ করে? উহা নরক কিম্বা স্বর্গ ভোগের মধ্যে গণনীয় কিম্বা স্বতন্ত্র ফল-ভোগ?

শিষ্য। আপনি বিকল্পজালের দ্বারা আমাকে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছেন। আমার একটী প্রশ্ন আছে, আপনি দয়া করিয়া তাহার উত্তর দিন।

গুরু। তোমার কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা কর।

শিষ্য। সকল মহাপুরুষ ঈশ্বরাদিকে সত্য বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আপনার কি সিদ্ধান্ত তাহা দয়া করিয়া বলুন।

গুরু। যতক্ষণ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ না হইবে, ততক্ষণ কোন গ্রন্থ বা কোন মহাপুরুষের বাক্য সত্য বলিয়া মানিবে না, কারণ সকল গ্রন্থই অপরা বিদ্যার উপদেশ দিয়াছে, এবং মহাপুরুষও পৃথিবীতে দুই প্রকারের আছেন। একপ্রকার মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা অপরা বিদ্যা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছেন, এবং অন্য প্রকার মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা পরাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহাসত্যধারী যথার্থ মহাপুরুষ, যাঁহাদিগকে পুরুষোত্তম, পরমহংস বা অর্হৎ বলে, যাহাঁরা পরাবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মৌনাবলম্বনকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন, এবং কেহ কেহ নিজে সুখী হইয়া পরোপকারের জন্য অধিকারিভেদে কিছু কিছু উপদেশ দান করেন, যাহাতে লোক সকল ভ্রষ্ট বা পতিত না হয়। তাঁহারা মনুষ্যের মস্তক-হইতে বৃথা ভয় ও লোভ, যাহা তাহাদিগের শরীর, মন, ধন নষ্ট করিতেছে,—সেই সকল বোঝা নামাইয়া দেন। পরন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, এরূপ আত্মঘাতী পুরুষ কে আছেন, যিনি সেই পরাৎপরকে অসত্য বলিয়া মানেন?

আজ এই পর্য্যন্ত। অন্য একদিন এ সম্বন্ধে আন্দোলন করা যাইবে।

শ্রীআশুতোষ দেব এম্ এ।

মৎস্যমাংসভোজন।

প্রাণিমাত্রই শরীর রক্ষার্থ আহারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে। শাস্ত্রে বলে, প্রাণ, ক্ষুদ্র বৃহৎ উচ্চ নীচ উত্তম অধম, সর্ব্ববিধ শরীরে সমানভাব আহার আকাঙ্ক্ষা করে, তবে অভাবের অনুপাতে উপযোগিতা, এবং ক্ষয়ের অনুপাতে পরিপূর্ণতা সংঘটিত হওয়া ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ডের মেরুদণ্ডরূপিণী মহীয়সী প্রকৃতির চিরন্তন প্রথা বলিয়াই, সকল স্থানে এক নিয়মে একবিধ আহার এক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষিত নহে।

শরীরের সঞ্জীবনী শক্তি প্রতিক্ষণ ক্ষীণতা লাভ করিতেছে, সর্ব্ববিস্রংসী পরিবর্ত্তঝটিকার সামর্থ্যে একটী অণুও অচলভাবে একস্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। জীবদেহ প্রতিপলে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন আর কিছুই নহে, কেবল অকর্ম্মণ্য অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ, এবং অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত উপকরণসংগ্রহব্যাপারের বহির্ব্বিকাশ। যাহা ব্যয়িত হইল, অপহৃত হইল, বিপর্য্যস্ত হইল, তাহা না হইলে চলেনা; জীব প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হইবেন। অমনি প্রাণের তারে আঘাত লাগিল। প্রাণের প্রার্থনার শত উৎস উৎসারিত হইল! ঘোষিত হইল, "আবশ্যক"। এই "আবশ্যক" মনে রাখিয়া, প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে জীব আহার গ্রহণে ধাবিত হইল। সম্মুখে প্রকৃতির বিচিত্র রত্নভাণ্ডার। জীব অজীব, কঠিন কোমল, বক্র সরল, সরস নীরস, সুদৃশ্য কুদৃশ্য, উৎকৃষ্ট নীকৃষ্ট, উৎকট উদ্‌ভট কত কি! যাহা আপনার আবশ্যকের অনুকূল তাহাই গ্রাহ্য, আর যাহা আবশ্যকের প্রতিকূল তাহা ত্যাজ্য। যাহা গিয়াছে, তাহাই চাই। যে জাতীয় পদার্থের অভাব, তাহারই জন্য আকাঙ্ক্ষা। জগতে একের স্থান অপরের দ্বারা পূর্ণ হয় না। এ সিদ্ধান্ত স্থূলতঃ ব্যক্তিগত নহে, কার্য্যকারিতা দ্বারা যে ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্ট হয়, তাদৃশ ব্যক্তিত্বই এখানে ব্যক্তির লক্ষণ। যাহার অভাবে উদ্‌বিগ্ন হইতে হইয়াছে, তাহার কার্য্য যে করিতে পারে, তাহাকেই চাই। স্খলিতবসনে, মলিনবদনে অকর্ম্মণ্য উপকরণের পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার উৎকৃষ্ট কারণ দেখিনা। যদিও সাধারণতঃ এই টুকুই প্রতিপন্ন হয় যে, শরীরযন্ত্রের কার্য্যকারিতার যে শক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তৎপূরণসমর্থ বস্তুই

আমাদের আহার করা উচিত, তথাপি ইহার অভ্যন্তরে অনেক চিন্তাবীজ নিহিত আছে বলিয়া এ সিদ্ধান্তকে আমরা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পরিনা।

কেবল যে ক্ষুৎপ্রতীকারই আহারের একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহা স্বীকার করা যায় না। শরীরযন্ত্রের অবসাদনিরারণ ও তাহাদিগকে স্বকার্য্যোপযোগী শক্তি প্রদান করিতে, সাধারণতঃ অনেক খাদ্যেরই সামর্থ্য আছে, কিন্তু সর্ব্ববিধ খাদ্যই মানবের মনুষ্যত্ববিকাশের সর্ব্বথা সহায় নহে। যে সকল অসাধারণ শক্তিবলে মানব অপরাপর জীবের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন, সেই সকল শক্তি যাহাতে সংবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ খাদ্যনির্ব্বাচন অত্যাবশ্যক। কেবল শরীররক্ষার জন্য আহার্য্য গ্রহণ করিতে হইলে, অনেকাংশে পশ্বাদির খাদ্য ও মানবসমাজের খাদ্যের পার্থক্য রক্ষা করা সুকঠিন হয়। অপিচ আহারে বিধি নিষেধ, উচিত অনুচিত চিন্তা প্রসাদমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অমরা বলিতে চাহি, কেবল শরীরবলই লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত নয়, সত্যবর্দ্ধক খাদ্য গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক বলের জন্য লালায়িত হওয়া উচিত। ভারতগগনের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র আচার্য্য পতঞ্জলিদেব মহাভাষ্যে বলিয়াছেন, "ভক্ষ্যঞ্চ নাম ক্ষুৎপ্রতিঘাতার্থমুপাদীয়তে, শক্যঞ্চ অনেন শ্বমাংসেনাপি ক্ষুধংপ্রতিহন্তুং তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইদং ভক্ষ্যং ইদমভক্ষ্যং ইতি"। ক্ষুৎ-প্রতিকারার্থ ভক্ষ্য গ্রহণ করিলেও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার ইহার গূঢ় অভিসন্ধির পরিচয় প্রদান করে। অভক্ষ্যভক্ষণে সম্প্রতি শরীর পুষ্ট হয় বটে, কিন্তু রজঃশক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় উহা মনুষ্যত্ববিকাশের প্রতিবন্ধক, সুতরাং পরিণামে দুঃখপ্রদ। আপাততঃ আমরা এরূপ অনেক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি, যাহাতে শরীর বেশ সুস্থ থাকে, অথচ পরিশেষে যাহাদ্বারা প্রকৃতির বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে। আমরা শরীররক্ষার্থ কিরূপ আহার আবশ্যক, অগ্রে তাহাই দেখিব, পরে ঐ সকল আহারের আধ্যাত্মিক পরিণতি কি প্রকার, তাহা বিবেচনা করিব। কিছু দিন পূর্ব্বে এ দেশে খাদ্যনির্ব্বাচন-সম্বন্ধে এক গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সাময়িক পত্রের দ্বারা, পুস্তকের সাহায্যে এবং সভার বক্তৃতায় ঐ আন্দোলন পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে সবই পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং তাৎকালিক

মতবাদও ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব হইয়া অধিক দিন থাকিতে পারে নাই। কাজেই ব্যক্তিগত অভিমানবিসর্জ্জন দিয়া যুক্তির সাহায্যে ও প্রমাণের বলে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

আহারবিষয়ে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য এই যে, মানুষের যুক্তিসঙ্গত আহার কি? শরীরের ক্ষয়িত অংশগুলির মাত্রা ও পরিমাণ অনুসারে তত্তজ্জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করাই সাধারণতঃ আহারের উদ্দেশ্য। মানবদেহের রাসায়নিক উপকরণ নানাবিধ পদার্থ। ঐ সকল পদার্থই ব্যয়িত হয়, সুতরাং উহাদেরই গ্রহণ আবশ্যক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সকল বস্তুতেই অল্পাধিকপরিমাণে মানবদেহের উপাদান অবস্থিত আছে, এ হিসাবে প্রায় সকল বস্তুই আহার্য্যরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আহার্য্য বস্তু ভোজন মাত্রেই দৈহিক অপচয় নিবারিত হয় না; পরিপাকক্রমে যথাকালে (ভক্ষ্য বস্তুর অবস্থানুসারে) রস রুধিরাদিরূপে পরিণত হইয়া প্রক্ষীণ তত্তদংশের অভাব পূরণ করিতে পারগ হয়। বস্তুর অবস্থা, স্বভাব, এবং ভক্ষণকর্ত্তার পাকস্থলীর যোগ্যতা, ও ভোজনের সাময়িকতা ইত্যাদি বহুকারণভেদে পরিপাকক্রমের ব্যতিক্রম হয়। কঠিন পদার্থ পরিপাক করিতে দন্তহীন ব্যক্তি অক্ষম, যে হেতু চর্ব্বণ উহার সহায়তা করে না। কাজেই অপেক্ষাকৃত কোমল খাদ্য গ্রহণ করা তাহার কর্ত্তব্য। কাঁচা খাদ্য পরিপাক করা কঠিন, এজন্য উহা রন্ধন করা হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যক্তিগত অসংখ্য ভিন্নভাব, অবস্থাগত অসংখ্য ভিন্নতা ও স্বভাবগত নানা পার্থক্য বিবেচনা করিলে প্রতি ব্যক্তির প্রত্যেক অবস্থায় ভিন্নরূপ খাদ্য নির্ব্বাচন আবশ্যক হয়। তাদৃশ নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও মোটের উপর গড়ে স্থূল নির্ব্বাচন অসম্ভব নহে। যখন যে পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন সেই পরিমাণে সেই পদার্থ গ্রহণ করিলে সাম্যরক্ষা করা হয়, সুতরাং তাহাই তখন মানুষের ন্যায়তঃ খাদ্য। নচেৎ ক্ষয়ের মাত্রা অধিক, অথচ আয়ের পরিমাণ অল্প, অথবা ক্ষয়ের পরিমাণ অল্প কিন্তু গ্রহণের পরিমাণ অতিশয় হইলে বৈষম্য সংঘটিত হয়। এই উভয় কারণের বৈষম্যই পীড়াপ্রদ, এমন কি পরিশেষে মরণেরও কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্যদেশীয় পেভি, পার্কস্, প্লেফেয়ার, স্মিথ্ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীর

নিকট শুনিতে পাইব, তদ্দেশের পরিশ্রমী মধ্যমাকার ব্যক্তির দেহ হইতে প্রায় ৩০০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪৬০০ গ্রেণ অঙ্গার পদার্থ ব্যয়িত হয়। ব্যয়-পরিপূরণ জন্য আহার করিতে হইলে, ঐ পরিমাণ পদার্থ আহার করা আবশ্যক হয়। যবক্ষারজান মানবদেহের একান্ত আবশ্যক পদার্থ। এই যবক্ষার-জানকে আমরা ওজোবর্দ্ধকরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। অঙ্গার শরীরের সর্ব্বপ্রধান দরকারী জিনিষ। বলিতে গেলে, অঙ্গারই আমাদের দেহগঠন করে, ও যবক্ষারজান শক্তিসম্বর্দ্ধন দ্বারা দেহকে কর্ম্মপটু করে। শরীরের তেজের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে যবক্ষারজানময় আহার্য্যের ন্যূনধিক্য হওয়া সঙ্গত। এইরূপ সকল প্রকারের ন্যূনাধিক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আহার গ্রহণ করিতে হইবে। মানবশরীররক্ষার জন্য পাশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত-গণের অভিমত পদার্থমধ্যে, যবক্ষারজান ও অঙ্গারকে প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াই খাদ্যাখাদ্যের প্রকৃতিনির্ব্বাচনবিষয়িণী বিচারণার সূত্রপাত। এজন্য আমরা ঐ দুইটীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে ইচ্ছা করি। আহার্য্য চারি জাতীয় পদার্থাত্মক, ইহা প্রাউট্ সাহেবের মত। (১) পণিরময়, (২) তৈসময়, (৩) শর্করাময়, (৪) সজল ধাতব এবং উপধাতব পদার্থময়। ইহার মধ্যে তৈলময়. ও শর্করাময় পদার্থে যবক্ষারজান নাই ইহা অনেকে বলেন। পণিরময় পদার্থই যবক্ষারজানবিশিষ্ট। পরন্তু ইহাঁরা সকলেই বলেন যে, অঙ্গারময় খাদ্য কেবল মেদোবৃদ্ধি করে, আর যবক্ষারজনময় খাদ্য মস্তিষ্ক ও অন্যান্য শরীরযন্ত্রের সামর্থ্যবৃদ্ধি করে, সুতরাং মানুষের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। এই যবক্ষারজ্ঞান লইয়াই আমিষ নিরামিষ বিবাদ প্রথম উপ-স্থিত হয়। এই যবক্ষারজান, উদ্ভিজ্জ খাদ্যে যত, তদপেক্ষা প্রাণিজ খাদ্যে অধিকমাত্রায় আছে, ইহা সাধারণের জ্ঞাত বিষয়। সুতরাংই মস্তিষ্ক-বর্দ্ধনপ্রার্থিগণ প্রাণিজ খাদ্যের সেবক হইতে বাধ্য হন। যবক্ষারজান পদার্থ তেজোবর্দ্ধক। শীতপ্রধান দেশে দৈশিক প্রকৃতির সহিত কায়িক প্রকৃতির সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে হইলেই, ঐ যবক্ষাজানময় খাদ্য আবশ্যক হয়। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, সুতরাং এখানে দৈশিক ও দৈহিক প্রকৃতির সমতারক্ষার্থে তেজোবর্দ্ধক পদার্থ প্রায়ই আবশ্যক হয় না। এমন কি, অনেক সময়ে তেজঃসাম্যরক্ষা করিবার জন্য তেজোবৃদ্ধির প্রতিকূল

ক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। কাজেই পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণ ও অনুপাতে যবক্ষারজানের উপযোগিতা এদেশে বড়ই বিভিন্ন। এ দেশের লোকের আকার, প্রকার, পরিশ্রম, ও স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ করিলে এবং ইঁহাদের আকার, শক্তি, ধর্ম্ম, ও স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে, ও এদেশের ভৌতিক প্রকৃতির অবস্থা চিন্তা করিলে, এক জন সুস্থকায় পরিশ্রমী ব্যক্তিকে ২০০ গ্রেণ যবক্ষারজানময় খাদ্য দেওয়াই যথেষ্ট। সম্ভবতঃ দৈহিক নির্গমন পরীক্ষা করিলেও ইহা অপেক্ষা অধিক যবক্ষারজান বহির্গত হইতেছে বলিয়া বুঝা যাইবে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে এতদ্দেশীয় লোক প্রতি দিবস ২০০ গ্রেণ যবক্ষারজানময় খাদ্য গ্রহণে ন্যায়তঃ অধিকারী।

এখন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, যবক্ষারজানময় ও অঙ্গারময় খাদ্যই যদি শরীরসংস্কারে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়, তবে তাহাই প্রকৃতপক্ষে গ্রাহ্য, কিন্তু কেবল প্রাণিজ ও কেবল উদ্ভিজ্জ এবং সম্মিলিত খাদ্য এই ত্রিবিধ খাদ্য হইতেই ঐ পরিমাণ যবক্ষারজান ও অঙ্গার আহরণ করা যাইতে পারে কি না। যবক্ষারজানগ্রহণার্থ প্রাণিজ খাদ্য অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ খাদ্যের অধিক পরিমাণে গ্রহণ আবশ্যক হয়। ডাক্তার এড্‌-ওয়ার্ড সাহেবের মতে সহস্রাংশ তণ্ডুলে ৬৩ অংশের অধিক যবক্ষারজান-ময় পদার্থ নাই। তণ্ডুল অপেক্ষা গমে যবক্ষারজান অধিক। ডাক্তার স্মিথ সাহেবের মতে গমজাত ময়দার সহস্রাংশের ১০৮ অংশ মাত্র যবক্ষার-জান। উক্ত ডাক্তারের পরীক্ষিত যবের সহস্রাংশে ৬৩ ভাগের অধিক যবক্ষারজান পাওয়া যায় নাই। ভুট্টার সহস্রাংশে ১১০ ভাগের অনধিক। যবক্ষারজানাংশের পূরণার্থে উদ্ভিজ্জখাদ্য অপেক্ষা প্রাণিজখাদ্য গ্রহণ করিলে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণ খাদ্যের দ্বারাই চলিতে পারে। সম্প্রতি ভাবিয়া দেখা যাউক, এই যবক্ষারজান, আমরা উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ উভয়ের মধ্যে কোন্ প্রকার খাদ্য হইতে গ্রহণ করিতে যুক্তিযুক্তরূপে বাধ্য। আমা-দের শরীরসংস্থান পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের পক্ষে উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ উভয়বিধ খাদ্যগ্রহণই যুক্তিসঙ্গত। ডাক্তার ওয়ালার বলেন, মানবের দন্তপরীক্ষা করিলে জানা যায়, ৪টী বিদারক দন্ত, ৮টী ছেদক দন্ত

এবং ২০টী চর্ব্বণদন্ত আছে। এই বিদারক দন্তকে কুক্কুরীয় দন্ত বলা যায়। ঐ দন্ত মাংসাশী জীবমাত্রেরই থাকে। মাংসাশী ও মাংসাহাররহিত জীবের দন্তের আকার প্রকার পৃথক্ হইয়া থাকে। মানুষের যখন এই মাংসাশন-যোগ্য ও উদ্ভিজ্জভোজনযোগ্য উভয়বিধ দন্তই আছে, তখন মানুষ স্বভাবতঃ উভয়ভোজী। মাংসাহারী জীবের অন্ত্র ক্ষুদ্র এবং উদ্ভিজ্জাহারীর অন্ত্র তদপেক্ষা বৃহৎ, ইহা, পরীক্ষা করিলে অবগত হওয়া যায়। মানুষের অন্ত্র মধ্যমাকার, সুতরাং মানুষ প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উভয়বিধ খাদ্যগ্রহণের অধিকারী। সাধারণতঃ যবক্ষারজান ও অঙ্গারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেই মিশ্রখাদ্য গ্রহণ করা মনুষ্যের সঙ্গত। ইহাঁর মতে মানুষ মাংস ও শস্য সবই খাইবে। আবার মনুষ্যের জাতীয়তা পরীক্ষা করিলে বুঝা যায়, মানুষ ফলভোজী জীব। মাংসাশী জীব মানবের বহু-দূরস্তরে, ও ফলাহারী জীবই মানুষের নিকটস্তরে অবস্থিত, সুতরাং মানবদিগেরও ফলাহারী জীব হওয়া উচিত। বেদানা ইত্যাদি সুফল যথেষ্টরূপ আহার করিলে যে মনুষ্যশরীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুস্থ থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। এখন কোন্ পথে যাই? অত্যধিক শীতপ্রধান মেরুসন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসিগণ প্রায়শ মাংসই ভোজন করে, তথায় শস্য দুর্ল্লভ, কেহ বা মৎস্যই অধিক আহার করে। উষ্ণপ্রধান দেশের লোকে প্রায়ই উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করে। তবে জগতের অধি-কাংশ ব্যক্তি মিশ্রখাদ্য ব্যবহার করে ইহা সঙ্গত কথা। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড্ বিনেটের মতে ক্ষুদ্র জীবের মধ্যেও আমিষাশী এবং উদ্ভিজ্জভোজী এই দুই শ্রেণী প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনের লোক মৎস্য, মাংস, উদ্ভিজ্জ, যাহা পুষ্টিকর, তাহাই খাইয়া থাকে। জাপানবাসীরা শস্য, ফল, মৎস্য, মাংস আহার করে। আইস্‌ল্যাণ্ডবাসীরা প্রায়ই মৎস্যমাংসের দ্বারা জীবন ধারণ করে। সাইবীরিয়ার লোক মৃগমাংস ও মৎস্যই প্রায়শঃ ভোজন করে। নিউবিয়া আবিসীনিয়া প্রভৃতির অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যই মাংস। অষ্ট্রেলিয়ার মানব প্রায়ই আমিষাশী। বর্ত্তমান কালের সভ্যদেশমাত্রেই উভয়বিধ খাদ্যভোজন দৃষ্ট হয়। মেক্সিকোর লোক প্রায়ই নিরামিষ আহার করে। ভারতেরও অনেক স্থলে মৎস্যমাংস ব্যবহৃত

হয় না, কোন কোন স্থানে উভয়বিধ ভোজন দেখা যায়। সুতরাং মানুষ মিশ্রখাদ্য ব্যবহার করিতে অধিকারী। ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

এখন বিবেচনা করা আবশ্যক, মাংসাশী ও উদ্ভিজ্জাশী উভয়বিধ মানবের ক্ষমতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কি না? এতদ্বিষয়ে ডাক্তার পার্কস্ বলেন, "আমিষভোজী ও উদ্ভিজ্জাশী ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আমিষখাদ্য দেহের যে উদ্দেশ্য সাধন করে, উদ্ভিজ্জখাদ্যও তাহাই করিতে পারে। এই উভয়বিধ খাদ্যভোজী ব্যক্তিই সমান পুষ্টি প্রাপ্ত হইতে পারে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ উভয় খাদ্যের মধ্যে আমিষখাদ্য অল্প সময়ে শরীরসংস্কার করে, উদ্ভিজ্জ খাদ্য বিলম্বে ঐ কার্য্য করিয়া থাকে। এ মতের অনুকূলে কোনও প্রত্যক্ষ দৃঢ় প্রমাণ নাই। আমিষভোজী, উদ্ভিজ্জাশী হইতে অধিকপরিশ্রমী তেজস্বী বা বলীয়ান্ বা ক্ষিপ্রকারী হয়, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া মনে করিও না। ইনি আরও বলেন, ভারতবাসী উদ্ভিজ্জভোজী ব্যক্তিরা শিক্ষিত আমিষভুক্ ব্যক্তির কাছে পরাভূত হইবে এমন সম্ভব নহে; যেহেতু পূর্ব্বসিদ্ধান্ত এখনও প্রমাণিত হয় নাই। ডাক্তার স্মিথ্ও বলেন প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উভয়খাদ্যই পরস্পরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন্ খাদ্যের পুষ্টিকারিতা কিরূপ? ইহা স্থির করিতে হইলে অভ্যাসের শরণ লইতে হয়। উভয় খাদ্যই জীবনরক্ষার উপযোগী, তবে এরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে যে, প্রাণিজখাদ্য শারীরিক পরিবর্ত্তন সত্বর ঘটাইতে পারে, আর উদ্ভিজ্জখাদ্য-গ্রহণে শরীরসংস্কার মন্দ মন্দ ভাবে হইতে থাকে। এই মতে মাংসভোজনের কথঞ্চিৎ আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হয়। ডাক্তার লেথবিও মাংসভোজনের অনুকূল মত প্রদান করিয়াছেন। পশ্চাত্যদেশের কোন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কিছুকাল মৎস্যমাংস ত্যাগ করিয়া দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারাও মৎস্যমাংস তেজোবর্দ্ধক একথা প্রমাণিত হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত আলোচনায় অবগত হওয়া যায়, পাশ্চাত্যদেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রাণিজখাদ্য-গ্রহণের উৎকর্ষ অনুমান করেন, কিন্তু অনুকূলে কোনও দৃঢ়তর প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন না। আমিষখাদ্য গ্রহণ করিতেই হইবে ইহা নির্ণীত হয় না।

এখন আমরা দেখিব, নিরামিষাশী ব্যক্তি কোন রূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন কি না। এতৎসম্বন্ধে জ্ঞানগৌরবিত প্রতিভাপ্রদীপ্ত জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত লুইকুন্ বলেন, "প্রাণিজখাদ্য ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জখাদ্য দ্বারা যে সকল বালক বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতি হইয়াছিল। তাহারা সকলেই সদাশয় বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান্। আমাদের আর্য্যশাস্ত্র বলেন, মৎস্যমাংসভোজীর সাত্ত্বিক গুণের হ্রাস এবং রাজসগুণের আধিক্য সংঘটিত হয়। সাত্ত্বিক খাদ্য সত্বগুণবর্দ্ধক, উহার প্রকৃষ্টপরিণাম বুদ্ধির প্রকাশ, ও দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সন্তোষাদি গুণের আবির্ভাব। রাজসগুণের বৃদ্ধিতে ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে অবিমৃশ্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। যে সকল গুণে মানব জনসমাজে দেবতা-জ্ঞানে পূজিত হন, সেই সকল গুণ সাত্ত্বিকতার অন্তর্গত। নিরামিষখাদ্য বলিলে ভারতে কেবল উদ্ভিজ্জখাদ্যই বুঝা হয় না, দুগ্ধাদিকেও বুঝা হয়। আবার অপরদিকে কতিপয় উদ্ভিজ্জখাদ্য অত্যধিক উত্তেজক বলিয়া তাহাদিগকেও আমিষ বলা হয়। সাধারণতঃ মৎস্যমাংসই আমিষ। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উভয়বিধ খাদ্যই সাত্ত্বিকগুণ বৃদ্ধি করে, তবে সকল প্রাণিজ বা সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্যের গুণাগুণ একরূপ নহে। অভ্যাসের পরিবর্ত্তনে শরীরের অস্বাভাবিকতা সংঘটিত হইতে পারে, কাজেই মাংস-ভোজনের চিরাভ্যাস ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত দুর্ব্বল হন, ইহাতে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের দোষ দেখা যায় না। মাংসভোজী সিংহ ব্যাঘ্র ক্ষিপ্রকারী ও তেজস্বী, কিন্তু উদ্ভিদ্‌ভোজী মহিষ বরাহ যে দুর্ব্বল বা অলস ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। উদ্ভিদ্‌ভুক্ সৈনিক ও মাংসাশী সৈনিক উভয়ের মধ্যে কে কত সামর্থ্যের অধিকারী, তাহাও বিবেচ্য। ভারতের মৎস্যমাংসাহারী সম্প্রদায় এখনও শরীরমানসবলে নিরামিষাশীর নিকট পরাজিত। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, নিরামিষাহারই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার একমাত্র কারণ নহে। বস্তুতঃ নিরামিষাহার বংশানুক্রমে অভ্যস্ত ও পরীক্ষিত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য বুঝা যাইবে। পাশ্চাত্য দেশের দ্রব্যগুণ এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই। "অঙ্গারক ঘৃত" যে কেন আর্য্য মহর্ষিগণের প্রিয়বস্তু ছিল, এবং "আয়ুর্বৈ ঘৃতং" বলিয়া তাঁহারা কেন ঘোষণা করিতেন, তাহা

পাশ্চাত্যদেশ বয়োবৃদ্ধির সহিত বুঝিতে পারিবে। ফলমূলাহারী মহর্ষিগণ সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে যে সকল অপূর্ব্বতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, মৎস্যস্ফসফরাস্ গ্রহণে পরিপুষ্টমস্তিষ্ক অধুনাতন পাশ্চাত্যপণ্ডিতমণ্ডলী কয় দিবসে কি সে সকল বুঝিতে পারিয়াছেন? মৎস্য মাংস বিহনে দেহরক্ষা কঠিন, ইহা পাশ্চাত্য মতে প্রমাণ করা গেল না।

আর একটী চিন্তার অবসর এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। কেবল কি দেহরক্ষাই আহারের উদ্দেশ্য? তাহা নয়, আমাদের মানসশক্তিও আহারের দ্বারাই পরিণামে পুষ্টিলাভ করে। আমাদের ধর্ম্মবল মানসিক শক্তির স্ফূর্ত্তি বা বিকাশমাত্র, সুতরাং আহারের সহিত মন, ও ধর্ম্মের একপ্রকার সম্বন্ধও আছে। নিরামিষাশীর ধর্ম্মজ্ঞান অধিক, এবং অন্তঃকরণ অধিক উন্নত একথা বলিতে চাহি না। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে, যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ সুন্দরপ্রকৃতি ও উদারমনা, নিরামিষাহার তাঁহাকে ক্রমশঃ উন্নতস্তরে লইয়া যাইবে, আর আমিষাহার তাঁহাকে অশান্ত করিবে। ধর্ম্মের প্রসঙ্গে পুণ্যপুঞ্জ মহর্ষিমণ্ডলীর জন্মভূমি ভারতের অধিবাসিগণ অন্য দেশের নিকট উপদেশ লইয়া কদাচ শান্তি লাভ করিতে পারিবেনা। ভারত চিরদিন ধর্ম্মবলে উন্নত, চিরদিন ধর্ম্মবলে বলী ছিল। তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, ভারতে মূর্ত্তিমতী ছিলেন। শান্ত, সহিষ্ণু ভারত আসুরবলে ও পাশববলে বলী হইতে পারে না। নিত্য মাংসভোজন ভারতকে উচ্ছৃঙ্খল করিবে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও শান্ত সুন্দর ধার্ম্মিকও সাত্ত্বিক করিবে এরূপ মনে হয় না। ধর্ম্মহীন, ও নীতিহীন বল বিফল, ধর্ম্মহীন জীবন মরণসমান। সর্ব্বদা মৎস্যমাংস গ্রহণে ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি পাইবে বা সাত্ত্বিকগুণ বৃদ্ধি পাইবে ইহা সম্ভব নহে। প্রাচীন ভারতবাসী একেবারে মৎস্যমাংস গ্রহণ করিতেন না, বা হিন্দুশাস্ত্রে মৎস্যমাংসগ্রহণ অবৈধ, এরূপ মতে আমাদের আস্থা নাই। বৈদিক সময়ে ভারতে পশুমাংস গ্রহণ প্রচলিত ছিল। মেষ, গো ইত্যাদি পশুমাংস ব্যবহৃত হইত। গৃহ্যসূত্রে গোমাংসব্যবহার প্রচলিত থাকার সংবাদ আছে, কিন্তু আতিথ্যকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম, ও বিবাহ এই তিন স্থানে মাত্র উহার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইত। শ্রাদ্ধে মৃগমাংস ব্যবহৃত হইত। দেবতা ও পিতৃপুরুষের

তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে মৎস্য মাংস ব্যবহৃত হইলে দোষাবহ হইত না। বিনাকারণে কেবল ভক্ষণার্থে মৎস্যমাংসগ্রহণের ব্যবস্থা মন্বাদিস্মৃতিশাস্ত্রে নাই। হব্য কব্য জন্য অবশ্য ব্যবহৃত হইবার কথা সর্ব্বত্র হিন্দুশাস্ত্রে আছে। হিন্দু-চিকিৎসাগ্রন্থে মৎস্যমাংসের বহুল গুণের উল্লেখ আছে। রোগবিশেষে, অবস্থাবিশেষে, মৎস্যমাংস অত্যাবশ্যক খাদ্য ইহাও উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ সর্ব্বদা মৎস্য মাংস ব্যবহারে রাজসগুণ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, মৎস্যমাংস আর্য্যগণ অধিক পছন্দ করিতেন না। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন। রণরঙ্গমত্ত সৈনিকের রজোগুণবৃদ্ধি আবশ্যক, সুতরাং মৎস্যমাংসাদি রাজস-আহারযোগ্য। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে স্থানে স্থানে মৎস্যমাংস ব্যবহারের বিধি পাওয়া যায়, তাহাও অধিকারিবিশেষের নিজস্ব বলিয়া মনে করি। শমপর ব্যক্তির পক্ষে রাজস মৎস্যমাংস অনাবশ্যক,সুতরাং অনাহার্য্য। দেশীয় অবস্থা, শরীরভাব, বুঝিয়া আহার করাই সঙ্গত। এ দেশের লোকের জীবনরক্ষার্থ আমিষগ্রহণ সকল অবস্থাতেই দোষাবহ ইহাও অযৌক্তিক। আহার রুচির অধীন, রুচি হিন্দুমতে পূর্ব্বজন্মের প্রকৃতির অনুগত। যাহার প্রকৃতি মৎস্যমাংস চাহে, সে খাইবে; আবার নিবৃত্তির দয়ায় যথাসময়ে আপনা হইতেই পরিত্যাগ করিবে। ফলতঃ মৎস্যমাংস শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত অন্যদা গ্রহণ করিলে ভারতবাসী ক্রমশঃ ধর্ম্মের নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের অনধিকারী হইতে থাকিবেন। আবার ইহাও চিন্তার যোগ্য, যাহাতে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতেই হইতে পারে। ধর্ম্মভিন্ন অন্য কিছুতেই ভারতবাসীর উদরের জ্বালা জুড়াইবে না। স্বধর্ম্মপথে অগ্রসর হইলে ভারতবাসী প্রকৃত শান্তির অধিকারী হইবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ ও উপদেশ মতে আপন আপন ভূমিকায় মৎস্যমাংস গ্রহণ অবিধেয় নহে, তবে অনুচিত ক্ষেত্রে অনাদিষ্ট অবস্থায় অত্যন্ত অনুচিত, ইহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী
যশোহর বেদবিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ভুলিব কেমনে?

তার সেই মুখখানি ভুলিব কেমনে !
সমভাবে দিবানিশি জাগিতেছে মনে ;
পারিনা ভুলিতে তারে,
নিসর্গের চারিধারে,
সহস্র প্রতিমা তার নিরন্তর জাগে ;
হৃদয় উদ্বেল হয় দেখি অনুরাগে ।
সে যে চিত্র চিরন্তন,
নাহি হয় পুরাতন,
সতত নূতন পূর্ণচন্দ্রের মতন—
—কিম্বা ফুল্ল কমলিনী কুসুমরতন—
বিকসিত ফুলদল
করে যবে ঢলঢল
বদন কমল তার পড়ে মোর মনে ;—
তার সেই মুখখানি ভুলিব কেমনে !
যে দিকে ফিরাই আঁখি
সোনার লাবণ্য মাখি
ঈষৎ ঘোমটা ঢাকি সস্মিত বদনে
বিম্বিত সে বিম্বাধর মানস-দর্পণে ।
ঝঙ্কারিয়া দশ দিক
কলকণ্ঠে কহে পিক,
"এস এস প্রাণাধিক প্রমোদ কাননে ।"
শুনি' হাসে ফুলরাণী মৃণাল আসনে ।
সুষমা সৌন্দর্য্যরাশি
সেখানে তাহার হাসি—
মুখখানি আসি তার জাগে মোর মনে
আমি ভালবাসি তারে ভুলিব কেমনে ।

শ্রীপঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় বি,এ ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ । [২য় সংখ্যা

সাহিত্য-সংহিতা ।

('সাহিত্য-সভার' মাসিক পত্রিকা) ।

সম্পাদক
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস,

"SAHITYA SABHA."

PATRON :—
The Hon'ble Sir JOHN WOODBURN, M. A.,
K. C. S. I., C. S., &c., &c.
Lieutenant-Governor of Bengal.

মহামান্য বঙ্গেশ্বর বাহাদুর, সার জন্ উড্‌বরন্, এম্, এ,
কে, সি, এস্, আই, সি, এস্, মহোদয়
"সাহিত্য-সভার" অভিভাবক হইয়াছেন ।

কলিকাতা
১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রকাশিত ।
২০।১ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, আলফ্রেড প্রেসে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত ।

☞ "সাহিত্য-সভার" সভ্যেরা বিনা মূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন ।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনরচিত দানসাগর গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহিত সাহিত্য-সংহিতায় মুদ্রিত হইতেছে। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রিমমূল্য প্রেরণ করিয়া সংহিতার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

২। ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলীসহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সটীক ও সানুবাদ মুদ্রিত হইতেছে। অর্দ্ধাংশের অধিক মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুগণ নাম ধাম পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৩। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ দেয় অগ্রিমমূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৪। সভার সভ্যগণ ও সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ টাকাকড়ি, প্রবন্ধ ও পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ।
সাহিত্য-সভার সহযোগী সম্পাদক।
১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক।
১।	ধর্ম্মপদের মূল ও ব্যাখ্যা	শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র বসু।	৬৫
২।	ঈশ্বরতত্ত্ব	,, ,, আশুতোষ দেব এম,এ।	৭৬
৩।	মুক্তা ও শঙ্খ	,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।	৯০
৪।	হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান	,, পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	১১০
৫।	দানসাগর	,, ,, ,,	১২১

☞ প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

সাহিত্য-সংহিতা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯, জ্যৈষ্ঠ। [২য় সংখ্যা।

অরহন্তবগ্‌গো সত্তমো।

গদদ্ধিনো বিসোকস্‌স বিপ্পমুত্তস্‌স সব্বধি।
সব্বগন্থপহীণস্‌স পরিলাহো ন বিজ্জতি ॥ ১॥

অন্বয়,—গদদ্ধিনো বিসোকস্‌স সব্বধি বিপ্পমুত্তস্‌স সব্বগন্থপহীণস্‌স (জনস্‌স) পরিলাহো ন বিজ্জতি।

সংস্কৃত,—গতাধ্বনঃ, বিশোকস্য, 'সর্ব্বধা' বিপ্রমুক্তস্য সর্ব্বগ্রন্থপ্রহীণস্য জনস্য পরিদাহো (দুঃখম্) ন বিদ্যতে।

'সব্বধি'—অর্থাৎ 'সর্ব্বপ্রকারে' 'সর্ব্ববিষয়ে' এই শব্দটীর সংস্কৃত প্রতিবাক্য Childers দিতে পারেন নাই। 'সর্ব্বধা' র সহিত ইহার কতক সাদৃশ্য আছে। এজন্য উহাই দেওয়া গেল।

অনুবাদ,—যাঁহার পথ চলা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছেন, যিনি বিগতশোক হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহার সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার কোন দুঃখ নাই।

উয্যুঞ্জন্তি সতীমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে।
হংসা ব পল্ললং হিত্বা ওকমোকং জহন্তি তে ॥ ২॥

অন্বয়,—তে সতীমন্তো উয্যুঞ্জন্তি, নিকেতে ন রমন্তি; পল্ললং হিত্বা হংসা ব তে ওকমোকং জহন্তি।

সংস্কৃত,—তে 'স্মৃতিমন্তঃ' (একাগ্রমনসঃ সন্তঃ) উদ্যুঞ্জন্তি (ধর্ম্মাভ্যাসে উদ্যোগিনো ভবন্তি), নিকেতে (আবাসে) ন রমন্তে, (মোদন্তে, মুদমাপ্নুবন্তি),

(পরন্ত) পল্লং হিত্বা (প্রস্থিতা ইতি শেষঃ) হংসা ইব তে (অর্হন্তঃ) ওক-মোকং জহতি (ত্যজন্তি)।

'সতীমন্তো'—'স্মৃতি' শব্দের পালি ভাষায় সাধারণ অর্থ ব্যতীত কয়েক প্রকার অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে 'একাগ্রতা, মনোযোগ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুবাদ,—তাঁহারা একাগ্রমনে ধর্ম্মাভ্যাসে নিরত রহেন, গৃহেতে সুখ পান না; হংসগণ যেমন পুষ্করিণী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহারা সেইরূপ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান।

যেসং সন্নিচয়ো নত্থি যে পরিঞ্ঞাতভোজনা।
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো।
আকাসেব সকুন্তানং গতি তেসং দুরন্নয়া ॥৩॥

অন্বয়,—যেসং সন্নিচয়ো নত্থি, যে পরিঞ্ঞাতভোজনা, সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো, আকাশে সকুন্তানং ব তেসং গতি দুরন্নয়া।

সংস্কৃত,—যেষাং সন্নিচয়ঃ (অর্থসঞ্চয় ইত্যর্থঃ) নাস্তি, যে 'পরিজ্ঞাত-ভোজনাঃ', শূন্যতা (শূন্যতারূপঃ, বিমোক্খো ইত্যস্য বিধেয়বিশেষণম্) অনিমিত্তশ্চ বিমোক্ষশ্চ যেষাংগোচরঃ, আকাশে শকুন্তানাং ইব তেষাং গতিঃ দুরন্বয়া।

'পরিঞ্ঞাতভোজনা'—বৌদ্ধধর্ম্মে ভোজনবিষয়ে তিনটী 'পরিঞ্ঞা (পরিজ্ঞা) কথিত হইয়াছে।

'ঞাণপরিঞ্ঞা' (জ্ঞানপরিজ্ঞা) অর্থাৎ আহারের জাতিবিষয়ক জ্ঞান; 'তীরণ পরিঞ্ঞা' (তীরণপরিজ্ঞা) অর্থাৎ বাহ্য আহার অতি নীচ ও অপবিত্র এই জ্ঞান; 'পহানপরিঞ্ঞা' (প্রহাণপরিজ্ঞা) অর্থাৎ আহারে সকল সুখ ত্যাগ করিতে হইবে এই জ্ঞান। যিনি এই তিন প্রকার জ্ঞানের সহিত ভোজন করেন, তিনি 'পরিজ্ঞাতভোজন।'

অনুবাদ,—যাঁহার অর্থসঞ্চয় নাই, যিনি 'পরিজ্ঞা'ত্রয়ের সহিত ভোজন করেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁহার গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে পক্ষিগণের গতি যেমন নিরূপণ করা যায় না, তাঁহাদিগের গতিও সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না।

যস্সাসবা পরিক্খীণা আহারে চ অনিস্সিতো।
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো।
আকাসেব সকুন্তানং পদং তস্স দুরন্নয়ং ॥৪॥

অন্বয়,—যস্স আসবা পরিক্খীণা, (যো) চ আহারে অনিস্সিতো, সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্স গোচরো, আকাশে সকুন্তানং ব তস্স পদং দুরন্নয়ং।

সংস্কৃত,—যস্য 'আসবাঃ' (কামাদিদোষাঃ) পরিক্ষীণাঃ, যশ্চ 'আহারে' অনিশ্চিতঃ, শূন্যতা অনিমিত্তশ্চ বিমোক্ষঃ যস্য গোচরঃ, আকাশে শকুন্তানামিব তস্য পদং দুরন্বয়ম্।

'আহারে অনিস্সিতো'—'আহার' চারি প্রকার। 'কবলিঙ্কারো' অর্থাৎ খাদ্য; 'ফস্সো' (স্পর্শঃ), 'মনোসঞ্চেতনা' (মনঃসঞ্চেতনা) অর্থাৎ চিন্তা; এবং 'বিঞ্ঞানম্' অর্থাৎ সংজ্ঞা।

অনুবাদ,—যাঁহার কামাদি দোষসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি 'আহার'-চতুষ্টয়ের বশীভূত নহেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁহার গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে পক্ষিগণের গতি যেমন দুর্জ্ঞেয়, তাঁহার গতিও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়।

যস্সিন্দ্রিয়ানি সমথং গতানি অস্সা যথা সারথিনা সুদন্তা।
পহীণমানস্স অনাসবস্স দেবাপি তস্স পিহয়ন্তি তাদিনো ॥৫॥

অন্বয়,—সুদন্তা অস্সা সারথিনা যথা যস্স ইন্দ্রিয়ানি (তথা) সমথং গতানি, তাদিনো পহীনমানস্স অনাসবস্স তস্স দেবাপি পিহযন্তি।

সংস্কৃত,—সুদান্তা অশ্বাঃ সারথিনা যথা যস্য ইন্দ্রিয়াণি (তথা) 'শমথং' (শান্ততামিত্যর্থঃ) গতানি, তাদৃশঃ প্রহীণমানস্য গতাভিমানস্য অনাসবস্য নিষ্কলুষস্য তস্য জনস্য ভাগ্যং দেবা অপি স্পৃহয়ন্তি।

অনুবাদ,—সারথি যেমন অশ্বগণকে দমন করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করিয়াছেন, তাদৃশ নিরভিমান নিষ্কলুষ পুরুষকে দেবতারাও ঈর্ষ্যা করেন।

পঠবীসমো নো বিরুজ্ঝতি ইন্দখীলুপমো তাদি সুব্বতো।
রহদো ব অপেতকদ্দমো সংসারা ন ভবন্তি তাদিনো ॥৬॥

অন্বয়,—তাদি্স সুব্বতো পঠবীসমো ইন্দখীলুপমো নো বিরুজ্ঝতি, (সো) অপেতকদ্দমো রহদো ব, তাদিনো সংসারা ন ভবন্তি।

সংস্কৃত,—তাদৃক্ সুব্রতঃ 'পৃথিবীসমঃ' 'ইন্দ্রকীলোপমঃ' নো বিরুধ্যতে (শুভাশুভয়োঃ মানাপমানয়োশ্চ বিরোধিনঃ ন ভবন্তীত্যর্থঃ); স অপেতকর্দ্দমঃ হ্রদইব (নির্ম্মলঃ শান্তশ্চ ভবতি), তাদৃশঃ অর্হতঃ সংসারাঃ (জন্মানি ইত্যর্থঃ) ন ভবন্তি।

'পঠবীসমো' 'ইন্দখীলুপমো'—'পৃথিবীর সমান' ও 'ইন্দ্রকীলোপম' বলিলে সচরাচর 'ধৈর্য্যশালী' ও 'দৃঢ়' এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে; কিন্তু বুদ্ধঘোষ অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যেমন লোকে পৃথিবীর উপর পবিত্র গন্ধমাল্যাদি নিক্ষেপ করে, অপবিত্র মূত্রপুরীষাদিও নিক্ষেপ করে, অথবা যেমন বালকাদি নগরদ্বারে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রকীলে মূত্র বা মলত্যাগ করে, ও অপর কেহ প্রণত হইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা তাহার সৎকার করে, তথাপি যেমন তাহাতে পৃথিবীর এবং ইন্দ্রকীলের অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই জন্মে না; * * * সেইরূপ ক্ষীণকল্মষ ভিক্ষু * * 'ইহারা খাদ্যবস্ত্রাদি দ্বারা আমার সৎকার করিল, এবং ইহারা তাহা করিল না' এই ভাবিয়া সৎকারকারী বা অসৎকারকারীর উপর সন্তুষ্ট বা বিরোধী হন না।" সুতরাং সাধু ভিক্ষুগণকে পৃথিবীর সহিত ও ইন্দ্রকীলের সহিত তুলনা করায়, তাঁহারা শুভ ও অশুভে অধিকারী এবং শত্রুমিত্রে সমভাবাপন্ন, এই অর্থই বুঝাইতেছে।

অনুবাদ,—তাদৃশ সুব্রত পুরুষ পৃথিবী এবং ইন্দ্রকীলের ন্যায় শুভাশুভে ও শত্রুমিত্রে সমভাবাপন্ন, তাঁহারা পঙ্কহীন হ্রদের ন্যায় নির্ম্মল এবং শান্ত। তাদৃশ ব্যক্তিকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।

সন্তং তস্স মনং হোতি সন্তা বাচা চ কম্মঞ্চ।
সম্মদঞ্ঞাবিমুত্তস্স উপসন্তস্স তাদিনো ॥৭॥

অন্বয়,—সম্মদঞ্ঞাবিমুত্তস্স উপসন্তস্স তাদিনো তস্স মনং সন্তং হোতি। বাচা চ সন্তা (হোতি) কম্মঞ্চ (সন্তং হোতি)।

সংস্কৃত,—সম্যগাজ্ঞয়া সম্যক্‌জ্ঞানেন বিমুক্তস্য উপশান্তস্য তাদৃশঃ তস্য অর্হতঃ মনঃ শান্তং ভবতি, বাক্ চ শান্তা ভবতি কর্ম্ম চ শান্তং ভবতি।

অনুবাদ,—সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত তাদৃশ প্রশান্ত পুরুষগণের (অর্হদ্‌গণের) চিত্ত প্রশান্ত হয়, বাক্য শান্ত হয়, এবং কর্ম্মও শান্ত হইয়া যায়।

অস্সদ্ধো অকতঞ্ঞূ চ সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো।
হতাবকাসো বন্তাসো সবে উত্তমপোরিসো ॥৮॥

অন্বয়,—যো নরো অস্সদ্ধো অকতঞ্ঞূ চ সন্ধিচ্ছেদো চ হতাবকাসো বন্তাসো (সিয়া) স বে উত্তমপোরিসো (সিয়া)।

সংস্কৃত,—যো নরঃ অশ্রদ্ধঃ, অকৃতজ্ঞঃ, সন্ধিচ্ছেদঃ, চ হতাবকাশঃ বান্তাশঃ স্যাৎ স বৈ উত্তমপুরুষঃ স্যাৎ।

'অশ্রদ্ধঃ'—'অশ্রদ্ধ' শব্দ এখানে ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 'শ্রদ্ধা' বলিলে সাধারণতঃ 'ধর্ম্মাদিতে বিশ্বাস' বুঝায়। কিন্তু এখানে শ্রদ্ধা শব্দ মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে শ্রদ্ধা শব্দে 'সহজে যে কোন বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন' (credulity) এই অর্থ বুঝাইতেছে। উহা অস্থিরমতিত্বের লক্ষণ সন্দেহ নাই। সুতরাং 'অস্সদ্ধো' শব্দের অর্থ, অন্য শব্দের অভাবে, 'স্থিরমতি' বলা যাইতে পারে।

'অকতঞ্ঞূ'—'অকৃতজ্ঞ' শব্দ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, 'অকৃত' কি না "যাহা কাহারও দ্বারা কৃত হয় নাই' অর্থাৎ 'যাহা অনন্তকালস্থায়ী', সুতরাং 'নির্ব্বাণ।' যিনি নির্ব্বাণকে জানিয়াছেন, তিনিই 'অকৃতজ্ঞ।'

'সন্ধিচ্ছেদো'—'সন্ধি' শব্দের অর্থ 'বন্ধন' করা যাইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধঘোষ 'সন্ধি' শব্দের অর্থ 'সংসার সন্ধি' (অর্থাৎ 'সংসারে পুনরাবর্ত্তন' বা পুনর্জন্ম) করিয়াছেন।

'হতাবকাসো'—'অবকাশ' অর্থে "ভাল মন্দের, কুশলাকুশলের অবকাশ।' তাহা যিনি নাশ করিয়াছেন, তিনি। 'হতাবকাশ।" অর্থাৎ যিনি ভালমন্দের অতীত।

'বন্তাসো'—'বান্তাশঃ' অর্থাৎ 'যাঁহার সকল বাসনা ফুরাইয়াছে।'

অনুবাদ,—যিনি সহজে হঠাৎ যে কোন বিষয়ে বিশ্বাস করেন না, যিনি নির্ব্বাণতত্ত্ব জানিয়াছেন, যিনি সংসারাবর্ত্তন ছিন্ন করিয়াছেন, যিনি সদসতের হাত হইতে এড়াইয়াছেন (?), যাঁহার সকল বাসনাই ফুরাইয়াছে, তিনিই যথার্থ সাধুপুরুষ।

গামে বা যদি বা রঞ্ঞে নিন্নে বা যদি বা থলে।
যত্থারহন্তো বিহরন্তি তং ভূমিং রামণেয্যকং ॥৯॥

অন্বয়,—গামে বা যদি বা অরঞ্ঞে নিন্নে বা যদি বা থলে, যত্থ অরহন্তো বিহরন্তি, তং ভূমিং রামণেয্যকং।

সংস্কৃত,—গ্রামে বা যদিবা অরণ্যে 'নিম্নে' বা যদি বা স্থলে, যত্র অর্হন্তঃ বিহরন্তি, সা ভূমিঃ রমণীয়া।

'নিন্নে'—'নিম্নে' অর্থাৎ 'গভীরজলমধ্যে।'

অনুবাদ,—গ্রামে কি অরণ্যে, গভীর জলমধ্যে কি শুষ্ক স্থানে, যেখানে অর্হতেরা থাকেন, সেই ভূমি রমণীয়।

রমণীয়ানি অরঞ্ঞানি যত্থ ন রমতী জনো।
বীতরাগা রমিস্সন্তি ন তে কামগবেসিনো ॥১০॥

অন্বয়,—অরঞ্ঞানি রমণীয়ানি; যত্থ জনো ন রমতী, (তত্থ) বীতরাগা রমিস্সন্তি (যস্মা) তে ন কামগবেসিনো।

সংস্কৃত,—অরণ্যানি রমণীয়ানি; যেষু জনো ন রমতে; তেষু বীতরাগাঃ রংস্যন্তে, যস্মাৎ তে ন কামগবেষিণঃ কামান্বেষিণঃ।

অনুবাদ,—অরণ্য সকল রমণীয়; যেখানে লোকে আনন্দ পায় না, উদাসীন ব্যক্তিগণ সেইখানে সুখ পাইয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা কামান্বেষী নহেন।

অরহন্তবগ্গো সত্তমো ॥

সহস্সবগ্গো অট্ঠমো।

সহস্সমপি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা।
একং অত্থপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি ॥১॥

অন্বয়,—অনত্থপদসংহিতা বাচা সহস্সমপি চে সিয়া, (তথাপি) অত্থপদং একং (বাচা) সেয্যো, যং সুত্বা উপসম্মতি।

সংস্কৃত,—অনর্থপদসংহিতা বাচঃ সহস্রমপি চেৎ স্যুঃ, তথাপি একং অর্থপদং বাক্যং শ্রেয়ঃ, যৎ শ্রুত্বা উপশাম্যতি।

অনুবাদ,—নিরর্থশব্দসমন্বিত বাক্য সহস্রসংখ্যক হইলেও, একটী অর্থপূর্ণ বাক্য তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা শুনিলে লোকে শান্ত হইয়া যায়।

সহস্সমপি চে গাথা অনত্থপদসংহিতা।
একং গাথাপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি ॥২॥

অন্বয়,—অনত্থপদসংহিতা গাথা সহস্সমপি চে (সিয়া) (তথাপি) একং গাথাপদং যং সুত্বা উপসম্মতি তং সেয্যা।

সংস্কৃত,—অনর্থপদসংহিতা গাথাঃ সহস্রমপি চেৎ স্যুঃ, তথাপি একং গাথাপদং যৎ শ্রুত্বা জন উপশাম্যতি তৎ শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—নিরর্থপদসংযুক্ত গাথা সহস্রসংখ্যক হইলেও একটী গাথাপদ, যাহা শুনিলে লোকে শান্ত হইয়া যায়, তাহা শ্রেষ্ঠ।

যো চ গাথা সতং ভাসে অনত্থপদসংহিতা।
একং ধম্মপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি ॥৩॥

অন্বয়,—যো চ অনত্থপদসংহিতা গাথা সতং ভাসে (তস্স) একং ধম্মপদং; যং সুত্বা উপসম্মতি, তং সেয্যো।

সংস্কৃত,—যশ্চ, অনর্থপদসংহিতা গাথাঃ শতং ভাষেত, তস্য একং ধর্ম্মপদং, যৎ শ্রুত্বা উপশাম্যতি, তৎ শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—যে অনর্থপদসংযুক্ত শত গাথা (শ্লোক) বলে, তাহার পক্ষে একটী ধর্ম্মপদ, যাহা শুনিলে লোকে শান্ত হইয়া যায়, তাহা শ্রেষ্ঠ।

যো সহস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে।
একঞ্চ জেয্যমত্তানং সবে সঙ্গামজুত্তমো ॥৪॥

অন্বয়,—যো (একো) সঙ্গামে সহস্সেন (গুণিতং) সহস্সং মানুসে জিনে, যো চ একমত্তানং জেয্য, সবে সঙ্গামজুত্তমো।

সংস্কৃত,—যঃ (একঃ) সংগ্রামে সহস্রেণ গুণিতং সহস্রং মানুষান্ জয়েৎ, যশ্চ একমাত্মানং জয়েৎ, স বৈ সংগ্রামোত্তমঃ (সংগ্রামজেতৃণামুত্তমঃ)।

অনুবাদ,—যদি কেহ যুদ্ধে সহস্রগুণ সহস্র ব্যক্তিকে জয় করে, এবং অপর কেহ কেবল আপনাকে জয় করেন, তবে তিনিই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।

অত্তা হবে জিতং সেয্যো যা চায়ং ইতরা পজা।
অত্তদন্তস্স পোসস্স নিচ্চং সঞ্ঞতচারিনো ॥৫॥
নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো সহ ব্রহ্মুনা।
জিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপসস জন্তুনো ॥৬॥

অন্বয়,—যা চায়ং ইতরা পজা (জিতায় তায়) জিতো অত্তা বে সেয্যো; অত্তদন্তস্স নিচ্চং সঞ্ঞতচারিনো তথারূপস্স (জন্তুনো) পোসস্স জিতং নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো ব্রহ্মূনা সহ অপজিতং কয়িরা।

সংস্কৃত,—যা চেয়ং ইতরা প্রজা (জিতায়াঃ তস্যাঃ) জিতঃ আত্মা বৈ শ্রেয়ান্; দান্তাত্মনঃ নিত্যং সংযতচারিণঃ তথারূপস্য (জন্তোঃ) পুরুষস্য জিতং (জয়মিত্যর্থঃ) নৈব দেবো অপজিতং কুর্য্যাৎ, ন গন্ধর্ব্বঃ ন ব্রহ্মণা সহ মারশ্চ।

তথারূপস্স জন্তুনো—এই দুইটী শব্দ অসংলগ্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

অনুবাদ,—সাধারণ লোককে জয় করা অপেক্ষা আপনাকে জয় করা শ্রেষ্ঠ; যিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা সংযতভাবে বিচরণ করেন, সেই পুরুষের জয়কে পরাজয়ে পরিণত করিতে দেবতাও পারেন না, গন্ধর্ব্বও পারেন না, ব্রহ্মাও পারেন না, মারও পারে না।

মাসে মাসে সহস্সেন যো যজেথ সতং সমং।
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে।
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্সসতং হুতং ॥৭॥

অন্বয়,—যো সতং সমং মাসে মাসে সহস্সেন যজেথ, (যো) চ একং ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে; যঞ্চে বস্সসতং হুতং (তস্মা) সা যেব পূজনা সেয্যো।

সংস্কৃত,—যঃ শতং সমাঃ মাসে মাসে সহস্রেণ যজেত, যশ্চ একং ভাবিতাত্মানং মুহূর্ত্তমপি পূজয়েৎ; যৎ বর্ষশতং হুতং (তস্মাৎ) সা এব পূজনা শ্রেয়সী।

অনুবাদ,—যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া সহস্র পদার্থ দ্বারা মাসে মাসে যজ্ঞ করে, এবং অন্য কেহ একজন ধর্ম্মপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে মুহূর্ত্তমাত্রও পূজা করে; তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।

যো চ বস্সসতং জন্তু অগ্গিং পরিচরে বনে।
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে।
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্সসতং হুতং ॥৮॥

অন্বয়,—যো চ জন্তু বনে অগ্গিং বস্সসতং পরিচরে, (অপরো) চ (কোপি) ভাবিতত্তানং একং মুহুত্তমপি পূজয়ে, যঞ্চে বস্সসতং হুতং (তস্মা) সা যেব পূজনা সেয্যো।

সংস্কৃত,—যশ্চ জন্তুঃ (জন ইত্যর্থঃ) বনে অগ্নিং বর্ষশতং পরিচরেৎ, অপরশ্চ কোঽপি ভাবিতাত্মানমেকং মুহূর্ত্তমপি পূজয়েৎ, যৎ বর্ষশতং হুতং, (তস্মাৎ) সৈব পূজনা (একস্য ভাবিতাত্মনঃ পূজা) শ্রেয়সী।

অনুবাদ,—যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া বনে অগ্নিদেবের পরিচর্য্যা করেন, এবং অন্য কেহ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনকেও মুহূর্ত্তমাত্র পূজা করেন, তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।

যং কিঞ্চি য়িঠ্ঠং ব হুতং ব লোকে সংবচ্ছরং যজেথ পুঞ্ঞপেক্খো।
সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি অভিবাদনা উজ্জুগতেসু সেয্যো ॥৯॥

অন্বয়,—পুঞ্ঞপেক্খো (পোসো) লোকে যং কিঞ্চি যিঠ্ঠং বহুতং ব সংবচ্ছরং যজেথ, সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি, উজ্জুগতেসু অভিবাদনা সেয্যো।

সংস্কৃত,—পুণ্যাপেক্ষঃ (পুরুষঃ) লোকে পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিৎ ইষ্টং বা হুতং বা সংবৎসরং (ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ) যজেত, সর্ব্বমপি তৎ ন চতুর্ভাগমেতি (অর্হতীত্যর্থঃ), ঋজুগতানাম্ (সরলপ্রকৃতীনাং সাধূনাম্) অভিবাদনা শ্রেয়সী।

অনুবাদ,—পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইহলোকে সংবৎসর ধরিয়া যাহা কিছু যাগ কিম্বা হোম করেন, সে সকলের মূল্য চতুর্থাংশও নহে, সরলপ্রকৃতি সাধুগণের অভিবাদনা অনেক শ্রেষ্ঠ।

অভিবাদনসীলিস্‌স নিচ্চং বদ্ধাপচায়িনো।

চত্তারো ধম্মা বড্‌ঢন্তি আয়ু বণ্ণো সুখং বলং ॥১০॥

অন্বয়,—অভিবাদনসীলস্‌স ইত্যাদি।

সংস্কৃত,—অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধাপচায়িনঃ, চত্বারো 'ধর্ম্মা' বর্দ্ধন্তে আয়ুঃ বর্ণঃ সুখং বলম্‌।

অনুবাদ,—যিনি সর্ব্বদা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অভিবাদন ও সম্মান করেন, তাঁহার আয়ুঃ বর্ণ, সুখ এবং বল এই চারিটী পদার্থ বর্দ্ধিত হয়।

যো চ বসসসতং জীবে দুস্‌সীলো অসমাহিতো।

একাহং জীবিতং সেয্যো সীলবন্তস্‌স ঝায়িনো ॥১১॥

অন্বয়,—যো দুস্‌সীলো অসমাহিতো (সন্তো) বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) সীলবন্তস্‌স ঝায়িনো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত,—যঃ দুঃশীলোঽসমাহিতঃ (সন্‌) বর্ষশতং জীবেৎ, তস্য জীবিতাৎ শীলবতঃ ধ্যায়িন একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—যে, দুশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা চরিত্রবান্‌ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে দুপ্পঞ্‌ঞো অসমাহিতো।

একাহং জীবিতং সেয্যো পঞ্‌ঞবন্তস্‌স ঝায়িনো ॥১২॥

অন্বয়,—যো দুপ্পঞ্‌ঞো অসমাহিতো (সন্তো) বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) পঞ্‌ঞবন্তস্‌স ঝায়িনো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত,—যঃ দুষ্প্রজ্ঞঃ অসমাহিতঃ (সন্‌) বর্ষশতং জীবেৎ, (তস্য জীবিতাৎ) প্রজ্ঞাবতঃ ধ্যায়িন একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—যে, প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা প্রজ্ঞাবান্‌ ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির একদিবসের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে কুসীতো হীনবীরিয়ো।

একাহং জীবিতং সেয্যো বিরিয়মারভতো দল্‌হং ॥১৩॥

অন্বয়,—যো কুসীতো হীনবীরিয়ো (সন্তো) বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) দল্‌হং বীরিয়ং আরভতো (পোসস্‌স) একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত,—যঃ কুসীদঃ হীনবীর্য্যঃ (সন্‌) বর্ষশতং জীবেৎ, (তস্য জীবিতাৎ) দৃঢ়ং বীর্য্যমারভমানস্য (জনস্য) একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—যে অলস ও হীনবীর্য্য হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য্য ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং উদয়ব্যয়ং।

একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো উদয়ব্যয়ং ॥১৪॥

অন্বয়,—যো চ উদয়ব্যয়ং অপস্‌সং বস্‌সতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) উদয়-ব্যয়ং পস্‌সতো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত,—যশ্চ উদয়ব্যয়ৌ অপশ্যন্‌ বর্ষশতং জীবেৎ, তস্য জীবিতাৎ উদয়ব্যয়ৌ পশ্যত একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

'উদয়ব্যয়ং'—'উদয়' অর্থে 'জন্ম,' 'আরম্ভ'; এবং 'ব্যয়' অর্থে 'মৃত্যু' 'শেষ।'

অনুবাদ,—যে আদি ও অন্ত (জন্মমৃত্যু) না দেখিয়া শত বর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা আদ্যন্তদর্শী পুরুষের একদিনের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং অমতং পদং।

একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো অমতং পদং ॥১৫॥

অন্বয়,—যো চ অমতং পদং অপস্‌সং বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) অমতং পদং পস্‌সতো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত,—যশ্চ অমৃতং পদং অপশ্যন্‌ বর্ষশতং জীবেৎ, তস্য জীবিতাৎ অমৃতং পদং পশ্যত একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—যে অমৃতপদ (মহানির্ব্বাণপদ) না দেখিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদদর্শনকারী পুরুষের এক দিবসের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং ধম্মমুত্তমং।

একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো ধম্মমুত্তমং ॥১৬॥

সহস্‌সবগ্‌গো অট্ঠমো।

অন্বয়,—যো চ ধম্মমুত্তমং অপস্‌সং বস্‌সসতং জীবে, (তস্‌স জীবিতা) ধম্মমুত্তমং পস্‌সতো একাহং জীবিতং সেয্যো।

সংস্কৃত,—যশ্চ ধর্ম্মমুত্তমং অপশ্যন্ বর্ষশতং জীবেৎ, (তস্য জীবিতাৎ) ধর্ম্মমুত্তমং পশ্যত একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—এবং যে উত্তম ধর্ম্ম না বুঝিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি উত্তম ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহার এক দিবসের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

---

(২)

ঈশ্বর তত্ত্ব।

(গুরুশিষ্যের কথোপকথন)

শিষ্য। আপনি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকে কি তবে মিথ্যা বলেন ?

গুরু। আমিত' তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহারা অপরা বিদ্যা। উহাদিগের দ্বারা সাধারণ লোকের মনে অনেক সংশয়ের উদয় হয়। ঐরূপ সংশয়ের কারণ এই যে সাধারণ লোক ভেদজ্ঞান পূর্ণ, সুতরাং তাহাদের যেমন জ্ঞান ও যেমন বুদ্ধি সেইরূপই বুঝে। যে সকল ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এমন অবস্থা পাইয়াছিলেন, যে অবস্থায় "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই জ্ঞানের উদয় হয়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহাদের প্রণীত শাস্ত্র সকল ভিন্ন হইতে পারে না। অজ্ঞানীর কাছে শাস্ত্রাদি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানীর কাছেউহা ভিন্ন নহে। অজ্ঞানীর কাছে উহা মিথ্যা কিন্তু জ্ঞানীর কাছে উহা সত্য।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছেন তাহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে এই বিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে। তাহা হইলে এই বিশ্বই বা কি এবং কোথা হইতে আসিল ?

গুরু। বিশ্বের কারণ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে চাহিনা, কারণ,

"অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্ ॥"

(জ্ঞানসংকলনী তন্ত্র)

অব্যক্ত হইতে সৃষ্টির উদ্ভব এবং অব্যক্ত হইতেই নাশ হয়। এবং সেই যে সৃষ্টিসংহার-বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান সেও অব্যক্ত। যদি সৃষ্টির কারণই অব্যক্ত রহিল তবে কেমন করিয়া আমি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিব ? বুদ্ধদেব এই জন্যই জগতের কারণ জ্ঞানাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই বিশ্ব কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি প্রশ্ন কেহ যদি তাঁহাকে করিত, তিনি বলিতেন যে তর্জ্জনী ক্ষেপণ করিয়া মহা সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণ করিতে চাহিও না। আমি যে কেন মনুষ্য হইয়াছি এবং আমি আদি কি অনাদি তাহাই জানি না,তবে কেমন করিয়া আমি এই বিশ্বের কারণ জানিব ? যে এইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন করে এবং যে ইহার উত্তর দেয়—ইহারা উভয়েই ভ্রান্ত বলিয়া জানিবে। মনুষ্যের জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার উত্তর দিতে পারে নাই এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া পারিবেও না। জ্ঞানবলে যতই চক্ষুর আবরণ উত্তোলিত হউক না কেন, তবু আবরণের পর আবরণ থাকিয়া সে মহাতত্ত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখিবে।

ঐরূপ মত কোন আধুনিক ইংরাজ কবিও প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

"Know thyself, presume not God to scan."

তুমি নিজে কে ইহাই জানিতে চেষ্টা কর, ঈশ্বর কে কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি জিজ্ঞাসারূপ ধৃষ্টতা করিও না।

আর্য্য ঋষিরা এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর ব্রহ্ম, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ; তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। তিনিই সত্য এবং অপর সকল মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, সেইরূপ পরমব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন বলিয়াই সংসার ও বিদ্যমান আছে এইরূপ ভ্রম হইতেছে। এই ভ্রমকেই মায়া বলে। ঋষিরা আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার ও চিন্ময় স্বরূপ। সংসার যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে তিনি আর জগৎকর্ত্তা বলিয়া কিরূপে উল্লিখিত হইতে পারেন ? তবে তিনি যে সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহা ভ্রম, আরোপ মাত্র; বাস্তবিক স্বরূপ নহে। যদি সংসারের সৃষ্টিই মিথ্যা হইল, তবে আর সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপে সম্ভব হয় ? ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ এই যে, তিনি অকর্ত্তা,

সংস্কৃত,—যশ্চ ধর্ম্মমুত্তমং অপশ্যন্ বর্ষশতং জীবেৎ, (তস্য জীবিতাৎ) ধর্ম্মমুত্তমং পশ্যত একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—এবং যে উত্তম ধর্ম্ম না বুঝিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি উত্তম ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহার এক দিবসের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

---

(২)

ঈশ্বর তত্ত্ব।

(গুরুশিষ্যের কথোপকথন)

শিষ্য। আপনি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকে কি তবে মিথ্যা বলেন?

গুরু। আমিত' তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহারা অপরা বিদ্যা। উহাদিগের দ্বারা সাধারণ লোকের মনে অনেক সংশয়ের উদয় হয়। ঐরূপ সংশয়ের কারণ এই যে সাধারণ লোক ভেদজ্ঞান পূর্ণ, সুতরাং তাহাদের যেমন জ্ঞান ও যেমন বুদ্ধি সেইরূপই বুঝে। যে সকল ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এমন অবস্থা পাইয়াছিলেন, যে অবস্থায় "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই জ্ঞানের উদয় হয়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহাদের প্রণীত শাস্ত্র সকল ভিন্ন হইতে পারে না। অজ্ঞানীর কাছে শাস্ত্রাদি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানীর কাছেউহা ভিন্ন নহে। অজ্ঞানীর কাছে উহা মিথ্যা কিন্তু জ্ঞানীর কাছে উহা সত্য।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছেন তাহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে এই বিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে। তাহা হইলে এই বিশ্বই বা কি এবং কোথা হইতে আসিল?

গুরু। বিশ্বের কারণ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে চাহিনা, কারণ,

"অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্॥"

(জ্ঞানসংকলনী তন্ত্র)

অব্যক্ত হইতে সৃষ্টির উদ্ভব এবং অব্যক্ত হইতেই নাশ হয়। এবং সেই যে সৃষ্টিসংহার-বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান সেও অব্যক্ত। যদি সৃষ্টির কারণই অব্যক্ত রহিল তবে কেমন করিয়া আমি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিব? বুদ্ধদেব এই জন্যই জগতের কারণ জ্ঞানাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই বিশ্ব কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি প্রশ্ন কেহ যদি তাঁহাকে করিত, তিনি বলিতেন যে তর্জ্জনী ক্ষেপণ করিয়া মহা সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণ করিতে চাহিও না। আমি যে কেন মনুষ্য হইয়াছি এবং আমি আদি কি অনাদি তাহাই জানি না,তবে কেমন করিয়া আমি এই বিশ্বের কারণ জানিব? যে এইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন করে এবং যে ইহার উত্তর দেয়—ইহারা উভয়েই ভ্রান্ত বলিয়া জানিবে। মনুষ্যের জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার উত্তর দিতে পারে নাই এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া পারিবেও না। জ্ঞান-বলে যতই চক্ষুর আবরণ উত্তোলিত হউক না কেন, তবু আবরণের পর আবরণ থাকিয়া সে মহাতত্ত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখিবে।

ঐরূপ মত কোন আধুনিক ইংরাজ কবিও প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

"Know thyself, presume not God to scan."

তুমি নিজে কে ইহাই জানিতে চেষ্টা কর, ঈশ্বর কে কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি জিজ্ঞাসারূপ ধৃষ্টতা করিও না।

আর্য্য ঋষিরা এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর ব্রহ্ম, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ; তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। তিনিই সত্য এবং অপর সকল মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, সেইরূপ পরমব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন বলিয়াই সংসার ও বিদ্যমান আছে এইরূপ ভ্রম হইতেছে। এই ভ্রমকেই মায়া বলে। ঋষিরা আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার ও চিন্ময় স্বরূপ। সংসার যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে তিনি আর জগৎকর্ত্তা বলিয়া কিরূপে উল্লিখিত হইতে পারেন? তবে তিনি যে সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহা ভ্রম, আরোপ মাত্র; বাস্তবিক স্বরূপ নহে। যদি সংসারের সৃষ্টিই মিথ্যা হইল, তবে আর সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ এই যে, তিনি অকর্ত্তা,

সংস্কৃত,—যশ্চ ধর্ম্মমুত্তমং অপশ্যন্ বর্ষশতং জীবেৎ, (তস্য জীবিতাৎ) ধর্ম্মমুত্তমং পশ্যত একাহং জীবিতং শ্রেয়ঃ।

অনুবাদ,—এবং যে উত্তম ধর্ম্ম না বুঝিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি উত্তম ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহার এক দিবসের জীবনও শ্রেষ্ঠ।

---

(২)

ঈশ্বর তত্ত্ব।

(গুরুশিষ্যের কথোপকথন)

শিষ্য। আপনি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকে কি তবে মিথ্যা বলেন ?

গুরু। আমিত' তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উহারা অপরা বিদ্যা। উহাদিগের দ্বারা সাধারণ লোকের মনে অনেক সংশয়ের উদয় হয়। ঐরূপ সংশয়ের কারণ এই যে সাধারণ লোক ভেদজ্ঞান পূর্ণ, সুতরাং তাহাদের যেমন জ্ঞান ও যেমন বুদ্ধি সেইরূপই বুঝে। যে সকল ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এমন অবস্থা পাইয়াছিলেন, যে অবস্থায় "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই জ্ঞানের উদয় হয়, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাহাদের প্রণীত শাস্ত্র সকল ভিন্ন হইতে পারে না। অজ্ঞানীর কাছে শাস্ত্রাদি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানীর কাছেউহা ভিন্ন নহে। অজ্ঞানীর কাছে উহা মিথ্যা কিন্তু জ্ঞানীর কাছে উহা সত্য।

শিষ্য। আপনি পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছেন তাহা হইতে এইরূপ বুঝা যায় যে এই বিশ্ব ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে। তাহা হইলে এই বিশ্বই বা কি এবং কোথা হইতে আসিল ?

গুরু। বিশ্বের কারণ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে চাহিনা, কারণ,

"অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি।
অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্॥"

(জ্ঞানসংকলনী তন্ত্র)

অব্যক্ত হইতে সৃষ্টির উদ্ভব এবং অব্যক্ত হইতেই নাশ হয়। এবং সেই যে সৃষ্টিসংহার-বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান সেও অব্যক্ত। যদি সৃষ্টির কারণই অব্যক্ত রহিল তবে কেমন করিয়া আমি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিব? বুদ্ধদেব এই জন্যই জগতের কারণ জ্ঞানাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই বিশ্ব কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইত্যাদি প্রশ্ন কেহ যদি তাঁহাকে করিত, তিনি বলিতেন যে তর্জ্জনী ক্ষেপণ করিয়া মহা সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণ করিতে চাহিও না। আমি যে কেন মনুষ্য হইয়াছি এবং আমি আদি কি অনাদি তাহাই জানি না,তবে কেমন করিয়া আমি এই বিশ্বের কারণ জানিব? যে এইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন করে এবং যে ইহার উত্তর দেয়— ইহারা উভয়েই ভ্রান্ত বলিয়া জানিবে। মনুষ্যের জ্ঞান যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার উত্তর দিতে পারে নাই এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া পারিবেও না। জ্ঞান-বলে যতই চক্ষুর আবরণ উত্তোলিত হউক না কেন, তবু আবরণের পর আবরণ থাকিয়া সে মহাতত্ত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখিবে।

ঐরূপ মত কোন আধুনিক ইংরাজ কবিও প্রকাশ করিয়াছেন যে,—

"Know thyself, presume not God to scan."

তুমি নিজে কে ইহাই জানিতে চেষ্টা কর, ঈশ্বর কে কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি জিজ্ঞাসারূপ ধৃষ্টতা করিও না।

আর্য্য ঋষিরা এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর। সেই পরাৎপর ব্রহ্ম, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ; তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ তিনি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। তিনিই সত্য এবং অপর সকল মিথ্যা। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়, সেইরূপ পরমব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন বলিয়াই সংসার ও বিদ্যমান আছে এইরূপ ভ্রম হইতেছে। এই ভ্রমকেই মায়া বলে। ঋষিরা আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার ও চিন্ময় স্বরূপ। সংসার যদি ভ্রম হয়, তাহা হইলে তিনি আর জগৎকর্ত্তা বলিয়া কিরূপে উল্লিখিত হইতে পারেন? তবে তিনি যে সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহা ভ্রম, আরোপ মাত্র; বাস্তবিক স্বরূপ নহে। যদি সংসারের সৃষ্টিই মিথ্যা হইল, তবে আর সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ এই যে, তিনি অকর্ত্তা,

CORRECTION

অরূপ, অস্থূল, অসূক্ষ্ম, অদীর্ঘ, অহ্রস্ব, নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ ও বাক্যমনের অগোচর। রজ্জুতে সর্পভ্রম বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জু মাত্র বোধ হয়, সেইরূপ পরম-ব্রহ্মে যে সংসার ভ্রম জন্মিয়াছে, তাহা দূরীভূত হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পায়। বেদান্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রজ্জুকে সর্পের ও পরব্রহ্মকে জগতের 'উপাদান' বলিতে হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু এইরূপ উপাদানকে "বিবর্ত্ত উপাদান" বলে। সংসারের কোন অস্তিত্ব নাই, উহা মায়া মাত্র—আমাদের কল্পনা হইতেই উহা প্রসূত হইয়াছে। আমরা যে ব্রহ্মকে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলি, উহা আমাদের ভ্রম, আরোপ মাত্র। এখন বুঝিলে জগৎ কি এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?

শিষ্য। আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু ঈশ্বর যদি নিরাকার, নিগুর্ণ হন, তবে প্রার্থনার উত্তর, প্রার্থনার দ্বারা সময়ে সময়ে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম, ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা কিরূপে হয়?

গুরু। ইহার ব্যাখ্যা যোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে অক্ষম। তাঁহারা ঐ সকল ঘটনার ভিত্তি ভূমি পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করেন। পুরাতন ইতিহাস ছাড়িয়া দাও, আধুনিক সভ্যজগতে যাঁহারা বিজ্ঞানের পূর্ণালোকে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারাও ঐ সকল ঘটনার বিশেষরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিকেরা ঐ সকল ঘটনার কোনরূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া উহাদিগকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু সত্য-প্রিয় বৈজ্ঞানিকেরা সত্যের মুখ চাহিয়া উহাদিগকে অমূলক বিবেচনা করেন না। তাঁহারা জানেন যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস যে, কোন অসাধারণ পুরুষ বিশেষ বা পুরুষগণ তাঁহাদের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন বা প্রকৃতির নিয়ম ব্যতিক্রম করেন,—তাঁহাদের অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত স্থূলদর্শী শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধিকতর দোষী। কারণ হয়তো তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ শিক্ষা এবং কুসংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমর্থনে বলিবার কিছুই নাই। যোগীরা প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি ইত্যাদি আশ্চর্য্য ঘটনার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে কোন অসাধারণ পুরুষ বা পুরুষগণ দ্বারা ঐ সকল ব্যাপার সংঘটিত হয় এরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ সকল ঘটনা বুঝা যায় না। তাঁহারা

বলেন যেমন মানবের অন্তরে অভাব রহিয়াছে, সেইরূপ ঐ অভাব মোচন করিবার যথেষ্ট শক্তিও তাহাদের ভিতরে আছে। প্রত্যেক মনুষ্য অনন্ত শক্তির দ্বার স্বরূপ। যখনই দেখা যায় যে কোন অভাব পরিপূর্ণ হইতেছে তখনই বুঝিতে হইবে যে অন্তরস্থ অনন্ত শক্তি হইতেই এই সমুদয় প্রার্থনাদি পরিপূর্ণ হইতেছে। উহা কোন অসাধারণ পুরুষবিশেষের দ্বারা হইতেছে না। অলৌকিক পুরুষের চিন্তায় মানবের অন্তঃশক্তি কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু অবশেষে আবার আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়া থাকে। ঐরূপ চিন্তার দ্বারা মানবের স্বাধীনতার হ্রাস হয় এবং ভয় ও কুসংস্কার হৃদয় অধিকার করে। তাহার ফল এই হয় যে মনুষ্য নিজেকে শক্তিহীন এবং দুর্ব্বল-প্রকৃতি এইরূপ বিশ্বাস করে। যোগীদের এইরূপ মত, যে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া কিছুই নাই, তবে প্রকৃতির স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার বিকাশ হয়। সূক্ষ্ম কারণ, স্থূল কার্য্য। স্থূলকে সহজেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সূক্ষ্মকে তদ্রূপ করা যায় না। সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রার্থনার উত্তর ইত্যাদি নিজেদের ভিতর হইতেই আসিয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির এরূপ ক্ষমতা আছে যে সে নিজের ভিতর হইতেই প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে না।

শিষ্য। সেই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিগুর্ণ ঈশ্বর—ঋষিরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তিনি কিরূপে জ্ঞানের গম্য হইতে পারেন?

গুরু। উহা সাধনের প্রয়োজন। উহা মুখে বিবৃত করা যায় না। এই জন্যই উল্লিখিত আছে যে,—

"উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানম্ অব্যক্তং চেতনাময়ং॥"

(জ্ঞানসংকলিনী)

সর্ব্বশাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট কেবল ব্রহ্মজ্ঞান উচ্ছিষ্ট নহে, কারণ উহা অপর অপর বিদ্যার ন্যায় মুখে বলা যায় না, উহা অব্যক্ত ও চেতনাময়। উহা অব্যক্ত বলিয়াই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে, "ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" অর্থাৎ ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহার ভিতর নিহিত। উহা অতি গূঢ়। যদি শাস্ত্রাদি

গ্রন্থে উহা পাওয়া যাইত, তবে তিনি ঐ কথা বলিতেন না। উহা এত গূঢ় বলিয়াই উক্ত আছে যে,—

"বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥ (জ্ঞানসংকলনী তন্ত্র)

অর্থাৎ বেদশাস্ত্র ও পুরাণাদি সামান্য গণিকার ন্যায় লোকের কাছে প্রকাশিত হয়; কিন্তু শাম্ভবী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা কুলবধূর ন্যায় অপ্রকাশ্য।

শিষ্য। উহা যদি এত গূঢ় এবং কঠিন হয়, তবে লোকে পূজাদি দ্বারা কি করে? উহার দ্বারা কি সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে না?

গুরু। ক্রমশঃ ইহার উত্তর দিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল লোকে ত্যাগ করিয়া বাহ্যাঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত। কতিপয় অর্থ-পিশাচের মোহজালে পড়িয়া অধুনা ভারত জড়োপাসক হইয়া উঠিতেছে। অন্ধ সংস্কার লোকসকলকে আকণ্ঠ-নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া লোকে জ্ঞান হইতে দূরে পড়িয়া অজ্ঞান অর্জ্জন করিতেছে, যথার্থ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। "অন্ধৈর্নীয়মানা যথান্ধাঃ", তদ্বৎ অর্থলোলুপ যাজক ও মূর্খ যজমান উভয়েই মজিতেছে। শাস্ত্র সকল দেশাচার ও লোকাচারের বশীভূত হইয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ সত্যের মুখ চাহিয়া সংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান, তবে বর্ত্তমান সমাজ তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে। শক্তি ও নিষ্ঠার তারতম্যানুসারে সত্যে ও ধর্ম্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য ও অধর্ম্ম আমাদের অবলম্বনীয় নহে। আমরা এক্ষণে সত্য ছাড়িয়া অসত্য লইয়াই ব্যস্ত; মুখ্য ছাড়িয়া গৌণ লইয়াই ব্যস্ত।

শিষ্য। পূজা কি মুখ্য কর্ম্ম নহে?

গুরু। উহা গৌণকর্ম্ম মাত্র। বেদে উহার উল্লেখ নাই। যে তিনজন মহর্ষি বেদানুকূল কার্য্যের মীমাংসা ও বর্ণনা করিয়াছেন—জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে বেদানুকূল সমস্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের বিষয়, পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে বেদানুকূল সমস্ত উপাসনা কাণ্ডের বিষয় এবং ব্যাসদেব শারীরক সূত্রে বেদানুকূল সমস্ত জ্ঞান-কাণ্ডের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কোন স্থানেই মূর্ত্তি পূজাদির ব্যবস্থা উল্লিখিত হয় নাই।

আবার দেখ মনীষিগণ ইহা বলিয়াছেন যে,—

"অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠ লোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

সাধারণ মনুষ্যগণ জলকেই দেবতা বোধে, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অন্তরীক্ষকে, মূর্খেরা কাষ্ঠ ও লোষ্ট্র নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে এবং সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি একমাত্র পরমাত্মাকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকে। মায়া তন্ত্রেও এইরূপ উল্লেখ আছে যে,—

"অস্মিন কালে সুরেশানি প্রকাশো জায়তে ভুবি।
তমোধর্ম্মেণ সর্ব্বত্র দেবতা প্রতিমাং সদা॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং শনিভৌময়োঃ।
সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
কৃত্বা তু পূজয়িষ্যন্তি মহাবিদ্যাং সভৈরবাং
এবং হি তামসীপূজাঽনিত্যাচ ভবেৎ কলৌ॥"

হে দেবি সুরেশানি! আজ কাল লোকে তমোধর্ম্মের প্রভাবে অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং শনি ও মঙ্গলবারে সভৈরব আপনার প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা জানে না যে সেই জগন্ময়ী মহাবিদ্যার এতাদৃশী পূজা তামসিক এবং অনিত্য, এবং উহা কলিকালেরই যোগ্য।

সেইজন্য ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং বিষ্ণু র্যোগিনাং হৃদয়ে হরিঃ।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাম্॥

(ব্রাহ্মে)

অর্থাৎ যাহারা ক্রিয়াবান্ তাহারা অগ্নিতে, যাহারা যোগী তাহারা স্ব স্ব হৃদয়ে যাহারা অল্প বুদ্ধি তাহারা প্রতিমাদিতে এবং আত্মবিদ্‌গণ সর্ব্বত্রই সেই বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

"ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাং। (গীতা)

অর্থাৎ যাহারা ভূতাদির পূজা করে তাহারা ভূতস্বভাবই প্রাপ্ত হয় এবং যাহারা আমার (ব্রহ্মের) উপাসনা করে তাহারা ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়।

সেই জন্য যজুর্ব্বেদে মনুষ্যকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে,—

"অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততোভূয় ইবতে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥"

অর্থাৎ যে অসম্ভূতি অর্থাৎ অনাদি কারণ প্রকৃতিকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, সে অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। এবং যে সম্ভূতি, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন কার্য্যরূপ পৃথিব্যাদিভূত, বৃক্ষাদি বা পাষাণাদিকে ব্রহ্মস্থানীয় বোধে উপাসনা করে, সে অন্ধকার হইতে ক্রমে গাঢ়তর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়।

স্বয়ং ব্যাসদেব যিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন তিনি কি বলিয়াছেন, শুন,—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মতকৃতম্ ॥

অর্থাৎ তুমি রূপ বিবর্জ্জিত; আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবের দ্বারা তোমার যে সেই অনির্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থযাত্রাদিদ্বারা তোমার যে সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি; হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটী বিকলতা দোষ ক্ষমা করুন। এখানে ব্যাসদেব নিজেই তাঁহায় ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে, যিনি নিরাকার, বাক্যের অতীত এবং সর্ব্বব্যাপী, তাহাকে তিনি কল্পনার দ্বারা সাকার বলিয়া বর্ণনা করিয়া দোয করিয়াছেন: সুতরাং এই সকল হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে গৌণ পূজার দ্বারা কখনও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, যদি সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হয় তবে পাষাণাদি মূর্ত্তিকে পূজা করিতে দোষ কি?

গুরু। তোমার এ যুক্তি তিষ্ঠে না। কারণ, তুমি যদি সমস্ত জগতকে

ব্রহ্ম বলিয়া মান তবে তোমায় বলিতে হইবে যে পাষাণও ব্রহ্ম এবং তুমিও ব্রহ্ম। তোমাতে চৈতন্যের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু পাষাণে ঐরূপ প্রকাশ হয় নাই, এমন কি অপ্রকাশ্য বলিলেও চলে। সুতরাং তোমাদের উভয়ের ভিতর তুমিই শ্রেষ্ঠ। তবে তুমি কেন তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করিতে চাহিতেছ? আর এক কথা, তোমার যখন সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে তখন কোন বাহ্য ক্রিয়ার প্রয়োজন হইবে না।

শিষ্য। সাকার পদার্থকে অবলম্বন করিয়া কি নিরাকারের ধারণা হয় না?

গুরু। তাহা কখনই হয় না। অদৃষ্ট ও অমূর্ত্ত পদার্থকে মনন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া অপেক্ষা, প্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষুদ্বারা দেখা সহজ মানি, কিন্তু তাই বলিয়া ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থকে চক্ষুদ্বারা দেখা সহজ নয়—তাহা অসাধ্য। সেইরূপ সাকার মূর্ত্তির রূপ ধারণা সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু সাকার মূর্ত্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একবারেই অসাধ্য। কারণ, "স বৃক্ষাকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ", তিনি সংসার হইতে, কাল হইতে এবং সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন। যদি তিনি সংসার, কাল ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবেত সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল। তাহা হইলে তাহাকে অন্বেষণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

আরও দেখ, যে বস্তুর সত্তা মনে সজ্ঞানে আহৃত হয়, সেই বস্তুই পরে স্মৃতিতে উদয় হয়, কিন্তু নিরাকার বস্তুর স্মৃতি থাকিতে পারে না। এবং স্মৃতির অভাবে স্মরণ হয় না, সুতরাং স্মরণের অভাবে মূর্ত্ত পদার্থ দেখিয়া অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা হইতে পারে না।

শিষ্য। আমরা দেখিতে পাই যে পৃথিবীর অতি সামান্য ক্ষুদ্র অংশের জ্ঞান থাকিলে আমাদের জীবনযাত্রা সুখে কাটিয়া যায়, সেইরূপ ইহাও কি ঠিক নহে যে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত, আকারবদ্ধ, আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মত স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে?

গুরু। না, তাহা চলে না। যদি পৃথিবীর অল্প অংশ জানিলেই যথেষ্ট হইত, তবে মনুষ্য কেন প্রকৃতির অপরিমেয় রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য লোকলোকান্তরে আপনার গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? উপনিষৎ বলিয়া-

ছেন যে, আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি", ভূমাই আমাদের সুখ, অল্পে আমাদের সুখ হয় না। "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্, য এতদ্বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি", অর্থাৎ যিনি সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগ শোক রহিত, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমর হন, আর সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন। তাই কবি লিখিয়াছেন যে, "স্বতঃ প্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহন স্নান যদি কঠিন হয়, তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন—তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র কলস-পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা আরও দুরূহতর।"

উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে,—

"যৎ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে॥"

অর্থাৎ যিনি বাক্য দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকে তুমি জান, এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। মনের দ্বারা যাহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাহাকে তুমি জান। এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় ঃ তাহা ব্রহ্ম নহে। সেই জন্য ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আইসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি পাইয়াছেন তিনি আর কাহা হইতে ভয় পান না। তাই বলিতেছিলাম, জগতের অন্যান্য জিনিষের ন্যায় তাহাকে বাঙ্মনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া খণ্ড করিয়া দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ লাভ করিতে পারি না। সেই জন্যই সেই মহাপুরুষেরা আমাদের সতর্ক করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে,—

"ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণং সর্ব্বং দেহ মধ্যে ব্যবস্থিতম্।
সাকারাশ্চ বিনশ্যন্তি নিরাকারো ন নশ্যতি॥
নিরাকারং মনোযস্য নিরাকারসমো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাকারন্ত পরিত্যজেৎ॥"

(জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্র)

অর্থাৎ বহির্ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লক্ষণ আমাদের দেহের ভিতর অবস্থিত আছে; সাকারের বিনাশ হয়, কিন্তু নিরাকারের নাশ নাই। মনে যখন নিরাকার ভাবা যায় মন তখন নিরাকার হয়। সুতরাং সর্ব্বচেষ্টা দ্বারা সাকার ত্যাগ করিবে। সেই জন্যই কবির বলিয়াছেন যে,—

"কবির যো দিশে সেই বিনুশে, নাম ধরা সো যায়।
কহে কবির সেই তত্ত্ব গহো, যো সদ্‌গুরু দেই বতায়॥"

কবির বলিতেছেন, যাহা কিছু দৃশ্যমান পদার্থ দেখিতেছ তাহা সকলই বিনাশশীল। যাহার নাম ধরিবে সেই যাইবে. অর্থাৎ যাহা ব্যক্ত করা যায় তাহার নাশ আছে, কবির বলিতেছেন সেই ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ কর, যাহা সদ্গুরু বলিয়া দিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না।

শিষ্য। আচ্ছা, ভাবের দ্বারা মৃত্তিকাদি মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বা দেবতা বোধে ধারণা করিতে দোষ কি?

গুরু। সে রূপ ধারণা করা যায় না। যখন জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সংস্কার-রাশি ভস্মীভূত হয় তখন চিত্ত কল্পনাশূন্য হইয়া স্থির হয়। তাহাকেই ভাবশুদ্ধি বলে, এবং তখনই "ভাবে হি বিদ্যতে দেবঃ," অর্থাৎ ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইলেই সেই পরমদেবের সাক্ষাৎ হয়। তখন নিজের স্থূল দেহেরই বিস্মৃতি হয়, পাষাণাদি বহির্লক্ষ্য দেবের ধারণাত' দূরের কথা! তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?"

দেবতা কাহাকে বলে, শুন—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"

(মনুস্মৃতি)

হে বিভো! আপনাকে কেহ অগ্নি বলে, কেহ মনু বলে, কেহবা প্রজাপতি বলিয়া আখ্যাত করে; অপর কেহ কেহ ইন্দ্র, প্রাণ এবং ব্রহ্ম, ইত্যাদি নামেও অভিহিত করিয়া থাকে।

যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে যে,—

"অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং দেবলং চিচ্ছিবং বিদুঃ।"

অকৃত্রিম, অনাদি, অনন্ত, নিরতিশয় আনন্দরূপী সেই চিৎকেই, বুধগণ দেব বলিয়া জানেন।

মনু বলিয়াছেন যে,—

"আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্।"

(মনুস্মৃতি)

আত্মাই একমাত্র মুখ্য দেবতা; এবং অন্যান্য গৌণ দেবগণ এই মুখ্যদেব আত্মাতেই অবস্থান করিতেছেন। এই জন্য বেদে কখনও সূর্য্যকে, কখনও ইন্দ্রকে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে স্তব করা হইয়াছে, অগ্নি বা ইন্দ্রাদি বলিয়া ভিন্ন দেবতা নাই।

তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"এবার কালীর নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।"

প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মের কোন নাম নাই।

এখন কি বুঝিতে পারিলে যে মূর্ত্ত্যাদি পূজা মুখ্য কর্ম্ম নহে?

শিষ্য। আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মনে আর এক সন্দেহের উদয় হইয়াছে।

গুরু। কি সন্দেহ বল।

শিষ্য। পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত উপায়ের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় কি না? এবং উহাই কি সহজ উপায় নহে?

গুরু। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতায় যে চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে তন্ত্রের নাম উল্লেখ হয় নাই। এবং হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্র সকল আধুনিক। শঙ্করা-

চার্য্যের সময় বৌদ্ধতন্ত্র প্রচারিত হয় নাই, নচেৎ তিনি তাহার উল্লেখ করিতেন। বৌদ্ধতন্ত্রে শিব হইয়াছেন ব্রজসত্ত্ব এবং দুর্গা হইয়াছেন বজ্র-ডাকিনী এবং মকারের বন্দোবস্ত উভয় তন্ত্রেই আছে। অনেকের বিশ্বাস যে অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন। আবার অনেকে বলেন যে, যে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের পতন আরম্ভ হয় সেই সময় বঙ্গদেশ হইতেই উহা প্রচলিত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অতিশের নামক একজন বাঙ্গালী তিব্বত দেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাহার নাম ভুটানে অতি প্রসিদ্ধ। গুজরাটী ভাষায় লিখিত "আগম প্রকাশ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালে, বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডাভোই, পাবাগড়, আহম্মদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকা মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ হইতে গুজরাট, আহম্মদাবাদ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দূরতর দেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই বলিতেছি যে তান্ত্রিকধর্ম্ম আধুনিক এবং অধিকাংশ তন্ত্র গ্রন্থ সকলও আধুনিক। ঐ সকল গ্রন্থ পাঁচ কিম্বা ছয় শত বর্ষের ভিতর রচিত হইয়াছে। এক একখানি তন্ত্র গ্রন্থ এত আধুনিক যে, উহার মধ্যে ইংরাজ, লণ্ডন প্রভৃতির নামও উল্লিখিত আছে।

পুরাণাদি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, কতকগুলি পুরাণ অতি প্রাচীন। কিন্তু পুরাণগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা এত সংস্কৃত হইয়াছে এবং উহাতে এত নূতন মত ও অপূর্ব্ব বিষয় সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা-দিগকে প্রাচীন এবং পুরাণ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে না। মহাভারতেরও ঐ দশা হইয়াছে। "ভোজ সঞ্জীবনীতে" উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহাভারতের কলেবর যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে, আর দিনকতক পরে উহা বহন করিবার জন্য হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যানের প্রয়োজন হইবে।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে দশখানি শিবের মহিমা, চারিখানি বিষ্ণুর মহিমা, দুইখানি হরির মহিমা এবং দুইখানি ভগবতীর মহিমা প্রকাশক। উহা বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋষিগণদ্বারা লিখিত হইলেও, প্রথমে উহাতে সাম্প্রদায়িক দেবতা বিশেষের নিন্দা ছিল না বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু পরে সম্প্রদায়িক দ্বেষা-দ্বেষির ফলে বিদ্বেষ সূচক শ্লোক সহ উহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ-

দের সহিত হিন্দুদিগের সংঘর্ষণই আমাদের আধ্যাত্মিক অবনতির কারণ। বৌদ্ধদের যখন অবনতি আরম্ভ হইল,তখন নিপীড়িত ব্রাহ্মণেরা তাহাদের উপর বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইল। বৌদ্ধগণ তাহাদের উন্নতির সময়, যেখানে যেখানে তীর্থ সংস্থাপন ও বুদ্ধাদির মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব প্রাধান্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, তথায় শত শত তীর্থ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন ও দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, এবং সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য প্রাচীন পুরাণাদি আখ্যানের সহিত সেই সকল নবাবিষ্কৃত তীর্থের মাহাত্ম্য ও প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি সংযোজিত করিয়া লোকের চক্ষে ধাঁদা লাগাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আসল ও নকল চেনা দায় হইয়াছে।

চারি সহস্র বৎসরের পূর্ব্ব হইতে বৈদিক ধর্ম্মের হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। এবং বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধান ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের পর হইতে, যতই মূল বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের আলোচনা লোপ পাইতে লাগিল এবং অনেক উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইতে লাগিল, ততই সমাজের অজ্ঞানান্ধকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনোনিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িল, এমন কি "তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্যের অর্থ দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল এবং সমাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। তখন তান্ত্রিকগণের উত্থান হইল এবং ঐ সকল মহাবাক্যের অনুকরণে ওঁ হ্রীং, ক্লীং, প্রভৃতি বীজমন্ত্রের আবিষ্কার হইল। যে মহাত্মারা উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজের উপকারের জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে লোকে অন্তর্লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া বহির্লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান হইল; এবং পরে তান্ত্রিক দীক্ষা সমাজ মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া সমাজের যেটুকু ধর্ম্মের জীবনী-শক্তি ছিল তাহা ক্রমে পঞ্চমকারের দ্বারা নির্ব্বাপিত হইল।

শিষ্য। বীজমন্ত্র কাহাকে বলে?

গুরু। পিঙ্গল বলিয়াছেন যে,—

"মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ।
যতঃ করোতি সংসিদ্ধে মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ॥"

অর্থাৎ যে বিশ্ববিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিলে জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হয়, সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম 'মন্ত্র'।

প্রণব যেমন ব্রহ্মের বাচক,—"প্রণবস্তস্য বাচকঃ"—সেইরূপ হ্রীং ক্লীং,ইত্যাদিকে তাঁহার বাচক বলিয়া কথিত হয়। সেইজন্য উহাদিগকে বীজ, মন্ত্র বলে।

যদি তান্ত্রিক বীজের দ্বারা তোমার ব্রহ্মলাভে নিতান্ত অভিরুচি হইয়া থাকে, তবে মন্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্ উভয়বিদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমীপে মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া, তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য কর। নচেৎ তোতা পাখীর ন্যায় হ্রীং ক্লীং, ইত্যাদি পড়িলে কিছুই ফল নাই। কেবল মন্ত্রবিদের দ্বারা তোমার কিছু উপকার হইবে না, কারণ জানত' নারদ মন্ত্রবিদ্ হইয়াও ব্রহ্মবিদ্ হইতে পারেন নাই।* অতএব কি বৈদিক কি তান্ত্রিক, উভয় অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় যে এক তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। যদি অনুষ্ঠান এবং প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইল, তবে তান্ত্রিক ক্রিয়া সহজ এইরূপ মূর্খতৃপ্তিকর আপাতমনোরম স্তোভ বাক্যের প্রয়োজন কি?

কিন্তু সহজ ও কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই না সত্য চাই? সত্য যদি সহজ হয় ত ভালই, না হইলে সত্য বই আমাদের আর গতি নাই'। সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘূরিতেছে, অথবা পৃথিবী সর্পের মস্তকোপরি স্থাপিত রহিয়াছে,ইত্যাদি বাক্য যদি কাহারও ধারণা করিতে সহজ বোধ হয়, তথাপি বিজ্ঞানপিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া ঐ সকল কথা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। ফল, মূল ও জলশূন্য গভীর অরণ্যে, ভ্রমণশীল দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যদি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কাহারও নিকট অন্নভিক্ষা করে, তবে তাহাকে মৃৎপিণ্ড আনিয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু সে ত মৃৎপিণ্ড চাহে না, সে বলিবে যেখানে পাও, আমার জন্য অন্ন আনিয়া দাও, নতুবা আমার জীবন-রক্ষা হইবে না। সেইরূপ সংসারের মধ্যে আমরা যখন আত্মার পিপাসা মিটাইতে চাই, তখন যতই আমরা কল্পনা-বাহিত পথে বিচরণ করি না কেন, কিছুতেই সেই পিপাসা মিটিবে না, যখন আমরা আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষ-

* একথার কোন মূল নাই, ছান্দোগ্যে গল্পচ্ছলে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে নাদর যে ব্রহ্মবিৎ ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।—সঃ

নীয় দুর্লভ পরমাত্মাকে পাইব, তখনই আমাদের পিপাসার শান্তি হইবে। সেই পরমাত্মা নিরাকার, নির্ব্বিকার এবং বাক্যমনের অগোচর হইলেও তথাপি তাঁহাকে চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব, এম, এ।

মুক্তা ও শঙ্খ।

আমাদের অজ্ঞতা।

সংবাদ-পত্রে দেখিলাম যে, বনগ্রামের নিকট ইচ্ছামতী নদীতে এক প্রকার শম্বুক অথবা ঝিনুক হয়, তাহার ভিতর মুক্তা থাকে, আর সেই মুক্তা সংগ্রহ করিয়া জেলেমালাগণ অল্লাধিক অর্থোপার্জ্জন করে। বিলাতে, চীনে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কোন কোন নদীতে যে এক প্রকার মিষ্ট জলের শম্বুক জন্মে (Fresh water mussel), আর সে শম্বুকে যে মুক্তা হয়, একথা আমি পূর্ব্বে জানিতাম, কিন্তু ইচ্ছামতী নদীর ঝিনুকে যে মুক্তা হয় তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। ফল কথা আমাদের দেশে, কোথায় কি হয়, তাহা আমরা কিছুই জানি না। আমাদের ভূগর্ভে, আমাদের সমুদ্রে, আমাদের পর্ব্বতে, আমাদের বনে, নানা রত্ন নিহিত আছে, কিন্তু তাহার আমরা কিছুই জানি না। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সাহেবেরা নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। সেজন্য ভারতের সকল কথা তাঁহারা অবগত আছেন। কিন্তু স্বদেশের সংবাদ আমরা কিছুই রাখি না। কয়জন লোক জানেন যে, এই কলিকাতা হইতে দুই শত ক্রোশ দূরে এক প্রকার মনুষ্য আছে, যাহারা বৃক্ষের পত্র পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করে? এইরূপ সকল বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু কি খনিজ পদার্থ হউক, কি উদ্ভিদ্ হউক, কি কীট পতঙ্গ অথবা পক্ষী হউক, তুমি এমন একটী নূতন বস্তু বাহির করিতে পারিবে না, যাহার সবিশেষ

বিবরণ সাহেবেরা লিপি-বদ্ধ না করিয়াছেন। সাহেবদের দেশে আম নাই, তথাপি আমে কিরূপ পোকা হয়, তাহার কিরূপ অণ্ড হয়, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সে পোকা কি করে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত সাহেবেরা সংগ্রহ করিয়াছেন। চক্ষুর উপর যে সমুদয় বিষয় রহিয়াছে তাহার কথা আমরা কিছুই বলিতে পারি না, কিন্তু আকাশে কোটি কোটি যোজন দূরস্থিত কোন্ গ্রহ কখন্ কাহার উপর সদয় ও নির্দ্দয় হন্ তাহা আমরা গণিয়া বলিতে পারি।

আমাদের অধোগতি।

সাহেবেরা পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে আসিয়া আমাদের দেশের প্রস্তর চূর্ণ করিয়া কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ বাহির করিতেছেন ও সেই কার্য্যে আমরা কুলিবৃত্তি করিতেছি। আমাদের দেশে পাট হয়, কল কারখানা করিয়া সাহেবেরা সেই পাট হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, ও আমরা কোমরে পৈতা গুঁজিয়া সেই কলে মজুরি করিতেছি। কিন্তু এখনও হইয়াছে কি! বালক কালে আমরা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা বাঙ্গালিজাতির ঘোরতর অবনতি হইয়াছে। আরও যে ঘোরতর দুর্গতি হইবে তাহার লক্ষণ চারি দিকে প্রতীয়মান হইতেছে। হিন্দু ইহকালের সুখকে তুচ্ছ করে, ও পরকালের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এই কথা সাহিত্য-সংহিতার প্রায় পত্রে পত্রে ঘোষিত হইতেছে। বেশ কথা! তবে পনর টাকার কেরানিগিরির জন্য লালায়িত হইও না। চাকরি না পাইলে, তবে শঠতা প্রবঞ্চনা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিও না, ও বনে গিয়া বায়ু ভক্ষণ করিয়া পরকালের দিকে চাহিয়া থাক।

আমাদের প্রয়োজন।

আর যদি একথা বুঝিয়া থাক যে, অর্থ না হইলে দেহ রক্ষা হয় না, ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে সৎপথে থাকিয়া যথাসাধ্য অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা কর; আপনার পরিবারবর্গকে ও দশ জনকে প্রতিপালন কর, স্বদেশকে ধনধান্যে পূর্ণ কর, জগতের চক্ষে স্বদেশবাসীকে মান সম্ভ্রমে উন্নত কর।

স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে হইলে তিনটী বিষয়ের নিতান্ত প্রয়োজন ঃ—(১) সুস্থ শরীর, (২) জ্ঞান ও (৩) ধন। কিন্তু জ্ঞান সকলের প্রথমে। পৃথিবীতে আধুনিক কালে যে সমুদায় নূতন জ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রথমে আমাদের সেই জ্ঞানের প্রয়োজন। কোটি কোটি যোজন দূরস্থিত নক্ষত্র হইতে পৃথিবীর সামান্য কীট পতঙ্গগণ ও পরমাণু পর্য্যন্ত যে বিষয়ে যাহা কিছু নূতন জ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমে আমাদের স্বদেশে যাহা হয় সেই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের লাভ করা আবশ্যক। সে জ্ঞান না হইলে আমরা কোন বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিব না। এই উদ্দেশে আজ আমি এই স্থানে ভারতজাত মুক্তা ও শঙ্খের বিবরণ প্রদান করিব।

জাহাজের আশ্রয়-স্থান।

গরিব দুঃখী লোক মুক্তার খবর না রাখিতে পারে, কিন্তু শাঁক না হইলে হিন্দুর সংসার চলে না। পূজার সময় তো চাই, তাহা ব্যতীত সন্ধ্যা বেলা অনেক গৃহস্থ শঙ্খধ্বনি করিয়া থাকেন। তাহার পর সে কালে মুখটুকু কৃষ্ণ বর্ণের অলকা-তিলকায় ও হাত দুই খানি লাক্ষা-লেপিত শাঁখায় আবৃত না করিলে, স্ত্রীলোকদিগের রূপ বাহির হইত না। এমন যে ভগবতী তিনিও শাঁখার শোকে ভস্মধারী শ্মশানবাসী ভিখারী শিবের সহিত কতই না কলহ করিয়াছিলেন। শঙ্খের সেকালে এত আদর ছিল! কিন্তু শঙ্খ কোথায় জন্মে? ভারতবর্ষে মুক্তা কোথায় হয়? অতি অল্প লোকেই তাহা অবগত আছেন।

যে স্থানে রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়াছিলেন, তাহার নিকটে যে সমুদ্র তাহাতে মুক্তা ও শঙ্খ হয়। এপারে ভারতবর্ষ অপর পারে সিংহল; দুই দেশের সমুদ্রেই মুক্তা জন্মে। এই স্থানের নিকট ভারত সমুদ্রের পূর্ব্ব কুলে টুটিকোরিন নামক এক সামান্য নগর আছে। অন্যান্য সমুদ্রকূলে পর্ব্বত অথবা উচ্চ ভূমিবেষ্টিত জাহাজের দুই চারিটা আশ্রয় স্থান থাকে। ঝড়ের সময় প্রবল সমুদ্র তরঙ্গ তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। ঝড়ের সময় জাহাজ সকল ইহার ভিতর নঙ্গর করিয়া নিরাপদে থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতের

পূর্ব্বকূলে একটীও এরূপ আশ্রয় স্থান নাই। পুরী, কোকোনাড়ার প্রভৃতি স্থানে জাহাজ সকলকে কূল হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতে হয়। কিনারায় অধিক জল নাই, সে জন্য ঠিক কিনারায় আসিয়া লাগিতে পারে না। মান্দ্রাজে সমুদ্রের মধ্যে উচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া জাহাজসমূহের আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রাচীরের অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে জন্য জাহাজসকলকে কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে থাকিতে হয়। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজে এক দুর্ঘটনা হইয়াছিল। সে গল্প এস্থানে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মান্দ্রাজ হইতে একখানি জাহাজ রেঙ্গুন যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল। এবং উহাতে প্রায় দুই তিন শত কুলি উঠিয়াছিল, কিন্তু তখনও মাল বোঝাই সমাপ্ত হয় নাই, এমন সময় তুমুল ঝড় উঠিল। জাহাজ আর সমুদ্র-কূলের নিকটে থাকিতে পারিল না জাহাজ দূর সমুদ্র অভিমুখে প্রস্থান করিল। কারণ, তীরের নিকটে থাকিলে বায়ুবেগে উহাকে ভূমির উপর ফেলিয়া চূর্ণ করিয়া দিবে; দূর সমুদ্রে জাহাজ উপস্থিত হইলে ঝড় অতিশয় বৃদ্ধি হইল. পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ সকল উহার উপর দিয়া চলিতে লাগিল ও সেই সময় উহার এক অংশ আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল অন্য অংশ পাতালের দিকে নামিতে লাগিল। কখনও বা জাহাজ এপাশ ওপাশ হইয়া ভয়ানক ভাবে দুলিতে লাগিল। যাত্রীদিগকে ভিতরে রাখিয়া জাহাজের উপরে উঠিবার দ্বার পেরেক দ্বারা বন্ধ করা হইল। জাহাজের ভিতর প্রায় দুই তিন শত কুলি ছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জাহাজের পাছে কোন দ্রব্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া এদিক ওদিকে গিয়া পড়ে, সেজন্য জাহাজের প্রায় সকল দ্রব্য রজ্জু, লৌহ-শৃঙ্খল, অথবা অন্য কোন উপায়ে আবদ্ধ থাকে। অভ্যন্তরে কোন স্থানে গুটিকত পিপে ছিল। এই পিপেগুলিও যথাস্থানে শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তরঙ্গবলে প্রবল বেগে জাহাজ যখন উপর দিকে উঠিতে ও নিম্ন দিকে নামিতে লাগিল, ভিক্টর হিউগো বর্ণিত কামানের ন্যায় তখন সেই শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া পিপেগুলি গড়াইয়া জাহাজের একধার হইতে অন্য ধারে অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই পিপের আঘাতে কয়েকজন লোকের প্রাণবিনষ্ট হইল, আর অনেকের

হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে ঝড় শীঘ্রই থামিয়া গেল। তখন দূর সমুদ্র হইতে জাহাজ পুনরায় তীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

টুটিকোরিন বন্দর।

টুটিকোরিন বন্দরেও জাহাজের আশ্রয়স্থান নাই। কিন্তু এই স্থান হইতে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের ডাক প্রেরিত হয়। তাহা ব্যতীত ভারতের দক্ষিণ প্রদেশ হইতে অনেক লোক সর্ব্বদা এই স্থান হইতে সমুদ্র পথে সিংহল দ্বীপে গমন করে। টুটিকোরিনের কিনারায় জাহাজ লাগিতে পারে না। জাহাজসকল প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করে। সে স্থান হইতে নৌকা করিয়া তীরে আসিতে হয়। সুন্দরবনে যেরূপ বাঘের উপদ্রব টুটিকোরিনের সমুদ্রে সেইরূপ হাঙ্গরের উপদ্রব আছে। সমুদ্রফেনের ন্যায় কোমল দেহবিশিষ্ট একপ্রকার জীব আছে। ইংরেজিতে ইহাকে জেলি-ফিশ বলে, অনেক সময়ে সমুদ্রকুলের সমুদায় জলটুকু জেলি মৎস্য দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। এই জীবের কোমল দেহ মনুষ্য শরীরে লাগিলে ঠিক বিচুটির ন্যায় জ্বালা করিতে থাকে। এইরূপ নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ডুবুরিদিগকে সমুদ্র হইতে মুক্তা তুলিতে হয়।

সমুদ্র হইতে বার মাস মুক্তা উত্তোলিত হয় না। প্রতি বৎসর মাঘ ফাল্গুন মাসেই এই কাজ হইয়া থাকে। সমুদ্রের মুক্তা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। মনে করিলে যে সে লোক সমুদ্র হইতে মুক্তা তুলিতে পারে না। কবে এই কাজ হইবে পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট তাহার ঘোষণা করেন্। সেই সময় টুটিকোরিনের নিকট সমুদ্রকূলে বালির উপর অল্প দিনের নিমিত্ত সামান্য একটী নগর সংস্থাপিত হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ, পুলিস, ডাক্তার, মাঝি, ডুবুরি, ঠিকাদার, মুক্তাক্রেতা, মুদি প্রভৃতি নানাবিধ লোক এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসিগণ রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং কিছু দিনের নিমিত্ত সমুদ্র-বালুকার উপর সামান্য একটী গির্জ্জাও সংস্থাপিত হয়। যে দিন মুক্তা অন্বেষণ আরম্ভ হইবে, সেই দিন মাঝি-মালা ডুবুরি সকলেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল কার্য্যের প্রারম্ভে হাঙ্গর-দেবের

পূজা দিতে হয়। সুন্দরবনে ফকিরের সাহায্যে বাঘ দেবতার পূজা না দিয়া কাঠ কাটিতে, অথবা মধু আহরণ করিতে যাইলে যেরূপ বিপদ্ ঘটে, হাঙ্গর দেবের পূজা না দিয়া সমুদ্রে নামিলেও সেইরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে। হাঙ্গর-দেবের পূজারি একজন খৃষ্টান। পুরুষানুক্রমে ইঁহারা হাঙ্গর-দেবের পূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

যে দিন হইতে মুক্তা অন্বেষণের কাজ আরম্ভ হইবে, সেই দিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় গুড়ুম্ করিয়া একটী তোপ হয়, তোপ হইবামাত্র সমুদ্র কূলে বিষম কোলাহল উপস্থিত হয়। মাঝি, মালা, ডুবুরি সকলেই প্রাণপণে চেঁচাচেঁচি করিতে থাকে। অনেক বকা-বকি ঝকা-ঝকির পর নৌকাগুলি সমুদ্র অভিমুখে গমন করে। সমুদ্রকুল হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে মুক্তা সংগৃহীত হয়। যে বৎসর যতটুকু স্থান হইতে ঝিনুক উত্তোলিত হইবে, সেই স্থানটুকু পূর্ব্ব হইতে বয়ার দ্বারা চিহ্নিত থাকে। সেই বয়া পার হইয়া অচিহ্নিত স্থানে গিয়া ঝিনুক তুলিবার অনুমতি নাই। মাঝি ও ডুবুরিগণ যাহাতে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে না পারে সে নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের একখানি জাহাজ এই স্থানে নঙ্গর করিয়া থাকে। যে নৌকা তিন শত কি চারি শত মন বোঝাই লইতে পারে এরূপ নৌকা সচরাচর মুক্তা উত্তোলন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। এক এক খানি নৌকায় তেরজন দাঁড়ি মাঝি ও দশ জন ডুবুরি থাকে। এক বারে পাঁচ জন ডুবুরি জলে অবতরণ করে, আর সেই সময় অপর পাঁচজন বিশ্রাম করিতে থাকে। কিন্তু কখন কখন দুইজন ডুবুরি এক সঙ্গে কাজ করে। কখন বা একজন ডুবুরি একলাই কাজ করে। ঐ দুইজন ডুবুরির নিমিত্ত দুইটী রজ্জু থাকে। একটী রজ্জুতে পনর ষোল সের ওজনের একখানি পাথর বাঁধা থাকে, অপর রজ্জুতে একটী কি দুইটী ঝুড়ি কি থলি কি জাল বাঁধা থাকে। নৌকা যথা স্থানে উপস্থিত হইলে ডুবুরিগণ জলে নামিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। বিলাতের ডুবুরিদিগের বেশ ভূষা ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের নল থাকে, ইহাদের সে সব কিছুই থাকে না। সামান্য একটু কৌপিন পরিধান করিয়া ইহারা জলে নিমগ্ন হয়। ডুবুরি প্রথম দড়ি দুই গাছি তাহার বাম হাত দিয়া ধারণ করে। তাহার পর পাথরের উপর এক পা রাখিয়া, দীর্ঘ একটী শ্বাস গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ হাতের

অঙ্গুলি দ্বারা আপনার নাসারন্ধ্র বন্ধ করে। নাসিকা বন্ধ করিবার নিমিত্ত কোন কোন ডুবুরির ধাতু নির্ম্মিত একটী যন্ত্রও থাকে। সে সুতাতে বাঁধিয়া ঐ যন্ত্রটী আপনার গলদেশে লম্বিত করিয়া রাখে, এই সময় রজ্জুর অপর অংশ ধরিয়া আর একজন লোক নৌকার উপর বসিয়া থাকে। ডুবুরি সঙ্কেত করিবামাত্র সে রজ্জু ছাড়িতে থাকে। দড়ি ধরিয়া পাথরের উপর পা রাখিয়া ডুবুরি সমুদ্রের ভিতর নামিতে থাকে। যখন দুইজন ডুবুরি এক সঙ্গে কাজ করে, তখন তাহারা দুইজনেই এক সঙ্গে পাথরের উপর পা দিয়া জলে অবতরণ করে। একজন ডুবুরি যদি একেলা কাজ করে, তাহা হইলে সে একেলাই পাথরের উপর পা রাখিয়া সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করে, কিন্তু এক এক খানি নৌকা হইতে সচরাচর পাঁচজন ডুবুরি এক সঙ্গে সমুদ্রে অবতরণ করে। এস্থানে জল অধিক গভীর নহে। চল্লিশ হইতে ষাটি হাত জলের নিম্নে মুক্তা সম্বলিত শুক্তিগণ বাস করে। নৌকার উপর দড়ির অন্য অংশ ধরিয়া যে লোক বসিয়া থাকে, অল্পক্ষণ পরে তাহার হাতে দড়ি ঢিলা হইয়া যায়। তখন সে বুঝিতে পারে যে ডুবুরি সমুদ্রতলে গিয়া পৌঁছিয়াছে। সমুদ্র গর্ভে উপস্থিত হইয়া ডুবুরি পাথর ছাড়িয়া ভূমির উপর দণ্ডায়মান হয়। তখন নৌকার লোক যে রজ্জুতে পাথর বাঁধা আছে তাহা টানিয়া পাথরখানি নৌকার উপর তুলিয়া লয়। তাহার পর ডুবুরি সমুদ্রতলে ভূমির উপর হাতড়াইয়া ঝিনুকের অনুসন্ধান করিতে থাকে। সংগৃহীত ঝিনুক দ্বারা সে নিজের ঝুড়ি, থলি অথবা জাল পূর্ণ করিতে থাকে। বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাসের নলের সহিত যোগ রাখিয়া, বিলাতের ডুবুরি অনেকক্ষণ জলের ভিতর থাকিতে পারে। কিন্তু টুটিকোরিনের ডুবুরিদিগের সেরূপ সাজ-সজ্জা নাই। এক হইতে আস্তে আস্তে পঞ্চাশ গণিতে যত টুকু সময় লাগে, অর্থাৎ এক মিনিটেরও কম ইহারা জলের ভিতর থাকিতে পারে। কদাচ কোন কোন ডুবুরি এক মিনিটকাল জলের ভিতর ডুবিয়া থাকিতে পারে। কে কতক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে লড়াই হয়। ডুবুরি যতই পাকা হউক না কেন, এক হইতে নব্বই গণনা কাল পর্য্যন্ত কেহই জলের ভিতর অবস্থিতি করিতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ডুবুরি মনে করে যে জলের ভিতর

সে এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা যাপন করিয়াছে। উপরে উঠিয়া যখন সে জানিতে পারে সে এক কি দেড় মিনিটের অধিক জলের ভিতর বাস করে নাই, তখন সে ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে যে ডুবুরি অধিকক্ষণ জলের ভিতর থাকিয়া অধিক ঝিনুক আহরণ করিতে পারে সে অধিক টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে টুটিকোরিণ ও সিংহলে মুক্তা সংগ্রহের কাজ ওলন্দাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মার্টিন নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ডুবুরিদিগের মধ্যে মাঝে মাঝে জেদাজেদি বাধিয়া যায়। তখন অধিক ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া একজন ডুবুরি অন্যজনকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে। এইরূপ উৎসাহে কোন কোন ডুবুরি এত হতজ্ঞান হইয়া পড়ে যে সে সাধ্যাতীত সময় পর্য্যন্ত জলের ভিতর থাকিয়া কাজ করিতে থাকে; অবশেষে দড়ি টানিয়া সঙ্কেত করিবার শক্তি তাহার থাকে না ও অবিলম্বে শ্বাস রোধ হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। কোন কোন ডুবুরি এরূপ দুর্বৃত্ত যে সমুদ্রতলে থাকিয়াই সে অন্য দ্বারা সংগৃহীত ঝিনুক বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে, তজ্জন্য সমুদ্রতলে ডুবুরিতে ডুবুরিতে অনেকবার মারামারি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে।" টুটিকোরিণে মুক্তা সংগ্রহ কার্য্য ইংরেজের অধীন হওয়া অবধি এরূপ বিবাদ বোধ হয় কখন হয় নাই।

সচরাচর বহুসংখ্যক মুক্তা ঝিনুক এক স্থানে একত্রে বাস করে। টুটিকোরিণের সমুদ্রে যে স্থানে মুক্তা ঝিনুক বাস করে, দীর্ঘে সে স্থানটী ছয় ক্রোশের অধিক নহে। কখন কখন মুক্তা ঝিনুকের সংখ্যা অতিশয় কমিয়া যায়। কেন হ্রাস হইয়া যায় তাহার প্রকৃত কারণ এখনও স্থির হয় নাই। পৃথিবীতে যেমন সকল জীবের শত্রু আছে, সেইরূপ মুক্তা ঝিনুকেরও শত্রু আছে। স্থবণ নামক এক প্রকার শামুক, কিলিকে নামক এক প্রকার সামুদ্রিক জীব, রেঃ নামক এক প্রকার মৎস্য শিশুঝিনুকের কোমল খোলা ভাঙ্গিয়া ভিতরের মাংস ভক্ষণ করে। যে স্থানে এই সমুদয় জীবের উপদ্রব অধিক হয় সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া ঝিনুকগণ অন্যত্রে গমন করে। ঝিনুকের সংখ্যা হ্রাস হইবার ইহা এক কারণ। ইহা ব্যতীত কেহ কেহ অনুমান

করেন যে নৌকার নাবিকগণ চুরি করিয়া অসময়ে অনেক ঝিনুক তুলিয়া লয়। কিন্তু এ অনুমান বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ, অধিক ঝিনুক সংগৃহীত হইলে তাহা না পচাইয়া মুক্তা বাহির করিতে পারা যায় না। ঝিনুক পচিলে ঘোরতর দুর্গন্ধ বাহির হয়। সুতরাং চুরি করিয়া গোপনে কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। দুর্গন্ধ দ্বারা চোর শীঘ্রই ধরা পড়িতে পারে। ঝিনুকের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইলে তবে তাহার ভিতর মুক্তা জন্মে। যে স্থানে অধিক সংখ্যক বয়ঃপ্রাপ্ত ঝিনুক থাকে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে তাহা স্থির করিয়া তবে মুক্তান্বেষণের অনুমতি প্রদান করেন। সুতরাং ডুবুরিগণ সমুদ্রতলে নামিয়া শীঘ্রই ঝুড়ি পূর্ণ করিতে সমর্থ হয়। ঝুড়ি পূর্ণ হইলে সেই দ্বিতীয় রজ্জু টানিয়া সঙ্কেত করে। নৌকার উপরের লোক তখন দড়ি টানিয়া ডুবুরিকে উত্তোলন করে। তখন আর এক জন ডুবুরি তাহার পরিবর্ত্তে জলে অবতরণ করে। প্রথম ডুবুরি নৌকার উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। যথাসময়ে দ্বিতীয় ডুবুরি উপরে উঠিলে তৃতীয় ডুবুরি জলে নিমগ্ন হয়। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া প্রথম ডুবুরি সুস্থ হইলে সে পুনরায় অবতরণ করে। ডুবুরিগণ পালা করিয়া এইরূপে সমস্ত দিন কাজ করে। কিন্তু এ কার্য্যে মানুষ শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়ে। এক এক জন ডুবুরি সমস্ত দিনে সাত আট বারের অধিক জলে নামিতে পারে না। দুই প্রহরের সময় কিছু ক্ষণের নিমিত্ত কাজ স্থগিত থাকে, তাহার পর অপরাহ্ণ চারিটার সময় কাজ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সমস্ত দিনে এক এক জন ডুবুরি দুই হাজার ঝিনুকের অধিক তুলিতে পারে না। সাজসজ্জা পরিহিত বিলাতি ডুবুরি সমস্ত দিনে কত কাজ করিতে পারে সে বিষয়ে মান্দ্রাজ বন্দরে একবার পরীক্ষা হইয়াছিল। মান্দ্রাজে মুক্তা ঝিনুক নাই। সে জন্য দুই জন বিলাতি ডুবুরি ঝিনুকের পরিবর্ত্তে সমুদ্রতল হইতে প্রস্তর খণ্ড তুলিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিল। চারি ঘণ্টা কাজ করিয়া দুই জন বিলাতি ডুবুরি ৩৬,০০০ প্রস্তর খণ্ড উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রতি জনে ১৮,০০০ প্রস্তর খণ্ড তুলিয়াছিল। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ বুঝিলেন যে, ইহারা যদি সেই পরিমাণে ঝিনুক তুলিতে পারে তাহা হইলে একজন বিলাতি ডুবুরি নয় জন দেশী ডুবুরির সমান কাজ করিতে পারিবে। কিন্তু কার্য্যে

তাহা হয় নাই। একবার টুটিকোরিণে বিলাতি ডুবুরি নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহদের দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই। দেশী অপেক্ষা বিলাতি ডুবুরিতে খরচ অধিক পড়িয়াছিল। সুতরাং যেমন পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে, দেশী ডুবুরি দ্বারা এখনও এই কাজ নিষ্পন্ন হইতেছে।

ঝিনুক বিক্রয়।

অপরাহ্ণ চারিটার সময় যেই কাজ বন্ধ হয়, আর নৌকা সকল কিনারার দিকে প্রত্যাগমন করিতে থাকে, সেই সময় সমুদ্রকূল জনাকীর্ণ হইয়া পড়ে। মাঝি, মাল্লা, ডুবুরি, ক্রেতা, বিক্রেতা প্রভৃতি নানা প্রকার লোক নৌকার প্রতীক্ষায় সমুদ্র তটে দাঁড়াইয়া থাকে। প্রবল তরঙ্গ বলে এক এক খানি নৌকা ক্রমে সমুদ্রকূলের বালুকার উপর আসিয়া পড়ে। যে স্থানে জোয়ার ও তরঙ্গের জল যায় না, মাঝিগণ নৌকা টানিয়া সেইরূপ স্থানে লইয়া যায়। তাহার ডুবুরিগণ ঝুড়িতে নিজের নিজের সংগৃহীত ঝিনুক লইয়া কোট্টু নামক স্থানে গমন করে। ঝিনুক লইয়া যাইবার নিমিত্ত চারিদিক্ উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত স্থানকে কোট্টু বলে। কোট্টুতে উপস্থিত হইয়া ডুবুরি নিজের ঝিনুকগুলি গণিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করে। গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী তখন সেই তিন ভাগের এক ভাগ ডুবুরিকে প্রদান করেন। অবশিষ্ট দুই ভাগ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। ডুবুরি তৎক্ষণাৎ নিজের অংশ সমুদ্র তীরে বালির উপর লইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে। গবর্ণমেণ্টের দুই অংশ কুলি দ্বারা প্রথম পরিগণিত হয়। তাহার পর সে সমুদয় ঝিনুককে এক এক হাজার করিয়া এক এক স্তূপে বিভক্ত করা হয়। অবশেষে অপরাহ্ণ ছয়টার সময় ঢোল পিটিয়া এক এক হাজার ঝিনুক এক এক বারে নিলামে বিক্রীত হয়। কখন কখন ক্রেতৃগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে না ডাকিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মূল্য কমাইবার জন্য চেষ্টা করে। গবর্ণমেণ্টের লোক তখন বিক্রয় বন্ধ করেন। কাজেই ক্রেতাগণ শেষে যথামূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যে ঝিনুক ডুবুরির ভাগে পড়ে তাহার পনর হইতে চল্লিশটী এক টাকায় বিক্রীত হয়। কিন্তু প্রথম প্রথম কখন কখন এক একটী ঝিনুক চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ক্রেতৃগণকে

গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে নগদ মূল্য দিয়া ঝিনুক ক্রয় করিতে হয়। মূল্য না দিয়া কেহ ঝিনুক কোট্টুর বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।

মাছি ও হাঙ্গর।

যাহারা অল্প সংখ্যক ঝিনুক ক্রয় করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ছুরি দিয়া ঝিনুক খুলিয়া তাহার ভিতর মুক্তা অন্বেষণ করে। তাহার পর সে ঝিনুক ফেলিয়া দেয়। যাহারা অনেক ঝিনুক ক্রয় করে তাহারা হয় সেই আস্ত ঝিনুক রেলপথে দূরে প্রেরণ করে, অথবা ধৌত করিবার নিমিত্ত যে স্বতন্ত্র কোট্টু থাকে তাহাতে লইয়া যায়। ছুরি দিয়া টাট্‌কা ঝিনুক খুলিলে অভ্যন্তরস্থ ছোট ছোট বীজ মুক্তা নয়নগোচর হয় না, তাহার ভিতরেই রহিয়া যায়। স্থতরাং ঝিনুকের সংখ্যা অধিক হইলে তাহাতে অনেক ক্ষতি হয়। সে জন্য বড় বড় মহাজনেরা ঝিনুক ক্রয় করিয়া ধৌত করিবার কোট্টুতে লইয়া যায়। সেই স্থানে ঝিনুক পচিতে থাকে। জলচর জীবকে স্থলে তুলিলেই মরিয়া যায় ও আপনা-আপনি পচিতে থাকে। তাহা ভিন্ন নীল বর্ণের দেহ ও রক্তবর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট এক প্রকার মক্ষিকা আসিয়া এই পচন কার্য্যের বিশেষরূপে সহায়তা করে। প্রথম তো পচা ঝিনুকের গন্ধে এস্থানে অন্য লোকের বাস করা ভার হইয়া উঠে। তাহার পর এই মাছির জ্বালায় প্রাণ অস্থির হইয়া পড়ে। অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, পদ্ম, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন প্রভৃতি যে সমুদয় সংখ্যায় মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া যায়, তাহা দ্বারাও এ মাছির সংখ্যা গণনা করিতে পারা যায় না। প্রচুর খাদ্য থাকিলে এক একটী জীবের সংখ্যা অতি অল্প সময়ের মধ্যে কত যে বাড়িতে পারে, এই মাছি তাহার দৃষ্টান্ত। ঝিনুক যখন প্রথম পচিতে আরম্ভ হয় তখন সেই গন্ধে দুই চারিটী মাছি আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রচুর খাদ্য পাইয়া তাহার পর সে মাছির দিন দিন বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে চিঁড়ের বাইশ ফের হইয়া এত মাছি উৎপন্ন হয় যে তাহা দ্বারা ঘর, দ্বার, ঘাঠ মাঠ, গাছপালা, সকল বস্তু অতি ঘন ভাবে আবৃত হইয়া পড়ে! বায়ু পর্য্যন্ত এই মাছিতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে, এমন কি নিশ্বাসের সহিতও দুই একটা মাছি নাকের ভিতর চলিয়া যায়। কিন্তু টাকার লোভ, বড় লোভ। এরূপ অবস্থাতেও

মানুষ কিছু দিন এই স্থানে কালযাপন করে। এরূপ দুর্গন্ধময়, মক্ষিকা-পূর্ণ স্থানে প্রতি বৎসর যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয় না ইহাই আশ্চর্য্য, তবে একেবারে যে এস্থানে ওলাউঠার মহামারি হয় না তাহা নহে। যে বৎসর ওলাউঠা আরম্ভ হয় সে বৎসর মুক্তা উত্তোলন কর্ম্ম একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কোন কোন বৎসর হাঙ্গরের উপদ্রবেও কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৯০ সালে হাঙ্গর-দেবতা পূজা খাইয়া সন্তোষ লাভ করেন নাই। সেজন্য সে বৎসর হাঙ্গরের উপদ্রব হইয়াছিল। অবশেষে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া নানারূপ মন্ত্রপাঠ করিল ও তুক্‌তাক্ করিল, ডুবুরিগণ তবে হাঙ্গরের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। সাহেবেরা এসকল কথা মানেন না, স্থতরাং তাঁহারা হাঙ্গর তাড়াইবার অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। জলের ভিতর তাঁহারা ডিনামাইটের আওয়াজ করিয়া হাঙ্গর তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করেন। ডুবুরিগণ বলে যে সে শব্দ জলের ভিতর তিন ক্রোশ দূর হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। ওলাউঠা ও হাঙ্গরের উপদ্রব ব্যতীত, কখন কখন মাঝি ও ডুবুরিদিগের মধ্যে মারামারি হইয়া থাকে। সেতুবন্ধ সমুদ্র খাড়ির যেমন এদিকে টুটিকোরিণ তেমনি অপর পারে সিংহলেও মুক্তা উত্তোলন কাজ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে তামিলগণ ও পারস্য উপসাগর হইতে আরবগণ সিংহলে আসিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে আরব ও তামিলদিগের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবগণের সংখ্যা অল্প ছিল, স্থতরাং সে যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইয়াছিল।

মুক্তা বাছাই।

ঝিনুক উত্তমরূপে পচিলে খোলা পৃথক্ করিয়া ভিতরের মাংস ধৌত করিতে হয়। তখন তাহার ভিতর হইতে মুক্তা বাহির হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য সকল ঝিনুকের ভিতর মুক্তা থাকে না। লোকে ঝিনুক ক্রয় করে, তাহার পর যাহার অদৃষ্টে যেরূপ থাকে তাহার সেইরূপ লাভ হয়। পরিমাণ, আকার ও ঔজ্জ্বল্য এই তিন গুণের জন্য মুক্তার মূল্য অল্পাধিক হয়। মুক্তা বড় হইলে তাহার আকার, গোল হইবে, তাহার বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে; এইরূপ মুক্তারই মূল্য অধিক। হোপ নামক একজন সাহেবের

নিকট একটী মুক্তা আছে তাহার চারিদিকের বেড় দুই ইঞ্চি আর তাহা ওজনে ৯০০ রতি। সেকালে রোম দেশে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকায় এক ছড়া মুক্তার মালা ছিল। মিসরদিগের রাণী ক্লিয়োপেট্রা একটী মুক্তা চূর্ণ করিয়া সেবন করিয়াছিলেন। ইহার মূল্য প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ছিল। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডে গ্রেশাম নামক একজন সাহেব ছিলেন। কথায় কথায় তিনি এক দিন স্পেনের রাজদূতকে বলিয়াছিলেন,—"রাণীকে আমি নিমন্ত্রণ করিব। সেই ভোজে আমি এত টাকা ব্যয় করিব যে তুমি শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে।" তাঁহার মার দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের একটী মুক্তা ছিল। ভোজের সময় সেই মুক্তা তিনি চূর্ণ করিয়া সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া রাণীর মঙ্গল প্রার্থনা পূর্ব্বক পান করিয়াছিলেন। বড় ছোট মুক্তা বাছিবার জন্য এই স্থানে লোকে পিত্তল নির্ম্মিত দশ প্রকার ছাঁকনি ব্যবহার করিয়া থাকে। ছাঁকনি খানির পরিমাণ ঠিক একরূপ, কিন্তু তাহাদের প্রথমটীতে কুড়িটী ছিদ্র থাকে। সুতরাং ইহার ছিদ্র গুলি বড়, আর ইহা দ্বারা বড় মুক্তা বাছাই হয়, ছোট মুক্তা ছিদ্র পথে নিম্নে পড়িয়া যায়। যে ছাঁকনি দ্বারা তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র মুক্তা বাছাই হয় তাহাতে ত্রিশটী ছিদ্র থাকে। এইরূপে ৫০, ৮০, ১০০, ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০ এবং এক সহস্র ছিদ্র সম্বলিত ছাঁকনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে ছাঁকনিতে এক হাজার ছিদ্র থাকে, তাহার ছিদ্র অতিশয় ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহার দ্বারা সরিষার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বীজ মুক্তাই বাছাই হইয়া থাকে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট বহুমূল্য মুক্তাকে এস্থানে "আনি" বলে। যে মুক্তা কুড়িটী ছিদ্র সম্বলিত ছাঁকনির উপর থাকিয়া যায়, যাহার আকার গোল ও বর্ণ উজ্জ্বল, তাহাই "আনি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার পর অনতারি, মসনকু, কল্লিপ্পু, কুরল, পিসল, মদঙ্কু ও ভদিভু, গুণানুসারে এই কয় প্রকার মুক্তার নাম আমি শুনিয়াছিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মুক্তা যাহা ৮০০ হইতে ২০০০ ছিদ্র সম্বলিত ছাঁকনি দ্বারা বাছাই হয় তাহাকে "টূল" বলে। বাছাই হইলে বড় বড় মুক্তাগুলিতে ছিদ্র করিতে হয়। ছোট ছোট গর্ত্ত সম্বলিত একখানি তক্তা লইয়া তাহার ভিতর মুক্তাগুলি রাখিয়া কাঠখানিকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জলে ভিজিলে তক্তা যখন ফাঁপিয়া উঠে তখন

তাহার গর্ত্তে মুক্তাগুলি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া যায়। তখন অনায়াসেই মুক্তাতে ছিদ্র কাটিতে পারা যায়, অবশেষে "মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ" সূতা দ্বারা মুক্তাগুলিকে হালি করিয়া গাঁথিতে হয়। বীজ মুক্তা প্রধানতঃ চীনে রপ্তানি হয়। সে স্থানের লোক ইহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করে। আমাদের দেশেও ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুক্তা সম্বলিত ঔষধ সেকালে রোমদিগের মধ্যেও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। যে স্থানে ঝিনুক পচাই ও মুক্তা বাছাই হয়, সে স্থানের বালুকাতে অল্লাধিক মুক্তা পড়িয়া থাকে। দেড় মাস কি দুই মাস পরে যখন সে বৎসরের মত মুক্তা উত্তোলন কার্য্য সমাপ্ত হয়, যখন দোকানি, পসারি, ডুবুরি, মহাজন প্রভৃতি যে যাহার গৃহে চলিয়া যায়, যখন সেই জনাকীর্ণ সমুদ্রকূল পুনরায় জনশূন্য হইয়া যায়, তখন দরিদ্র লোকেরা এই স্থানে আসিয়া বালুকার ভিতর মুক্তা অন্বেষণ করিতে থাকে। এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে একজন লোক বহুমূল্য একটী মুক্তা লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সমুদ্রে অধিক মুক্তা জন্মে না। * প্রতি বৎসর তিন চারি লক্ষ টাকার মুক্তা উত্তোলিত হয় কি না সন্দেহ। সমুদ্র খাড়ির অপর পারে সিংহলে ইহা অপেক্ষা অধিক মুক্তা জন্মে। সে স্থানে প্রতি বৎসর পাঁচ ছয় লক্ষ টাকার মুক্তা উত্তোলিত হয়।

কি করিয়া মুক্তা হয়।

এই প্রবন্ধ যতটুকু লিখিব মনে করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আরও অনেক কথা বলিবার আছে। সে সমুদয় কথা অতি সংক্ষেপে আমাকে শেষ করিতে হইবে। ঝিনুকের ভিতর মুক্তা কিরূপে জন্মে? বালককালে শুনিয়াছিলাম যে স্বাতি নক্ষত্রের জল ঝিনুকের ভিতর পড়িলে সেই জলের প্রভাবে মুক্তা জন্মে। কিন্তু যে বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই তাহার সত্যাসত্যত্ব সম্বন্ধে আমি কোনরূপ মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। যে, যে জীবের ভিতর মুক্তা জন্মে এই প্রবন্ধে আমি

* পূর্ব্বে তাম্রপর্ণী নদী সাগরসঙ্গমে উৎকৃষ্ট মুক্তা উৎপন্ন হইত এই জন্যই রঘুবংশে "তাম্রপর্ণীসমতেস্য মুক্তা সারং মহোদধেঃ তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

তাহাকে ঝিনুক বলিলাম বটে, কিন্তু ইহা ঠিক ঝিনুক নহে। ইহাকে জোঙ্গড়া না কি বলে। আমাদের পুষ্করিণীর ঝিনুক অপেক্ষা ইহা অনেক বড়। খোলাবিশিষ্ট সামুদ্রিক জীবের মধ্যে ইহা আভিকিউলিডি (Aviculidœ) জাতির অন্তর্গত। ইহার বিশেষ নাম Avicula or Melegrina marganti-fera। মুক্তা ঝিনুক দীর্ঘে অর্দ্ধ হস্ত অপেক্ষাও বড় হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-গণ স্থির করিয়াছেন ঝিনুকের উদরে এক প্রকার রোগ হইলে মুক্তা হয়। ঝিনুক, শামুক, কাঁকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি জীব শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত শরীরের উপর যে কঠিন বর্ম্ম নির্ম্মাণ করে, তাহার প্রধান উপাদান চূণ। সেই জন্য ইহাদের খোলা পোড়াইলে পুনরায় চূণে পরিণত হয়। বলিতে গেলে অন্যান্য জীবের যেমন বাহিরে মাংস ও ভিতরে অস্থি থাকে, এ সমুদায় জীবের তাহার ঠিক বিপরীত। ইহাদের বাহিরে অস্থি ভিতরে মাংস। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে ঝিনুক খোলার অভ্যন্তরদেশ এক প্রকার উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ মসৃণ পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। এই পদার্থকে নেকার বা মুক্তার-মাতা (Nacre or Mother of Pearl) বলে আমাদের পুষ্করিণীতে যে ঝিনুক থাকে তাহার খোলার ভিতর এই নেকার পদার্থ অতি সামান্য ভাবে থাকে। ভারত সমুদ্রের ঝিনুকের ভিতরও এ পদার্থ অধিক পুরু হয় না। কিন্তু প্রশান্ত ও দক্ষিণ সমুদ্রের অনেক স্থানে এই পদার্থ এত পুরু হয় যে খোলার বহির্দ্দেশস্থ অনুজ্জ্বল অংশ হইতে ইহাকে অনায়াসেই পৃথক্ করিতে পারা যায়। এই পদার্থ বিলাত প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হয়। বোতাম প্রস্তুত ও নানারূপ শিল্প কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক কোন কারণে ঝিনুকের উদরে প্রদাহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঝিনুকদিগের ডাক্তার বৈদ্য নাই। আরোগ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাহারা ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে পারে না। জলে ধুইয়া প্রথম তাহারা সেই প্রদাহের কারণ দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে। যদি একান্ত দূর করিতে না পারে তাহা হইলে, শরীরের যে রস দ্বারা রৌপ্যসদৃশ শুভ্র বর্ণের উজ্জ্বল নেকার গঠিত হয় সেই রস দ্বারা গোল করিয়া প্রদাহ-স্থানস্থিত সেই দাহজনক পদার্থকে আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করে। এই রস ক্রমে ঘনীভূত ও কঠিন হইলেই তাহাকে মুক্তা বলে। কি কারণে ঝিনুকের উদরে প্রদাহ হয়? এবিষয়ে

নানা লোকের নানা মত। কেহ বলেন ঝিনুকের কোমল মাংসে সামান্য একটু আঘাত লাগিলেই প্রদাহ উপস্থিত হয়। ঝিনুকের ভিতর কৌশলে প্রদাহ উপস্থিত করিয়া কোন কোন স্থানের লোকে মুক্তা উৎপন্ন করে। জল হইতে ঝিনুক তুলিয়া তাহার ভিতর বালুকাকণা প্রবিষ্ট করিয়া পুনরায় তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিতে হয়। "নেকার" সঞ্চিত হইয়া ক্রমে তাহার ভিতর মুক্তার উৎপত্তি হয়। উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রবিশারদ লিনিয়াস সাহেব সুইডেন দেশে এই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন সে জন্য সে দেশের গবর্ণরজেনেরলের নিকট হইতে তিনি ৭০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। চীনদেশে লোকে পুষ্করিণীতে মুক্তার চাষ করে। ইউনিয়া হাইকিয়া নামক এক প্রকার ঝিনুকে এই মুক্তা জন্মে। জল হইতে ঝিনুকটী তুলিয়া তাহার ভিতর একটী শীশ নির্ম্মিত ছিটা-গুলি প্রবিষ্ট করিয়া লোকে পুনরায় তাহাকে জলে নিক্ষেপ করে। সেই ছিটা-গুলির চতুর্দ্দিকে "নেকার" সঞ্চিত হইয়া ক্রমে মুক্তায় পরিণত হয়। কখন কখন কোন বুদ্ধিমান্ লোক বুদ্ধদেবের অতি ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি ঝিনুকের ভিতর রাখিয়া দেয়। যথাকালে তাহার উপরও "নেকারের" পর্দ্দা পড়িয়া ঠিক সেই আকারের একটী মুক্তার উৎপত্তি হয়। তখন ঝিনুকের ভিতর নারায়ণ মুক্তা আকারে অবতার হইয়াছেন এই বলিয়া চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। লোকে দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া ষোড়শোপচারে পূজা প্রদান করে। মুক্তাস্বামীর দিনকত বিলক্ষণ দুপয়সা লাভ হয়। অবশেষে লোকের একটু ভক্তি কমিয়া আসিলে তিনি অধিক মূল্যে ইহা বিক্রয় করিয়া ফেলেন। বালুকা-কণা ছিটাগুলি অথবা অন্য উপায়ে মানুষ যে মুক্তা উৎপাদন করে, তাহা এক প্রকার আসল মুক্তা। বাজারে যে অতি সুলভ কৃত্রিম মুক্তা বিক্রীত হয়, ইহা সে মুক্তা নহে। কৃত্রিম মুক্তা কাচ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। সামান্য একটী ছিদ্রবিশিষ্ট গোলাকার ফাঁপা কাচের বর্ত্তুল প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার পর বাটা মাছের ন্যায় কোন প্রকার মৎস্যের উজ্জ্বল আঁইস গলাইয়া তরল আমোনিয়ার সহিত তাহাকে মিশাইয়া বর্ত্তুলের ভিতর পিচকারি করিয়া দিতে হয়। অবশেষে ছিদ্রটী বন্ধ করিয়া দিতে হয়। বহুকাল হইতে চীনে কাচের মুক্তা প্রস্তুত হইতেছিল। এখন কিন্তু ফরাশি দেশেই অধিক কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত হইয়া

থাকে। জাকুইন নামক একজন ফরাশি এই কার্য্য প্রথম আরম্ভ করেন। রোম নগরেও কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত হয়। কাচ বর্ত্তুলের বাহিরে আমিষের প্রলেপ দিয়া রোমের লোকে এই প্রকার মুক্তা প্রস্তুত করে।

বালুকা অথবা প্রস্তরকণা অথবা অন্য কোন বাহ্য বস্তু ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করিলে তাহার উদরে প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং তাহার জন্যই মুক্তার উৎপত্তি হয়। পারস্য উপসাগরে একবার দুইটী ঝিনুক উত্তোলিত হইয়াছিল। একটীর উদরে অতি ক্ষুদ্র একটী মৎস্য অপরটীর উদরে অতি ক্ষুদ্র একটী কাঁকড়া ছিল। ঝিনুকের উদরে যে স্থানে এই দুইটী বাহ্যবস্তু সন্নিবেশিত ছিল, সে স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঝিনুকদ্বয় "নেকার" দ্বারা দুইটী বস্তুকে আবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং কিয়ৎ পরিমাণে সেই "নেকার" মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় ঝিনুক দুইটী ধরা পড়িয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বাহ্য বস্তু প্রবেশ ব্যতীত ঝিনুকের উদরে আপনা আপনি এই রোগের উৎপত্তি হয়। ওলাউঠা, বসন্ত, যক্ষ্মা, প্লেগ প্রভৃতি রোগ যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়, ঝিনুকের প্রদাহও সেইরূপ এক প্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন ঝিনুকের ভিতর দুই একটী মৃত অণ্ড থাকিয়া যায়। সেই মৃত অণ্ড তাহার উদরে প্রদাহ উপস্থিত করে। প্রদাহ উপস্থিত হইলে ঝিনুক তাহাকে "নেকার" দ্বারা আবৃত করে। তাহাতেও কখন কখন মুক্তার উৎপত্তি হয়।

বিলাত প্রভৃতি দেশের লোক রসায়নশাস্ত্রের সহায়তায় হীরা মাণিক প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এ চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই। সে সকল দেশের লোক আমাদের মত জড় নহেন, তাঁহারা সজীব ও উদ্যমশীল। কৃত্রিম মুক্তা তাঁহারা প্রস্তুত করিয়াছেন। আসল সমুদ্রজাত আভিৎকুইলার মুক্তা উৎপাদন করিতেও তাঁহারা বিশেষরূপে যত্ন করিয়াছিলেন। সিংহল দ্বীপের যে অংশে মুক্তা উত্তোলিত হয়, সে স্থানে আরিপু নামক একটী গ্রাম আছে। আরিপু হইতে দেড় ক্রোশ দূরে ডেনমান্ নামক একজন সাহেব বৃহৎ একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া মুক্তা ঝিনুকের চাষ করিয়াছিলেন। পুষ্করিণীটী সমুদ্রের লবণ জলে পরিপূর্ণ

করিয়া, পলারাশি নির্ম্মিত পাড় দ্বারা তাহার চারিদিক পরিবেষ্টিত করিয়া, তাহার ভিতর তিনি দ্বাদশ সহস্র ঝিনুকশাবক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাত মাস পরে তিনি দেখিলেন যে কেবল সাতাইশটী ঝিনুক জীবিত আছে। প্রায় একশত মৃত ঝিনুকের খোলা পুষ্করিণীর তলদেশ হইতে বাহির হইয়াছিল। বার হাজার ঝিনুকের মধ্যে অবশিষ্ট ঝিনুক যে কোথায় গেল তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক তাহারা যে মরিয়া গিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল অনুমান দ্বারা তাহার কয়েকটী এইরূপ কারণ স্থির হইয়াছিল। (১) পুষ্করিণীতে সমুদ্রের ন্যায় গভীর জল ছিল না। (২) পুষ্করিণীতে যত ঝিনুকের ভালরূপ সঙ্কুলান হয় তাহা অপেক্ষা অধিক ঝিনুক রাখা হইয়াছিল। (৩) পুষ্করিণীতে প্রচুর পরিমাণে ঝিনুকের খাদ্য ছিল না। (৪) শৈশব অবস্থায় ঝিনুকের খোলা কোমল থাকে, সেই সময় নানারূপ মৎস্য ও অন্যান্য জীব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহারা নিহত হইয়াছিল। অন্যান্য স্থানেও সাহেবেরা সমুদ্রজাত মুক্তা-ঝিনুকের চাষ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিলাতে এক প্রকার ঝিনুক আছে, তাহাকে (oyster) অয়েষ্টার বলে। ইহাতে মুক্তা হয় না, কিন্তু সাহেবেরা ইহাকে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী বলিয়া আহার করেন। সিরকার সহিত এই ঝিনুকের শাঁস তাঁহারা কাঁচা ভক্ষণ করেন। বিলাত ও ফরাশিদেশের নিকট সমুদ্রের ভিতর এই ঝিনুকের চাষ করিয়া অনেক লোকে জীবিকানির্ব্বাহ করে। সুতরাং মুক্তা ঝিনুকের চাষ যে নিতান্ত অসম্ভব কার্য্য তাহা বোধ হয় না। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্বকূল ও সিংহল ব্যতীত পারস্যোপসাগর, দক্ষিণ আমেরিকায় পানামা, উত্তর আমেরিকার উপকূলে দ্বীপসমূহ সুলু দ্বীপ প্রভৃতি আরও নানা স্থানের সমুদ্রে মুক্তা জন্মে।

শঙ্খ।

শঙ্খ বিষয়ে অধিক লিখিবার আর স্থান নাই। সুতরাং এই বস্তুর বিবরণ আমাকে দুই চারি কথায় সমাপ্ত করিতে হইবে। জীবতত্ত্বে শঙ্খকে Turbinella rapa বলে। টুটিকোরিণ ও সিংহলের যে সমুদ্রে

মুক্তা-ঝিনুক বাস করে, শঙ্খ শম্বুকও সেই স্থানে বাস করে। শাঁখার গহনার সেকালে যে কত আদর ছিল তাহা সকলেই জানেন। মহা মহা রথিগণ সেকালে বাদ্যযন্ত্ররূপে শঙ্খ ব্যবহার করিতেন। সেই সমুদয় শঙ্খের নানারূপ নাম ছিল, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য ও অর্জ্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত ছিল। "শঙ্খচক্রগদাপদ্ম হস্তম্", বিষ্ণু এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। শঙ্খ নির্ম্মিত অলঙ্কার হাতে না থাকিলে সেকালে স্ত্রীলোক-দিগের হস্তপ্রদত্ত জল শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত না। পশ্চিম অঞ্চলে অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরা শঙ্খের পরিবর্ত্তে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বলয় ব্যবহার করিয়া থাকে। শঙ্খের আদর বঙ্গদেশেই অধিক ছিল। পূর্ব্বকালে যে সমুদয় বিদেশীয় ভ্রমণকারিগণ এদেশে আসিয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে শঙ্খ বিষয়ে নানা কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গার্সিয়া নামক ইতালি দেশের একজন ভ্রমণকারী শঙ্খ বিষয়ে এক অদ্ভুত কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "চঙ্কো নামক বস্তু বঙ্গদেশেই প্রেরিত হইয়া থাকে। সেকালে এই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ ছিল। শঙ্খ নির্ম্মিত অলঙ্কারের উপর বঙ্গমহিলাদিগের এত লোভ ছিল যে, উপঢৌকন স্বরূপ এই বস্তু প্রদান করিলেই প্রদাতার হস্তে তাহারা অকাতরে আপনাদের সতীত্ব বিসর্জ্জন করিত। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পাঠানেরা এদেশ অধিকার করিয়াছে সেই অবধি এ বস্তুর আদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। সেজন্য ইহার মূল্যও অনেক কমিয়া গিয়াছে।" শাঁখা পাইলেই এ দেশের স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব বিসর্জ্জন করিত। মন্দ কথা নহে। কেহ বোধ হয় তামাসা করিয়া গারসিয়াকে এই সমাচার প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিবরণে শঙ্খ "চঙ্ক" নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহা হইতেই ইহার ইংরাজী নাম (Chank) হইয়াছে। নালা, কুকে, মিকির প্রভৃতি আসাম প্রদেশের বন্যজাতিদিগের মধ্যে শঙ্খ নির্ম্মিত গহনার এখনও বিলক্ষণ আদর আছে। ঢাকার সৌখিন শঙ্খ বলয়ও কোন কোন ভদ্র মহিলা এখনও ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বলিতে গেলে পূর্ব্বে এই বস্তুর যেরূপ আদর ছিল, সে আদরের এখন কিছুই নাই।

টুটিকোরিণের নিকট সমুদ্রে প্রায় চল্লিশ হাত গভীর জলের নিম্নে

সমুদ্রতলের বালুকার ভিতর শঙ্খ—শম্বুক বাস করে। মুক্তা ঝিনুকের ন্যায় ইহারা বালির উপর থাকে না। পুষ্করিণীতে ঝিনুক যেরূপ কাদার ভিতর লুক্কায়িত থাকে, ইহারাও সেইরূপ বালুকার ভিতর লুক্কায়িত থাকে। ঝিনুক যেরূপ এক স্থানে দলে দলে আসিয়া একত্র বাস করে, ইহারা সেরূপ করে না। একটা এখানে আর একটা সেখানে এইভাবে ইহারা ছড়াইয়া থাকে। সেজন্য শঙ্খ আহরণ করিতে ডুবুরিদিগের কিছু অধিক কষ্ট হয়। ডুবুরিগণ যেভাবে সমুদ্র গর্ভ হইতে মুক্তা ঝিনুক উত্তোলন করে শঙ্খও তাহারা সেইভাবে তুলিয়া থাকে। মুক্তার ন্যায় এ কাজ বারমাস চলে না। অগ্রহায়ণ হইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত কেবল এই কয়মাস ডুবুরিগণ শঙ্খ উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। গবর্ণমেণ্টের খাস অধীনে থাকিয়া ডুবুরিগণ ঠিকা হিসাবে এই কাজ করিয়া থাকে। এক হাজার শঙ্খ তুলিলে মজুরি স্বরূপ ডুবুরিকে কুড়ি টাকা প্রদান করিতে হয়। সমস্ত দিন কাজ করিয়া সংগৃহীত শঙ্খ লইয়া মাঝি ও ডুবুরিগণ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রকূলে প্রত্যাগমন করে। সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইলে সংগৃহীত শঙ্খ প্রথম বাছাই হয়। বাছাই করিবার নিমিত্ত আড়াই ইঞ্চ ব্যাস পরিমাণ ছিদ্র সম্বলিত এক কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহৃত হয়। যে শঙ্খ এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া গলিয়া যায় ঠিকাদার পুনরায় তাহাকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে। সে শঙ্খ পুনরায় জীবিত হয় কি না তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। কিন্তু জীবিত হইবে, এইরূপ আশা করিয়া ঠিকাদার পুনরায় তাহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করে। বাছাই হইলে বড় বড় শঙ্খ-গুলিকে কিছু দিনের নিমিত্ত কোটুতে রাখিতে হয়। সেই স্থানে কিছু দিন থাকিলে শঙ্খ-খোলার অভ্যন্তর নিহিত মাংস পচিয়া যায়। তখন তাহাকে জলে ধুইলেই পরিষ্কার হইয়া যায়। পরিষ্কৃত শঙ্খ জুলাই মাসে নিলামে বিক্রীত হয়। এক সহস্র শঙ্খ সচরাচর পঞ্চাশ টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। সেতুবন্ধের নিকট সমুদ্রে প্রতি বৎসর প্রায়ই চারি লক্ষ শঙ্খ সংগৃহীত হয়। সিংহলে প্রতি বৎসর কত শঙ্খ উত্তোলিত হয় তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে এই কাজের নিমিত্ত এ স্থানের ঠিকাদারগণ প্রতি বৎসর সিংহল গবর্ণমেণ্টকে ষাটি হাজার টাকা প্রদান করিয়া থাকে। দক্ষিণাবর্ত্ত

বা দক্ষিণ-মোচড়া শঙ্খ অর্থাৎ যে শঙ্খে নিম্নদেশের বৃহৎ ছিদ্র বিপরীত দিকে থাকে তাহা অনেক মূল্যে বিক্রীত হয়, এমন কি এরূপ একটী শঙ্খ লক্ষ টাকায়ও বিক্রীত হইতে পারে। কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের হাতে যে শঙ্খ ছিল তাহা এই জাতীয় শঙ্খ। কিন্তু এরূপ শঙ্খ অতি বিরল, কেবল একটী এরূপ শঙ্খের কথা আমি অবগত আছি। সিংহল দ্বীপে জাফ্‌না নামক স্থানে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তি এইরূপ একটী শঙ্খ সমুদ্র হইতে তুলিয়াছিল। কিন্তু এই শঙ্খ আশানুরূপ মূল্যে বিক্রীত হয় নাই, কেবল সাতশত টাকায় ইহা বিক্রীত হইয়াছিল। শঙ্খ বিষয়ে আর আমি অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। সে জন্য অবশ্য এই স্থানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান।

রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি হিন্দুর পূজ্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে আমরা এই কথাই জ্ঞাত হইতেছি যে তৎকালে অনেকানেক কামিনীই যৌবন দশায় পরিণীতা হইতেন, যেমন সাবিত্রী ও দময়ন্তী, সীতা ও লক্ষ্মণা, উষা ও শকুন্তলা, রুক্মিণী ও কুন্তী প্রভৃতি রাজতনয়ার বিবাহ, বাল্যাবস্থা অতীত হইলেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

শুধু পৌরাণিক আখ্যায়িকাই যে তাহার প্রচুর প্রমাণ তাহাও নহে, এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃ মুনিগণের বচনও প্রমাণ স্বরূপ উপন্যাস করা যাইতে পারে। যথা—

"ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।
দশবর্ষাষ্টবর্ষাবা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥
অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ॥"

অর্থ—স্ত্রীধর্ম্মিণী না হইতে হইতেই ত্রিশ বর্ষীয় বর ষোড়শী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। কিন্তু কন্যার দশ বা আট বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে

ঐরূপ বয়স্কা বালিকা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের বিশেষ সহায় হইবে। অতএব পুষ্পিতা না হইতেই পিতা একবার মাত্র কন্যা প্রদান করিবেন।

উক্ত বচনে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত কামিনীকুলের পরিণয় কাল, এটী যে একটী নির্দ্ধারিত অভিমত, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হইল।

প্রমাণান্তরও দুর্লভ নয়। এই দেখুন পাঠক মহাশয়গণ মহর্ষি মনু স্থলান্তরে অবার কি বলিয়া গিয়াছেন

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেদ্‌ভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।

অর্থ—ত্রিশবৎসরের বর দ্বাদশ বৎসরের কন্যাকে স্বীকার করিবে। এই বচনে বার বৎসরের কন্যার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ পাওয়া যাইতেছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রথমতঃ যৌবনাবস্থাতেই রমণীবৃন্দের বিবাহই বৈধ বোধ হয় ও বাল্যবিবাহ অবিধেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। কেন না হিন্দুদিগের বিবাহ বন্ধন অতীব কঠোর। এই বিবাহ বন্ধন এতই সুদৃঢ় যে দম্পতির মধ্যে একের মরণেও, তাহা শিথিল হইবার নয়, পরলোক গমনের পরেও অবিচ্ছিন্ন থাকে। এই বন্ধন বিশ, বা পঁচিশ বৎসরের জন্য নহে। এমন স্থলে কন্যার পক্ষে স্বয়ং পাত্রের দোষগুণ বিচার না করিয়া, তাঁহার স্বভাব চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া কেবল অভিভাবকের কথায় অজ্ঞাত পুরুষের করে চিরকালের জন্য আত্মসমর্পণ করা, সামাজিক নিয়মে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। প্রত্যুত তাহার পরিণাম ফল বিষময় হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং স্বয়ং বর এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রথা যে সমীচীন ছিল এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। স্বয়ম্বর বা গান্ধর্ব্ববিবাহ যুক্তিসঙ্গত হইলে অগত্যা কন্যার ১৭।১৮ বৎসর বয়স ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ ৮।১০ বৎসরের বালিকার উপর বর নির্ব্বাচনের ভার ন্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত হয় না। কলিযুগে স্বয়ম্বর বিবাহ ও গান্ধর্ব্ববিবাহের নিষেধ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, তবে কেন যে উহা সমাজে অপ্রচলিত হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তবে স্বয়ম্বরপ্রথা বা গান্ধর্ব্ব বিবাহ উঠিয়া যাওয়ার এই এক হেতু হইতে পারে যে মানবজাতির হৃদয় সর্ব্বাগ্রে রূপের দিকেই ধাবিত হয়, চক্ষু রূপেরই পক্ষপাতী। যেখানে আকৃতি সুশ্রী দেখে সেখানেই অগ্রে মন অনুরক্ত হয় মূর্ত্তি বিশ্রী দেখিলে একবারেই মন

বিরক্ত হইয়া উঠে, আর যেন গুণের পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, বিদ্যা বল বুদ্ধি বল আর কিছুই ভাল বলিয়া মনে লয় না। এখন বর নির্ব্বাচনের ভার যদি কন্যার উপর দেওয়া যায়, তবে অশিক্ষিতা বা অল্প শিক্ষিতা অধীরপ্রকৃতি যুবতী হয়ত নির্গুণ-মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য রূপবান্ সোনার কুম্ড়াতেও ভুলিয়া যাইতে পারে, এবং তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া চিরজীবন ক্লেশ ভোগ করিতে পারে। আর সর্ব্বগুণাধার কথঞ্চিৎ কুরূপ নীলরতনেও উপেক্ষা করিতে পারে। এই হেতুতেই বোধ হয় হিন্দুসমাজে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের প্রথা রহিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং বর নির্ব্বাচনের ভার পিতার কিম্বা অপরাপর অভিভাবকের হস্তেই রহিল, এজন্যই বোধ হয় মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

"কন্যা মৃগয়তে রূপং"
মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং ॥

অর্থ—বরনির্ব্বাচনের ভার কন্যার উপরে দেওয়া যায় না, কেননা কন্যা কেবল রূপেরই অন্বেষণ করে, মাতার উপরেও দেওয়া যায় না, মা কেবল কন্যার খাওয়া পরার সুখ-স্বচ্ছন্দই দেখিবেন; কন্যা সর্ব্বদা অলঙ্কারে গা ঢাকিয়া অন্নপূর্ণা প্রতিমার মত বসিয়া থাকিলেই মার আনন্দ, রূপগুণ তত থাকুক্ বা না থাকুক্, ছেলের অর্থ সম্পত্তি থাকিলে মার আর তত আপত্তি থাকে না। কিন্তু বিবেচক পিতা রূপ ততটা দেখিবেন না, ধন ততটা দেখিবেন না, দেখিবেন বরের চরিত্র কেমন, বিদ্যাবুদ্ধি কিরূপ, যদি পাত্র সদ্গুণ সম্পন্ন হয় তাহা হইলেই পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের স্বর্গীয় সুখে চিরদিন কন্যা নিমগ্না থাকিতে পারিবে তাই পিতা গুণের অন্বেষণ করেন।

প্রাচীন ঋষিরা বিবাহ সম্বন্ধে বরের গুণের এত পক্ষপাতী ছিলেন যে কহিতে কুণ্ঠিত হন নাই—

"কাম মামরণং তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তু মত্য পি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥"

অর্থ—বরং ঋতুমতী অবস্থায় ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কন্যাকে গৃহে রাখিয়া দেওয়া উচিত তথাপি মূর্খের নিকট সমর্পণ করা কখন উচিত নহে।

এই বচনটী মূর্খহস্তে পতিতা কোনও অবলার দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াই মূর্খের নিকট কন্যা সমর্পণ অতি দোষাবহ ইহা বুঝাইবার জন্যই মনু বলিয়া গিয়াছেন, নতুবা বিশেষ চেষ্টায় সদ্গুণ সম্পন্ন পাত্র না ঘটিলে অগত্যা মূর্খের নিকট দিবে না, চিরদিন মেয়েকে আইবড় করিয়া ঘরে রাখিবে এমন কথা নহে। যেমন—বরং বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব তথাপ্য-কর্ত্তব্যমাচর" অর্থাৎ বরং বিষ খাইয়া মর, গলায় দড়ি দাও, তবুও দুষ্কর্ম্ম করিও না, এস্থলে যেমন সত্য সত্য বিষ খাইবার বা গলায় দড়ী দেওয়ার উপদেশ করা হয় নাই, কিন্তু দুষ্কর্ম্ম করা ভাল নহে ইহাই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ কন্যাদান স্থলেও অসৎ পাত্রে কন্যা দান অতি অপ্রশস্ত ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র দ্বৈতনির্ণয়গ্রন্থে উক্ত মনু বচনের ঐরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

সে যাহা হউক যেকারণে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ হিন্দুসমাজে উঠিয়া যাউক্ না কেন তাহা অদ্যকার অলোচ্য বিষয় নহে।

কিন্তু "ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং" এই বচনের দ্বারা এবং "ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎভার্য্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং" এই বচনের দ্বারা বার বৎসর ও ষোল বৎসরেও কন্যার বিবাহ পাওয়া যায়, তাহা সমাজে কেন বর্জ্জিত হইল? ইহাতে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে কি না? এবং ঋষিগণ ৮।৯।১০ বৎসরের বালিকা বিবাহের জন্য সমস্বরে চীৎকার করিয়া মাথার দিব্য দিয়া বিধান করিয়া গিয়াছেন কেন? ইহাতেও কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে কি না? অদ্যকার প্রবন্ধের ইহাই আলোচ্য বিষয়। এখন বালিকার বিবাহ সম্বন্ধে কোন্ ঋষির কি মত ইহাই উদ্বাহতত্ত্ব হইতে দেখান যাইতেছে—

যমের বচন—

"কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাঽপ্রদত্তা গৃহে বসেৎ।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাং সাকন্যা বরয়েৎ স্বয়ং ॥

অঙ্গিরার বচন—

"প্রাপ্তে তু দ্বাদশেবর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্ত কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতং ॥"

"তস্মাৎ সংবৎরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষজঃ॥"

রাজমার্ত্তণ্ড বচন—সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতং॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকংযান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাং॥
যস্ততাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥"

ইত্যাদি বচনের অনুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন, সকল বচনেরই তাৎপর্য্যার্থ কন্যা ঋতুমতী না হইতে দশ হইতে বার বৎসরের মধ্যেই তাহাকে বিবাহ দিবে ইহার পর বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত দোষাবহ।

যদিও বেদার্থেরই উপনিবন্ধ বিধায় ঋষি বচন বিশেষ প্রমাণ তাহার উপরে আমাদের সংশয় করা উচিত নহে, ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই ঠিক, অভ্রান্ত, অতর্কনীয়, অবনত মস্তকে মানিয়া লওয়া উচিত, তাঁহাদের কথার উপরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা বা প্রতিবাদ করা বা কারণ অনুসন্ধান করা চলে না, কেন না "আজ্ঞাগুরূণামবিচারণীয়া" গুরুর আজ্ঞার বিচার করিবে না, গুরুর আজ্ঞার উপরে "কেন" খাটে না কথা ঠিক, ঋষি বাক্যের উপরে আপত্তি নাই; একথা অকাট্য, অপ্রতিবাদ্য।

কেননা ঋষিগণ যোগ মাহাত্ম্যে যাহা বুঝিয়াছেন, যোগের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব দেখিয়াছেন, বহুদিন দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন, যে বিষয়ের চিন্তার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন, সে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব আমাদের মত কীটাণুর বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; ঋষিদিগের সিদ্ধান্তিত বিষয়ের দোষগুণের চিন্তা করিয়া আমাদের সেই সময়টা নষ্ট করা বৃথা, ঋষিরাই চিন্তার পরাকাষ্ঠা করিয়া মীমাংসিত বিষয় আমাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আমরা নিরাপত্তিতে কেবল তাহা মানিয়া লইলেই আমাদের সুবিধা।

এজন্য মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলিয়াছেন "আর্ষন্তু যোগিনাং বিজ্ঞানং লোক্যবুৎপাদনায়নালং।"

অর্থাৎ ঋষিদিগের যৌগিক বিজ্ঞান লোকদিগকে বুঝাইতে সমর্থ নহে, যেমন অনুবীক্ষণের সাহায্যে যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শনের যোগ্য হয়, তাহা এই চর্ম্মচক্ষুতে দেখা যায় না, সেইরূপ ঋষিগণের যোগচক্ষুর দৃশ্য পদার্থ আমাদের দর্শনযোগ্য হইতে পারে না।

ঋষিরা যোগবলে দেখিয়াছিলেন সংক্রান্তি, অমাবস্যা পূর্ণিমা ও দ্বাদশী তিথিতে সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিলে পিতৃহত্যার পাপ হয়, কিন্তু আমরা এমন কোন লৌকিক বিজ্ঞান বা যুক্তিতে তাহার কি মাথামুণ্ড বুঝিব?

এজন্য মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

"হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥"

অর্থাৎ যাহারা ঋষিদিগের নির্ণীত ধর্ম্মকর্ম্মের উপরে হেতু অনুসন্ধান করিবে তাহারা নাস্তিক, তাহাদিগের সহিত কথামাত্রই কহিবে না।

এ সমস্ত কারণে মুনি বাক্যের উপরে কারণ অনুসন্ধান না করা উচিত। কিন্তু এখন আর সেকাল নাই, যে কারণেই হউক ইদানীং ধর্ম্মকর্ম্মেও কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি না? শ্রাদ্ধ করিবে কেন? দশ বৎসরেই কন্যার বিবাহ দিবে কেন? ষোল বৎসরেই দিবে না কেন? এই "কেন"রযুগ উপস্থিত হইয়াছে? এই "কেন"র যুক্তি না জানিতে পারিলে মনটা কেমন কেমন করে ও কেমন অতৃপ্তি বোধ হয়, সুতরাং অগত্যা বাধ্য হইয়া ধর্ম্ম বিষয়েও অনেকের যুক্তি অনুসরণ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে।

এজন্য অদ্য বিবাহ বিষয়ে বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করিব, ইহার যথার্থতা এবং প্রামাণ্য বিষয়ে সহৃদয় পাঠকবৃন্দের পক্ষপাতশূন্য বিবেচনার উপরেই নির্ভর রহিল।

বালিকা বিবাহেই গুণ কি? আর যুবতি-বিবাহেই বা দোষ কি ইহাই সম্প্রতি আলোচ্য।

দেখা যায় বর্ত্তমান বিজ্ঞানযুগের অনতিপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের তন্ত্রশাস্ত্রে আছে "ব্রহ্মাণ্ডে যেগুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে" অর্থাৎ বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে যে যে ধর্ম্ম, গুণ বা দোষ আছে শরীরেতেও তৎসমুদায়ই আছে।

যেমন মহাব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্র, গিরিনদী, বন, বন্যপ্রাণী উদ্ভিজ্জাদি, স্বর্গ, নরক ও অমৃত, বিষ প্রভৃতি স্থূলরূপে বিরাজিত রহিয়াছে,

সেইরূপ এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডভূত শরীরেও সেই সেই চন্দ্র সূর্য্যাদি সকলই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত আছে, যথা—তিমির বিনাশ করিয়া আলোক প্রদান করে বিধায় দুটী চক্ষুই দৈহিক চন্দ্র ও সূর্য্য, একসের জলে যে পরিমিত মুড়ি ভিজান যাইতে পারে, সেই মুড়িগুলি অক্লেশে জিহ্বা ভিজাইয়া লয় অতএব জিহ্বাই জলবাহিনী নদী, আহার্য্য বস্তু নিচয় পরিপাক করে বিধায় জঠরানলই দৈহিক বহ্নি; যেমন ভূতলে কুশ, কাশ দুর্ব্বা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জাদি জন্মিয়া থাকে সেরূপ এই শরীরেও রোম, কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি রহিয়াছে, যেমন অরণ্যে মৃগ প্রভৃতি জীব জন্তু বিচরণ করে, সেইরূপ কেশাদিতে উৎকুণ (উকুণ) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, উদরে কত কত কৃমি জন্মিতেছে, উহাদেরও স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ রহিয়াছে, এইরূপ অপরাপর বিষয়ও মিলাইয়া লইতে পারা যায়।

বহির্জ্জগতে যেমন অমৃত এবং বিষ দুইটী পদার্থ স্থূলরূপে আছে সেইপ্রকার এই শরীরেও অমৃত ও বিষ দুইটী পদার্থ প্রকারান্তরে রহিয়াছে। আমাদিগের দশনাগ্রে ও নখাগ্রে বিষ আছে, মানবদেহে বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণ মল, শ্লেষ্মা, অশ্রু, নেত্র মল ও ঘর্ম্ম এই দ্বাদশ প্রকার মলই বিষ বিশেষ জানিবে।

"বিষস্য বিষমৌষধং" বিষের ঔষধ বিষ ইহা সিদ্ধান্তিত শাস্ত্র। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যদি কেহ মরিবার জন্য অথবা ভ্রমে বিষ খাইয়া থাকে, তবে সেই বিষদোষ নাশ করিবার জন্য তাহাকে বিষ্ঠা আহার করান হইয়া থাকে। তদ্রূপ যুবকের মুখে বা নাসিকায় যে ব্রণ জন্মে তাহাতে তাহার নাসিকার শ্লেষ্মা দুই তিনবার দিলেই উহা মরিয়া যায়, ইহা অনেক প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে, এবং গলপার্শ্ব বা বঙ্ক্ষণ ফুলিয়া প্রদাহ হইলে লালার প্রলেপ দিলেই কমিয়া যায় ইহাও অনেক দেখা গিয়াছে। এতদ্দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে মানব শরীরে বিষবিশেষ আছে।

সেই বিষ বিশেষ অসাধু ব্যক্তির শরীরে পাপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, অসাধু শরীরের সেই পাপ, আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন, ইত্যাদি কারণে অপরের শরীরে সংক্রমিত হয়, সংক্রমিত হইলে সেই সংসর্গকারী অসাধুরূপে পরিণত হয়, বা বিকৃত স্বভাব হয় বা উৎকট পীড়াগ্রস্ত হয়, বা মরিয়াও যাইতে পারে।

সাধুদিগের শরীরেও সেই বিষ বিশেষ আছে বটে, কিন্তু পুণ্য অর্থাৎ সাধুবৃত্তিরূপ অমৃত দ্বারায় উক্ত বিষ বিশেষ অভিভূত থাকে, সেই জন্যই সাধু সংসর্গ প্রার্থনীয়।

সে যাহা হউক কোন কোন ব্যক্তি কাহার কাহার সংসর্গে হৃষ্ট পুষ্ট হয়, কেহ কেহ বা জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়। প্রাচীন মহর্ষিগণ কাহার শরীরে বিষ প্রবাহ, কাহার শরীরে বা অমৃত প্রবাহ আছে ইহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অন্যান্য চিহ্ন দর্শনে নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেন। সেই জন্য কাহার সংসর্গ কাহার সহ্য হইবে কাহার বা হইবে না ইহা বলিতে সমর্থ হইতেন।

কিন্তু অধুনা স্থূলমতি আমরা আর শরীরের চিহ্ন দেখিয়া কাহার শরীর বিষাক্ত কাহার শরীর বা অমৃতাক্ত তাহা বুঝিতে পারি না। না পারিলেও বাঁচিতেই সকলের ইচ্ছা, মরিতে কেহই প্রস্তুত নহে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

রঘুনন্দনকৃতউদ্বাহতত্ত্বে উক্ত আছে,—

"নমূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি।
মেঢ্রশ্চোন্মাদশুক্রাভ্যাং হীনঃ ক্লীবঃ স উচ্যতে॥"

অর্থ—যাহার প্রস্রাবে ফেন জন্মে না এবং বিষ্ঠা জলে ডুবিয়া যায় * *
সেই ব্যক্তি ক্লীব, তাহাকে কন্যা দান করিবে না।
এইরূপে বরের পরীক্ষা করা হইত। * *

এবং "ত্রীণি যস্যাঃ প্রলম্বানি ললাট মুদরং ভগং।
ক্রমেণ ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং॥"

অর্থ—যে কন্যার ললাট, উদর, জননেন্দ্রিয় লম্বমান দীর্ঘাকার হয় সেই কন্যা যথাক্রমে শ্বশুর দেবর ও পতি ঘাতিনী হইবে। ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে কন্যাও পরীক্ষিতা হইত।

কিন্তু এখন সমাজের প্রথা অনুসারে পরীক্ষা করা দূরের কথা পরীক্ষার কথা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। যদিও ঠিকুজী অনুসারে গণ বর্ণও যোটক কোথাও কিঞ্চিৎ দেখা হয়, তাহা দেখারই মধ্যে গণ্য নহে।

কিন্তু তথাপি সকলের জীবনই প্রার্থনীয়, মরণ প্রার্থনীয় নহে।

এই একটা কিম্বদন্তী অনেক দেশেই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে সকল কুকুর বা

বিষধর সর্প বার বার প্রাণীকে দংশন করে, তাহাদের বিষবেগ ক্রমশঃ কমিয়া যায়. তাহার পরে সেই কুক্কুর.বা সর্প কাহাকে ও দংশন করিলে সেই দষ্ট ব্যক্তি আর বিষে আক্রান্ত হয় না এবং মরেও না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মানব শরীরেও বিষ আছে, সুতরাং স্ত্রীজাতির শরীরেও সেই বিষ পরিত্যক্ত হয় নাই, সেই বিষ বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হয়। যে সময়ে বালিকাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উপচিত হয় যৌবন উদ্ভিন্ন হয়, তখন তাঁহাদের শরীরে অল্প অল্প বিষাঙ্কুর পরিস্ফুট হইতে থাকে, তখন সেই উচ্ছলিতবিষবেগা যুবতির পরিণয় করিয়া তাহার সহিত আলাপ ও গাত্র-স্পর্শাদি সংসর্গে প্রথমপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সেই কামিনীর দৈহিক বিষবেগ প্রশমিত হইলে দ্বিতীয় পতি উহার সংসর্গে আর বিপন্ন হইবেনা, প্রত্যুত সুখেই কাল অতিবাহিত করিবে।

একথা জোতির্ব্বিৎপ্রবর রামদাস কবিবল্লভকৃত জ্যোতিঃসারার্ণবে লিখিত আছে যথা—

"ভূমির্ন স্পৃশ্যতে যস্যা অঙ্গুল্যাচ কনিষ্ঠয়া।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্যাৎ দ্বিতীয়ঞ্চাভিনন্দতি॥" (প্রথম তরঙ্গ)

অধিক কি লিখিব? যে কামিনীর উদর বিলম্বিত, জঙ্ঘাদেশ স্থূল, নাসাস্থূল, তাহার দৈহিক বিষ-সংস্রবে ক্রমশ এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত আটটী যাবৎ পুরুষ বিনষ্ট হয়, তৎপরে বিষবেগ শ্লথ হইলে নবম পুরুষ আর মরিবেনা, অথচ সেই পুরুষেই বিষবেগ প্রশমিত হয়। সেই বিষধরী যুবতী নবম পুরুষের সহিত সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। একথাও রামদাস কবিবল্লভকৃত জ্যোতিঃসারার্ণবের পঞ্চম তরঙ্গ—

"যস্যা মধ্যং ভবেদ্দীর্ঘং সা স্ত্রী পুরুষঘাতিনী।
ভূমির্ন স্পৃশ্যতেঽঙ্গুল্যা সা নিহন্যাৎ পতিত্রয়ং॥ ১
প্রদেশিনী ভবেদ্দীর্ঘা সাস্যাৎ সৌভাগ্য শালিনী।
ঊর্দ্ধা যস্যা ভবেদ্দীর্ঘা পতিং হন্তি চতুষ্টয়ং॥
লম্বোদরী স্থূলজঙ্ঘা স্থূলনাসা চ যা ভবেং।৩
পতয়ো হষ্টৌ ম্রিয়েরন্ সা নবমেতু প্রসীদতি॥

বিরলা দশনা যস্যাঃ কৃষ্ণাক্ষী কৃষ্ণজিহ্বিকা।
ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়মপি বিন্দতি॥
যস্যা অত্যুৎকটৌ পাদৌ বিস্তৃতঞ্চ মুখং ভবেৎ।
উত্তরোষ্ঠেচ লোমানি সা শীঘ্রং ভক্ষয়েৎ পতিং"॥

অর্থ—যেই কন্যার মধ্যদেশ দীর্ঘ সে পুরুষ ঘাতিনী হয়, এবং যাহার মধ্যাঙ্গুলী ভূমি স্পর্শ করে না সেই বিষকন্যা তিনটী পতি বিনাশ করিবে।

যে কন্যার পায়ের প্রদেশিনী অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুলী অপেক্ষায় দীর্ঘ হয়, সে কন্যা ভাগ্যবতী হইবে। কিন্তু সেই প্রদেশিনী দীর্ঘা হইয়া যদি উপরে উঠিয়া থাকে তবে সে কন্যা পতিচতুষ্টয় বিনষ্ট করিবে। ২।

যে কন্যার উদর লম্বা, জঙ্ঘা ও নাসিকা স্থূল, তাহার আটটী পতিই মরিবে, পরে নবম পতিতে সে প্রসন্না থাকিবে। ৩।

যে কন্যার দন্ত বিরল, ফাঁক ফাঁক, চক্ষু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, তাহার প্রথম ভর্ত্তা মরিবে, এবং সে দ্বিতীয় ভর্ত্তা লাভ করিবে। ৪।

যে কন্যার পা দুখানি উৎকট অর্থাৎ পাদতল সম্পূর্ণরূপে ভূতল স্পর্শ করে না, পায়ের নীচে ফাঁক থাকে, এবং মুখকুহর অতি বিস্তৃত ও ঠোঁটের উপরি-ভাগে রোম রেখা থাকে সে শীঘ্রই পতিকে সংহার করিবে। ৫।

অপিচ বিষকন্যার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যথা রামদাস কবিবল্লভ কৃত জ্যোতিঃসারার্ণবে যষ্ঠ তরঙ্গে—

"রিপুক্ষেত্র গতৌ তৌতু লগ্নে যদিশুভগ্রহৌ।
ক্রূরস্তত্র গতোঽপ্যেকো ভবেৎ স্ত্রী বিষকন্যকা"॥১
"ভদ্রা তিথির্যদাশ্লেষাশতভিষা চ কৃত্তিকা"।
আঙ্গার রবিবারেষু ভবেৎ স্ত্রীবিষকন্যকা॥২

অর্থ—যে কন্যার জন্ম লগ্নে দুইটী শুভগ্রহ থাকে, এবং ঐ শুভগ্রহ দুইটীর যদি সেই লগ্ন স্থান শত্রুর গৃহ হয় এবং একটী ক্রূর গ্রহ থাকে তবে সে বিষকন্যা হইবে। তাহার বিষ সংসর্গে স্বামী বাঁচিবে না॥১

অপিচ মঙ্গল বা রবিবারে, দ্বিতীয়া সপ্তমী অথবা দ্বাদশী তিথিতে এবং অশ্লেষা শতভিষা কিম্বা কৃত্তিকানক্ষত্রযোগে যে কন্যা জন্মে তাহাকে বিষকন্যা বলিয়া জানিবে। তাহার বিষ সংসর্গে পুরুষ বাঁচিবে না॥২

এইরূপ বিষকন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইলেও তাহার সংসর্গে পুরুষ অকালে কালকবলে পতিত হইবে।

উক্তবিধ বিষকন্যার মারণীশক্তি আছে ইহা নিশ্চয় জানিয়াই চন্দ্র গুপ্তের নিধনার্থ মহানন্দের মন্ত্রী রাক্ষসকর্ত্তৃক পরমসুন্দরী বিষকন্যা প্রেরিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে "হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকের (সংহিতা ১১৫ পৃ) যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সদর্থ বলিয়া বোধ হয় না। 'হৈতুক' শব্দে যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্মের কারণ অনুসন্ধান করে এরূপ অর্থ নহে। হৈতুক শব্দের অর্থ 'নাস্তিক'। ভাষ্যকার মেধাতিথির মতে "পরলোক নাই, দানফল নাই, হোমফল নাই এইরূপ যাহাদের সিদ্ধান্ত তাহারাই হৈতুক। নাস্তিকা নাস্তি পরলোকো নাস্তি দত্তং নাস্তি হুতমিতি স্থিতপ্রজ্ঞাঃ" কুল্লুকের মতে যাহারা বেদবিরোধি তর্ক করে তাহারা হৈতুক। ফলতঃ শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানার্থ তদনুকূল যুক্তি তর্ক করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। যুক্তি তর্কহীন অন্ধ বিশ্বাস শাস্ত্রারদিগের অভিমত নহে। এইরূপ স্থলান্তরে বুঝিতে হইবে। সং।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, আষাঢ় ও শ্রাবণ। [৩য়, ৪র্থ সংখ্যা

সাহিত্য-সংহিতা।

('সাহিত্য-সভার' মাসিক পত্রিকা)।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস,

"SAHITYA SABHA."

PATRON :—

The Hon'ble Sir JOHN WOODBURN, M. A.,

K. C. S. I., C. S., &c., &c.

Lieutenant-Governor of Bengal.

মহামান্য বঙ্গেশ্বর বাহাদুর, সার জন্ উড্‌বরন্, এম, এ,

কে, সি, এস্, আই, সি, এস্, মহোদয়

"সাহিত্য-সভার" অভিভাবক হইয়াছেন।

কলিকাতা

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রকাশিত।

২০।১ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, আলফ্রেড প্রেসে

শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

☞ "সাহিত্য-সভার" সভ্যেরা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনরচিত দানসাগর গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহিত সাহিত্য-সংহিতায় মুদ্রিত হইতেছে। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রিমমূল্য প্রেরণ করিয়া সংহিতার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

২। ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাৱলীসহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সটীক ও সানুবাদ মুদ্রিত হইতেছে। অর্দ্ধাংশের অধিক মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুগণ নাম ধাম পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৩। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ দেয় অগ্রিমমূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৪। সভার সভ্যগণ ও সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ টাকাকড়ি, প্রবন্ধ ও পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ।
সাহিত্য-সভার সহযোগী সম্পাদক।
১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক।
১।	বৈষ্ণবধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যযুগ।	শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী এ, এম, এ।	১২১
২।	জীবের স্বাধীনতা বা অদৃষ্টবাদ।	„ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।	১৪৬
৩।	নাগার্জ্জুন।	„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ।	১৫৪
৪।	জপজী।	„ আশুতোষ দেব, এম,এ,এফ,টি, এস্।	১৫৭
৫।	প্রতীচ্য-মায়াবাদ।	„ „ „	১৭৫
৬।	ধর্ম্মপদের মূল ও ব্যাখ্যা	„ চারুচন্দ্র বসু।	১৮৮
৭।	অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।	মৌলবী শ্রীআবদুল করিম।	১৯৯
৮।	অধ্যাত্ম-তত্ত্ব।	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।	২১২
৯।	বঙ্গভাষার আবাহন-গীতি।	„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ।	২২২
১০।	হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান।	„ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	২২৫
১১।	কার্য্য-বিবরণ।	... ...	২৩০
১২।	দানসাগর।	„ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	৯—২৪

☞ প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

সাহিত্য-সংহিতা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯, আষাঢ় ও শ্রাবণ [৩য়, ৪র্থ সংখ্যা।

বৈষ্ণবধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যযুগ।

গৌরাঙ্গধর্ম্মের অভ্যুত্থান।

অনুক্রমণিকা।

অতিদীর্ঘ তমস্বিনীও প্রভাতা হয়। বঙ্গের ধর্ম্মজীবনেও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে মহানিশার সঞ্চার হইয়াছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা প্রভাতা হইতে চলিল। যাহার আগমনপ্রক্রমে বঙ্গবাসী হিন্দুসন্তান রাজশ্রীভ্রষ্ট হইয়া আর্য্যজনসেবিত সনাতনধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছসংসর্গে ম্লেচ্ছপথানুবর্ত্তী হইয়াছিল, দেহগেহ সার করিয়া ভগবচ্চিন্তা বিস্মৃত হইয়াছিল, ধূপনৈবেদ্যোপহারে শাস্ত্রসম্মত পূজায় জলাঞ্জলি দিয়া মদ্যমাংসাদ্যুপচারে ভবানীপূজনে ও যক্ষ বাশুলি বিষহরির অর্চ্চনে প্র[illegible] হইয়াছিল, হরিবাসরাদিতে নামকীর্ত্তনে হরিকথাদিশ্রবণে ও হরিলীলানুকরণ দর্শনে বীতস্পৃহ হইয়া মঙ্গলচণ্ডীর গীতে, যোগীপাল ভোগীপাল, মহীপালের গীতে রাত্রি জাগরণ অভ্যাস করিয়াছিল, শ্রাদ্ধ মহোৎসবাদিতে অর্থব্যয় অপব্যয় মনে করিয়া মিতালি পাতাইতে ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, আচাররহিত শুষ্কজ্ঞান, শুষ্কতর্ক মাত্র পাণ্ডিত্যের নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছিল, সেই মহাতমিস্রার দুর্ভেদ্য আবরণও কি যেন কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতির উদ্গমনপ্রাক্কালে অপসরণোন্মুখ হইল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধুর কাকলি বঙ্গীয় সমাজে নিশার অবসান বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া দিল। কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, গুণরাজ, কবীন্দ্র, শ্রীকর ও অনন্তের রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতাত্মক ভগবন্নামানুবাদ অদূরবর্ত্তী শুভদিনের সূচনা করিল। ঈশ্বর, কেশব, অদ্বৈত, শ্রীবাস, আচার্য্যরত্ন, হরিদাস, নিত্যানন্দ, গঙ্গাদাস,

মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবের আবির্ভাবে ক্রমে বঙ্গের ধর্ম্মজীবনে সত্য সত্যই নব ঊষার অভ্যুদয় হইল। অন্ধকার ও আলোকের এই সম্মিলনকাল ঐতিহাসিকের বড়ই হৃদয়স্পর্শী।

অদ্বৈতের ধর্ম্মমণ্ডলী।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এই অবসানকাল বঙ্গের পুণ্যময় যুগসন্ধি। এই সময়েই সমাজের বিষম দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া মাধবেন্দ্র-শিষ্য বৈষ্ণবশিরোমণি অদ্বৈতাচার্য্য সমাজের উদ্ধার সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। দেখিলেন ভগবানের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাহীন হইয়াই সমাজের এত দুর্গতি। বিশুদ্ধ ভক্তির মহিমা প্রচার করিলেই সমাজ নবজীবন লাভ করিবে। সৎকর্ম্মানুরাগ ভগবদ্ভক্তির নিত্যসহচর। আর ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাসের অভাবই ধর্ম্মনীতির মূলোচ্ছেদী ও উচ্ছৃঙ্খল পাপাচারের জনয়িতা। সমাজসংস্কার সুতরাং ভক্তিমাহাত্ম্যপ্রচার মাত্র সাপেক্ষ। অদ্বৈত কি তাহাতে সুসমর্থ? একবার ভাবিলেন তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তি হয়ত এতাদৃশ বিপুল আরম্ভের উপযোগিনী নহে। কিন্তু অপেক্ষার আর সময় নাই। অমনি কার্য্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাস, অচিরে ক্ষুদ্রশক্তিতে মহাশক্তির সমাবেশ হইবে। যাঁহার কার্য্য তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না। তিনি স্পষ্টই আসন্ন বন্ধুগণকে বলিলেন—

"শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়নগোচর॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আনিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥"

দেখিতে দেখিতে আচার্য্য নবদ্বীপে বঙ্গের-জাতীয়কেন্দ্রে এক বৈষ্ণবমণ্ডলী স্থাপন করিলেন। দলে দলে বৈষ্ণবগণ দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া সেই মণ্ডলীতে যোগদান করিলেন। সুদূর চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও উড়িষ্যা হইতে ভক্তগণ আসিয়া আচার্য্যের সহকারী হইলেন। শনৈঃ শনৈঃ মণ্ডলীর কার্য্যারম্ভ হইল। দুই সন্ধ্যা গীতা ভাগবত পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। ভক্তিযোগই একমাত্র নিঃশ্রেয়স সাধন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। মণ্ডলীর দৈনন্দিন অধিবেশনের আরম্ভে, মধ্যে ও অবসানে "কৃষ্ণকথা কৃষ্ণপূজা নাম সংকীর্ত্তনের" ঘটাঘটি দেখিয়া নবদ্বীপ সমাজ চমকিয়া উঠিল।

গৌর নিতাই।

অদ্বৈতের প্রতিজ্ঞাবাক্য এইবার সফল হইতে চলিল। কুশাগ্রবুদ্ধি অশেষশাস্ত্রপারদর্শী নিমাই পণ্ডিত পিতৃপিণ্ডোদ্দেশে গয়ায় গমন করিয়া কৃষ্ণগতপ্রাণ ঈশ্বরপুরীর নিকট ভক্তিযোগে দীক্ষিত হইয়া আসিলেন। প্রত্যাগমন করিয়াই নিমাই বৈষ্ণবমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া প্রচণ্ডকীর্ত্তনমদে নবদ্বীপ মাতাইয়া তুলিলেন। নবদ্বীপে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বঙ্গের পণ্ডিত সমাজ দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এক বিরাট্ ব্যাপারের সূত্রপাত হইল।

স্বল্পকাল পরে নিত্যানন্দ আসিয়া নিমাইয়ের সহচর হইলেন। ভক্তি-তীর্থে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম হইল। নবদ্বীপের গৃহে গৃহে পল্লীতে পল্লীতে হরিনামস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগাই মাধাইয়ের ন্যায় কত ঘোর পাপাচারীও এই নামস্রোতে মজ্জন করিয়া পবিত্র হইল।

নিমাইসন্ন্যাস

নাম-বন্যায় নবদ্বীপ ডুবাইয়া নিমাই দেশদেশান্তরে বর্ণবয়োধর্ম্মাশ্রম-নির্ব্বিশেষে সেই ভক্তিযোগ প্রচার করিতে সংকল্প করিলেন। কিন্তু তিনি অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, গৃহীর হস্তে ধর্ম্মপ্রচার হইলে তাহাতে সার্ব্বজনীন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অমনি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া কণ্টকনগরীতে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়া গুরুদত্ত কৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তিভেরী হস্তে বাহির হইলেন।

কৃষ্ণচৈতন্যের ধর্ম্মমত।

দেশদেশান্তরে সেই ভেরীর নিনাদ শ্রুত হইল। কৃষ্ণচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম স্বর্গমর্ত্ত্য কাঁপাইয়া উচ্চরবে উদ্ঘোষিত হইল। ভাগ্যবান্ মানব স্থিরচিত্তে সেই ঘোষণা শ্রবণ করিলেন।

অনুরাগ জীবের নিত্যধর্ম্ম।

বিষয়রাগকলুষিতচিত্ত জীব! একবার নিজের অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখ—তুমি কি ছিলে, কি হইয়াছ। শাস্ত্রমুখে একবার তোমার স্বরূপতত্ত্বের পরিচয় লও। বুঝিবে শুদ্ধ স্বভাবে তুমি বিশুদ্ধ পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যময়। অনুরাগই তোমার নিত্যধর্ম্ম। যখনই তোমার আত্মা সেই শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান করিবে তখনই তাহা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার সঙ্গলাভের জন্য স্বতই তদভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। জীব! সেই বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমই তোমার পরম পুরুষার্থ।

মায়াবশে ভগবদনুরাগ বিষয়রাগে পরিণত।

অনাদি মায়াবশে সংসারমোহে কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে পড়িয়া দেখ তোমার কি অধোগতি হইয়াছে। তোমার স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ বিষয়রাগে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তোমার বিশুদ্ধজ্ঞান আচ্ছন্ন। তুমি এখন ভগবদ্দৃষ্টি-বিহীন ও ভগবন্মাধুর্য্যাস্বাদে বঞ্চিত। তাই স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া, কুহকে পড়িয়া প্রাকৃত রূপ রসগন্ধস্পর্শ-শব্দে আকৃষ্ট হইয়াছে। পদে পদে কিন্তু অশেষ দুঃখের ভাজন হইয়া বুঝিতেছ বিষয় সুখ তোমার প্রকৃত অন্বেষ্টব্য নহে।

সহজ ভজনই শ্রেষ্ঠ।

তবে এখন বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধিতে যত্নবান্ হও, তাহা হইলেই পরমপুরুষার্থ লাভ ঘটিবে। বুঝিতেছি এ উপদেশ পালন করা আপাততঃ তোমার নিকট অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইবে। তোমার চতুর্দ্দিকেই বিষয়ের কঠোর বন্ধন প্রাকৃতরূপরসাদি পঞ্চক সর্ব্বত্রই প্রপঞ্চিত। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক্ষণে তোমার রাগকষায়িত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়নিচয় বলপূর্ব্বক তোমায় প্রপঞ্চরসে আকৃষ্ট করিবে। সবই বুঝি। বুঝি বলিয়াই তোমায় তোমার সহজ সাধনমার্গ দেখাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছি।

ভক্তিমার্গই সহজ সাধনমার্গ।

তোমার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়নিচয় সর্ব্বদা ভোগার্থে লালায়িত। বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিগৃহীত করিতে তুমি অসমর্থ। অথচ তোমায় কর্ম্ম ক্লেশের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। এখন ভাবিয়া দেখ, বাসনাই তোমার যাবতীয় দুঃখের মূল। বাসনাপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া হয়ত অকৃতকার্য্য হইলে; অমনি ইচ্ছার ব্যাঘাতে চিত্তে ক্রোধদ্বেষাদি উত্থিত হইয়া তোমায় দুঃখের আস্পদ করিয়া তুলিল। উত্তরকালে সেই ক্রোধদ্বেষাদি হৃদয়ে বাসনারূপে পোষিত থাকিয়া, আবার তোমায় ক্লেশসঙ্কুল কর্ম্ম-পরম্পরায় নিয়োজিত করিবে। কৃতকার্য্য হইলেও রক্ষা নাই। আপাতমধুর মনোরথসিদ্ধিজনিত সুখ বাসনান্তরের কারণ স্বরূপ হইয়া তোমাকে সেই দুঃখময় কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করিবে। উভয়তঃ বাসনা অনর্থকরী। যাবৎ এই বাসনাবীজ সম্যগ্‌দগ্ধ না হইবে তাবৎ পোষিত বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সংসার দুঃখভোগ

অনিবার্য্য। তবেই নিষ্কাম কর্ম্ম তোমার আশ্রয়নীয়। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কামনাবর্জ্জিত কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। তবে উপায় কি? বুঝিয়া দেখ প্রাকৃত শব্দস্পর্শাদিসমুদ্ভব সুখেচ্ছাই সংসারক্লেশজনক ভোগবাসনপরম্পরাজননী। সে সুখত আত্মার নিজস্ব নহে।

নিষ্কাম কৃষ্ণোদ্দেশক কর্ম্ম, ভক্তিমার্গের প্রথম সোপান

তাই পরস্ব প্রাপ্তির আশায় পুনঃ পুনঃ কর্ম্মচক্রে পড়িয়া ঘুরিতে হয়। সুখের পরিবর্ত্তে কিন্তু স্বল্পসুখমিশ্র ও অবিমিশ্র দুঃখমাত্র অধিগত হয়। আশা তথাপি বলবতী থাকে। বিষয় সুখবাসনার নির্বৃতিও, নাই নিবৃত্তিও নাই। অপ্রাকৃত চিন্ময়রসলিপ্সায় কিন্তু এ বিড়ম্বনা নাই। অপ্রাকৃত আনন্দ আত্মার বিশুদ্ধ ভোগ, তাদৃশ ভোগ কোনরূপেই নিদারুণ সংসারযন্ত্রণার কারণ হইতে পারে না।

যে অখণ্ড, অবিমিশ্র সুখ আত্মার নিজ সম্পত্তি, তাহার ভোগাধিকার লাভ করিয়া জীব আর কোন্ সুখের জন্য কোন্ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সংসরণে প্রবৃত্ত হইবে? তবেই এখন তোমার কর্ম্মফল যাহাতে বিরস প্রাকৃত সুখগন্ধরহিত হইয়া বিশুদ্ধ চিদানন্দরূপে স্বকীয় নিত্যসম্পত্তি দেখাইয়া দেয়, তাহারই সন্ধান বলিয়া দিতেছি।

তোমার নিখিল কর্ম্মই ভগবানের প্রীত্যর্থ পর্য্যবসিত হউক, প্রপঞ্চ মধ্যে ও ভগবৎ সেবার সমস্ত উপকরণই বিদ্যমান। শব্দ সুখানুভবেচ্ছা, হরিনাম গান, হরিকথাশ্রবণাদিতে চরিতার্থা হউক। স্পর্শসুখানুভূতিবাসনা হরিমন্দিরমার্জ্জন, হরিচরণপরিচরণাদিতে তৃপ্তিলাভ করুক। শ্রীমূর্ত্তির রূপাদিদর্শনে প্রাকৃতরূপদিদৃক্ষার তিরোধান হউক। মহাপ্রসাদাদি রসে রসনা অপ্রাকৃত স্বাদ অনুভব করুক। পূজার্থক ধূপধূম পুষ্পচন্দনাদি গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিত্য লোলুপ হউক। এক কথায় পুরুষোত্তমের সেবায় ও সেবানুকূল্যে তোমার নিখিল ভোগবাসনার বিলয় সাধন হউক।

মানব এই ভক্তিসাধনাই তোমার সহজ সাধন। ভ্রমবশে তোমার যে স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ বিষয়গামী হইয়া—সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষধর্ম্মাধর্ম্মের নিদান স্বরূপ হইয়া বাসনা পরম্পরাক্রমে তোমায় সংসারে বদ্ধ করিয়াছে, এই ভক্তি, সাধনা তোমার সেই অনুরাগকে হরিসেবানুরক্তিতে পরিণত করিয়া প্রপঞ্চ

মধ্যে তোমায় তোমার নিত্যসুখের আস্বাদন করাইয়া বাসনা ধ্বংসপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ সংসার ক্লেশের উপশম করিবে। কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনান্তরের আশ্রয় গ্রহণ অনাবশ্যক। হৃদ্গত ভক্তিবীজকে সেবারূপ কর্ম্মজলসেকে অঙ্কুরিত কর, অবশ্যই উহা কালে সুফল দান করিবে। সাবধান, কদাপি ভক্তিমার্গভ্রষ্ট হইও না।

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদাত্বয়ি॥"

ভগবন্ সংসারচক্রের আবর্ত্তনে যে কোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, আমার ভগবদ্ভক্তির কোথাও ব্যতিক্রম না হয়। সর্ব্বকর্ম্মই যেন ভক্তিপ্রণোদিত হয়। প্রহ্লাদের এই প্রার্থনাই তোমার সাধীয়সী প্রার্থনা।

ভক্তিসাধন দাস্যসখ্য বাৎসল্য স্বকীয় পরকীয়ভাবমূলক।

জীব এইবার তোমার ভজনরীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। অধিকারি-ভেদে তোমার এই ভক্তিসাধনা প্রথম হইতেই নানাভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে। সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তোমার প্রকৃতিগত রুচি নির্ণয় করিয়া তোমার অধিকারানুরূপ রীতির উপদেশ দিবেন। হরিদাস্য তোমার স্বভাবসিদ্ধ আত্মধর্ম্ম। সুতরাং প্রথম হইতেই হরিদাস্যাভিমানে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্তিই তোমার স্বধর্ম্মানুযায়িনী। কিন্তু তোমার সৌভাগ্য থাকিলে হয়ত অর্জ্জুন বা শ্রীদাম সুদামাদির অনুকরণে সখিত্বাভিমানে শ্রীহরির ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পার। হয়ত সুকৃতিবশতঃ আবার যশোদাদির ন্যায় বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া বালগোপালের পরিচর্য্যায় তোমার স্পৃহা হইতে পারে। মহিষীগণের কৃষ্ণানুরাগকথায় আকৃষ্ট হইয়া তদভিমানে কৃষ্ণানুরক্তিও তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। কৃষ্ণৈকপ্রাণ ব্রজগোপীবৃন্দের মধুরতম পরকীয় ভাবরসে অনুপ্রাণিত হইয়া, কৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ ও তোমার রুচিসম্মত হইতে পারে। ফলতঃ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং স্বকীয় ও পরকীয় ভাবে ভক্তির বহুবিধ বিকাশ তোমার অধিকার সাপেক্ষ।

ভক্তিমার্গিন্! ভজনসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি যতই অগ্রসর হইবে ততই

তোমার চিত্ত নানারূপ ভাবতরঙ্গে আলোড়িত হইবে। মধুর বৃন্দাবন-লীলাদির শ্রবণকীর্ত্তন-স্মরণানুশীলনে তোমার ভগবদনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে তাহা শেষে প্রেমৈকপরতায় পূর্ণতা লাভ করিবে। তখন অন্তরে অভীষ্টমূর্ত্তির সাক্ষাৎকারলাভ ও মানস-পরিচর্য্যার জন্য ব্যাকুল হইবে। অচিরাৎ ভগবদনুগ্রহে তোমার অন্তরগত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া স্ফীতজ্ঞানালোকে হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। দেখিতে দেখিতে তথায় পরমব্যোম আবির্ভূত হইবে। তখন সেই চিদাকাশে অভীষ্টলোক, অভীষ্টবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্টসেবায় অবসর লাভ করিবে। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় তোমার বাহ্যসাধনও স্বতই অন্তঃসাধনে বিলীন হইয়া যাইবে। তখন তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সচ্চিদানন্দ ভগবানের শরণাপন্ন হইবে।

ভাব ও প্রেমের বিকাশ। একান্তানুরাগীর সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ।

ভক্তিলভ্য পুরুষার্থ।

সাধক! সাধনার ফলে, পুরুষোত্তমের কৃপায় এইবার তোমার পরম পুরুষার্থ করতলগত। এখন একবার দিব্যনেত্রে জ্ঞানালোকে অনন্তধামে ভগবানের ঐ শাশ্বত লীলানিকেতন সকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও। অনন্তমূর্ত্তিতে পরমপুরুষ যুগপৎ ঐ নিত্যলীলা-ভূমি সমূহে বিরাজ করিতেছেন। দাস্যসখ্যাদির বিভিন্নভাবাবলম্বী সেবক-গণ লীলাময়ী অপ্রাকৃত সত্ত্বমূর্ত্তি লাভ করিয়া স্ব স্ব ভাবানুরূপ লীলাসদ্মে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইয়া অপার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে-ছেন। জরামরণশোকরহিত সর্ব্ববিধ নিত্যশুদ্ধ-সুখোপকরণসম্ভৃত সেই পরমধামে প্রবেশ লাভ করিয়া হরিপদাম্ভোজ নিষেবনানন্দে ভক্তগণের আর কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। ঐ দেখ রামোপাসকগণ রামাবদানগান করিতে করিতে রঘুনন্দনের কমনীয় মূর্ত্তিদর্শনে আনন্দে আত্মহারা। ঐ দেখ ব্রজমণ্ডলে নন্দনন্দন শ্রীদাম সুদাম আদি সহ নিত্য বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ব্রজদেবীগণ উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার বেণুধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন। অসংখ্যলীলার অসংখ্যনিকেতন। সবই নিত্য সনাতন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের প্রচার।

১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ৬ ছয় বৎসর দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া এই প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

"চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥"
"তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্যগীত প্রেমভক্তি দান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড়ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিল ভ্রমণ॥
গৌড়বঙ্গ উৎকল দক্ষিণ দেশ গিয়া।
লোক নিস্তার কৈল আপনি ভ্রমিয়া॥"

এই প্রচার ফলে দাক্ষিণাত্যে, বঙ্গে, ব্রজমণ্ডলে, প্রয়াগ ও বারাণসীধামে, অসংখ্য ভক্ত নামকীর্ত্তন ও ভক্তিরমাধুর্য্যরসে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। নীলাচলে দার্শনিকাগ্র গণ্য বাসুদেব সার্ব্বভৌম, গোদাবরীতীরে রাজমাহেন্দ্রীনগরে উৎকলরাজের স্থানীয় প্রতিনিধি ভক্তিরসরসিক অশেষশাস্ত্রজ্ঞ রায়রামানন্দ, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্য লক্ষ্মীনারায়ণসেবী সপুত্রক বেঙ্কটভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী, গৌড়মালদহে রামকেলী গ্রামে গৌড়াধিপতির বিশ্বস্ত অমাত্য ভক্তিশাস্ত্র-কুশল উত্তরকালে রূপসনাতন বলিয়া পরিচিত দবীরখাস ও সাকর মল্লিক নামক ভ্রাতৃদ্বয়, ভাগীরথীতীরে কুলিয়াগ্রামে, ভাগবতীদেবানন্দ ও বরাহ নগরে ভাগবতাচার্য্য প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিত প্রেমভক্তিবাদের প্রাধান্য অঙ্গীকার করিলেন। দক্ষিণাপথে বৃদ্ধকাশীবাসী বৌদ্ধগণ, বারাণসীধামে প্রকাশানন্দ পরিচালিত মায়াবাদী সন্নাসীগণ, শ্রীচৈতন্যসহ * বিচারে হতদর্প হইলেন। প্রয়াগসন্নিধানে যমুনা পারবর্ত্তী আম্বলি গ্রামে রুদ্রসম্প্রদায় গুরু বল্লভভট্টও প্রেমধর্ম্মের মহিমা স্বীকার করিলেন। ফলতঃ মহাপ্রভু যখন

শ্রীগৌরাঙ্গ হস্তে।

* মায়াবাদী প্রকাশানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের শাস্ত্রীয় বিচার হয় নাই, বা সে বিচারে পরাস্ত হইয়া তিনি চৈতন্যের মত গ্রহণ করেন নাই। তাহার অন্য কারণ আছে। সং।

যে স্থানে গমন করিলেন তখন সেই স্থানই ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিল পণ্ডিতমূর্খ, হিন্দুযবন, যুবকবৃদ্ধ, ধনীদরিদ্র, ব্রাহ্মণশূদ্র, আর্য্য অনার্য্য, সকলেই হরিভক্তিসুধা পান করিয়া ধন্য হইল। তাঁহার দক্ষিণদেশ সঞ্চরণ কালে—

"——পথে যাইতে যে পায় দরশন।
যে গ্রামে যায় সেই গ্রামের যতজন॥
সবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি।
অন্যগ্রাম নিস্তার সে সেই বৈষ্ণব করি॥
দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী কেহ কর্ম্মী পাষণ্ডী অপার॥
সেই সব লোক প্রভুর দরশন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দরশনে।
কৃষ্ণ উপাসক হইল লয় কৃষ্ণনামে॥"

মথুরাগমনচ্ছলে নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্য যে যে স্থানে পদার্পণ করিলেন, সেই সেই স্থানেই—

"সর্ব্বলোক দেখিতে আইসে হর্ষমনে।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেমভক্তি বিনু আর নাহি কোন রঙ্গ॥
দূরে থাকি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করি।
সবে মেলি উচ্চ করি বোলে হরি হরি॥
বোল বোল বোল প্রভু বোলে বাহুতুলি।
বিশেষে বোলের সঙ্গে হই কুতূহলী॥"

ঝাড়িখণ্ডের (ছোটনাগপুর প্রদেশের) বনপথ দিয়া যখন বৃন্দাবন গমন করিতেছেন, তখন,—

"যেই গ্রাম দিয়া যান যাহা করেন স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় প্রেম ভক্তি।
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন॥
সবে কৃষ্ণ হরি বলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরায় বৈষ্ণব হ'ল সর্ব্বদেশে॥
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝাড়িখণ্ড।
ভিন্নপ্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড॥
নামপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে সাধ্য কার॥"

আবার যখন—

"বারাণসীপুরী আইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য॥
বাহুতুলি প্রভু বলে বোল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥"

প্রয়াগে আসিয়া শ্রীচৈতন্য—

"——তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
"মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥
পূর্ব্বে যেন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিল।
পশ্চিম দেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিল॥"

মধুপুরীতে জনতা দর্শনে—

"বাহু তুলি বোলে প্রভু বোল হরিধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি হরিধ্বনি॥"

এইরূপে আসেতুবন্ধ দক্ষিণাপথে, বঙ্গে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহে, বন্যঝাড়িখণ্ড প্রদেশে, পশ্চিমে কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন অঞ্চলে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মুখে প্রেমধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইল। উৎকলের সৌভাগ্য আরও

অধিক। গমনাগমনান্তে তথায় যাবজ্জীবন বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রায় সমগ্র উৎকল দেশই বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। স্বয়ং উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সহ তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

১৪৩১ হইতে ১৪৩৭ শকাব্দ পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রাচ্ছলে দেশে দেশে প্রেমধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন। ইহার পরেও তিনি অষ্টাদশ বর্ষ ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু আর কখনও স্বয়ং নীলাচল ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যান নাই। ১৮ বৎসরের মধ্যে প্রথম ৬ বৎসর নানা দিগ্দেশ হইতে শ্রীক্ষেত্রে সমাগত এবং নিজ ক্ষেত্রবাসী ভক্তগণের সহিত নৃত্যগীত কীর্ত্তনরঙ্গেই অতিবাহিত করেন। ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারকল্পে কিন্তু এ সময়েও তিনি উদাসীন হয়েন নাই।

এই সময়েই আসন্নসহচর আকুমার বৈরাগ্যব্রতধারী সংকীর্ত্তনবিহারী প্রেমিকশিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বঙ্গদেশে দ্বারে দ্বারে হরিনাম ও হরিপ্রেম বিলাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। পরমবৈষ্ণব অভিরাম দাস প্রথিতনামা পদাবলী রচয়িতা বাসুঘোষ, প্রধান কীর্ত্তনিয়া মাধবঘোষ এবং অন্যান্য কতিপয় ভক্ত তাঁহার সহকারিরূপে যাইতে অঙ্গীকার করিলেন। শুভক্ষণে শুভলগ্নে তাঁহারা পুরুষোত্তম ত্যাগ করিয়া বঙ্গে উপনীত হইলেন। প্রথমেই পাণিহাটীতে দেশব্যাপী কীর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। অনন্তর

শ্রীনিত্যানন্দ হস্তে।

"জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥
"কিঁ ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥
"যেথানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় শত শত জন।"

এইরূপে এঁড়াদহ, খড়দহ, সপ্তগ্রাম, আম্বুয়ামুলুক (অম্বিকাকালনা) শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খোল্যবেড়া, বড়গাছি, দোগাছিয়া, কুলিয়া প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগ সগণ নিত্যানন্দের প্রচণ্ডকীর্ত্তনভরে প্রকম্পিত হইল। তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণও রাঢ়ে, বঙ্গে সর্ব্বত্র নাম বিতরণ করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু বাঙ্গালায় নামকীর্ত্তন প্রচারের ভার প্রাপ্ত হন, প্রায় সেই সময়েই শ্রীগৌরাঙ্গদেব অশেষ শাস্ত্রবিৎ ভক্তাগ্রগণ্য রূপ-সনাতনকে পশ্চিমাঞ্চলের ব্রজমণ্ডলের সকল লোককে প্রেমতত্ত্ব শিখাইতে পাঠাইয়া দেন। ভ্রাতৃদ্বয় আসিয়া মথুরা-মাহাত্ম্যগ্রন্থ সংগ্রহপূর্ব্বক লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করিয়া সংসারবদ্ধ জীবকে গোপীভাবোপাসনা শিক্ষা দিবার জন্য ক্রমে অসংখ্য ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিলেন এবং মদনগোপাল ও গোবিন্দের সেবা প্রকাশ করিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দশমতোষণী, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ ইঁহাদেরই অমৃতনিষ্যন্দি-লেখনীপ্রসূত। অদ্যাবধি শুদ্ধ প্রেমরসপিপাসু ভক্তগণ ইঁহাদেরই নিখাত ভক্তিসুধা সমুদ্রে অবগাহন করিয়া ধন্য হইতেছেন।

রূপসনাতন হস্তে।

১৪৫৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্যের এবং অনন্তর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোধান হইলে এই বৃন্দাবন ভূমিই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিল। নীলাচলে গদাধরাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রভুর শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া একরূপ নির্জ্জনে কালাতিপাত করিতে থাকেন। বঙ্গদেশে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের অন্তর্ধানে নানা কারণে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া উঠিল। কেবল ব্রজধামের শ্রীই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। গোপালভট্ট, রঘুনাথদাস, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, ভূগর্ভ, লোকনাথ প্রভৃতি মহা মহা বৈষ্ণবগণ আসিয়া অসংখ্য ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমধর্ম্মের সম্যক্ অনুশীলন করিতে লাগিলেন। অহোরাত্র নাম কীর্ত্তনে, স্থানে স্থানে রাধাকৃষ্ণ সেবাপ্রবর্ত্তনে, গীতা ভাগবতাদি প্রাচীন ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি নবীন ভক্তিগ্রন্থ সমূহের পঠন পাঠনে শ্রীজীবের ভক্তিসন্দর্ভসমূহ প্রণয়নে সেই পুণ্যধামে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায় ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করিল। ফলতঃ বৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণবগণই শেষে সমগ্র গৌড়মণ্ডলের একমাত্র আশাস্থান হইলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ বঙ্গে ও উৎকলে শুদ্ধ চৈতন্যধর্ম্মের পুনঃ প্রচারের জন্য পরামর্শ করিয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ নামক তাহাদের তিন শিষ্যকে রাশি রাশি গ্রন্থসহ প্রেরণ করিলেন। নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গৌড়মণ্ডলে প্রেমধর্ম্মের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

বঙ্গে ও উৎকলে লক্ষ লক্ষ লোক হিন্দু ও যবন, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী পণ্ডিত ও মূর্খ, সাধু ও তস্কর, তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভক্তির মহিমায় উদ্ধার পাইলেন।

শ্রীনিবাস সাধারণতঃ বিষ্ণুপুরে থাকিতেন। সেই

শ্রীনিবাস হস্তে।

"বিষ্ণুপুর দেশে বহি কত কত জন।
অশেষ হইল শিষ্য না যায় লিখন॥
স্বকীয় দেশেতে কৈল শিষ্য বহুতর। (স্বকীয় দেশ = চাকুন্দী)
না জানি এ নাম তার আমি অজ্ঞবর॥
নানা দেশ বিদেশ হইতে কত জন।
আইলেন সবে হইলা কৃপার ভাজন॥
রাঢ় বঙ্গদেশ যত গৌড় দেশ আর।
ব্রজভূমি মগধ উৎকল দেশ আর।
বড় গঙ্গা পার আর বৃদ্ধ কঙ্কাণ।
গঙ্গা মধ্যে দেশ হয় যত কিছু আন॥"

শ্রীনিবাসের প্রশিষ্য কর্ণানন্দ-প্রণেতা যদুনন্দন দাস নিজ শ্রীনিবাসের প্রায় একশত প্রধান শিষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ এবং বিষ্ণুপুররাজ বীর-হাম্বীর সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। রামচন্দ্র অনেক ভক্তিবাদ প্রবর্ত্তিত করেন।

নরোত্তম দাস নিজ জন্মভূমি খেতরী গ্রামে বাস করিয়া সাধারণতঃ গঙ্গা-পদ্মাসঙ্গমসন্নিহিতপ্রদেশে সহস্র সহস্র লোককে বর্ণবয়োনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রেমবিলাসে খেতুর, বুধরী, গাম্ভীলা, গোয়াস, ব্রহ্মপুত্র পারস্থ এগারসিন্দুর, (রাঢ়ে) গোপালপুর, গড়ের হাট, রাজমহল, নৈহাটী, কুমার নগর, ফরিদপুর, পাছ-পাড়া প্রভৃতি গ্রামের বহুসংখ্যক শিষ্যের বর্ণনা আছে। ইহাঁদের মধ্যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গাম্ভীলা গ্রামবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী এবং রাজমহলের দুর্দ্দান্ত জমীদার চাঁদরায় ও সন্তোষ রায় ইতিহাসে লব্ধনামা। গঙ্গানারায়ণের নিকট বহু লোক দীক্ষিত হয়।

নরোত্তম হস্তে।

শ্যামানন্দ উৎকলে ধারেন্দা গ্রাম, সুবর্ণরেখা তীরবর্ত্তী রয়নী গ্রাম,

শ্যামানন্দ হস্তে।

বলরামপুর, নৃসিংহপুর, ও গোপীবল্লভপুরে অনেককে প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। রসিকানন্দমুরারীই ইহাঁদের অগ্রগণ্য।

শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের পর শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচারের ভার এক্ষণে শিষ্য-ব্যবসায়ী গোস্বামিসন্তানগণের হস্তে পড়িয়াছে। ফল দেদীপ্যমান। আপাততঃ তদ্বিবরণ স্থগিত রাখিয়া গৌরাঙ্গমতের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গীয় সমাজের অবস্থান্তর বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রচার-ফল।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্ম প্রচারে বঙ্গীয় সমাজে সর্ব্বতোভাবে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। দুই চারিটী প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই একথায় সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। প্রথমেই ধরুন শূদ্রাদির চরম ধর্ম্মাধিকারিতা।

ব্রাহ্মণ্যবাদ নিরাস।

প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যবাদানুসারে একমাত্র ব্রাহ্মণই নিঃশ্রেয়স সাধন ও যোগাদিধর্ম্মে অধিকারী। বহুজন্মার্জিত পুণ্য-ফলে সংস্কৃত-বুদ্ধি হইয়া জীব সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তবে মোক্ষধর্ম্মানুশীলনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে।

শূদ্রাদির চরম ধর্ম্মাধিকার শ্রীচৈতন্যের মতসিদ্ধ।

শূদ্রাদিকে সুতরাং জন্মজন্মান্তরে চরমধর্ম্মোপযোগী ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত বর্ত্তমান জন্মে অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদানুসারে নিঃশ্রেয়সসাধন ভগবদ্ভজনে সকল মনুষ্যেরই তুল্যাধিকার।

ব্রাহ্মণের বর্ণমর্য্যাদা শূদ্রাদির চরমধর্ম্মাধিকারবিরোধিনী নহে।

"মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রা স্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।" ইহার কারণ জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গের ন্যায় ভক্তিমার্গ পুণ্যকর্ম্মপ্রভব বুদ্ধিবৈশদ্যের অপেক্ষা রাখে না।

জ্ঞানমার্গে আত্মজ্ঞানই মোক্ষ এবং বহুজন্মসাধ্য। নির্ম্মলবুদ্ধিই আত্মজ্ঞানের উপযোগিনী। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" ভক্তিমার্গে ভগবৎপ্রেমই পুরুষার্থ এবং সেই প্রেম জীবের স্বভাবসিদ্ধ রাগনির্ব্বাহিত নির্হেতুক ভক্তিমাত্রলভ্য। এই মতে ভগবদ্ভাবভাবিত চিত্তে ভগবদ্দর্শনোপযোগী জ্ঞান স্বতঃ-সম্ভাবি। কেননা চিত্তের অবস্থা সর্ব্বদাই ভাবানুযায়িনী। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযন্তিতে॥"

এইরূপে কর্ম্মিসমাজে জন্মান্তরীণ কর্ম্ম জন্য ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিয়াও শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্মাধিকারে মানবমাত্রেরই সাম্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একদিকে সমাজে এইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদার এবং অপর দিকে চরমধর্ম্মে জাতিবর্ণানপেক্ষার নিদর্শন সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। যবন হরিদাস এবং শূদ্র নরোত্তম এবং শ্যামানন্দ বৈষ্ণব প্রেমে বঞ্চিত হয়েন নাই। আবার বিপ্রপাদোদক পান করিয়া স্বয়ং নিমাইও কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন।

পরমার্থানুশীলনে সার্ব্বজনীন সাম্য।

বলা বাহুল্য শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন প্রচারে বঙ্গে এই ধর্ম্মগত সাম্যবাদ সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। পরমধর্ম্মচর্চ্চাধিকারে গৌরাঙ্গসম্প্রদায় যেরূপ প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে ধর্ম্মোপাসনার স্বরূপ বিচারেও সেইরূপ তন্মতের প্রতিবাদ করিয়াছে। শাঙ্করমত চালিত * ব্রাহ্মণসম্প্রদায় উপাস্যমূর্ত্তির পারমার্থিক সত্যতা ও নিত্যতা স্বীকার করেন নাই। অভেদজীবব্রহ্মবাদ অঙ্গীকার করিয়া সাধক আত্মজ্ঞানোপযোগিনী চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নিরাকার ব্রহ্মের শাস্ত্রসম্মত কোনও কল্পিতমূর্ত্তির ধ্যানার্চ্চন করিতে থাকিবেন। চিত্তনির্ম্মল হইলে নির্বিশেষচিন্ময় ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান স্বতঃস্ফূরিত হইবে। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুরূপ ব্রহ্মের কল্পিত বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া উপাসনে

কল্পিতমূর্ত্তিবাদ নিরাস ও মূর্ত্তিস্থাপন।

* সকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই শাঙ্করমত চালিত এ কথা প্রকৃত নহে। সং।

প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে সকলেই অমূর্ত্তজ্ঞান প্রয়াসী। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ সম্পূর্ণ পৃথক্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বরূপতঃ জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেবল নীরস শুষ্ক আত্মজ্ঞান সংসার মোক্ষের কারণ হইতে পারে, কিন্তু ভগবদ্দর্শন ও নিত্যসুখময়ধামে তৎসহ নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে ক্ষুদ্রশক্তি তটস্থজীবের রাগবশে মায়ামোহে পুনর্ব্বন্ধ ও অধোগতি অসম্ভব নহে। নিরুপাধিক প্রেমই এই নিত্য সম্বন্ধের সংস্থাপক। এই প্রেমলাভের জন্য সাধক ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া নিত্যধামে প্রকটিত ভগবানের অপ্রাকৃত সত্ত্বময় ও লীলাময় অনন্ত নিত্যবিগ্রহের একতমের ধ্যানার্চ্চনে, স্বীয় রুচি ও অধিকার অনুসারে প্রবৃত্ত হইবেন। এতন্মতানুসারে বাহ্য শ্রীমূর্ত্তি সুতরাং নিত্যবিগ্রহেরই ভক্তিরসোদ্দীপনী প্রতিচ্ছবি। প্রেমোদয়ে ও ভাবাবেশে যখন সাধক হৃদাকাশে ভগবানের সাক্ষাৎকার পাইয়া মানসপূজায় নিযুক্ত হন তখনও তথায় উপাস্য দেবতার এই মূর্ত্তির প্রস্ফুরণ। এই জন্য শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন—

> শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
> অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥

বঙ্গে গৃহে গৃহে মূর্ত্তিপূজা। বঙ্গে উৎকলে ও ব্রজ-মণ্ডলে অসংখ্য শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা।

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের এই মত গৌরবের সাক্ষ্যপ্রদান করিবার নিমিত্ত আজ বঙ্গের প্রায় গৃহে গৃহে রাধাকৃষ্ণাদি বিগ্রহ পূজিত। ৪০০ বর্ষের মধ্যে বঙ্গ, উৎকল ও ব্রজমণ্ডলে অসংখ্য হরিমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ ভক্তের নয়ন মনের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে। এই সকল শ্রীমন্দিরের ও সেবার ঐতিহাসিক বিবরণ অনেক নিজবার্ষিক বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধে আপাততঃ তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়েও বিরত থাকিলাম।

ভক্তাবতারগণের পূজা ও সমাদর।

শ্রীমূর্ত্তির পূজাপ্রসঙ্গে গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ের আর এক প্রকারের পূজাপদ্ধতির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ভক্তাবতারগণের পূজার কথা বলিতেছি। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় মতে অনন্তশক্তি ভগবান্ নানাকারণেই অবতীর্ণ হইতে পারেন। জগদ্বাসীকে কোনও অপ্রাকৃত নিত্যলীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত হয়ত

প্রপঞ্চ মধ্যে সেই লীলার সাময়িক প্রকটন। বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া সপরিকর জগতীমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া লীলাচ্ছলে বহির্মুখজনগণকে ভগবৎপ্রেম শিখাইয়া অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বর শেষে নিজলীলা সংবরণ করেন। বৃন্দাবনাদিলীলা এতদনুযায়িনী। কখনও বা জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য সপার্ষদ ভগবানের আবির্ভাব। দত্তাত্রেয় বুদ্ধাদি জ্ঞান-মার্গের উপদেশ দিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের মতে ভগবান্ ভক্তিযোগ প্রচারের জন্য স্বয়ং ভক্তাবতার গ্রহণ করিয়া নিজ নিত্য ভক্তগণসহ পৃথিবীতে শুভাগমন করেন। স্বসম্প্রদায়বর্ত্তী সমস্ত প্রাচীন আচার্য্যকেই এতদনুসারে ভগবদ্ভক্তাবতার স্থির করিয়া এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্য-দেবকে ভগবানের স্বেচ্ছাস্বীকৃত ভক্তাবতার নির্ণয় করিয়া গৌরাঙ্গসম্প্রদায় এই দ্বিবিধ ভক্তাবতারেরই পূজা পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন।

ফলে এক্ষণে গৌড়মণ্ডলে রাধাকৃষ্ণাদি পূজার সহিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারক "মহান্ত" নামধারী পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণও সমাদরে ও দিব্যবুদ্ধিবশে সসম্ভ্রমে পূজিত। বৃন্দাবনলীলাস্মরণে নিত্যানন্দ বলদেবরূপে ও তদীয় অন্তরঙ্গ অনুচরগণ ব্রজের গোপালরূপে অভ্যর্চ্চিত। শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেমের অবতার সুতরাং একাত্মক রাধাকৃষ্ণ। এই জন্য তদন্তরঙ্গগণ ব্রজের নিত্যসখীরূপে এবং কেহ কেহ মহিষীরূপে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের পূজাস্পদ। মূল অদ্বৈতাচার্য্য পরম ভক্ত সদাশিবরূপেই নির্দ্ধারিত। শ্রীনিবাসাচার্য্যের সময়ে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পুনরাবির্ভাব বলিয়া স্বীকৃত হন। কিন্তু কেবল শ্রীনিবাসেয় অনুবর্ত্তী কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীগণই মহান্তের সম্মান মাত্র পাইয়াছেন। অবতারবাদ আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

এই অবতারবাদ প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে একটু আধটু "গোলযোগও" উপস্থিত না হইয়াছে এমন নহে। স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার দুইচারি স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ফলে একই আচার্য্য কোথাও ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং কোথাও বা ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য একই স্বরূপের অধিকারী নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। একই দিব্য পুরুষের যুগপৎ বিভিন্ন প্রকাশ এবং ভিন্ন দিব্য পুরুষের এক শরীরাশ্রয় দিব্য

বিভূতিনিষ্পন্ন এই মত আশ্রয় করিয়া শেষে গোলযোগের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

যাহাহউক সুখের বিষয় ভক্তাবতারগণের পূজাচ্ছলে প্রাতঃস্মরণীয় একান্তানুরাগী হরিপ্রেমলুব্ধ ভজনপরায়ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের স্মৃতি শ্রীপাট ও শ্রীধাম সমূহে মঠে মঠে, মন্দিরে মন্দিরে, সযত্নে সংরক্ষিত হইয়া গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের অচিরাতীত কীর্ত্তি গৌরবের নিদর্শনরূপে একমাত্র যদৃচ্ছাসমাগত সৌভাগ্যবান্ দর্শক ও যাত্রিগণের হৃদয়ে ভক্তির অপরূপ মাধুর্য্য উন্মেষ করিতেছে। এখনও তাঁহাদের পুণ্যময় আবির্ভাব তিরোভাব দিনের উপলক্ষে মেলা ও মহোৎসবাদি প্রসঙ্গে সহস্র সহস্র লোক আগমন করিয়া নামকীর্ত্তনঘটা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাগবশে তাহাতে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইতেছে।

অবান্তর ফল।

ভাবোচ্ছ্বাসে ভাষার পুষ্টি ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি।

এক্ষণে বঙ্গে গৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচারের অবান্তর ফল কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব। জাতীয় ভাব ও ভাষার পুষ্টির কথাই সর্ব্বাগ্রেই আসিয়া পড়ে। যে কোনও ধর্ম্মেরই অভ্যুদয়-কালে জাতীয়জীবনে ভাবস্রোতঃ খরবেগেই প্রবাহিত হয়। তাহার উপর গৌরাঙ্গধর্ম্ম স্বভাবতই প্রেমভাবোচ্ছ্বাসময়। মধুর বৃন্দাবনলীলা যাহার প্রাণ, অনুরাগবতী ব্রজসুন্দরীদিগের বিচিত্র হাবভাব মাধুরী যাহার অস্থিমজ্জা, সেই প্রেমধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গবাসীর হৃদয় যে ভাবতরঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভাবের পরিপুষ্টির সহিত ভাষার পরিপুষ্টিও অবশ্যম্ভাবিনী। নবোদ্ভূত ভাবনিচয় প্রাণময়ী প্রাকৃত ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়া প্রাকৃতভাষার ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করে। পণ্ডিতের ভাষায়, সুশিক্ষার্জ্জিত ভাষায়, প্রাণের হাসি বা প্রাণের কান্না প্রকাশ করা যায় না। সেই ভাবের আবেগে প্রাকৃত ভাষার সমৃদ্ধিসিদ্ধি। এই জন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুত্থানে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আরও এই ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও অনেকানেক গ্রন্থ রচিত হইয়া ভাষার গৌরববর্দ্ধন করায় পরোক্ষভাবেও

শ্রীচৈতন্যধর্ম্ম বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছে। সম্প্রতি এবিষয়ে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গের কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন নিজগ্রন্থে এবিষয়ে অনেক কথাই বলিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার পুনর্বিচার নিরর্থক। কেবল এই-মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই ধর্ম্মের কল্যাণে রাশি রাশি উপাদেয় সংস্কৃতগ্রন্থ, এবং চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বহুসংখ্যক অমূল্য বাঙ্গালাগ্রন্থ প্রণীত হইয়া বঙ্গের গৌরব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে বঙ্গের সামাজিক ইতিবৃত্ত রক্ষণ।

৪০০ বর্ষ পূর্ব্বের বঙ্গের সামাজিক চিত্র। সামাজিক অনাচার। রাজার ও রাজপ্রতিনিধির অত্যাচার।

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস অদ্যাপি লিখিত হয় নাই। যখন লিখিত হইবে তখন দেখা যাইবে এই বৈষ্ণব সাহিত্যের নিকট সেই ইতিহাস কতদূর ঋণী। ৩০০।৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে ও তদূর্দ্ধে বঙ্গের সামাজিক অবস্থার সুস্পষ্ট ছবি এই বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের পৃষ্ঠে অঙ্কিত। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোকে ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বের এই বঙ্গভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবেন, দেশময় ঘোর অনাচার ও অশান্তি। তান্ত্রিকতার প্রবল প্রতাপ। ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর ও বিষহরির পূজা। মদ্যমাংসাদি দ্বারা যক্ষ ও বাশুলির পূজা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সর্ব্বত্রই সাত্ত্বিক পূজাতেও তামসিক আচার। যবনবিপ্লবে মুসলমান রাজা ও রাজপ্রতিনিধির বিষম অত্যাচারে হিন্দু সমাজ ত্রস্ত বিকম্পিত। কোথাও কিছু নাই শুনা গেল—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥"

ভয়ে কাহারও প্রকাশ্যে হিন্দুয়ানী দেখাইবার যো নাই।
যদি "হরি হরি বলি হিন্দু করে কোলাহল।
অমনি প্রতিবেশী সাবধান করিয়া দেয়,
"বাদসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল॥"

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের হস্তেও নিস্তার নাই। হিন্দুর ধর্ম্মোদ্যম দর্শন মাত্রেই তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তর্জ্জন করিতে থাকেন,—

"এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানী।
তবে উদ্যম চালাও কার বল জানি॥"
আর দিনকীর্ত্তন করিতে লাগ্ পাইনু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইনু।"

অত্যাচার কেবল ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক নহে। স্থানীয় জমিদার রামচন্দ্র সরকারে করদান করেন নাই অমনি

"ক্রোধ হঞা ম্লেচ্ছউজীর আইল তার ঘর।
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল॥"
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্যরন্ধন।
অপর দিন সভা লঞা করিল গমন॥
জাতি ধনজন খানের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল।"

ফল লোকের সর্ব্বদাই ভয়।

"যবনে গ্রাম করিবে কবল।"

দেশব্যাপী এই অত্যাচারের কালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের* কঠোর প্রায়শ্চিত্তবিধি লোকসমুদায়কে আরও অশান্ত করিয়া তুলে। ব্রাহ্মণ জমিদার সুবুদ্ধিরায়কে যবনেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া "করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইল।" সমাজের ব্যবস্থাপকগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য শুধু তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কঠোর তুষানলের ব্যবস্থা করিলেন। সাধারণ লোক সকলে চমকিয়া উঠিল।

এই বিষম অনাচার ও অত্যাচার মধ্যেও কেবল হিন্দুগৃহস্থের পারিবারিক সুখের দৃশ্যই একমাত্র শান্তিপ্রদ। গৃহস্থের গৃহের প্রতি তাকাইয়া দেখুন, গৃহলক্ষ্মী প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া

গৃহস্থের পারিবারিক সুখ।

* ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বড়ই উদার, সুতরাং উহা অশান্তির কারণ হইতে পারে না। সামাজিক সঙ্কীর্ণতাই ঐ অশান্তির কারণ। প্রবন্ধকার বর্ণিত অশান্তি প্রকৃত পক্ষে ঘটিয়াছিল কি না তাহাও সন্দেহস্থল। সং।

গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা। দেবসেবায় অভিনিবেশবতী, শ্বশুর শাশুড়ীর ও পতির সেবায় আলস্য নাই।

"উষঃকাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ কর্ম্ম।
আপনি করেন সব সেই তান ধর্ম্ম॥
দেবগৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বরপূজার সজ্জা করেন সকল॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন॥
কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ॥"

দেশে আর এক সুখ ছিল অন্ন বস্ত্রের দুঃখ ছিল না। সামান্য হিন্দু গৃহস্থও তখন ধনধান্য বসনভূষণে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। "ঘরে ঘরে তৈল ঘৃত দুগ্ধ, তণ্ডুল কার্পাস ধান্য লোনবড়ী মুদ্গের" প্রচুর সম্ভার সঞ্চিত থাকিত। অচিরপ্রসূত শিশুকে উপহার দিবার জন্য "সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজত মুদ্রা পাশুলি, সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ। দুবাহুতে দিব্যশঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক, স্বর্ণমুদ্রা নানাহারগণ। ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি কটি পট্টসূত্র ডোরী, হাত পদের যত আভরণ। চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী ভুণী থোপপট্ট পাড়ী, সুবর্ণরৌপ্যমুদ্রা বহুধন" লইয়া গৃহস্থ রমণী কুটুম্ব গৃহে গমন করিতেছেন। চৈতন্যের ভোজন উপলক্ষে যে সমস্ত ভক্ষ্যের আয়োজন দেখা যায় তাহা রাজভোগ প্রায়।

ধনধান্য সম্পদ।

ধনীর বিলাস বৈভবের চিত্র অনেকটা বাদসাহি রকমের।

ধনীর বিলাস-বৈভব।

"দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য তিনচন্দ্রাতপ তাহার উপরে॥
তহি দিব্যশয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে।
পট্টনেত বালিশ শোভয়ে চারিপাশে॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।

দিব্য পিত্তলের বাটা পাকা পান তা'ত ॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পান খাঞা অধর দেখি দেখি হাসে ॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুইজনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে ॥
কি কহিব সেবা কেশভারের সংস্কার।
দিব্যগন্ধ আমলকী বই নাই আর ॥
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান।
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান ॥"

প্রামাণিক গ্রন্থ।

বৈষ্ণব-সাহিত্য ইতিবৃত্তের প্রকাণ্ড আকর হইলেও কিন্তু সঙ্কলনকর্ত্তাকে বিলক্ষণ সাবধান হইতে হইবে। সম্প্রদায়গত, বংশগত ব্যক্তিগত ও নানাবিধ স্বার্থদোষে এই সাহিত্যে অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ অনেক স্থলেই প্রক্ষেপদুষিত হইয়াছে। অনেক অধুনাতন গ্রন্থও প্রাচীনতার দাবী করিতে বসিয়াছে। অনেক স্থলে এখন এই সকল আধুনিক গ্রন্থের সাহায্যে প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থের উপরেও লোকের সন্দেহ উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। আমার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রত্নতত্ত্ববিষয়িনী গত বর্ষের বার্ষিক বিবরণীতে আমি এ বিষয়ের অনেকটা আলোচনা করিয়াছি। এখানে একটী উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেবের আদ্যলীলা সম্বন্ধে তাঁহার বাল্যসহচর মুরারিগুপ্তের রচিত চৈতন্যচরিত এবং তদনুবর্ত্তী চৈতন্যভাগবত সর্ব্ববাদিসম্মত প্রমাণ। মধ্যলীলা সম্বন্ধে তাহার জীবনের শেষার্দ্ধ কালের আসন্নসহচর দামোদরের রচিত করচা পাওয়া যায় না। কিন্তু দামোদরের অন্তরঙ্গ রঘুনাথদাসের প্রিয়তম শিষ্য কৃষ্ণদাসকবিরাজ গুরুমুখে দামোদরের করচা শ্রবণ করিয়া তদনুসারে চরিতামৃতে মহাপ্রভুর মধ্যলীলায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতই মধ্যলীলার একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। এই মধ্যলীলা প্রসঙ্গেই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মমত উপন্যস্ত। চরিতামৃত নিবদ্ধবিবরণে সন্দেহ

জন্মাইতে পারিলেই তদন্তর্গত ধর্ম্মমতের সম্পূর্ণ যাথার্থ্যে সন্দেহ আসিয়া পড়িবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নানাদিক হইতে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য-ভাবে চরিতামৃতের উপরে আক্রমণ হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে অধুনাতন অত্যুদারমতাবলম্বীদিগেরই আক্রোশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সমাজ-মর্য্যাদানুরোধে রূপ সনাতনের জগন্নাথ-মন্দির প্রবেশ নিষেধে সম্মতি, হরিদাসের সহিত পৃথক্ ভোজনের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণসেবকসহ তীর্থ-ভ্রমণ প্রভৃতিতে তাঁহারা চৈতন্যের জীবনে অনুদারতা দেখিয়া স্তম্ভিত হন। তদুপরি অবতারবাদাদির প্রসঙ্গেও অনেকের নানারূপ আপত্তি আছে। কাজেই তাহারা খাঁটি একখানি চৈতন্যের চরিতগ্রন্থ অনুসন্ধানে (সঙ্কলনে বলিব না) প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রন্থও বাহির হইয়া পড়িল। খুব পুরাতন পুঁথি সন্দেহ করিবার যো নাই। দুই একজন পুঁথিখানি দেখিলেন। ছাপা হইল। শুনা গেল ছাপার পর যাঁহারা পুঁথি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা মুদ্রিত পুস্তকে তাঁহাদের দৃষ্ট পুঁথি হইতে অনেক ব্যতিক্রম দেখিলেন। যাহা হউক বঙ্গবাসী গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইল। গ্রন্থে অনুদার মতের লেশমাত্র নাই। দুই এক স্থলে কেবল প্রাচীনত্বের অনুরোধেই এক আধটা অলৌকিক বৃত্তান্ত দেখা গেল। বর্ণনা সর্ব্বত্রই সরল ও সরস এবং সম্পূর্ণরূপেই যেন বস্তনুযায়িনী। কত ভৌগোলিক বৃত্তান্তের সমাবেশ, কত প্রাচীন নগরেরও নামোল্লেখ। গ্রন্থের সত্যতাস্থাপনে তাহাই যথেষ্ট। সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ সকলেই অবশ্য মূর্খ ও স্বার্থান্ধ নহেন। তাঁহারা কিন্তু ভাব ভাষা এবং প্রামাণিকগ্রন্থবিরোধ দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন না। এই মহামূল্য গ্রন্থখানির নাম গোবিন্দদাসের করচা। শ্রদ্ধাস্পদ দীনেশ বাবুও ইতিহাসাংশে এই গ্রন্থখানির সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর করিয়াছেন। গ্রন্থখানির একটু পরিচয় লউন।

প্রথমেই গ্রন্থকার কাঞ্চননগরবাসী শ্যামদাস কর্ম্মকারের পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া গৌরাঙ্গের নিকট আসিয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাস অবধি দক্ষিণভ্রমণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। অবশ্য এই খানেই অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থের সহিত বিরোধ। গোবিন্দ কর্ম্মকার নামক আসন্ন্যাস

মহাপ্রভুর কোনও সঙ্গীর নাম পর্য্যন্তও কোনও গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক গোবিন্দ নিজ মতে প্রভুর সন্ন্যাসকালে কাটোয়ায় তাঁহার সমীপেই বর্ত্তমান। সেই স্থানে বিল্বরক্ষমূলে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ হইতে বিনিঃসৃত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"অভেদ পুরুষ নারী যখন বুঝিবে।
তখন প্রেমের তত্ত্ব অবশ্য স্ফুরিবে॥"
শ্রীমুখের বাণী হয় বেদান্তের সার।
যা শুনিলে জীবগণের বিমুক্ত সংসার॥"

গোবিন্দ মূর্খ বলিয়াই এক রকম আত্মপরিচয় দিয়াছে। কিন্তু বিলক্ষণ দুষ্ট বুদ্ধির নিদর্শন দেখাইয়াছে। বেদান্তের অভেদ একাত্মবাদ ও মুক্তিবাদ মহাপ্রভুর মুখে আরোপিত করিয়াছে। প্রভুর সন্ন্যাসে গোবিন্দ শুনিলেন—

"হুলুধ্বনি নারীগণ করিয়া উঠিল—
অঞ্জলি পূরিয়া যত কুলবধূগণ।
প্রভুর মাথায় করে লাজ বরিষণ॥"

গোবিন্দ বোধ হয় এস্থলে সন্ন্যাস বিধি বৈবাহিক বিধিরই অন্তর্গত মনে করিয়া থাকিবে। ইহার পর সন্ন্যাসান্তে গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই চলিলেন। বর্দ্ধমানে গোবিন্দের স্ত্রী গোবিন্দকে ফিরাইতে আসিলেন। গোবিন্দের বর্ণনানুসারে সন্ন্যাসী চৈতন্য গোবিন্দের স্ত্রীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিল। চরিতামৃতে আছে, ছোট হরিদাস ভিক্ষার্থে পরমবৈষ্ণবী মাধবীর মুখ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া বৈরাগীর প্রকৃতি সম্ভাষণের অপরাধে তাঁহাকে পরিবর্জ্জন করেন। দুঃখে হরিদাস প্রয়াগে আত্মবিসর্জ্জন করেন। গোবিন্দ বোধ হয় এ কঠোর নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। দক্ষিণভ্রমণ প্রসঙ্গেও বারাঙ্গনাসহ চৈতন্যের আলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া গোবিন্দ চৈতন্যের এই উদারতা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন।

স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকার সময়ে গোবিন্দ এক অদ্ভুত কথাও বলিলেন।

"প্রভুর সন্ন্যাসকালে ধরেছি কৌপীন।"
শূদ্রের এ সন্ন্যাস কোন্ মতানুসারে?

ভেকাশ্রয় তখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যাহাহউক, দেখা গেল দক্ষিণযাত্রা

মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণবালককে দক্ষিণে লইয়া যান। নিজ করচামতে কিন্তু গোবিন্দই সঙ্গে চলিলেন। সম্ভবতঃ বহির্ব্বাস কমণ্ডলু ধারণেরই সাহায্যার্থে। অবশ্য বুঝিতে হইবে ইহাতে চৈতন্যের সম্পূর্ণ ঔদার্য্যই প্রকটিত। চৈতন্য যদি এতদূর উদারই ছিলেন, নিয়মবন্ধের যদি সম্পূর্ণ অতীতই ছিলেন, তাহা হইলে সন্ন্যাসেরই কি আবশ্যকতা ছিল তাহা বুঝা যায় না। আর শূদ্রসহচর ভণ্ড সন্ন্যাসীর ধর্ম্মপ্রচারে লোকে যে কিরূপে আস্থা স্থাপন করিবে তাহাও গোবিন্দদাস দয়া করিয়া বলিয়া দেন নাই। যাহা হউক সন্ন্যাসীর সহিত দক্ষিণদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যাগমন কালে একদিন ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর পানে চাহিয়া দেখিলেন প্রভুর—

"এলাইল জটাজুট খসিল কৌপীন।"

গোবিন্দের দর্শনশক্তিও বোধ হয় ভাবাবেশে নষ্ট হইয়াছিল। নহিলে মুণ্ডী বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর জটা কোথা হইতে আসিল? এবিষয়ে আর বাড়াইব না। যে সকল কথার উল্লেখ করিলাম গ্রন্থের সত্যতাসন্দেহে তাহাই যথেষ্ট। তদ্ব্যতীত তাঁহার বর্ণিত ইতিবৃত্ত প্রায়শঃ সর্ব্বগ্রন্থবিরোধী। কোন কোন স্থলে মহাপ্রভু নিতান্ত তরলচিত্ত সংসারীর ন্যায় প্রতিপাদিত। সন্ন্যাসের কাল, ভ্রমণের কাল প্রভৃতি সকলই সর্ব্বসিদ্ধান্তপ্রতিকূল। চৈতন্যধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। এই সকল কারণে অনেকেই করচায় প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিবেন না। ফলতঃ বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ও ভক্তিরত্নাকর এবং তদবিরোধী গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক। নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"ভক্তিপ্রহ্ববিলোকনপ্রণয়িনী নীলোৎপলস্পর্দ্ধিনী
ধ্যানালম্বনতাং সমাধিনিরতৈর্নীতেহিতপ্রাপ্তয়ে।
লাবণ্যৈকমহানিধী রসিকতাং রাধাদৃশোস্তন্বতী
যুষ্মাকং কুরুতাং ভবার্ত্তিশমনং নেত্রে তনুর্ব্বা হরেঃ॥

জীবের স্বাধীনতা বা অদৃষ্টবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমূহে যখন অনুমানের প্রামাণ্য অবধারিত হইল, তখন আর আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব, পরলোকের অস্তিত্ব, জন্মান্তরের অস্তিত্ব, পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব ও পাপের ফল তিরস্কার, পুণ্যের ফল পুরস্কারের একমাত্র প্রদাতা অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট্—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবধারণ করিতে কোনরূপ বেগ পাইতে হইবে না। এই সকলের প্রামাণ্য সংস্থাপনে প্রত্যক্ষ পরাঙ্মুখ, সুতরাং অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যে প্রমাণ বলে দেহাত্মবাদ অবধারিত হইয়াছে, সেই প্রমাণের দুর্ব্বলতা প্রদান করিতে পারিলে, প্রমাণ বলে দেহাত্মবাদ খণ্ডিত হইলে, দেহ ভিন্ন আত্মাকে প্রমাণ করিতে অধিক পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিতে হইবে না। স্বমত সমর্থনের পূর্ব্বে পরমত-খণ্ডনের আবশ্যকতা। এই এই কারণে প্রথমতঃ আপনাদিগের প্রদর্শিত দেহাত্মবাদের সমালোচনা করিব। প্রোজ্জ্বলিত-বহ্নিতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-বর্ণে রঞ্জিত চাকচিক্যবিশিষ্ট পিত্তলাভরণ যেমন আত্মগোপনে অসমর্থ, প্রমাণাভাসে সমর্থিত, আপাতশ্রুতিমধুর অসৎ বিষয়ও সেইরূপ দোষশূন্য প্রমাণের সমক্ষে আত্মগোপনে অসমর্থ। আপনি পরলোক নাই বলিয়া, পরলোকে বিচারক নাই শাসনকর্ত্তা নাই বলিয়া, দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা বিনষ্ট হয় বলিয়া, নরকের বিভীষিকা হইতে পাপীকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, ঐহিক-সুখের প্রলোভন দেখাইয়া জগৎকে বিমোহিত করিতেছেন ; আপাতমধুর আপনার কথায় জগৎ বিমুগ্ধ। উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার-চ্ছটায় কার্য্য যেমন জগতে মত্ততা আনয়ন করে, "কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবৎ" আপনার এই দৃষ্টান্তযুক্ত কথাও সেইরূপ জগতে বিচার-পরাঙ্মুখতা আনয়ন করিতেছে। আপনি মনোহর বাক্যের অবতারণা করিতে পারেন, আপনার বাক্য চারু এইজন্য আপনি "চার্ব্বাক" নামে প্রখ্যাত। দেখা আবশ্যক, আপনার এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত কতদূর ন্যায়ানুমোদিত ও যুক্তিসহ। আমরা যদি কোন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দৃষ্টান্তের

সহিত দার্ষ্টান্তিক সমান-ধর্ম্মা কি না তাহার বিচার না করিয়া সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে যাই ; তাহা হইলে আমরা পণ্ডিতের নিকট একান্ত ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত হইব সন্দেহ নাই। বহ্নি-গর্ভ চুল্লী যখন নিজের মস্তকে স্থালীস্থ তণ্ডুল বহন করিয়া তাহার পাক সাধন করিতেছে ; তখন জলপূর্ণ চুল্লীই বা কেন তাদৃশ প্রক্রিয়ায় অন্নপাকে অসমর্থ হইবে ? দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকের সাধর্ম্ম্য বোধ না থাকিলে এইরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণ করাও আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। দেখা আবশ্যক, সমবেত কিণ্বাদির সহিত সমবেত ভূতসমূহের, মদশক্তির সহিত চৈতন্যের তুলনা হইতে পারে কি না। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এইরূপ তুলনার আবিষ্কার, দেখা আবশ্যক এই তুলনা প্রদর্শন সেই উদ্দেশ্য সাধনের কতদূর সহায়তা করিতেছে। স্বীকার করিলাম, কিণ্বাদির মিলনে আগন্তুক মদশক্তি উৎপন্ন হয় ; এই মদশক্তি উৎপন্ন হয় বলিয়াই যে, ভূতসমবায়ে আগন্তুক চৈতন্যের উৎপত্তি হইবে, ইহা কি করিয়া প্রতিপন্ন করা যায় ? বৃহস্পতির অবতার চার্ব্বাক আমাকে নির্ব্বোধ বলিতে হয় বলুন ; আমি কিন্তু আপনার কথার কিছুই মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। "চৈতন্যং মদশক্তিবৎ" সংস্কৃত কবিতার এই অংশমাত্র পাঠ করাতেই আপনার নিষ্কৃতি নাই, আমাদিগের মত অজ্ঞদিগকে একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে। চৈতন্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নয়। সুতরাং যাহার প্রামাণ্য খণ্ডনে আপনি বদ্ধপরিকর, আপনার সেই চিরশত্রু অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা আপনার পক্ষে এক্ষণে একান্ত কর্ত্তব্য। অনুমানে সাধ্য চাই, পক্ষ চাই, হেতু চাই, দৃষ্টান্ত চাই। আপনার "চৈতন্যং মদশক্তিবৎ" এস্থলে পক্ষ কি ? সাধ্য কি ? হেতু কি ? দৃষ্টান্তই বা কি ? বুঝাইয়া বলিতে হইবে। চৈতন্য যদি পক্ষ হয়, আর তাহার উৎপত্তি যদি সাধ্য হয় ; তাহা হইলেও হেতুর প্রয়োজন। আপনার হেতু কি, খুলিয়া বলুন। হেতু কি বলিলে বুঝিব, সেই হেতুটি সৎ, কি অসৎ। অসৎ হেতু হইলে তাহা দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধি হয় না ; সুতরাং আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অনুমানে ব্যাপ্তিজ্ঞান (হেতু সাধ্যের একান্ত সাহচর্য্যজ্ঞান) চাই। এস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানই বা কোথায় হইল ? দুইচারি স্থলে আপনি কি চৈতন্যের উৎপত্তির প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ? কিণ্বাদির সংযোগে মদশক্তির উৎপত্তি হয় ;

সুতরাং ভূতসমূহের মিলনে বা শুক্রশোণিতের সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, ইহা কি আকারের অনুমান বুঝিলাম না। গঙ্গাচরণ তর্কবাগীশ নামে আমাদিগের গ্রামে একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের একটী কন্যা ছিল। সেই কন্যা-বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে; চাউল, দাউল, ময়দা, চিনি, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যজাত প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীতে অনেকগুলি খড়ের ঘর। দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ অন্তঃপুরের একটী খড়ের ঘরে অগ্নি সংযোগ হইল। বাড়ীতে বহুসংখ্যক ছাত্র ও ভৃত্য ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয়ের পত্নীর চীৎকারে তাহারা সকলে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল ও অগ্নি নির্ব্বাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হইল। তর্কবাগীশ মহাশয়ও সেইস্থলে উপস্থিত। হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল, রামীদাসীর কুঁড়েঘরে একবার অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল; রামীর কন্যা শ্যামী তখন কলসস্থিত জলসেচনে সেই অগ্নি নির্ব্বাপন করিয়াছিল। তর্কবাগীশের এই ঘটনায় ব্যাপ্তিগ্রহ হইল যে কলসস্থিত তরল পদার্থের সেচনে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। তর্কবাগীশ সহাস্যমুখে ছাত্র ও ভৃত্যদিগকে উপদেশ দিলেন, "আর চিন্তা নাই, ভাণ্ডারে প্রচুরপরিমাণে তৈলপূর্ণ কলস আছে, অগ্নিতে উহা নিক্ষেপ কর, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে।" পত্নী ও ভৃত্যের নিবারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের নিকটে ও গুরুভক্ত নৈয়ায়িক ছাত্রদিগের নিকটে কার্য্যকর হইল না; তাহারা গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অগ্নিতে সমস্ত তৈলের আহুতি প্রদান করিল। তাহার ফল মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল। মনীষাসম্পন্ন চার্ব্বাক, তর্কবাগীশ মহাশয়ের সেই সিদ্ধান্তে ও আপনার এই সিদ্ধান্তে অল্পই পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয়। কিণ্বাদির মিলনে মদশক্তি উৎপন্ন হয়; তাই বলিয়া সর্ব্বত্র দ্রব্যের সহিত দ্রব্যান্তরের সংযোগে কি নূতন শক্তি বা নূতন গুণের উৎপত্তি হয়? কৈ তাহারত প্রমাণ নাই। শুক্লসূত্র দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিলে শুক্লবস্ত্রেরই উৎপত্তি হয়, বস্ত্রে শুক্ল-গুণেরই উৎপত্তি হয়; শর্করার সহিত জলের মিশ্রণে জলে মিষ্টরসেরই উৎপত্তি হয়; অন্য প্রকার হয় না। সুতরাং দ্রব্যমাত্রের সহিত দ্রব্যান্তরমাত্রের সংযোগে আগন্তকগুণের উৎপত্তি হয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। যদি বলেন, অধিকাংশ স্থলেই সমবায়িকারণ,

(উপাদানকারণ) স্থিত-গুণের সজাতীয় গুণ কার্য্যে উৎপন্ন হয়; কিন্তু যে যে স্থলে দ্রব্যের সহিত দ্রব্যান্তরের সংযোগবিশেষ (রাসায়নিকসংযোগ) (১) হয়; সেই সেই স্থলে আগন্তক গুণ বা আগন্তক শক্তির উৎপত্তি হয়। শুক্রশোণিতে (Spermatazooa and Ovum) সংযোগ বিশেষ (রাসায়নিকসংযোগ) হয় বলিয়া সেই সংযোগজন্য "চৈতন্য" নামক আগন্তক গুণ বা আগন্তক শক্তির উৎপত্তি হয়। বুঝিলাম, শরীর পক্ষ, চৈতন্যের উৎপত্তি সাধ্য, আর সংযোগবিশেষ (রাসায়নিকসংযোগ) হেতু। শরীরের সমধায়িকারণ শুক্রশোণিতে (Spermatazooa and Ovum) যে সংযোগবিশেষ হইয়াছিল; তাহা শরীরেও আছে; সুতরাং শরীরে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য বা জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার উল্লিখিত এই "সংযোগবিশেষ" কি? লেখনীদণ্ডের সহিত মস্যাধারের সংযোগ হইতে লেখনী ও মসীর সংযোগ ভিন্ন; আবার সেই উভয়বিধ সংযোগ হইতে হস্তলেখনীর সংযোগ ভিন্ন, আবার সেইসকল সংযোগ হইতে পত্র লেখনী সংযোগ ভিন্ন; পত্র লেখনী সংযোগ প্রভৃতি সংযোগ হইতে মসী ও পত্রের সংযোগ বিভিন্ন। সুতরাং প্রত্যেক সংযোগেই বিশেষত্ব আছে। সুতরাং দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, আপনার উল্লিখিত "সংযোগবিশেষ" বুঝিলাম না। আপনার "সংযোগবিশেষের" শ্রেণীর একটী সাধর্ম্ম্য বলুন। যাহা দ্বারা সেই "সংযোগবিশেষ" শ্রেণীর অবধারণ করিব।

আবার দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, আপনি যে অর্থে "সংযোগবিশেষ" শব্দের কীর্ত্তন করিয়াছেন; আপনার ভাগ্যে সে অর্থগ্রহণের আশা নাই, কারণ পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা শুক্রশোণিতে রাসায়নিক সংযোগ হয় স্বীকার করেন না। স্বীকার করিলেই বা কি? ব্যাপ্তিগ্রহ হইল কোথায়? দৃষ্টান্ত

(১) "In Chemical combination the body produced is more or less different in appearance and properties from those of whice it is composed. Further, when the substances chemically combine they invariably do so in definite proportions. * * * * Not only does chemical combination produce bodies different from a mixture of the consituents, but it is also accompanied by an evolution of heat."

JAGO'S INORGARIC CHEMISTY.

কি? শরীরত পক্ষ, শরীর ভিন্ন পদার্থেত আপনার চৈতন্যের সত্তা নাই। সুতরাং কি করিয়া বুঝিব আপনার এই অনুমান দোষশূন্য। মৃতশরীরে আপনার মতে শরীরারম্ভক শুক্রশোণিতের সেই সংযোগবিশেষ আছে কি না? থাকিলে চৈতন্য নাই কেন? যদি বলেন, সেই শুক্র-শোণিতের সংযোগ কি? প্রত্যেক দ্বাদশবর্ষের পরে পূর্ব্বশরীরের একটি মাত্র পরমাণুও পর-শরীরে নাই। যদি নাই থাকে; তবেত অনেক পূর্ব্বেই আপনার প্রমাণিত চৈতন্যের লোপ হইবার কথা। যদি বলেন, আমার এই অনুমান কেবলান্বয়ী বা অন্বয়ব্যতিরেকী নয়। আমার অনুমান কেবলব্যতিরেকী। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, আপনার এই অনুমান কেবলব্যতিরেকী কি না? অনুমান তিন প্রকার, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী। যদিও ন্যায়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মহর্ষি গোতম—"পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট" এইরূপ নাম দিয়া অনুমানের তিনপ্রকার বিভাগ করিয়াছেন; কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন "অথবা পূর্ব্ববদিতি যত্র যথা পূর্ব্ব"মিত্যাদি গ্রন্থদ্বারা অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি দ্বারাই অনুমানের বিভাগ করিয়াছেন। যেথানে বিপক্ষ (সাধ্যশূন্য স্থান) নাই; সেই কেবলান্বয়ী। যেমন এই সূর্য্যমণ্ডল জ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) কারণ সূর্য্যমণ্ডল প্রমেয় (প্রমাণের বিষয়, অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলকে প্রমাণ করা যাইতে পারে) এস্থলে প্রমেয়ত্ব সাধ্য; সুতরাং প্রমেয়ত্ব শূন্য স্থান নাই। আমি করিতে পারি বা না পারি, পদার্থমাত্রই প্রমাণের বিষয়, কারণ পদার্থমাত্রকেই প্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণগুলি জাগরূক রহিয়াছে। যেথানে সপক্ষ (নিশ্চিত-সাধ্যবান্) নাই; সেই কেবলব্যতিরেকী। যেথানে সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ের সত্তা আছে; সেই অন্বয়-ব্যতিরেকী। কেবলব্যতিরেকীর উদাহরণ,—যে হাসে, সে মনুষ্য। মনুষ্যত্বরূপ-সাধ্য মনুষ্য ভিন্নস্থলে থাকে না; সুতরাং মনুষ্যত্বের সপক্ষ আর পাওয়া যায় না। কেবলব্যতিরেকী স্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের রীতি স্বতন্ত্র। যে হাসে সে মনুষ্য; যে মনুষ্য নয়, সে হাসে না; (যন্নৈবং তন্নৈবং) যেমন ব্যাঘ্র। এখানে মনুষ্যত্ব সাধ্য, হাস্য হেতু। যেথানে হেতু থাকে, সেইথানে সাধ্য থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত না দেথাইয়া যেথানে সাধ্য থাকে না, সেইথানে হেতু থাকে না তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যাঘ্রকে উপ-

স্থিত করা হইয়াছে। কেবলব্যতিরেকীর আর একটি উজ্জ্বলদৃষ্টান্ত আছে, কোন এক নৈয়ায়িকপণ্ডিতের দুইটি স্ত্রী ছিল। প্রথম স্ত্রী গৃহকর্ত্রী ও ও ব্যাপিকা, কনিষ্ঠা অল্পবয়স্কা ও সুন্দরী। নৈয়ায়িক ছোটস্ত্রীতে আসক্ত হইলেও বড়স্ত্রীর ভয়ে ছোটস্ত্রীতে প্রকাশ্যভালবাসা দেথাইতে পারিতেন না, বড়স্ত্রীর অসাক্ষাতে কথন কথনও প্রণয়-সম্ভাষণ করিতেন। একদিন অল্পরাত্রে বড়স্ত্রী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিল, সেই অবসর বুঝিয়া প্রাঙ্গণের কোন এক নিভৃতকোণে অন্ধকারে প্রচ্ছন্নভাবে নৈয়ায়িক ছোটস্ত্রীর সহিত চুপে চুপে কি বলিতেছিলেন। বড়স্ত্রী তাহা বুঝিতে পারিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া আস্তে আস্তে পণ্ডিতের পৃষ্ঠে তাহার হস্ত অর্পণ করিল। পণ্ডিত তথন অনন্যোপায় হইয়া স্তুতিবাদে বড়বৌকে ভুলাইবার উদ্দেশে বলিলেন, "কি সুখস্পর্শ!" এই স্পর্শদ্বারাতেই বুঝিয়াছি, ইহা বড়বধুর পল্লব-পেলব-পাণিতল"; বড়বৌ আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না, সে তৎক্ষণাৎ একথানি সম্মার্জ্জনী আনিয়া ভাল করিয়া নৈয়ায়িকের পৃষ্ঠে দুইচারিবার আঘাত করিয়া বলিল, "তোমার এই কেবলব্যতিরেকী-অনুমানের দৃষ্টান্ত দেথাইলাম; যে আমার পল্লব-পেলব পাণিতল নয়, তাহার এরূপ সুখস্পর্শ নাই, যেমন এই সম্মার্জ্জনীর স্পর্শ"; যে বঙ্গীয় নৈয়ায়িকযুবক নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাককে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিতেছিলেন; তাঁহার পার্শ্বস্থিত সহচর মৈথিলনৈয়ায়িক হাস্য করিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, উদয়ন, ইহা তোমারই ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তুমি বঙ্গীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ, শুনিয়াছি তোমারই দুই স্ত্রী আছে। এই সূত্র ধরিয়া তুমি বুঝি তোমার জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণীকে বিসর্জ্জন করিয়াছ। বঙ্গীয়-নৈয়ায়িকের নাম তথন বুঝিলাম "উদয়ন"। উদয়ন মৈথিলনৈয়ায়িককে বলিলেন, "দেথ, গঙ্গেশ, ইহা তোমারই কাজ, অনুমান বুঝাইবার ভার আমার উপর নাই, তাহা তোমার উপরেই অর্পিত, অনুমানবলে আমি কেবল নাস্তিকমত থণ্ডন করিব, বৈদিকমত সমর্থন করিব। মহর্ষি এই ভার আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। উদয়ন গঙ্গেশকে এইমাত্র বলিয়া আবার চার্ব্বাককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। "দেথা যাউক" আপনার এই অনুমান কেবলব্যতিরেকী কি না। শুক্রশোণিতে সংযোগ বিশেষ হয়; সুতরাং

চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। চৈতন্যের উৎপত্তি সাধ্য, শুক্রশোণিতের সংযোগ হেতু। কেবলব্যতিরেকী স্থলে যেখানে সাধ্যের অভাব থাকিবে, (সাধ্য থাকিবে না) সেখানে হেতুরও অভাব থাকিবে, (হেতু থাকিবে না) সুতরাং সেখানে সাধ্যচৈতন্যের উৎপত্তির অভাব আছে (চৈতন্যের উৎপত্তি নাই) সেখানে হেতু শুক্রশোণিত সংযোগেরও অভাব থাকা চাই (শুক্রশোণিত সংযোগ থাকা চাই না) আপনি কি বলিতে পারেন; যেখানে চৈতন্যের উৎপত্তি নাই, সেখানে শুক্রশোণিত সংযোগ নাই। প্রত্যেক শুক্রশোণিত সংযোগে গর্ভ হয় না, গর্ভ হইলেও শুক্রশোণিত সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের উৎপত্তি হয় না, কয়েক মাস পরে চৈতন্য সঞ্চার হয়। মৃতশরীরেও চৈতন্যের অভাব সত্ত্বেও শুক্রশোণিত সংযোগের সত্তা থাকে। সুতরাং দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, আপনার এই অনুমান কেবল-ব্যতিরেকী নয়। "রাসায়নিক সংযোগ" যাঁহাদিগের অবধারিত; সেই পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরাই যখন শুক্রশোণিতে রাসায়নিক সংযোগ স্বীকার করেন না; তখন "কিণ্বাদির" সহিত বা চূর্ণহরিদ্রার সহিত কি করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে? কারণ সেই সেই স্থলে রাসায়নিক সংযোগ হয়। বরং আমিই আপনার বিরুদ্ধে অনুমান করিতে পারি যে, চৈতন্য জড়দ্রব্য সংযোগে উৎপন্ন নয়, হেতু চৈতন্য জড়ীয়গুণ নয় "যন্নৈবং তন্নৈবং" জড়দ্রব্য সংযোগে যে যে গুণ বা শক্তি উৎপন্ন; সে সে জড়ীয়গুণ বা শক্তি যেমন চূর্ণহরিদ্রা সংযোগে রক্তিমা ও কিণ্বাদিমিলনে মদশক্তি। এইরূপ স্থলেই "সৎপ্রতিপক্ষতা" রূপ দোষের উদ্ভাবন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন। আপনার অনুমানে "উপাধিও" আছে। "উপাধি" থাকিলেই হেতু ব্যভিচারী, এইরূপ অনুমান করা যায়। "উপাধি" কি, আপনাকে বুঝাইতে হইবে না; আপনিই "ব্যাপ্তিশোভয়বিধোপাধিবিধুরঃ সম্বন্ধঃ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা আরম্ভ করিয়া অনুমান-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তথাপি অন্যশ্রোতাদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থ উপাধি কি আমার বুঝাইতে হইবে। সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হইবে যে, সেই উপাধি হইবে। ব্যাপ্য (undistributed term) দ্বারা ব্যাপকের (distributed term) অনুমান হয়, ব্যাপক দ্বারা ব্যাপ্যের অনুমান হয় না। ব্যাপ্য ধূম থাকিলে ব্যাপক-বহ্নি থাকিবেই

থাকিবে, ব্যাপক-বহ্নি থাকিলে ব্যাপ্য-ধূম থাকিতেও পারে না থাকিতেও পারে। যে যাহার ব্যাপ্য, তাহা দ্বারা আবার তাহার ব্যাপকের অনুমান হয়। সুতরাং সেই প্রথমোক্ত ব্যাপ্য দ্বারাতেও সেই শেষোক্ত ব্যাপকের অনুমান হয়। যেমন "এক" না হইলে "দুই" হয় না, আবার "দুই" না হইলে তিন হয় না, কাজেকাজেই এক না হইলে তিন হয় না। এক্ষণে বোধ হয় সহজেই বুঝা গেল যে, যে ব্যাপ্যের ব্যাপকের যে ব্যাপক; সে ব্যাপ্যেরও সে ব্যাপক। মধ্যবর্ত্তী ব্যাপ্যের ব্যাপক হইয়া যদি প্রথম ব্যাপ্যের সে ব্যাপক না হয়; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই প্রথম ব্যাপ্যেরও দ্বিতীয় ব্যাপক ব্যাপক নহে; ও সেই ব্যাপকেরও সেই প্রথমব্যাপ্য ব্যাপ্য নহে; সুতরাং সেই প্রথম ব্যাপ্য দ্বারা সেই দ্বিতীয় ব্যাপকের অনুমান হইতে পারে না। এই তৃতীয় ব্যাপকটিই উপাধি। ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমান হয় সত্য; কিন্তু বহ্নিদ্বারা ধূমের অনুমান হইতে পারে না। বহ্নিকে যদি ধূমের ব্যাপ্য মনে করিয়া বহ্নিদ্বারা ধূমের অনুমান করা যায়; তাহা হইলে প্রতারিত হইতে হয়। কারণ—বহ্নির সহিত আর্দ্রেন্ধন (ভিজা কাঠ) সংযোগের ব্যাপ্য ধূম; এই ব্যাপ্য ধূম দ্বারা তাহার ব্যাপক আর্দ্রেন্ধন সংযোগের ব্যাপ্য; তখন ধূম ব্যাপ্য বহ্নিও আর্দ্রেন্ধন সংযোগের ব্যাপ্য হওয়া চাই। কিন্তু সকল বহ্নিতে কিছু আর্দ্রেন্ধন সংযোগ থাকে না, একখণ্ড লৌহকে অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিলে তাহাতেও অগ্নি থাকে, লৌহখণ্ড কিছু আর্দ্রেন্ধন নয়। সুতরাং বহ্নি আর্দ্রেন্ধন সংযোগের ব্যাপ্য নয়। বহ্নি আর্দ্রেন্ধন সংযোগের ব্যাপ্য নয় বলিয়াই ধূমের ব্যাপ্য বহ্নি নয়। এই অনুমানে আর্দ্রেন্ধন সংযোগ উপাধি। সেইরূপ আপনার অনুমানেও জড়ীয়গুণভেদ বা জড়ীয়গুণ ভিন্নোৎপত্তি উপাধি। আপনার মতে চৈতন্যের বা চৈতন্যোৎপত্তির ব্যাপ্য শুক্রশোণিত সংযোগ। চৈতন্য জড়ীয়গুণ নয়; চৈতন্য জড়ীয়গুণ ভিন্ন; সুতরাং চৈতন্যে জড়ীয়গুণ ভেদ আছে। চৈতন্যের ব্যাপক জড়ীয়গুণভেদ, জড়ীয়গুণভেদের ব্যাপ্য চৈতন্য। সুতরাং শুক্রশোণিত সংযোগ সেই চৈতন্যের ব্যাপ্য হইলে জড়ীয়গুণ ভেদেরও ব্যাপ্য হওয়া চাই। কিন্তু শুক্রশোণিত সংযোগে যখন গর্ভ হইয়াছে ও তজ্জন্য সেই গর্ভের সহিত মাতৃ-জরায়ুর সংযোগ হইয়াছে, তখন কি করিয়া বলিব? তাহাতে জড়ীয়গুণভেদ আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

নাগার্জ্জুন।

সিদ্ধ নাগার্জ্জুন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের এক উজ্জ্বলতম রত্ন। সুশ্রুত নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের টীকায় শ্রীমদ্ ডল্বনাচার্য্য লিখিয়াছেন, নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের * প্রতিসংস্কর্ত্তা। সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্র নামক গ্রন্থে উত্তরতন্ত্রনামক শেষ অধ্যায় ও নাগার্জ্জুনের বিরচিত। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে চক্রপাণি † চিকিৎসা-সংগ্রহ নামক গ্রন্থে নাগার্জ্জুনাঞ্জন ও নাগার্জ্জুনযোগনামক ঔষধদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পাটলীপুত্র নগরের কোনস্তম্ভে নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক উক্ত ঔষধদ্বয়ের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট ‡ রসরত্নসমুচ্চয়গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের প্রতি স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন "নাগার্জ্জুন, সুরানন্দ, নাগবোধি, যশোধন, খণ্ডকাপালিক, ব্রহ্ম, গোবিন্দ, লপক ও হরি এই সমস্ত একই ব্যক্তির নাম"। নাগার্জ্জুন কক্ষপুট নামক গ্রন্থে অনেক ঔষধের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। কথিত আছে নাগার্জ্জুন ঐ গ্রন্থ স্বীয় কক্ষপুটে ধারণপূর্ব্বক দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন। এইরূপে সংস্কৃত গ্রন্থে নাগার্জ্জুন সম্বন্ধে নানা বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস কোথায়ও লিপিবদ্ধ নাই। সুপ্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণীর ¶ মতে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের দেড়শত বৎসর পরে নাগার্জ্জুন কাশ্মীর দেশে প্রাদুর্ভূত হন।

জাম্—পাল—র্চ—গ্যুই (মঞ্জু—শ্রী—মূল—তন্ত্র) নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে লু—টুব্ (নাগার্জ্জুন) খৃঃ পূঃ ৩৩ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে ঃ—

* "প্রতিসংস্কর্ত্তাপি ইহ নাগার্জ্জুন এব"। (ডল্বনাচার্য্য কৃত সুশ্রুত টীকা)।

† "নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলীপুত্রকে"। (চক্রপাণিঃ)।

‡ নাগার্জ্জুনঃ সুরানন্দো নাগবোধির্যশোধনঃ।
খণ্ডকালিকো ব্রহ্মা গোবিন্দো লপকো হরিঃ॥ (বৃদ্ধবাগ্‌ভট)।

¶ ততো ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পুরনিবৃতেঃ।
অস্মিন্ সহলোকধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ॥
বোধিসত্ত্বশ্চ দেশেঽস্মিন্ একভূমীশ্বরোঽভবৎ।
সতু নাগার্জ্জুনঃ শ্রীমান্ ষড়হর্বন সংশ্রয়ী॥ (রাজতরঙ্গিণী)।

"দে-সিন্ শেগ্-প ঙ-দেস্—নেস্
লো-নি-ষি গ্যু-লোন্-প ন।
গে-লোঙ্ লু-ষেস্ দো-বোদ্ জুঙ্
তন্-প-ল- দদ্ চিঙ্ কন্॥ (জম্-পল্-র্চ-গ্যুই।)

বুদ্ধদেবের ইহ-জগৎ-ত্যাগের চারিশত বৎসর পরে নাগার্জ্জুন নামক এক ভিক্ষু জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বহুউপকার সাধন করিবেন"।

তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে নাগার্জ্জুন দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিদর্ভ দেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বহু লোককে ঐ ধর্ম্মে আনয়ন করেন। সাতবৎসর অবিশ্রান্তচেষ্টার পর তিনি ভারতের তদানীন্তন পরাক্রান্ত নৃপতি ভোজভদ্রকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কাবাব্ দুন্-দেন্ (সপ্তআজ্ঞা) নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থে নাগার্জ্জুন ও তদ্‌গুরু শরহের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাঁরা উভয়েই নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "যে চারিটী সূর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে নাগার্জ্জুন তাঁহাদিগের অন্যতম"। ডাক্তার সুঝুকি নামক জনৈক জাপানী পণ্ডিত আমার নিকট কিয়ৎকাল পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন যে, চীন ভাষায় নাগার্জ্জুনের জীবনচরিত বিদ্যমান আছে। তিনি বলেন সংস্কৃত ভাষায় নাগার্জ্জুনের যে জীবনী লিপিবদ্ধ ছিল উহাই খৃঃ ৪০০ অব্দে কুমারজীব নামক পণ্ডিত চীন ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। নাগার্জ্জুনের সর্ব্বপ্রধান ছাত্রের নাম আর্য্যদেব। তিনি শতকশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

নাগার্জ্জুন বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক খানির নাম এ স্থলে উল্লিখিত হইল ঃ—

(১) ধর্ম্মসংগ্রহ, (২) প্রজ্ঞাদণ্ড, (৩) প্রজ্ঞাশতক, (৪) মাধ্যমিকসূত্র, (৫) প্রজ্ঞাপারমিতাটীকা, (৬) নাগার্জ্জুন কক্ষপুট, (৭) সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার, (৮) দ্বাদশনিকায় শাস্ত্র, ইত্যাদি।

নাগার্জ্জুনের গ্রন্থসমূহ বৌদ্ধসমাজে সবিশেষ সমাদৃত ছিল। শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

সংক্ষেপেণাথবা তাবৎ পশ্যেৎ সূত্রসমুচ্চয়ম্।
আর্য্যনাগার্জ্জুনাবদ্ধং দ্বিতীয়ং চ প্রযত্নতঃ॥ (বোধিচর্য্যাবতার)

মাধ্যমিকসূত্রই নাগার্জ্জুনের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ। মাধ্যমিকদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই তিনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। চন্দ্রকীর্ত্তি মাধ্যমিক টীকার প্রারম্ভে নাগার্জ্জুনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক লিখিয়াছেন ঃ—

নাগার্জ্জুনায় প্রণিপত্য তস্মৈ তৎকারিকাণাং বিবৃতিং করিষ্যে।
(মাধ্যমিকবৃত্তি)

মাধ্যমিকদর্শনের মূলতত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ। এইমতে কোন বস্তুরই যথার্থ সত্তা নাই, পদার্থ সকল প্রতীয়মান সত্তা লইয়া সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতেছে। প্রতীয়মান সত্তার অপর নাম সংবৃত্তিসত্য বা ব্যবহারিকসত্য। যথার্থ সত্তার অপর নাম পরমার্থসত্য। বৌদ্ধদার্শনিকগণ শূন্যতাকেই পরম সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। মাধমিকসূত্রে স্পষ্টই লিখিত আছেঃ—

দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।
লোকসংবৃত্তিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ॥ (মাধ্যমিকসূত্র)

দুই প্রকার সত্যের আশ্রয় করিয়া বুদ্ধগণ ধর্ম্মের উপদেশ দেন—সংবৃত্তি সত্য ও পরমার্থ সত্য।

নাগার্জ্জুন মাধ্যমিকসূত্রের প্রারম্ভে বুদ্ধদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন ঃ—

অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্
অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্।
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্
দেশয়ামাস সম্বুদ্ধস্তং বন্দে বদতাং বরম্॥ (মাধ্যমিকসূত্র)

পদার্থসমূহের প্রকৃত উৎপাদ ও নিরোধ, উচ্ছেদ ও শাশ্বতিকত্ব, একার্থত্ব ও নানার্থত্ব, আগম ও নির্গম নাই। যিনি প্রপঞ্চনাশক ও মঙ্গলবিধায়ক এই প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, আমি সেই বাগ্মিবর বুদ্ধদেবকে বন্দনা করি।

মাধ্যমিকদর্শনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

জপজী।

ভূমিকা।

গুরু নানক কর্ত্তৃক শিখসমাজ গঠিত হইয়াছে। তিনি শিখদিগের আদি গুরু। পঞ্জাবী ভাষায় তিনি 'জপজী' বা জপ পরমার্থ রচনা করেন। ইহা শিখদিগের "আদিগ্রন্থ" নামক ধর্ম্মপুস্তকের প্রথমঅধ্যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানদিগের আক্রমণ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব,—এই তিনের সমন্বয়ে শিখধর্ম্মের পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতের ভক্তি-প্রস্রবণ হইতেই গুরুনানকের ধর্ম্মমূলক উপদেশসমূহ এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতারূপ উৎস নিস্যন্দিত হইয়াছিল। রামানুজের প্রিয়শিষ্য রামানন্দের যে দ্বাদশজন ভাগবত শিষ্য ছিল, তাহাদিগের লিখিত পুস্তকাদি হইতে "আদিগ্রন্থের" এক তৃতীয়াংশ সংগৃহীত হইয়াছে। হিন্দুদিগের ন্যায় দেবদেবীর পূজার পরিবর্ত্তে শিখগণ ভক্তির সহিত "আদিগ্রন্থের" পূজা করিয়া থাকেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা যেরূপ গায়ত্রী জপ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, শিখেরা তদ্রূপ অতি প্রত্যূষে জপজীর অন্ততঃ প্রথম পদ আবৃত্তি না করিয়া সংসারকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। 'গীতা' যেরূপ হিন্দুদিগের আদরের বস্তু, 'জপজী' সেইরূপ শিখদিগের আদরের বস্তু।

'জপজী' কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে লিখিত হয় নাই। নানককে তাঁহার শিষ্যেরা মধ্যে মধ্যে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, তাহার কতকগুলি উত্তর 'জপজীর' আকার ধারণ করিয়াছে। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে ইহাতে অসংলগ্ন দোষ দৃষ্ট হয়। 'জপজীর' সকল পদের ছন্দ ও পংক্তি সংখ্যা সমান নহে। 'জপজীর' সকল পদগুলি আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই পুস্তকের ৫২ খানি টীকা প্রচলিত আছে। টীকাকারদিগের পাণ্ডিত্যানুসারে 'জপজীর' টীকাতে কেহ দ্বৈতমত, কেহ অদ্বৈত মত, কেহ মায়াবাদ, কেহ ভক্তিমত, কেহ বা জ্ঞানমত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সকল মতের সামঞ্জস্য করিয়া 'জপজীর' অনুবাদ করা হইল।

রাভিনদীর তীরস্থ তালবন্দ নামক গ্রামে, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে (এপ্রিল কিম্বা

যে মাসে) নানক ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতার নাম কালু, তিনি ক্ষেত্রী-জাতীয় বেদীবংশীয় কৃষিজীবী ছিলেন এবং রায়বুলার মক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুতের অধীনে তিনি ঐ গ্রামে পাটওয়ারির কাজ করিতেন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নানকের জন্মের সময় তেত্রিশকোটি হিন্দু-দেবদেবীরা আবির্ভূত হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, একজন প্রধান ভক্ত পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার শৈশবের ঘটনাসমূহের বিষয় অতি অল্পই জানা যায়। অন্য বালকদের ন্যায় তিনি ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত না করিয়া গভীর পরমার্থিক চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সাত বৎসর বয়সকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন; কিন্তু তাঁহার অলৌকিকজ্ঞানের নিকট তাঁহার শিক্ষক পরাভূত হইয়া, তাঁহারই নিকট জ্ঞান শিক্ষা করেন।

মধ্যবয়সে তিনি দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দুইটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সংসারধর্ম্মে নানক বড় অমনোযোগী ছিলেন এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য কোন কাজকর্ম্ম না করায় তাঁহার আর্থিক কষ্টও যথেষ্ট হইয়াছিল। শৈশবাবধি তাঁহার সাধুসন্ন্যাসীর সহিত সঙ্গ করিতে বিশেষ আসক্তি ছিল। তিনি সংসারধর্ম্মে মন দিতেন না বলিয়া সকলে তাঁহাকে পাগল ভাবিত।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা তিনি এক নদীর খালে স্নান করিতে যান; পরে স্নানের নিমিত্ত অবগাহন করিলে বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বিষ্ণুর সমীপে লইয়া যায়। তথায় তাঁহার দীক্ষা হয় এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের নাম প্রচার করিবার জন্য আদিষ্ট হন। ইহার পর তিনি খালের ভিতর হইতে প্রত্যাগত হইয়া, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করেন। যে ভৃত্যের সহিত তিনি স্নান করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার নদীগর্ভে মজ্জনের পর, সেই ভৃত্য আসিয়া সকলকে বলে যে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন; পরে সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া জাল দিয়া অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু তাহাকে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এক্ষণে তাঁহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

এই ঘটনার পর তাহার সামান্যবিষয়াদি যাহা ছিল তাহা দরিদ্রদিগকে দান করেন এবং ফকিরত্ব গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। তিনি প্রথমে

প্রচার করেন যে "হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কেহ নাই।" এই উপদেশে সকলে ক্ষুণ্ণ হয় এবং নবাব দৌলত খাঁ তাঁহাকে এই বাক্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। সেই সময়ে মধ্যাহ্নপ্রার্থনা করিবার সময়, কাজীসাহেব তাঁহার প্রার্থনা বলিতেছিলেন; নানক তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কেন তিনি কাজীসাহেবকে অপমান করিলেন, নবাব এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিলেন যে কাজীর প্রার্থনা স্বর্গে পৌঁছাইবে না, কারণ যখন তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন তাঁহার মন পরমাত্মার দিকে ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণে কূপ সমীপস্থ এক সদ্যপ্রসূত মেষ-শাবকের উপর তাঁহার মন আকৃষ্ট ছিল। ইহা শ্রবণে কাজী নানকের পদতলে পতিত হন এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন।

গৃহত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে পূর্ব্বদিকে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হন। সেই সময়ে শেখ শাজান নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই ব্যক্তি হিন্দুদিগের জন্য এক মন্দির এবং মুসলমানদিগের জন্য এক মসজিদ্ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার নিকট যে কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, সে আনন্দের সহিত তাহার আতিথ্যসংকার করিত, পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। নানক অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির দ্বারা তাহার স্বভাব এবং পাপ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন এবং অবশেষে তাহাঁকে তাহার পাপের জন্য অনুতপ্ত করেন। ইহার পর তিনি এক মৃতহস্তীকে পুনর্জীবিত করেন, একদল ঠগীকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করেন এবং আরও অনেক আশ্চর্য্যক্রিয়া প্রদর্শন করেন। বাবর যখন সয়েদপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নানক বন্দী হন। কিন্তু যখন বাবরের সম্মুখে নীত হন, বাবর তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হন এবং তাঁহাকে এবং অপরাপর বন্দীগণকে কারাগার হইতে মোচন করিয়া দেন।

নানক যখন দ্বিতীয়বার প্রচার করিতে বাহির হন, তখন দক্ষিণ দিকে এবং তৃতীয়বার প্রচার করিবার জন্য উত্তরদিকে গমন করেন। এই তৃতীয়বারে তিনি সুমেরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তথায় মহাদেব এবং

মহা মহা যোগীগণের সহিত তাঁহার অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। তিনি যখন চতুর্থবার প্রচার করিবার জন্য ভ্রমণে বাহির হন, তখন পশ্চিমদিকে মক্কা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। মক্কাতে যখন উপস্থিত হন, তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং অন্যমনস্ক বশতঃ মহম্মদের গোরস্থান কাবার দিকে তিনি পদবিস্তৃত করিয়া শয়ন করেন। কাজী রুকুদ্দিন ভগবানের গৃহের প্রতি এইরূপ অসম্মাননা দেখিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন; কিন্তু নানক তাহার উত্তরে বলেন যে, "আমার পা এরূপ স্থানে ফিরাও দেখি, যেখানে ভগবানের গৃহ নাই"। কাজী তাঁহার পা যেদিকে ফিরাইতে লাগিলেন কাবাও সেই দিকে ফিরিতে লাগিল। এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া কাজী নানকের পদচুম্বন করেন এবং অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নানক পঞ্চমবারে গোরথ হাতাবি পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া আইসেন। ইহাই তাঁহার শেষ ভ্রমণ; ইহার পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুকালের ঘটনাও বিস্ময়কর।

শেষবারের ভ্রমণের পর যখন তিনি রাভি নদীর কূলে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার শিষ্যদিগের ভিতর প্রচার হয় যে, গুরু আসিয়াছেন। তিনি এক শুষ্কবৃক্ষের তলে অবস্থিতি করিলে, সেই বৃক্ষ তাহার স্পর্শে পুষ্পিত ও মুঞ্জরিত হইয়া উঠে। তাহারপর তিনি প্রচার করেন যে, এইবার তিনি দেহরক্ষা করিবেন। পরে হিন্দু এবং মুসলমান ভক্তগণ একত্রে সমবেত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। হিন্দুরা বলেন যে, নানকের মৃত্যুর পর তাঁহারা তাঁহার সৎকার করিবেন এবং মুসলমানেরা বলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে গোর দিবেন। তাহাদের কলহ মিটাইবার জন্য তিনি বলেন যে, "হিন্দুরা আমার দক্ষিণ দিকে এবং মুসলমানেরা আমার বামদিকে পুষ্প স্থাপন করুক। যদি কল্য প্রাতঃকালে হিন্দুদিগের পুষ্প শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে তাহারা আমার সৎকার করিবে এবং যদি মুসলমানদিগের পুষ্প শুষ্ক না হয়, তাহা হইলে তাহারা আমার গোর দিবে"। তৎপরে তিনি একখণ্ড বস্ত্রে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া, তাঁহার ভক্তদিগকে ভগবানের স্তোত্র আবৃত্তি করিতে বলেন। সেই স্তোত্র শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার দেহ রক্ষা হয়। অবশেষে পরদিন প্রাতঃকালে যখন তাহারা সেই বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল, তখন তাহারা দেখিল

যে, বস্ত্রের ভিতর কেহ নাই, নানক অন্তর্ধান করিয়াছেন। কিন্তু পুষ্প সকল সমভাবে রহিয়াছে; কাহারও পুষ্প শুষ্ক হয় নাই। তৎপরে হিন্দুরা হিন্দু-দিগের এবং মুসলমানেরা মুসলমানদিগের পুষ্প লইয়া "গুরু", "গুরু" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এইরূপে শিখদিগের আদিগুরু পৃথিবী হইতে তিরোহিত হন। কিন্তু তিনি যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা অমূল্য রত্ন বিশেষ। বিশেষতঃ 'জপজীর' ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ শিখদের আর নাই। এই অমূল্যরত্ন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রথিত করিয়া রাখিলে ভাষারই মঙ্গল বিধায়, 'জপজী' অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জপজী।

এক ওঁ সৎ নাম কর্ত্তা পুরুষ,
নির্ভৌ, নির্বৈর, অকাল-মূরত,
আজুনি সৈভং, গুরুপ্রসাদ, জপ।
আদি সচ্চ, যুগাদি সচ্চ, হৈভীসচ্, নানক, হোসীভী সচ্
সোচে সোচ ন হোবৈ, যে সোচী লখবার,
চুপে চুপ্ ন হোবৈ, যে লায়রহা লিবতার।
ভুখিয়া ভুখন উতরি, যে বল্না পুরিয়া ভার।
ষহস সিয়ানপা লখ হোবে, তইক ন চল্লে নাল।
কিব সচিয়ারা হোবৈ ? কিব কুড়্ড়ে তুট্টে পাল ?
হুকুমরজাই চল্না, নানক, লিখিয়া নাল ॥ ১ ॥

অর্থঃ—সত্যনামধারী, সর্ব্বপ্রপঞ্চকর্ত্তা, নির্ভয়, বৈররহিত, বিনাশহীন এবং অযোনী-সম্ভব একমাত্র পরমাত্মা ও সদ্গুরুর কৃপায় লাভ হয়। নানক বলিতেছেন যে, তিনি আদিতে অর্থাৎ আমার জন্মের পূর্ব্বে সত্য ছিলেন,

যুগের আদিতে সত্য ছিলেন, এখনও সত্য আছেন এবং ভবিষ্যতে আমার মৃত্যুর পরেও সত্য থাকিবেন। বিচারের পর বিচারের দ্বারা, এমন কি লক্ষবার বিচারেও তাঁহাকে জানা যায় না। মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেও কিছুই হইবে না, কারণ পরমাত্মা ভিন্ন পরমাত্মার স্বরূপ অপরে কেহ জ্ঞাত নহে। বিশাল নগরীসমূহে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য প্রস্তুত থাকিলেও, যেমন ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ যাবৎকাল পরমাত্মাকে না জানা যায়, তাবৎকাল মনুষ্য বহুগুণবান হইলেও শান্তি পায় না। সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে কেমন করিয়া জানা যাইবে, কেমন করিয়া অসত্যকে (অর্থাৎ, কামক্রোধাদিকে) দূর করা যাইবে? ইহার উত্তরে, নানক বলিতেছেন যে পরমাত্মার আদেশ * অনুসারে কার্য্য করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই ॥ ১ ॥

হুক্‌মী হোবন আকার, হুকুম ন কহিয়া যাই,
হুক্‌মী হোবন জীব, হুক্‌মী মিলে বডিয়াই।
হুক্‌মী উত্তম নীচ, হুক্‌মী লিখি দুখ্ সুখ্ পাইয়ে,
ইক্‌না হুক্‌মী বখ্‌সীস, ইক হুক্‌মী সদা ভবাইয়া।
হুক্‌মে অন্দর সভ্ কোই, বাহর হুকুম ন কোই,
নানক হুক্‌মৈ যে বুঝেত ত হুক্‌মৈ কহে ন কোই ॥ ২ ॥

অর্থঃ—তাঁহার আদেশে সকল বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে; সাধারণ মনুষ্য তাঁহার আদেশ যে কি তাহা বলিতে অসমর্থ। তাঁহার আদেশে জীব সৃষ্ট হইতেছে এবং তাঁহারই আদেশে জীবের উন্নতি হইতেছে। তাঁহার আদেশে জীব নীচপদ হইতে উত্তম পদে আরূঢ় হইতেছে; তাঁহারই আদেশে সকলে সুখ দুঃখ ভোগ করে। তাঁহারই আদেশে কেহ পুরস্কার অর্থাৎ শান্তি পাইতেছে এবং কেহবা সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে। সকলের অভ্যন্তরে ঐ আদেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে; বাহিরে উহার তত্ত্ব বুঝা যায় না। নানক বলিতেছেন যে, কেবল জ্ঞানী পুরুষেরাই তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হন, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না ॥ ২ ॥

* প্রকাশমান চৈতন্য শক্তির অনুকূলে কার্য্য করার নাম পরমাত্মার আদেশ।

গাবে কো তান্ হোবে কি সে তান্,
গাবে কো দাত্, যানে নিসান।
গাবে কো গুণ বডিয়াইয়াঁ চার।
গাবে কো বিদ্যা বিখম্ বিচার।
গাবে কো সাজ করে তনু খেহ্।
গাবে কো জীয় লয় ফিরি দেহ্।
গাবে কো জাপৈ দিস্‌সৈ দূর,
গাবে কো বেক্‌খে হাদারা হদূর।
কথ্‌না কথিন আবে তোট্,
কথ কথী কথিয়ৈ কোট কোট কোট।
দেঁদা দে লেন্দে থক্ পায়,
যুগা যুগান্তর খাই খায়।
হুকুমী হুকুম চলায়ে রহ।
নানক বিগসৈ বে-পরবাহ ॥ ৩ ॥

অর্থ ঃ—যিনি পরমাত্মার অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল পরমাত্মার বিষয়ে যথার্থরূপে গান করিতে সমর্থ। কেহ গুণের বিচার করিয়া তাঁহার গান করিতেছে, কেহ বিদ্যার বিচার করিয়া গান করিতেছে; ব্রহ্মা সৃষ্টির দ্বারা গান করিতেছেন এবং মহাদেব সংহার দ্বারা গান করিতেছেন। কোন কোন যোগীপুরুষ একজন্মে তাঁহার গান করিতে সক্ষম না হইয়া, পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার গান করিতেছে, কেহ কেহ তাহাকে দুর্জ্ঞেয় ভাবিয়া জপের দ্বারা গান করিতেছে এবং কেহবা তাঁহার সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া গান করিতেছে। তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহার সীমা পাইবে না। পরমাত্মার দান অসীম; গ্রহীতা সেই দান গ্রহণ করিয়া অন্ত পায় না; যুগযুগান্তর সেই দান ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না। পরমাত্মার আদেশ এইরূপে চলিতেছে। নানক বলিতেছেন যে, সেই পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশমান এবং অভাবশূন্য ॥ ৩ ॥

সাচা সাহেব, সাচা নাঁউ, ভাখ্যা ভাউ অপার,
আখৈ মংগ্গে দেঁ দেঁ, দাত করে দাতার।
ফের কি আগে রখিয়ে, জিতু দিসৈ দরবার ?
মুহুঁ কি বোলন বোলিয়ে, জিত্ সুন ধরে পিয়ার,
অমৃত বেলা সচ্ নাঁউ বড্ডিয়াই বিচার।
করমী আবৈ, কপ্ড়া নদরী মোখ দুয়ার।
নানক, এবৈঁ জানিয়ে সভ্ আপে সচিয়ার ॥ ৪ ॥

অর্থ ঃ—পরমাত্মা সত্যস্বরূপ, তাঁহার নাম সত্য এবং তাঁহার ভাব অনন্ত। তাঁহার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করিতেছে, সে তাহা প্রাপ্ত হইতেছে। কোন্ বিষয় তাঁহার সম্মুখে রাখিলে, অর্থাৎ কি কার্য্য করিলে, সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার মহিমা যাহা শুনিতে ভাল লাগে তাহা মুখে বর্ণনা করিবে; অতি প্রত্যুষে তাঁহার সত্যনাম এবং মহিমার বিচার করিবে; কর্ম্মদ্বারা জীব পাঞ্চভৌতিক শরীর গ্রহণ করে এবং জ্ঞানরূপ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে আমি অর্থাৎ দ্রষ্টা সত্য এবং দৃশ্যও সত্য বোধ হয়॥ ৪ ॥

থাপিয়া ন জাই কিতা ন হৈ,
আপে আপ্ নিরঞ্জন সোই।
জিন সেবিয়া তিন্ পাইয়া মান্,
নানক গাবিয়ে গুণি নিধান।
গাবিয়ে সুনিয়ে মন রাখিয়ে ভাউ,
দুখ্ পর্হর্ সুখ্ ঘর লৈ জাই।
গুরমুখ্ নাদং, গুরমুখ্ বেদং, গুরমুখ্ রহিয়া সমাই,
গুরু ঈশ্বর, গুরু গোরখ, বর্ম্মাগুরু পার্ব্বতী মাই।
যে হুঁ জানা আখা নাহি, কহে না কথন ন জাই।
গুরাঁ ইক দেহ বুঝাই,
সভন্ জীয়া কা একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই ॥ ৫ ॥

অর্থ ঃ—পরমাত্মার জ্ঞান কোন স্থানবিশেষে স্থাপন করা যায় না এবং বাহ্য কর্ম্মদ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ হয় না। তিনি স্বয়ং নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়ারূপ আবরণ রহিত। যে ব্যক্তি অন্তর্মুখী ও জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করে, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হয়; নানক বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তিই পরমাত্মার গুণগান করিতে সক্ষম। পরমাত্মার গুণ শ্রবণ করিয়া, সেই গুণে প্রীতি রাখিলে দুঃখ নাশ হইয়া, সুখ অর্থাৎ শান্তি লাভ হয়। পরমাত্মার অনুভবকারিসদ্গুরুর মুখে জ্ঞানরূপী ধ্বনি এবং বেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাঁহারই মুখে জ্ঞান অবস্থিতি করিতেছে। পরমাত্মার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে যাঁহার লাভ হইয়াছে, এইরূপ গুরুকে ঈশ্বর, গোরক্ষনাথ, ব্রহ্মা কিম্বা পার্ব্বতীমাতা বলা যায়। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার অনুভব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না; সদ্গুরুর কৃপায় জ্ঞানরূপ দেহ লাভ হয়। পরমাত্মাকে সকল জীবের একমাত্র দাতা তাহা কখন ভুলিব না॥ ৫ ॥

তীরথ্ নাঁবা, জে তুদ্ ভাবা, বিন্ ভাঁনে কি নাঁই করি
জেতী সিরসঠ্ উপাই বেখা, বিনু করমা কি মিলে লই।
মত্ বিচ রতন্, জবাহার মাণিক,
যে ইক গুঁরাকী শিখসুনী, গুরাঁ ইক দেহি বুঝাই।
সভন্ জীয়াকা একদাতা, সোমে বিসরি ন জাই ॥ ৬ ॥

অর্থ ঃ—পরমাত্মার মনন ভিন্ন আত্মরূপী তীর্থে কেহ স্নান করিতে সক্ষম হয় না; অনুভব ভিন্ন ঐ তীর্থ লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। যতপ্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে তাহারা আত্মকর্ম্ম ভিন্ন পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারে না। সকল মনুষ্যের ভিতরে জ্ঞানরূপ মণিমাণিক্যাদি বিরাজ করিতেছে; কিন্তু সদ্গুরুর কৃপাই জ্ঞানরূপ রত্নাদি লাভ হয়। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মার অনুভব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না; সদ্গুরুর কৃপায় জ্ঞানরূপ দেহ লাভ হয়। পরমাত্মা যে সকল জীবের একমাত্র দাতা তাহা কখন ভুলিব না॥ ৬ ॥

জে যুগ চারে আর্জাঁ হোর দসূনী হোই,
নবা খণ্ড বিচ জানিয়ে, নাল চলে সভ কোই।

চংগা নাঁউ রখায়কে, যস কীরত্ জগ লেই,
যে তিস্ নদরী ন আয়ে, তাঁ বাত ন পুছে কৈ।
কীটা অন্দর কীটকর, দোষী দোষ ধরে।
নানক, নিগুর্ণীয়া গুণ করে, গুণ বন্তিয়া গুণ দেই।
তেহা কোইন সুঝই জিতু সুন গুণ কোই করে ॥ ৭ ॥

অর্থ ঃ—যদি সাধনারদ্বারা কাহার পরমায়ুঃ চারিযুগব্যাপী হয়, কিম্বা উহার দশগুণ বর্দ্ধিত হয়, কিম্বা নবখণ্ড পৃথিবীস্থ * জীব উহার আদেশানুসারে চলে, কিম্বা জগতে যশকীর্ত্ত্যাদি লাভ করে, কিন্তু যত্তাপি সে পরমাত্মার অনুভব না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সকল, সিদ্ধিই তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। সে নিজে নীচ অবস্থায় সামান্য কীটের ন্যায় থাকিয়াও, উচ্চ অবস্থার মহদ্‌ব্যক্তিকেও তাহাদের ন্যায় কীট বিবেচনা করিয়া তাহার দোষ ধরে। নানক বলিতেছেন যে, সেই নির্গুণ পরমাত্মার নিকট যে ব্যক্তি সগুণ ভাবিয়া যাহা কামনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ হয়; তখন সেই নির্গুণ পরমাত্মা গুণবানের ন্যায় গুণ প্রদান করেন। জ্ঞানী পুরুষেরা পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও মহিমা বর্ণনা করেন না॥ ৭ ॥

শুনিয়ে সিধ পীর সুরনাথ,
শুনিয়ে ধরতী ধবল আকাশ,
শুনিয়ে দ্বীপ লোহ পাতাল,
শুনিয়ে পোহি ন সকে কাল।
নানক ভগতা সদা বিকাশ
শুনিয়ে দুখ পাপ কা নাশ ॥ ৮ ॥

অর্থ ঃ—সিদ্ধপীর, দেবতা, পৃথিবী, পর্ব্বত, আকাশ, সপ্তদ্বীপ, † সপ্তলোক, ‡ এবং সপ্তপাতাল ¶ যাহাদের কথা আমরা শুনিতে পাই, তাহাদিগকে কাল

* ঐন্দ্র, কসেরু, তাম্রপর্ণ, কুমারিকা, নাগ, সৌম্য ইত্যাদি নবখণ্ড।
† সপ্তদ্বীপ— জম্বু, শাক, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, গোমেদক, পুষ্কর।
‡ সপ্তলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য।
¶ সপ্তপাতাল—তল, অতল, বিতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল।

নাশ করিতে পারে না। নানক বলিতেছেন, যে ভক্ত অর্থাৎ পরমাত্মার অনুভবকারী পুরুষ সর্ব্বদাই প্রকাশমান; এবং জ্ঞানরূপ বাক্য অজ্ঞানীর নিকট দুঃখ বলিয়া প্রতীতি হইলেও, উহা শ্রবণ করিয়া অজ্ঞানের নাশ হয়॥ ৮ ॥

শুনিয়ে ঈসর বর্ম্মা ইন্দ,
শুনিয়ে মুখ সলাহন মন্দ,
শুনিয়ে যোগ জুগতি তন ভেদ
শুনিয়ে শাস্ত্র সমৃতি বেদ।
নানক ভগতা সদা বিকাশ
শুনিয়ে দুখ পাপ কা নাশ ॥ ৯ ॥

অর্থ ঃ—ঈশ্বর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং উত্তম ও অধম বিচারকারীর কথা শুনা যায়; যোগের দ্বারা শরীরের ভেদ হয় ইহাও শুনা যায়; শাস্ত্র, স্মৃতি বেদের কথাও শুনা যায়। কিন্তু নানক বলিতেছেন ইত্যাদি॥ ৯ ॥

শুনিয়ে সৎ সন্তোষ গিয়ান,
শুনিয়ে আট সাঠ্ কা ইসনান,
শুনিয়ে পঢ় পঢ় পাবে মান
শুনিয়ে সহজ লাগে ধিয়ান।
নানক ভগতা সদা বিকাশ,
শুনিয়ে দুখ পাপ কা নাশ ॥ ১০ ॥

অর্থ ঃ—সৎসন্তোষ ও জ্ঞানের কথা শুনা যায়, ৬৮ প্রকার তীর্থস্নানের কথা শুনা যায়, শাস্ত্রাদি পাঠে মনুষ্য বিদ্যা লাভ করে ইহাও শুনা যায়, এবং সহজ উপায়ে ধ্যানলাভ হয় ইহাও শুনা যায়। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি॥ ১০ ॥

শুনিয়ে সবাঁ গুনাকে গাহ্,
শুনিয়ে, সেখ পীর পাতসাহ্,
শুনিয়ে অন্ধে পাবে রাহ্
শুনিয়ে হাত হবে অসগাহ্।

নানক ভগতা সদা বিকাশ,
শুনিয়ে দুখ পাপ কা নাশ ॥ ১১ ॥

অর্থ ঃ—সাকার ব্রহ্মের বর্ণনা শুনা যায়; সেখ, পীর ও পাতসাহের বর্ণনা শুনা যায়। অজ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানমার্গ প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্য হস্তপদাদি রহিত অর্থাৎ সহায়বিহীন হয়, এইরূপও শুনা যায়। কিন্তু নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

মন্‌নে কী গতি কহি না জাই,
যে কো কহে পিছে পছ তাই।
কাগদ কলম ন লিখন হার,
মন্‌নে কা বহি কর্‌নি বিচার।
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই,
যে কো মন্ জানে মন্ কোই ॥ ১২ ॥

অর্থ ঃ—মনের গতি বর্ণনা করা যায় না, উহা অসংখ্য প্রকার, যদি কেহ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করে তাহার চেষ্টা বৃথা হয়। কাগজ ও কলম উহার বর্ণনা করিতে গিয়া হার মানিয়াছে এবং পুস্তক লিখিয়াও কেহ মনের বিচার করিতে সমর্থ হয় নাই। সদ্‌গুরুর কৃপায় যে অভ্যাসদ্বারা মন মনকে জানিতে পারে সেই অভ্যাসরূপ নামের দ্বারা, মানব সেই নিরঞ্জনের অর্থাৎ সর্ব্ব প্রপঞ্চাতীত নিরাকারের তদাকারত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

মন্‌নে স্থরতি হোবে মন বুধ,
মন্‌নে সগল ভবন কী সুদ্ধ্।
মন্‌নে মুহি চোটা ন খাই,
মন্‌নে যমকে সাথ ন জাই।
ঐ সা নাম নিরঞ্জন হোই
যে কো মন্ জানে মন্ কোই ॥ ১৩ ॥

নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপ বায়ুতে মন স্থির করিলে যখন ঐ বায়ু এবং মন স্তব্ধ হইয়া যায়, তখন মন বুদ্ধি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপ্রজ্ঞারূপে পরিণত হয়; যখন মন শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা লাভ করে, তখন উহা ব্যাপ্ত সত্ত্বা হয়, অর্থাৎ সকল লোকান্তরের

জ্ঞাতা হয়। মন তখন সুখ দুঃখের অতীত হয় এবং মনের তখন মৃত্যু হয় না। কিন্তু নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

মন্‌নে মার্গ ঠাকি ন পাই,
মন্‌নে পতি সিউঁ পরগট জাই,
মন্‌নে মগন্ চলে পন্থ
মন্‌নে ধরম সেতী সম্বন্ধ।
ঐ সা নাম নিরঞ্জন হোই
যে কো মন্ জানে মন কোই ॥ ১৪ ॥

অর্থ ঃ—মনের পথ হইতে মনকে কেহ ভুলাইতে পারে না; সদ্‌গুরুর উপদেশের দ্বারা মন পরমাত্মায় বিলীন হয়। মনের পথ আনন্দরূপী এবং ধর্ম্মের সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার অনুভবের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

মন্‌নে পাবে মোখ্ দুয়ার,
মন্‌নে পরবারে সাধার,
মন্‌নে তরে তারে গুরু সিখ,
মন্‌নে, নানক ভবেঁ ন ভিখ।
ঐ সা নাম নিরঞ্জন হোই,
যে কো মন্ জানে মন্ কোই ॥ ১৫ ॥

অর্থ ঃ—মন মোক্ষের দ্বার প্রাপ্ত হয়; উত্তম জ্ঞানরূপ আধারের সাহায্যে সংসাররূপ মহাপারাবার উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সদ্‌গুরুর কৃপায় শিষ্যের অজ্ঞান দূর হয়; নানক বলেন যে, তখন মনের দরিদ্রতা অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থা থাকে না। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

পঞ্চ পরবাণ পঞ্চ পরধান,
পঞ্চ পাবে দরগে মান,
পঞ্চে সোহে দর রাজান।
পঞ্চাঁ কা গুরু এক ধিয়ান।

যে কো কহে করে বিচার,
তা কর্‌তে কথ্‌নে নাহি সুমার।
ধৌল ধর্ম্ম দয়া কা পুত,
সন্তোষ থাপি রাখিয়া জিন্‌ সুত।
যে কো বুঝে হোবে সচিয়ার,
ধব্‌লে উপরি কেতা ভার।
ধরতী হোর পরে হোর হোর,
তিস্‌তে ভার তলে কৌন জোর।
জীয়া জাতি রঙ্গা কে নাম,
সভনা লিখিয়া বুঢ়ি কলাম।
এহ্‌ লেখা লিখি জানে কোই,
লেখা লিখিয়া কেতা হোই।
কেতা তান সুয়ালিহ রূপ,
কেতী দাত জানে কৌন কুত।
কীতা পসাউ একো কবাহ্‌,
তিস্‌তে হোয়ে লাখ দরিয়া।
কুদরতি কবন কহা বিচার
বারিয়া ন জাবা একবার,
যো তুদ ভাবে সাই ভলিকার
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার ॥ ১৬ ॥

অর্থ ঃ—পঞ্চপ্রকার প্রমাণ * আছে এবং এই দ্রষ্টাদি পঞ্চবাক্যকে জ্ঞানী পুরুষেরা প্রধান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন; এই পঞ্চবিধ প্রমাণ যখন একত্রিত হয়, তখন পরমাত্মার অনুভব হয়; রাজাধিরাজ পরমাত্মার নিকট পঞ্চপ্রকার

* প্রমাণ—যথা দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশ্য, শ্রবণ ও মনন।

বিচার * শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয় †। পঞ্চপ্রকার বস্তুর ‡ ধ্যানই গুরু, অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা ঐ পঞ্চবিধ শত্রুর দমন হয়। যে ব্যক্তি পরমাত্মাবিষয়ক কথন কিম্বা বিচার করে, সে ব্যক্তি কথন কিম্বা বিচারের দ্বারা তাঁহার অন্ত পায় না। নির্ম্মল অর্থাৎ পরমপবিত্র ধর্ম্ম দয়ার পুত্র স্বরূপ অর্থাৎ, উহা দয়ার দ্বারা চালিত হয়। যে মনুষ্যের অভ্যন্তরে পরম সন্তোষরূপী সূত্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই লোকেই ধর্ম্মকে জানিতে সক্ষম হয়। সেই পরম সন্তোষকে যে মনুষ্য বুঝিয়াছে সেই লোকেই সত্য স্বরূপ হয়। ধর্ম্মের উপর কত ভার রহিয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্মের উপর অনন্তজ্ঞান, অনন্তধ্যান, অনন্ত পৃথিবী ইত্যাদি রূপ অনন্তভার স্থাপিত রহিয়াছে; এই ভারের কেহ ওজন করিতে পারে না। বহুবিধ জীব, বহুবিধ জাতি এবং বহুবিধ বর্ণ পরমাত্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহার বিচার করিয়া অন্ত পায় না। জীববুদ্ধি যদি উহার বর্ণনা করিতে চায়, তাহা হইলে উহার বর্ণনা লিখিয়া শেষ করিতে পারে না। পরমাত্মার গান, রূপ এবং দয়া অনন্ত, জীব উহার নির্ণয় করিতে পারে না। পরমাত্মার একমাত্র সংকল্প হইতে অনন্ত সৃষ্টিরূপ অনন্ত নদী প্রবাহিত হইয়াছে। পরমাত্মার ঐ সংকল্প জীব বিচারের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে না বলিয়া, নানক বলিতেছেন যে, হে পরমাত্মা! তোমার সংকল্প জীবের পক্ষে মঙ্গলদায়ক; তোমার নাশ নাই, তুমি নিরাকার রূপে বিরাজমান রহিয়াছ ॥ ১৬ ॥

অসংখ জপ, অসংখ ভাউ
অসংখ পূজা, অসংখ তপ তাউ,
অসংখ গ্রন্থ মুখ বেদ পাঠ,
অসংখ যোগ মন রহে উদাস,
অসংখ ভগতি গুণ গিয়ান বিচার।
অসংখ সতী, অসংখ দাতার

* বিচার—যথা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।
† ইহাকেই পরমাত্মার 'হুকুম' বলে।
‡ বস্তু—যথা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়।

অসংখ সুর মুহ ভখসার,
অসংখ মোনি মন লিব লাইতার।
কুদরতি কোন কহা বিচার,
বারিয়া না জাবা একবার
যো তুদ ভাবে সাই ভলিকার
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার ॥ ১৭ ॥

অর্থ ঃ—অসংখ্য জপের দ্বারা, অসংখ্য প্রীতির দ্বারা কিম্বা অসংখ্য পূজা, অসংখ্য তপস্যা এবং অসংখ্য প্রকার বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা পরমাত্মার নির্ণয় করা যায় না। অসংখ্য যোগী সর্ব্বদা যোগে মগ্ন রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নির্ণয় করিতে পারে না। অসংখ্য প্রকার ভক্তির দ্বারা, কিম্বা ধ্যানের দ্বারা তাঁহার গুণের বর্ণনা করিয়া তাঁহার নির্ণয় করিতে পারে না। অসংখ্য সত্যবাদী পুরুষ, অসংখ্য দাতা ব্যক্তি, অসংখ্য ধর্ম্মবীরগণ যাঁহারা পরমাত্মার সারজ্ঞান বিচার করিতে সমর্থ এবং অসংখ্য ব্যক্তিগণ, যাঁহারা পরমাত্মার প্রেমে মৌনী হইয়া আছেন, তাঁহারা কেহই পরমাত্মার নির্ণয় করিতে পারেন না। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

অসংখ মুরখ অন্ধ ঘোর
অসংখ চোর হারাম খোর,
অসংখ অমর কর জাঁয় জোর,
অসংখ গলফড়ি হত্যা কমাহ,
অসংখ পাপী পাপ কর জাই,
অসংখ কুড়িয়ার কুঢ়ে ফিরাহ্,
অসংখ ম্লেক্ষ্ মল-ভখি খাহ্,
অসংখ নিন্দক সির করে ভার,
নানক নীচ কহা বিচার।
কুদরতি কৌন কহা বিচার, ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

অর্থ ঃ—অসংখ্য মূর্খ এবং ঘোর অজ্ঞানী, অসংখ্য চোর এবং হারামখোর (অর্থাৎ অলস ব্যক্তি,) অসংখ্য যোগীগণ যাঁহারা যোগঅভ্যাসের দ্বারা অমর

হইয়াছেন, অসংখ্য পুরুষ যাহারা গলায় রজ্জু দিয়া আত্মঘাতী হয়, অসংখ্য প্রকার পাপী, যাহারা সর্ব্বদা পাপে নিমগ্ন রহিয়াছে, অসংখ্য মিথ্যাবাদী ব্যক্তি যাহারা সর্ব্বদা মিথ্যা বলিতেছে, অসংখ্য নিন্দুক ব্যক্তি যাহারা নিন্দার ভার মস্তকোপরি লইতেছে,—নানক বলিতেছেন যে, আমার ন্যায় একজন সামান্য ক্ষুদ্র মানবও বিচার করিয়া বলিতে সক্ষম যে, পূর্ব্বোক্ত কেহই পরমাত্মার নির্ণয় করিতে পারে না। নানক বলিতেছেন, ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

অসংখ নাব অসংখ থাব,
অগম্য অগম্য অসংখ লোয়,
অসংখ কহে সির ভার হোই।
অখ্‌রী নাম, অখরী সালাহ্
অখ্‌রী গিয়ান গীতগুণ গাহ।
অখ্‌রী লিখন বোলন বাণি
অখরাঁ সির সংযোগ বাখানি।
জিন এহ্ লিখে, তিস্ সির নাহি
জিবঁ ফরমাএ তিবঁ তিবঁ পাহি।
জেতা কীতা তেতা নাঁউ
বিন নাবেঁ নাহি কোথাঁউ।
কুদরতি কৌন, ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

অর্থ ঃ—পরমাত্মার অসংখ্য প্রকার নাম এবং অসংখ্য প্রকার সৃষ্টি বর্ত্তমান রহিয়াছে, পরমাত্মার সৃষ্ট লোকের নির্ণয় করা যায় না; পরমাত্মার অসংখ্য মহিমা বর্ণনা করিতে মস্তক পীড়িত হয়। পরমাত্মার নাম, পরমাত্মার বিচার, পরমাত্মার জ্ঞান এবং পরমাত্মার মহিমাবর্ণন, সকলই অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী; মহাপুরুষেরা পরমাত্মার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, কিম্বা লিখিয়াছেন তাহাও অবিনাশী। পরমাত্মার সহিত যে বাণীর সংযোগ হয় অর্থাৎ বৈখরী বাণী তাহাও অবিনাশী। যে ব্যক্তি পরমাত্মার সম্বন্ধে লিখিয়া থাকে, তাহার মস্তকোপরি কোন দোষ দেওয়া উচিত নহে, কারণ পরমাত্মা তাহাকে যেরূপ অনুভব শক্তি দিয়াছেন, সে ব্যক্তি তদনুযায়ী তাঁহার বর্ণনা করে।

যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পরমাত্মার নাম স্বরূপ; এমন কোন স্থান নাই যেখানে তাহার নামের মহিমা দৃষ্টিগোচর হয় না অর্থাৎ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার নামের প্রকাশ রহিয়াছে॥ ১৯॥

ভরিয়ে হথ পৈর তন দেহ,
পানি ধোতে উতরস্ খেহ্।
মুত পলিতী কাপড় হোই,
দে সাবুন লইয়ে উহ্ ধোই।
ভরিয়ে মতি পাপা কে সঙ্গ,
উহ্ ধোপে নাবঁ কে রঙ্গ।
পুন্নী পাপী আখন নাহ্,
কর কর করনা লিখনে জাহ্,
আপে বীজি আপেহি খাহ্
নানক, হুকমী আবে জাহ্॥ ২০॥

অর্থ ঃ—হস্ত, পদ এবং শরীর মলিন হইলে জলের দ্বারা ধৌত করিলে মলিনতা দুর হয়। বিষ্ঠা এবং মূত্র দ্বারা কাপড় মলিন হইলে সাবানের দ্বারা ধুইলে উহাদের মল ধৌত হইয়া যায়। পাপের দ্বারা যদি মন পরিপূর্ণ হয়, অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা যদি লোকে ভ্রমে আবৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরমাত্মার নামের দ্বারা, অর্থাৎ নামরূপী অনুভবের দ্বারা মলিনতারূপ ভ্রম এবং সংশয় দূর হয়। পুণ্যবান্ এবং পাপী বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই; অবিদ্যার ভ্রমে পাপ এবং পুণ্য বলিয়া দুই প্রকার ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ঐ ভ্রমকে যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়া গ্রহণ করে, তাহার নিকট উহা পাপ কিম্বা পুণ্য বলিয়া গণ্য হয়। মানব নিজেই কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং নিজেই কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। নানক বলিতেছেন, যে পরমাত্মার আদেশানুসারে লোকে সংসারে ঐ ভ্রান্তিবশতঃ যাতায়াত করিতেছে॥ ২০॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

প্রতীচ্য-মায়াবাদ।

বহুশতাব্দী পূর্ব্বে যখন আর্য্যজাতির সভ্যতার কিরণ দিগ্‌দিগন্তর ব্যাপ্ত করিয়াছিল, যখন আর্য্যজাতি উন্নতমস্তিষ্কের পরিচালনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ভারতকে সর্ব্ববিদ্যার আধারভূমি করিয়াছিলেন, যখন বেদান্ত, সাংখ্য ইত্যাদি দর্শন সমূহ, আবিষ্কৃত হইয়া জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল, তখন আর্য্যঋষিরা পৃথিবীর সম্মুখে মায়াবাদের সুমহান্ সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। সে আজ অনেক দিনের কথা; তাহার পর কত দেশ সভ্য হইয়াছে, কত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচ্য ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহার উপর আর কেহ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, অজ্ঞানীর চক্ষে এই সংসার, এই সৃষ্টি, মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিষ্ণু বল, ব্রহ্মা বল, রুদ্র বল, সূর্য্য বল, অগ্নি বল, বায়ু বল, চন্দ্র বল, যম বল, এই সমস্ত দেবগণ, ইঁহারাও মায়া। এ সংসারে যাহা কিছু মহিমাময় বলিয়া দেখিতেছ, কিম্বা যাহাকে তুচ্ছ ঘৃণিত কীটের মত মনে করিতেছ, অধিক কি, তোমার চক্ষে বা অন্তরে যাহা কিছুরই সত্তা বোধ হইতেছে, সে সমস্তই, শুধু একমাত্র মায়া বা অবিদ্যা,—অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং উপাধিভূষিত সমস্ত বিষয়ই মায়া।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রতীচ্য মনীষিগণের আবিষ্কৃত আধুনিক মনোবিজ্ঞান, সেই বহুশতাব্দী পূর্ব্বকার প্রাচ্য মনীষিগণের আবিষ্কৃত মায়াবাদের সম্পূর্ণ পোষকতা করিয়াছে। পূর্ব্বকার ইন্দ্রিয় নিমিত্তক মনোবিজ্ঞান (Physiological psychology) চিন্তনের (thought) প্রক্রিয়া এইরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল যে, কোন একটী ভাব (idea) মানসপ্রতিবিম্ব (mental-image) হইতে, এবং মানসপ্রতিবিম্ব ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ (Sensations) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; আধুনিক প্রতীচ্য মনীষিগণ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রক্রিয়া ও সম্ভবপর, অর্থাৎ, কোন কোন অবস্থার ভাব (idea) মানসপ্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে এবং মানসপ্রতিবিম্ব ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ উদ্রেক করে। তাঁহারা 'হিপনটিজম' (hypnotism) বা 'ট্রান্স' (trance) (অর্থাৎ কৃত্রিম স্বপ্ন বা সমাধি) অবস্থায় এই পরীক্ষা

করিয়া থাকেন। এইরূপ উপায় যে পূর্ব্বে প্রাচ্য দেশে অজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, সুলভা নামক কোন রমণী অলৌকিক যৌগিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি একদা জনক রাজাকে "যোগবন্ধৈর্ববন্ধ সা," অর্থাৎ, 'যোগবন্ধ' দ্বারা তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়াছিলেন। সেই পুরাকালের 'যোগবন্ধ' এবং আধুনিক 'হিপ্‌নটিজ্‌মের' (যোগবন্ধ) ভিতর কোন প্রভেদ নাই। সুলভা 'যোগবন্ধ' যে উপায়ে করিয়াছিলেন আধুনিক প্রেততত্ত্ববিদ্‌গণ ও (Spiritists) অবিকল সেই উপায়ে 'হিপ্‌নটাইজ্‌' (যোগবন্ধ) করিয়া থাকেন। বিনেট (Binet) এবং ফেরি (Fere) নামক দুইজন পাশ্চাত্যপণ্ডিত তাঁহাদের 'হিপ্‌নটিজ্‌ম্' (Hypnotism) (যোগবন্ধ) নামক বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "সাহচর্য্য বশতঃ একটী ভাব (idea) হইতে মানসপ্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় এবং মানসপ্রতিবিম্ব ঐন্দ্রিয়িক উপরাগে পরিণত হয়"। তাঁহারা উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন, কোন একটী কুকুরের কল্পনা (idea) যোগবন্ধযুক্ত একটী লোকের মনে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কুকুরের মানসপ্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে। সেই প্রতিবিম্ব সে "বাহ্যপ্রতিফলিত" করে এবং সেই প্রতিবিম্বকে সে "বাস্তব" না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। "বাহ্য প্রতিফলন" কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তরে ঐ বুধগণ বলেন যে, কোন বিষয়ের বাস্তবত্বে বিশ্বাসকেই ঐ বিষয়ের "বাহ্য প্রতিফলন" বলে, অর্থাৎ কোন মানস প্রতিবিম্বের বাস্তবত্বে বিশ্বাস করার নাম ঐ প্রতিবিম্বের 'বাহ্য প্রতিফলন'। প্রাচ্য ঋষিরা চিন্তনের-প্রক্রিয়া এইরূপে স্থির করিয়াছেন যে মানসপ্রতিবিম্ব হইতেই ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ উৎপন্ন হয়,—আমরা যাহাকে সংসার বলিতেছি তাহা কিছুই নহে কেবল আমাদের মানসপ্রতিবিম্ব সমূহের প্রতিফলন মাত্র। মায়ার ন্যূনাধিক অনুভবক্ষমত্ব (Susceptilility) লইয়াই স্বাভাবিক মনুষ্য ও যোগবন্ধযুক্ত (Hypnotised) মনুষ্যের ভিতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। স্বাভাবিক সংবিৎ (Consciousness) এবং যোগবন্ধের সংবিতের প্রভেদ এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যাইতে পারে, যেমন দুইপ্রকার জল শীতল ও উষ্ণ,—শীতল জল 'স্বাভাবিক' বা সাম্য অবস্থার জল, কারণ স্বাভাবিক জল যাহা পাওয়া যায় তাহা শীতল হয়; এবং উষ্ণ জল, অস্বাভাবিক জল, কারণ সাধারণ জলকে কোন উপায় দ্বারা উষ্ণ করিতে

হয়; এই স্থানে বলা হইতে পারে যে, শীতলজল স্বাভাবিক সংবিতের ন্যায়। প্রতীচ্য বুধমণ্ডলী সম্প্রতি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক লোকে সকল সময়েই অল্পাধিক যোগমুগ্ধ (hypnotic) অবস্থায় আছে; এবং তাঁহারা এ পর্য্যন্তও বলিয়াছেন যে, জীবনের সমুদয় কার্য্য যোগমুগ্ধ অবস্থার অবোধপূর্ব্ব উদ্বোধন (Unconscious Suggestion) দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ঋষিদিগের মতের সহিত এই মতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এমন কি বিনেট্ এবং ফেরি ইহাও বলিয়াছেন যে, "বাহ্য অনুভূতি প্রকৃত পক্ষে (Hallucination) ভ্রমমাত্র।" ইহা মায়ার (Illusion) ন্যায় ইন্দ্রিয় পরিণাম (sensation) এবং বুদ্ধিপরিমাণব্যক্তি সমূহের সমন্বয় (synthesis) মাত্র।"

প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান, প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের ন্যায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে যে, কেবল মাত্র ঐন্দ্রিয়িক প্রত্যক্ষ (sense-perception) দ্বারা আমাদের কিছুই সাহায্য হয় না; কারণ, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের ন্যায় তুল্য ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতিসম্পন্ন একটী গাভী চিত্রশালার চিত্রিত স্বভাবের সৌন্দর্য্য মনুষ্যের ন্যায় উপভোগ করিতে পারিত। কোন বিষয়ের মানসিক উপরাগ (mental impression) জন্মিবার পূর্ব্বে ঐ বিষয়কে বিশেষরূপে অনুভব করিতে হয়। ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ সকল (sense impression) ভূয়োদর্শন দ্বারাই মানসিক উপরাগরূপে পরিণত হয়। ভূয়োদর্শন না থাকিলে আমরা গাভীর ন্যায় চিত্রশালায় কেবল বিভিন্ন বর্ণের প্রলেপ দেখিতাম, অথবা মনুষ্যকে চলচ্ছক্তিসম্পন্ন দেশ (space ?) বোধ করিতাম। সুতরাং, কোন বিষয়ের মানসিক সংস্কার জন্মাইবার পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের পুনরাবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন, নতুবা যে বিষয় প্রথমে আমাদের ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের উদ্রেক করে, সেই বিষয়ের মানস প্রতিবিম্বকে আমরা স্মৃতিপথে আনিতে পারি না। একবার মানসপ্রতিবিম্ব গঠিত হইলে, ইন্দ্রিয়গণ যখন ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের অজ্ঞাত কারণদ্বারা (যাহাকে আমরা 'বিষয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করি,) সংস্কারাক্রান্ত (impressed) হয়, তখন আমরা স্মৃতিজ প্রতিবিম্ব (memory image) দেখিয়া থাকি। বহুবর্ষব্যাপী অদর্শনের পর যখন আমরা কোন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া দেখি যে, তাহার "পরিবর্ত্তন" হই-

য়াছে, তখন আমরা যে নূতন ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ অনুভব করি, তদনুযায়ী ঐ বন্ধুর পূর্ব্বকার মানসপ্রতিবিম্ব নূতন করিয়া আমাদিগকে পুনরায় গঠন করিতে হয়; যদি তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে চিনিতে পারি না। যতক্ষণ আমরা তাহার স্মৃতিপ্রতিবিম্ব পুনর্গঠিত করিয়া না লই, ততক্ষণ আমরা তাহাকে আমাদের পরিচিত বন্ধু বলিয়া জানিতে পারি না। সুতরাং, যে পর্য্যন্ত না বন্ধুর স্মৃতিজ প্রতিবিম্ব (memory image) বন্ধুর সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দিতে পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ইহাকে প্রত্যভিজ্ঞান (recognition) বলিতে পারি না। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, সময়ে সময়ে আমাদের কত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতে হয়, যখন আমাদের এমন লোকের সহিত দেখা হয়, যাহার মুখ আমাদের নিকট পরিচিত, অথচ সে লোককে চিনিতে পারি না। যেমন তিনি তাঁহার নাম বলেন, অমনি আমরা চিনিতে পারি,—নাম না বলা পর্য্যন্ত আমাদের স্মৃতিজ প্রতিবিম্ব সম্পূর্ণ হয় নাই, এতক্ষণে সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নাম না বলেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে বাস্তবিক "দেখিতে" পাই না।

প্রাচ্য মনোবিজ্ঞান আরও নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, মানসপ্রতিবিম্ব একবার গঠিত হইলে, উহা স্বতঃস্থায়ী হইয়া যায়, অর্থাৎ যে বিষয়ের ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের দ্বারা উহা গঠিত হয়, সে বিষয়ের উপর উহা আর নির্ভর করে না। যেমন, আমাদের কোন অনুপস্থিত বন্ধু জীবিত এবং সুখে থাকিলে কিম্বা আমাদের অজ্ঞাতসারে তাহার মৃত্যু হইলে, যে কোন অবস্থায় হউক, তাহার মানসপ্রতিবিম্ব আমাদিগের ভিতর সমভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং একই রূপ মনের আবেগ (emotions) উৎপন্ন করে। কোন একটী মানসপ্রতিবিম্ব দুই প্রকারে আমাদের স্মৃতিতে উদ্রিক্ত করা যাইতে পারে, যথা, যে ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ দ্বারা উহা গঠিত হইয়াছে, সেই ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের পুনরাবৃত্তি দ্বারা অথবা ঐ প্রতিবিম্বের (image) ভাবনা দ্বারা (idea), অর্থাৎ উহার 'নামের' উল্লেখ বা চিন্তনের দ্বারা। আমাদের সম্বিতের বর্ত্তমান অবস্থায় উভয় প্রকার সংযোগেরই প্রয়োজন হয়; যদি ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের অভাব ঘটে, তাহা হইলে (কোন বিষয় বা কার্য্যের) 'নামের' দ্বারা যে প্রতিবিম্বের

(image) উদয় হয় তাহাকে স্মৃতিজ প্রতিবিম্ব বলে; যদি নামের অভাব ঘটে, তাহা হইলে সাহচর্য্যের (association) অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন প্রত্যভিজ্ঞানের অঙ্গহানি হয়, কারণ সকলেই জানেন যে, "চিন্তার জন্য ভাষার প্রয়োজন," এবং এখানে 'নাম' ভাষার স্থান অধিকার করিতেছে। যোগমুগ্ধ (hypnotic) সংবিতের অবস্থায় কোন প্রতিবিম্বের উদ্রেক করিতে হইলে, কেবল মাত্র 'নামই' যথেষ্ট, অন্য কিছুর প্রয়োজন হয় না; তখন স্বাভাবিক ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের অভাবে ঐ প্রতিবিম্ব সংবিতের ক্ষেত্রে অবাধে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং বাহিরে প্রতিবিম্ব 'প্রতিফলিত' হইয়া আমাদিগের নিকট 'বাস্তব' বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ, যোগমুগ্ধ অবস্থায় কোন বিষয় বা কার্য্য মনে উদিত হয়, এবং ঐ অবস্থায় কোন বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ থাকে না বলিয়া, ঐ প্রতিবিম্ব যখন বাহিরে প্রতিফলিত হয়, তখন সত্য বলিয়া বোধ হয়। স্মৃতিজপ্রতিবিম্ব-উদ্রেককারী 'নামের' এই অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলিয়া, ইহা জাগ্রৎ এবং যোগমুগ্ধ সংবিতের সংযোগ-সূত্র স্বরূপ হইয়াছে; এবং এই জন্য প্রাচ্য মনীষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, 'নাম' বিষয়ের একটী বিশেষ উপাদান। এই মত প্রথমে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্মে এবং যাদুবিদ্যায় (magic) দেখিতে পাওয়া যায়। 'নামের' এরূপ ক্ষমতা যে, যখন কোন পুলিশের লোক রাজার 'নামের' দোহাই দিয়া কোন বিষয়ের জন্য আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন যেন আমরা কোন অজ্ঞাত উপায়ে বাস্তব অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া সাহায্য করিতে সম্মত হই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নবাবিষ্কৃত প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান সাহায্যে প্রাচ্য মায়াবাদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়াছে। এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানে 'ভাবনা' (idea) এই কথাটীর বেশী ব্যবহার নাই, কারণ পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক 'ভাবনাই' (idea) প্রতিবিম্ব (image) মাত্র। উহাতে এইরূপ উক্ত আছে যে আমরা 'প্রতিবিম্ব' (image) সমূহের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকি,"—পরিষ্কার ভাবনা সকল (ideas) কতকগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে প্রকাশিত এবং পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব (image) সমূহের সমষ্টি মাত্র। একই মুহূর্ত্তে এবং একই অবস্থায় আমরা যে সকল ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ অনুভব করিয়া থাকি

তাহাদিগকে তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীসমূহে স্থাপন করিয়া, আমরা অজ্ঞাতসারে ঐ সকল প্রতিবিম্ব প্রস্তুত করিয়া লই। এইরূপ উপায়ে যে, কেবল প্রতিবিম্ব সকল প্রস্তুত হয়, তাহা নহে, পরন্তু উহা দ্বারা ঐ সকল প্রতিবিম্ব মনের সহিত গ্রথিত হইয়া যায়। ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ সমূহের ভিন্ন শ্রেণী সকলকে এক একটী মানসিক প্রতিবিম্ব বলা যায়,—উহাদিগকে আমরা ছাঁচের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে গঠন করিতে পারি; উহাদিগের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করিয়া লই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কোন্ বস্তুর দ্বারা এই মানসিক প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়? প্রাচ্য ঋষিরা বলিয়াছেন যে, মনের দ্বারাই মানসিক প্রতিবিম্ব সকল প্রস্তুত হয়। মনের স্বভাবই এই যে উহা ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল ও গতিশীল। আমরা কিছু না ভাবিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু একবারে একটী ভিন্ন দুইটী বিষয় ভাবিতে পারি না, এবং যে বিষয় ভাবি, তাহাও অতি অল্পক্ষণের নিমিত্ত। শূন্যচিন্তা কিম্বা কেবলমাত্র একটী বিষয়ের চিন্তার চেষ্টার দ্বারা আমাদের সংবিতের পরিবর্ত্তন হয় এবং তখন আমরা যোগমুগ্ধ সংবিৎ প্রাপ্ত হই। প্রাচ্য ঋষিদিগের মতে বাহ্য জগৎ বা সংসার আর কিছুই নহে, কেবল আমাদের মানস প্রতিবিম্বসমূহের সমষ্টি মাত্র, অর্থাৎ মনই ঐরূপ আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Experinental psychology) দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, মনে কোন প্রতিবিম্বের উদ্রেক করিতে হইলে ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ (Sense impression) এবং 'নাম' উভয়েরই প্রয়োজন হয়; আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায় 'নাম' ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের প্রতিবিম্ব মাত্র (Reflex) এবং যোগমুগ্ধ (Hypnotic) অবস্থায় ঐন্দ্রিয়িকউপরাগ 'নামের' প্রতিবিম্ব (Reflex) মাত্র। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানে আরও স্থির হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রতিবিম্ব (Image) আমাদের পূর্ব্বকার ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ সমূহকে উদ্রেক করে; যে সমস্ত ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের দ্বারা একটী সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব সৃষ্ট হইয়াছে, মন সেই সমস্ত ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের উদ্রেক করে। আমাদের জাগ্রৎ অবস্থায়, প্রতিবিম্ব (Image) হইতে উৎপন্ন আমাদের আভ্যন্তরিক ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ (internal sense impressions) সমূহ, আমাদের বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক সংস্কারের স্রোতের দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়; যদিও তাহারা

একেবারে লুপ্ত হয় না, কিন্তু এইরূপ ক্ষীণভাবে বর্ত্তমান থাকে যে, তাহারা সংবিতের দ্বারেও প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। যদি কোন গতিকে তাহারা সক্ষম হইতে পারে, তখন তাহাদিগকে আমরা (hallucination) ভ্রান্তি বলিয়া থাকি এবং যে লোকের ঐরূপ অনুভব হয়, তাহাকে আমরা 'উন্মত্ত' আখ্যা প্রদান করি। কিন্তু এরূপ জ্ঞানী পুরুষও আছেন, যাঁহারা যে বিষয়ের চিন্তা করেন, চক্ষুরুন্মীলিত করিয়াও সেই বিষয়কে দৃষ্টিপথে আনিয়া ফেলেন। কোন একটী বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে কোন একটী প্রতিবিম্বের বাহ্য প্রতিফলন দ্বারা তাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকেন। যখনই কোন মানসপ্রতিবিম্বের (Mental image) উদয় হয়, তখন, এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণ ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ (Sensation) উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং যদিও আমরা আমাদের ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ সমূহের সহিত চিরপরিচিত, তবুও তাহারা আমাদের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যায়। যেমন, যখন তুমি গোলাপজলের আঘ্রাণ লও, তখন তুমি অনুভব করিতে না পারিলেও গোলাপ পুষ্পের ক্ষীণ প্রতিবিম্ব তোমার মানসচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে; কিন্তু ঐ সময়ে গোলাপের পরিবর্ত্তে যদি একটী আম্রের ক্ষীণ প্রতিবিম্বের উদয় হয়, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তুমি ইহা লক্ষ্য করিবে এবং এইরূপ ঘটনাকে আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। যখন জাগ্রৎ অর্থাৎ বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক সংস্কারপ্রবাহের (internal sense impression) গতিরোধ হয় অর্থাৎ যোগমুগ্ধ অবস্থায় (hypontic) এই সকল ক্ষীণ আভ্যন্তরিক ঐন্দ্রিয়িক সংস্কার (Internal sense impression) চেতন হইয়া বাহিরে 'প্রতিফলিত' হয় এবং সেই অবস্থায় উহা সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। এই সকল আভ্যন্তরিক ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ সমূহ আমাদিগের মনের ভিতর সকল সময়ে সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যে সকল প্রতিবিম্বের দ্বারা তাহাদের উদ্রেক হয়, সুসঙ্গত বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের উপর সেই সকল প্রতিবিম্বের বাহ্য প্রতিফলনকেই আমাদিগের ন্যায় বিবেকযুক্ত পুরুষেরা সংসার বা জগৎ বলিয়া থাকে। জাগ্রৎ এবং যোগমুগ্ধ অবস্থার প্রতিবিম্ব বাস্তবিক একই প্রতিবিম্ব মাত্র,—তবে দুইটী ভিন্ন আলোকে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যখন সূর্য্যালোককে বাধা দিতে পারা

যায়, তখন বর্ত্তিকালোকে আমরা কোন জিনিষ দেখিতে পাই এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাধা দিতে না পারি, ততক্ষণ যে বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, তাহার উপর আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। যোগমুগ্ধ অবস্থার লোকের উপর যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাঁহা হইতে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, কোন বিষয়ের বাস্তব জ্ঞান, কেবলমাত্র আমাদের বর্ত্তমান সংবিতে আবদ্ধ নহে এবং যোগমুগ্ধ ও জাগ্রৎ এই দুই অবস্থার বিষয় ও ঘটনাসমূহ কার্য্যতঃ উভয়ই বাস্তব। ঋষিগণও এইরূপই বলিয়াছেন, কিন্তু "কার্য্যতঃ" এই কথাটী অর্থশূন্য বিশেষণ বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এবং "বাস্তব" এই কথাটীর পরিবর্ত্তে "ভ্রমাত্মক" এই কথাটীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

মায়াবাদে এই সংসারকে ভ্রমকল্পিত (Hallucination) বলে না,(illusion) মায়া বলে। মায়ার প্রাচ্য সুষ্ঠু উদাহরণে, "রজ্জুতে সর্প ভ্রমবৎ" বলা হয়; উহা বিকারের রোগী বিকারের প্রভাবে, যে সর্প দেখে সেই সর্পের ন্যায় ভ্রান্তি (Hallucination) নহে। কারণ, সর্প এবং রজ্জু উভয়ের ভিতর কতকগুলি সাধারণ ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ বর্ত্তমান আছে, (যথা, আকৃতি, বর্ণ ও স্থিতি) সুতরাং রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয়, সেই সর্পের ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত ঐন্দ্রিয়িক উপরাগরূপ ভিত্তি রহিয়াছে। "রজ্জুতে সর্প ভ্রম বোধ হওয়া" অর্থে যে আমরা "রজ্জুতে সর্প দেখা" বলি, তাহা ঠিক নহে। এ দুইটীর ভিতর প্রভেদ আছে; কারণ, রজ্জু প্রথমে দেখা চাই, তবে ভ্রম হইবে, কিন্তু অন্য লোকে যেখানে রজ্জু দেখিতেছে, সেখানে যে লোক সর্প দেখে, সেইখানে সেই লোকের সংবিতে কোন রজ্জুর উদয় হয় না। পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান এই বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা করিয়াছে; ভ্রান্তি (Hallucination) এবং মায়া (illusion) সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছে। যোগমোহের (hypnotism) একটী সাধারণ পরীক্ষা এই যে, যে ব্যক্তিকে যোগমুগ্ধ করা হইয়াছে, তাহাকে যদি বলা যায় যে 'রাম' নামে একজন লোক, যিনি সেখানে বর্ত্তমান আছেন, তিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে এই ব্যতিরেক ভ্রমের(nagative hallucination)এর ফল এইরূপ হইবে যে, সেই লোক আর 'রামকে' দেখিতে পাইবে না, তাহার কথা শুনিতে পাইবে না এবং তাহার স্পর্শ ও অনুভব করিতে পারিবে না। তাহার পর তাঁহাকে যখন (positive hallucination) অন্বয়মুখী ভ্রমাবিষ্ট করা যায়, তখন

তাহার সম্বন্ধে (illusion) মায়ার বিকাশ হয়। যেমন, তাহাকে যদি বলা হয় যে, "শ্যাম নামে অপর এক ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হইল," এবং রাম যেখানে বসিয়া আছে, সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় যে, "শ্যাম সেখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে," তাহা হইলে, সেই লোক 'রামের' পরিবর্ত্তে 'শ্যামকে' দেখিবে, 'শ্যামের' কথা শুনিবে এবং 'শ্যামের স্পর্শ অনুভব করিবে; কারণ, 'শ্যামের' সম্বন্ধে তাহার মানস প্রতিবিম্ব যেরূপ গঠিত হইয়া আছে, সেইরূপ প্রতিবিম্ব সে 'রামের' উপর বাহ্য প্রতিফলিত করিবে। ইহাকে 'রামকে শ্যাম ভ্রম' বলা যাইতে পারে না; ইহাকে 'রামকে শ্যাম দেখা', এইরূপ বলা যায়।* ইহা স্পষ্ট বুঝিতে হইলে, আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সমাধি অবস্থায় যেরূপ বাহ্য জগতের লোপ হয়, যোগমুগ্ধ অবস্থায় বাহ্যজগতের লোপ সেরূপ ভাবে হয় না। আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় যেরূপ বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ এবং মানস প্রতিবিম্বসমূহের সংমিশ্রণ বর্ত্তমান থাকে, তখনও সেইরূপ সংমিশ্রণ বর্ত্তমান থাকে,—তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, যোগমুগ্ধ অবস্থায় বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ (external image) সকল অতি ক্ষীণভাবে এবং মানস প্রতিবিম্ব (internal image) সমূহ অতি স্পষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে। যে সকল বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ 'রাম' এবং 'শ্যাম' উভয়ের মধ্যে সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান থাকে (যেমন, বর্ণ, আকৃতি ও স্থিতি), ঐ ব্যক্তি সেই সকল সংস্কার পাইলেও, তাহাদিগের দ্বারা তাহার কোন বিশেষ সাহায্য হয় না। পূর্ব্বোক্ত মায়ার উদাহরণে, যেরূপ লোকে সর্প ও রজ্জু হইতে জাত অনিশ্চিত বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের (sense impressions) উপর সর্পের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি 'শ্যাম' হইতে উৎপন্ন মানস প্রতিবিম্ব তাহার সংশয়াত্মক (Ambiguons) ইন্দ্রিয়োপরাগের উপর প্রতিফলিত করে। পূর্ব্বোল্লিখিত যোগমোহের পরীক্ষায় কতকটা প্রতারণা বা প্রবঞ্চনার প্রয়োজন হয় এবং যোগমোহকারী ব্যক্তি মিথ্যাকে সত্যের ন্যায় সহজে এবং দৃঢ়ভাবে সংস্কারাবদ্ধ করিতে পারে। ভ্রমের এই অংশ 'রজ্জুতে সর্প দেখা' এই উদাহরণেও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মায়ায় সাধারণ বা প্রয়ো-

* ন্যায়মতে এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা অপ্রমার নাম বিপর্য্যাস। সং।

জনীর অংশ নহে। কারণ, আমরা মায়াবাদ হইতে বুঝিতে পারি যে প্রত্যেক বিষয়ের 'প্রত্যক্ষের' (?) ধারা একই প্রকার; আমরা যখন রজ্জুতে রজ্জু দেখি বা রজ্জুতে সর্প দেখি, তখন আমরা বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ (external sense impression) হইতে উৎপন্ন ভিত্তির উপর আমাদের মানস প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিয়া থাকি—বাস্তবিক বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগের কোন অর্থ নাই; উহা যে কিরূপে এবং কোন্ বিষয়ের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা জানি না। 'সর্প' এবং 'শ্যামের' উদাহরণে, বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ সমূহ (sensation) এবং মানস প্রতিবিম্বের (internal image) ভিতর কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাহ্য ঐন্দ্রিয়িক উপরাগ এবং মানস প্রতিবিম্বের বিসদৃশ সংযোগ ক্বচিৎ ঘটে; তাহা না হইলে, এই সংসার বিশেষরূপে বাতুলাগার বলিয়া বোধ হইত।

মায়াবাদের নৈতিকফল সম্বন্ধে এইবার কিছু আলোচনা করা যাউক। প্রতীচ্য ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে ভবিষ্যৎ জীবনকে বাস্তব সত্য অবস্থা এবং এই জীবনকে ক্ষণস্থায়ী ছায়ারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্য ঋষিদিগের মতে, যে কোন প্রকাশমান অবস্থাকে মায়া বলা যায়, এমন কি দেবতারাও স্বয়ং সেই এক সতের ক্ষণস্থায়ী বিকাশ মাত্র। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে এইখানেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; প্রাচ্য মতানুসারে যাহাকে নীতি বলা যায়, তাহা নীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় মাত্র। এই সংসার যে একটী বিস্তৃত নাট্যশালা এবং প্রত্যেক লোকে যে অভিনেতা স্বরূপ—এইরূপ ধারণা, হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধদিগের নিকট কোন রূপক নহে; বরঞ্চ ধ্রুব সত্য। যে সকল রিপুগণের অভিনয় করিতে হয়, সেই সকল রিপুগণকে সত্য ভাবিয়া যদি কোন অভিনেতা তাহাদিগের দ্বারা অভিভূত হয়, তাহা হইলে আমরা যেমন সেই অভিনেতাকে উন্মত্ত বলিয়া থাকি, সেইরূপ যে সকল লোক এই অসার সংসারের পরিবারাদি ক্রীড়নককে আপনার ভাবিয়া অভিভূত হয়, প্রাচ্য মনীষিগণ তাহাদিগকে উন্মত্ত বলিয়া থাকেন। সেই জন্য তাঁহারা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, তোমাদের অভিনয়ের অংশ ভাল করিয়া শিক্ষা কর এবং তোমাদের যথাশক্তি ভাল করিয়া অভিনয় করিতে চেষ্টা কর; কিন্তু

মূর্খের ন্যায় তোমাদিগকে যথার্থ রাজা, কিম্বা যথার্থ ভিখারী, যথার্থ সাধু কিম্বা যথার্থ পাপী বলিয়া কল্পনা করিও না; তোমাদের মনে রাখা উচিত, যে, জীবনের এই মিলনবিয়োগান্ত নাটক অভিনয়ের জন্য তোমাদিগকে ঐরূপ অংশ সকল দেওয়া হইয়াছে।

এই সংসারের সমুদয় বস্তুর বাস্তবত্বে বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোকে এত কার্য্যক্ষম, ব্যস্ত, লোভী, অহঙ্কারী এবং স্বার্থপর হইয়াছে, সেই জন্য কার্য্যতঃ আমরা এত জড়বাদী হইয়াছি এবং সত্যতার বিস্তার এত হইয়াছে; যদি আমরা আমাদের অস্তিত্বের মায়িক বা স্বপ্নবৎ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতাম, তাহা হইলে, আমরা আমাদের উৎসাহ, আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের গর্ব্ব হারাইয়া ফেলিতাম এবং অসভ্য বন্য মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইতাম। সময়ে সময়ে ঘোর জড়বাদী ও অস্তিত্বের বৃথাভিমান দ্বারা ব্যথিত হইয়া উঠে। ইহ জীবনে কোন বিষয়ের সারত্বে জ্ঞান, অন্তঃপ্রবাহিত অসারত্ব জ্ঞানের দ্বারা ক্রমাগত প্রতিহত হইয়া স্থির ভাব ধারণ করিতেছে। ইহ জীবনে এই ভাবের মিশ্রণের দ্বারা আমাদিগকে প্রকৃতস্থ রাখিয়াছে। যে দেবী মহামায়া-রূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন, কেবল মাত্র মহা-পুরুষেরাই অপ্রকৃতিস্থ না হইয়া, সেই দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে-সক্ষম হন।

প্রকৃতির সুমহান্ নিয়মই এইরূপ যে, লোকে যত বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতে থাকে, ততই এই সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। যতই বুঝিতে পারে, ততই লোক ধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়, ততই ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস করিতে থাকে এবং জ্ঞেয় হইতে অজ্ঞেয়কে বুঝিতে চেষ্টা করে। প্রতীচ্য দেশ সকল "স্বাধীন ইচ্ছার" এবং এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশ্বের চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিজের কার্য্যে নিজের দায়িত্ব আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, এই পৃথিবীতে যেরূপ কার্য্য করা যায়, সেই অনুযায়ী ও ভবিষ্যৎজীবনে পুরস্কৃত কিম্বা দণ্ডিত হইতে হয়, এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচ্য বুধগণ অন্য প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন,—তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা জীবনরূপ নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতা মাত্র; তাঁহারা নিজেরা অংশ সকল বিভাগ করেন না, দৃশ্যাবলী চিত্রিত করেন না, কিম্বা সাজসজ্জাদিও

প্রস্তুত করেন না; তাঁহারা ভাবেন যে, তাঁহাদের কেবল এই মাত্র দায়ীত্ব আছে যে, তাঁহাদের যে অংশ অভিনয় করিতে হইবে, তাহা যেন বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনীত হয়। এই স্থানে কর্ম্মবাদ, অবতারবাদ এবং মায়াবাদের এক সঙ্গে অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কর্ম্ম-বাদ মতে, আমাদের ইহজীবনের কর্ম্মের ফল এই জন্মেই হউক, কিম্বা ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক, এই পৃথিবীতেই ভোগ করিতে হইবে। প্রাচ্য মনীষিগণ বলেন যে, যেমন কোন লোক স্বপ্নে যদি কাহাকে হত্যা করে, তবে সেই হত্যার জন্য তাহাকে ফাঁসি দেওয়া যেরূপ অন্যায় ও বৃথা, সেইরূপ ইহজীবনের কর্ম্মের জন্য, সংবিতের অন্য অবস্থায় আমাদের শাস্তি দেওয়া সেইরূপ অন্যায় ও বৃথা। যদি ভবিষ্যৎ জন্মের পুরস্কার কিম্বা দণ্ড প্রাচ্য মতে না থাকে,* তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর মনোরম স্বর্গের এবং ভয়ঙ্কর নরকের বর্ণনা,——যে বর্ণনা পুরাকালের খৃষ্টধর্ম্মের ভিতরও দৃষ্ট হয় না, তাহা কেমন করিয়া আসিয়া থাকে?

হিন্দু কিম্বা বৌদ্ধদিগের ঐ স্বর্গ ও নরক, খৃষ্টানদিগের ন্যায়কর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ করিবার জন্য কোন স্থান বিশেষ নহে। স্বর্গ এবং নরক আর কিছুই নহে, কেবল জ্বলন্ত স্বপ্ন মাত্র,——যাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহাদিগের নিকট উহা 'বাস্তব'; আমারা ইহজীবনে যে সকল মানস-প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া থাকি, যখন আমরা ইহলোক ত্যাগ করি, তখন সেই সকল প্রতিবিম্ব আমাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া লইয়া যাই। এই সকল মানসপ্রতিবিম্ব পরে প্রতিফলিত হয় এবং আমাদিগের নিকট বাহ্য জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এবং ইহজীবনে মন যেরূপ এক চিন্তা হইতে অন্য চিন্তায়, এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে ধাবমান হয়, সেইরূপ পরজীবনেও মন স্বনিয়ম অনুসারে বাহ্য প্রতিফলিত এক প্রতিবিম্ব হইতে অন্য প্রতিবিম্বতে ধাবমান হয়। সুতরাং ভবিষ্যৎ জীবন এই জীবনের প্রতি-কম্পন মাত্র, এই জীবনই যেন পরজন্মে অন্তর্দ্দিক হইতে বহির্দ্দিকে বাহির হইয়া আইসে,——যে সকল বিষয় সংস্কারভূত (Subjective) ছিল, তাহা

* এ কথা লেখক কোথায় পাইলেন? কর্ম্মফল লোকে জন্মজন্মান্তরে ভোগ করে, ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ। সং।

ফলোন্মুখ (Objective) হয়। এবং প্রাচ্য নরক আমাদিগকে এই ভাবে দণ্ডিত করে যে, আমরা যে স্থানে যাইতেছি, যদি না দেখিয়া চলি, তবে সেই স্থানে আমাদের মস্তক গৃহভিত্তিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়। যদি তুমি মূর্খের ন্যায় মনুষ্যদিগকে ইহজন্মে শত্রু কর, তবে তোমার মৃত্যুর পর দেখিবে যে তাহা-দের প্রতিবিম্ব সকল তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে,—তখন তোমার কাছে তাহারা আর মানস প্রতিবিম্ব মাত্র নহে, কিন্তু ভয়ঙ্কর সত্য এবং জীবন্ত ও শত্রুতার জ্বলন্ত মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইবে; সেই সময়ে তোমার পার্থিব কার্য্যের স্মৃতি তোমার সম্মুখে উদয় হইবে এবং তোমার বিবেক যদি তোমায় দোষী স্থির করে, তবে তোমার দৈত্যরূপী শত্রু সকল তোমায় বারংবার হত্যা করিবে, কিম্বা জ্বলন্ত হ্রদে নিক্ষেপ করিবে। যদি তুমি জ্ঞানীর ন্যায় ইহজন্মে মনোরম প্রতিবিম্ব সকল প্রস্তুত করিয়া রাখ, তবে যে সকল বন্ধু তোমার পূর্ব্বে লোকান্তরগত হইয়াছেন, তাঁহারা তোমার চতুর্দ্দিকস্থ স্বর্গীয় প্রদেশে স্নেহ ও ভালবাসার বাহু বিস্তার করিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিবে।*

লোকে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়াই সমুদয় ধর্ম্মে নরকের ভয় দেখান হইয়াছে; কিন্তু "নরক যে দণ্ডভোগের স্থান বিশেষ," এইরূপ ধারণা অনেক কারণ বশতঃ যুক্তিসঙ্গত নহে। এবং আজকালকার মতে কেহ কেহ যে ইহাকে 'স্থান' নহে 'অবস্থা' বিশেষ মাত্র বলেন, তাহাতে কিছুই আইসে যায়না; কারণ এইখানে 'স্থান' এবং 'অবস্থা' একার্থ শব্দ মাত্র। যেমন কোন একটী নৈশ স্বপ্ন-বিভীষিকাকে (স্থান) নহে, (অবস্থা) বিশেষ বলিলে, তাহার কষ্ট এক বিন্দু কমে না, সেইরূপ নরককে সংবিতের অবস্থা বিশেষ বলিলেও নরক ভোগের আশা একতিলও বেশী মনোরম হয় না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মায়াবাদ হইতে এই উপদেশ লাভ হয় যে, ইহলোকে এইরূপ কার্য্য করিতে শিক্ষা করা উচিত, যেন পরকালের জন্য

* লেখকের মতে স্বর্গ ও নরক "জ্বলন্ত" স্বপ্ন হইলেও, উহাতে প্রকৃত স্বর্গ নরক অপেক্ষা সুখদুঃখের কিছুমাত্র তারতম্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে আর উহাদিগকে বাস্তব বলায় দোষ কি? যাঁহারা (Theosophy) 'পরাবিদ্যা' অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা লেখ-কের মত অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সং।

সুখের স্বপ্ন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হই,——কেবল মনুষ্যের সহিত নহে, সমুদয় প্রকৃতির সহিত বন্ধুতা করিতে ব্যগ্র হওয়া উচিত। ইহা একজনের পক্ষে নহে, সকলের পক্ষে সমান; উহা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। অপরের কাছে যেরূপ ব্যবহারের আশা কর, নিজে অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর। *

শ্রীআশুতোষ দেব।

পাপবগ্গো নবমো।

অভিথরেথ কল্যাণে পাপা চিত্তং নিবারয়ে।
দন্ধং হি করতো পুঞ্ঞং পাপাস্মিং রমতী মনো॥ ১॥

অন্বয়,—কল্যাণে অভিথরেথ (চে) পাপা চিত্তং নিবারয়ে; দন্ধং হি পুঞ্ঞং করতো (পোস্স) মনো পাপাস্মিং রমতী।

সংস্কৃত,—কল্যাণং অভি ত্বরেত (চেৎ ততঃ) পাপাৎ চিত্তং নিবারয়েৎ; তন্দ্রিতং হি পুণ্যং কুর্ব্বতঃ (পুরুষস্য) মনঃ পাপে রমতে।

'দন্ধং'—তন্দ্রিতং অলসং যথা স্যাৎ তথা অর্থাৎ 'আলস্যের সহিত'।

অনুবাদ,—যদি কেহ শীঘ্র পুণ্যলাভ করিতে চায়, তবে সে পাপ হইতে মনকে নিবৃত্ত করুক; আলস্যের সহিত পুণ্যকর্ম্ম করিলে, মনা পাপে রত হইয়া থাকে।

পাপঞ্চে পুরিসো কয়িরা নতং কয়িরা পুনপ্পুনং।
ন তম্হি ছন্দং কয়িরাথ দুক্খো পাপস্স উচ্চয়ো॥ ২॥

অন্বয়,—পাপঞ্চে পুরিসো কয়িরা ন তং পুনপ্পুনং কয়িরা, তম্হি ছন্দং ন কয়িরাথ, দুক্খো পাপস্স উচ্চয়ো।

সংস্কৃত,—পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কুর্য্যাৎ নতৎ পুনঃ পুনঃ কুর্য্যাৎ, তস্মিন্ 'ছন্দং' ন কুর্য্যাৎ, দুঃখঃ পাপস্য উচ্চয়ঃ।

* Light নামক পত্রিকায় প্রকাশিত 'মায়া' নামক প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল। লেখক।

'ছন্দং—'ছন্দ' শব্দের অর্থ 'ইচ্ছা'।

অনুবাদ,—যদি কেহ কখন পাপ করে, তবে যেন তাহা পুনঃ পুনঃ না করে, যেন তাহাতে আসক্তি প্রকাশ না করে (কারণ) পাপসঞ্চয় দুঃখকর।

পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা কয়িরাথেনং পুনপ্পুনং।
তম্হি ছন্দং কয়িরাথ সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চয়ো॥ ৩॥

অন্বয়,—পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা, (ততো) এনং পুনপ্পুনং কয়িরাথ, তম্হি ছন্দং কয়িরাথ, সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চয়ো।

সংস্কৃত,—পুণ্যঞ্চেৎ পুরুষঃ কুর্য্যাৎ, (ততঃ) এনৎ পুনঃ পুনঃ কুর্য্যাৎ, তস্মিন্ ছন্দং কুর্য্যাৎ, সুখঃ পুণ্যস্য উচ্চয়ঃ।

অনুবাদ,—যদি কেহ পুণ্যকর্ম্ম করে, তবে যেন তাহা পুনঃ পুনঃ করে, যেন তাহাতে তাহার রুচি জন্মায়, (কারণ) পুণ্যসঞ্চয় সুখকর।

পাপো পি পস্সতি ভদ্রং যাব পাপং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি পাপং অর্থ পাপো পাপানি পস্সতি॥ ৪॥

অন্বয়,—যাব পাপং ন পচ্চতি (তাব) পাপো পি ভদ্রং পস্সতি; যদা চ পাপং পচ্চতি অর্থ পাপো পাপানি পস্সতি।

সংস্কৃত,—যাবৎ পাপং ন পচ্যতে (তাবৎ) পাপেঽপি ভদ্রং শুভং পশ্যতি; যদা চ পাপং পচ্যতে অথ পাপঃ (পাপকৃৎ) পাপানি (অশুভানি) পশ্যতি।

অনুবাদ,—যতক্ষণ পাপ পরিপক্ক না হয় ততক্ষণ পাপী সুখ দর্শন করে; কিন্তু যখন পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তখন পাপী অমঙ্গল দর্শন করে।

ভদ্রো পি পস্সতি পাপং যাব ভদ্রং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতি ভদ্রং অথ ভদ্রো ভদ্রানি পস্সতি॥ ৫॥

অন্বয়,—যাব ভদ্রং ন পচ্চতি (তাব) ভদ্রো পি পাপং পস্সতি, যদা চ চ ভদ্রং পচ্চতি অথ ভদ্রো ভদ্রানি পস্সতি।

সংস্কৃত,—যাবৎ ভদ্রং পুণ্যংকর্ম্ম ইত্যর্থঃ ন পচ্যতে (তাবৎ) ভদ্রঃ (পুণ্যকারী) অপি পাপমশুভমিত্যর্থঃ পশ্যতি যদা চ ভদ্রং পচ্যতে ভদ্রো ভদ্রাণি (শুভানি) পশ্যতি।

অনুবাদ,—যতক্ষণঃপুণ্যকর্ম্ম পরিপাক প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সৎ ব্যক্তি ও

অশুভ দর্শন করিতে থাকেন, কিন্তু যখন পুণ্যকর্ম্ম পরিপক্ক হয় তখন তিনি মঙ্গল দর্শন করেন।

মাহবমঞ্ঞেথ পাপস্‌স ন মন্তং আগমিস্‌সতি।
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি।
পূরতি বালো পাপস্‌স থোকথোকম্পি আচিনং ॥ ৬ ॥

অন্বয়,—মং তং ন আগমিস্‌সতি (ইতি) পাপং মা অবমঞ্ঞেথ; উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি, (তথা) থোকথোকম্পি পাপং আচিনং বালো পূরতি।

সংস্কৃত,—মাং তৎ ন আগমিষ্যতীতি পাপং মা অবমন্যেত; উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভোঽপি পূর্য্যতে, তথা স্তোকং স্তোকমপি পাপং আচিন্বন্ বালঃ পূর্য্যতে।

অনুবাদ,—পাপ আমার কাছে আসিবে না, এই ভাবিয়া কেহ যেন পাপকে অবজ্ঞা না করে; বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ মূর্খ অল্প অল্প করিয়া পাপ চয়ন করিলেও অবশেষে পাপে পূর্ণ হইয়া যায়।

মাহবমঞ্ঞেথ পুঞ্ঞস্‌স মন্তং আগমিস্‌সতি।
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি।
পূরতি ধীরো পুঞ্ঞস্‌স থোকথোকম্পি আচিনং ॥ ৭ ॥

অন্বয়,—মং তং ন আগমিস্‌সতি (ইতি) পুঞ্ঞং মা অবমঞ্ঞেথ; উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি (তথা) থোকথোকম্পি পুঞ্ঞং আচিনং ধীরো পূরতি।

সংস্কৃত,—মাং তৎ ন আগমিষ্যতীতি পুণ্যং মা অবমন্যেত; উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভোঽপি পূর্য্যতে তথা স্তোকং স্তোকমপি পুণ্যমাচিন্বন্ ধীরঃ পূর্য্যতে।

অনুবাদ,—আমার পুণ্য হইবে না, এই ভাবিয়া কেহ যেন পুণ্যকে অবজ্ঞা না করেন; বিন্দু বিন্দু জল পড়িলেও কলস পূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অল্প অল্প করিয়া পুণ্য চয়ন করিলেও জ্ঞানবান্ পুণ্যে পূর্ণ হইয়া যান।

বাণিজো ব ভয়ং মগ্‌গং অপ্পোমত্থো মহদ্ধনো।
বিসংজীবিতুকামো ব পাপানি পরিবজ্জয়ে ॥ ৮ ॥

অন্বয়,—ভয় মগ্‌গং অপ্পসত্থো মহদ্ধনো বাণিজো ব বিসং জীবিতুকামো ব পাপানি পরিবজ্জয়ে।

সংস্কৃত,—ভয়ং (বিপচ্ছঙ্কুলং) মার্গং অল্পসার্থঃ মহাধনঃ বাণিজইব বিষং জীবিতুকাম ইব পাপানি পরিবর্জ্জয়েৎ।

অনুবাদ,—সঙ্গে প্রভূত ধন থাকিলে এবং অল্পসংখ্যক সঙ্গী থাকিলে বণিক্ যেমন বিপদসঙ্কুল পথ পরিত্যাগ করে, জীবনেচ্ছু ব্যক্তি যেমন বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পাপ পরিত্যাগ করিবে।

পাণিম্হি চে বণো নাস্‌স হরেয্য পাণিনা বিসং।
নাব্বণং বিসমন্বেতি নত্থি পাপং অকুব্বতো ॥ ৯ ॥

অন্বয়,—অস্‌স পাণিম্হি বণো ন চে (সিয়া) (ততো অয়ং) পাণিনা বিসং হরেয্য অব্বণং (পোসং) বিসং ন অন্বেতি (তথা) অকুব্বতো পাপং নত্থি।

সংস্কৃত,—অস্য পাণৌ ব্রণো ন চেৎ স্যাৎ ততোঽয়ং পাণিনা বিষং হরেৎ; অব্রণং (নরং) বিষং ন অন্বেতি তথা অকুর্ব্বতঃ (পাপং ইতি শেষঃ) পাপং নাস্তি।

অনুবাদ,—যদি হস্তে ক্ষত না থাকে তবে হস্ত দ্বারা বিষ গ্রহণ করা যায়; অক্ষত মনুষ্যকে বিষ কিছু কহিতে পারে না, সেইরূপ যে পাপ আচরণ না করে তাহার কাছে পাপ নাই।

যো অপ্পদুট্ঠস্‌স নরস্‌স দুস্‌সতি সুদ্ধস্‌স পোসস্‌স অনঙ্গনস্‌স।
তমেব বালং পচ্চেতি পাপং সুখুমো রজো পটিবাতং ব খিত্তো ॥ ১০ ॥

অন্বয়,—যো অপ্পদুট্ঠস্‌স নরস্‌স, সুদ্ধস্‌স অনঙ্গনস্‌স পোসস্‌স দুস্‌সতি, তমেব বালং পটিবাতং খিত্তো সুখুমো রজো ব পাপং পচ্চেতি।

সংস্কৃত,—যোঽপ্রদুষ্টায় নরায় শুদ্ধায় অনঙ্গনায় পুরুষায় দুষ্যতি, তমেব বালং প্রতিবাতং ক্ষিপ্তো সূক্ষ্মো রজ ইব পাপং প্রত্যেতি (প্রত্যাগচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ)।

অনুবাদ,—যে নির্দ্দোষ, শুদ্ধ এবং নির্ম্মল ব্যক্তির নিন্দা করে, বায়ুর বিরুদ্ধদিকে ক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ধূলিকণার ন্যায় পাপ তাহারই নিকট আইসে।

গব্ভমেকে উপ্পজ্জন্তি নিরয়ং পাপকম্মিনো।
সগ্‌গং সুগতিনো যন্তি পরিনিব্বন্তি অনাসবা ॥ ১১ ॥

অন্বয়,—একে গব্ভমুপ্পজ্জন্তি, পাপকম্মিনো নিরয়ং যন্তি, সুগতিনো সগ্‌গং যন্তি, অনাসবা পরিনিব্বন্তি।

সংস্কৃত,—একে গর্ব্ভম্ (গর্ত্তে ইত্যর্থঃ) উৎপদ্যন্তে, পাপকর্ম্মিণঃ নিরয়ং যান্তি সুগতয়ঃ স্বর্গং যান্তি, অনাস্রবা পরিনির্ব্বান্তি (নির্ব্বাণপদবীং গচ্ছন্তি)।

অনুবাদ,—কেহ কেহ (পুনরার) গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করে, পাপকর্ম্মিগণ নরকে গমন করে, পুণ্যকর্ম্মিগণ স্বর্গে গমন করেন, এবং বিষয় বাসনাহীন ব্যক্তিগণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স।
ন বিজ্জতী সো জগতি প্পদেসো যত্র ঠিঠ্‌তো মুঞ্চেয্য পাপকম্মা॥১২॥

অন্বয়,—ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স জগতি সো প্পদেসো বিজ্জতী যত্র ঠিঠ্‌তো (জনো) পাপকম্মা মুঞ্চেয্য।

সংস্কৃত,—ন অন্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্ব্বতানাং বিবরং প্রবিশ্য জগতি স প্রদেশো বিদ্যতে যত্র স্থিতঃ (নরঃ) পাপকর্ম্মণঃ মুচ্যেত।

অনুবাদ,—অন্তরীক্ষে, সমুদ্র মধ্যে কিম্বা পর্ব্বত বিবরে, জগতে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে অবস্থান করিলে পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স।
স বিজ্জতী সো জগতি প্পদেসো যত্র ঠিঠ্‌তং ন প্পসহেথ মচ্চু॥১৩॥

অন্বয়,—ন অন্তলিক্‌খে ন সমুদ্দমজ্‌ঝে ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স, জগতি সো প্পদেসো বিজ্জতী যত্র স্থিতং (মনুস্‌সং) মচ্চু ন প্পসহেথ।

সংস্কৃত,—ন অন্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্ব্বতানাং বিবরং প্রবিশ্য, জগতি স প্রদেশো বিদ্যতে যত্র স্থিতং (মনুষ্যং) মৃত্যুঃ ন প্রসহেত।

অনুবাদ,—অন্তরীক্ষে, সমুদ্রমধ্যে কিম্বা পর্ব্বত বিবরে জগতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে অবস্থান করিলে মৃত্যু আক্রমণ করে না।

দণ্ডবগ্‌গো দশমো।

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো।
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে॥ ১ ॥

অন্বয়,—সব্বে দণ্ডস্‌স তসন্তি, সব্বে মচ্চুনো ভায়ন্তি; অত্তানং উপমং কত্বা ন হন্যে ন ঘাতয়ে।

সংস্কৃত,—সর্ব্বে দণ্ডাৎ ত্রসন্তি, সর্ব্বে মৃত্যোঃ বিভ্যতি; আত্মানমুপমাং কৃত্বা ন হন্যাৎ ন ঘাতয়েৎ।

অনুবাদ,—সকলেই দণ্ডের ভয় করে, সকলেই মৃত্যুর ভয় করে; অতএব সকলকে আপনার ন্যায় ভাবিয়া কাহাকেও আঘাত করিবে না, বা হত্যা করিবে না।

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্‌স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং।
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে॥ ২ ॥

অন্বয়,—সব্বে দণ্ডস্‌স তসন্তি, সব্বেসংজীবিতং পিয়ং অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে।

সংস্কৃত,—সর্ব্বে দণ্ডাৎ ত্রসন্তি সর্ব্বেষাং জীবিতং প্রিয়ং, আত্মানমুপমাং কৃত্বা ন (কংশ্চিৎ) হন্যাৎ ন ঘাতয়েৎ।

অনুবাদ,—সকলেই দণ্ডের ভয় করে, জীবন সকলেরই প্রিয়; (অতএব) আপনার ন্যায় ভাবিয়া কাহাকেও হত্যা করিবে না, কাহাকেও আঘাত করিবে না।

সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি।
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং॥ ৩ ॥

অন্বয়,—অত্তনো সুখমেসানো যো সুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন বিহিংসতি সো পেচ্চ সুখং ন লভতে।

সংস্কৃত,—আত্মনঃ সুখমেষয়ন্ যঃ সুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন বিহিনস্তি স প্রেত্য সুখং ন লভতে।

অনুবাদ,—যে আত্মসুখাভিলাষী হইয়া সুখাকাঙ্ক্ষী জীবগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করে, সে পরলোকে সুখ পায় না।

সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন হিংসতি।
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো লভতে সুখং ॥ ৪ ॥

অন্বয়,—অত্তনো সুখমেসানো যো সুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন ন হিংসতি সো পেচ্চ সুখং ন লভতে।

সংস্কৃত,—আত্মনঃ সুখমেষয়ন্ যঃ সুখকামানি ভূতানি দণ্ডেন ন হিনস্তি স প্রেত্য সুখং ন লভতে।

অনুবাদ,—যে আত্মসুখাভিলাষী হইয়া সুখাকাঙ্ক্ষী জীবগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা না করে, সে পরকালে সুখ লাভ করে।

মাহবোচ পরুসং কঞ্চি বুত্তা পটিবদেয্যু তং।
দুক্‌খা হি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয্যুতং ॥ ৫ ॥

অন্বয়,—কঞ্চি পরুসং মাহবোচ (পরুসং) বুত্তা (পুগ্‌গলা) তং পটিবদেয্যু; সারম্ভকথা হি দুঃখা; পটিদণ্ডা তং ফুসেয্যু।

সংস্কৃত,—কংশ্চিৎ পরুষং মা (পরুষং) বোচঃ (নরাঃ) ত্বাং প্রতিবদেয়ুঃ; সংরম্ভকথা হি দুঃখা; প্রতিদণ্ডা ত্বাং স্পৃশেয়ুঃ।

অনুবাদ,—কাহাকেও কর্কশ বাক্য বলিও না, যাহাকে কর্কশ বাক্য বলিবে, সে তোমায় পুনরায় কর্কশ বাক্য বলিবে; ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখদায়ক (জানিবে)। দণ্ডের প্রতিদণ্ডে দণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করিবে।

স চে নেরেসি অত্তানং কংসো উপহতো যথা।
এস পত্তো'সি নির্ব্বাণং সারম্ভো তে ন বিজ্জতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়,—উপহতো কংসো যথা অত্তানং সচে নেরেসি, (ততো) এস নির্ব্বাণং পত্তোহসি; সারম্ভো তেন বিজ্জতি।

সংস্কৃত,—উপহতং কাংস্যং ইব আত্মানং চেৎ ন ঈরয়সি (ততঃ) এষঃ নির্ব্বাণং প্রাপ্তোহসি 'সংরম্ভ'স্তে ন বিদ্যতে।

'অত্তানং নেরেসি'—(আত্মানং ন ঈরয়সি) আপনাকে যদি প্রেরণ না কর, অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দানে চালিত না কর।

* অনুবাদ,—ভগ্ন কাংস্য যেমন শব্দ করে না, সেইরূপ যদি তুমি কথা না কও, তবে তুমি নির্ব্বাণ পাইয়াছ; তোমার কাহারও সহিত বিরোধ নাই।

* অথবা 'আহতকাংস্য পত্রে যেরূপ শব্দ করে, তুমি যদি আহত বা অধিক্ষিপ্ত হইয়া সেইরূপ প্রতিধ্বনি না কর, তাহা হইলে ইত্যাদি' এরূপও অর্থ হইতে পারে—সং

যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরং।
এবং জরা চ মচ্চু চ আয়ুং পাচেন্তি পাণিনং ॥ ৭ ॥

অন্বয়,—যথা গোপালো দণ্ডেন গাবো গোচরং পাচেতি এবং জরা চ মচ্চু চ পাণিনং আয়ুং পাচেন্তি।

সংস্কৃত,—যথা গোপালঃ দণ্ডেন গাঃ গোচরং (গোচারনভূমিমিত্যর্থঃ) প্রাজয়তি (তাড়য়িত্বা নয়তি) তথা জরা চ মৃত্যুশ্চ প্রাণিনাম্ আয়ুং প্রাজয়তঃ।

অনুবাদ,—যেমন, গোপাল গরুদিগকে যষ্টি দ্বারা তাড়না করিয়া গোচারণ ভূমিতে লইয়া যায়, সেইরূপ জরা ও মৃত্যু জীবগণের জীবনকে (আয়ুকে) তাড়না করিয়া (মরণের দিকে) লইয়া যায়।

অথ পাপানি কম্মানি করং বালো ন বুজ্‌ঝতি।
সেহি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্‌গি দড্‌ঢো ব তপ্পতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়,—অথ বালো পাপানি কম্মানি করং ন বুজ্‌ঝতি; দুম্মেধো সেহি কম্মেহি অগ্‌গিদড্‌ঢো ব তপ্পতি।

সংস্কৃত,—বালঃ পাপানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ ন বুধ্যতে; দুর্ম্মেধাঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিরগ্নিদগ্ধ ইব তপ্যতে।

অনুবাদ,—মূর্খ ব্যক্তি যখন পাপ কর্ম্ম করে, তখন তাহা বুঝিতে পারে না; দুর্মেধা ব্যক্তি আপন কর্ম্ম দ্বারা অগ্নিদগ্ধের ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করে।

যো দণ্ডেন অদণ্ডেসু অপ্পদুট্‌ঠেসু দুস্‌সতি।
দসন্নমঞ্‌ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়,—যো অদণ্ডেসু অপ্পদুট্‌ঠেসু দণ্ডেন দুস্‌সতি, (সো) দসন্নং অঞ্‌ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি।

সংস্কৃত,—যোহদণ্ড্যান্ অপ্রদুষ্টান্ দণ্ডেন দুষ্যতি (অত্যাচরতি), স দশানামন্যতরং স্থানং (গতিং) ক্ষিপ্রমেব নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তির উপর অত্যাচার করে, সে শীঘ্রই দশবিধ গতির মধ্যে একপ্রকার গতি প্রাপ্ত হয়।

বেদনং পরুসং জানিং সরীরস্স চ ভেদনং।
গরুকং বাপি আবধং চিত্তক্‌খেপং ব পাপুণে ॥ ১০ ॥

রাজতো বা উপসগ্‌গং অত্তক্‌খানং ব দারুণং।
পরিক্‌খয়ং ব ঞতীনং ভোগানং ব পভঙ্গুরং ॥ ১১ ॥
অথবস্‌স অগারানি অগ্‌গি ডহতি পাবকো
কায়স্‌স ভেদা দুপ্পেঞ্‌ঞো নিরয়ং সোউপপজ্জতি ॥ ১২ ॥

অন্বয়,—পরুসং বেদনং জানিং সরীরস্‌স ভেদনং, গরুকং আবাধং বাপি, চিত্তক্‌খেপং ব, রাজত উপসগ্‌গং বা, দারুণং অত্তক্‌খানং ব, ঞাতীনং পরিক্‌খয়ং ব, ভোগানং পভঙ্গুরং ব পাপুণে, অথব অস্‌স অগারানি পাবকো অগ্‌গি ডহতি; দুপ্পঞ্‌ঞো সো কায়স্‌স ভেদা নিরয়ং উপপজ্জতি।

সংস্কৃত,—পরুষাং বেদনাং, জ্যানিং (নাশং, ধ্বংসং), শরীরস্ত ভেদনং, গুরুকং আবাধং বাপি, চিত্তক্ষেপং বা, (রাজতঃ (রাজ্ঞঃ) উপসর্গং বধবন্ধনাদিক মিত্যর্থঃ) দারুণং অভ্যাখ্যানং (অপবাদং কলঙ্কং)* বা, জ্ঞাতীনাং পরিক্ষয়ং বা, ভোগানাং (বস্তূনাং ধনানাং) 'প্রভঞ্জনং' (নাশং ক্ষয়ং) বা প্রাপ্নুয়াৎ (অসৌ নর ইতি শেষঃ), অথবা অস্য (পাপচারিনঃ) আগারাণি (গৃহাণি) 'পাবকোঽগ্নিঃ' (অশনিঃ) দহতি; দুষ্প্রজ্ঞঃ স কায়স্ত ভেদাৎ (আরভ্য ইতি শেষঃ) নিরয়ং (নরকং) উপপদ্যতে (গচ্ছতি)।

অনুবাদ,—এই ব্যক্তি তীব্র যাতনা, নাশ, অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি, উন্মাদ, রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন দুর্ঘটনা, জ্ঞাতিক্ষয় বা সম্পৎনাশ প্রাপ্ত হয়, অথবা ইহার গৃহসকল অশনি পাতে ধ্বংস হয়। এই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি দেহাবসানে নরকে গমন করে।

ন নগ্‌গচরিয়া ন জটা ন পঙ্কা নানাসকা থণ্ডিল সায়িকা বা।
রজো চ জল্লং উক্কুটিকপ্প ধানং সোধেন্তি মচ্চং অবিতিণ্ণ কঙ্খং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়,—ন নগ্‌গচরিয়া ন জটা ন পঙ্কা ন অনাসকা ন থণ্ডিল সায়িকা বা ন চ রজোজল্লং ন উক্কুটিকপ্পধানং অবিতিন্নকাঙ্খং মচ্চং সোধেন্তি।

সংস্কৃত,—ন নগ্নচর্য্যা ন জটাঃন পঙ্কং ন অনশং ন স্থণ্ডিলশায়িকা বা ন রজঃ চ ন উৎকুটিকল্পধানং অবিতৃপ্তাকাঙ্ক্ষা মর্ত্যং শোধয়ন্তি।

অনুবাদ,—নগ্নচর্য্য, কিম্বা জটা, কিম্বা পঙ্ক, কিম্বা অনশন, কিম্বা স্থণ্ডিল

* কঠিন অপরাধের দোষ।

শয়ন, কিম্বা ধুলি মর্দ্দন, কিম্বা নিশ্চলভাবে উপুড় হইয়া উপবেসন, কিছুই অতৃপ্তাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিকে শোধন করিতে পারে না।

অলঙ্কতো চেপি সমং চরেয্য সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী।
সব্বেসু ভূতেসু নিধায় দন্তং সো ব্রাহ্মণো সো সমণোস ভিক্‌খু ॥ ১৪ ॥

অন্বয়,—যো অলঙ্কতো চেপি সন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী (সন্তো) সব্বেসু দণ্ডং নিধায় সমং চরেয্য সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিক্‌খু।

সংস্কৃত,—যোঽলঙ্কৃতোঽপি শান্তঃ নিয়তঃ ব্রহ্মচারী সন্ সর্ব্বেষু ভূতেষু দণ্ডং (অত্যাচরণং) নিধায় (ত্যক্ত্বা) শমং চরেৎ স ব্রাহ্মণঃ স শ্রমণঃ স ভিক্ষুঃ।

অনুবাদ,—যে ব্যক্তি অলঙ্কৃত হইয়াও শান্ত, নিয়ত ও ব্রহ্মচারী হন, এবং সকল প্রাণীর উপর অত্যাচার হইতে বিরত হইয়া, শম আচরণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ, তিনিই ভিক্ষু।

হিরীনিসেধো পুরিসো লোকস্‌সিং কোচি বিজ্জতি।
যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্‌সো ভদ্রো কসামিব ॥ ১৫ ॥

অন্বয়,—লোক্‌সিং হিরীনিসেধো কোচি পুরিসো বিজ্জতি যো ভদ্রো অস্‌সো কসামিব নিন্দাং অপ্পবোধতি।

সংস্কৃত,—লোকে 'হ্রীনিষেধো' কশ্চিৎ পুরুষঃ বিদ্যতে য ভদ্রোঽশ্বঃ কশামিব (অপ্রবোধতি) *

† 'হিরীনিবেধো'—(সং) হ্রীনিষেধঃ,-বহুব্রীহি সমাস করিলে 'লজ্জা যাহার নিষেধ (স্বরূপ) হইয়াছে' এইরূপ অর্থ হয়। তাহা হইলে 'যিনি লজ্জা বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছেন' এইরূপ অর্থ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

'অপ্পবোধতি'—সং 'অপ্রবোধতি,' বা 'অল্পবোধতি,' বা 'অপবোধতি'—আমরা প্রথমটী গ্রহণ করিলাম; তদনুসারে 'অগ্রাহ্য করে' এইরূপ অর্থ হয়।

* এস্থলে কুৎসিতার্থ নঞ্‌ শব্দের সহিত বোধতিপদের সমাস 'অপচসিত্বং জাল্মঃ' এইরূপ স্থলের স্যায় গণয়ত্যর্থঃ। সং।

† হ্রীনিষেধ শব্দে নির্লজ্জ অর্থ করিলেই ভাল হয়—তাহা হইলে সমস্ত শ্লোকের এইরূপ অর্থ দাঁড়ায়ঃ—জগতে এরূপ নির্লজ্জ কে আছে যে, সদশ্ব যেরূপ কশাঘাতের ভয় করে না তদ্রূপ নিন্দা ভয় করেনা। লেখকের অর্থে—কষ্ট কল্পনা দোষ দেখা যায়। সং।

অনুবাদ.—পৃথিবীতে এমন.কে পুরুষ আছেন যিনি লজ্জা বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছেন এবং সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন কশাকে গ্রাহ্য করে না, তিনি সেইরূপ নিন্দাকে গ্রাহ্য করেন না?

অস্সো যথা ভদ্রো কসা নিবিট্ঠো আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ।
সদ্ধায় সীলেন চ বিরিয়েন চ সমাধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ।
সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা পহস্সথ দুক্খমিদং অনপ্পকং ॥ ১৬ ॥

অন্বয়,—কসানিবিট্ঠো ভদ্রো অস্সো যথা আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ। সদ্ধায় সীলেন চ বিরিয়েন চ সমাধিনা (চ) ধর্ম্মবিনিচ্ছয়েন চ সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা (সন্তা) ইদং অনপ্পকং দুক্খং পহস্সথ।

সংস্কৃত,—কশানিবিষ্টঃ (কশাহতঃ) ভদ্রঃ (সুশিক্ষিতঃ) অশ্ব ইব আতাপিনো (ভৃশং ব্যবসায়িনঃ) সংবেগিনঃ (বেগবন্তঃ) ভবত। শ্রদ্ধয়া শীলেন চ বীর্য্যেন চ সমাধিনা চ ধর্ম্মবিনিশ্চয়েন চ সম্পন্নবিদ্যাচরণাঃ (পূর্ণজ্ঞানাঃ সদাচারাশ্চ ইত্যর্থঃ) প্রতিস্মৃতাঃ (সর্ব্বদা স্মৃতিমন্তঃ সন্তঃ) ইদং অনল্পকং (ভূয়াংসং) দুঃখং প্রহাস্যথ (ত্যক্ষ্যথ জেষ্যথ)।

অনুবাদ,—সুশিক্ষিত অশ্ব কশাহত হইলে যেরূপ উদ্যোগী ও বেগবান্ হয়, সেইরূপ উদ্যোগী ও কার্য্যতৎপর হইবে। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, ধ্যান, ও ধর্ম্মনির্দ্ধারণ দ্বারা পূর্ণজ্ঞান ও সদাচার সম্পন্ন এবং স্মৃতিমান্ হইলে এই (নিন্দা ও অত্যাচার রূপ) মহৎ দুঃখকে জয় করিতে পারিবে।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(১)

গীত।

যার বাঁশীর স্বরে, প্রাণি হরে, বাঁচেনা গো প্রাণ।
চল গো সখি, শুনে আসি, শ্যামের বাঁশীর গান ॥
কেমন বাঁশের বাঁশী, মন উদাসী করিল রাধার।
জাতি কুল মজাইল বাঁশী, প্রাণে থাকা ভার ॥
জানি কত সুধা, বাঁশী-সুধা, সুধা বরিষএ।
সুধা-বাঁশী, সুধা-আশী বাঁশী কেমন রহে ॥
বাঁশী সকল দেহে, রন্ধ্রময়ে, সুধা রাখে কিসে?
যেমন কুলবধূর কুল বিনাশে, মূলে থাউআরা বাঁশে ॥
শুনে বাঁশীর গান, আন্ চান্, মন নহে স্থির।
যথার্থ জানিলাম বাঁশী বটে জাদুগীর্ ॥
হইলো বাঁশী কাল, কি জঞ্জাল, ঘটাইল সজনী!
যেমন কটকের বিষাল বাণে হরিণ হরিণী ॥
বাঁশীর লাগল্ পাইলে দিমু জলে, যমুনা ডুবাইএ।
বাঁশের বংশী বিনাসিমু কি ঔষধ দিএ ॥
বোলে রাম মোহনে, বাঁশী কেন ডুবাইলো জলে।
চান্দ মুখেতে যেমন বাজাএ, বাঁশী তেম্নি বোলে ॥

(২)

গীত।

যথ ব্রজনারী কক্ষে করি সুবর্ণ-কলসী।
শ্রীমতি সাজিল্ যেমন ষোলকলা শশী ॥
রাধে চন্দ্রমুখী যথ সখী সাজিল যতনে।
চলিল যমুনার জলে, জল অন্বেষণে ॥

চলে পন্থে হাটি, ভাবে দুইটি ও রাঙ্গা চরণ।
গোবিন্দ মঙ্গল গুণ করেন গায়ন ॥
যথ ব্রজাঙ্গনা, বোলে তানা * হরিগুণ গাই।
যদি বাড় বোলে ছলে গোবিন্দ নি পাই ॥
হেরে চন্দ্রমুখ, মন দুখ, কর্ব্ব নিবারণ।
জিজ্ঞাসিব বাঁশী কেনে করে জ্বালাতন ॥
দারুণ বাঁশীর জ্বালা, ব্রজবালা সহিতে না পারি।
ভিক্ষা চাইলে নাহি দিলে, কর্ব্ব বাঁশী চুরি ॥
বাঁশী চুরি কৈরে, হাতে ধরে সাজা দিব আর।
দেখ্‌ব বাঁশী, কেমন বাঁশী রাধে রাধে বোলে ॥
শ্যামের বাঁশীর দুঃখে, গৃহ সুখে, রৈতে না দেয় প্রাণি।
রাই বোলে বাঁশীএ কৈল রাধে কলঙ্কিনী ॥
যাএ নদীর কূলে, নামে জলে, করে জল কেলী।
বংশী ধরে বংশী বাজাএ, রাধে রাধে বোলি ॥
বোলে রাম মোহনে, রাই শুনে, শ্যামের বাঁশীর গান।
অন্তরে অন্তরে থাকে হানে মদন-বাণ ॥

(৩)

গীত।

রাই বোলে নবনী-চোরার সে কর্ম্ম কি ভালো।
ননী-চোরার সনে, মিছা কেনে, বিবাদের কি ফল ॥
চোরের বুদ্ধি, গৃহ সন্ধি জানে নানান্ ছল।
নিজ কার্য্য সাধি, গৃহে যদি, যাইতে পারি ভালো ॥
গৃহে গুরুগঞ্জনা ভয় আসিতে লাগিল।
ভ'রে যমুনার জল, চল চল বোলে প্যারী।
নবজলধররূপ ধরিলেন শ্রীহরি ॥
হইলো মেঘের বরণ, মদনমোহন, পন্থে আরম্ভিল।
দিবসে রজনী পাইএ গ্রহনিশি হইল ॥

* তানা—তাহারা।

দেখে মেঘের আন্ধার, হইলো রাধার অন্তরে তরাস।
কৃষ্ণ শ্যামে মেঘরূপৈ সে পন্থে কৈল গ্রাস ॥
হইল পন্থহারা, সব গোপীরা, কৃষ্ণ বৈলে কান্দে।
কাল ননদী শাশুড়ী কি ঠেকাইল ফান্দে ॥
গৃহে ননদী মোরে, নিষেধ করে, আসতে দিল বাধা।
সেই দোষেতে দোষী হইলাম কলঙ্কিনী রাধা ॥
কি দেখে আইলাম জলে, যাত্রাকালে মাথে ঠেকিল চাল।
এই কূল সেই কূল দ্বিকূল গেল দুঃখের কপাল ॥
কেনে আইজ* গৃহে যাইতে বিরল পথে, নব জলধরে।
ভাঙ্গিল কলসী, কি লইয়া যাইমু ঘরে ॥
ভাব্যে উপায় না দেখি, যথ সখী রাধা পানে চাহে।
রাই বোলে ঐ মেঘে কেনে মুরলী বাজাএ ॥
যদি মেঘ হইতো, চলি যাইত, গগন পানে সখি!
মেঘের পাএ কি নেপুর বাজাএ, ঐরূপ না দেখি ॥
বুঝি কি মেঘ নহে, মনে লএ, আইলো মনচোরা।
মেঘের পাএ কি নেপুর বাজাএ, ভয় করিস্ না তোরা ॥
চল যাই ধরি তারে, মনচোরারে, যাএ নি দেখি ধরা।
দেখ্‌বো কেমন, মেঘের কিরণ, বাঁচ্‌বে প্রেমধরা ॥
শুনে সব গোপী মিলি, ধর ধর বোলি, ধরিবারে যাএ।
লড় দিলে কানাই আর নেপুর বাজে রাঙ্গা পাএ ॥
বোলে ঐ গঙ্গাম্বুতে অবিরতে ভাবেন শ্রীহরি।
ভট্ট রামমোহনে বোলে গৃহে গেল ব্রজনারী ॥

(৪)

গীত—কুহু রাগ।

মধুপুরী যাএ রাধার বন্ধু হে,
না জানি কপালে কিবা আছে।

* আইজ—আজ।

পাইলে যুবতী নব মধু হে,
অলি হইয়া রহে কালা পাছে ॥ ধুয়া।
রাধার বন্ধের ভাগী হইবো সেই নারী,
ভোলাইয়া রাখে যদি কাছে।
মরিমু পুড়িমু শোকে জড়ি হে,
জল বিনে মীন যেন আছে ॥
ন যাইয় রাধার প্রাণবন্ধু হে,
হারাইলে না পাএ হেন দেখি।
মুক্তারাম সেনে ভণে বিধি হে,
হেন হি কপালে আছে লেখি ॥*

(৫)

গীত—(পরমার্থিক)।

(এই গীতটী লোকমুখ হইতে সংগৃহীত।)

গুরু দিন ত গেল, সন্ধ্যা হৈল পার কর আমারে ॥ ধ্রু।
আমি ঘাটে আইলাম, বসি রইলাম ;
যারা শেষে আসে আগে পার হই যায়,
আমি রইলাম বৈসে।
যার হাতে কড়ি, সে পার হয় তাড়াতাড়ি,
আমি দীন ভিখারী, নাই গো কড়ি, দেখ জুরিজারি ॥
আমার পথের সম্বল, গুরুর নামটি কেবল,
পার কর গুরুদেব, ডাকিহে কাতরে !!

গীত—ছন্দ—প্রভাত।

পিরীতি আচ্ছা নয় রে কালিয়া সোণা !
পিরীতি আচ্ছা নহে ॥ ধুয়া।
বন্ধুর পিরীতি, দুপুর ডাকাতি,
কে বলে পিরীতি ভালো।

* 'সাহিত্য-পরিষৎ' পত্রিকায় মুক্তারাম সেনের বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে 'সারদামঙ্গল' নামে ইঁহার একখানি চণ্ডীকাব্য আছে।

প্রাণের বন্ধের সনে, পিরীত করি,
ভাবিতে জনম গেল ॥
বন্ধের পীরিতি' মাটীর কলসী,
ভাঙ্গিলে না লএ জোড়া।
শ্যাম বন্ধের সনে, পিরীতি করিয়া,
জীয়তে হইআছি মরা ॥
পিরীতি আরতি, পিরীতি সারথি,
পিরীতি ওই গলার মালা।
শ্যাম বন্ধের সনে, পিরীতি করিআ,
সোণার বরণ কৈইনু কালা ॥
পিরীতি রতন, পিরীতি যতন,
পিরীতি ওই গলার হার।
পিরীতি করি, যেই জন মরে,
সফল জীবন তার ॥
সুজনে সুজনে, পিরীতি করিলে,
হাতে হাতে পাএ সোণা।
কুজনে সুজনে, পিরীতি করিলে,
(মিশাএ) * * দুধের চনা ॥
সুজনে সুজনে, পিরীতি করিলাম,
কুজন করিল কে ?
প্রেমের জ্বালা, হৃদেতে রাখিআ,
জ্বলিয়া মরিব সে।
পিরীতি আচ্ছা নহে ॥

(৭)

গীত।

সুখের সায়রে, দুঃখ উপজি,
ভাগিল * যৌবন মোর।

* ভাগিল—ভাঙ্গিল, অর্থাৎ গত হইয়া গেল।

আপনা জানিয়া, পিরীতি করিলাম,
বন্ধুয়া হইল পর ॥
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিলাম,
কুজন বলিবে কে ?
অমৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিলাম,
ঢলিয়া পড়িনু সে ॥
আপনা ভাবি, পিরীতি করিলাম,
পর কি আপনা হয়।
মিছা প্রেম করি, কান্দি কান্দি মরি,
দ্বিজ চণ্ডী দাস কয়॥ †

(৮)

গীত।

কহ কহ কথা শুনি :
কাহার মন্দিরে আজু পোসালা ‡ রজনী ॥
আলাইআ মোহন চূড়া, পড়িআছে ঝরে।
নিকটে না আইস বন্ধু না ছুইঅ মোরে।
কৈওরে কৈওরে বন্ধু না বাসিঅ লাজ।
সহজে বেকত হইবা রমণী সমাজ ॥
সকল তোমার বশ যথ গোয়ালিনী।
দারুণ শাশুড়ী মোরে বোলে কলঙ্কিনী ॥
ভাবিতে পাঞ্জর শোষে তনু হইল ক্ষীণ।
রাধার সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন ॥

(৯)

গীত।

আজু নিশি কোথাতে আছিলা।
রতির আলস লাগি, যেই ঘরে আছিলা জাগি,
তিল আধ কেনে না ঘুমাইলা ॥

† 'চণ্ডীদাস' গ্রন্থে এই পদটি দেখা যায় না।
‡ পোসালা—পোহাইলা।

নীল কমল আঁখি, অলসে লোহিত দেখি,
কালা হইছে অরুণ অধর।
কেমন কুমতি রামা, বিনি স্নানে তোমা,
কেমনে পাঠাইআ দিছে ঘর ॥
তুমি যে পরশমণি, কেমনে গো অলো ধনী,
কথ পুণ্যে পাইআছিলা লাগ।
পরাণ বন্ধুয়া বোলি, হিয়ার উপরে থুলি,
অঙ্গে দেছে কঙ্কণের দাগ॥
মালতীর মালা ছিড়া, খসিছে মোহন চূড়া,
কেনে থাক এমত বিভোল।
যুবতী রমণী সঙ্গে, যেই ঘরে আছিলা রঙ্গে,
সেইখানে পড়িছে কথ ফুল ॥
বিলম্ব না কর চল, নিশি অবশেষ ভেল,
রহিলেক নাহি কিছু কাজ।
ভকতি যে মতি হীন, কহে ভবানন্দ দীন,
মিছা কাজে কেনে পায় * লাজ ॥

(১০)

গীত।

আমার কৃষ্ণ ধন বোল কোথাএ রহিল।
সুখ ছাড়ি বনে আইলাম কলঙ্ক হইল ॥
আমার মনের দুঃখ মনে রৈল, বাঞ্ছা না পূরাইল ॥
রাজরাজেশ্বরী আমি কি করি বোল ;
রজনী প্রভাত হইল নাথ না আসিল ॥
বৃকভানু-নন্দিনী রাই কি করি বোল।
শ্যামচান্দে বোল্গে রাধার দুঃখ রহিল ॥

* পায়—পাও।

(১১)

গীত।

শ্যামের পিরীতে পরাণি গেল।
কালরূপ ভাব্যে ভাব্যে আমার কি হইল ॥
কে বোলে শ্যামেরে ভাল, অন্তরে বাহিরে কালো,
কালরূপ ভাব্যে ভাব্যে কালী হইল ॥
তরু মূলেতে বসি, ভাবিতেছি দিবানিশি,
বন্ধু না আসিব বুলি ফণী হইআ ডংশিল ॥
ফুটল পুষ্পের কলি, অঙ্কুরে ভাঙ্গিল।
আস্‌ব বলি মাধব গেছে পুন না আসিল ॥

(১২)

গীত।

আমি কালরূপ হেরিতে কর্য্যাছি মানা।
সখি বুঝালে মনে বুঝে না ॥
আমি যখনেতে কালরূপ হেরেছি।
তখনি নির্ম্মল কুলে কালী দিএছি ॥
কলঙ্ক-চন্দন সখি সর্ব্ব অঙ্গে মাখিবো।
আমি কৃষ্ণ কলঙ্কী হবো ॥
কালরূপ হেরিবো।
আমি সদা এ কলঙ্কের অলঙ্কার পরিবো॥
আমি আর গুরুজনার ভয় রাখি না।
কি করি বোল সজনি।
জটিলা যেমন শুনিলে ভয় রাখিনা ॥
কূলমান সকলি কালী দিএছি।
আমি কালাচান্দের দাসী হইয়াছি ॥
মূঢ়মতি ললিতা গো জান না।
রাখোয়াল বলে কালাচান্দকে নিন্দা করনা ॥
কালাচান্দকে নিএ সখি হৃদের মাঝে রাখিবো।

বোলুক বোলুক সকলে কলঙ্কী রাই।
কাল হার পরেছি গলে কিছু ক্ষতি নাই ॥
কালপদে সঁপেছি জীবন যৌবন।
সখি কৃষ্ণ বিনে নাই অন্যমন ॥
সকলি বোলাছে লোকে রাধাকে মনে।
নিজ নাম লেখো হরি তব চরণে ॥
রঘু কহে কালা পদে ধনে প্রাণে সঁপিবো ॥

(১৩)

গীত।

ও সে আমার চিকণ কালা,
কেন শূন্য কদম তলা॥ ধু।
কি বোলে প্রবোধ দিব মন রে আমার।
বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ অঙ্গে ডংশে অনিবার ॥
নিবৃত্ত না হও সখি বিরহ বিষের জ্বালা ॥
মরি মরি সহচরি, আমি অবলা।
কার গলে হার গাথে দিব বনফুলের মালা ॥
বাঁকা বংশী বদন বিনে প্রাণি মোর যাএ।
বৃকভানু নন্দিনী পাগলিনী প্রায় ॥
আদরিণী করে মোরে বাড়াইলে গৌরব।
কলঙ্কিনী করে মোরে লুকালে মাধব ॥
রাধা বোলে কে ডাকিবে গোঠে যাবার বেলা ॥
মরি মরি বন্ধু বিনে শূন্য হেরি বৃন্দাবন।
কি করিব কোথা যাব বোল অখন ॥
অহনিশি বন্ধু বিনে ঝুরে দুই নয়ান।
তুষের আনল হইতে দহে তনু দুই গুণ ॥
গোপী বোলে সেই বিচ্ছেদে হইল (মন) আমার চঞ্চলা ॥

(১৪)

গীত—প্রভাত।

সজনি সই, যামিনী হইল অবসান।
ধরিয়া শ্রীমতী-গলে বিদায় মাগে শ্যাম॥
আঁখির নিমেষে (রাতি) পোসাইল রে কানু।
পূর্ব্বে প্রকাশিত হৈল নিদারুণ ভানু॥
করবীর মালা কানু হাতে করি লৈয়া।
মধুর বচনে বোলে রাধার গলে দিয়া॥
কার কর ধরিয়া বোল এ শ্যামরায়।
হাসিয়া সুন্দরী রাধা দেওত বিদায়॥
এথেক শুনিয়া রাধে লইলেন পদধূলি।
কোকিলার স্বরে বোলে করি পুটাঞ্জলি॥
কে দিব বিদায় কানু কাহার শকতি।
জনমে জনমে হৈবা মোর নিজপতি॥
মোর নিজ নিবেদন শুন প্রাণ বন্ধে।
শ্রীরাধার সম্বাদ কহে দীন ভবানন্দে॥

(১৫)

গীত—রাগ—বসন্ত।

ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি।
কলি যুগে ধন্য ধন্য করিয়া অবনী॥
ধন্য কলিযুগে চৈতন্য অবতার।
পাইয়া ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার॥
না জা'না প্রেমের-রতি কৌতুক বাখানে।
গোপাল গোরচান্দ পাইমু কেমনে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগে শেষ।
জীবের করুণা দেখি চৈতন্য প্রবেশ॥
শিবে বিরিঞ্চি যারে ধ্যাএ নিরন্তর।
সে পন্থ জাগেন প্রভু প্রতি ঘরে ঘর॥

অস্ত্র-যুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন।
উদ্ধারিলা জগ জন আমি দীন হীন॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রতি রাম দাস। *
সমাইরে করিলা দয়া আপনে নৈরাশ॥

(১৬)

গীত।

আহ্মি কিরূপ হেরিলাম সই যমুনার জলে যাইতে।
আহ্মি স্বপ্নে কি হেরিলাম সই গত নিশিতে॥
সেই ভেশে হেরি আইনুম রাধার কুঞ্জেতে।
মাণিক মকর কুন্তল শোভে শ্যামের গলেতে॥
যেমত বিজুলী খেলি আছে কাল মেঘেতে।
দেখি নয়ান জুড়াইল প্রেমানন্দ হইল মনেতে॥
শ্যাম ছাড়া হইলাম নিশি প্রভাতে।
গোপীকান্ত বোলে যাবত আসিবে;
আহ্মি রূপ হেরি তোমার মনেতে॥

(১৭)

গীত।

জ্বালাএ জ্বলিত আমার প্রাণ হে,
শুনলো পিরীতি না জান। ধু।
পিরীতি ভুজঙ্গম, ডংশিল আহ্মারি গাত্র।
বিষে তনু জর জর, দহিল অন্তর।
আগেতে জানিতাম আহ্মি, এমন করিবা তুহ্মি।
আগেতে জানিতাম, তখনে মজিতাম,
আপনার মন আপনে রাখিতাম।
ভণে রসিক রঘুনাথে, ধরিআ কামিনীর হাতে।
পিরীতি করিআ, না চাহ ফিরিআ
পুরুষের হিয়া বড়হি কঠিন॥

* "সার গীতা" নামে এই রতি রাম দাসের এক খানি গ্রন্থ আছে।

(১৮)

গীত—রামক্রিয়া।

সই, দেখরে রঙ্গ কেলি।
নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥ ধু।
খেলে রাই কানু মিলি দুই তনু।
সেই রূপে উজলএ জিনি কোটী ভানু॥
খেণে খেণে শ্যামনাগর গোকুলে ব্যাপিত।
শ্যামরূপ হেরিআ রাধা হরষিত॥
কহে ছৈদ আইনদ্দিনে আনন্দ কথা।
শুনিতে শ্রবণে সুখ গাও যথা তথা॥

(১৯)

গীত।

না দেখি উপায় রে নাথ, না দেখি উপায়।
সবে ভরসা কৃষ্ণ তুয়া রাঙ্গা পায় (রে নাথ)॥
দিন গেল মিছা কাজে ভবেতে আসিআ।
ঠেকিআ রহিলুম মুই তোমা না ভজিআ
না ভজি গোবিন্দ পদ মুই অপরাধী।
এই তিন ভুবন মধ্যে ভ্রমি নিরবধি॥
ধন জন পুত্র মিত্র সব অকারণ।
মনেতে ভাবিয়া দেখ নিশির স্বপন॥
বৃক্ষ আরোহণে যেন থাকে পক্ষীগণ।
প্রভাতে উঠিআ যাইতে কে করে বেদন॥
কৃষ্ণ পদে না ভজিলুম মুই দৃঢ় মনে।
বোলিতে উত্তর নাই ধরিলে শমনে॥
রতিরাম দাস কহে ভজ এইবার।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম না হইবে আর॥

(২০)

গীত।

সারদা-নন্দন-পিতৃ-জনক-জনক।
তান তাত-ভৃত্যগণ অতি ভয়ানক॥
সেই ভয়ানক বন্ধু-পতি-পিতৃ-অরি।
তান হুতাশনে চিত্ত পড়ে ঘুরি ঘুরি॥
হরি-অরি-অরি-পতি-যদি নাই পাই।
জীবনে জীবন দিমু হলাহল খাই॥
বৃকভানু-সুতা কহে সখী-সম্বোধনে।
খগপতি-পতি আসি মিলিল তখনে॥
বান-সুতা-পতি-স্থিতি কবি একুধার। *
ইন্দ্র-সুত-বন্ধু গেল গোচরে রাধার॥
তম প্রকাশিত হৈল শ্রী অঙ্গ তেজেতে।
পাণি জোড়ে সখিগণে কহে রাধিকাতে॥
বসুদেব-সুত আসি হৈল উপস্থিত।
প্রাণপতি লৈয়া রাধা কর মন প্রীত॥
লজ্জার কারণে রাধা দুই আখি মুদে।
সুভদ্রানন্দন-জায়া-তাত-সুত নাদে॥
সখি-গণ-ঘরে গেল ইঙ্গিত বুজিআ।
বসিলেন নন্দ-সুত রাধা কোলে লৈয়া॥
বনোদ্ভব পাইরা যেন প্রীত মকরন্দ।
বনপতি দেখি যেন রোহিণী আনন্দ॥
তেন মত মন প্রীত রাধা নারায়ণ।
বলাহকোদ্ভবে যেন শান্ত হুতাশন॥
শ্রীরাম লোচনে ভণে শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর।
সেবক জানিয়া দয়া কর গদাধর॥ (ক্রমশঃ।)

শ্রীআবদুল করিম।

* একুধার—একধারে বা পার্শ্বে।

অধ্যাত্মতত্ত্ব।

যে যাহার আপ্ত, সে তাহার মতে চলিয়া থাকে। জগতে আপ্ত চিনিতে গিয়া অনেক স্থানে প্রতারিত হইতে হয়। প্রায়শঃ স্বদেশবাসী, স্বগ্রামবাসী, আত্মীয়বর্গ ও পিতামাতা প্রভৃতি আপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ততোধিক আপ্ত-স্বশরীরবর্ত্তী ইন্দ্রিয়বর্গ। সেইকারণ আমরা অনেকসময়ে ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় সংসার নির্ব্বাহ করি। চক্ষু যাহা দেখায়, তাহাই দেখি। শ্রবণ যাহা শুনায়, তাহাই শুনি। নাসিকা যাহা আঘ্রাণ করায়, তাহাই আঘ্রাণ করি; এবং তল্লব্ধ জ্ঞান সত্য—ভ্রম প্রমাদাদি দোষরহিত বিবেচনা করি। এই আপ্তোপনীত চাক্ষুষাদি জ্ঞান সাধারণের বড় আদরের ধন। যদি কেহ; এহেন চাক্ষুষাদি জ্ঞানের ব্যাভিচার প্রদর্শনে বদ্ধ পরিকর হয়, তাহা হইলে নিজে প্রণিধান না করিলে সহসা সে কথায় আস্থাস্থাপন করিতে পারে না। সময়ে সময়ে বিবেক চসমা চোকে দিয়া দেখিলে এই অন্তরঙ্গ-ভূত ইন্দ্রিয়বর্গের অনাপ্ততা পরিলক্ষিত হয়; কেননা ভ্রমপ্রমাদ অনাপ্ততার পরিচায়ক।

শুভ্র শঙ্খ পিত্তদোষবশতঃ পীতবর্ণ দেখায়। স্থাণু দূরতা নিবন্ধন প্রাণীরূপে প্রতীয়মান হয়। আকাশ দৃষ্টিশক্তির লঘুতাপ্রযুক্ত নীল বলিয়া বোধ হয়। কষায়িত রসনায় পীতজল রাসায়নিক সংযোগে মধুররসে পরিণত হয়। যখন বাষ্পীয়যান চলিয়া থাকে, তখন সেই চলনে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত শরীর সচল, হয়; সেই সচল দৃষ্টিতে অচল বৃক্ষাদি সচল বলিয়া দৃষ্ট হয়। মনঃপ্রসাদলব্ধ অনুমান এই সমস্ত জ্ঞানের ভ্রান্তি প্রতিপাদনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণের অনাপ্ততার প্রমাণ করিয়া দেয়। বস্তুতঃ আমাদের পরম প্রেমাস্পদ ইন্দ্রিয়কে আমরা সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতে পারি না। চক্ষুর অনেক দোষ। চক্ষু অতি নিকটের বস্তু দেখিতে পায় না। আপনার মুখ আপনার চক্ষুতে দেখা যায় না। আবার সূক্ষ্মবস্তু দর্শনে নিতান্ত অক্ষম। দূরের বস্তু দর্শন দূরের কথা নিকটের ব্যবহিত বস্তুদর্শন করিতেও পারে না। অপিচ, কখন শাদাকে কাল দেখায়, কখন বা কালকে শাদা দেখায়। বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়িলেও মনঃ সংযোগ না হইলে দর্শনক্রিয়া সাধিত হয় না। এইরূপে পরম অন্তরঙ্গ

চক্ষু আমাদিগকে পদে পদে প্রতারিত করিয়া থাকে। চক্ষুর ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিও বঞ্চনা করিয়া থাকে। তাই বলি, ইন্দ্রিয়বর্গ আমাদের একান্ত আপ্ত হইতে পারে না। একারণ অনেকে অনুমানজ্ঞানের সাধন মনকে (অন্তঃকরণ) আপ্ত বলিয়া থাকেন। তাই মন যাহা বলে, লোকে তাহাই করে। ইচ্ছাসত্বেও মনের অমতে কার্য্য করা ঘটে না। মন ইষ্টানিষ্টের বিধাতা,—মনের মত মনোমত অন্তরঙ্গ আর দ্বিতীয় নাই। দুঃখের বিষয়,—মনের প্রসার সর্ব্বত্র নাই। যাঁহার অধিষ্ঠানে মন মনন করে, যাঁহার প্রসাদে মন ইন্দ্রিয়গণের সারথ্য করে, এহেন মনের মানুষ মন দেখিতে পায় কি না সন্দেহ।

চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের ও মনের দোষ নগণ্য; অনেক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রিয়াদির নিকট ঋণী, তাই তাহাদের সম্বন্ধে দুইচারি কথা লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছে।

জ্ঞানের সাধনের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা, এই পাঁচটীর নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। কর্ম্মের সাধনের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন উভয়েন্দ্রিয়।

"শ্রোত্রংত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমং।
বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ু মেঢ্রং তথৈব চ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সন্তুতানীহ যুগপন্মনসা সহ পার্থিব॥" মহাভারত।

সরল বিধায় অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। যতই কেন জ্ঞান হউক না, সমস্ত জ্ঞান পাঁচ ভাগে বিভক্ত। শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন ও আঘ্রাণ। যাহা-দিগের শ্রবণাদি হয়, তাহাদিগকে শ্রবণেন্দ্রিয়াদির বিষয় বলে। অতএব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। কর্ম্মও পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কথন, গ্রহণ, গমন, মলত্যাগ ও মূত্রত্যাগ। মনের সহায়তা ব্যতীত জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় সাধিত হয় না। এইজন্য সাঙ্খ্যকার বলিয়াছেন, "উভয়াত্মকং মনঃ।" মন যেমন স্বতন্ত্রভাবে অন্তরের কার্য্যসাধন করে বলিয়া, অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ নামে অভিহিত হয়। সেই অন্তঃকরণ মন বেদান্ত মতে চারিভাগে বিভক্ত। যথা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। সংশয়, নিশ্চয়,

গর্ব্ব ও স্মরণ এই চারটী অন্তরের কার্য্যসাধন করে. বলিয়া অন্তরিন্দ্রিয় নামে কথিত হইয়াছে। একই অন্তঃকরণ কার্য্যভেদে ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে।

"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরং।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥"

বেদান্ত পরিভাষা।

এক্ষণে ইন্দ্রিয় কি তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। জগতে দুইটী স্থূল বস্তুর উপলব্ধি হয়। প্রথম চেতন, দ্বিতীয় অচেতন বা জড়। ক্ষিত্যাদি ভূতনিচয় অচেতন। আত্মা কেবল চেতন পদার্থ। অচেতন মাত্রই ভৌতিক। ইন্দ্রিয়ের স্বতঃ চৈতন্য নাই। চেতন আত্মার অধিষ্ঠানে স্বকার্য্য সাধন করে। বস্তুগত্যা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয় জড়বিধায় ভৌতিক। অতএব ন্যায়দর্শনে উক্ত হইয়াছে—

"ঘ্রাণরসনা চক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ।"

বেদান্তদর্শনেও চক্ষুরাদি ভৌতিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—

"জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্ চক্ষু জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি।
এতান্যাকাশাদীনাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্‌ক্রমেণোৎপদ্যন্তে।

অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহারা যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর সাত্ত্বিক অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাঙ্খ্যমত বারান্তরে উল্লেখ করিবার ইচ্ছা আছে।

সকল বস্তুই ত্রিগুণময়ীর বিকার বিধায় ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞান, প্রকাশ ইত্যাদি; রজোগুণে প্রবৃত্তি, উত্তম ইত্যাদি; তমোগুণে মোহ ইত্যাদি। জ্ঞান বা প্রকাশস্বভাব সাত্ত্বিকগুণের অংশে ইন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হইয়া দর্শনাদি জ্ঞানের সমুৎপাদন করে। রজোগুণাদি অংশে সমুৎপন্ন হইলে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য অন্যবিধ হইত। যে যাহার বংশে সমুৎপন্ন হয়, সে তাহার সম্পত্তির অধিকারী হয়—ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিনিয়ত বস্তুশক্তি।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু তেজ হইতে, কর্ণ আকাশ হইতে, নাসিকা পৃথিবী হইতে, ত্বক্ বায়ু হইতে এবং জিহ্বা জল হইতে সমুৎপন্ন। ভৌতিক অংশে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, ভৌতিক জগতে তাহার স্থিতি, এবং ভৌতিক

পদার্থে তাহার লয় সাধিত হয়। আত্মজগতে তাহার অধিকার নাই, আত্মবিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতাও নাই। নিজে ভূত, কাজেই স্বীয় উপাদানভূত পঞ্চভূত লইয়াই তাহার কার্য্যকারিতা। যাহা ভৌতিক, তাহা তাহার বিষয়। ভগবান্ অপার্থিব। তদংশে আত্মাও অপার্থিব। তাই চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অন্য ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না।

জগতে এমন একটী বস্তুশক্তি আছে যে, সজাতি সজাতির আকর্ষণ, অভিব্যক্তি বা প্রকাশ করে। পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক তেজ আছে বলিয়াই পৃথিবী বৈদ্যুতিক তেজ আকর্ষণ করে।

মেঘ, ধূম, জ্যোতি, সলিল ও মরুতের সমবায়, তাই বায়ুময় জলীয় মেঘ, জলস্তম্ভরূপে জল আকর্ষণ করে। যাহাতে যে বস্তু নাই, সে তাহার আকর্ষণ করে না। আমি যদি সাধু হই, তাহা হইলে অপরের সাধুতার আকর্ষণ করিতে পারি, বা অপরের সাধুতা আমার নিকট অভিব্যক্ত হইতে পারে। এই কথা কবি ভাবান্তরে বলিয়াছেন—

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।"

জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তাই তাঁহাদের নিকট "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।"

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন,—

"যস্য যন্নিয়মেনাবভাসকং তত্তদ্‌গুণবৎ প্রকৃতিকং,
যথা রূপাভিব্যঞ্জকরূপবৎ প্রকৃতিকো দীপঃ ইতি।"

অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকৃতির হয়, সেই বস্তু সেই প্রকৃতির বস্তুর প্রকাশক হয়। যেমন প্রদীপ। প্রদীপ রূপবান্, সেইজন্য প্রদীপ রূপবান্ বস্তুর প্রকাশ করে। তেজের গুণ রূপ। চক্ষু তৈজসিক অংশে সমুদ্ভূত। নয়ন যখন পরকীয় গুণ স্পর্শাদির অভিব্যঞ্জক না হইয়া কেবল তৈজসিক গুণ রূপকে অভিব্যক্ত করে, তখন নয়নও প্রদীপের ন্যায় তৈজস। প্রদীপ তেজঃপদার্থ। তাই তেজের গুণ রূপ অভিব্যক্ত করে, রূপ ভিন্ন অন্য গুণ প্রকাশ করিতে পারে না। সজাতি সজাতির সহিত মিলিয়া তাহার অভিব্যঞ্জক হয়।

চক্ষু যে তেজ পদার্থ ইহা চোকে অঙ্গুলী দিয়া বুঝাইতে পারা যায়। চক্ষু মুদিত করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে জ্যোতির্দর্শন হয়। রাত্রিতে অন্ধতমসাবৃত

গৃহেও সে জ্যোতি দৃষ্ট হয়। তবে যাঁহারা যোগী, তাঁহারা ভালরূপ আলোক দেখিতে পান। তুমি আমিও যে, কিছু দেখিতে না পাই এমন নয়। একটু চাপিলেই দেখা যায়।

কর্ণ আকাশময়, কর্ণে অঙ্গুলি দিলে শোঁ, শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কর্ণ যদি আকাশ না হইত, তবে শব্দ হইত না; কেননা শব্দসমবায়ি কারণকে আকাশ বলে। ইত্যাদি প্রকারে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকতার অনুভব করা যাইতে পারে।

নয়ন অন্ধকারের বস্তু দেখিতে পায় না; কেননা অন্ধকারস্থিত বস্তুর তাদৃশ তেজ নাই—সে অন্ধকারকে অভিভূত করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি চক্ষুতে প্রতিফলিত করিতে পারে না। যদি চক্ষু তৈজসিক বস্তু না হইত, তাহা হইলে অন্ধকারের বস্তু বেশ দেখিতে পাইত। নতুবা কর্ণ অন্ধকারের বস্তুর শব্দ শুনিতে পারে, নাসিকা অন্ধকারস্থিত বস্তুর গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারে। ত্বক্ আঁধারের বস্তুর স্পর্শ করে। রসনা অন্ধতমসাবৃত রসের আস্বাদন করে, চক্ষু সেইরূপ আঁধারের বস্তুর রূপ দেখিতে পায় না কেন? অবশ্যই বলিতে হইবে, চক্ষুর তেজের সহিত তাদৃশ বর্ণাকারময় বাহ্যবস্তুর তেজ অন্তরে নীত না হইলে, প্রত্যক্ষক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। ইত্যাদি যুক্তিমূলকই চক্ষু তেজ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে।

কর্ণ আকাশের অংশেজাত; তাই কর্ণ সজাতি আকাশের গুণ শব্দ শ্রবণ করে। নাসিকা পার্থিব, তাই নাসা পৃথিবীর গুণ গন্ধের আঘ্রাণ করে। ত্বক্ বায়ুর বিকার, তাই বায়ুর গুণ স্পর্শ ত্বকের বিষয়। জিহ্বার উপাদান জল; তাই রসনা জলের গুণ রসের আস্বাদন করে।

স্থূল কথা,—পাঁচটী ভূতের পাঁচটী সন্তান। সন্তানের নাম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা। এই পাঁচজন পৈতৃক পাঁচটী বিষয়ের অধিকারী হইয়াছে। বিষয়ের নাম রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। পঞ্চজন পঞ্চবিষয় হইতে পঞ্চপ্রকার কর গ্রহণ করে। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও আস্বাদন। এই পঞ্চের দলই কালের করালকবলে লীন হয়, পঞ্চাতীত আত্মার লয় নাই, উৎপত্তিও নাই।

আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না। কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিব?

আত্মাতে ভৌতিক তেজ নাই, যে, চোকে দেখিব? আত্মা আকাশ হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার শব্দ শুনিয়া প্রাণ জুড়াইতাম। পার্থিব নহেন, যে, সে আমোদে মন মাতিবে? বায়বীয় পদার্থ হইলে ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করিলে, প্রাণ শীতল হইত? তিনি জলীয় বস্তু নহেন যে, রসনায় সে রসের আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিব। এক কথায় তিনি পঞ্চভূতের অতিরিক্ত বস্তুতে উপহিত। তাহাতে পঞ্চভূতের ধর্ম্ম রূপাদি নাই। কাজেই আত্মার বা পরমাত্মার প্রত্যক্ষ হয় না।

এতাবতা বলা হইল, ইন্দ্রিয় ভৌতিক। ভৌতিক রূপাদি তাহার বিষয়। অভৌতিক (ঈশ্বর) আছেন কিনা, ইন্দ্রিয়ের এ তর্ক করিবার অধিকার নাই। ঈশ্বর অভৌতিক অতীন্দ্রিয় পদার্থ। অনুমানের শরণাগত না হইলে, অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা হয় না। অনেক সময়ে অনুমানের অনুমতিতে চলিতে হয়। অনুমানও সর্ব্বত্র আপ্ত হয় না—সময়ে সময়ে প্রতারণা করে। অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণসাপেক্ষ। যদি দেখি, যেখানে ধূম, তথায় বহ্নি, তবেই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া অনুমান করিতে পারি; "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ", প্রত্যক্ষের প্রসাদে যে ব্যাপ্তি প্রভৃতি জ্ঞান সাধিত হয়, তাহাই অনুমানের প্রাণ। যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভ্রম-প্রমাদ-সাপেক্ষ, তখন প্রত্যক্ষ-প্রাণ অনুমানপ্রমাণে ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, একথা বলা বেশীর ভাগ। ফলতঃ অগ্নিতে গৃহদাহ হইলেও যেমন অগ্নি পরিহার করিতে পারি না, সেইরূপ অনুমানে প্রমাদ ঘটিলেও অনুমান আমাদের আদরের ধন।

অনুমানই হউক অথবা অন্যবিধ চিন্তাই হউক,—সকলই স্ব স্ব প্রবৃত্তির দাস। অনুমানেরও স্বাধীনতা নাই। অনুমান প্রবৃত্তির অধীনতায় পরিচালিত হয়। তাই অনুমান বা যুক্তি রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তাহার একটী উদাহরণ দিতেছি।

সকলেই সুখ চায়, সুখ জীবনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলেই ধাবিত হইয়াছে। সুখ জীবনের প্রধান প্রয়োজন। বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কাজ করে না; অতএব সুখের ইচ্ছা আস্তিক—নাস্তিক সাধারণ। সেই সুখ, আকাশের ন্যায় ধরিতে অগ্রসর হইয়া নানাজনে নানাপথে বিচরণ করিতেছে। সকলেই আপন আপন সুখ চায়। সে আপনি কে?

এইখানে "গোলকধাঁধাঁ"। ধাঁধায় পড়িয়া অনেকে আত্মহারা হয়। অনেকে যেমন লাটসাহেব দেখিতে গিয়া সমবেশধারী প্রত্যেক ইংরেজকে লাটসাহেব ভাবে। সেইরূপ স্বপ্রবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া নাস্তিক ভাবেন, আমি দেখি অতএব দর্শনেন্দ্রিয় 'আমি'। আমি শ্রবণ করি; অতএব শ্রবণ যুগল 'আমি'। 'আমি চলি, সুতরাং চরণ 'আমি'। শ্বাসরুদ্ধ হওয়ায় সমস্ত ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, অতএব প্রাণবায়ু 'আমি'। কেহ বা ভাবেন—যেমন বৃক্ষের ফল, ফুল, মূল, পল্লব, শাখা, ও প্রকাণ্ড সমস্ত বৃক্ষ। সেইরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, নখ ও লোম প্রভৃতি সব 'আমি'। প্রত্যুত যেমন কেবল ফল বা ফুলাদি বৃক্ষ নয়, সেইরূপ কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি 'আমি' নহে। যেমন একটী শাখাচ্ছেদে বৃক্ষের বৃক্ষত্ব নষ্ট হয় না; সেইরূপ একটী ইন্দ্রিয়ের হানিতে আমার (আত্মার) আমিত্বের হানি হয় না। বৃক্ষ ও যাহা পত্র-পুষ্প ফলাদিই তাহা। ব্যবহারসিদ্ধির জন্য বৃক্ষের সহিত সময়ে সময়ে পত্রাদির ভেদব্যবহার হইয়া থাকে। চক্ষু ও 'আমি' অভিন্ন হইলেও আমার চক্ষু বলিয়া আমাতে ও চক্ষুতে * যে ভেদ ব্যবহৃত হয়, তাহা স্বগত ভেদাভিপ্রায়ে, বস্তুতঃ অভেদ।

আস্তিকের 'আমি' স্বতন্ত্র পদার্থ। দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, কিছু নয়। তিনি যে কি, তাহা তিনিই জানেন। শরীর জড়, আত্মা অজড় বা চেতন। জড় পদার্থের অবয়ব সংস্থানে চেতনের উৎপত্তি যুক্তিসহ নয়। যেমন কারণ, সেইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। অচেতন উপাদানে চেতনের উৎপত্তি হয় না। শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় একজাতি, আত্মা সে জাতীয় নয়। আত্মা জলজদলগত সলিলবৎ শরীরে ভাসমান। আত্মা শরীরে নির্লিপ্ত, অথচ তাঁহার অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয় স্বকার্য্য সাধন করে। তিনি দেহরাজ্যের রাজা, তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার রাজত্ব চলিতেছে। কঠবল্লীতে আছে—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধান্ মনো প্রগ্রহমেব চ।

* ভেদ তিন প্রকার, স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়। বৃক্ষের পত্র পুষ্পাদির সহিত বৃক্ষের ভেদ স্বগত। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষান্তরের ভেদ সজাতীয়। বৃক্ষের সহিত ঘট, পটাদি বিজাতি বস্তুর ভেদ বিজাতীয়।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।

অর্থাৎ শরীর রথ, আত্মা সেই রথের আরোহী। বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি) তাহার সারথি, মন (সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি) রশ্মি (লাগাম), ইন্দ্রিয় রথবাহক অশ্ব। রূপাদি বিষয়,—রথচলনের পথ। আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়ও মনের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া রথারোহণের ফলভূত সুখ ও দুঃখের উপভোগ করেন। এই কথা মনীষীরা বলেন।

লোকে বলে, "রথ চলিতেছে।" বস্তুতঃ রথের চলিবার শক্তি নাই। রথ অচল—চেতনাহীন জড়। রথবাহকের ব্যাপার রথে আরোপিত হয়, তাই লোকে বলে, রথ চলে। সেইরূপ শরীরও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মধর্ম্ম চেতনার আরোপ হয়। ফলতঃ ইন্দ্রিয়ের দর্শনাদি করিবার ক্ষমতা নাই। মন আত্মার প্রসাদে ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া জ্ঞানের সাধন হয়। মনঃসংযোগ ব্যতীত ইন্দ্রিয় স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় মনের অধীন; কিন্তু মন ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়। মন ইন্দ্রিয়ের সহায়তার অভাবে "আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদি প্রকারে স্বতন্ত্রভাবে 'আমি'র উপলব্ধি করে। অতএব অনেকে মনকে আত্মা বলিয়া ভ্রান্ত হন। ফলতঃ মনও আত্মা নয়। 'আমার মন',—এই ভেদবুদ্ধি মনের সহিত আত্মার ভেদ প্রমাণ করিতেছে। ইহার উপর আপত্তি হইতে পারে—'আমার আত্মা' এইরূপ ভেদজ্ঞান হয় বলিয়া, কি আমার সহিত আত্মার ভেদ স্বীকার করিতে হইবে? বস্তুতঃ 'আমার আত্মা, এরূপ প্রয়োগ ভ্রমবিজৃম্ভিত। আমার আত্মা ও আমার 'আমি';—একই কথা। আমার আমি, মাটীর মাটী অশ্বডিম্ববৎ নিরর্থক। অথবা উপাধিভেদে ভেদ স্বীকার করা যাইতে পারে।

বেদান্তমতে অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি ভাগে বিভক্ত। ন্যায়মতে অন্তঃকরন মন নামে অভিহিত হইয়াছে। অন্তঃকরণের বিভাগ স্বীকৃত হয় নাই। আমিও পূর্ব্বে অন্তঃকরণাভিপ্রায়ে মনের উল্লেখ করিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে করিব। ভাষাপরিচ্ছেদে মনের লক্ষণ উল্লেখিত হইয়াছে। যথা—

"সাক্ষাৎকারে সুখাদীনাং করণং মন উচ্যতে।"

অর্থাৎ যাহা সুখাদিসাক্ষাৎকারে হেতু তাহার নাম মন। মন কর্ত্তা নয়, করণ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জ্ঞানের সাধন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয় বাহিরের বস্তু লইয়া দর্শনাদি করে। মন অন্তরের কাজ করে। চাক্ষুষাদি জ্ঞানের সময় বহিরিন্দ্রিয়ের করণতা অন্তরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ; কিন্তু সুখাদি সাক্ষাৎকারে মনের করণতা নিরপেক্ষ—এই বিশেষ।

"অযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে।" ভাষাপরিচ্ছেদ।

দুইটী বা দুয়ের অধিক জ্ঞান ঠিক এক সময়ে হয় না। অতএব বলিতেছেন, জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্যহেতু অর্থাৎ সমকালে উৎপত্তির অভাববশতঃ মন অতি সূক্ষ্ম। পরমাণুবৎ নিরবয়ব। মন অণু বলিয়াই এক সময়ে দুইটী জ্ঞানের ধারণা হয় না। যদি অণু না হইয়া, মহৎ হইত এবং অবয়ব দ্বারা সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া থাকিত, তাহা হইলে, ঠিক একসময়ে চক্ষু মনের সহায়তায় দেখিতে পাইত। কর্ণ শুনিতে পাইত; কিন্তু মন সকল ইন্দ্রিয়-ব্যাপক নয়। একসময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের নিকট যাতায়াত করিতে পারে না, সুতরাং একসময়ে সকলের জ্ঞান হয় না। অধিক কি—এক সময়ে দুই চক্ষু দিয়া দুই বস্তুর দর্শনজনিত দুইটী জ্ঞান হয় না। একজনের নাসিকার নিকট "আতরের শিশি" ধর, অপরের নিকট বিষ্ঠাপূর্ণ পাত্র ধর। বুঝিতে পারিবে—সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের জ্ঞান যুগপৎ হইবে না। যদি মনের অবয়ব থাকিত, তবে এক সময়েই এক অবয়বে চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মিত, অবয়বান্তরে শ্রাবণাদি জ্ঞান জন্মিতে পারিত।

মনের একটী বিশিষ্ট শক্তি আছে, তাহার বলে যথায় যাইবার আবশ্যকতা হয়, তথায় অবিলম্বে যাইতে পারে—কিছুমাত্র কালবিলম্ব হয় না। চক্ষু দেখিবে, মন তৎক্ষণাৎ তথায় ছুটিবে। কর্ণ শুনিবে, মন তথায় অমনি "হাজির"। যখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, কোন কার্য্য করে না, তখনও চঞ্চল মন অচঞ্চল থাকিতে পারে না। তখন মন আপন ঘর অনুসন্ধান করে। স্মৃতির সহিত পূর্ব্বানুভূত বস্তু লইয়া ব্যস্ত থাকে। যখন স্মৃতিও থাকে না, তখন মন স্বপ্নাবস্থায় মেধ্যানাড়ীতে বসিয়া অসম্বদ্ধ কল্পনা করে। আত্মার সহবাসে মনের এইরূপ কার্য্যকারিতা শক্তি স্ফুরিত হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ হইলে, জড়বৎ অবস্থান করে। সুষুপ্তিকালে আত্মার সহিত

মনের সম্বন্ধ বিচ্যুত হয়। তখন মন নির্ব্যাপার হইয়া পুরীততী নাড়ীতে অবস্থান করে। যোগবলেও মন বিষয় সম্বন্ধ রহিত হয়।

মন জড়; অতএব জড়ের উপাদানই মনের উপাদান হওয়া যুক্তিযুক্ত। জড়ের উপাদান পঞ্চভূত। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয় মনেরও উপাদান পঞ্চভূত। তবে বিশেষ এই, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এক একটী ভূত হইতে সঞ্জাত, মন সেরূপ নয়। মন সমবেত পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন। পূর্ব্বেই যুক্তিযোগে ও শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, যে বস্তু যাহা নয়, সে তাহার গুণ গ্রহণ করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহার সে গুণের অভিব্যক্তি করিবার শক্তি থাকে না। পাঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয় পঞ্চভূতস্থিত রূপাদি পঞ্চকের গ্রহণকালে পঞ্চভূতময় মনের সহায়তার অপেক্ষা করে। মনের উপাদান যে পঞ্চভূত, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে। যথা—

"সত্ত্বাংশৈ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকং
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনা ঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে।
তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈঃ।"

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্ব প্রধান অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, এবং একাকী মন সেই পাঁচটী ভূতেরই সত্ত্বাংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। অন্তঃকরণে আকাশ আছে, সেইজন্য শব্দ শুনিবার সময় মনঃসংযোগ হয়। বায়ুর বিকার বিধায়, মনঃ-সংযোগে স্পর্শজ্ঞান হয়। মন আগ্নের বিধায়, দর্শনজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মন জলেরও বিকার বলিয়া, জলের গুণ রসের আস্বাদন পায়। আবার মন পার্থিব, একারণ পার্থিবগুণ সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ গ্রহণের সহায়তা করে। তাই বলি, মনও ভূত। ভূতের সংসারে এক ভূতনাথ ছাড়া সবই ভূত। তিনিই কেবল ভূত নাচাইয়া ঘরে ঘরে ফিরিতেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—,

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতু—
স্তৎ পুরীষং, যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যোনিষ্ঠস্তন্মনঃ ইতি।

ভুক্ত অন্ন জাঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া তিনভাগে বিভক্ত হয়। ত্রিধা বিভক্ত অন্নের স্থূলতম অংশ পুরীষরূপে পরিণত হয়। মধ্যম অংশ রসাদি-ক্রমে মাংসের উপচয় করে; এবং সূক্ষ্মাংশ হিতাখ্যানাড়ীতে অনুপ্রবিষ্ট

হইয়া বাগাদিকরণ সংঘাতের স্থিতি উৎপাদন করত মনরূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ মনের পুষ্টিসাধন করে। অতএব অন্নোপচিত মন ভৌতিক।

ক্রমশঃ—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

---

* বঙ্গভাষার আবাহন-গীতি।

দেখ মা চাহিয়া বঙ্গের ভারতি !
বঙ্গবীণাপাণি দেবী সরস্বতি !
মাগো বঙ্গভাষা—বাঙ্গালীর আশা
সপ্তকোটি বুকে—প্রাণের পিপাসা—
উজলি' অপূর্ব্ব রাজন্যপ্রভায়
বঙ্গেশ্বর† বঙ্গ 'সাহিত্যসভা'য়
আনন্দে দেখ মা চাহিয়া আজি !
কি ভয় জননী নহ তুমি দীনা,
নাহি আর তব ছিন্নতন্ত্রী বীণা,
কত কবিকণ্ঠে হয়ে সমাসীনা
করিয়াছ রঙ্গে—অপূর্ব্ব সঙ্গীত,
শুনে বঙ্গবাসী হারায়ে সম্বিৎ ;
ভালে শোভে রাজপ্রসাদের টিকা,
দেখ চেয়ে আজি ওগো ললাটিকা
বঙ্গের ভারতি চাহ একবার,
দেখ অঙ্গে তব কত অলঙ্কার—
এসমা অপূর্ব্বশোভায় সাজি !
জনম তোমার হায় মা বিদেশে,
বাল্যে ব্রজবুলি আধ আধ ভাষে
বিদ্যাপতি আদি কৃষ্ণভক্তিরসে
শুনাল শৈশবে মধুর কথা।
পরে চণ্ডীদাস আদি মহাজন
চারু কৃষ্ণলীলা করি বিরচন—
বৈষ্ণব কবিরা উচ্ছ্বসিত মন—
কত ভক্ত হায় করিল পূজন;
বসন্তে যেন বা কোকিলকাকলী
সুললিত সেই চারুপদাবলী,
ছিল মা তোমার বাল্যের গাথা !
তার পরে হর্ষে শ্রীকবিকঙ্কণ
চারু চণ্ডীকাব্য মানসরঞ্জন
চণ্ডীর মহিমা করি' প্রকটন
গাহিল আনন্দে মুকুন্দরাম।

* এই কবিতাটী সাহিত্যসভার প্রথম সাম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অনুরুদ্ধ হইয়া পাঠ করিবার জন্য রচিত।

† সাহিত্যসভার অভিভাবক মহামান্য বঙ্গেশ্বর বাহাদুর সারজন্ উড্‌বরন, এম, এ, কে,সি, এস, আই, সি, এস, মহোদয়, প্রথম সাম্বাৎসরিক উৎসব সাহিত্যসভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

পরে কৃত্তিবাস—কীর্ত্তির নিবাস,
গাহিল আনন্দে কাশীরাম দাস,
গৌড়কীর্ত্তিরাশি করিল প্রকাশ।
ধর্ম্মমঙ্গল রচি' ঘনরাম।
রায় গুণাকর ভারত তখন
রচিল মধুর মানসমোহন—
যেন মধুমাসে কোকিলকূজন—
সাধক প্রসাদ মানসরঞ্জন
গাহিল তোমার কৈশোরে মাতা।
পরে সুগম্ভীর করি শঙ্খধ্বনি
ডমরু নিনাদে নাচে যথা ফণী,
নাচিল আনন্দে বঙ্গের ধমনী,
চরণ নূপুর ছিঁড়িল অমনি,
শুনিয়া মধুর বীরত্ব গাথা !
দিল অঙ্গে রঙ্গে নব অলঙ্কার,
করিয়া সগর্ব্বে বীণার ঝঙ্কার—
ধন্য বাণীপুত্র শ্রীমধুসূদন !
কষ্টে বাণীব্রত করি উদ্‌যাপন
পূজিলা তোমায় কবিতারাণি !
স্বর্গীয়া জননী ভারত ঈশ্বরী।
—রাণী ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী—
যাঁহার রাজত্বে ভারত ভিতর
শিক্ষা সভ্যতার হ'ল যুগান্তর
যাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্য-সুশাসনে,
বিরাজিত তুমি স্বর্ণসিংহাসনে
জন্মিল তোমার ধন্যপুত্রগণ,
সহিয়া জীবনে কত নির্যাতন,—
দিল নববল শক্তি সঞ্জীবনী
আনন্দে মাতিয়া করি বীণাধ্বনি,
বিদ্যার সাগর শ্রীরামমোহন,
গুপ্ত, দীনবন্ধু আদি কবিগণ,
অক্ষয়, বঙ্কিম অমূল্যরতন,
আরো কত কবি কত গ্রন্থকার—
দিল অঙ্গে তব নব অলঙ্কার ;
চিরদিন তোমা ভক্তিভরে পূজি'
হায় হেমচন্দ্রে—অন্ধকবি—আজি
*বঙ্গেশ্বর বৃত্তি করিয়া প্রদান,
সারদাসেবার রাখিল সম্মান ;
তাই বঙ্গবাণি, বহুভাগ্য মানি',
পূজে ভক্তিভরে রাঙা পাদু'খানি
শতকবি আজি দেখমা তোমার
পরাই'ছে কণ্ঠে কত অলঙ্কার,
দেখ আজি মাতঃ এ মহা উৎসব,
কি অভাব তব অতুল বিভব,
সপত্নীসেবক, দেখ মা ভারতি,
করিতে তোমার মঙ্গল আরতি
সমবেত আজি, দেখগো জননি !
আনন্দে নাচিছে তাদের ধমনী,
প্রকৃতিবৎসল বঙ্গ অধিপতি,
তোমার পূজায় হ'য়ে সভাপতি,

* সুপ্রসিদ্ধকবি ও সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয়কে বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করিয়া, বাস্তবিক পক্ষে বঙ্গভাষারই গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন।

করি'ছেন কত উৎসাহ প্রদান,
তব ভক্তগণ লভিছে সম্মান,
বাণীপূজাতরে এই সভাস্থল
পেয়ে বঙ্গেশ্বরে কত সমুজ্জ্বল!—
আনন্দে চাহমা বঙ্গের বাণি!
হায় আজি বঙ্গে, সব নিদ্রাগত,
শিল্পের সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য বিগত!
সুজলা সুফলা চন্দনশীতলা
কোথা সেই বঙ্গ শস্যেতে শ্যামলা—
শূন্য হেরি যত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!
নাহি রত্নরাজি আজি অলকার!
নন্দনকাননে নাহি পারিজাত!
নিরভ্রগগনে অশনিসম্পাত!
বরুণ নন্দন পিপাসার তরে,
শুষ্ককণ্ঠে হায় কাঁদিছে কাতরে!
দারুণ দুর্ভিক্ষে ভারত শ্মশান!
যেন বাজে দূরে প্রলয় বিষাণ!—
জীবন-সংগ্রামে সবে হীনবল
নাহি উদ্দীপনা-অদৃষ্টসম্বল!
সবে মোহাচ্ছন্ন অদৃষ্ট লাগিয়া—
শুধু বঙ্গভাষা তুমি মা জাগিয়া!
কি অভাব তব নহ তুমি দীনা,
আর নাহি তব ছিন্নতন্ত্রী বীণা,
ভক্ত কবিকণ্ঠে হয়ে সমাসীনা
দেখমা চাহিয়া অপূর্ব্ব প্রভা!
দেখ, বঙ্গেশ্বর প্রকৃতিবৎসল
তব সভাস্থল করিয়া উজ্জ্বল,
যত ভক্তবৃন্দ আনন্দে মাতিয়া
আসিয়াছে তব পূজার লাগিয়া,
মাতঃ বঙ্গভাষা করি আবাহন
এসগো ভারতি মরালবাহন!
সপ্তকোটিবুকে স্বর্ণসিংহাসন
শোভিছে তোমার উজ্জ্বলদর্শন!
শত কবি শোভে তব অঙ্কস্থলে
শত কাব্যভূষা শোভে তব গলে,
এস মা অনন্ত সৌভাগ্যশালিনি
চারু রত্নহারা কবিতামালিনি
এস বীণাপাণি বঙ্গের ভারতি
করিছে তোমার বার্ষিক আরতি
আনন্দে মাতিয়া সাহিত্য-সভা।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ

হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থে ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।

উক্তরূপে বিষকন্যার পরীক্ষা করা বর্ত্তমান সমাজে দুরূহ ব্যাপার, অথচ জীবন সকলেরই প্রার্থনীয়, মরণ কাহারই অভিলষিত নহে, ইহা নিশ্চয় করিয়াই ত্রিকালদর্শী লোকহিতৈষী আর্য্যঋষিগণ সংক্রামক বিষদোষ হইতে মানবদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই বালিকাবিবাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বালিকাবস্থায় বিবাহ হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিষদোষের সম্ভাবনা থাকে না; যেমন অবিপক্ব অজাতসার বিষতরুর বিষভক্ষণে কথঞ্চিৎ ক্লেশ হইতে পারে বটে, কিন্তু উক্ত বিষ ভক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। দেখা যায়, ক্রমশঃ অল্প পরিমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরে অধিকপরিমাণ অহিফেনও অভ্যাস প্রযুক্ত ভক্ষণকারীকে মারিতে পারে না, সেই প্রকার যে বালিকার শরীরে বিষের অঙ্কুরমাত্রের উদ্গম হইয়াছে, সেই নব বিবাহিতা বালিকা বধূর সংসর্গে শ্বশুর দেবর অথবা স্বামী বিষদোষে আক্রান্ত হইতে পারে না।

প্রাচীনকালের ব্যবহার ঐরূপই ছিল, পূর্ব্ববঙ্গে এখনও স্থান বিশেষে উক্ত ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

নববিবাহিতা বালিকাবধূ পতিগৃহে আসিয়া কিছুদিন কাহারও সহিত কথা কহে না, পুত্রবধূও কন্যার মত শাশুড়ীর নিকটেই থাকে, শাশুড়ীর কাছেই শয়ন করে, রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্বে পতির শয্যায় যায় না; এবং শ্বশুর শাশুড়ীর পদপ্রক্ষালনের জল আনিয়া দেয়, গৃহলেপন, পাকপাত্র মার্জ্জন, হরিদ্রা সর্ষপাদি পেষণ, শাশুড়ীর সহিত একত্র রন্ধন, ইত্যাদি গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকে। রন্ধনান্তে পতি প্রভৃতিকে পরিবেশন করে, পতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে,—পতি প্রভৃতির বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত পুনর্ব্বার অপরাহ্নে অঙ্গসংলগ্নতাহেতু শারীরিক উষ্মা বস্ত্রে সংযোজিত করিয়া যথা স্থানে সজ্জিত ভাবে স্থাপন করে।

এই রূপে বস্ত্রাদির সংস্পর্শপ্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্পর্শে নিজের অঙ্কুরিত দৈহিক বিষ পতি প্রভৃতির শরীরে সংক্রান্ত হইয়া ক্রমে সাম্য লাভ করে, তখন

আর কাহারও বিকৃতি জন্মায় না, প্রত্যুত পরস্পর সংসর্গে শরীরগত দোষ সামঞ্জস্যই লাভ করে।

এই প্রকারে প্রথমে অল্পে, অল্পে সহিয়া সহিয়া অভ্যস্ত হইলে পরে, গুরুতর সংসর্গেও অনিষ্টের সম্ভাবনা হয় না, পরন্তু অহিফেনের ন্যায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পুষ্টিই সাধন করে।

মানব শরীরগত তাড়িত বা উষ্মা স্বভাবতঃ ইতস্ততঃ সর্ব্বদা বিচ্ছুরিত হইয়াই থাকে, কিন্তু আলাপ গাত্রস্পর্শাদি সংসর্গে পাপ নামক দৈহিক বিষ উক্ত তাড়িত প্রবাহের সহিত একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রান্ত হয়, ইহা "প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে" পতিতসংসর্গ প্রকরণে ছাগলেয় প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্ফুটভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। যথা—

"আলাপাদ্‌গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎসহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥" (ছাগলেয় ১)

অর্থ—পরস্পর আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক সঙ্গে শয়ন, একাসনে উপবেশন, একত্র অধ্যয়ন,—ইত্যাদি সংসর্গে এক শরীর হইতে পাপবৃত্তিগুলি অপর শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ১ ॥

"সংলাপস্পর্শনিঃশ্বাস সহশয্যাসনাশনাৎ।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥" ২॥ (দেবল)

অর্থ—পরস্পর আলাপ, স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন, যাজন, অধ্যাপন, ও যৌনসংসর্গে একশরীরের পাপবিষ অপর শরীরে সংক্রান্ত হয় ॥ ২ ॥

"আসনাচ্ছয়নাদ্‌যানাৎ ভাষণাৎ সহ ভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥" ৩ (পরাশর)

অর্থ—তৈল বিন্দু জলে ফেলিবা মাত্র যেমন ছড়াইয়া যায়, তেমন উপবেশন, শয়ন, যানারোহণ, আলাপ ও একসঙ্গে ভোজনরূপ সূত্রে এক শরীরের পাপবৃত্তিগুলি বিকীর্ণ হইয়া অপরশরীরে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৩।

অতএব দ্বিতীয়সংস্কারের পূর্ব্বে পত্নীর সহিত গুরুতর সংসর্গ করিবে না; বিশেষতঃ নির্ণয়সিন্ধু গ্রন্থে যম এবিষয় বিশেষরূপে সাবধান করিয়াগিয়াছেন যথা—

"প্রাগ্রজোদর্শনাৎ পত্নীংনেয়াদ্‌গত্বা পতত্যধঃ।
বৃথাকারেণ শুক্রস্য ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ ॥"

কিন্তু রজোনিঃস্রবের পরে যথাশাস্ত্র গুরুতর সংসর্গেও পত্নীর শরীরগত সঞ্চিত দোষে ভর্ত্তা আক্রান্ত হইবে না, এ বিষয় মনু কহিয়াছেন ঃ—

"স্ত্রিয়ঃ পবিত্রমতুলং নৈতা দুষ্যন্তি কর্হিচিৎ।
মাসিমাসি রজস্তস্যা দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি" ॥

অর্থঃ—প্রতি মাসেই রজঃস্রাবের সহিত স্ত্রীদিগের দৈহিক সঞ্চিত দোষসকল অপসৃত হইয়া যায়, তখন তাহাদের শরীর নির্দ্দোষ হয়।

কিন্তু যতদিন রজোনিবৃত্তি না হয়, ততদিন উহাদের দৈহিক দোষ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হয়, তখন অল্পমাত্র সংস্রবও ভয়ানক অনর্থের কারণ হয়, সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ ও সুশ্রুতপ্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ বিশেষ সাবধান করিয়া গিয়াছেন। যথা ঃ—

রজঃ প্রবৃত্তির তিন দিন কুলস্ত্রীগণ অতি সন্তর্পণে থাকিবে, যেন কাহাকেও স্পর্শ না করে, কাহারও সহিত হাসিবে না, তৈল মর্দ্দন করিবে না, অলঙ্কার পরিবে না, স্নান করিবে না, একবেলা আহার করিয়া ক্ষীণা হইবে, বলকর দুগ্ধাদি আহার করিবে না, তৈজস পাত্রে খাইবে না, মৃন্ময়পাত্রে বা কদলাদি পত্রে আহার করিয়া তাহা ফেলিয়া দিবে, খট্টায় পালঙ্কে উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে না, সামান্যশয্যায় অতি ক্লেশে ত্রিরাত্র শয়ন করিয়া পরে তাহা ফেলিয়া দিবে, গৃহকোণে ভিন্ন কাহারও দৃষ্টিপথেও থাকিবেনা, অপরের বস্ত্রাদিতে নিজের বস্ত্র সংযোগ করিবে না, যদি দৈবাৎ অপরের বস্ত্র নিজের বস্ত্রে সংযুক্ত হয়, তবে তাহা ধৌত করিয়া পরে ব্যবহার করিবে, (*) যদি

* উক্তরূপ ব্যবহার এখনো পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে।

"নোপগচ্ছেৎ প্রমত্তোহপি স্ত্রিয়মার্ত্তবদর্শনে।
সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়াসহ ॥
রজসাভিপ্লুতাং নারীংনরস্য হ্যপগচ্ছতঃ।
প্রজ্ঞা তেজো বলংচক্ষু রায়ুশ্চৈব প্রহীয়তে ॥
তাং বিবর্জ্জয়তস্তস্য রজসা সমভি প্লুতাং।
প্রজ্ঞাতেজো বলং চক্ষুরাশ্চৈব প্রবর্দ্ধতে ॥' (মনু ৪।৪০—৪২)

দৈবাৎ রজস্বলা স্ত্রী কাহাকেও স্পর্শ করে, তবে তৎক্ষণাৎ পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে, তুলসীজল স্পর্শ ও বিষ্ণু পাদোদক পান করিবে, তবেই রজস্বলা স্ত্রীর শরীর হইতে সংক্রান্ত দোষরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে।

ইহার অন্যথাচরণে ও গুরুতর সংসর্গে মানবগণ তাহাদের দৈহিক বিষে সমাক্রান্ত হইয়া দিন দিন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইবে, শরীর মন নিস্তেজ হইবে—অল্পবয়সে "চস্‌মা" পরিতে হইবে, মস্তিষ্কে দোষ জন্মিবে, কান্তিভ্রষ্ট হইবে, অকালে কালকবলে পতিত হইবে। (১)

অতএব পূর্ব্বোক্ত মুনিজনের বচনদ্বারা ইহাই প্রমাণিত ও অনুমিত হইল—যে নারী বিষধরী।

রজস্বলা সম্বন্ধে যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রানুশাসিত নিয়ম উপেক্ষা করিবে,

---

"ঋতৌ প্রথমদিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী দিবাস্বপ্নাঞ্জনাশ্রুপাতনস্নানানুলেপনাভ্যঙ্গ নখচ্ছেদনমপ্রধাবনহসনকথনাতিশয়শ্রবনাবলেখনানিলায়াসান্ পরিহরেৎ।" "দর্ভসংস্তর-শায়িনী করতলশরীরস্পর্শান্ত্যমভোজিনী" ইত্যাদি (সুশ্রুত, শারীর স্থান)।

(১) "স্ত্রীধর্ম্মিণী ত্রিরাত্রন্তু স্বমুখং নৈব দর্শয়েৎ।
স্ববাক্যং শ্রাবয়েন্নাপি যাবৎ স্নানান্নশুধ্যতি॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)
"বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ পাত্রে খর্ব্বে চ ভোজনং।
গন্ধংমাল্যং দিবা স্বাপংতাম্বূলঞ্চাস্যশোধনং॥" (অত্রি)
"আহারং গোরসানাঞ্চ পুষ্পালঙ্কারাধরণং।
অঞ্জনং কঙ্কতং দন্তাঃ পাঠশয্যারেধিহণং।
অগ্নিসংস্পর্শনঞ্চৈব বর্জ্জয়েচ্চ দিনত্রয়ং॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)
"দিবাকীর্ত্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি॥" (মনু ৫।৮৫)।
"রজো দর্শনতো দোষাৎ সর্ব্বমেব পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বৈরলক্ষিতা শীঘ্রং লজ্জিতান্তগৃহে বসেৎ॥
একাম্বরাবৃতাদীনা স্নানালঙ্কারবর্জ্জিতা।
মৌনীন্ত্যধোমুখী চক্ষুঃপাণিপদ্ভিরচঞ্চলা।
অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃন্ময়ভাজনে॥
স্বপেদ্ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেবমহস্ত্রয়ং।
স্নায়ীতচ ত্রিরাত্রান্তে সচেলমুদিতে রবৌ॥"
ক্ষামালঙ্কদবাপ্নোতি পুত্রং পুজিতলক্ষণং॥" (ব্যাস ৩।৩৭—৪৪)।

সে নিশ্চয়ই জীবিতকাল পর্য্যন্ত মানসিক ও শারীরিক শান্তিসুখে বঞ্চিত হইবে।

অতএব যদি মানব নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখ শান্তিতে থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুটভাবে বিষবেগ উচ্ছলিত হইয়া উঠিলে, বয়োধিকা কন্যার পাণিপীড়ন করিবে না। পরন্তু উক্তরূপ ঘর্ম্মাদি বিষের (১) করালকবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্কুরাবস্থায় বিষ থাকিতে থাকিতে বালিকাবস্থায়ই পরিণয় করা কর্ত্তব্য।

এজন্য লোকহিতার্থে ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যাকুলাবতংস অনেকানেক ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ও শরীরতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ সমস্বরে কহিয়া গিয়াছেন যে, অষ্টম নবম ও দশম বর্ষ বয়স্কা বালিকারই বিবাহ সুপ্রশস্ত। দৃষ্টরজস্কা উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতীর বিবাহ ভূয়োভূয়ঃ শিরঃশপথপূর্ব্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

এই প্রকারে বালিকাবিবাহ সম্যগ্‌রূপে যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মমূলক ও বিজ্ঞান-প্রসূত কি না—ইহা চিন্তাশীল মনীষিগণের বিচার্য্য।

আমি ইহা বলিতেছি না যে, মৎপ্রদর্শিত প্রমাণ ও যুক্তিই একমাত্র বালিকা-বিবাহে যথেষ্ট কারণ, কিন্তু চিন্তাশীল বুধগণের বিচার করিবার জন্য কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সহায়তা হইতে পারে, এই নিমিত্তই আমার উদ্যম।

ইহা অপেক্ষায় অন্যবিধ ও সূক্ষ্মকারণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আমার মত স্থূলবুদ্ধির দুর্জ্ঞেয়।

কেহ কেহ বালিকাবিবাহে এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা এই—

পুষ্পবতী অবস্থায় যোষিদ্গণের মানসিক চাঞ্চল্য অতিশয় প্রবল হয়, তখন চাঞ্চল্য স্তম্ভিত করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে প্রায় তাহারা সমর্থ হয় না, সুতরাং সেই অবস্থায় উৎপথবর্ত্তিনী হইয়া পিতৃকুল কলুষিত করিতে পারে, অতএব রজঃ প্রবৃত্তির পূর্ব্বেই কন্যাকে পাত্রসাৎ করা উচিত। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর প্রথমতরঙ্গে জ্ঞানভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর এই মতেরই পোষণ করিয়াছেন। (১) (ক্রমশঃ)

---

(১) "বসা শুক্র মসৃক্ মজ্জা মূত্রবিট্ ঘ্রাণকর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রু দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ।" (মনু ৫।১৩৫॥ অত্রি ৩২)।

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

কার্য্য-বিবরণ।

১৩০৮ সালের দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন।

১। বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১৯০২।২৮শে মে) বুধবার অপরাহ্ন ৬ ছয় ঘটিকার সময়, ১০৬।১, গ্রে ষ্ট্রীটস্থ সভার কার্য্যালয়ে, সাহিত্যসভার ২য় বর্ষের ১২শ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যারত্ন, এম,এ,বি,এল।
২। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ।
৩। ,, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৪। ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ,
৫। ,, হরিদেব শাস্ত্রী।
৬। ,, দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ।
৭। ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
৮। ,, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৯। ,, রাধাগোবিন্দ গাঙ্গোপাধ্যায়।
১০। ,, দ্বারকানাথ কাব্যতীর্থ।
১১। ,, সখারাম গণেশ দেউস্কর।
১২। ,, মধুসূদন চক্রবর্ত্তী।
১৩। ,, কামাখ্যামোহন বন্দোপাধ্যায়।
১৪। ,, সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৫। ,, নবনীকান্ত সেন।
১৬। ,, অনুপকৃষ্ণ মিত্র।
১৭। ,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
১৮। ,, সখানাথ দেব।
১৯। ,, মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্য।
২০। ,, মোহিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য।
২১। ,, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।
২২। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
২৩। ,, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২৪। ,, যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।
২৫। ,, ব্রজগোপাল মতিলাল।
২৬। ,, ডাক্তার অমৃতলাল সরকার।
২৭। ,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
২৮। ,, আশুতোষ দেব এম, এ।
২৯। ,, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ।
৩০। ,, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।
৩১। ,, বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য আধ্যাত্মিক।
৩২। ,, কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
৩৩। ,, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।
৩৪। ,, নন্দলাল ঘোষ।
৩৫। ,, শিবকৃষ্ণ দত্ত।
৩৬। ,, চারুচন্দ্র মিত্র।
৩৭। ,, মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ,বি,এল।
৩৮। ,, সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী বি, এ।
৩৯। ,, ডাঃ বিপিনবিহারী ঘোষ।
৪০। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম,এ, (সম্পাদক)।
৪১। ,, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—
(সহযোগী সম্পাদক)।

২। প্রথমতঃ গতবর্ষের (১৩০৮ সালের) বাৎসরিক সভার আয়ব্যয়ের হিসাব পঠিত হইল এবং তাহাতে দৃষ্ট হইল যে, গতবর্ষে অতি অল্পই উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় ২৮শে বৈশাখ তারিখের অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদিত আগামীবর্ষের কর্ম্মচারীনিয়োগবিষয়ক মন্তব্য পাঠ করিলেন। ঐ অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে, "পেট্রন," (অভিভাবক),সভাপতি, সহকারিসভাপতিগণ, সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক, এবং ধনাধ্যক্ষ—ইঁহাদের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া পূর্ব্ববৎ রাখা হউক। মন্তব্য পঠিত হইলে পরে, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল মতিলাল মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি,ডি, এল, সি, আই, ই, মহাশয়ের স্থলে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ,বি,এল, মহাশয়কে এবং রায় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের পরিবর্ত্তে রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম,এ,সি,এস্,আই, মহাশয়কে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হউক। শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সভায় ১ম প্রস্তাবটী গৃহীত হইল না, ২য়টী সভা অনুমোদন করিলেন॥ তৎপরে শ্রীযুক্ত কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, রায় শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ও ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহোদয়দ্বয়ের পরিবর্ত্তে কোন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত না করিয়া, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়দ্বয়কে সভার অতিরিক্ত সহকারিসভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত করা হউক। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব এম, এ, মহাশয় ঐ প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। সভা কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অস্থায়ী পত্রিকাসম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের স্থানে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল, মহাশয় স্থায়ী সম্পাদকরূপে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় সহকারী-পত্রিকা-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হউন, কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সভা ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

৫। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির আয়ব্যয় পরীক্ষক শ্রীযুক্ত প্রমথ চন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে মহাশয়কে নির্ব্বাচিত করা হউক, কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—সভায় ঐ মন্তব্যটী পঠিত হইলে পরে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবুর পরিবর্ত্তে, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, মহাশয়কে অন্যতম আয়ব্যয় পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করা হউক—উক্ত প্রস্তাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইল; সভা তাহার অনুমোদন করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভার গ্রন্থরক্ষক নির্ব্বাচনবিষয়ক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রস্তাব পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে,—শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বাবুর স্থানে শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ মহাশয় গ্রন্থরক্ষক নির্ব্বাচিত হউন। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সমর্থন করিলেন—সভা কর্ত্তৃক উহা অনুমোদিত হইল।

৭। তৎপরে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের মধ্যে উক্ত সমিতির পরিবর্ত্তন বিষয়ক মন্তব্য পঠিত হইলে, কুমার শ্রীযুক্ত কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত প্রমথকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয়কে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত করা হউক। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় উহার সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে মহাশয়কে, উল্লিখিত সভার সভ্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয় সমর্থন করিলেন,তাহা সভাকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল। পরলোকগত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হউন—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত কাব্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইল ও সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থানে, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সভ্য নিযুক্ত হউন, এই মর্ম্মে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মন্তব্য সভায় পঠিত ও গৃহীত হইল। অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দামোদর বিদ্যানন্দ ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ শাস্ত্রী মহোদয়দ্বয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম অতিরিক্ত সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় নানারূপে সাহিত্যসভার নানাবিধ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সভার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র. এই নিমিত্ত সভা তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ করিতেছেন, এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন ও সেই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে, সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইল। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কে, আই, এইচ, পণ্ডিতশ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সুখ্যাতি কীর্ত্তন করিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সম্পাদক।

শ্রীকামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ,
সভাপতি।

১৩০৯। ১লা আষাঢ়।
১৯০২। ১৬ই জুন।
রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ছয় ঘটিকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, ভাদ্র ও আশ্বিন। [৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাহিত্য-সংহিতা।

('সাহিত্য-সভার' মাসিক পত্রিকা)।

সম্পাদক
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বি, এল,
এফ, আর, জি, এস।

কলিকাতা
১০৬।১ নং, গ্রে ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রকাশিত।
১১ নং, সিমলা ষ্ট্রীট, "হরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

১৫ই অগ্রহায়ণ প্রকাশিত।

☞ "সাহিত্য-সভার" সভ্যেরা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনরচিত দানসাগর গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহিত সাহিত্য-সংহিতায় মুদ্রিত হইতেছে। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রিমমূল্য প্রেরণ করিয়া সংহিতার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

২। ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলীসহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সটীক ও সানুবাদ মুদ্রিত হইতেছে। অর্দ্ধাংশের অধিক মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুগণ নাম ধাম পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৩। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ দেয় অগ্রিমমূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৪। সভার সভ্যগণ ও সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ টাকাকড়ি, প্রবন্ধ ও পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ।
সাহিত্য-সভার সহযোগী সম্পাদক।
১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক।
১।	স্বর্গীয় সার্ জন্ উড্বর্ণ।	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ।	১—[illegible]
২।	দার্শনিক মতের সমালোচনা।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।	২৩৩
৩।	জপজী।	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব, এম, এ, এফ, টি, এস্।	২৫৭
৪।	সাংখ্যদর্শনের ইতিহাস।	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম, এ।	২৭৩
৫।	ধর্ম্মপদের মূল ও ব্যাখ্যা।	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু।	২৮০
৬।	যোগদর্শন।	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব, এম, এ, এফ্, টি এস্।	২৮৭
৭।	বীজগণিত (চক্রবাল)।	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য।	৩১৩
৮।	সম্রাট্ জহাঁগীরের স্বলিখিত আত্মজীবন বৃত্তান্ত।	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৩২০
৯।	হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান।	শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	* ৩৩১
১০।	কোজাগর পূর্ণিমায়। (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ।	৩৪৫
১১।	কার্য্য-বিবরণ		৩৫১
১২।	দান-সাগর।	শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	২৫—৫০

* ৪১শ ফর্ম্মা হইতে পত্রাঙ্ক ৩২১এর স্থলে ৩৩১ মুদ্রিত হইয়াছে। ৩৩১—৩৫৪এর স্থলে ৩২১—৩৩৪ই যথার্থ পত্রাঙ্ক হইবে। মুদ্রাকর।

☞ প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

সাহিত্য-সংহিতা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯, ভাদ্র ও আশ্বিন। [৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দার্শনিক মতের সমালোচনা।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বেদান্ত এই কয়েকখানি প্রধান দর্শনই ষড়্দর্শন পদে অভিহিত। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি, ব্যাস ইঁহারা যথাক্রমে ষড়্দর্শনের প্রণেতা। সকল দর্শনের মোক্ষই একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই মোক্ষ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ, অর্থাৎ যাদৃশ দুঃখ-নিবৃত্তি কালে পুনর্ব্বার দুঃখান্তরের সম্ভাবনা না থাকে, তাদৃশ দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষ। তত্ত্বজ্ঞানই এই মোক্ষের একমাত্র উপায়; ঐ তত্ত্বজ্ঞান ন্যায়বৈশেষিক মতে জীবাত্মার শরীর হইতে পার্থক্য জ্ঞান, সাঙ্খ্যপাতঞ্জল মতে প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান, বেদান্ত মতে জীবব্রহ্মের ঐক্যাবধারণ। মীমাংসা মতে আত্মার প্রাকৃতিক অবস্থাজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। কণাদমহর্ষি প্রণীত বৈশেষিকসূত্র, প্রশস্তপাদপ্রণীত উহার ভাষ্য, গৌতমমহর্ষি প্রণীত ন্যায়সূত্র, বাৎস্যায়নকৃত উহার ভাষ্য। ঐ সূত্র ও ভাষ্য অতিসংক্ষিপ্ত সংস্কৃতদ্বারা গ্রথিত ও অত্যন্ত গভীরার্থ; সুতরাং সুকুমারমতি অন্তেবাসিদিগের ঝটিতি দুর্ব্বোধ; এই জন্য অন্তেবাসিদিগের উপরি দয়াপরতন্ত্র হইয়া অনেক নব্য নৈয়ায়িক অনেক নব্যবৈশেষিক ঐ উভয় দর্শনকে বিশদরূপে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বিদ্যানিবাসপুত্র নৈয়ায়িকশিরোমণি বিশ্বনাথপঞ্চানন গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রের সরল ও সংক্ষিপ্তভাবে বৃত্তি প্রণয়ন ও প্রশস্তপাদ প্রণীত বৈশেষিকসূত্রভাষ্যকে সংক্ষেপে কারিকারূপে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ কারিকাও স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ হওয়ায়, ন্যায়-বৈশেষিক মতানুযায়িনী সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে ব্যাখ্যারও স্বয়ংই প্রণয়ন করিয়াছেন। এই স্থলে

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বিশ্বনাথপঞ্চানন যেরূপ ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, সেইরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। রাজীবনামা তাঁহার অন্যতম অন্তেবাসী তাঁহার নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, ন্যায়, বৈশেষিক শাস্ত্রের দুরূহত্ব নিবন্ধন তদধ্যয়নে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন; তদ্দর্শনে রাজীবনামক শিষ্যে দয়াপরতন্ত্র হইয়া উক্ত তার্কিকশিরোমণি নিজনির্ম্মিত কারিকাবলীর উপরি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে,—"নিজনির্ম্মিত কারিকাবলীমতিসংক্ষিপ্তচিরন্তনোক্তিভিঃ। বিশদীকরবাণি কৌতুকান্নন্থ রাজীব দয়াবশংবদঃ।" দেশের দুর্ভাগ্যে উত্তরোত্তর অন্তেবাসিদিগের বুদ্ধির হ্রাস হওয়ায়, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীও যখন দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল, তখন বালকৃষ্ণভট্টাত্মজ মহাদেব ভট্টনামক একজন তার্কিকাগ্রণী সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশ নামক দিনকরী এইরূপ-অপর-নামধেয় ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই স্থলেও এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেবভট্ট উপমান পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ঐ প্রকাশগ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ঐ প্রকাশগ্রন্থের অন্তে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে,—

"ভানুং প্রণম্য পরিভাব্য চ শাস্ত্রসারং মুক্তাবলীকিরণ এষ পিতৃপ্রদিষ্টঃ।
যদ্যুক্তিভির্দিনকরেণ করেণ সোঽয়ং নীতঃ প্রকাশপদবীং সুধিয়াং মুদেঽস্তু।"

পরে যথাক্রমে রুদ্র ভট্টাচার্য্য এক ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বদেশীয় চন্দ্রমুণি ভট্টাচার্য্যও মনোরমা নামক এক ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যাখ্যাত্রয়ের মধ্যে দিনকরী নামক ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিপূর্ণ বলিয়া সর্ব্বত্র পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সমাদৃতা হইয়াছে। বিদ্যানিবাসপুত্র বিশ্বনাথপঞ্চানন কোন্ সময়ে কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; অন্ততঃ আমি কোন প্রমাণ পাই নাই। পরন্তু তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়া ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, তিনি নব্যটীকাকারগণ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন ছিলেন এবং একজন প্রামাণিক পুরুষ ছিলেন। গ্রন্থের পরিচ্ছেদ সমাপ্তিকালে "ইতি শ্রীবিশ্বনাথ পঞ্চাননভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং" এইরূপ লিপিস্বরস দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত ছিলেন। যদি ইহাই হয় তাহাহইলে তাঁহার

সময়ে যে, তাঁহার দ্বারা বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈশেষিকসূত্র প্রণেতা কণাদ ও ন্যায়সূত্র প্রণেতা গৌতম এই দুইজন সমান সিদ্ধান্তে উপনীত ছিলেন।—"এতেব পদার্থাঃ বৈশেষিকপ্রসিদ্ধাঃ নৈয়ায়িকানামপ্যবিরুদ্ধাঃ প্রতিপাদিতশ্চৈবমেব ভাষ্যে।" এই সন্দর্ভ দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত বৈশেষিক-সূত্রভাষ্যেও এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। ভাষ্য এই,—

"দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াভাবাঃ সপ্তৈবপদার্থাঃ ষোড়শা নামত্রৈবান্তর্ভাবাৎ।" দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-জাতি-বিশেষ-সমবায়-অভাব এই সপ্তই পদার্থ, এই সপ্ত পদার্থ মীমাংসকেরও অভিমত। ঐ পদার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণক্রিয়ার আশ্রয়, ঐ দ্রব্য পৃথিব্যাদি, রূপরসাদি চতুর্বিংশতি প্রকার গুণ, উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণাদি পঞ্চবিধ কর্ম্ম, মনুষ্যত্ব ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি, পরমাণুদিগের পরস্পর ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মই বিশেষ পদের বাচ্য। ইঁহাদের মতে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এই নয়বিধ দ্রব্য। তন্মধ্যে আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন, এই পাঁচটী নিত্য অর্থাৎ প্রলয় কালেও ইহারা অবস্থান করে। সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি নাই। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটী ভূতপদের প্রতিপাদ্য। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণ যাহাতে আছে, তাহারাই ভূতপদার্থ। পৃথিবীতে ঘ্রাণগ্রাহ্য গন্ধস্বরূপ বিশেষ গুণ, জলে রসনাগ্রাহ্য রসস্বরূপ বিশেষ গুণ, তেজে নয়নগ্রাহ্য রূপ স্বরূপ বিশেষ গুণ, বায়ুতে ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শস্বরূপ বিশেষ গুণ, আকাশে শ্রবণগ্রাহ্য শব্দস্বরূপ বিশেষ গুণ আছে। ভূতের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, এই চারিটী নিত্যানিত্য ভেদে দুইরূপ। পরমাণু নিত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত দ্ব্যণুক ঘটাদি অনিত্য। ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুই স্থূল দ্রব্যের উপাদান। সৃষ্টির প্রথমে পরমাণুদ্বয় একত্রিত হইয়া দ্ব্যণুক হয়, ঐ দ্ব্যণুকত্রয় একত্রিত হইয়া ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়। সূর্য্যদেব গবাক্ষের মধ্যগত হইলে সূর্য্য-কিরণের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্মরেণু আমরা দেখিতে পাই, ঐ সূক্ষ্মরেণুই ত্রসরেণু। উহার অপেক্ষাকৃত মহৎ পরিমাণ থাকায়, উহা আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। যে বস্তুতে সূক্ষ্ম পরিমাণ থাকে, অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ না থাকে, সেই বস্তু আমাদের নয়নগোচর হয় না। যেহেতু প্রত্যক্ষে মহৎ পরিমাণ কারণ।

অতএব ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক ও তদবয়ব পরমাণুর সূক্ষ্ম পরিমাণ থাকায়, অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ না থাকায়, উহা আমাদের নয়নগোচর হয় না। এই স্থলে যদি কেহ আপত্তি করেন যে, ত্রসরেণুতে বিশ্রাম স্বীকার করিলেই সকল নির্ব্বাহ হইতে পারে, ত্রসরেণুর অবয়ব দ্ব্যণুক ও তদবয়ব পরমাণু স্বীকারের আর প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, অনেক অবয়বদ্বারা গঠিত যে সকল বস্তু উহারাই মহৎপরিমাণবিশিষ্ট দেখা যাইতেছে, এবং অবয়বের আধিক্য অল্পতা নিবন্ধনই মহৎ পরিমাণের তারতম্য দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং ত্রসরেণু যদি অনেক অবয়ব দ্বারা গঠিত না হইত, তাহা হইলে উহাতে মহৎ পরিমাণ থাকিতে পারিত না। এবং সকল প্রত্যক্ষ দ্রব্য ঘটপটাদিকেই যখন সাবয়ব দেখা যাইতেছে, তখন প্রত্যক্ষ দ্রব্য ত্রসরেণুই বা সাবয়ব না হইবে কেন? এবং প্রত্যক্ষ দ্রব্য ঘটাদির অবয়ব কপালাদির সাবয়বত্ব দৃষ্টান্তে ত্রসরেণুরূপ প্রত্যক্ষ দ্রব্যের অবয়ব যে দ্ব্যণুক উহারও সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। দ্ব্যণুক যে অবয়ব দ্বারা সাবয়ব হইয়াছে সেই অবয়বের নামই পরমাণু। এই পরমাণুতেই বিশ্রাম, অর্থাৎ পরমাণু নিরবয়ব উহার কোন অবয়ব নাই; উহার অবয়ব স্বীকার করিলে তুল্য যুক্তি দ্বারা তাহার অবয়ব ও তাহার অবয়ব স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ যদি কোন অবয়বে বিশ্রাম না হয়, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে এবং সুমেরুপর্ব্বতও সর্ষপের তারতম্য স্থির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সুমেরু অনেক অবয়ব দ্বারা গঠিত, সর্ষপ অল্পাবয়ব দ্বারা গঠিত, এই বলিয়াই উহাদের পরিমাণ তারতম্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি সুমেরুর অবয়বও অসংখ্য হয় ও সর্ষপের অবয়বও অসংখ্য হয়, তাহা হইলে কিরূপে উহাদের তারতম্য স্থিরীকৃত হইবে। অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও অবয়বের মধ্যে কোন একটী অবয়বে বিশ্রাম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সৃষ্টির সময় এক পরমাণুর সজাতীয় অপর পরমাণুর সহিত যোগ হইয়া অর্থাৎ পার্থিব পরমাণুর সহিত পার্থিব পরমাণুর, জলীয় পরমাণুর সহিত জলীয় পরমাণুর, তৈজস পরমাণুর সহিত তৈজস পরমাণুর, বায়বীয় পরমাণুর সহিত বায়বীয় পরমাণুর, যোগ হইয়া ক্রমে স্থূল পৃথিবী, স্থূল জল, স্থূল তৈজ, ও স্থূল বায়ুর উৎপত্তি হয়। উক্তরূপ সজাতীয় পরমাণুর সহিত সজাতীয় পরমাণুর যোজকই বিশেষ

পদার্থ। বিশেষ পদার্থ না থাকিলে বিজাতীয় পরমাণুর বিজাতীয় পরমাণুর সহিত যোগদ্বারা অর্থাৎ পার্থিব পরমাণুর সহিত জলীয় পরমাণুর যোগদ্বারা সৃষ্টির বিশৃঙ্খলভাবের সম্ভাবনা ঘটিত। এই সম্ভাবনা নিরাসার্থই পূর্ব্বোক্ত-দর্শনকর্ত্তারা একটী অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ পরমাণুতে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ ঐ অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকার না করিয়াই উক্ত বিশৃঙ্খল ভাব নিবারণের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্রব্য পদার্থ বিভাগ বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের সহিত মীমাংসকের কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে দ্রব্য নববিধ; কিন্তু মীমাংসক মতে দ্রব্য দশবিধ,—তাঁহাদের মতে অন্ধকারও একটী অতিরিক্ত দ্রব্য, তাঁহাদের যুক্তি এই,—

"তমস্তমালবর্ণাভং চলতীতি প্রতীয়তে,
রূপবত্বাৎ ক্রিয়াবত্বাৎ দ্রব্যন্তু দশমং তমঃ।"

অন্ধকার তমালপাত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, এবং একস্থান হইতে স্থানান্তরে অপসৃত হইতে দেখা যায়। সুতরাং যখন রূপ ও ক্রিয়া এই উভয় অন্ধকারে বিদ্যমান আছে, তখন উহাকে অবশ্যই দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই স্থলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বলেন যে, অন্ধকার আলোকের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে স্থলে আলোক না থাকে, সেই স্থলে নীলবর্ণের অনুভব হয়। যেরূপ কোন গভীরবিবরে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট বস্তু না থাকিলেও, উহার অনুভব হইয়া থাকে। আলোকের অপসরণ নিবন্ধনই অন্ধকারের চলত্ব প্রত্যয় হইয়া থাকে; তত্ত্বতঃ অন্ধকারে কোন রূপও নাই ও ক্রিয়াও নাই। আবার কতিপয় মীমাংসক একাদশ দ্রব্যবাদী। তাঁহাদের মতে শব্দ অতিরিক্ত নিত্য দ্রব্য। ধ্বন্যাদি ঐ শব্দরূপ দ্রব্যের ব্যঞ্জক, অর্থাৎ ধ্বন্যাদি দ্বারা শব্দরূপ নিত্য দ্রব্য প্রকাশিত হয়। নৈয়ায়িক বৈশেষিকের নিকট এই মতেরও সমীচীনত্ব নাই; কারণ, শব্দ দ্রব্য হইলে, উহার পরিমাণাদি গুণের কল্পনা করিতে হয়, এবং ধ্বন্যাদিরও ব্যঞ্জকত্ব কল্পনা করিতে হয়; তাহাতে অনেক কল্পনা-গৌরব হয়। পদার্থ সংশয় স্থলে লাঘব পক্ষই উপাদেয়, আর গৌরব পক্ষ হেয়। সুতরাং ঐ মতেরও সমীচীনত্ব নাই। তন্তু প্রভৃতি অবয়বের সহিত পট প্রভৃতির যে সম্বন্ধ এবং দ্রব্যের সহিত গুণ-ক্রিয়া-জাতির ও গুণ কর্ম্মের

সহিত জাতির এবং পরমাণুর সহিত বিশেষের যে সম্বন্ধ উহাই সমবায়। এই সমবায় সম্বন্ধ স্বীকারে অনুমানই একমাত্র প্রমাণ। অনুমানের প্রণালী এইরূপ ঃ—বিশিষ্ট বুদ্ধিমাত্রই কোন বিশেষ্যে কোন বিশেষণের একটী সম্বন্ধকে বিষয় করিয়া থাকে ; যেরূপ পুরুষদণ্ডী এই বিশিষ্ট বুদ্ধি পুরুষরূপ বিশেষ্যে দণ্ডরূপ বিশেষণের পরস্পর সংযোগরূপ সম্বন্ধকে বিষয় করে দেখা যাইতেছে। সেইরূপ পট নীলরূপবিশিষ্ট এই বিশিষ্ট বুদ্ধিও যে পটরূপ বিশেষ্যে নীলরূপাত্মক বিশেষণের কোন সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ সম্বন্ধই সমবায়। এই স্থলে সংযোগ সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াছে, ইহা বলা যায় না ; কারণ, যে বিশেষ্যে যে বিশেষণের সংযোগ সম্বন্ধ বিষয় হয়, সেই বিশেষ্য হইতে সেই বিশেষণের কদাচিৎ বিচ্ছিন্ন ভাব হইয়া থাকে। যেরূপ পুরুষ হইতে দণ্ডের বিচ্ছিন্ন ভাব কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যখন পটস্বরূপ বিশেষ্য হইতে নীলরূপাত্মক বিশেষণের কদাচ বিচ্ছিন্ন ভাবের সম্ভাবনা নাই, তখন ঐ স্থলে সংযোগাতিরিক্ত সম্বন্ধ যে বিষয় হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং ঐ সম্বন্ধই সমবায় পদে অভিহিত। ভূতলাদি দেশে ঘটাদির অবিদ্যমানতাবস্থায় যখন ভূতলাদিদেশে ঘটাদি নাই, এই সর্ব্ব সাধারণের অনুভবে ঘটাদির অভাব বিষয় হইতেছে, তখন অভাব যে একটী পদার্থ ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, অলীক বিষয় কখনও সাধারণের অনুভবের গোচর হইতে পারে না। এই স্থলে কপিল বলেন যে, অভাব অধিকরণকৈবল্য ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে, যে সময়ে ভূতলাদি দেশে ঘটাদি বিদ্যমান না থাকে, সেই সময়ে ঘটাদি বিশেষণ ভাবে ভূতলের অস্তিত্ব অনুভূয়মান হয় ; আর যে সময়ে ভূতলাদি দেশে ঘটাদি বিদ্যমান না থাকে, সেই সময়ে কৈবল্যভাবে ভূতলের অর্থাৎ কেবল ভূতলের অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং কৈবল্যই অভাব পদে অভিহিত। অভাব অতিরিক্ত পদার্থ নহে। এই বিষয়ে যদি অতিরিক্ত অভাবপদার্থবাদিগণ কপিলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কৈবল্য পদার্থ কি ? তাহা হইলে বোধ হয় কপিলকেও চরমে অভাবপদার্থ স্বীকার করিয়াই কৈবল্য পদার্থ নির্ব্বচন করিতে হইবে। যাহা হউক ঋষিদিগের সহিত ঋষিদিগের মতভেদ, এই বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। মতভেদে বরং আমাদের সুবিধাই আছে, কারণ, যে

সময়ে অভাব খণ্ডনের প্রয়োজন হইবে, সেই সময়ে আমরা কপিলের মত অবলম্বন করিব। যে সময়ে অভাব সংস্থাপনের প্রয়োজন হইবে, সেই সময়ে গৌতম কণাদের মত অবলম্বন করিব। গৌতম যে ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ষোড়শ পদার্থ এই,—প্রমাণ প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, স্থল, জাতি, নিগ্রহস্থান ; এই ষোড়শ পদার্থ—প্রশস্তপাদাচার্য্যের মতে দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থে অন্তর্ভুক্ত। যথার্থ অনুভবের অসাধারণ কারণই প্রমাণ পদার্থ। এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ভেদে চতুর্বিধ। বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষমূলক যে জ্ঞান উহাই প্রত্যক্ষপ্রমিতি। ইহার গুণে, ও ঐ প্রত্যক্ষপ্রমিতিকরণ ইন্দ্রিয়গণের দ্রব্যে অন্তর্ভাব। অনুমাপক ধূমাদি হেতুতে অনুমেয় বহ্ন্যাদি বস্তুর অবিনাভাব সম্বন্ধজ্ঞানমূলক যে অবধারণ, ইহা অনুমান। গবাদিপশুর সাদৃশ্য দর্শনমূলক গবয়াদি পশুর স্থিরীকরণ উপমান। বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য শ্রবণমূলক যে বাক্যার্থের অনুভব উহা শব্দপ্রমাণ। এই প্রমাণত্রয়ের গুণে অন্তর্ভাব। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, রাগ-দ্বেষাদি দোষ, প্রেত্যভাব অর্থাৎ মরণোত্তর পুনঃ পুনঃ জন্ম, সুখ-দুঃখের উপভোগরূপ ফল, দুঃখ, অপবর্গ এই দ্বাদশবিধ প্রমেয়। এই দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের মধ্যে আত্মা, শরীর, ও ইন্দ্রিয়ের দ্রব্যে অন্তর্ভাব। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই কয়েকটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ইহাদের গুণে ; বুদ্ধির গুণে, মনের দ্রব্যে, প্রবৃত্তির গুণে, রাগ-দ্বেষ-মোহপদপ্রতিপাদ্য ইচ্ছা, দ্বেষ মিথ্যাজ্ঞান স্বরূপ দোষের, গুণে অন্তর্ভাব। 'প্রেত্য মৃত্বা ভাবো জননং' এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা মরণোত্তর পুনর্জন্মই প্রেত্যভাব শব্দের অর্থ ; প্রাণশরীরের চরম সংযোগনাশই মরণ, এবং প্রাণশরীরের আদ্যসংযোগই জন্ম। সুতরাং প্রেত্যভাব পদার্থের গুণেই অন্তর্ভাব। সুখ, দুঃখ সাক্ষাৎকার রূপ মুখ্যফলের গুণে, গৌণ মুখ্য সাধারণ জন্যবস্তু মাত্র রূপ যে ফল উহার দ্রব্যাদিতে, পীড়ারূপ দুঃখের গুণে অন্তর্ভাব। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই অপবর্গ পদার্থ। সুতরাং উহার অভাবে অন্তর্ভাব। একস্থানে ভাব ও অভাবের যে জ্ঞান অর্থাৎ এই বস্তু স্থাণু বা পুরুষ এইরূপ যে জ্ঞান, উহাই সংশয় ; এই সংশয়ের গুণে অন্তর্ভাব। যে অর্থকে উদ্দেশ করিয়া লোক সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়,

সেই অর্থই প্রয়োজন ; এই প্রয়োজন মুখ্যও গৌণভেদে দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখা-ভাব এই দুইটী মুখ্য প্রয়োজন ; সুখ বা দুঃখাভাবের উপায় সকল গৌণ প্রয়োজন। ইহাদের যথাযথ দ্রব্যাদিতেই অন্তর্ভাব। যে বিষয় বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মত তাহাই দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত, বিচারদশাতে অবশ্য উদ্ভাবনীয়। এই দৃষ্টান্তেরও যথাযথরূপে দ্রব্যাদিতেই অন্তর্ভাব। শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থই সিদ্ধান্ত। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত, অভ্যুপ-গমসিদ্ধান্ত ভেদে এই সিদ্ধান্ত চারি প্রকার। সকল শাস্ত্রদ্বারা যাহা প্রতি-পাদিত হয়, অর্থাৎ কোন শাস্ত্রই যাহার অঙ্গীকারে প্রতিকূল নহে, সেই বিষয়ই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেরূপ ঘ্রাণাদির ইন্দ্রিয়ত্ব, গন্ধাদির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, পৃথিব্যাদির ভূতত্ব সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। বাদী ও প্রতিবাদীর একতরমাত্রের অঙ্গীকৃত যে বিষয়, উহাই একতরের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত ; যেরূপ মীমাংসকদিগের শব্দনিত্যত্ব, অর্থাৎ শব্দের নিত্যতা মীমাংসকগণেরই শাস্ত্রসম্মত, অন্যের নহে। অতএব উহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত ; সুতরাং উহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যে বিষয়ের সিদ্ধি হইলে, অন্য প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধি হয়, সেই বিষয়ই অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। যেরূপ নিখিল জগতের ঈশ্বর কর্ত্তৃকত্ব সিদ্ধ হইলে, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয়, কারণ, ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্ব না থাকিলে নিখিল জগতের কর্ত্তৃত্ব অসম্ভাবিত হয়, সুতরাং ঐ বিষয় অধিকরণসিদ্ধান্ত। শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে অনুল্লিখিত বিষয় যদি শাস্ত্রার্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা পরিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ পরিপ্রাপ্ত বিষয় অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। যেরূপ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব। উহা গৌতমের শাস্ত্রে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত না হইলেও, গৌতমের শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্য ইহা স্থিরীকৃত হইবে যে, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব গৌতমের অভিপ্রেত। ঐ সকল সিদ্ধান্তের যথাযথ দ্রব্যাদিতে অন্তর্ভাব। বিচারাঙ্গ ন্যায় পঞ্চাবয়বসম্পন্ন। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন এই পাঁচটী ন্যায়াবয়ব। সাধনীয় বিষয়ের যে নির্দ্দেশ, উহা প্রতিজ্ঞা। যেরূপ এই পর্ব্বতে বহ্নি বিদ্যমান আছে, এইরূপ বাক্য প্রতিজ্ঞা। সাধনীয় বহ্ন্যাদি বস্তুর জ্ঞাপক ধূমাদির যে নির্দ্দেশ, উহা হেতু, যেরূপ এই পর্ব্বতে বহ্নির বিদ্যমানতার জ্ঞাপন কি, এই আকাঙ্ক্ষায় বহ্নির জ্ঞাপকত্বরূপে ধূমাদির যে নির্দ্দেশ ইহাই হেতু। দৃষ্টান্তের উল্লেখযোগ্য যে অবয়ব অর্থাৎ যে অবয়বে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায় সেই অবয়বই উদাহরণ,

যেরূপ যে যে স্থানে ধূমের বিদ্যমানতা সেই সেই স্থানে বহ্নিরও বিদ্যমানতা যথা পাকশালাদি; এই বাক্য উদাহরণ। এই পর্ব্বতাদিতে ধূমাদি হেতুর বিদ্যমানতা আছে, এইরূপ নির্দ্দেশ উপনয়। সেইহেতু এই পর্ব্বতাদিতে বহ্ন্যাদির বিদ্যমানতা আছে, এইরূপ উপসংহার বাক্য নিগমন। এই পঞ্চাবয়ব বাক্যের গুণে অন্তর্ভাব। ব্যাপ্যের অর্থাৎ নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুর আরোপা-ধীন ব্যাপকের যে আরোপ, উহা তর্ক। এই জলাশয়ে যদি ধূমের বিদ্যমানতা থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য বহ্নিরও বিদ্যমানতা থাকিত ; এইরূপ মানস প্রত্যক্ষই তর্কপদে অভিহিত। এই তর্কের ফল সংশয়নিবৃত্তি। কোন জলাশয়ে ধূমায়মান বাষ্প দর্শন করিয়া, এই জলাশয়ে ধূমের বিদ্যমানতা আছে কি না, এইরূপ সন্দিহান পুরুষ যদি ঐরূপ তর্কে সমর্থ হয়, তাহাহইলে ঐ পুরুষের ঐরূপ সংশয়নিবৃত্তি হয়। ঐ তর্ক মানসপ্রত্যক্ষ বিশেষ ; সুতরাং উহারও গুণে অন্তর্ভাব। যে কোন প্রকারে অর্থের যে অবধারণ, উহাই নির্ণয় পদে অভিহিত। এই নির্ণয়ের গুণে অন্তর্ভাব। তত্ত্ব নির্ণয় বা জয়লাভ, এই উভয়ের একতর সাধনে সমর্থ ন্যায়সঙ্গত যে বচনসন্দর্ভ, উহাই বিচারপদে অভিহিত। যাঁহারা তত্ত্বনির্ণয় বা জয়লাভ, এই উভয়ের একতরা-ভিলাষী ও সর্ব্বজনসিদ্ধ অনুভবের অপলাপ করেন না, শ্রবণাদিতে পটু এবং অকলহকারী ও বিচারোপযোগী বাদপ্রতিবাদরূপ ব্যাপারে সমর্থ, তাঁহারাই ঐ বিচারে অধিকারী। ঐ বিচার বাদ, জল্প, বিতণ্ডা ভেদে তিন প্রকার। পরস্পর জিগীষাশূন্য কেবল তত্ত্বনির্ণয়ার্থ যে বাদপ্রতিবাদ, ইহাই বাদবিচার। ঐ বিচারত্রয়ের মধ্যে বাদবিচরাই সমীচীন। কারণ, এই বিচারদ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। জল্প ও বিতণ্ডাদ্বারা বাদী ও প্রতিবাদীর একতর মাত্রের জয়-লাভহয়। প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব নির্ণীত হয় না। সুতরাং ঐ বিচারদ্বয় অসমীচীন। আবার ঐ বিচারদ্বয়ের মধ্যে বিতণ্ডাবিচার অত্যন্ত অসমীচীন। কারণ জল্পবিচারে নিজপক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক পরপক্ষে দোষোদ্ভাবন হয়। কিন্তু বিতণ্ডাবিচারে নিজপক্ষ স্থাপন হউক বা না হউক, পরপক্ষে দোষোদ্ভাবনই একমাত্র উদ্দেশ্য। এইক্ষণে সভাতে পণ্ডিত মহোদয়গণের যে বিচার হয়, ঐ বিচার সর্ব্বত্র জল্প বা বিতণ্ডাবিচারে পরিণত হয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোন স্থলেই বাদবিচার পরিলক্ষিত হয় না। এই জন্যই বিচার শুশ্রূষুমহোদয়গণ ইদানীন্তন পণ্ডিত মহোদয়গণের

বিচার শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হন না। ধর্ম্মতত্ত্বসন্দিহান ধার্ম্মিক মহোদয়গণ পণ্ডিতগণের বিচারদ্বারাই ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় দূরে থাকুক, পণ্ডিতমহোদয়গণের বিচার শ্রবণের পর ধর্ম্মতত্ত্বসংশয় অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া থাকে। যাঁহারা আমাদের শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারা মনে করেন যে, আমাদের শাস্ত্রীয় বিচার প্রণালীই এইরূপ অসমীচীন। কিন্তু তাহা নহে। পণ্ডিত মহোদয়গণের জিগীষাদোষেই ইদানীন্তন বিচারপ্রণালী অসমীচীনভাবে পরিস্ফুট হয়। শাস্ত্রের কোন অপরাধ নাই। প্রবন্ধগৌরবভয়ে শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল না। প্রবন্ধান্তরে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা তত্ত্ববুভুৎসু ও যথার্থবাদী, অনর্থক বিবাদেচ্ছাশূন্য, এবং যথাকালে যাঁহাদের বাদ প্রতিবাদের পরিস্ফূর্ত্তি হয় এবং যাঁহারা অনর্থক পূর্ব্বপক্ষদ্বারা সময় অতিবাহিত না করেন, ও যাঁহারা যুক্তসিদ্ধ বিষয়ের অপলাপ করেন না, তাঁহারাই শাস্ত্রীয় বাদবিচারে অধিকারী। বাদবিচারের সভা ও মধ্যস্থ এবং রাজপুরুষের বিদ্যমানতার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু জল্প ও বিতণ্ডা বিচারে সভা ও মধ্যস্থের আবশ্যকতা, এবং বিচারসভাতে শান্তিরক্ষার জন্য রাজপুরুষের বিদ্যমানতা আবশ্যক। নিজপক্ষ স্থাপনানন্তর পরপক্ষদূষণার্থ বাদী প্রতিবাদীর জিগীষাপূর্ব্বক যে বাদ প্রতিবাদ উহাই জল্প। নিজপক্ষ স্থাপনা না করিয়াই পরপক্ষদূষণার্থ বাদী প্রতিবাদীর জিগীষাপূর্ব্বক যে বাদ প্রতিবাদ উহাই বিতণ্ডা। এই বিচারত্রয়ের গুণে অন্তর্ভাব। অনুমানার্থপ্রযুক্ত হেতু দুইরূপ, অদুষ্ট ও দুষ্ট। যে হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ নাই, সেই হেতু অদুষ্ট অর্থাৎ সদ্ধেতু; যেরূপ পর্ব্বতে বহ্নিসাধনার্থ ধূমহেতু সর্ব্বাংশে সদ্ধেতু। এবং যে সকল হেতুতে ব্যভিচারাদি দোষ আছে, সেই সকল হেতুই দুষ্ট। এই দুষ্ট হেতুই হেত্বাভাস পদে অভিহিত। যে সকল হেতু বাস্তবিক হেতু না হইয়া, হেতুর ন্যায় আভাস পায়, অর্থাৎ প্রকাশ পায়, তাহারাই হেত্বাভাস; এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনৈকান্তিক, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষিত' ও বাধিত ভেদে হেতুর দোষ পাঁচ প্রকার। যে হেতুতে সাধনীয় বস্তুর সহিত নিয়ত সম্বন্ধ নাই, এবং সাধনীয় বস্তুর অভাবের সহিতও নিয়ত সম্বন্ধ নাই, সেই হেতু অনৈকান্তিক; যেরূপ ধূম সাধনার্থ প্রযুক্ত বহ্নিহেতু।

যে হেতু সাধনীয় বস্তুর সহিত কোন একস্থানে অবস্থান না করে, সেই হেতু বিরুদ্ধ, যেরূপ গোত্ব সাধনার্থ প্রযুক্ত অশ্বত্ব হেতু। পক্ষে অর্থাৎ সাধনীয় বস্তুর যে স্থানে সিদ্ধি হয়, সেই স্থানে ঐ সাধনীয় বস্তুর সাধনার্থ প্রযুক্ত যে হেতু অবস্থান না করে, সেই হেতু অসিদ্ধ; যেরূপ জলাশয়ে বহ্নি সাধনার্থ প্রযুক্ত ধূমহেতু। যদি এক সময়ে একস্থানে ভাব ও অভাব সাধনার্থ হেতু-দ্বয় বাদিপ্রতিবাদিকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ হেতুদ্বয়ই সৎপ্রতি-পক্ষিত হয়। যেরূপ পর্ব্বতে বহ্নি সাধনার্থ বাদিকর্ত্তৃক প্রযুক্ত ধূমহেতু; এবং ঐ স্থলে বহ্নির অভাব সাধনার্থ প্রতিবাদিকর্ত্তৃক প্রযুক্ত পাষাণময়ত্ব হেতু, এই হেতুই সৎপ্রতিপক্ষিত। যে স্থানে যে বস্তু নাই, ভ্রমক্রমে সেই স্থানে সেই বস্তু সাধনের জন্য যদি কোন হেতু প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই হেতু বাধিত হয়। যেরূপ জলাশয়ে বহ্নি সাধনার্থ প্রযুক্ত জল হেতু। এই হেত্বাভাসের যথাযথ দ্রব্যাদিতে অন্তর্ভাব।

বক্তার তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত অর্থের পরিকল্পনাদ্বারা যে দোষানুসন্ধান উহাই ছল। যেরূপ কোন ব্যক্তি প্রয়োগ করিলেন যে, এই মনুষ্য নেপাল দেশ হইতে আগত, কারণ ইহার নিকট নবকম্বল রহিয়াছে। ইহাতে যদি কোন ছলবাদী নবশব্দের নূতনত্বরূপ অর্থের গোপন করিয়া, নব সংখ্যারূপ অর্থের পরিকল্পনপূর্ব্বক বলেন যে, এই মনুষ্যের নিকট নবসংখ্যক কম্বল নাই, সুতরাং এই মনুষ্য নেপাল দেশ হইতে আগত নহে। তাহাহইলে এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ ছলানুসন্ধানে পরিণত হয়। এই দোষারোপরূপ ছলেরও গুণে অন্তর্ভাব। অসদুত্তরই জাতিপদার্থ। অনেক লোকের এইরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, তাহারা প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের সদুত্তর দানে অসমর্থ হইলে, নানাপ্রকার অসদুত্তর দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐ অসদুত্তরই জাত্যুত্তর পদে অভিহিত। এই জাতিরও গুণে অন্তর্ভাব। বিচারকালে বাদী বা প্রতিবাদীর কোনরূপ স্খলন হইলেই বাদী বা প্রতিবাদী বিচারে পরাজিত হয়, ঐ স্খলনই নিগ্রহস্থান পদে অভিহিত। এই নিগ্রহ স্থান দ্বাবিংশতি প্রকার। জল্প বা বিতণ্ডা বিচারেই উহা ধর্ত্তব্য, বাদ বিচারে নহে। কারণ, বাদবিচারে বাদী বা প্রতিবাদীর কোনরূপ জিগীষা নাই।

ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতম প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ এই প্রমাণ চতুষ্টয়

বাদী। এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে অবলম্বন করিয়া গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণি নামক প্রমাণগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ প্রমাণগ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অনুমানপরিচ্ছেদ, তৃতীয় উপমানপরিচ্ছেদ, চতুর্থ শব্দপরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ প্রমিতির, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমিতিপ্রমিতির, তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপমিতিপ্রমিতির, চতুর্থ পরিচ্ছেদে শাব্দ প্রমিতির লক্ষণ, কারণ ও প্রমাণ্যাদি স্থিরীকৃত হইয়াছে। উক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়া মিথিলাদেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা হউক্ তিনি যে ষড়্দর্শনটীকাকৃৎ বাচস্পতিমিশ্রের পরবর্ত্তী, ইহা তাঁহার প্রবন্ধদ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। যেহেতু তিনি নিজ প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বাচস্পতি মিশ্রের প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত তত্ত্বচিন্তামণির প্রথম টীকাকার জয়দেব মিশ্র। তাঁহার অপর নাম পক্ষধর মিশ্র। রঘুনাথ শিরোমণি অধ্যয়নচ্ছলে যাঁহার নিকট গমন করিয়া বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। পক্ষধরমিশ্রের সময় বাসুদেব সার্ব্বভৌমও একজন তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার ছিলেন। তাঁহার টীকার নাম সার্ব্বভৌমনিরুক্তি। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি ভুবনবিজেতৃছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইয়া সকলের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতেই নবদ্বীপ গুরুস্থান বলিয়া ভুবনবিখ্যাত হইয়াছিল। জয়দেব মিশ্রকৃত টীকার নাম আলোক। যেহেতু ঐ আলোক তত্ত্বচিন্তামণির টীকা, সেই হেতু আলোক নামেরও সার্থকতা হইয়াছে। মণিকে প্রকাশ করিতে আলোক ভিন্ন কাহারই সামর্থ্য নাই। পরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রধান ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি তত্ত্বচিন্তামণির দীধিতি নামে এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ টীকার দীধিতি নামেরও সার্থকতা আছে। কারণ, দীধিতি ব্যতিরেকে মণি প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। রঘুনাথ শিরোমণি গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক। উক্ত শিরোমণি তত্ত্বচিন্তামণিকে অধিকার মাত্র করিয়া টীকাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ টীকাগ্রন্থকে তত্ত্বচিন্তামণি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি দর্শনবিষয়ে অদ্বিতীয় লেখক ছিলেন। ন্যায়দর্শন অনেকে অধ্যয়ন করেন

ও কৌতুকবশতঃ তদ্বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়নও করিয়া থাকেন; কিন্তু ন্যায় দর্শনের যে রহস্য তাহা কোন সুধীই জানিতে সমর্থ হন নাই। আমার বিশ্বাস, যদি কোন সুধী ন্যায়দর্শনের রহস্য বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক শিরোমণিই রহস্য বুঝিয়াছিলেন। শিরোমণিও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন,—

"ন্যায়মধীতে সর্ব্বস্তনুতে কুতুকান্নিবন্ধমপ্যত্র।
অস্য তু কিমপি রহস্যং কেবলং বিজ্ঞাতুমীশতে সুধিয়ঃ॥"

আরও শিরোমণি বলিয়াছিলেন যে,—

"মান্যান্ প্রণম্য বিহিতাঞ্জলি রেষ ভূয়ো ভূয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি।
দূষ্যং বচো মম পরং নিপুণং বিভাব্য ভাবাববোধবিহিতো ন দুনোতি দোষঃ॥"

আমি মান্যব্যক্তিদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বার বার নিবেদন করি, যদি আমার বাক্য দূষ্য হয়, তাহাহইলে আমার বাক্যে দোষোদ্ভাবন করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র বক্তব্য নাই, তবে ইহাই বক্তব্য যে, নিপুণভাবে চিন্তা করিয়া দোষোদ্ভাবন করিবেন। কারণ, ভাব বুঝিয়া দোষোদ্ভাবন করিলে কোন সন্তাপের সম্ভাবনা থাকে না। এই শিরোমণিসন্দর্ভের কোন টীকাকার শিরোমণির ভাব বর্ণন করিয়াছেন যে,—

"নিপুণতরবিভাবনয়া দোষাঃ স্বয়মেব যাস্যন্তীতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ আপাততঃ দোষ মনে হইলেও নিপুণতর চিন্তার পর দোষ স্বয়ং মন হইতে চলিয়া যাইবে। আরও বলিয়াছেন যে,—

"বিদুষাং নিবহৈরিহৈকমত্যাদ্ যদদুষ্টং নিরটঙ্কি যচ্চ দুষ্টং।
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব।"

পূর্ব্বতন বিদ্বদ্গণ ঐকমত্য পূর্ব্বক যাহা অদুষ্ট ও যাহা দুষ্ট বলিয়া স্থির করিয়াছেন, রঘুনাথ শিরোমণির নিকট তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, অর্থাৎ যাহা অদুষ্ট তাহা দুষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা দুষ্ট তাহাই অদুষ্ট হইয়াছে। আপাততঃ এই বাক্যদ্বারা রঘুনাথ শিরোমণির কিঞ্চিৎ অহঙ্কার প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু তাহা নহে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, কার্য্যতঃ তাহাই তিনি দেখাইয়াছেন।

পরে তার্কিকাগ্রণী মথুরানাথ তর্কবাগীশ চারিখণ্ড তত্ত্বচিন্তামণির টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার টীকার নাম রহস্য। এই নামেরও সার্থকতা

আছে। কারণ, মথুরানাথের টীকা মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, মথুরানাথ তত্বচিন্তামণির রহস্যোদ্ভেদ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি তত্বচিন্তামণির অন্তর্গত প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই খণ্ড মাত্রের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু মথুরানাথ চারিখণ্ড তত্বচিন্তামণির অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি খণ্ডেরই টীকা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মথুরানাথ শিরোমণিকৃত দীধিতিগ্রন্থের ও উদয়নাচার্য্যকৃত ন্যায়কুসুমাঞ্জলি এবং বৌদ্ধাধিকারের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, ও আলোকের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন। মথুরানাথ যে সকল টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি মাত্র করিতে হইলেও একজনের জীবনে কুলায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু তিনি ঐ সকল গ্রন্থের চিন্তা করিয়া কিরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। আমরা আবার পণ্ডিত বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। তবে যদি বলেন যে, "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে"। যে দেশে অন্য কোন বৃক্ষ নাই সেই দেশে এরণ্ড বৃক্ষই বৃক্ষ রূপে পরিচিত হইয়া থাকে, এক্ষণে আমরাও তদ্রূপ, তাহা হইলে কোন বক্তব্য নাই।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রথম শিরোমণিকৃত দীধিতির টীপ্পনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত কারকচক্র প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও ভবানন্দ প্রণীত। এ পর্য্যন্তও কারকচক্রের পঠন পাঠনার প্রচার অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। পরে জগদীশ তর্কালঙ্কার শিরোমণিকৃত দীধিতির টিপ্পনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেক গ্রন্থের ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ও অন্যান্য গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় নাই। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নামক যে গ্রন্থ, উহা অত্যন্ত উপাদেয়। উহার মূল্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বত্র পঠন পাঠনায় প্রচারিত আছে। যেরূপ প্রবাদ আছে যে, "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বং অভিজ্ঞানশকুন্তলা"। সেইরূপ প্রবাদ আছে যে, 'জগদীশস্য সর্ব্বস্বং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা"। তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকা দ্বারা অসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ছাত্রদিগের পাঠের ক্ষতি করিয়া কোনস্থানে যাইতেন না। তিনি ছাত্রবর্গ ও পরিবারবর্গের সহিত নিজের আহারাদি নির্ব্বাহের জন্য ৩৬০ ঘর শিষ্য করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক শিষ্যকে এই ভার দিয়াছিলেন যে, 'তোমরা প্রত্যেকে বৎসরের মধ্যে একদিন আমার ও ছাত্রবর্গ এবং পরিবারবর্গের ভোজনোপযোগী ব্যয়ভার গ্রহণ করিবে। তৎকালে শিষ্যবর্গও অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত অবনতমস্তকে গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আজ্ঞানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। জগদীশের বিলাসিতা ছিল না। তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলনজনিত আনন্দে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া চরমে অবশ্যই নিতানন্দধামে বিরাজ করিতেছেন। উত্তরোত্তর এইরূপ অনেক বিলাসশূন্য পুরুষ নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "বুনো"রামনাথ নামে বিখ্যাত এক মহাত্মা নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারও কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না। তিনি অনায়াসলব্ধ শাকাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তথাপি অর্থলোলুপ হইয়া কোনস্থানে গমন করিতেন না। অনেক মহাত্মা তাঁহাকে নিজবাটীতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকের চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কেবল ধার্ম্মিককুলতিলক মহারাজ নবকৃষ্ণবাহাদুরমহোদয়ের এক বিচারসভাতে তিনি মহারাজের বিদ্যানুরাগিতাগুণে আকৃষ্ট হইয়া একবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এক্ষণে বিলাসী হইয়াই অনির্ব্বচনীয় দুঃখে কাল অতিবাহিত করিতেছি। ভাবিয়া দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, বিলাসিতাই আমাদের সকল অনর্থের একমাত্র মূল।

জগদীশ তর্কালঙ্কারের জীবদ্দশাতেই গদাধর ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপপ্রদীপ পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺ ভুবনমোহন বিদ্যারত্নমহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। গদাধর ভট্টাচার্য্য হরিরাম ভট্টাচার্য্যের ছাত্র। প্রবাদ আছে যে, গদাধর ভট্টাচার্য্যের পাঠ সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই, তাঁহার অধ্যাপক পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাপকের পত্নী, স্বামীর মুখে গদাধরের প্রশংসা শুনিয়া, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গদাধর ছাত্রদের মধ্যে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র। সেই জন্য তিনি স্বামীর পরলোক গমনের পর গদাধরকে অনুরোধ করিলেন যে, তুমি ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এই চতুষ্পাঠী রক্ষা কর। গদাধর গুরুপত্নীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাহাই স্বীকার

করিলেন। ছাত্রবৃন্দও গুরুপত্নীর আজ্ঞানুসারে গদাধরের নিকট অধ্যয়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে ছাত্রবৃন্দ গদাধরের নিকট অধ্যয়ন করিয়া যাদৃশ প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াও তাদৃশ প্রীতি অনুভব করিতে পারেই নাই। সেই সময়েই গদাধর অভিনব প্রণালীতে শিরোমণিকৃত দীধিতীর টিপ্পনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জগদীশের টিপ্পনী অপেক্ষা গদাধরের টিপ্পনী যদিও অধিক বিস্তৃতভাবে রচিত হইয়াছিল, তথাপি যেরূপ অভিনব প্রণালীতে গদাধরের টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অভিনব প্রণালীতে কোন টিপ্পনীকারের টিপ্পনী রচিত হয় নাই। ব্যপ্তিকাণ্ডে জগদীশের টিপ্পনী, জ্ঞানকাণ্ডে গদাধরের টিপ্পনী অধিক চমৎকারিণী। এই জন্যই এইক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিকাণ্ডে জগদীশকৃত টিপ্পনী, এবং জ্ঞানকাণ্ডে গদাধরকৃত টিপ্পনী পঠন পাঠনায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত গদাধর ব্যুৎপত্তিবাদ, শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, স্বর্গবাদ, বিবাহ-বাদ, বিধিস্বরূপ নিযোজ্যান্বয়ী প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থের পঠন পাঠনায় প্রচার প্রায় সর্ব্বত্র আছে। নবদ্বীপে গদাধর ভট্টাচার্য্যই শেষ গ্রন্থকার। তাঁহার পর কোন গ্রন্থকার নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। গ্রন্থকর্ত্তা জন্মগ্রহণ না করিলেও শঙ্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতি তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য নবদ্বীপ সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐ সকল গ্রন্থকর্ত্তাদের টীকা টিপ্পনী দ্বারা ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, এইরূপ অন্য কোন দর্শনই হয় নাই। এবং ন্যায় দর্শনে কৃতবিদ্য না হইলে, অন্য দর্শনে কৃতবিদ্য হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প, এই জন্যই এই প্রদেশে ন্যায়শাস্ত্রের অধিক প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল। এক্ষণে যদিও অনেকে কাব্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াই কাব্যাদি শাস্ত্রের পঠন পাঠনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি আমার বিশ্বাস যে, তাঁহারা সাংখ্যাদি শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেও দার্শনিক ভাব বুঝিতে সমর্থ হন না। তবে এক্ষণে নির্ব্বিবাদ রাজ্য, এই রাজ্যে কেহই সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। তাহার কারণ, ধরা পড়িবার ভয় নাই। ধরিলেই বা কোন্ ব্যক্তি সেই বিষয়ে কর্ণপাত করিবে। পূর্ব্বকালে কোন শাস্ত্রের পণ্ডিত বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে, তাৎকালিক ধনীরা সেই শাস্ত্রে কৃতবিদ্য

মধ্যস্থ সন্নিধানে সেই শাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন পণ্ডিতের সহিত বিচার করাই-তেন। সুতরাং ধরা পড়িবার ভয় ছিল। এক্ষণে সে ভয় নাই। অতএব সকলেই অসঙ্কুচিতচিত্ত। এক্ষণে বিবাহাদি শুভকার্য্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভাই নাই। কোন কোন স্থানে আন্তশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সভা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সেই সভাতেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচার নাই। কোন পণ্ডিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেও, অধিকাংশ বাবুরা বলিয়া থাকেন যে, মহাশয় শুষ্ক চীৎকারের প্রয়োজন কি? বিদায় যাহা পাইবার তাহাই পাইবেন। সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কারবিভূষিতা নর্ত্তকী সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতেছে, তাহা শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করুন। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অবনতি আর কি হইতে পারে!

যেরূপ গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-পতঞ্জলি-ব্যাস-প্রণীত দর্শনের মূলসূত্র পাওয়া যায়, সেইরূপ কপিলপ্রণীত দর্শনের মূলসূত্র পাওয়া যায় না। তত্বসমাস নামক কয়েকটী সূত্র সুলভ হইলেও, উহা কপিলপ্রণীত কি না, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান। কারণ, শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্থানে স্থানে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকারই উল্লেখ করিয়াছেন। মূলসূত্র প্রাপ্ত হইলে, অবশ্য কোন স্থানে আচার্য্যগণ তাহার উল্লেখ করিতেন। সুতরাং সাংখ্য-কারিকাই এক্ষণে সাংখ্যশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ বলিয়া পরিগণনীয়।—যে কারিকার প্রামাণ্যবোধে ষড়্দর্শনের টীকাকৃৎ বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্ব-কৌমুদী নামে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু যে সাংখ্যসূত্র অবলম্বন করিয়া ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, মনোনিবেশপূর্ব্বক সে সূত্রগুলি পাঠ করিলে, ইহাই স্থিরীকৃত হইবে যে, এক একটী কারিকা ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে। "সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ নাভাবাৎ কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ"। এই একটী সাংখ্যকারিকার অর্দ্ধাংশ, এই স্থলে "সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধিঃ" এই একটী সূত্র, "কার্য্যদর্শনাৎ তদনুপলব্ধেঃ", এই আর একটী সূত্র।

"অসদকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যং॥"

এই একটী সাংখ্যকারিকা, এই স্থলে যথাক্রমে চারিটী সূত্র, "নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ" এই একটী সূত্র; "উপাদান নিয়মাৎ" ইহা তাহার পর

সূত্র। "সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ" ইহা তৃতীয় সূত্র। "শক্তস্য শক্যকরণাৎ" ইহা চতুর্থ সূত্র। এই কারিকা ও সূত্রগুলি দেখিলেই স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে যে, এক একটী কারিকা অবলম্বন করিয়াই অনেকগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে।

কপিল মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও শব্দ এই তিনটী মাত্র প্রমাণ। অন্যান্য প্রমাণ এই তিনেরই অন্তর্গত। প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে ঃ—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবং উপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ"॥

চার্ব্বাক মতে এক প্রত্যক্ষই প্রমাণ, এতদ্ব্যতিরিক্তের প্রামাণ্য নাই। তাঁহাদের মতে যে বস্তুর প্রত্যক্ষ না হয়, সে বস্তু অলীক। বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতৃকণাদমতে ও বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই উভয়ই প্রমাণ। এই উভয় প্রমাণের অগোচর বস্তু অলীক। সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতৃকপিলমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটীই প্রমাণ। এই প্রমাণত্রয়ের অগোচর বস্তু অলীক। কোন নৈয়ায়িক মতেও ঐ তিনটীই প্রমাণ। কোন নৈয়ায়িক মতে, অর্থাৎ গৌতম প্রভৃতির মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটীই প্রমাণ। কপিল উপমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তিনি বলেন বস্তুবিশেষের সাদৃশ্যজ্ঞানদ্বারা বস্তুবিশেষের অবধারণই উপমান। সুতরাং উহা সাদৃশ্যলিঙ্গক অনুমানদ্বারাই চরিতার্থ হইবে। উপমান স্বীকারের আর প্রয়োজন কি? আবার কণাদ বলেন যে, উপমান যেরূপ অনুমানের অন্তর্গত, সেইরূপ শব্দও অনুমানের অন্তর্গত; কারণ, বাক্য শ্রবণের পর বাক্যার্থ জ্ঞানই শব্দপ্রমাণমূলক। উহাও বাক্যলিঙ্গক অনুমানদ্বারা বাক্যার্থের অনুমান করিলেই চরিতার্থ হইতে পারে। অতিরিক্ত শব্দ প্রমাণেরই বা প্রয়োজন কি? ইহাতে গৌতম বলেন যে, অনুমান প্রমাণে অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞান অপেক্ষনীয়। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে,

যে পুরুষের উপমান উপমেয়ের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, এবং বাক্য ও বাক্যার্থের পরস্পর অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞান নাই—সেই পুরুষেরও উপমান দ্বারা উপমেয় স্থিরীকৃত হইতেছে, ও বাক্য শ্রবণের পর বাক্যার্থ স্থিরীকৃত হইতেছে, তখন উপমান ও শব্দ দুইটীকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। প্রভাকরমতাবলম্বী মীমাংসক বিশেষের মতে, প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি এই পাঁচটীই প্রমাণ। ভট্টমতাবলম্বী মীমাংসক ও বেদান্তমতে ঐ পাঁচ এবং অভাব অর্থাৎ অনুপলব্ধি এই ছয়টীই প্রমাণ। পৌরাণিকমতে ঐ ছয়টী এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য এই আটটীই প্রমাণ।

চার্ব্বাক অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। তাহাতে কপিল বলেন যে, ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া চার্ব্বাককে অনুমানের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যাহাকে উপদেশ দিতে হইবে, তাহার উপদেষ্টব্য বিষয়ে, সংশয়, বা ভ্রম আছে কিনা, তাহা না বুঝিয়া, যে কোন ব্যক্তির প্রতি কিছু উপদেশ দিলে, তাহার বাক্যে কেহ আদর করে না। তাহাকে বুদ্ধিমান্ লোক উন্মত্তের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব অপর পুরুষের অজ্ঞান, বা সংশয় অথবা ভ্রম তাহার অভিপ্রায় বিশেষদ্বারাই হউক বা বচন ভঙ্গী দ্বারাই হউক অনুমান করিয়া লইতে হইবে। প্রভাকর, ভট্ট, বেদান্তী ও পৌরাণিকগণ অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে অর্থাপত্তি এইরূপ;—অর্থতঃ যে অবধারণ, ফলতঃ অনুপপত্তি জ্ঞানমূলক যে অবধারণ, উহাই অর্থাপত্তি। যেরূপ এক ব্যক্তি দিবা-ভোজন করে না, অথচ স্থূলকায়, সেই স্থলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি রাত্রিতে অবশ্য ভোজন করিয়া থাকে; অন্যথা ঐ ব্যক্তির স্থূলকায়ত্বের অনুপপত্তি, অর্থাৎ ব্যাঘাত হইত, এইরূপ অনুপপত্তিজ্ঞানমূলক যে রাত্রিভোজিত্বের অবধারণ উহাই অর্থাপত্তি। এই স্থলে কপিল, নৈয়ায়িকও বৈশেষিক বলেন যে, অর্থাপত্তি অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, ঐ অনুপপত্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে অবিনাভাব সম্বন্ধজ্ঞান ভিন্ন অর্থাৎ দিবা ভোজনাভাববিশিষ্টের স্থূলকায়ত্বাভাব ও রাত্রি ভোজিত্বাভাব এই উভয়ের অবিনাভাবসম্বন্ধজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সুতরাং অবিনাভাবসম্বন্ধমূলক জ্ঞান বলিয়া, উহা অনুমানেরই অন্তর্গত। স্বাতন্ত্র্যে অর্থাপত্তির প্রামাণ্য নাই। প্রভাকর প্রভৃতির মতে অন্বয়ে অবিনাভাবসম্বন্ধ-জ্ঞানমূলক জ্ঞান অর্থাৎ বহ্নি ও ধূম এই উভয়ের অবিনাভাবসম্বন্ধজ্ঞানমূলক জ্ঞান অনুমান; ব্যতিরেকে অবিনাভাব সম্বন্ধজ্ঞানমূলক জ্ঞান অর্থাৎ বহ্নির অনুমান স্থলে বহ্ন্যভাব ও ধূমাভাব এই উভয়ের অবিনাভাবসম্বন্ধজ্ঞানমূলক জ্ঞান অনুমান নহে, সুতরাং অর্থাপত্তির প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য।

রঘুনাথশিরোমণিও অর্থাপত্তি জ্ঞানের উত্তরকাল 'অর্থাপয়ামি নত্বনু-মিনোমি', ইত্যাদি সাধারণের অনুভববলে অর্থাপত্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। ভট্ট ও বেদান্ত মতে অভাব অর্থাৎ অনুপলব্ধি একটী প্রমাণ। তাঁহারা বলেন, অভাবের প্রত্যক্ষে অনুপলব্ধি কারণ। অর্থাৎ এই দেশে যদি ঘট থাকিত, তাহা হইলে ঘটের উপলব্ধি হইত, এইরূপ ঘটাত্মক প্রতিযোগীর অনুপলব্ধিই ঘটাভাবের প্রত্যক্ষে কারণ। ইহাতে কপিল বলেন যে, অভাব যদি একটী বস্তু হইত, তাহা হইলে অভাবের প্রত্যক্ষে অনুপলব্ধি কারণ হইত। কিন্তু অভাব বস্ত্বন্তর নহে, অধিকরণকৈবল্য মাত্র; অর্থাৎ ভূতলাদি দেশে ঘটাদির বিদ্যমানতা অবস্থায় ভূতলাদি দেশ ঘটাদ্যুপরক্ত; আর ঘটাদির অবিদ্যমানতা অবস্থায় ভূতলাদিদেশ, ঘটাদ্যনুপরক্ত। ঐ ঘটাদ্যনুপরক্ততারূপ কৈবল্যই ঘটাভাব। এতদ্ব্যতিরিক্ত ঘটাভাব আর কিছুই নহে। সুতরাং ভূতলাদি দেশের প্রত্যক্ষকারণ সকল একত্রিত হইলে, যেরূপ ভূতলাদি দেশের ও তদ্গত রূপাদি অন্যান্য ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ ভূতলাদি দেশের আর একটী ধর্ম্ম যে ঘটাদ্যনুপরক্ততারূপ কৈবল্য, তাহারও ঐ সকল কারণদ্বারাই প্রত্যক্ষ হইবে। অনুপলব্ধিকে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এইস্থলে নৈয়ায়িক বলেন যে, কৈবল্য পদার্থ নির্ব্বচন করিতে হইলে, চরমে কপিলকেও অভাবের শরণ লইতে হইবে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে নৈয়ায়িক অনুপলব্ধির প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়াই অভাব প্রত্যক্ষের উপপাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, ঘটাদি প্রত্যক্ষে যেরূপ ঘটাদির সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ কারণ, সেইরূপ অভাব প্রত্যক্ষেও অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধই কারণ অনুপলব্ধির প্রামাণ্য স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। পৌরাণিকমতে সম্ভব ও ঐতিহ্য এই দুইটী অতিরিক্ত প্রমাণ। তাঁহারা বলেন যে, যে বস্তুর

অন্তর্ভূত যে বস্তু, সেই বস্তুর সম্ভব হইলে, অন্তর্ভূত বস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে। যেরূপ বৎসরের অন্তর্ভূত মাস, মাসের অন্তর্ভূত দিন, খারী পরিমাণের অন্তর্ভূত দ্রোণাঢ়কাদি পরিমাণ। এইস্থলে বৎসরের সম্ভব হইলে, মাস জ্ঞান, মাসের সম্ভব হইলে, দিনের জ্ঞান; এবং খারীপরিমাণের সম্ভব হইলে, দ্রোণাঢ়কাদি পরিমাণ জ্ঞান সম্ভবপ্রমাণমূলক। ইহাতে কপিল বলেন যে, যে বস্তুর অন্তর্ভূত যে বস্তু ঐ উভয় বস্তুর যখন অবিনাভাবসম্বন্ধ আছে, তখন অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞানমূলক ঐ জ্ঞান অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে পুরুষের অবিনা-ভাবসম্বন্ধ নাই, সেই পুরুষের সম্ভবপ্রমাণমূলক জ্ঞান হয়, ইহা বলা যায় না। যেহেতু অবিনাভাবসম্বন্ধ ব্যতিরিক্ত সম্ভব পদার্থ দুর্নিরূপণীয়। অর্থাৎ বৎসরের ঘটক মাস, মাস ঘটিত বৎসর, এই ঘটক ঘটিত ভাব নির্ব্বচন করিতে হইলে, অবিনাভাবসম্বন্ধের শরণ অবশ্য লইতে হইবে। সুতরাং সম্ভব অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। যে প্রবাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বক্তা নাই, কেবল বৃদ্ধপরম্পরায় শ্রুতমাত্র, সেই প্রবাদমূলক যে জ্ঞান, উহাই ঐতিহ্যপ্রমাণমূলক। যেরূপ এই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে, এই প্রবাদমূলক বটবৃক্ষে যক্ষের অবস্থিতিজ্ঞান ঐতিহ্য প্রমাণমূলক। এই বিষয়েও কপিল বলেন যে, যে প্রবাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বক্তা নাই, সেই প্রবাদ হইতে বস্তুর সংশয় ভিন্ন অবধারণ হইতে পারে না। সুতরাং সাংশয়িকত্ব নিবন্ধন ঐ প্রবাদের প্রামাণ্য হইতে পারে না। যে প্রবাদের নির্দ্দিষ্ট বক্তা আছে, সেই প্রবাদ শব্দপ্রমাণের অন্তর্ভূত। সুতরাং ঐতিহ্যেরও প্রমাণান্তরত্ব নাই।

কার্য্যদর্শনদ্বারা কারণ অবধারিত হইয়া থাকে। ঐ কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। বৌদ্ধমতে অসৎ হইতে, অর্থাৎ সৎ বলিয়া নির্ব্বচনের অযোগ্য অভাব হইতে সৎ, অর্থাৎ ভাববস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, যখন বীজনাশের পর অঙ্কুরকে উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে, দুগ্ধনাশের পর দধ্যাদিকে উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে, তখন ইহাদ্বারা ইহাই অনুমান হয় যে, সমস্ত ভাবকার্য্য অভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, পটোৎপত্তির পূর্ব্বে তন্তুর নাশ দৃষ্ট হয় না; অতএব সকল ভাবকার্য্য কিরূপে অভাব হইতে উৎপন্ন হইবে। এতদুত্তরে তাঁহারা বলেন যে, তৎকালে অন্তের অবস্থান্তর

প্রাপ্তিরূপ বিনাশ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে পটকালে ইহারা তন্তু, এইরূপ ব্যবহারেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। যখন পটকালে ঐরূপ ব্যবহারের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন না, কেবল পটব্যবহারেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন, তখন তৎকালে তন্তু সকল নষ্ট হইয়াছে, ইহা অনুমানদ্বারা স্থির করিয়া লইতে হইবে।

বৌদ্ধদর্শন মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাধ্যমিক সর্ব্বশূন্যতাবাদী। তিনি বলেন যে, ঘটাদি বস্তুর সত্ত্ব যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে ঘটাদির সত্ত্বের জন্য কুলালাদির ব্যাপারের বৈফল্য হয়। ঘটাদির অসত্ত্ব যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলেও অসৎ আকাশকুসুম যেরূপ কখনও সৎ হইতে পারে না, সেইরূপ ঘটাদিরও সত্ত্ব কখনও হইতে পারে না। সুতরাং সকল বস্তুরই অলীক শূন্যতায় পর্য্যবসান হয় মাত্র। এইস্থানে নৈয়ায়িক বলেন যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদ অত্যন্ত নির্যুক্তিক। কারণ, যদি সকল বস্তুই অলীক হয়, তাহা হইলে, মাধ্যমিকমতে প্রমাণও অলীক। যদি প্রমাণও অলীক হয়, তাহা হইলে অলীকদ্বারা কিরূপে সর্ব্বশূন্যতাবাদ সিদ্ধ হইবে। যদি সর্ব্বশূন্যতাবাদ-সাধক প্রমাণ সৎ হয়, তাহা হইলে ঐস্থানেই সর্ব্বশূন্যতাবাদের ব্যাঘাত হইল। যদি নিষ্প্রমাণক সর্ব্বশূন্যতাবাদ স্বীকার করিতে মাধ্যমিক কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে, তাঁহার মতে পূর্ণতাবাদ নিষ্প্রমাণক হইলেও, তাহা স্বীকার করিতেই বা তাঁহার আপত্তি কেন হয়, বুঝিতে পারি না। তাঁহার নিকট পূর্ণতাবাদই বা কিসে অপরাধী?

যোগাচার মতে বাহ্যার্থশূন্যতা, অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সকল অলীক। পরন্তু বিজ্ঞানবস্তুর সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বস্তু নাই। অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সকল বিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ। ঐ বিজ্ঞান স্বপ্রকাশ। কিন্তু উহার ভাবত্ব থাকায় ক্ষণিক। ফলকথা বিজ্ঞানের স্থায়িত্ব নাই। তাঁহাদের মতে যে বস্তু ভাব, সেই বস্তুই ক্ষণিক। এই বিষয়ে তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ, যে সময়ে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হয়, সেই সময় আমরা মনে করি যে, একটী মেঘই স্থায়িভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া অবশ্য ইহাই স্থির হইবে যে, ঐ মেঘ প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তনশীল। পরন্তু একটী মেঘের পরিবর্ত্তনের পরই তৎসজাতীয় অপর একটী মেঘ পূর্ব্বমেঘের স্থান অধিকার করায়, আমরা পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি না। সেইরূপ এই জগৎ প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু একের পরিবর্ত্তনের পরক্ষণেই তৎসজাতীয় অপর একটী পূর্ব্বস্থান অধিকার করায়, আমরা জগতের পরিবর্ত্তনও বুঝিতে পারি না। ঐ বিজ্ঞান দুইরূপ; প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। ঘটপটাদি বাহ্যবস্তুসকল প্রবৃত্তিবিজ্ঞান স্বরূপ। আত্মা আলয়বিজ্ঞান স্বরূপ। ঐ আলয়বিজ্ঞানের গাঢ়নিদ্রাবস্থাতেও সত্তা থাকে। অতএব আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ হইলে গাঢ়নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বিজ্ঞান না থাকায়, কিরূপে আত্মা বিদ্যমান থাকিবে, এই আপত্তিও স্থান পাইবে না। তৎকালে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান না থাকিলেও আলয়বিজ্ঞানের সত্তায় কোন বাধা হইবে না। মাধ্যমিকমতে স্বপ্রকাশ বিজ্ঞানবস্তুরও সত্তা যদি জগতে না থাকে, তাহাহইলে জগৎ অন্ধ হইয়া পড়ে। এই স্থলে নৈয়ায়িক বলেন যে, যোগাচারমতে নীলপীতাদি বস্তু যদি বিজ্ঞানের আকার হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত বস্তু যদি না থাকে, তাহা হইলে যে স্থলে নীলবস্তু ও পীতবস্তু এই উভয়কে বিষয় করিয়া একটী বিজ্ঞান হইয়াছে, ঐ স্থলে বিজ্ঞানের অভিন্নত্বনিবন্ধন নীলবস্তুও পীতবস্তু এই উভয়ের অভিন্নত্ব হয়, অর্থাৎ যে নীলাকার সেই পীতাকার হইয়া উঠে। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও যোগাচারকে বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বাহ্যবস্তু স্বীকার করিতে হইবে। সৌত্রান্তিক বলেন যে, বাহ্যবস্তু নাই, অর্থাৎ বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত বস্তু নাই। এই যোগাচারমতও অত্যন্ত নির্যুক্তিক। কারণ, বাহ্যবস্তুর দৃষ্টান্তেই বিজ্ঞানবস্তু সিদ্ধ করিতে হইবে। যদি বাহ্যবস্তু না থাকে, তাহা হইলে বাহ্যবস্তুর উপমানদ্বারা আভ্যন্তরিক বিজ্ঞানবস্তু সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। এবং "যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্ বহির্ব্বদবভাসতে" এই বাক্যেরও প্রামাণ্য থাকিতে পারে না। কারণ, বাহ্যবস্তু না থাকিলে বাহ্যবস্তুর ন্যায় এই উপমানকথন "শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া" মাথা নাই মাথা ব্যথার ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গত হয়। সুতরাং বাহ্যবস্তুরও অনুমানদ্বারা অবধারণ করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার মতে বাহ্য ও অবাহ্য উভয় বস্তুরই সত্তা আছে। পরন্তু উভয় বস্তুই অনুমান সিদ্ধ, কোনটীই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে, এবং উভয়বিধ বস্তুই ক্ষণিক। বৈভাসিক বলেন, সৌত্রান্তিকের মতও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, তাঁহার মতে যে

বাহ্যার্থের অনুমেয়ত্ববাদ, তাহাতে বাহ্যার্থের অনুমান করিতে হইবে। অনুমান করিতে হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান অর্থাৎ অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞান অপেক্ষনীয়। আবার অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞানে কতিপয় স্থানে সহচার দর্শন অপেক্ষনীয়। যদি প্রত্যক্ষগোচর কতিপয় স্থান না থাকে, তাহা হইলে অবিনাভাবসম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব হয়; সেই অভাবনিবন্ধন অনুমানে লোকের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। সুতরাং সৌত্রান্তিকের অনুমেয়ত্ববাদ কেবল বাদমাত্র,—কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মতে বাহ্য অবাহ্য উভয় বস্তুরই সত্ত্বা আছে। তন্মধ্যে বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অবাহ্য অর্থাৎ বিজ্ঞানবস্তু অনুমানসিদ্ধ। পরন্তু উভয় বস্তুই ক্ষণিক। তাঁহার মতে আবার বাহ্য অর্থ দুই প্রকার, গ্রাহ্য ও অধ্যবসেয়। তাঁহার মতে নির্ব্বিকল্পক রূপগ্রহণই প্রমাণ। কারণ, উহা কল্পনা জ্ঞান নহে অর্থাৎ উহাতে কোনরূপ কল্পনা নাই।—তাঁহাদের দর্শনেও ইহাই উক্ত হইয়াছে, "কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্ব্বিকল্পকং।" যে প্রত্যক্ষ কল্পনা জ্ঞান নহে, অর্থাৎ যাহাতে কোনরূপ কল্পনা নাই সেই প্রত্যক্ষই নির্ব্বিকল্পক। উহাই অভ্রান্ত অর্থাৎ প্রমাণ। সবিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ অধ্যবসায় কল্পনাজ্ঞান, অর্থাৎ উহাতে নানাপ্রকার কল্পনা থাকায়, উহা অপ্রমাণ। বৌদ্ধদিগের অভিপ্রেত এই সকল বিষয় বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য কিয়দংশ শাস্ত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।—

"ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা।
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সচ মোক্ষোঽভিধীয়তে॥
প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণদ্বিতয়ং তথা।
চতুঃ প্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ॥
অর্থো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকৈশ্চ বহুমন্যতে।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোঽর্থো ন বহির্মতঃ॥
আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সম্মতা।
কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ॥
রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাম্ মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা॥
কৃত্তিঃ কমণ্ডলুর্মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনং।
সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ॥"

বৌদ্ধমতে সংস্কারাদি সকল বস্তুই ক্ষণিক। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধ চারিভাগে বিভক্ত বৈভাষিকাদি নামে প্রসিদ্ধ। বৈভাষিক জ্ঞানান্বিত অর্থবাদী। সৌত্রান্তিক বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। যোগাচারমতে সাকারা বুদ্ধি, মাধ্যমিক মতে নিরাকারা বুদ্ধি। যে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয় তাহাকে তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান বলেন। সকল বৌদ্ধমতেই রাগদ্বেষাদির উচ্ছেদ হইলেই মুক্তি হয়। তাঁহাদের আচার মৃগাদি চর্ম্ম ও কমণ্ডলু ধারণ, মুণ্ডিত মস্তক, চীরবস্ত্র পরিধান, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ, ও রক্তাম্বরধারণ। যদিও ভগবান্ বুদ্ধদেব একজনই উপদেষ্টা, তথাপি বৌদ্ধদিগের বুদ্ধিভেদে চাতুর্বিধ্য ঘটিয়াছে। যেরূপ কোন ব্যক্তি যদি বলেন যে, সূর্য্য অস্তগমন করিয়াছেন; তাহা শুনিয়া নিজের অভিলষিতানুসারে,জার মনে করে, অভিসরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, চোর মনে করে, পরধন অপহরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অনূচান অর্থাৎ সাঙ্গবেদাধ্যায়ী মনে করেন যে, সাঙ্গ বেদাধ্যয়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাও প্রায় তদ্রূপ। বৌদ্ধদিগের এই ক্ষণিকত্ববাদ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা নৈয়ায়িক খণ্ডন করিয়াছেন। সকল যুক্তি এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিলে, প্রবন্ধের শরীরগৌরব হইবে, এইজন্য সংক্ষেপে নৈয়ায়িকদিগের কিয়দংশ যুক্তি এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল।

ক্রমশঃ—

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

জপজী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তীরথ তপ দয়া দত্ত দান,
যে কো পাবে তিলকা মান,
সুনিয়া মানিয়া মন কীতা ভাউ,
অন্তর্গত তীরথ্ মল নাউ।

সভি গুণ তেরে মৈ নাহি কোই,
বিন্ গুণ কীতে ভগতি ন হোই।
স্বয়স্তি আথ্ বাণি বরমাউ,
সত্ব স্বহান সদা মন চাউ।

অর্থঃ—জঙ্গম-তীর্থ, তপস্যা, দয়া ও দানের দ্বারা লোকে যে প্রশংসা উপার্জ্জন করে, তাহা অতি সামান্য। গুরুবাক্য শ্রবণ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া আত্মতত্ব মনন করিলে, পারমার্থিক তীর্থের ফল পাওয়া যায় এবং মনের মলিনতা দূর হয়। তোমার সকল সদ্‌গুণ আচ্ছন্ন থাকাতে, তুমি কিছু দেখিতে পাইতেছ না। তোমার ভিতর মহাবাক্যের বিচার উদয় হইলে, তবে তোমার ভক্তির উদয় হইবে; যতক্ষণ না তাহার উদয় হয়, ততক্ষণ তুমি অজ্ঞানে-আচ্ছন্ন রহিবে। স্বস্তি এবং শান্তিপূর্ণ যে মহাবাক্য, তাহাই ব্রহ্মবাণী বলিয়া জানিবে; সেই ব্রহ্মবাণী বিচার করিলে,তুমি অন্তরে ও বাহিরে আনন্দ অনুভব করিবে।

কৌন সুবেলা, বখ্‌ত কৌন, কৌন থিতি, কৌন বার,
কৌন সিরুতী, মাহ কৌন, জিৎ হোয়া আকার।
বেলন পায়া পণ্ডিতাঁ, জিন লিখন লেখ পুরাণ,
বখ্‌ত ন পায়া কাদিয়াঁ, লিখন লেখ কৌরাণ।
থিতি বার ন যোগী জানে, রুতী মাহ্ ন কোই,
যা কর্‌তা সিরসঠ্ কো সাজে, আপে জানে সোই।
কিব কর আখাঁ, কিব সালাহী, কিব বরণী, কিব জানা।
নানক, আখন সভকো আখে, ইক দু এক সিয়ানা
বড্ডা সাহিব, বড্ডি নাঁই কীতা জাঁকা হোবে,
নানক, যেকো আপে জানে, আগ গয়া ন সোহ॥ ২১॥

অর্থঃ—সেই পরমাত্মা জগতাকারে কোন্ সময়ে পরিণত হইয়াছিলেন,তখন কত বেলা, কত সময়, কোন্ তিথি, কোন্ বার, কোন্ ঋতু, কোন্ মাস ছিল, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। পণ্ডিত মহোদয়েরা বেদ ও পুরাণের সাহায্যে সেই সময় নির্ণয় করিতে পারেন না এবং কোরাণের

সাহায্যে কাজী সাহেবও সেই সময়ের ঠিক পান না। যোগীরাও সেই তিথি ঋতু, মাস ও বারের অন্ত পান না; কেবল সেই পরমাত্মাই, যিনি জগতাকারে পরিণত হইয়াছেন, তিনিই কেবল তাহা জানেন। আমি তাহা কিরূপে বলিব। তাহার বিচারই বা আমি কিরূপে করিব। কেমন করিয়াই বা তাহার বর্ণনা করিব এবং কেমন করিয়াই বা তাহা জানিব? নানক বলিতেছেন যে, সকলে এক একটী কল্পনা করিয়া, সেই অনুসারে বর্ণনা করে। যাঁহার দ্বারা এই সৃষ্টি হইয়াছে, আমার বোধ হইতেছে যে, তিনি মহান্ পুরুষ। তাঁহার বিচারও মহান্ এবং এই সংসারের ন্যায় ও অন্যায়রূপ ব্যবহার তিনিই করিতেছেন। নানক বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজে অনুভবের দ্বারা আপনাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তির পূর্ব্বাপরের বিচার থাকে না, কারণ সে জানিতে পারে যে দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্য সকলই সেই পরমাত্মার রূপ॥ ২১॥

পাতালাঁ পাতাল লখ, আগাসাঁ আগাস,
উঢ়ক উঢ়ক ভাল থকে বেদ কতেবা কহেন্ ইক বাত,
সহস আঠারহ কহেন কতেবাঁ, অসল ইক ধাত।
লেখা হোই তো লিখিয়ে, লেখে হোই বিনাশ,
নানক, বড়া আখিয়ে আপে জানে আপ॥ ২২॥

অর্থঃ—কোন বিষয়েরই সীমা দেখিতে পাওয়া যায় না; এক পাতালের ন্যায় অসংখ্য পাতাল এবং এক আকাশের ন্যায় অনন্ত আকাশ বর্ত্তমান রহিয়াছে; বেদ শাস্ত্রাদি এবং অষ্টাদশ সহস্র পুরাণ ইহার বিচার করিয়া অন্ত পায় না। কিন্তু অনুমানের সাহায্যে বলা হয় যে, পরমাত্মাই সত্য। পরমাত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ তিনি আছেন কি নাই, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যে বলে যে, তাঁহার অস্তিত্ব আছে, সেও তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হয় না। নানক বলিতেছেন যে, সেই পরমাত্মাই নিজে আপনাকে জানেন এবং তাঁহা অপেক্ষা মহান্ আর কেহ নাই॥ ২২॥

সালাহি সালাহ্ এতি সুরত ন পাইয়া,
নদীয়াঁ অতে বাহ্ পবেহ্ সমুন্দ ন জানিয়েহ্।

সমুন্দ সাহ সুলতান গিরহা সেতী মালধন।
কীড়ি তুল ন হোবনী যে তিস্ মনহ্ ন বিসরেহ্ ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ—বাহ্যবিচারের পর বিচারদ্বারা পরমাত্মার তত্ত্ব কেহ অবগত হয় না। তাহারা ক্ষুদ্র নদীতে বিচরণ করিতেছে, সমুদ্রের খবর জানে না। যদি কোন ব্যক্তি সুলতান বা রাজা হয়, কিম্বা সমুদ্রের ন্যায় অসীম ধনের ঈশ্বর হয়, কিন্তু তাহার মন যদি পরমার্থিক বিষয়ে রত না হয়, তাহা হইলে সে কীটের তুল্যও নহে॥ ২৩ ॥

অন্ত ন সিফৎ কহন ন অন্ত,
অন্ত ন করণৈ দেন ন অন্ত।
অন্ত ন বেখন সুনন ন অন্ত,
অন্ত ন জাপে কিয়া মন অন্ত,
অন্ত ন জাপে কীতা আকার,
অন্ত ন জাপে পারাবার,
অন্ত কারণ কেতে বিললাহি,
তাকে অন্ত ন পায়ে জাহি,
এই অন্ত ন জানে কোই,
বহুতা কহিয়ে বহুতা হোই।
বড্ডা সাহিব উচ্চা থাউ,
উচ্চে উপরি উচ্চা নাঁউ,
এ বড় উচ্চা হোবে কোই,
তিস উচ্চে কো জানে সোই,
যে বড় আপ জানে আপি আপ,
নানক, নদরী করমী দাত ॥ ২৪ ॥

অর্থ ঃ—পরমাত্মার গুণের অন্ত নাই এবং বর্ণনারও অন্ত নাই; তাঁহার কার্য্যেরও অন্ত নাই এবং দানেরও অন্ত নাই। তাঁহার মহিমা দেখিতে দেখিতে এবং শুনিতে শুনিতে শেষ হয় না; তাঁহার নামের জপের ও মননের

অন্ত নাই। জপের দ্বারা তাঁহার আকারের অন্ত পাওয়া যায় না এবং তাঁহার আদি ও অন্তের নির্ণয় হয় না। তাঁহার অন্ত জানিবার জন্য বহুলোকে কত কষ্ট করিতেছে। কিন্তু তাঁহার অন্ত পায় না। তাঁহার অন্ত কেহ জানে না এবং বলিয়াও তাঁহার কেহ শেষ করিতে পারে না। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার স্থান অতি উচ্চে এবং তাঁহার নাম সকলের উপরে। তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন নাই। তাঁহার সমান যে হইবে, সেই তাঁহাকে জানিবে। যে আপনাকে আপনি জানে সেই শ্রেষ্ঠ। নানক বলিতেছেন যে, নিমেষমাত্রে আত্মকর্ম্ম অর্থাৎ আত্মচিন্তা হইয়া থাকে এবং নিমেষ মাত্রে তাঁহার সাক্ষাৎরূপ ফল পাওয়া যায় ॥ ২৪ ॥

বহুতা করম লিখিয়া ন জাই,
বড্ড দাতা তিল ন তমাই।
কেতে মংগে বোধ অপার,
কেতিয়াগণত নাহি বিচার,
কেতে খপ তুট্টে বেকার,
কেতে লেলে মূকর পাহ্,
কেতে মূরখ খাহি খাহ্
কেতিয়া দুখ ভুখ সদমার,
য়হভী দাত তেরি দাতার।
বন্দ খালাসী ভাণে হোই
হোর আখন সকে কোই।
যে কো খাই কু আখনি পাই,
ওহু জানে জেতীয়া মুহ্ খাই,
আপে জানে আপে দেই,
আখেহ্ সেভী কেই কেই।
জিসনোঁ বখ্সে সিফত সালাহ,
নানক পাতসাহিঁ পাতসাহ্ ॥ ২৫ ॥

অর্থ ঃ—কর্ম্ম অনন্ত, উহা লিখিয়া শেষ করা যায় না ; কর্ম্ম ফলের যিনি দাতা, তাঁহার তিল প্রমাণ অহঙ্কার নাই। কত লোকে অপার যোদ্ধা হইবার জন্য সাধনার দ্বারা প্রার্থনা করিতেছে ; কেহবা গণিতের দ্বারা পরমাত্মার বিচার করিতেছে। কেহ বা নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিতেছে, কেহ বা পরমাত্মাকে জানিয়াও বলিতেছে যে জানি না ; কেহ বা মূর্খতাবশতঃ পরমাত্মার নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না, কেহ বা জগৎ দুঃখময় এইরূপ বিচার করিতেছে, কাহারও বা চিন্তা করিতে করিতে তৃপ্তি হইতেছে না এবং কেহ বা সকলই সত্য এইরূপ বিচার করিতেছে। এই সকল সত্যাসত্য যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সকলই পরমাত্মার দান। যখন পরমাত্মার সত্যস্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখন বদ্ধ ও মোক্ষ উভয়েরই মীমাংসা হইয়া যায়। অভ্যন্তরে পরমাত্মার যে বিচার উদয় হয়, তাহা বাহিরে কাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না। নিজে নিজেই তাহা বুঝা যায়। যে কেহ আভ্যন্তরীণ বিচারকে অভ্যন্তরে পান করে, সে কখন ঐ বিচার বাহিরে বলিতে সক্ষম হয় না। পরমাত্মার আনন্দ যিনি পান করেন, তিনি তৃপ্ত হন না, আরও চান, যত পাইয়া থাকেন, আরও তত চান। তিনি নিজে নিজেকে জানেন এবং নিজেকে নিজে দান করিতে সক্ষম হন। যাঁহারা পরমাত্মার বর্ণন করিতে পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম। পরমাত্মার কৃপায় যাঁহার অনন্ত জ্ঞান-চক্ষু লাভ হয়, তিনিই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন এবং তাঁহার বর্ণনা করিতে সমর্থ হন। নানক বলিতেছেন যে, পরমাত্মা পাতসাহেরও পাতসাহ ॥ ২৫ ॥

অমূল গুণ অমূল বাপার, অমূল বাপারী এ অমূল ভাণ্ডার,
অমূল আবেঁ অমূল লে জাই, অমূল ভাই অমূল সমাই,
অমূল ধরম, অমূল দিবান, অমূল তুল অমূল পরবান্
অমূল বখসীস্, অমূল নীসান, অমূল করম অমূল ফরমাণ।
অমূলো অমূল আখিয়া না জাই, আখি আখি রহে লিবলাই।
আখে বেদ পাঠ পুরাণ, আখে পড়ে করে বাখিয়ান,
আখে বরসে আখে ইন্দ্র, আখে গোপী হৈতে গোবিন্দ,

আখে ঈসর আখে সিদ্ধ, আসে কেতে কীতে বুদ্ধ,
আখে দানব আখে দেব, আখে সুর নর মুনিজন সেব
কেতে আখে আখ্ণ পাহ্, কেতে কহ্ কহ্ উঠ উঠ জাহ,
এতে কীতে হোর করেহ্, তাঁ আখ ন সকে কেই কেই।
যে বড্ড ভাবে তে বড্ড হোই, নানক জানে সাচা সোই,
যো কো আখে বোল বিগাড় তাঁলিখিরে সির গাবারাঁ গাবার ॥২৬॥

অর্থ ঃ—পরমাত্মার গুণ এবং সেই গুণের ব্যবহার অমূল্য এবং সেই গুণের ব্যাপারী ও ভাণ্ডার অমূল্য ; অলৌকিক পুরুষ এ পৃথিবীতে আসিয়া পরমাত্মার অলৌকিক গুণ বর্ণনা করতঃ তাঁহার অলৌলিক গুণ সকল তাঁহার সহিত লইয়া যাইতেছেন। পরমাত্মার ভাবনা অমূল্য, সেই ভাবনার দ্বারা লোকে নির্বিকল্প স্বরূপ হইয়া যায় ; পারমার্থিক ধর্ম্ম অমূল্য এবং সেই ধর্ম্মের যিনি চালনা করিতেছেন, তিনিও অমূল্য ; তাঁহার উদাহরণ অর্থাৎ তাঁহাকে জানিবার উপায় এবং তাঁহার প্রমাণ অর্থাৎ অভ্যাসও অমূল্য। সেই পরমাত্মার অনুভবও অমূল্য। সেই পরমাত্মারূপী লক্ষ্যও অমূল্য ; তাঁহার কর্ম্মও অমূল্য এবং সেই পরমাত্মার বর্ণনাও অমূল্য। সেই মহান্ অমূল্য অর্থাৎ পরমাত্মার বর্ণনা করা যায় না এবং বর্ণনার চেষ্টা করিয়া লোকে তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করে। বেদ ও পুরাণাদি তাঁহার বর্ণনা করিতেছে এবং সেই সকল পড়িয়াও লোকে পুনরায় বর্ণনা করিতেছে! ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র, ও গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহারা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এবং সিদ্ধ ও সম্যক্প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণ সেই পরমাত্মার বর্ণনা করিয়াও অন্ত পাইতেছেন না। দেব ও দানব সুর, নর, মুনি ও সেবকগণ তাঁহার বর্ণনা করিয়া অন্ত পান না। কেহ বা বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে এবং কেহ বা বর্ণনা করিতে পুনরায় আসিতেছে,—এই সকল ব্যক্তিই তাঁহার যথার্থ বর্ণনা করিতে পারেন না। যাহার যেরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধি সে তদ্রূপ বর্ণনা করিয়া যাইতেছে। নানক বলিতেছেন যে, তাঁহারা যতদূর বর্ণনা করিয়াছেন, ততদূর উহা সত্য। যে ব্যক্তি সেই বর্ণনা খণ্ডন করিতে যায়, তাহাকে মূর্খের ভিতর মূর্খ বলিয়া জানিবে ॥ ২৬ ॥

সে দর কেহা, সো ঘর কেহা, জিৎবহি সরব সমালে ?
বাজে নাদ অনেক অসংখ্যা, কেতে গাবন হারে ?
কেতে রাগ পরি সিউ কহি অন্ কেতে গাবন হারে ?
গাবে ভুহ্ নো পবন পাণি বৈসন্তর, গাবে রাজা ধরম দুয়ারে,
গাবে চিতগুপ্ত লিখ জানে, লিখ লিখ ধরম বিচারে।
গাবে ঈসর বরমা দেবী সোহন সদা সবারে,
গাবে ইন্দ্র ইন্দ্রাসন বৈঠে দেবতীয়াঁ দরনালে।
গাবে সিদ্ধ সমাধি অন্দর গাবে সাধ বিচারে,
গাবে জতী সতী সন্তোষী গাবে বীর করারে,
গাবে পণ্ডিত পঢ়ন রিখীসর জুগ জুগ বেঁদা নালে.
গাবে মোহিনীয়া মনহোনী সুরগা মোচ্ছ পইয়ালে,
গাবে রতন উপায়ে তেরে অঠ সঠী তীরথ লালে,
গাবে জোধা মহাবল সুরা, গাবে খাণী চারে,
গাবে খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ডা কর কর রাখে ধারে,
সেই তুধ নো গাবেঁ জো তুধ ভাবে, রতে রতে ভগত রসালে,
হোর্ কেতে গাবে সে সৈ চিত ন আবে, নানক কিয়া বিচারে।
সোই সোই সচা, সচ সাহিব সাচা, সাচা নাঁই,
হৈভী হোসী, জাই ন জাসী, রচনা জিনি রচাই।
রঙ্গী রঙ্গী ভাঁতি কর কর জিন্সাঁ জিন উপাই,
কর কর বেখে কীতা আপনা, জিবঁ তিসদী বড়িয়াই।
যো তিস্ ভাবে সোই করসী, হুকুম ন করনা জাঁই,
সো পাতসাহ্, সাহাঁ পাতি, নানক, রহণ রজাই ॥ ২৭ ॥

অর্থঃ—সেই দ্বার কোথায় এবং সেই ঘরই বা কোথায়, যেখানে বসিয়া পরমাত্মা সমস্ত জগৎ রক্ষা করিতেছেন। অসংখ্য লোকে শব্দ অর্থাৎ পরম তত্ত্ব গান করিতেছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কত ? অসংখ্য পুরুষ রাগ রাগিণীর দ্বারা পরমাত্মার মহিমা গান করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা কত ? রাজা

অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষ তাঁহার গান করিতেছে; আকাশাদি পঞ্চতত্ত্ব পরমাত্মার প্রতিপাদন করিতেছে। চিত্রগুপ্ত অর্থাৎ মন, পরমাত্মার সত্তার দ্বারা রচনা করিতেছে ও সত্যস্বরূপ পরমাত্মার চিন্তা করিয়া ধর্ম্ম বিচার করিতেছে। ঈশ্বর, ব্রহ্মা ও দেব দেবী, প্রভৃতি পরমাত্মার গুণ লাভ করিয়া পরমাত্মার গুণানুবাদ করিতেছেন; ইন্দ্রাসনে বসিয়া এবং দেবতা পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্র পরমাত্মার গুণ গান করিতেছেন; সিদ্ধ ব্যক্তি সমাধিতে মগ্ন হইয়া পরমাত্মার গান করিতেছেন। সাধু ব্যক্তি বিচারের দ্বারা গান করিতেছেন; ঋষিশ্রেষ্ঠ যুগযুগান্তর বেদের দ্বারা অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার গান করিতেছেন। কেহ মোহিনী রূপ ধারণ করিয়া, কেহ বা মনকে বশীভূত করিয়া, কেহ স্বর্গে গিয়া এবং কেহ মোক্ষ পাইয়া তাঁহার গান করিতেছে। বিশেষ জ্ঞানীপুরুষ সমুদ্র স্বরূপ এবং তাহার তত্ত্বজ্ঞান রত্নস্বরূপ; সেই রত্ন লাভ করিয়া তিনি পরমাত্মার গান করিতেছেন। কেহ বা ৬৮ প্রকার অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারা তাঁহার সমীপে স্থিত হইয়া তাঁহার গান করিতেছে; কোন মহাবল যোদ্ধা তাহার বলের দ্বারা পরমাত্মার গান করিতেছে; কেহ বা অনন্ত প্রকার গুণের বিচার করিয়া গান করিতেছে। অনন্ত ও অসংখ্য পুরুষ এক এক খণ্ড জ্ঞানভূমি লাভ করিয়া পরমাত্মার গান করিতেছে। কেহ বা ব্যাপ্তিরূপ সত্তা লাভ করিয়া গান করিতেছে। কেহ বা ঐ জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার গান করিতেছে। যাঁহার প্রতি পরমাত্মার কৃপা দৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই মহাত্মা তাঁহার গান করিতে সমর্থ হন। পরমাত্মার অসংখ্য, ভক্তসকল অনন্তপথে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার সুন্দর গুণানুবাদ গান করিতেছেন। নানক বলিতেছেন যে, অনন্ত পুরুষ অনন্ত উপায়ে পরমাত্মার গান করিতেছেন, কিন্তু তিনি তাহাদের সংখ্যা জ্ঞাত নহেন।

পরমাত্মাই কেবল সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সত্য স্বরূপ এবং তাঁহার ন্যায়বিচারও সত্য। বর্ত্তমান কালে পরমাত্মার অস্তিত্ব আছে, অতীত কালেও ছিল এবং ভবিষ্যৎ কালেও থাকিবে; তিনি স্বয়ম্ভু; তাঁহার উপর আর কেহ নাই; তাঁহার রচনাও অনন্তপ্রকার। তাঁহার অনন্ত প্রকার রচনার ব্যাপার সমুদয় তিনিই জ্ঞাত আছেন। অনেক পুরুষ সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়া অহঙ্কার করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। অহঙ্কারে

লোকে মত্ত হইয়া স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্য করে এবং পরমাত্মার সত্যস্বরূপ বিচার করে না। নানক বলিতেছেন যে, তিনি পাতসাহেরও পাতসাহ; তাঁহার সত্যস্বরূপ আদেশ অনুসারে এবং জ্ঞানবিচারের দ্বারা যে ব্যক্তি কার্য্য করে, সেই শ্রেষ্ঠ॥ ২৭॥

মুন্দ্রা সন্তোষ, সরম পত ঝোলি, ধিয়ান কী করে বিভূতি,
খিন্থা অকাল কুয়ঁারি কায়া, জুগতি ডণ্ডা পরতীত।
আয়ী পন্থী সগল জমাতী, মন জীতে জগ জীত।
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেস॥ ২৮॥

অর্থ:—যোগীগণের সন্তোষই মুদ্রা বা কর্ণবেধ-স্বরূপ, অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিচারে স্থিতি হওয়াই যোগীগণের সন্তোষরূপী মুদ্রাস্বরূপ; লজ্জা অর্থাৎ জ্ঞানে নম্র হওয়াই, যোগীগণের ভিক্ষা-ঝুলিস্বরূপ; পরমাত্মার ধ্যান তাহাদের ভস্মলেপন স্বরূপ; কাল-পরিচ্ছেদ রহিত, অর্থাৎ জন্ম মরণাদি রহিত কায়া, তাহার আবরণ কন্থা স্বরূপ এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই তাহার আশ্রয় দণ্ডস্বরূপ। মনোজয়ের দ্বারা পঞ্চভূতাদির জয়, সকল ধর্ম্মপথের ভিতর শ্রেষ্ঠ পথ, অর্থাৎ ব্রহ্মাকার বৃত্তি দ্বারা বিষয়াকার বৃত্তির জয়ের নামই মনের জয়; সেই মনের জয় করিতে পারিলেই সকল পথ জয় করা যায়। পরমাত্মাকে আমি বারংবার নমস্কার করিতেছি এবং আদি, নির্গুণ, অনাদি, অক্ষয় এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া একভাবাপন্ন, সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করিতেছি॥ ২৮॥

ভূগতি গিয়ান্ দয়া ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজে নাদ,
আপি নাথ, নাথী সভ জাকি, রিদ্ধি সিদ্ধি ঐরা সদা।
সংযোগ বিয়োগ দুইকার চলাবে লেখে আরে ভাগ।
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জুগ একোবেস॥ ২৯॥

অর্থ:—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি পরমাত্মার দয়ার ভাণ্ডার স্বরূপ; এই অনুভূতি চরাচর প্রভৃতি সমুদয় বিশ্বে ঘোষিত রহিয়াছে। সেই পরমাত্মা স্বাক্ষী স্বরূপে, কখন বা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপে, কখনও বা রিদ্ধি স্বরূপে, কখনও বা সিদ্ধি স্বরূপে সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু যোগীরা সংযোগ বিয়োগরূপ দুই কর্ম্মের নির্ণয় করিয়া উহাদের সত্য অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে নিরালম্ব হন। পরমাত্মাকে আমি ইত্যাদি॥ ২৯॥

একা মাই, জুগতি বিয়াই, তিন চেলে পরবান,
ইক সংসারী, ইক ভণ্ডারী, ইক লায়ে দিবান।
জিব তিস্ ভাবৈ, তিঁব চলাবৈ, জিব হোবৈ ফুরমাণ,
ওহু বেখে, ওনা নদরী ন আবৈ, বহুতা এহু বিড়াণ।
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জুগ একোবেস॥ ৩০॥

অর্থ:—এক মাতা স্বাক্ষী স্বরূপ হইয়া তিনজন অনুচরকে প্রমাণরূপে প্রকটীভূত করিয়াছেন; তাঁহার এক চেলার নাম সংসারী, একের নাম ভাণ্ডারী এবং অপরের নাম বিচার কর্ত্তা, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকে সাক্ষী করিয়া তিন গুণ প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে একের নাম তমঃ, অন্যের নাম রজ এবং তৃতীয়ের নাম সত্ত্ব। যে ব্যক্তি যে গুণসম্পন্ন, সে সেই গুণের কাজ করে অর্থাৎ সেই গুণের দ্বারা সে সেইরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যে যে গুণ প্রধান, সে সেই গুণের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। অন্য গুণের কার্য্য সে জানে না; এই প্রকারে সে খণ্ডন করিলেও তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না। পরমাত্মাকে আমি, ইত্যাদি॥ ৩০॥

আসন লোয় লোয় ভণ্ডার, যো কিছু পায়া সু একেবার,
কর কর বেখে সিরজন হার, নানক, সচ্চে কি সাচীকার।
আদেশ তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জুগ একোবেস॥৩১॥

অর্থ:—ত্রিলোকব্যাপ্ত হইয়া তিনি অবস্থিত রহিয়াছেন এবং সকল

লোকের তিনি অনুভবরূপী ভাণ্ডার স্বরূপ এবং লোকের যখন অনুভব হয়, তখন একেবারেই সে সেই পরমাত্মাকে পায়। যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সে নিজের সিদ্ধি হইতে উৎপন্ন সৃষ্টিতে মগ্ন হইয়া পরমাত্মাকে বিস্মৃত হয়। নানক বলিতেছেন যে, একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মার এই সকল রচনাও সত্য। সেই স্বাক্ষীস্বরূপকে আমি বারংবার নমস্কার করিতেছি, ইত্যাদি ॥৩১॥

ইকদূ জীভো লখ হোবে, লখ হোরে লখ বীস,
লখ লখ গেড়াঁ আখিয়ে ইক নাম জগদীস।
এতুরাহ্ পত পৌড়িয়াঁ চড়িয়ে হোই ইকীস,
সুনি গল্লাঁ আকাশকী কীটা আয়ী রীস।
নানক, নদরী পাইয়ে, কুড়ে ঠীস ॥ ৩২ ॥

অর্থ ঃ—কেহ অদ্বৈতকে কেহ দ্বৈতকে কেহ বা জীবভাবকে বিশেষরূপে লক্ষ করিতেছে। কিন্তু সেই পরমাত্মা এই সকল প্রকার বাদের অতীত হইয়া একমাত্র অনুভব স্বরূপ সাক্ষীরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন; তিনিই সত্য। এই প্রকার অনুভবের দ্বারা লোকে আত্মপ্রশংসা লাভ করে এবং সেই অনুভবে সে মগ্ন হইয়া মুক্তিলাভ করে। শূন্যে যে গন্ধর্ব্বনগর আছে, তাহা শুনিয়া লোকে যেরূপ অসম্ভব জ্ঞান করে, সেইরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্য সেই জ্ঞানকে তুচ্ছ বলিয়া থাকে। নানক বলিতেছেন যে, সেই পরমাত্মা সত্যস্বরূপ এবং অন্য সকল বাদ প্রলাপ মাত্র ॥ ৩২ ॥

আখ ন জোর, চুপে নহ জোর,
জোর ন মাংগন, দেন ন জোর,
জোর ন জীবন, মরণ নহ জোর,
জোর ন রাজ, মাল মণি সোর,
জোর ন সুরতি গিয়ান বিচার,
জোর ন জুগতি ছুটে সংসার,
জিস হথ জোর কর বেখে সোই,
নানক, উত্তম নীচ ন কোই ॥ ৩৩ ॥

অর্থ ঃ—যিনি সেই অনুভব লাভ করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মার বর্ণনা করিতে কিম্বা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। সেই অনুভব অপরের নিকট হইতে পাওয়া যায় না, কিম্বা অপরকে দান করা যায় না। জগতকে জয় করা, অর্থাৎ সৃষ্টি প্রপঞ্চের কর্ত্তা হওয়া, কিম্বা উহা বিনাশ করা, জীবের ক্ষমতার অতীত। যাবৎকাল লোকের অনুভব জ্ঞান না হয়, তাবৎকাল সে শ্রুতি ইত্যাদি শাস্ত্রের বিচার করিতে অক্ষম এবং তাবৎকাল বহুপ্রকার যুক্তি দ্বারাও তাহার সংসার ত্যাগ হয় না। যাহার বল আছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই অনুভব লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই কেবল সংসারাতীত হয়। নানক বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তির নিকট উচ্চ ও নীচ জ্ঞান নাই ॥ ৩৩ ॥

রাতী রুতী থিতি বার,
পচন পানি অগ্নি পাতাল,
তিস্ বিচ ধরতী থাপ রাখী ধর্ম্মসাল।
তিস্ বিচ জীব জুগতি কে রংগ,
তিনকে নাম অনেক অনন্ত।
করমী করমী হোই বিচার
সচ্চা আপ সচ্চা দরবার।
তিথে সোহন পঞ্চ পরবাণ,
নদরী করম পবৈ নিসান।
কচ্চ পকাই উথে পাই,
নানক, গয়া জাপৈ জাই ॥ ৩৪ ॥

অর্থ ঃ—রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, পবন, জল, অগ্নি ও পাতাল এই সকলের অভ্যন্তরে যে অনুভবরূপী জ্ঞান রহিয়াছে, তাহার নামই ধর্ম্মশালা। ঐ অনুভবের মধ্যে অনেক প্রকার জীব, অনেক প্রকার যুক্তি, অনেক প্রকার বল ইত্যাদি অনন্ত নামধারী অবস্থিত রহিয়াছে। বিচারের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ইহাদের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, তখন লোকে নিজের ও

সৃষ্টির সত্যতা অনুভব করে। প্রমাণ দ্বারা সেই অনুভবজ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ অনুভব প্রতিপাদক কর্ম্মদ্বারা স্বয়ং অনুভব করিতে পারা যায়। অনুভব হইলে কাঁচা ও পাকার অর্থাৎ সত্যাসত্যের মীমাংসা হয়। নানক বলিতেছেন, যে ব্যক্তি অনুভবের জন্য চেষ্টা করে, সে অনুভব প্রাপ্ত হয় ॥৩৪॥

ধরম খণ্ড কা এহো ধরম,
গিয়ান খণ্ড কা আখে করম।
কেতে পবন পানি বৈসন্তর, কেতে কাঁন মহেশ,
কেতে বরমে ঘাতে ঘড়িয়ে রূপ রঙ্গ কে বেস।
কেতয় করম ভূমি, মের কেতে ধূ উপদেশ,
কেতে ইন্দ্র চন্দ্র সূর কেতে, কেতে মণ্ডল দেশ।
কেতে সিদ্ধ বুদ্ধ নাথ, কেতে দেবী বেস।
কেতে দেব দানব, মুনি কেতে, কেতে রতন সমুন্দ্র,
কেতীয়া খানী, কেতিয়া বাণী, কেতে পাত নরিন্দ্র,
কেতীয়া সুরতী, সেবক কেতে, নানক, অন্ত ন অন্ত ॥ ৩৫॥

অর্থঃ—কর্ম্ম-খণ্ডের ধর্ম্ম এইরূপ যে, কর্ম্মের অর্থাৎ সাধনার দ্বারা অনুভব-জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন জানিতে পারা যায় যে, কত পবন, বরুণ, অগ্নি, কানু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা, রূপ ও বর্ণযুক্ত কত প্রকার রচনা করিতেছেন। কত প্রকার কর্ম্ম-ভূমি, মেরু, নিশ্চয় জ্ঞান, ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবতা, গ্রহ, দেশ, সিদ্ধ, বুদ্ধ, নাথ, দেব, দেবী, দানব, মুনি, রত্ন, এবং সমুদ্র রহিয়াছে এবং কত প্রকার জ্ঞানের খনি, জ্ঞানের বাণী, জ্ঞানী পুরুষগণ এবং শ্রুতি ও সেবক রহিয়াছে; নানক বলিতেছেন যে, তাহাদের অন্ত নাই ॥ ৩৫ ॥

গিয়ান খণ্ড মহি গিয়ান প্রচণ্ড,
তিথৈ নাদ বিনোদ কোড় আনন্দ,
সর্ব্ব খণ্ড কী বাণী রূপ,
তিথৈ ঘড়ত ঘড়িয়ে বহুত অনূপ।

তাঁ কীয়া গল্লা কথিয়াঁ ন জাঁই,
যে কো কহে পিছে পছতাই।
তিথে ঘড়িয়ে সুরতি মতি মন বুদ্ধ,
তিথে ঘড়িয়ে সূরাঁ সিদ্ধা কী শুদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

অর্থ ঃ—জ্ঞান-ভূমিতে জ্ঞানের প্রকাশ রহিয়াছে; জ্ঞানরূপী নাদে কোটী কোটী আনন্দ রহিয়াছে। সেই ভূমিতে এক এক প্রকার বিকাশ রহিয়াছে, এবং তাহাদের নির্দ্দিষ্ট নামও রহিয়াছে; এবং লোকে যখন যে ভূমি প্রাপ্ত হয়, সে তখন সর্ব্বপ্রকারে সেই ভূমির অনুযায়ী রচনার কর্ত্তা হইয়া থাকে। বাহিরে থাকিয়া এই ভূমির বর্ণনা হয় না, এই ভূমি প্রাপ্ত না হইলে, তাহার বর্ণনা কেহ করিতে পারে না। যে ঐ ভূমি প্রাপ্ত না হইয়াছে, সে যদি ঐ ভূমির বর্ণনা করে, তাহা হইলে, সে পশ্চাতে অনুশোচনা করিয়া থাকে। কারণ, তাহার বর্ণনা যথার্থ হয় না। যে ঐ সকল ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মন, বুদ্ধি ও স্মৃতি পরিমার্জ্জিত হয়। এবং যখন দেব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন দেবতা ও সিদ্ধগণের সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ৩৬ ॥

করম খণ্ড কী বাণি জোর, তিথে হোর ন কৌই হোর।
তিথে যোধ মহাবল সূর, তিন মহিরাম রহিয়া ভরপুর।
তিথে সীতো সীতাঁ মহিমা মহি, তাঁকে রূপ ন কথনে জাই।
না উহ্‌মরে ন ঠাগে জাহি, জিনকে রাম বসে মন মাহি।
তিথে ভগত বসে কে লোয়, করে আনন্দ সচ্চা মন সোহ।
সচ্চ খণ্ড বসে নিরঙ্কার, কর করু বেখে নদর নিহাল।
তিথে খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ড, যে কো কথে ত অন্ত ন অন্ত।
তিথে লোয় লোয় আকার, জিবঁ জিবঁ হুকম, তিবঁ তিবাঁকার।
বেখে বিগসে করে বিচার, নানক, কথনা করড়া সার ॥ ৩৭ ॥

অর্থ ঃ—কর্ম্ম-খণ্ডের বাণী কর্ম্ম-খণ্ডেই রহিয়াছে, সেখানে অন্য প্রকার বাণী থাকিতে পারে না। সেখানে মহাবল কর্ম্ম-বীরগণ রহিয়াছেন এবং সর্ব্বব্যাপী রাম অর্থাৎ পরমাত্মা সেখানে পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেখানে

যে শক্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার মহিমা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যায় না। যাহার পরমাত্মার স্বাক্ষাৎ অনুভব সেখানে হইয়াছে, তাহার কখনও মৃত্যু হয় না। কিম্বা কেহ তাহাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না। সেখানে অনন্ত প্রকার ভক্ত অবস্থিতি করিয়া সত্যস্বরূপ আনন্দে মগ্ন রহিয়াছে। সেই সত্যরূপ কর্ম্মখণ্ডে অনুভব জ্ঞান অবস্থান করিতেছে এবং সেখানে লোকে জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা অনুভব করিয়া দেখিতেছে এবং আনন্দে মগ্ন হইতেছে। সেখানে যত খণ্ড, অখণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া অন্ত পাওয়া যায় না। সেখানে অনেকানেক আকার ও লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং তথায় পরমাত্মার আদেশানুসারে সকল প্রকার কার্য্য হইতেছে; তাহার অন্যথা আর কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি তাহার বিচার করে, তাহারই নিকট পরমাত্মার বিকাশ হইয়া থাকে। নানক বলিতেছেন যে, সেই পরমাত্মার আদেশ অনুভব করা অতি কঠিন ব্যাপার॥ ৩৭॥

জত হাপরা, ধীরজ সুনীয়ার,
অহরণ মতি, বেদ হতিয়ার,
ভউখলা অগ্নি তপ তাউ,
ভস্তৃ ভাউ, অমৃত তিত ঢাল,
ঘড়িয়ে শব্দ, সচ্চী টকসাল।
জিন কো নদর করম তিন কার,
নানক, নদরী নদর নিহাল॥ ৩৮॥

অর্থ:—পুরুষার্থ অবলম্বন করিলে সেই স্বর্ণকার অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎ হয়। শ্রেষ্ঠবুদ্ধির নাম পুরুষার্থ ভূমি এবং সেই বুদ্ধিদ্বারা বেদ অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয়; ইহাকেই শাস্ত্র বলে। কর্ম্ম হইতেছে, বায়ু নিষ্পেষক যন্ত্র এবং ব্রহ্মরূপী অগ্নি হইতেছে, অগ্নিতাপ। এবং ঐ ব্রহ্মরূপী অগ্নির দ্বারা অবিদ্যাকে দ্রবীভূত করিলে অমৃত হইবে, তখন একমাত্র সত্যস্বরূপ অনুভব অবশিষ্ট থাকিবে। উহাই একমাত্র সত্য টাঁকশাল, অর্থাৎ তথায় সত্যাসত্য বুঝিতে পারা যায়। যাহাকে মহাত্মা ব্যক্তিরা কৃপা করেন, সেই ব্যক্তিই সত্য টাঁকশালকে জানিতে পারে। নানক বলিতেছেন যে, তখন আভ্যন্তরিক বিষয় সকল বুঝা যায়॥ ৩৮॥

উপসংহার শ্লোক।

পবন গুরু, পানি পিতা, মাতা, ধরতী মহৎ,
দিবস রাতী দুই দাই দাই দাইয়া, খেলে সকল জগৎ।
চংগিয়াইয়াঁ বুরিয়াইয়াঁ বাচে ধরম ইদুর,
করমী আপো আপনি, কেনেড়ে কে দূর।
জিনী নাম ধিয়াইয়া, গয়ে মুসকত ঘাল,
নানক, তে মুখ উজলে, কেতী ছুটী নাল॥ ৩৯॥

পবন গুরু স্বরূপ, জল পিতার স্বরূপ, মহতী পৃথিবী জননী স্বরূপা। বিদ্যা ও অবিদ্যা দ্বারা জগৎ খেলা করিতেছে। বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বারা ভাল মন্দ বুঝা যায়। ইহাদের বিচারের দ্বারা যে সত্ত্ব অংশ পাওয়া যায় তাহার নাম ধর্ম্ম। যে যেরূপ কর্ম্ম করে, সে সেইরূপ কর্ম্মফল পায়, অর্থাৎ অবিদ্যার দ্বারা লোকে বদ্ধ হয়, এবং বিদ্যা দ্বারা মুক্ত হয়। যাহার এই বিষয়ে বিশ্বাস নাই, সে কর্ম্ম করিয়া দেখুক অবশ্যই ঐরূপ ফল পাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যিনি অবিদ্যা ও বিদ্যার বিচার করেন, তিনি সত্যস্বরূপ নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন। নানক বলিতেছেন যে, সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠ, আমি তাঁহাকে ভক্তির সহিত বারংবার নমস্কার করিতেছি॥ ৩৯॥

শ্রীআশুতোষ দেব।

সাংখ্যদর্শনের ইতিহাস।

দর্শনসমূহের মধ্যে সাংখ্য প্রাচীনতম। এই দর্শনে প্রকৃত্যাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা * নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে সাংখ্যদর্শন কহে। আমার বোধ হয়, সংখ্যা শব্দের অর্থ ভেদ-

সাংখ্যদর্শন।

* "সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে যস্মাৎ প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" বিজ্ঞানভিক্ষু ধৃত ভারতবচনে।

জ্ঞান, এবং প্রকৃতি (জড়) ও পুরুষ (চৈতন্য) এতদুভয়ের ভেদবোধক শাস্ত্রের নাম সাংখ্য।

সাংখ্যশাস্ত্র প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—নিরীশ্বর সাংখ্য ও সেশ্বর সাংখ্য। মহর্ষি কপিল* নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রবর্ত্তক। সেশ্বর সাংখ্য পতঞ্জলি মুনির উদ্ভাবিত।

কপিলের জীবনী।

মহামুনি কপিলের জীবনী সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি হিন্দু গ্রন্থে ও মহাবস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে এবিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অধুনাতন লোকের অবিশ্বাস্য। হিন্দুশাস্ত্রের মতে কপিল ব্রহ্মার মানসপুত্র ও বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। ভাগবতপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে, কপিলের নয় ভগ্নী ছিল। ইঁহারা সকলেই কর্দ্দমমুনির ঔরসে ও দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, অযোধ্যাধিপতি সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞে, তাঁহার ষষ্ঠিসহস্র তনয় যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া কপিলমুনির ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে।

পরমেশ্বর সর্ব্বাগ্রে † কপিল ঋষিকে জ্ঞানদ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তিনি সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল।

চিরন্তন প্রবাদ এই যে, কপিল বর্ত্তমান আজমীঢ় জেলার সন্নিহিত পুষ্করারণ্যে জন্মগ্রহণ করেন ও জীবনের অধিকাংশ সময় গঙ্গাসাগরে অবস্থিতি করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পদ্মপুরাণ পাঠে দৃষ্ট হয়, কপিল ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতেন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, নারদ দক্ষের সহস্র পুত্রকে সাংখ্যবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

মহাবস্তু নামক বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, মহর্ষি কপিল অনুহিমবৎ প্রদেশের শাকোট বনখণ্ডে বাস করিতেন। গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ব পুরুষগণও এই স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। যে স্থানে কপিল বাস করিতেন, উহার নাম কপিলবাস্তু। নেপাল তরাইয়ের 'নিগ্‌লিভা' নামক স্থানে প্রাচীন কপিলবাস্তুর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহর্ষি কপিল অযোধ্যার রাজা সুজাতের সমসাময়িক। তিনি বুদ্ধের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব খৃঃ পূঃ ৯ম (নবম) * শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কপিলের পরবর্ত্তী সাংখ্যাচার্য্যগণ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। আসুরি কপিলের নিকট হইতে সাংখ্যজ্ঞান লাভ করেন, এবং পঞ্চশিখাচার্য্য আসুরির নিকট সাংখ্যশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া, উহা সর্ব্বত্র প্রচার করেন। পঞ্চশিখের অপর নাম কাপিলেয়। তিনি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ষষ্ঠিসহস্র শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে সাংখ্যমত ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে। মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীনগ্রন্থে সাংখ্যমত বিবৃত হইয়াছে। এমন কি সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ, এবং সুশ্রুত, চরক প্রভৃতি চিকিৎসাগ্রন্থেও সাংখ্যদর্শনের মত উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ

---

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ হইতে কপিল সম্বন্ধে উক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ॥"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)।

† কপিল যে, নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রবর্ত্তক, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বাচস্পতি মিশ্রই তত্ত্বকৌমুদীতে নিরীশ্বরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু কিন্তু উক্ত মতের আদর করেন নাই। ভাগবতের কপিল ও দেবহুতি সংবাদেও নিরীশ্বরতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। স—সং।

* পঞ্চশিখাচার্য্যকে কপিলের প্রশিষ্য বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং কপিল যদি খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দীর লোক হন, তাহা হইলে পঞ্চশিখাচার্য্য তাঁহার অপেক্ষা আধুনিক লোক, একথা স্বীকার করিতে হইবে। অথচ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জনক পঞ্চশিখসংবাদ নামক অধ্যায় দৃষ্ট হয়। সুতরাং পঞ্চশিখ যে, মহাভারতকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধগ্রন্থকারের উল্লিখিত কাল নির্ণায়াত্মক প্রমাণে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। আর শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ হইতে যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও কপিলের অতি প্রাচীনতার পরিচায়ক। আর যখন বৈদিক যুগের আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ চরকাদিতে সাংখ্যমত পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন কপিলের খৃঃ পূঃ ৯ম শতাব্দী অপেক্ষা বহুপ্রাচীনতাকল্পে কোন সন্দেহই নাই। স—সং।

সংস্কৃতভাষায় প্রায় যাবতীয় গদ্য ও পদ্য গ্রন্থে প্রকৃতি ও পুরুষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সাংখ্যদর্শনের ইতিহাস।

পঞ্চশিখের পরে কয়েক শতাব্দী মধ্যে যে সকল সাংখ্যাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কোন বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহাপণ্ডিত ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকা নামে একখানি সাংখ্যশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ৭০টী শ্লোক বিদ্যমান আছে। অধুনা সাংখ্যদর্শন বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সাংখ্যকারিকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে পরমার্থ নামক জনৈক পণ্ডিত এই গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত করেন। ইদানীং সাংখ্যসূত্র নামে যে গ্রন্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকের মতে উহা প্রকৃত কপিলকৃত সাংখ্যসূত্র নহে। বোধ হয়, উহা ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা হইতে সঙ্কলিত। কেহ কেহ বলেন তত্ত্বসমাস নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থই কপিলের প্রণীত। আমার বোধ হয়, ইহাও যথার্থ নহে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে গৌড়পাদ ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্য কারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু তিনি কোথায়ও সাংখ্যসূত্র বা তত্ত্বসমাসের উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যে সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে যাইয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত ভাষ্যে সাংখ্যসূত্র বা তত্ত্বসমাসের বচন কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে মিথিলানিবাসী বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামে যে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহা ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাংখ্যকারিকার বিশদ ব্যাখ্যামাত্র।* বস্তুতঃ সাংখ্যসূত্র ও তত্ত্বসমাস এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রকৃত রচয়িতা কে তাহা এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, উহার নাম সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্য। সাংখ্যসূত্রের একখানি উৎকৃষ্ট টীকাও বিদ্যমান আছে। উহার রচয়িতার নাম অনিরুদ্ধ। বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধ, ইহাঁরা কোন্ সময়ে বা কোন্ দেশে

* বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীকে. ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকার ব্যাখ্যা মাত্র বলা একেবারেই সঙ্গত নহে। উহাতে কারিকার্থ ব্যতীত প্রসঙ্গতঃ অনেক জটিল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা ও মীমাংসা আছে। স—সং।

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে, এক অনিরুদ্ধের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত পরমার্থ-বিনিশ্চয়, নামরূপ পরিচ্ছেদ ও অভিধর্ম্মার্থসংগ্রহ নামক তিনখানি উপাদেয় বৌদ্ধদর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি প্রদেশে এখনও অতি যত্নের সহিত পঠিত হয়। অনিরুদ্ধস্থবির তাঞ্জোর প্রদেশে বৌদ্ধসম্প্রদায় মধ্যে সঙ্ঘ নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধদার্শনিক অনিরুদ্ধ ও সাংখ্যসূত্রের টীকাকার অনিরুদ্ধ, এক কি না বলা যায় না। কথিত আছে, সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যপ্রণেতা বিজ্ঞানভিক্ষু ১৬শ শতাব্দীর লোক।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পঞ্চশিখাচার্য্য ষষ্ঠিসহস্র শ্লোক রচনা করিয়া, সাংখ্য-দর্শন প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। পঞ্চশিখের সময় নিরূপণ করা সহজ নহে। নানা প্রমাণ দৃষ্টে অনুমিত হয়, তিনি গৌতমবুদ্ধের অন্ততঃ একশত বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পঞ্চশিখের পরেই, আমি সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াছি। এতদ্দেশীয় প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। যাহা হউক পঞ্চশিখের সময় হইতে ঈশ্বর-কৃষ্ণের সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী হইতে খৃঃ উঃ ৫ম শতাব্দী পর্য্যন্ত দ্বাদশশত বৎসর মধ্যে সাংখ্যদর্শনের কিরূপ ক্রমিক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা একান্ত দুরূহ। মনুসংহিতায় প্রকৃত্যাদি তত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধচরিত কাব্য পাঠে দৃষ্ট হয়, বুদ্ধদেব রাজগৃহে অরাড়কালামের নিকট যে সাংখ্যমত শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা অধুনাতন প্রচলিত সাংখ্যমত হইতে কিয়দংশে পৃথক। বুদ্ধ-চরিত কাব্যে প্রকৃতি, বিকার, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত, তিনগুণ ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধ-চরিতকাব্য রচয়িতা লিখিয়াছেন, কপিল ও তাঁহার শিষ্যগণ সাংখ্যশাস্ত্রে সম্যক্সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রজাপতি ও তাঁহার পুত্র সাংখ্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান

লাভ করেন এবং জৈগীষব্য, জনক ও বৃদ্ধ পরাশর সাংখ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদিও সাংখ্যদর্শনের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান নাই, তথাপি উহা যে, প্রাচীন মনীষিগণের নিকট সর্ব্বতো-ভাবে সমাদৃত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ ভারতের যাবতীয় প্রাচীনশাস্ত্রে সাংখ্যমত প্রতিবিম্বিত। সাংখ্যদর্শনের চিহ্ন কোনকালেই হিন্দু শাস্ত্র হইতে অপনীত হইবে না।

নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শনের ইতিহাস সঙ্কলন করা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, সেশ্বর সাংখ্যের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাও তদ্রূপ কঠিন। সেশ্বর সাংখ্যদর্শন সচরাচর পাতঞ্জল দর্শন বা যোগদর্শন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাংখ্য ও যোগদর্শন প্রায় একই রূপ। যোগদর্শনের বিশেষত্ব এই যে, উহাতে এক অতিরিক্ত পরমাত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। কথিত আছে, মহামুনি পতঞ্জলি যোগদর্শনের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। পাণিনীয় মহাভাষ্যপ্রণেতা পতঞ্জলি ও যোগদর্শন প্রণেতা পতঞ্জলি, এক ব্যক্তি কি না জানা যায় না। অনেকেই উভয়কে পরস্পর অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে রাজা পুষ্যমিত্র ও তাঁহার সভার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এবং ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১১১ সূত্রে লিখিত আছে "যবন সাকেত অবরোধ করিয়াছিল।" নাগেশ ভট্টের মত এই যে, মহাভাষ্যে যে গোণিকাপুত্রের উল্লেখ আছে, উহা পতঞ্জলির নামান্তর মাত্র। এবং কৈয়টের মতে তিনি গোনর্দীয় নামেও অভিহিত ছিলেন। পতঞ্জলি স্বয়ং লিখিয়াছেন, তিনি কিছুকাল কাশ্মীরে বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ দেশীয় কোন রাজা তাঁহার মহাভাষ্য অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন। রুদ্রযামল, বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণ ও পদ্মপুরাণ পাঠে দৃষ্ট হয়, পতঞ্জলি ইলাবৃত বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম অঙ্গিরাঃ ও মাতার নাম সতী। তিনি দৈববিৎ ছিলেন। সুমেরু পর্ব্বতের উত্তরে বটবৃক্ষতলে লোলুপা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া, তিনি তাহাকে বিবাহ করেন। তিনি এক সময়ে তপোনিমগ্ন ছিলেন, এই অবসরে ভোটভাণ্ডারের অধিবাসীগণ আসিয়া তাঁহাকে অপমানিত করে। তখন তিনি স্বীয় মুখ হইতে বহ্নি নিঃসারিত করিয়া তাহাদিগকে ভস্মীভূত করেন।

মহাভাষ্যে পুষ্যমিত্রের সভা ও যবন কর্ত্তৃক সাকেত অবরোধের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হইয়াছিল। অতএব পতঞ্জলি ঐ সময়ের লোক।* পতঞ্জলি যে ইলাবৃত বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত এবং যে ভোটভাণ্ডার দেশের লোককর্ত্তৃক তিনি অপমানিত হইয়াছিলেন, উহা তিব্বতের নামান্তর মাত্র। এই সকল বৃত্তান্ত পাঠে প্রতীতি হয়, পতঞ্জলি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এইরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে।

ব্যাস পাতঞ্জল দর্শনের এক উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রণয়ন করেন। বেদান্তসূত্র প্রণেতা ব্যাস ও পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্য রচয়িতা ব্যাস এক ব্যক্তি কি না জানা যায় না। বেদান্তসূত্রে যোগদর্শনের উল্লেখ আছে। যাহা হউক পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যপ্রণেতা ব্যাস, অনুমান খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবার বলেন মহাভারতও ঐ সময়ে সঙ্কলিত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র যোগদর্শনের টীকা বিরচন করেন। ধারানগরীর রাজা ভোজদেব যোগদর্শনের যে বৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহা দ্বাদশ শতাব্দীর গ্রন্থ। ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ভিক্ষু যোগদর্শনের অপর একখানি টীকা বিরচন করেন।†

ক্রমশঃ—

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
প্রেসিডেন্সি কলেজ।

* এ সকল কথার মূল কি? আমরা বারান্তরে পতঞ্জলির জীবনচরিত সমালোচনা স্থলে এসকল কথার বিস্তৃতভাবে বিবেচনা করিব। স—সং।

† প্রবন্ধকার অনেকস্থলে নিজের মতের পরিপোষক প্রমাণাদি উদ্ধার করেন নাই। সুতরাং তাঁহার কৃত কপিলের কালনির্ণয়ের প্রামাণিকত্ব পক্ষে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। ভবিষ্যতে যদি প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা যৌক্তিক শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া, অথবা নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। প্রতীচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর অবলম্বিত কালনির্ণয় প্রায়শঃ অসমীচীন ও পৌর্ব্বাপর্য্য বিরোধী। স—সং।

জরাবগ্‌গো একাদশমো।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি।
অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্‌সথ॥ ১॥

অন্বয়,—(ইমস্‌সিং লোকসন্নিবাসে) নিচ্চং পাজ্জলিতে সতি কো নু হাসো কিমানন্দো; অন্ধকারেন ওনদ্ধা (কিংকারণা) পদীপং (ঞান পদীপং) ন গবেস্‌সথ।

সংস্কৃত,—(অস্মিন্ লোকে) নিত্যং প্রজ্বলিতে সতি (রাগাদিভিঃ একাদশভিঃ অগ্নিভিরিত্যর্থঃ *) কো নু হাসঃ যুষ্মাকমিতি শেষঃ) কো (বা) আনন্দঃ (বিদ্যতে); অন্ধকারেণ অবনদ্ধা (আবৃতাঃ সন্তঃ, যূয়মিতিশেষঃ) প্রদীপং (জ্ঞানপ্রদীপং) ন গবেষয়থ (অন্বেষয়থ)।

অনুবাদ,—অনুরাগ দ্বেষাদি দ্বারা তাপিত এই জগতে হাস্য বা আনন্দ কোথায়? হে মানবগণ! তোমরা অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছ ও জ্ঞানদীপের অনুসন্ধান করিতেছ না।

পস্‌স চিত্তকতং বিম্বং অরুকায়ং সমুস্‌সিতং।
আতুরং বহুসঙ্কপ্পং যস্‌স নত্থি ধুবং ঠিতি॥ ২॥

অন্বয়,—চিত্তকতং (কতচিত্তং) অরুকায়ং সমুস্‌সিতং আতুরং বহুসঙ্কপ্পং বিম্বং পস্‌স, যস্‌স ধুবং ঠিতি নত্থি।

সংস্কৃত,—চিত্রীকৃতং (বস্ত্রাভরণাদিভিঃ অলঙ্কৃতং) অরুকায়ং (?) সমুচ্ছ্রিতং আতুরং বহুসঙ্কল্পং বিম্বং পশ্য, যস্য ধ্রুবং স্থিতির্নাস্তি।

অনুবাদ,—বস্ত্রাদিদ্বারা সুসজ্জিত এই ক্ষতসমষ্টি স্বরূপ পুঞ্জীকৃত, রোগযুক্ত, নানাসঙ্কল্পপূর্ণ দেহকে অবলোকন কর, যাহার অপরিবর্ত্তনীয় স্থায়িত্ব নাই।

পরিজিন্নমিদং রূপং রোগনিড্ডং পভঙ্গুরং।
ভিজ্জতি পূতি সন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং॥ ৩॥

অন্বয়,—ইদং রূপং পরিজিন্নং রোগনিড্ডং পভঙ্গুরং; (অসৌ) পূতি-সন্দেহো ভিজ্জতি; জীবিতং হি মরণন্তং।

* বুদ্ধঘোষ।

সংস্কৃত,—ইদং রূপং (শরীরং) পরিজীর্ণং রোগনীড়ং প্রভঙ্গুরং; (অসৌ) পূতিসন্দেহো ভিদ্যতে; জীবিতং হি মরণান্তং।

অনুবাদ,—এই শরীর জীর্ণ, রোগপূর্ণ ও ভঙ্গুর; (এই) পূতিসমষ্টি স্বরূপ দেহ ভগ্ন হইয়া থাকে। জীবন মরণে অবসান হয়।

যানিংমানি অপত্থানি অলাপুনেব সারদে।
কাপোতকানি অট্‌ঠীনি তানি দিস্বান কা রতি॥ ৪॥

অন্বয়,—যানিংমানি সারদে অলাপুনেব অপত্থানি কাপোতকানি অট্‌ঠীনি তানি দিস্বান কা রতি।

সংস্কৃত,—যানীমানি শরদি অলাবূনি ইব অপাস্তানি (প্রক্ষিপ্তানি) কাপোতকানি (শুক্লানি) অস্থীনি, তানি পশ্যতঃ কা রতিঃ (আস্থা)।

অনুবাদ,—শরৎকালের অলাবুর ন্যায় প্রক্ষিপ্ত এই শুভ্র অস্থিগুলিকে দেখিয়া, ইহাদের প্রতি কি আস্থা হইতে পারে?

অট্‌ঠীনং নগরং কতং মংসলোহিতলেপনং।
যত্থ জরা চ মচ্চু চ মানো মক্‌খো চ ওহিতো॥ ৫॥

অন্বয়,—অট্‌ঠীনং নগরং মংসলোহিতলেপনং কতং, যত্থ জরা চ মচ্চু মানো (চ) মক্‌খো চ ওহিতো।

সংস্কৃত,—অস্থীনাং নগরং মাংসলোহিতলেপনং কৃতং, যত্র জরা চ মৃত্যুশ্চ মানশ্চ (অভিমানশ্চ) ম্রক্ষশ্চ (কাপট্যঞ্চ) অবহিতা (স্থিতা ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ,—অস্থি দ্বারা এক পুরী নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাতে রক্তমাংসের প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভিতর জরা, মৃত্যু, অহঙ্কার, এবং কাপট্য বাস করিতেছে।

জীরন্তি বে রাজরথা সুচিত্তা অথো সরীরম্পি জরংউপেতি।
সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি সন্তো হবে সব্‌ভি পবেদয়ন্তি॥ ৬॥

অন্বয়,—সুচিত্তা রাজরথা বে জীরন্তি, অথো শরীরম্পি জরং উপেতি; সতঞ্চ ধম্মো ন জরং উপেতি; (ইতি) হবে সন্তো সব্‌ভি পবেদয়ন্তি।

সংস্কৃত,—সুচিত্রা রাজরথা বৈ জীর্য্যন্তি, অথ শরীরমপি জরামুপৈতি; সতাং তু ধর্ম্মঃ ন জরামুপৈতি; (ইতি) সন্তঃ হি বৈ সদ্‌ভ্যঃ প্রবেদয়ন্তি (কথয়ন্তি)।

অনুবাদ,—রাজাদিগের সুচিত্রিত রথ সকলও জীর্ণ হইয়া যায়; আর (সেইরূপ) শরীরও জীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু সাধুগণের ধর্ম্ম জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না; সজ্জনেরা সজ্জন সমীপে এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অপস্‌সুতা ইয়ং পুরিসো বলিবদ্দো ব জীরতি।
মংসানি তস্‌স বড্‌ঢন্তি পঞ্‌ঞা তস্‌স ন বড্‌ঢতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়,—অপস্‌সুতা ইয়ং পুরিসো বলিবদ্দো ব জীরতি; তস্‌স মংসানি বড্‌ঢন্তি, তস্‌স পঞ্‌ঞা (চ) ন বড্‌ঢতি।

সংস্কৃত,—অল্পশ্রুতঃ (অল্পজ্ঞানসম্পন্নঃ) পুরুষঃ বলীবর্দ্দ ইব জীর্য্যতি (বৃদ্ধো ভবতি); তস্য মাংসানি বর্দ্ধন্তে, তস্য প্রজ্ঞা তু ন বর্দ্ধতে।

অনুবাদ,—যে ব্যক্তি অল্প জ্ঞান উপার্জ্জন করে, সে কেবল বলীবর্দ্দের ন্যায় বৃদ্ধ হইতে থাকে; তাহার মাংস বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহার জ্ঞান বর্দ্ধিত হয় না।

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনং ॥ ৮ ॥
গহকারক! দিট্‌ঠোহসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসঙ্খিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা ॥ ৯ ॥

অন্বয়,—গহকারকং গবেসন্তো অনিব্বিসং অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং, পুনপ্‌পুনং জাতি দুক্‌খা। গহকারক, দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি; সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা, গহকূটং বিসঙ্খিতং, বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়ং অজ্‌ঝগা।

সংস্কৃত,—গৃহকারকং (অস্য আত্মরূপস্য গৃহস্য কর্ত্তারং) গবেষয়ন্ (অন্বিষ্যন্) অনির্বিশন্ (অবিন্দন্ অলভমানঃ) অনেকজাতিসংসারং সমধাবিষম্ দধার জন্মনঃ জন্মান্তরং প্রাপ সংসারাৎ সংসারান্তরঞ্চ অগমমিত্যর্থঃ) *, পুনঃ পুনঃ জাতিঃ (জন্ম) দুঃখা (দুঃখকরা)। গৃহকারক দৃষ্টোহসি (ময়েতি শেষঃ), পুনঃ গৃহং ন করিষ্যসি; সর্ব্বাং তে পার্শ্বকা ভগ্নাঃ, গৃহকূটং বিসংস্কৃতং (ভগ্নং, নষ্টং), বিসংস্কারগতং (নির্ব্বাণগতং) চিত্তং তৃষ্ণাণাম্ ক্ষয়ং অধ্যগাৎ (প্রাপৎ)।

* ইতি বুদ্ধঘোষ।

'গহকারক',—গৃহকারক,—'গৃহ' অর্থে 'এই দেহ' ইহার 'কারক' অর্থাৎ 'নির্ম্মাতা' = সংস্কারাদি, যাহা পুনর্জন্ম আনয়ন করে।

'সন্ধাবিস্‌সং'—এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার আকৃতি অনুসারে ইহাকে ভবিষ্যতের উত্তম পুরুষ এক বচনের পদ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। (Prof. Max Muller) অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অর্থ ঠিক করা যায় না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা অন্য কোন কোন (Childers) চাইল্ডার্স প্রমুখ পণ্ডিতগণের ন্যায় উহাকে লুঙের পদ (সমধাবিষম্) বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

অনুবাদ,—দেহরূপ গৃহনির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, কিন্তু তাঁহাকে না পাইয়া, কত বার জন্মগ্রহণ করিলাম, কত সংসারই পরিভ্রমণ করিলাম; পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কি দুঃখকর! হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না; তোমার সকল কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, গৃহাবলম্বন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণগত আমার চিত্তে তৃষ্ণা সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং।
জিণ্ণকোঞ্চাহব ঝায়ন্তি খীণমচ্ছেহব পল্ললে ॥ ১০ ॥

অন্বয়,—ব্রহ্মচরিয়ং অচরিত্বা যোব্বনে ধনং অলদ্ধা (পুরিসো) খীণমচ্ছে পল্ললে জিণ্ণকোঞ্চাহব ঝায়ন্তি।

সংস্কৃত,—ব্রহ্মচর্য্যং অচরিত্বা যৌবনে ধনং অলব্ধ্বা জনঃ ক্ষীণমৎস্যে পল্বলে জীর্ণক্রৌঞ্চ ইব ক্ষিণ্বন্তি (নশ্যন্তি)।

অনুবাদ,—ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করিলে, যৌবনে ধন উপার্জ্জন না করিলে, মৎস্যহীন পুষ্করিণীতে জীর্ণ ক্রৌঞ্চের ন্যায় নাশ প্রাপ্ত হইতে হয়।

অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধনং।
সেন্তি চাপাতিখীণাহব পুরাণানি অনুত্থুনং ॥ ১১ ॥

BLEED THROUGH

অন্বয়,—ব্রহ্মচরিয়ং অচরিত্বা যোব্বনে ধনং অলদ্ধা (পুরিসো) পুরাণানি অনুত্থুনং অতিখীণো চাপাহব সেন্তি।

সংস্কৃত,—ব্রহ্মচর্য্যং অচরিত্বা যৌবনে ধনং অলব্ধ্বা জনঃ পুরাণানি অনুস্তুবন্ অতিক্ষীণঃ চাপ ইব শেতে।

অনুবাদ,—ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করিলে, যৌবনে ধন উপার্জ্জন না করিলে, পুরাতন কথা স্মরণ করিতে করিতে জীর্ণ ধনুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়।

অত্তবগ্‌গো দ্বাদসমো।

অত্তানং চে পিয়ং জঞ্ঞা রক্‌খেয্য তং সুরক্‌খিতং।
তিণ্ণমঞ্ঞতরং যামং পটিজগ্‌গেয্য পণ্ডিতো ॥ ১ ॥

অন্বয়,—অত্তানং চে পিয়ং জঞ্ঞা (ততো) তং সুরক্‌খিতং রক্‌খেয্য; পণ্ডিতো তিণ্ণমঞ্ঞতরং যামং পটিজগেয্য।

সংস্কৃত,—আত্মানং চেৎ প্রিয়ং জানীয়াৎ ততঃ তং সুরক্ষিতং রক্ষেৎ; পণ্ডিতঃ ত্রয়াণামন্যতরং যামং প্রতিজাগৃয়াৎ।

অনুবাদ,—যদি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর, তবে তাহাকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবে; পণ্ডিতব্যক্তি ত্রিযামের মধ্যে (অন্ততঃ) এক যামও জাগরিত থাকিবেন।

অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে।
অথঽঞ্ঞমনুসাসেয্য ন কিলিস্‌সেয্য পণ্ডিতো ॥ ২ ॥

অন্বয়,—অত্তানমেব পঠমং পতিরূপে নিবেসয়ে, অথ অঞ্ঞং অনুসাসেয্য; পণ্ডিতো (এবং করিয়) ন কিলিস্‌সেয্য।

সংস্কৃত,—আত্মানমেব প্রথমং প্রতিরূপে কর্ত্তব্যে নিবেশয়েৎ অথ (তদনন্তরং) অন্যমনুশিষ্যাৎ; পণ্ডিতঃ (এবং কৃত্বা) ন ক্লিশ্যেৎ (ক্লেশং প্রাপ্নুয়াৎ)।

অনুবাদ,—যাহা কর্ত্তব্য তাহাতে অগ্রে আপনাকে নিবিষ্ট করিবে, পরে অন্যকে উপদেশ দিবে; পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ করিলে ক্লেশ পাইবেন না।

অত্তানঞ্চে তথা কয়িরা যথঞ্ঞমনুসাসতি।
সুদন্তো বত দম্‌মেথ অত্তা হি কির দুদ্দমো ॥ ৩ ॥

অন্বয়,—যথঞ্ঞমনুসাসতি তথা অত্তানং চে কয়িরা (ততো) সুদন্তো বত দম্মেথ; অত্তাহি কির দুদ্দমো।

সংস্কৃত,—যথান্যমনুশাসতি তথা আত্মানঞ্চেৎ কুর্য্যাৎ (ততঃ) সুদান্তঃ (ভূত্বা, অন্যমপি) দময়েৎ; আত্মা হি কিল দুর্দ্দমঃ।

অনুবাদ,—লোকে অন্যকে যেরূপ হইতে উপদেশ দেয় আপনাকে যদি সেইরূপ করে, তবে আপনি সংযত হইয়া পরকেও দমন করিতে পারে; আত্মাই যথার্থ দুর্দ্দমনীয়।

অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া।
অত্তনাইব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং ॥ ৪ ॥

অন্বয়,—অত্তা হি অত্তনো নাথো, কো হি পরো নাথো সিয়া; সুদন্তেন অত্তনা ইব দুল্লভং নাথং লভতি।

সংস্কৃত,—আত্মা হি আত্মনঃ নাথঃ, কো হি পরো নাথঃ স্যাৎ; সুদান্তেন আত্মনৈব দুর্ল্লভং নাথং লভতে।

অনুবাদ,—আত্মাই আত্মার নাথ, অন্য নাথ আর কে আছে? আত্মাকে সুসংযত করিতে পারিলে, লোকে দুর্ল্লভ নাথ লাভ করে।

অত্তনাইব কতং পাপং অত্তজং অত্তসম্ভবং।
অভিমন্থতি দুম্মেধং বজিরং ব অস্ময়ং মণিং ॥ ৫ ॥

অন্বয়,—অত্তনাইব কতং অত্তজং অত্তসম্ভবং পাপং বজিরং অস্ময়ং মণিং ব দুম্মেধং অভিমন্থতি।

সংস্কৃত,—আত্মনৈব কৃতং আত্মজং আত্মসম্ভবং পাপং বজ্রঃ অশ্মময়ং মণিমিব দুর্ম্মেধসং অভিমথ্নাতি।

অনুবাদ,—হীরক যেমন প্রস্তরময় মণিকে খণ্ড খণ্ড করে, আত্মকৃত, আত্মজ ও আত্মসম্ভব পাপ সেইরূপ নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে মথিত করে।

যস্‌স অচ্চন্তদুস্‌সীল্যং মালুবা সালমিবোততং।
করোতি সো তথঽত্তানং যথা নং ইচ্ছতি দিসো ॥ ৬ ॥

অন্বয়,—যস্স অচ্চন্তদুস্সীল্যং, সো মালুবা ওততং সালমিব অত্তানং তথা করোতি যথা দিসো'নং ইচ্ছতি।

সংস্কৃত,—যস্য অত্যন্তদৌঃশীল্যং, সঃ 'মালুবা' (লতা) অবততং (বেষ্টিতং) সালমিব আত্মানং তথা করোতি যথা দ্বিষঃ এনমিচ্ছন্তি।

'মালুবা ওততং সালমিব'—'মালুবা'* শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না; উহার অর্থ লতা†। এখানে উপমাটি স্পষ্ট বুঝা যায় না।

অনুবাদ,—লতা যেমন বেষ্টিত সালবৃক্ষের সহিত ইতস্ততঃ নীত হয়, সেইরূপ যাহার দুঃশীলতা অত্যন্ত অধিক, তাহার শত্রু তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা করে, সে আপনাকে সেইরূপ করিয়া ফেলে।

সুকরানি অসাধূনি অত্তনো অহিতানি চ।
যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুক্করং॥ ৭॥

অন্বয়,—অসাধূনি অত্তনো অনহিতানি চ সুকরাণি; যং বে হিতঞ্চ সাধুঞ্চ তং বে পরমদুক্করং।

সংস্কৃত,—অসাধূনি আত্মনোঽহিতানি চ (কর্ম্মাণি) সুকরাণি; যৎ বৈ হিতঞ্চ সাধু চ তৎ বৈ পরমদুষ্করম্।

অনুবাদ,—অসাধু ও আপনার অহিতকর কর্ম্ম করা সহজ; কিন্তু যাহা সাধু ও হিতকর তাহা অতিশয় দুষ্কর।

* মূলের পাঠ ও ব্যাখ্যা প্রতীচ্যপণ্ডিতানুমোদিত হইলেও সমীচীন বোধ হয় না। মূল না পাওয়ায় আমরা পাঠোদ্ধার করিতে পারিলাম না। তবে মূলের পাঠে যেরূপ অর্থ কল্পনা করিলে, অর্থসঙ্গতি হয়, তাহা এস্থলে প্রদত্ত হইল। "মালুবা সালং" ইহার অর্থবোধ হয়, লতা যেমন বৃক্ষকে ব্যাপ্ত করে, তদ্রূপ ইত্যাদি। "যস্য অত্যন্তদৌঃশীল্যং মালুবা সালং বৃক্ষং ইব অবততং সন্ততো ব্যাপ্তং সর্ব্বতোমুখং ইত্যর্থঃ ভবতি, স আত্মানং তথা করোতি যথা এনং দ্বিট্ শত্রুরিচ্ছতি, অর্থাৎ স নরঃ শত্রুনন্দনো ভবতি ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ সাল যেমন লতাদ্বারা অত্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইলে, লতাবেষ্টন অতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার আত্মা দুঃশীলতায় সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন সে এরূপ করে যে, শত্রুরাও তাহাকে তদ্রূপ ইচ্ছা করে। অর্থাৎ তাহার অবশ্যম্ভাবী পতন ভাবিয়া শত্রুরা আনন্দিত হয়। স—সং।

† প্রমাণ কি?

যো সাসনং অরহতং অরিয়ানং ধম্মজীবিনং।
পটিক্কোসতি দুম্মেধো দিট্‌ঠিং নিস্‌সায় পাপিকং।
ফলানি কট্‌ঠকস্‌সেব অত্তহঞ্ঞায় ফল্লতি॥ ৮॥

অন্বয়,—যো দুম্মেধো পাপিকং দিট্‌ঠিং নিস্‌সায় অরহতং অরিয়ানং ধম্মজীবিনং (চ) সাসনং পটিক্কোসতি, (সো) কট্‌ঠকস্স ফলানিহ অত্তহঞ্ঞায় ফল্লতি।

সংস্কৃত,—যো দুর্ম্মেধাঃ পাপিকাং দৃষ্টিং (দর্শনং, শাস্ত্রমিত্যর্থঃ) নিঃশ্রিত্য (আশ্রয়ত্বেন গৃহিত্বা) অর্হতাং আর্য্যাণাং ধর্ম্মজীবিনাঞ্চ শাসনং প্রতিক্রুশ্যতি, সঃ 'কট্‌ঠকস্য' ফলানীব আত্মহত্যায়ৈ ফুল্লতি।

অনুবাদ,—যে নির্ব্বোধ ব্যক্তি অসত্য পাপ মত অবলম্বন করিয়া অর্হৎ-বর্গের, আর্য্যগণের ও ধার্ম্মিকগণের শাসনকে অবজ্ঞা করে, সে 'কট্‌ঠকের' ফলের ন্যায় আপনার নাশের ফল প্রসব করে।

অত্তনাহব কতং পাপং অত্তনা সঙ্কিলিস্সতি।
অত্তনা অকতং পাপং অত্তনাহব বিসুজ্ঝতি।
সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং নাহঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোধয়ে॥ ৯॥

অন্বয়,—অত্তনাহব পাপং কতং, অত্তনা সঙ্কিলিস্সতি; অত্তনা পাপং অকতং, অত্তনাহব বিসুজ্ঝতি; সুদ্ধি অসুদ্ধি পচ্চত্তং, ন অঞ্ঞো অঞ্ঞং বিসোধয়ে।

সংস্কৃত,—আত্মনৈব পাপং কৃতং, আত্মনা সংক্লিশ্যতি; আত্মনা পাপং অকৃতং, আত্মনৈব বিশুধ্যতি; শুদ্ধিঃ অশুদ্ধিশ্চ প্রত্যাত্মং (বর্ত্ততে) ন অন্যঃ অন্যং বিশোধয়েৎ।

অনুবাদ,—লোকে আপনি পাপ করে, আপনিই কষ্ট পায়; আপনি পাপ না করিলে, আপনিই পবিত্র থাকে; শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি স্বাত্মনিষ্ঠ অন্যে অন্যকে শুদ্ধ করিতে পারে না।

অত্তদত্থং পরত্থেন বহুনাহপি ন হাপয়ে।
অত্তদত্থমভিঞ্ঞায় সদত্থপসুতো সিয়া॥ ১০॥

অন্বয়,—বহুনাহপি পরত্থেন (পুগ্গলো) অত্তদত্থং ন হাপয়ে, অত্তদত্থমভিঞ্ঞায় সদত্থপসুতো সিয়া।

সংস্কৃত,—বহুনাপি পরার্থেন (পরকীয়বহুকার্য্যানুরোধাদপীত্যর্থঃ) (নরঃ) আত্মনোঽর্থং (আত্মমঙ্গলকরকার্য্যং) ন হাপয়েৎ (ত্যজেৎ), আত্মার্থং অভিজ্ঞায় (সম্যজ্‌জ্ঞাত্বা) স্বদর্থপ্রসিতঃ (স্বকীয়মঙ্গলার্থেঽভিনিবিষ্টঃ) স্যাৎ।

অনুবাদ,—পরকীয় বহু কর্ত্তব্যের অনুরোধেও কোন ব্যক্তির আপনার মঙ্গলকর কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নয়, স্বকীয় মঙ্গলজনক কার্য্য উত্তমরূপে জানিয়া তাহাতে নিবিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

যোগদর্শন।*

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোনকালেই মনুষ্যগণ বাহ্যজগতের ব্যাপারে পরিপূর্ণ শান্তিলাভ করিতে পারে নাই। শান্তি পাইবার আশায় মনুষ্যগণ ভবিষ্যতের গর্ভ আলোড়িত করিতে ব্যগ্র হয়। কেন আমরা জন্মগ্রহণ করিতেছি, আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং কোথায় যাইব, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা করাই পূর্ব্বতন এবং আধুনিক প্রত্যেক দার্শনিকেরই প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন প্রকারে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে, কিন্তু ঋষিগণ যোগ-দর্শনে এই সকল প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা অন্যান্য দার্শনিকদিগের ন্যায় কেবল তর্ক বা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন যে "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া" অর্থাৎ কেবল তর্ক দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, সেই জন্য তর্ক ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা পরীক্ষার দ্বারা তাঁহাদের অনুমান সকল প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। চিন্তনের উপযোগী দেশ, কাল ও জলবায়ুর গুণে এবং কোন ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডীর' ভিতর আবদ্ধ না থাকাতে, সেই পূর্ব্বতন ঋষিদিগের চিন্তার স্রোত অবাধে বিশ্বসংসার ভেদ করিয়া অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল।

* গত ২২শে কার্ত্তিক, (Theosophical Society) পরাবিদ্যা সমিতির অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। লেখক।

বর্ত্তমান অন্যান্যদর্শন হইতে যোগদর্শনের অনেক অংশে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় ইহা এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বলে না যে, কতকগুলি ভাব ও ইন্দ্রিয়পরিণাম জ্ঞানের গম্য, এবং তাহা ভিন্ন অপর সকল অজ্ঞেয়; সুতরাং ঐ অজ্ঞেয় হইতে আমাদের বুদ্ধি এবং বিচার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। কিম্বা এমনও কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই যে, একজন ন্যায়বান্, দয়াশালী এবং মহান্ ঈশ্বর, ঐ সকল গুণযুক্ত হইয়াও, এই দুঃখময় পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।

যোগবিৎ মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন যে, দুর্জ্ঞেয় বলিয়া কিছুই নাই। যদি আমরা যথার্থ পথ অনুসরণ করিতে পারি, তাহাহইলে আমরা সকল বিষয়ই জানিতে সমর্থ হইতে পারি। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতর চিন্ময় আত্মা বিরাজ করিতেছেন। সকল মনুষ্যেরই সেই আত্মসাক্ষাৎ করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাঁহাদের মতে বাহ্যজগৎ বলিয়া কিছুরই অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক বস্তুই কল্পনাপ্রসূত বলিয়াই, অন্তর হইতে বাহির হইয়া বাহ্যজগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহারা বলেন যে, কেহ তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই, এবং তাঁহারা ভিন্ন অপর কেহ তাঁহাদের ভাগ্যকর্ত্তা বিধাতা নহেন। তাঁহারা এরূপও বলিয়া থাকেন যে, সাধারণতঃ কেবল দুইটী বিষয়ের অস্তিত্ব আছে,—একটী মহান্ আত্মা, এবং অপরটী জগৎ। প্রথমটী চিন্ময় এবং, দ্বিতীয়টী প্রথমটীর ভ্রমকল্পনা বা মায়াপ্রসূত। তাঁহাদের মতে এই মায়া বা ভ্রমজ্ঞান দূর করাই, মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। মায়া দূরীকৃত হইলে, মনুষ্য প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্তাধীন করিয়া কেবল চিদ্রূপেই বিরাজ করেন।

তাঁহারা বলেন যে, যদিও সকল মনুষ্য কালক্রমে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তথাপি এই অবস্থায় উপনীত হইতে বহুজন্ম অতীত হইয়া যাইবে। সেই জন্য যোগীরা এমন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাদ্বারা পুরুষকারবলে, অতি সত্বরই ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি ইহজন্মে মায়ার নাশ করিয়া আত্মা স্বরূপে বিরাজ করিতে পারেন। প্রবল পুরুষকার ভিন্ন এই মায়াপিঞ্জর ভেদ করিবার অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মপথ অনায়াসসাধ্য নহে; মায়াজাল ছিন্ন করাও অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত।

সেই জন্যই মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন,—

> "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
> দুর্গমম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"
>
> (কঠোপনিষৎ)

মোহ নিদ্রা হইতে উত্থিত হও, জাগরিত হও; না উঠিলে, না জাগিলে এই ক্ষুরধার নিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না।

অন্যান্য দার্শনিকদের ন্যায় ঋষিরা আমাদিগকে এই পাঞ্চভৌতিক প্রত্যক্ষ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র ভাবের জগতে বিচরণ করিতে হইবে, ইহা বলিয়া ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা অপরের ন্যায় কেবল কল্পনা-বাহিত পথে বিচরণ করিতে বলেন না। পরন্তু কি উপায়ে মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাঁহারা তাহার উপায় প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন যে, এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখ, তোমরাও কৃতকার্য্য হইবে। অপর ধর্ম্মের ন্যায় তাঁহারা "অঙ্গীকৃত দেশের" জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলেন না। তাঁহারা বলেন যে, আমরা যে উপায় আবিষ্কার করিয়াছি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে, করতলস্থিত আমলকের ন্যায় ফল দৃষ্ট হইবে। সত্যমিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখ। এই উপায়টীর নাম যোগ। ইহার দ্বারা ইহজন্মেই প্রবল পুরুষকার সাহায্যে আত্মা মায়াজাল ছিন্ন করিয়া স্ব-রূপে প্রকাশিত হইতে সক্ষম হন।

সংকল্প আমাদের এই ভ্রমজ্ঞান বা মায়ার একমাত্র কারণ। সংকল্প আছে বলিয়াই, আমরা জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এই সংসারচক্রে ঘুরিতেছি। বুদ্ধদেব যখন প্রবুদ্ধ হন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে,—

> "জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান,
> সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
> পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার
> হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর।

> ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,
> সংস্কারবিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"
>
> (বৌদ্ধধর্ম্ম)।

সংকল্পময় আকারই আমাদের 'গৃহকারক।' চিত্ত সংস্কারবিহীন হইলে, এবং তৃষ্ণার ক্ষয় হইলে, এই সংসারচক্রে আর আবর্ত্তিত হইতে হইবে না। সুতরাং সংকল্পই এই সংসারচক্রের নাভি। এই নাভি রোধ করিলে, এই সংসার চক্র আর চলিতে পারিবে না। অতএব যুক্তিপূর্ব্বক দৃঢ় বৈরাগ্য অভ্যাসরূপ পরম পুরুষকার অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধিবলে সংসার চক্রের নাভি, চিত্তকে রুদ্ধ করা উচিত। সংকল্প নাশ করাই যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাহ্যবস্তুর ভাবনা করার নামই সংকল্প। কেবল সমাধিবলেই বাহ্যবস্তুর ভাবনা পরিত্যাগ করা যায়। স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরম, এই ত্রিবিধরূপে জীব বিরাজ করিতেছেন। ভোগের নিমিত্তই জীব, এই স্থূলরূপ ধারণ করিতেছে ও সংকল্পময় আকারে বা আতিবাহিক দেহে জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতেছে। এই দুইটী পরিত্যাগ করিয়া চরম যে পরমরূপ, তাহা গ্রহণ করা উচিত। সেই জন্যই বুধগণ বাহ্যবস্তুর বিস্মৃতি-পূর্ব্বক যথার্থ চিত্তক্ষয়কেই যোগ বলিয়া জানেন। সংকল্পই পরম বন্ধন। সংকল্প-শূন্যতাই মোক্ষ।

যোগীরা অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিয়া কেন যোগ অভ্যাস করেন, তাহার উত্তরে ঋষিরা বলেন যে,—পরমপদই বা কি, আমার উপর কে আছেন, কে নাই, পাপপুণ্য বা কোন্ পদার্থ, জন্মমৃত্যুই বা কি, সুখদুঃখই বা কি,—এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়ার জন্য জ্ঞানিগণ সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে যোগবিদ্যা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেই যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগী স্বয়ং জানিতে পারেন যে, "আমি সকলের আদি"। পাপ পুণ্য ইত্যাদি কল্পনামাত্র; অবিদ্যা ভ্রম মাত্র। ঐ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা 'আমি'। আমার উপর কেহই নাই। তিনি তখন জানিতে পারেন যে, "আমার ভয় নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পাপপুণ্য, স্বর্গনরক প্রভৃতি ভ্রম মাত্র। আমার কল্পনা দ্বারা আমি ঐ সকল ভ্রম সৃষ্টি করিয়াছি। তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে বাহ্যক্রিয়া ত্যাগ করেন। যদি বল, তিনি লোক শিক্ষার্থে করিতেছেন, তাহা

হইলে, লোকভয় তাঁহার উপর রহিয়া গেল। তবে তিনি কি প্রকারে নির্ভয় হইলেন? যখন ঐ সকল সংকল্প যোগীর মনে উদয় হয়, তখন যোগীকে স্বয়ং বুঝিতে হইবে যে, এই অনিত্য অসার কল্পনা আমার মনে কেন উদয় হইতেছে? বোধ হয়, আমার সংকল্প বিকল্প মনে স্থান পাইয়াছে। আমার সম্পূর্ণরূপে চিত্তজয় হয় নাই। তখন "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের বিচার করিয়া যোগী ঐ সকল কল্পনা বিনাশ করিবেন। তাহা হইলে লোকভয়, দেবভয়, স্বর্গনরকের ভয়, জাতিভেদ, লজ্জা প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না। সকলই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। ঋষিরা বলেন যে, যে স্থানে যাইবার জন্য যোগীরা এত কষ্ট করিতেছেন, সেই স্থানে যোগীরা অবশ্য যাইতে পারিবেন। কারণ, সেই স্থানে 'আমি' নাই। যখন সেই স্থানে 'আমি' নাই, তখন জগতের ভেদাভেদ, পাপপুণ্য, স্বর্গনরকরূপ অসার ভার রাখিবার স্থান কোথায়? সে স্থান ত শূন্য। ভার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেই পুনঃ পৃথিবীতে আসিতে হইবে। ইহাকেই যোগের অধঃপতন বলে। তাঁহারা বলেন যে, যেখানে 'রাম' নাই, সেখানে "হাম্ হ্যায়" এবং যেখানে "হাম্ নাহি" সেখানে "রাম হ্যায়"। অর্থাৎ, যেখানে 'আমি' নাই সেখানে সেই চিন্ময় পুরুষ আছেন, এবং যেখানে 'আমি' আছি, সেখানে সেই চিন্ময় পুরুষ নাই। ঋষিদের আবিষ্কৃত যোগদর্শনের ইহাই গূঢ় তত্ত্ব।

যোগ কাহাকে বলে, তাহার উত্তরে ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাঙ্গতিম্।
তং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্॥"

(কঠোপনিষৎ)

অর্থাৎ, যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি নিজ বিষয় চেষ্টা করে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানিগণ পরমগতি বলেন, এবং সেই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলেন। যোগারূঢ়ের লক্ষণ সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে,—

"যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে
সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥"

অর্থাৎ, যখন মানব ইন্দ্রিয়াদির ভোগের জন্য শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, তৎসাধনের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত, এবং আসক্তির মূলীভূত সমস্তপ্রকার সঙ্কল্প বর্জ্জিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। তখন সংকল্প বিকল্পের নিরোধ হয়। তখনই মনের নিবৃত্তি হয়, এবং শান্তি লাভ হয়। সেই জন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে, "মনোনিবৃত্তি পরমোপশান্তি" (যতিপঞ্চক)। সেই নিরোধ অবস্থায় আত্মা স্বরূপে, অর্থাৎ স্বকীয় নির্লিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা সংকল্প ও বিকল্পের নিরোধ করিতে হয়। বহুকাল যাবৎ নিরন্তর আদরসহকারে তপস্যা প্রভৃতি সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাস স্থির হয়। তখন চিত্ত-প্রসাদ লাভ হয়। যতদিন চিত্তপ্রসাদ লাভ না হয়, ততদিন বিশেষ সতর্ক ভাবে ও ভক্তিসহকারে নিরন্তর যোগোপায়ের অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ, চিত্তকে স্থির করা অতি দুরূহ ব্যাপার। অর্জ্জুন বলিয়াছেন যে,—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মনো বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

(গীতা)

অর্থাৎ, মন বড়ই চঞ্চল, বায়ুর ন্যায় ইহাকেও বশীভূত করা দুষ্কর কার্য্য। ভাগ্যবশতঃ যদিও চিত্ত প্রশান্ত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার অস্থির হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং একবার চিত্ত স্থির হইয়াছে, দেখিয়া নিশ্চিন্ত না হইয়া দীর্ঘকাল ভক্তিসহকারে যোগোপায়ের অনুষ্ঠান করা উচিত। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে বৈরাগ্যের উদয় হয়। সেইজন্য বৈরাগ্যের অপর নাম জ্ঞানযোগ। বৈরাগ্য দুই প্রকার, অপর ও পর। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুখসাধন উপস্থিত হইলেও, তাহাতে সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত থাকার নাম অপর-বৈরাগ্য। বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় আত্মা পৃথক, ইহা সম্যক্ প্রত্যক্ষ হইলে, প্রকৃতি ও তৎকার্য্য জড়বর্গ বিষয়ে অনুরাগ থাকে না, ইহাকে পর-বৈরাগ্য বলে। পর-বৈরাগ্যের অপর নাম জীবন্মুক্তি। অভ্যাস ও বৈরাগ্যরূপ জ্ঞান-যোগের দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্প বিনষ্ট হইলে, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি লাভ হয়। কেবলমাত্র বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না। তাহার সহিত অভ্যাসও চাই। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥"

অর্থাৎ, হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া থাকে। সমাধি দুই প্রকার; সবিকল্প ও নির্বিকল্প। কোনও একটী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু অবলম্বন, করিয়া তদাকারে চিত্তের বৃত্তিধারাকে সবিকল্প সমাধি বলে। যেমন, জ্যোতির্দর্শন, মূর্ত্তিদর্শন, শব্দশ্রবণ, ইত্যাদি। তখন মন একাগ্রভাব ধারণ করে। এই অবস্থায় 'আমি' আছি, অর্থাৎ মন থাকে। যখন মনের লয় হয়, তখন চিত্তের কোন বৃত্তি থাকে না। চিত্ত তখন নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং পুরুষেও বিষয়রূপ চিত্তবৃত্তির ছায়া পড়ে না। অর্থাৎ, তখন পুরুষের, আমি সুখী, দুঃখী, ইত্যাদি জ্ঞান হয় না। ইহাকেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বলা হয়। যোগীরা বলেন যে, ঐ নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিবার জন্য আট প্রকার পথ আছে। এই সকল পথ কি, ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে,—

"শুদ্ধ দৃষ্টি নিরমল,
সত্যবাক্য, সুসঙ্কল্প, সাধু ব্যবহার।
পুণ্যকর্ম্ম, সাধু উপজীবিকা সুন্দর,
শুদ্ধস্মৃতি, অবিচল সত্য ধ্যান আর।"

(অমিতাভ)

এই অষ্ট পথের দ্বারা চিত্ত সঙ্কল্পশূন্য হইয়া নির্ম্মল হয়। তপস্যাতে অধিক দেহ নিষ্পাড়ন প্রয়োজন কি না, ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে;—

"একদিকে ইন্দ্রিয়ের সুখ,
অন্য দিকে ব্রহ্মচর্য্য দেহ নিষ্পীড়ন
পরিহরি, মধ্যপথ করি অনুসার,
করি অষ্ট পথে চিত্ত নৈর্ম্মল্য সাধন,
হও ধ্যানে অগ্রসর॥"

(অমিতাভ)

তখনই যথার্থ বৈরাগ্যের উদয় হইবে। পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন যে, ঐ সমাধি লাভ করিতে হইলে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির প্রয়োজন। যতক্ষণ চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ নির্ব্বিকল্প সমাধি হইবে না। সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে,—

"মন, চিত্ত, বুদ্ধি
তিনে নহে শুদ্ধি।"

অর্থাৎ যতক্ষণ, মন, চিত্ত ও বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ চিত্তশুদ্ধি বা ভাব শুদ্ধি হইবে না। যম, নিয়ম ইত্যাদি দ্বারা মন, চিত্ত ও বুদ্ধির নাশ হইয়া ভাবশুদ্ধি হয়, এবং পরে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়।

যোগাধিকারি সম্বন্ধে সণৎকুমার গীতায় উল্লিখিত আছে যে,—

"যোগাধিকারিণঃ সর্ব্বে প্রাণিণঃ সর্ব্বদা যাতাঃ।
বালো বৃদ্ধো ব্যাধিযুক্তো যুবা স্ত্রী শূদ্রমন্ত্রভূৎ॥"

অর্থাৎ, সকল সময়ে সকল প্রাণীই যোগের অধিকারী; তিনি বালকই হউন, বৃদ্ধই হউন, ব্যাধিযুক্তই হউন, যুবাই হউন, স্ত্রীই হউন, আর শূদ্রই হউন, সে জন্য কিছু বাধা নাই। অর্থাৎ যিনি যে অবস্থায় থাকুন, তিনি যোগের অধিকারী।

যোগ কিরূপে শিক্ষা করা যায়, ইহার উত্তরে ঋষিরা বলিয়াছেন যে, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মবিদ্ গুরুর অন্বেষণ করিয়া, তাঁহার নিকট জ্ঞান ও ধ্যান শিখিবে। মুমুক্ষুগণ কখনও অজ্ঞানী গুরুর কাছে যাইবেন না। কারণ, উপনিষৎ বলিয়াছেন যে,—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ॥"

(কঠোপনিষৎ)

অর্থাৎ, যাহারা অজ্ঞানতায় অবস্থিত, অথচ আপনাদিগকে বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা দন্দ্রম্যমান অর্থাৎ অতিশয় কুটিল ভাবে নানা পথে চালিত হইয়া, অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধদিগের ন্যায়

পরিভ্রমণ করে। যিনি স্বয়ং অন্ধ, তিনি অন্যকে কেমন করিয়া পথ দেখাইবেন? সুতরাং জ্ঞানী গুরুর আশ্রয় লওয়া উচিত।

মুমুক্ষুগণের সৎগুরুগম্য মহাবাক্য, জ্ঞান, ধ্যান ও তপস্যার বিশেষ প্রয়োজন। তপস্যা কাহাকে বলে, তাহার উত্তরে ঋষিরা বলিয়াছেন যে,—

"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥"
(জ্ঞানসংকলিনী)

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। যিনি ঊর্দ্ধরেতাঃ তিনি মনুষ্য নহেন, দেবতা। শম, দম ইত্যাদির দ্বারা আত্মশোধনের নামই ব্রহ্মচর্য্য। সুতরাং মুমুক্ষুগণের ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই, সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে, এপথে উন্নতির কোন আশা নাই। ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের বলবৃদ্ধি হইলে মনেরও বল বৃদ্ধি হয়। সুতরাং রিপুগণের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করা যায়। সেই জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ", অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা বীর্য্যলাভ হয়।

যোগীরা বলেন যে, বহির্ব্রহ্মাণ্ডের সকল লক্ষণ আমাদের এই দেহরূপী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং যে অনন্ত শক্তি এই বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাও আমাদের দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মহাশক্তিকে প্রাণ বলে। আমাদের দেহস্থ সেই প্রাণশক্তিকে জয় করিতে পারিলে, আমরা মহাপ্রকৃতিকে জয় করিতে সমর্থ হইব। সেই প্রাণজয়ের নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম হইলে, যথার্থ প্রাণের শান্তি পাওয়া যায়। যোগীরা আরও বলিয়াছেন যে, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, সেই প্রাণশক্তির পরিচায়ক। যেরূপ দেবাসুরগণ সর্পরূপ রজ্জুর সাহায্যে পর্ব্বতদ্বারা সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ, যোগীরা বলেন যে, আমাদের শ্বাসরূপ দণ্ডদ্বারা যদি এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে মন্থন করা যায়, তবে অমৃতোপম তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভূত হইবে। ঐ অমৃত পান করিয়া যোগী নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

এই প্রাণজয় বা প্রাণায়াম অভ্যাসের জন্য বিভিন্ন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, তিনটী উপায়ের দ্বারা প্রাণজয় করিতে পারা যায়। প্রথম যোগের দ্বারা, দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা, তৃতীয় ঔষধের দ্বারা। যোগের মধ্যেও বিভিন্ন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং সকলই যে মুক্তির পথ তাহা নহে। ঐ সকল পথ বিশেষরূপে এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। তবে ঐ সকল পথের মধ্যে যে দুইটী পথ বিশেষরূপে বিখ্যাত, তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। প্রথম হটযোগ, দ্বিতীয় রাজযোগ বা লয়যোগ। হটযোগে যোগীদিগের আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়, এবং অন্যান্য বিভূতিও লভ্য হয়। উহা অভ্যাস করিতে হইলে, বিশিষ্ট উপায়ে শরীরাদির চালনা ও ব্যায়ামপ্রভৃতি করিতে হয়। যথার্থ পথ অবলম্বন করিতে না পারিলে, লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এ পথে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। আধুনিক যোগীদিগের ভিতর অধিকাংশই হটযোগী। যোগে যে বিঘ্ন হয়, সে প্রায় এই পথেই হইয়া থাকে। যাঁহারা এই পথে সফলতা লাভ করেন, তাঁহারা প্রাণকে জয় করিতে পারেন। কিন্তু এই পথে মুক্তিলাভ সহজসাধ্য নহে। এই পথের সাহায্যে প্রাণজয় হয়, এবং অতুল বিভূতি লাভ হয়। ইহাকে মুক্তির পথ কখন বলিতে পারা যায় না। যেখানে বিভূতি আছে, সেখানে বন্ধন আছে। সুতরাং মুক্তিলাভ হয় না। যত প্রকার যোগের পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাজযোগ বা লয়যোগ শ্রেষ্ঠ উপায়। নির্ব্বাণেচ্ছু যোগিগণ বিভূতিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। উন্নত যোগিগণ বিভূতিকে সর্পের ন্যায় ত্যাগ করেন। তাঁহারা জানেন, যে ব্যক্তি বিভূতি প্রদর্শন করে, সে বদ্ধ রহিয়াছে। তাহার মুক্তি লাভ হয় নাই। লয়ে যোগীদিগের যে বিভূতি হয় না, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা কখনও বিভূতি প্রদর্শন করেন না। কারণ, বিভূতি প্রদর্শন করিতে হইলে, গুণে আবদ্ধ হইতে হয়। যেখানে গুণ আছে, সেখানে মনও আছে। সুতরাং সেখানে মুক্তি কিরূপে সম্ভব হয়? ঔষধ ও মন্ত্রের দ্বারা প্রাণজয় হয় বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা মুক্তিলাভ ঘটে না।

যোগবিৎগণের মধ্যে কেহ কেহ এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী দেহের ভিতর ছয়টী পদ্মের কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই এক একটী পদ্মে চিত্তকে সংযত করিয়া দেশবন্ধ করেন। অপরে কেহ বা বহির্ব্বস্তুতে,

কিম্বা শূন্যে ত্রাটক করিয়া, এবং কেহ বা শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর লক্ষ্য করিয়া, অথবা কোন শব্দে মন রাখিয়া চিত্তকে দেশবন্ধ করিয়া থাকেন। তখন চিত্তের বৃত্তি সমূহ স্থির হইয়া, মন শান্তভাব ধারণ করে। মন যখন শান্তভাব ধারণ করে, তখন প্রাণশক্তিও স্থির হয়। সুতরাং শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণের ক্রিয়াও স্থির হইয়া যায়। ইহাকেই প্রাণায়াম বলে। ইহাই প্রাণজয়ের উপায়। সেই জন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ", যখন শ্বাসপ্রশ্বাস হয় না, তখন সেই অবস্থাকে প্রাণায়াম বলে। যোগবিৎ ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা কোন অস্বাভাবিক উপায়ে (যেমন নাসিকা ও মুখ বদ্ধ করিয়া) নিশ্বাস রোধপূর্ব্বক সাধনা করেন, তাঁহাদের সেই সাধনার প্রণালী অতীব হেয়। আজকাল লোকে, প্রাণায়াম অর্থে নাসিকা ও চক্ষুঃ রোধপূর্ব্বক সাধনা মনে করেন। পূর্ব্বোক্ত দেশবন্ধকে চিত্তের ধারণা বলে,—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা।" এই দেশবন্ধ অভ্যস্ত হইয়া গেলে ধ্যান হয়। কিরূপ ধ্যান শ্রেষ্ঠ, তাহার উত্তরে ঋষিরা বলিয়াছেন যে,—

"ন ধ্যানং ধ্যানমিত্যাহুর্ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ।
তস্য ধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং ন সংশয়ঃ॥"
(জ্ঞানসংকলিনী)

অর্থাৎ মন শূন্যময় হওয়ার নামই ধ্যান; সেই ধ্যানের প্রসাদে লোকে শান্তি ও মোক্ষ পাইয়া থাকে। তখনই মনের লয় হয়। মনের লয়করণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে,—

"অনাহতস্য পদ্মস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতিরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥
(উত্তরগীতা)

অনাহত পদ্ম হইতে একরূপ শব্দ সর্ব্বদা উত্থিত হইতেছে, সেই শব্দে চিত্তকে দেশবন্ধ করিলে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সেই জ্যোতিঃ আমাদের পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টি, অর্থাৎ এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরের সূক্ষ্ম অংশের নাম জ্যোতিঃ, এবং সেই জ্যোতির সূক্ষ্ম অংশের নাম, সূক্ষ্ম শরীর। এই

সূক্ষ্ম শরীরই আমাদের জন্মমৃত্যুর বীজ স্বরূপ। ইহাকেই বুদ্ধদেব 'গৃহকারক' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঐ জ্যোতিতে কালী, দুর্গা ইত্যাদি মূর্ত্তি, অথবা নিজ মূর্ত্তি, কিম্বা গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিলে, আমাদের সূক্ষ্ম শরীর আমাদের অভীপ্সিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দেয়। কেহ কেহ বলেন যে, প্রস্তরাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিয়া, জ্যোতিতে মূর্ত্তি ধারণা করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, ঋষিরা অল্পজ্ঞানীর জন্য প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তির প্রচলন করিয়া গিয়াছেন। সাধনার দ্বারা সেই সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস করিলে, ব্রহ্মরন্ধ্রে "সোঽহং" ধ্বনি শ্রবণ করা যায়। এই ধ্বনিই সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্ম অংশ। এই ধ্বনিতে মন রাখিলে মনের লয় হয়। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, মনের লয়ের জন্য সার্দ্ধকোটি পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরে যে পথের উল্লেখ করা হইল, তাহাই সাধারণ ও সহজ-সাধ্য পথ। ঔষধের সাহায্যে জ্যোতিঃ দর্শন, শব্দ শ্রবণ ইত্যাদি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের লয় না হয়, ততক্ষণ সেই অবস্থাকে সবিকল্প সমাধি বলে। তাহার অতীত যে সমাধি তাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। সেই অবস্থায় বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং যে সাধনায় সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস করা না হয়, সেই সাধনা মোক্ষ-মূলক নহে। কারণ, সূক্ষ্ম শরীরকে ধ্বংস না করিলে জন্মমৃত্যুর রোধ হইবে না। প্রাণিগণ যে এত কষ্টভোগ করিতেছে, তাহার কারণ জন্ম, এবং জন্মের কারণ সূক্ষ্ম শরীর। সুতরাং সূক্ষ্ম শরীরের নাশ করিয়া, জন্মরোধ করিলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। যাঁহারা হটযোগী, তাঁহারা এই সূক্ষ্ম শরীরের ধ্বংস না করিয়া, এই সূক্ষ্ম শরীর লইয়া সাধনা করেন। এই সাধনায় বলে তাঁহারা অতুল বিভূতি লাভ করেন।

অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার নামই বিভূতি। পরিণামের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, ভূত এবং ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ অতীত ও অনাগত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। শব্দ, অর্থ, ও জ্ঞান, এই তিনটীর প্রত্যেকের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, সমস্ত প্রাণীর শব্দ জানা যায়, অর্থাৎ পশু পক্ষী প্রভৃতি কি অভিপ্রায়ে শব্দ করিতেছে, তাহা বুঝা যায়। সংস্কার দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, স্বকীয় ও পরকীয় ব্যক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব

জন্মের পরিজ্ঞান হয়। মুখরাগাদি চিহ্নরূপ প্রত্যয়ের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, পরকীয় চিত্তবৃত্তির প্রত্যক্ষ হয়। নিজের রূপের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, অন্তর্ধান সিদ্ধ হয়। সূক্ষ্ম শরীরে সাধনা বিশেষের দ্বারা, কোন্ দেশে কিরূপে শরীর ত্যাগ হইবে, তাহা জানা যায়। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতারূপ চিত্তপ্রসাদের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, যোগিগণের অমোঘ শক্তি জন্মে। যাহা হইলে, ইচ্ছামাত্রেই যোগিগণ প্রাণীমাত্রের সুখদান, দুঃখহরণ ইত্যাদি অনায়াসে করিতে পারেন। হস্তিপ্রভৃতির বল লক্ষ্য করিয়া সাধনা করিলে, সেইরূপ বল লাভ হয়। সূক্ষ্ম শরীরের সাধনার দ্বারা দিব্যচক্ষুঃ লাভ হয়, এবং সেই দিব্যচক্ষুঃ অপর ব্যক্তিকেও প্রদান করা যায়। যোগিগণ পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ভূমধ্যে নিহিত গুপ্তধন, অথবা সুমেরুর পরপারে অতিদূরবর্ত্তী বিষয় দেখিতে পান। ভগবান্ অর্জ্জুনকে, এবং বেদব্যাস সঞ্জয়কে, যে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত বিভূতির প্রভাব মাত্র। যোগীরা বলেন যে, এই দেহের ভিতর বহিব্র্ক্ষাণ্ডের সমুদয় লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। "ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণং সর্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম্" (জ্ঞানসঙ্কলিনী)। সুতরাং ঐ সকল লক্ষণে যথাক্রমে সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, বহিব্র্ক্ষাণ্ডের ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়। যেমন শরীরস্থ সূর্য্যে সাধনা করিলে, বহিব্র্ক্ষাণ্ডস্থ চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞান হয়। অন্তরস্থঃচন্দ্রে সাধনা করিলে, বহিঃস্থ তারাসমূহের সন্নিবেশের জ্ঞান হয়। অন্তরস্থ ধ্রুবনক্ষত্রে সাধনা করিলে, তারাগণের গতি জানা যায়। নাভিচক্রে সাধনা করিলে, দেহান্তর্গত সমুদয় পদার্থের সম্যগ্ জ্ঞান হয়। কণ্ঠকূপে সাধনা করিলে, ক্ষুৎপিপাসা রোধ হয়। বিশ্বামিত্র ঋষি রামলক্ষ্মণকে জয়া বিজয়া নামক যে বিদ্যা প্রদান করেন, তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা হইত না। এই বিদ্যা কণ্ঠকূপে সাধনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সূক্ষ্মশরীরের সাধনা করিলে, অন্তরীক্ষবাসী সিদ্ধগণের দর্শন হয়। হৃদয়ে সাধনা করিলে, চিত্তজ্ঞান জন্মে। সাধনার দ্বারা যোগিগণ অপরের শরীরে ও চিত্তে প্রবেশ করিতে পারেন। এই বিভূতি বলেই শঙ্করাচার্য্য অমরু রাজার মৃত শরীরে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল বিহার করিয়াছিলেন। সাধনার দ্বারা উদান বায়ুর জয় করিতে পারিলে,

জল, কর্দ্দম ও কণ্টকাদি তীক্ষ্ণ পদার্থে সঙ্গ হয় না, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন ত্যাগ করিতে পারা যায়। ঐ সাধনার দ্বারা জলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারা যায়, কর্দ্দমের উপর ভ্রমণ করিলে পদে কর্দ্দম স্পর্শ হয় না, কণ্টকের উপর দিয়া চলিলে, রক্তপাত হয় না। সাধুগণ কাষ্ঠপাদুকাসহকারে যে, নদী উত্তীর্ণ হন এবং অনাবৃতপদে যে জ্বলন্ত অগ্নির উপর ভ্রমণ করেন, তাহা এই উদান বায়ু জয়েরই ফল। সাধনার দ্বারা সমান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে, অগ্নিতুল্য তেজস্বী হওয়া যায়। সাধন বলেই যোগীরা দিব্যশ্রোত্র লাভ করেন। আকাশেগমনরূপ সিদ্ধি লাভ করেন, ভূতজয় করেন, অর্থাৎ ইচ্ছাবশতঃ পৃথিব্যাদির পরিণাম করেন। ভূতজয় হইলে, যোগিদিগের অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য ও রূপলাবণ্য প্রভৃতি কায়সম্পদ্ জন্মে এবং ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ দ্বারা তাঁহাদের শরীরের অভিঘাত হয় না; যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, ইত্যাদি। ভূতজয়ের দ্বারা সৌন্দর্য্য, শরীরের মাধুর্য্য অতিশয় বীর্য্য ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ়তা, ইত্যাদি শরীরসম্পৎ লাভ হয়। সূক্ষ্ম শরীরের সাধনায় ইন্দ্রিয়জয় হয়। ইন্দ্রিয়জয় হইলে, মনের ন্যায় দেহের অতি শীঘ্র গতি হয়, দেহকে অপেক্ষা না করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বহির্বিষয়ের বৃত্তিলাভ ও সমস্ত প্রকৃতিবর্গ জয়রূপ সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ হয়। এই সূক্ষ্ম শরীরের সাধনায় দ্বারা যোগিগণ সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বজ্ঞ হন। যাঁহারা তান্ত্রিক, তাঁহারা মণি-পদ্মে সূক্ষ্মশরীরের সাধনা করিলে, তন্ত্রোক্ত সিদ্ধি লাভ করেন। যাঁহারা শৈব তাঁহারা অনাহত পদ্মে সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, শিবোক্ত সিদ্ধি লাভ, করেন। এবং যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা বিশুদ্ধপদ্মে সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে বৈষ্ণবোক্ত সিদ্ধি লাভ করেন। আজ কাল লোকে দেহতত্ত্ব অবগত নহেন বলিয়া, কেহ কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। এখন সমগ্র বঙ্গ দেশে একজন সিদ্ধ তান্ত্রিক, কিম্বা শৈব পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে।

উপরে যে সকল বিভূতির উল্লেখ হইল, তাহা ভিন্ন অন্যান্য বিভূতিও যোগিগণের হইয়া থাকে। যেমন সূক্ষ্ম শরীরের সাধনা করিলে, সূক্ষ্মশরীর যখন সম্মুখে আসিয়া থাকে, তখন তাহাকে যে প্রশ্ন করা যায়, সে, সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়। এইরূপ করিয়া আর্য্যঋষিরা যোগশাস্ত্র, অধ্যাত্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, বিজ্ঞানশাস্ত্র, জ্যোতিষ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এই সূক্ষ্ম

শরীরের সাধনার দ্বারা লোকে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন। সমুদয় ঐশ্বর্য্য লাভ হইলে, লোকে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন। এই বিভূতির সাধনায় রাবণ অদ্বিতীয় ছিলেন। সাধনার বলে, তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। এই সাধনার বলে প্রহ্লাদ সমুদয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, এবং অবশেষে তাঁহার পিতারও প্রাণনাশের কারণ হইয়াছিলেন। এই সাধনার বলে, শ্রীকৃষ্ণ কায়ব্যূহ রচনা করিয়া প্রত্যেক গোপীর সহিত একই সময়ে বিহার করিতেন। অসাধারণ যোগী না হইলে, বিভূতি ও মোক্ষ এক সঙ্গে থাকে না। সেরূপ যোগীশ্বর ইতিহাসে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সেইজন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাঁহাদের বিভূতি আছে, তাঁহাদের মুক্তি হয় না। পতঞ্জলি মুনি সেইজন্য বলিয়াছেন যে, "তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্", অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিভূতিতেও যাঁহার বৈরাগ্য হয়, তাঁহার অবিদ্যাদি ক্লেশ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম-বন্ধন বিনষ্ট হয়। তখন পুরুষের স্বরূপে অবস্থানরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি হয়।

মুমুক্ষুগণের সর্ব্বদা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের বিচার করা উচিত। ইহাতে শরীরের বৃত্তিগুলি ও ভ্রম উভয়ই ক্ষীণ হইয়া যায়। গুরুর কৃপায় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রদর্শিত হইলে, জীব ব্রহ্মময় হইয়া থাকে। তখন জীব আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। যেরূপ স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ গুরুবাক্যানুসারে শিষ্য তন্ময় ভাব ধারণ করে। যোগীর অন্তঃকরণ যখন উদাসীন ভাব ধারণ করে, তখনই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, তৎক্ষণাৎ আনন্দানুভব হইয়া থাকে। আনন্দে সন্তুষ্ট হইলে, যোগাভ্যাসে চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে কোনও বিধি বা ক্রমের প্রয়োজন হয় না। তৎকালে যোগী কোন বিষয়ের চিন্তা করেন না। প্রত্যুত সর্ব্বদা শূন্যময় হইয়া থাকেন। কোন প্রকার চিন্তা না থাকিলে, আত্মতত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। বাক্য, মন ও শরীরের সংক্ষোভনিবন্ধন যত্নাতিশয় সহকারে বাসনাদি বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দিঙ্মণ্ডলের সহিত আপনাকে স্থিরভাবে ধারণ করা যায়। যে কাল পর্য্যন্ত পদার্থের প্রতি প্রযত্নের লেশমাত্র বর্ত্তমান থাকে,—যতকাল সঙ্কল্প, কল্পনা ও চিন্তার অধিকার থাকে, ততকাল তত্ত্বকথা কিরূপে সম্ভব হয়? যোগিব্যক্তি সর্ব্বদা জাগ্রদবস্থায় সুপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করেন। সাধারণতঃ জন্তুগণ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন যোগী ব্যক্তির কখনও জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থা নাই। জীব যখন স্বপ্নাভিভূত হয়, তখন তাহার চৈতন্যাংশের ন্যূনমাত্র থাকে। যখন জীবের জাগ্রদবস্থা হয়, তখন বিষয় জ্ঞান ঘটে। কিন্তু যোগীর অবস্থা স্বপ্ন জাগরণের অতীত বলিয়া, যোগীরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ঋষিগণ লয়যোগের সপ্তভূমিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যোগী যেমন উন্নত হইতে থাকেন, সেই অনুসারে তিনি এক ভূমিকা হইতে অন্য ভূমিকায় পদার্পণ করেন। প্রথম ভূমিকার নাম শুভেচ্ছা। সৎসঙ্গে থাকিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া বর্দ্ধিত করাই যোগের প্রথম ভূমিকা। সাধুবুদ্ধি বিবেকী মানব যখন, "আমি বৈরাগ্যবান্ হইয়া কিরূপে সংসার-সাগর পার হইব," এইরূপ বিচার করিতে থাকে, তখন সে দিন দিন ভোগচিন্তা হইতে বিরত হইতে থাকে। যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, এইরূপ সৎকর্ম্ম, অর্থাৎ শম দম ইত্যাদি রূপ ব্রহ্মচর্য্য করিতে থাকে। এইরূপ সৎকর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হইলে, তাঁহার তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, এবং তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিতে থাকেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে,—

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণ-দোষাঃ॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

অর্থাৎ, জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ, আত্মা, যিনি শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান, এবং নির্ম্মলচিত্ত যতিগণ যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি সত্য, তপস্যা, সম্যগ জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লভ্য হয়েন। এইরূপ জ্ঞান হইলে, সাধু প্রথম ভূমিকা প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় ভূমিকার নাম বিচারণা। যোগী এই ভূমিকাতে উপনীত হইলে, শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কর্ম্ম সমূহের ব্যাখ্যাকর্ত্তা সৎগুরুর আশ্রয়ে অবস্থান করেন। তাদৃশ সদ্গুরুর নিকট থাকিয়া শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা অবগত হইয়া, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। আন্তরিক মদ, মান, মাৎসর্য্য, লোভ প্রভৃতি

পূর্ব্বেই ত্যক্ত হইয়াছে। তবে লোকব্যবহারার্থে বাস্ত যাহা কিছু থাকে, তাহাও ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর তিনি অসংসঙ্গ নামক তৃতীয় যোগ ভূমিকায় উপস্থিত হন। তখন তিনি অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলাপে, সংসারের নিন্দায় ও বৈরাগ্য অভ্যাসে সময় ক্ষেপণ করেন। এই তৃতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত হইলে; তত্ত্ববিৎ দুইপ্রকারে অসংসঙ্গ অনুভব করেন। "আমি কর্ত্তা নহি, ভোক্তা নহি, বাধ্যও নহি, বাধকও নহি।" "সুখ দুঃখ যাহা কিছু সমস্তই প্রাক্তন কর্ম্মকৃত এবং ভগবানের অধীন। এ বিষয়ে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এই বিপুল ভোগরাশি, ইহা একটা সঙ্কট রোগস্বরূপ, সম্পৎও বিষম আপৎ স্বরূপ।" এই প্রকার ধারণায় অনিত্য বোধে সমুদয় বিষয়ের প্রতি যে অনাস্থাপূর্ব্বক ভাবনা ত্যাগ, তাহাকে সামান্য অসংসঙ্গ বলা হয়। তৎপরে "আমি কর্ত্তা নহি, ঈশ্বরই কর্ত্তা, পূর্ব্বকৃত বা ইদানীং ক্রিয়মান্ কোন কর্ম্মই আমার নাই", এই প্রকার শব্দার্থ ভাবনাও দূরে পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত ও মৌনভাবে যে অবস্থান, তাহাকে শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ কহে। তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে,—

নিষ্ক্রিয়ৈব পরাপূজা,
মৌনমেব পরং তপঃ।
অনিচ্ছৈব পরং ধামং,
অচিন্তৈব পরং পদং॥"

অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হওয়াই শ্রেষ্ঠ পূজা, মৌনব্রত অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ইচ্ছাশূন্যতাই শ্রেষ্ঠ ধাম এবং চিন্তার অতীত হওয়াই শ্রেষ্ঠ পদ।

তখন চিত্ত, কি অন্তরে, কি বাহিরে, কি ঊর্দ্ধদেশে, কি অধোদেশে, কি কোন দিকে, কি আকাশে, কি কোন পদার্থে, কি কোন অপদার্থে, কি জড়ে, কি চিদাভাসে, কোন বিষয়েই অবস্থিত থাকে না। তখন চিত্ত আকাশের ন্যায় প্রকাশান্তর শূন্য চিদ্রূপে অবস্থান করে। তখনকার অবস্থাকে শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ বলা যায়। কৃষকগণ যেমন জলসেকে শস্যাদির অঙ্কুরকে বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ বিচারবলে, অর্থাৎ বৈরাগ্যের আবির্ভাব দ্বারা শুভেচ্ছানাম্নী প্রথমভূমিকার সাধনকেই অগ্রে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এইরূপে একটী ভূমিকা বর্দ্ধিত হইলে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভূমিকা সকল

আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। চেষ্টা এইরূপ সমভাবে থাকিলে, প্রথম ভূমিকা হইতে তৃতীয় ভূমিকা পর্য্যন্ত অনায়াসে লভ্য হয়। এই প্রথম ভূমিকা ত্রয়কে জাগ্রৎ বলা হয়। উহাকে জাগ্রৎ বলার কারণ এই যে, ঐ সময়ে বাহ্যবস্তুর যথাযথ ভেদজ্ঞান থাকে। তৎপরে বাসনাবিলয় দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চের যে বোধ, সেই অবস্থাকে চতুর্থ ভূমিকা বলে। তখন যোগিগণ সমুদয় জগৎ প্রপঞ্চবিভাগ শূন্য অনাদি, অনন্ত একবস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন। তখন তাঁহার নিকট হইতে দ্বৈতভাব একেবারেই দূরে যায়। অদ্বৈতভাব আসিয়া স্থিরতর হইয়া উঠে। চতুর্থ ভূমিকা ঠিক স্বপ্নাবস্থা। কারণ, সে অবস্থায় এই জগৎ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। পরে যোগী যখন পঞ্চম ভূমিকাতে উপনীত হন, তখন তাঁহার সেই স্বপ্নবৎ ভাব বিলীন হইয়া যায়। তিনি তখন চিৎসত্ত্বামাত্রে অবশিষ্ট থাকেন। ঐ পঞ্চম ভূমিকাকে সুষুপ্তি দশা বলে। কারণ, তৎকালে নিখিল ভেদজ্ঞান প্রশান্ত হইয়া যায়। তখন যোগী কেবল মাত্র অদ্বৈত ভাবে অবস্থিতি করেন। দ্বৈতভাব বিগলিত হওয়ায় যোগী অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন। তিনি তখন আনন্দঘনাকারে অবস্থান করেন। তখন তিনি জানেন যে,—

ওঁ মনো বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং
ন চ শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রং।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

(নির্ব্বাণষটকম্)

অর্থাৎ আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কিম্বা চিত্ত নহি; শ্রোত্র, জিহ্বা, ঘ্রাণ, কিম্বা নেত্রও নহি; আকাশ, ভূমি, অগ্নি, কিম্বা বায়ুও নহি; আমি কেবল চিৎস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম। তখন তিনি পরিশান্ত ভাবে অবস্থান করায়, সর্ব্বদা নিদ্রালু ব্যক্তির ন্যায় লক্ষিত হন। এই ভূমিকাতেই তিনি অভ্যাস বলে বাসনাক্ষয় করেন। তাহার পর তিনি ষষ্ঠ ভূমিকাতে অধিরূঢ় হন। সেই ভূমিকার নামান্তর তুরীয়; সেই ভূমিকায় "আমি না সৎ, না অসৎ, না আমি, না অহঙ্কার" এইরূপ জ্ঞান হয়। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে,—

"অহমাত্মা পরংব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তকং।
বিজ্ঞানমানন্দো ব্রহ্ম সত্তত্ত্বমসি কেবলং ॥
অহং ব্রহ্মাস্ম্যাহং ব্রহ্ম অশরীরমনিন্দ্রিয়ং।
অহং মনো বুদ্ধিমরুদহঙ্কারাদিবর্জিতং ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিমুক্তং জ্যোতিস্তদীয়কং।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দমব্বয়ং ॥

(গারুড়ে)

অর্থাৎ, আমি আত্মা, পরব্রহ্ম, সত্যস্বরূপ এবং অনন্ত জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় ব্রহ্ম এবং কেবল তত্ত্বমসি জ্ঞানযুক্ত। আমি ব্রহ্ম হইয়াছি, এবং আমি অশরীরী ও অনিন্দ্রিয় পুরুষ। আমি মন, বুদ্ধি মরুদহঙ্কারাদি বর্জ্জিত এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি অবস্থা হইতে মুক্ত। আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধিযুক্ত ; আমি অদ্বয় এবং সত্য ও আনন্দ স্বরূপ। এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া, তিনি হর্ষ শোকের অতীত হন। সেই জন্য উপনিষৎ বলিয়াছেন যে,—

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

অর্থাৎ দুর্দর্শ (যাঁহাকে সহজে দেখা যায় না), গূঢ়, প্রতি বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, হৃদয়ে অবস্থিত, দুর্গম (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম), এবং জ্ঞান মাত্রগ্রাহ্য স্থানে অবস্থিত, সেই পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগের দ্বারা জানিয়া, জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষশোকের অতীত হন। তৎকালে,—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥'

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

অর্থাৎ, সেই পরাবর ব্রহ্মকে দর্শন করিলে, হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সাধকের কর্ম্ম সমূহও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যোগী তখন জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি একেবারে নির্ব্বাণ না হইলেও, সর্ব্বদা পট-

চিত্রিত প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ হইয়া থাকেন। এইরূপে ষষ্ঠ ভূমিকায় অবস্থান করিয়া, যোগী ক্রমে সপ্তম ভূমিকায় আরোহণ করেন। সপ্তম ভূমিকায় অধিরূঢ় হইয়াই একেবারে বিদেহমুক্ত হন। তখন,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

অর্থাৎ যেমন প্রবহমান নদীসকল, নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষে প্রবেশ করেন। তাই ঋষিরা বলিয়াছেন যে,—

"বেদান্ত বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্ম লোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥"

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

বেদান্তবিজ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ ব্রহ্মকে যাঁহারা উত্তমরূপে জানিয়াছেন, সন্ন্যাসযোগের দ্বারা যাঁহারা শুদ্ধস্বভাব হইয়াছেন, যাঁহারা পরম অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যতিগণ মৃত্যুকালে ব্রহ্মলোকসমূহে সম্যগ্‌রূপে মুক্ত হয়েন। এই সপ্তমভূমিকার অবস্থা বাক্যের অগম্য। এই অবস্থা সংসার ভূমির সীমা। এই অবস্থাকে কেহ শিব বলেন, কেহ ব্রহ্ম বলেন, কেহ প্রকৃতি পুরুষের একীভাবে অবস্থিতি বলিয়া থাকেন। এবং কল্পনা অনুসারে অন্যান্য প্রকারেও অভিহিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ এই অবস্থা কোনরূপে বাক্যদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে না।

সমাধিযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব যোগীরা এইরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, যে ধ্যানযোগের দ্বারা 'আমি' থাকি না অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও চিত্ত ব্রহ্মতে লয় হয়, অর্থাৎ জীবত্বের ধ্বংশ হয়, তাহাকেই সমাধি বলে। সমাধিস্থের লক্ষণ সম্বন্ধে নিরালম্বোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ভূত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠশরণমধিগম্য তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যার্থং নিশ্চিত্য নির্বিকল্পসমাধিনা স্বতন্ত্রসময়শ্চরতি স মুক্তঃ, স পূজ্যঃ, স পরমহংসঃ,

সোঽবধূতঃ,স ব্রাহ্মণঃ,স সত্যঃ,সান্দি (?) স সর্ব্ববিৎ।" অর্থাৎ,যিনি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, মমতা ও অহঙ্কার রহিত হইয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শরণাগত হয়েন এবং তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিয়া নির্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠানে নিরত একাকী অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই পূজ্য, তিনিই পরমহংস, তিনিই অবধূত, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই সত্যস্বরূপ এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। মন শূন্যময় না হইলে সমাধি হয় না। সেইজন্য ঋষিরা বলিয়াছেন যে,—

"ঊর্দ্ধশূন্যম্ মধ্যশূন্যম্ নিরাময়ম্।
ত্রিশূন্যং যোঽভিজানাতি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥"

(ওঁকারগীতা)

অর্থাৎ, ঊর্দ্ধশূন্য, মধ্যশূন্য এবং অধঃশূন্য, এই ত্রিশূন্য যিনি জানিতে পারেন, তিনি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। সেইজন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণং।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যতে বন্ধনাৎ॥"

(উত্তরগীতা)

অর্থাৎ সর্ব্বশূন্য ও নিরাভাস হওয়াই সমাধিস্থের লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। যিনি পূর্ব্বোক্ত ত্রিশূন্য জানিয়াছেন, তিনিই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। আরও কথিত আছে যে,—

"ঊর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকং।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং॥"

(উত্তরগীতা)

যাঁহার পূর্ব্বোক্ত ত্রিশূন্যের জ্ঞান হইয়াছে, এবং যিনি সর্ব্বশূন্য হইয়া সেই আত্মাকে জানেন, তিনিই যথার্থ সমাধিস্থ হইয়াছেন। সেই শূন্যের ভাবনা দ্বারা লোকে পুণ্যপাপ হইতে মুক্ত হয়—"শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে" (উত্তরাগীতা)। জীবন্মুক্ত গীতায় জীবন্মুক্তের লক্ষণ এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে যে,—

"ঊর্দ্ধং ধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে।
শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ, যিনি ধ্যানদ্বারা ঊর্দ্ধ দর্শন করেন, অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্থিত আকাশের ন্যায় পরমাত্মাকে ভাবনা করেন, তখন তাঁহার মনকে বিজ্ঞান বলা যায়, এবং সেই মন যখন শূন্যস্বরূপ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। মন শূন্যময় হইলে, নির্ব্বিকল্প, নির্বীজ বা নিরালম্ব সমাধি হয়। তখনই যোগীরা জানিতে পারেন যে, "ঊর্দ্ধশূন্যম্, অধোশূন্যম, মধ্যশূন্যম্, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহশূন্যম্, সর্ব্বশূন্যম্।" তখন যোগীরা দেখেন যে, শূন্যভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ইহাই যোগের চরম অবস্থা। এই অবস্থা বলিয়া বুঝান যায় না। ইহাকেই নির্ব্বিকল্প, নির্বীজ বা নিরালম্ব সমাধি বলে।

যোগীরা যে শূন্য ভাবিয়া শূন্যময় হইতে চান, সে শূন্য কাহাকে বলে? ইহা কি শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের শূন্যের ন্যায় কিছুই নহে? ঋষিরা বলিয়াছেন যে, ঐ শূন্য জ্ঞানের অতীত! অজ্ঞানের স্বপ্নেরও অগোচর! তবে তাহা কি? তাহা যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলিব। যেমন জল আর তরঙ্গ, প্রকৃত একই বস্তু। তদ্বৎ সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই, অজ্ঞান বলিয়াও কোন বস্তু নাই। শুধু তাহাই আছে, যাহা জ্ঞান ও অজ্ঞান পরিহার করিয়া এক অপূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে। যাহা আছে তাহার প্রতিরূপ শব্দ নাই, চিহ্ন নাই, সঙ্কেত নাই, যাহা দিয়া লোককে বুঝান যায়। তবে শাস্ত্রে বলে, ঐ যে নকিঞ্চন বলিয়া কিছু আছে, তাহা চৈতন্যরূপে, সংবিদ্‌রূপে অবস্থিতি করে। যখন দ্বিত্ব কল্পনা তিরোহিত হয়, তখন জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ই তিরোহিত হয়।* তাহার পর যাহা থাকে, প্রতিশব্দ থাকিতে পারে না বলিয়া, তাহা উপাধিশূন্য। তাহাকে জ্ঞানও বলা যায় না। কারণ জ্ঞানের "জ্ঞান" এই নামটীও অবিদ্যা-বিলসিত; সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যার বিলয়ে জ্ঞানও বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব এমন অবস্থায় যাহা থাকে, তাহাকে কিছু বলিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। তাহা অব্যক্ত। সেইজন্য ঋষিরা বলিয়াছেন যে,—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদপি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥"

(কঠোপনিষৎ)

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, এবং সেই মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। ঐ যে অব্যক্ত উহা কিছু নয়, উহা শূন্য। কিন্তু এ "কিছু না" শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের শূন্যের ন্যায় নহে। এ শূন্যের ভিতর সকলই নিহিত রহিয়াছে। যখন আমরা কোন বহুদূরবিস্তৃত প্ররোহ বিশাল বটবৃক্ষের কারণ অন্বেষণ করিতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে, উহার বীজটী ভিন্ন আর কি কারণ হইবে? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সে বটবীজটী কত সূক্ষ্ম; তাহার সর্ব্বাবয়ব তন্ন তন্ন করিয়া দেখ, কোথাও কি ঐ বিশাল বৃক্ষের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইবে? কিন্তু এই সমুচ্ছ্রিত বিশাল বৃক্ষের যাহা কিছু আছে, সমস্তই সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম বীজটীর অভ্যন্তরে নিহিত। তাহা না হইলে তাহার উদ্ভব অসম্ভব। সুতরাং বটবীজে বটবৃক্ষকরণের সর্ব্বশক্তি থাকিলেও, বীজাবস্থায় তাহা এমন অস্ফুট যে, যেন তাহাতে কিছুই নাই। যাহা নাই, তাহা "কিছু না" ভিন্ন আর কি? কিন্তু এ নাস্তিত্বের অভ্যন্তরে যেমন অস্তিত্বের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই শূন্যরূপ "কিছুনাতে" সর্ব্বশক্তি সমবায়রূপী "কিছুত্ব" সমবেত। তাহা না হইলে আভাসেও সংসার কোথায়? ঋষিরা যে শূন্যের জন্য লালায়িত, তাহা আকাশ অপেক্ষাও শূন্য। কিন্তু অপরে সচরাচর যাহাকে শূন্য বলে, ইহা তাহাও নহে। ইহা শূন্য হইলেও চিদাত্মক সাক্ষাৎ সর্ব্বশক্তি বলিয়াই চৈতন্যময়। এ শূন্যে চৈতন্য সূর্য্যকান্ত মণিতে অগ্নির ন্যায়, দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায়, অস্ফুট অনালোকিতরূপে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। এই শূন্যকে যিনি জানিতে পারিয়াছেন, আমি তাঁহাকে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি।

তত্ত্ববিৎ যোগীরা বলেন যে, যোগ দুই প্রকার,—ব্যষ্টি যোগ ও সমষ্টি যোগ। পূর্ব্বে যোগের পথ সকল সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা ব্যষ্টি যোগের অন্তর্গত। প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া প্রাণায়ামাদির সাহায্যে কিম্বা বিচারের দ্বারা মন লয় করিবার জন্য যাহা করা যায়, তাহাকে ব্যষ্টি যোগ কহে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় যে সকল যোগের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই ব্যষ্টি যোগের অন্তর্গত। সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সংন্যাসযোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ব্রহ্মযোগ,

রাজগুহ্যযোগ, বিভূতিযোগ, ভক্তিযোগ, প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ, গুণত্রয়যোগ, পুরুষোত্তমযোগ, আচারবিবেকযোগ এবং মোক্ষযোগ—এই সকলই ব্যষ্টি যোগের অন্তর্গত। ক্রমাগত অভ্যাস এবং আলোচনা দ্বারা ব্যষ্টিযোগ সমষ্টিযোগে পরিণত হয়। কিন্তু এমন মহাত্মা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহাদের সমাধি অবস্থার যে মহাভাব, সেই মহাভাবের জন্য ব্যষ্টিযোগের দ্বারা উদ্দীপনা করিতে হয় না। সেই ভাবের মত্ততা তাঁহাদের চক্ষুতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে। তাঁহাদের প্রাণ শূন্যময়। তাঁহাদের প্রাণে শূন্যের ছায়া পড়িলেই, তাঁহারা বিনা চেষ্টায় সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহারা সকল বস্তুই সেই মহান্ ভাবের দ্বারা জড়িত দেখেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে সেই ভাব উদ্দীপনা করিতে হইলে, কোন বিশেষ অবলম্বনের সাহায্য লইতে হয় না। তখন তাঁহাদিগের খেচরী মুদ্রা আপনি হইয়া থাকে। কারণ,—

"মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনম্।
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্
সা এব মুদ্রা বিচরন্তি খেচরী॥

(জ্ঞানসংকলিনী)

সেই অবস্থায় বিনা অবলম্বনে মন স্থির হয়, বিনা নিরোধে বায়ু স্থির হয়, বিনা অবলোকনে দৃষ্টি স্থির হয়। তখনই যথার্থ খেচরী মুদ্রা হয়। সেই সমষ্টি যোগের অপর নাম ভাব-সমাধি। কত জন্মের তপস্যায়, কত জন্মের সুকৃতিবলে, এই অবস্থা পাওয়া যায় তাহ দুর্নিরূপণীয়। এইরূপ সমাধিবিশিষ্ট যোগী পৃথিবীতে অতি বিরল।

বৌদ্ধদিগের মতে সমাধির চারিটী সোপান আছে। প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে, মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, অবিদ্যা দূর হয়; কি নিত্য, কি অনিত্য বুঝিতে পারা যায়। যখন দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ করা যায়, তখন সকল এক বলিয়া বোধ হয়। তখন বহুজন্মপুষ্পনিকরে গ্রথিত পুষ্পমালার ন্যায় একই সত্বার সূত্রে গ্রথিত বলিয়া বোধ হয়। যখন সমাধির তৃতীয় সোপান লাভ করা যায়, তখন সমুদয় জড়ে উপেক্ষা জন্মিয়া থাকে। তখন

সুখ-দুঃখ জ্ঞান বিদুরিত হয়, তখন আত্মা সম্পূর্ণরূপে আসক্তির অতীত হইয়া, অস্পন্দ অক্রিয় ও উপেক্ষক হয়। সমাধির চরম সোপানে উঠিলে, অহঙ্কারজ্ঞান নির্ব্বাণ হয়, জন্ম-মৃত্যু আবর্ত্তন নির্ব্বাণ হয়। তখন যোগিগণ নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ঋষিরা যোগিদিগের চারি প্রকার চৈতন্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথম জীব-চৈতন্য, দ্বিতীয় ঈশ্বর-চৈতন্য, তৃতীয় কূটস্থ-চৈতন্য, চতুর্থ ব্রহ্ম-চৈতন্য। প্রথমে জীবাবস্থা। যোগী বলেন যে, তখন আমি পরমহংস, স্বামী বা অবধূত; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিতেছি; এই বিশ্ব দৃশ্য এবং আমি দ্রষ্টা। এই অবস্থাতেই ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ, হিতাহিত বোধ, উচ্চনীচ বোধ হয়। এই অবস্থাতেই "আমি" বদ্ধ, এই জন্য আমি মুক্তি প্রার্থনা করি, জ্ঞান অর্জ্জন করি, যোগ অভ্যাস করি, নিজেকে জ্ঞানী এবং অপরকে অজ্ঞানী মনে করি। এক ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অপর ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট মনে করি। কিন্তু এ সকলই অজ্ঞান মনের ধর্ম্ম, এ মনেরই ক্রীড়া, এ অবস্থায় আমি অজ্ঞান মোহবিশিষ্ট জীব ভিন্ন আর কিছুই নই; এবং আমারই অজ্ঞানতায়, আমি আমার খণ্ড আমিত্বে অবস্থিতি করিয়া, আমার বাহিরে এই জগৎ দেখিতেছি। এবং আমার সেই অজ্ঞান মনই ধর্ম্মাধর্ম্ম, বন্ধ, মোক্ষ, হিতাহিত প্রভৃতির বিচার করিতেছে। যোগী বলেন যে, যখন আমি দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হই, তখন আমি সেই মনের বাহিরে যাই। তখন আমার দেহাভিমান দূরে যায়। তখন সেই খণ্ডসীমা বিশিষ্ট আমিত্ব এক মহান্ বিরাটরূপ প্রাপ্ত হয়। তাহাই বিজ্ঞানময় আমি। মানবদেহস্থ সীমাবদ্ধ খণ্ড আমিই এই বিরাট বিজ্ঞানময় আমিত্বে উপস্থিত হইলে, দেখি, আমিই সর্ব্বভূতে বিরাজিত, মানব, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, স্থলচর, জলচর, ব্যোমচর প্রভৃতি যত জীব আছে, সে সকলই আমি। আমিই নিজ মায়াময় কল্পনাদ্বারা আমাকে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে খণ্ডিত করিতেছি। আমিই সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র; আমিই স্থল, জল, বায়ু, আকাশ; আমিই বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা। চিন্ময় আমি, নিজ কল্পনার দ্বারা জীবত্ব প্রাপ্ত হইতেছি। যখন আমিই সকল, তখন হিতাহিত নাই, উচ্চনীচ নাই, জ্ঞানী অজ্ঞানী নাই, কিম্বা বন্ধ মোক্ষ নাই।

তখন আর কর্ম্ম নাই, কর্ম্মফল নাই। দ্বৈতজ্ঞানে কর্ম্মফল ও শুভাশুভ জ্ঞান উদয় হয়। যখন এক আমিই রহিয়াছি, তখন আর কর্ম্মের শুভাশুভ, পাপ পুণ্য কোথায়? যোগী বলেন যে, এই আমার দ্বিতীয় অবস্থা। তিনি বলেন যে, এই অবস্থা হইতে যখন মায়ারূপ ভ্রমজাল ছেদনপূর্ব্বক, কল্পনাপিঞ্জর ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠি, তখন দেখি যে, এই মরু মরীচিকাসদৃশ ভ্রমাত্মক কল্পনাময়। সৃষ্টি কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। আর জীব জন্তু কিছু নাই, চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, পৃথিবী নাই। আর কিছুই নাই, এক আছি "আমি"। এই 'আমি'র খণ্ডরূপ নাই, বিরাটরূপ নাই; ইহা রূপহীন, নামহীন, গুণহীন, চিত্তহীন, মনঃহীন, কল্পনাহীন। তখন 'আমি' নির্গুণ, একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। কেবল "অহং" এই জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই আমার তৃতীয় অবস্থা। তৎপরে সূর্য্য যেমন দিবাবসানে পশ্চিমাকাশে মন্দপ্রভ হইয়া লোহিতমূর্ত্তি ধারণ করেন ও ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যান, এবং তখন যেমন অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, সেইরূপ, এই 'অহং' জ্ঞানরূপ চিন্ময়-সত্তা ক্রমে ক্রমে বিনা চেষ্টায়, বিনা কারণে, আপনিই লয় প্রাপ্ত হয়, তখন আর কিছুই থাকে না। ইহাই জীবন্মুক্তি। যোগী বলেন যে, ইহাকে আর চতুর্থ অবস্থা বলা যায় না। কারণ, যেখানে 'আমার' অস্তিত্ব নাই, সেখানে অবস্থা কিরূপে সম্ভবে? ইহার নাম ব্রহ্ম-চৈতন্য। ইহাই নির্ব্বাণ। তখন,—

"কর্ম্ম নাই, জন্ম নাই, নাহি মৃত্যু আর,
সুখের তৃষ্ণায়, দুঃখ-তাড়নায় আর,
নহে বিচলিত, আত্মা শান্তাকাশ মত
অনন্ত, অসীম, শান্ত, শান্তি-পারাবার।" (অমিতাভ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

বীজগণিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সাহিত্য-সংহিতা ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ৯০ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

(তৎপূর্ব্বে সাহিত্য-সংহিতা ১ম ভাগের ২৪, ৭৪ ও ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

চক্রবাল।

(AFFECTED SQUARE).

সূত্র ঃ—হ্রস্বজ্যেষ্ঠপদক্ষেপান্ ভাজ্যপ্রক্ষেপভাজকান্।
কৃত্বা কাল্প্যো গুণস্তত্র তথা প্রকৃতিতশ্চ্যুতে ॥
গুণবর্গে প্রকৃত্যোনেঽথবাল্পং শেষকং যথা।
তত্তু ক্ষেপহৃতং ক্ষেপো ব্যস্তঃ প্রকৃতিতশ্চ্যুতে ॥
গুণলব্ধিঃ পদং হ্রস্বং ততো জ্যেষ্ঠমতোঽসকৃৎ।
ত্যক্ত্বা পূর্ব্বপদক্ষেপাং শ্চক্রবালমিদং জগুঃ ॥
চতুর্দ্ব্যেকযুতাবেবমভিন্নে ভবতঃ পদে।
চতুর্দ্বিক্ষেপমূলাভ্যাং রূপক্ষেপার্থভাবনা ॥

অভিন্ন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ক্ষেপানয়নার্থ এই সূত্র। প্রথমে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ সাধন করিয়া কনিষ্ঠকে ভাজ্য, জ্যেষ্ঠকে প্রক্ষেপ ও ক্ষেপকে ভাজক কল্পনা করিয়া, কুট্টকদ্বারা এরূপ গুণসাধন কর, যাহার বর্গ ও প্রকৃতি অন্তর করিলে শেষ অল্প হয়। সেই শেষকে পূর্ব্বক্ষেপ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগফলকে ক্ষেপ বল। কিন্তু গুণবর্গ প্রকৃতি অপেক্ষা অল্প হইলে, ক্ষেপ ব্যস্ত হইবে, অর্থাৎ ধন থাকিলে ঋণ ও ঋণ থাকিলে ধন করিতে হইবে। যে গুণের বর্গ ও প্রকৃতির অন্তর গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই গুণের যে লব্ধি হইয়াছিল, তাহা কনিষ্ঠ হইবে। তাহা হইতে জ্যেষ্ঠ সাধন কর। প্রথম গৃহীত কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ ত্যাগ করিয়া অভিনব কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ দ্বারা কুট্টকাদি করিয়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ উৎপন্ন কর। এইরূপ বারম্বার কর। এইরূপে অনন্ত অভিন্ন কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ উৎপন্ন হইবে। এই নিয়মকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ চক্রবাল বলিয়াছেন। এই

নিয়মে ৪, ২ ও ১ ক্ষেপে অভিন্ন কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সাধন কর। ৪ ও ২ ক্ষেপের কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ দ্বারা ১ ক্ষেপে, কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ আনয়নার্থ ভাবনা কর।

উপপত্তি।

প্রথম পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও ক্ষেপ সাধন করিয়া ভাবনার্থ কনিষ্ঠ ১ কল্পনা কর। ইহার বর্গকে প্রকৃতিদ্বারা গুণ করিলে, প্রকৃতিই হইবে। সুতরাং তাহাতে ই^{২}—প্র যোগ করিলে ই^{২} হয়, ইহা মূলপ্রদ। অতএব কনিষ্ঠ ১, জ্যেষ্ঠ ই, ক্ষেপ ই^{২}—প্র হইল।

এক্ষণে ভাবনার্থ ন্যাস।

ক	জ্যে	ক্ষে
১	ই	ই^{২}—প্র

ভাবনালব্ধ, কই+জ্যে, কপ্র+জ্যেই, ক্ষে(ই^{২}—প্র),

এক্ষণে ইষ্টবর্গহৃত ক্ষেপ ইত্যাদি নিয়মে কার্য্য করিতে ইষ্ট=ক্ষেপ, কল্পনা কর।

অতএব $\frac{\text{কই}+\text{জ্যে}}{\text{ক্ষে}}$, $\frac{\text{কপ্র}+\text{জ্যেই}}{\text{ক্ষে}}$, $\frac{\text{ই}^{২}-\text{প্র}}{\text{ক্ষে}}$,

এক্ষণে নূতন কনিষ্ঠ $\frac{\text{কই}+\text{জ্যে}}{\text{ক্ষে}}$ ইহাতে ই এর মান নিরূপণার্থ কুট্টক কর। তাহাতে গুণ যাহা হইবে, তাহা ই এর মান হইবে। লব্ধি, নূতন কনিষ্ঠ মান, অভিন্ন হইবে।

এই নূতন কনিষ্ঠে ক্ষেপ $\frac{\text{ই}^{২}-\text{প্র}}{\text{ক্ষে}}$ ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে ই^{২} অপেক্ষা প্র, অধিক হইলে ক্ষেপ ব্যস্ত হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বে ক্ষেপ ধন থাকিলে, নূতন ক্ষেপ ঋণ হইবে, আর ঋণ থাকিলে ধন হইবে। এক্ষণে এই ক্ষেপ অভিন্ন হইয়াছে কিনা বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, ইহার অংশীভূত ই^{২}—প্র অভিন্ন। কারণ, প্রকৃতি ও ইষ্ট অভিন্নই কল্পিত হইয়াছে।

পূর্ব্বসিদ্ধ নূতন কনিষ্ঠ বা লব্ধি হইতে ইষ্টবর্গ মান আনয়ন কর। লব্ধি=ল কল্পনা কর।

$$\text{ল}=\frac{\text{কই}+\text{জ্যে}}{\text{ক্ষে}}$$

$$\therefore \text{ই}=\frac{\text{লক্ষে}-\text{জ্যে}}{\text{ক}}$$

$$\text{ই}^{২} = \frac{\text{ল}^{২}.\ \text{ক্ষে}^{২} - \text{২ ল. ক্ষে. জ্যে} + \text{জ্যে}^{২}}{\text{ক}^{২}}$$

$$\therefore\ \text{ই}^{২} - \text{প্র} = \frac{\text{ল}^{২}\ \text{ক্ষে}^{২} - \text{২ ল. ক্ষে. জ্যে} + \text{জ্যে}^{২} - \text{ক}^{২}.\ \text{প্র}}{\text{ক}^{২}}$$

কিন্তু $\text{ক্ষে} = \text{জ্যে}^{২} - \text{ক}^{২}.\ \text{প্র}.$ ইহার উত্থাপন করিলে,

$$\text{ই}^{২} - \text{প্র} = \frac{\text{ল}^{২}.\ \text{ক্ষে}^{২} - \text{২ ল. ক্ষে. জ্যে} + \text{ক্ষে}}{\text{ক}^{২}} = \frac{\text{ক্ষে}\ (\text{ল}^{২}.\ \text{ক্ষে} - \text{২ ল. জ্যে} + ১)}{\text{ক}^{২}}$$

এক্ষণে বিচার্য্য ঃ—কুট্টকার্থ ভাজ্য = ক ও হার = ক্ষে ছিল। তাহা দৃঢ় করা হইয়াছে। অতএব $\text{ক}^{২}$ ও ক্ষে অবশ্যই দৃঢ় হইবে। $\text{ক}^{২}$ ও ক্ষে দৃঢ়, অথচ $\text{ই}^{২} - \text{প্র}$ ।অভিন্ন তাহাহইলে বলিতে হইল যে, $\frac{\text{ক্ষে}\ (\text{ল}^{২}.\ \text{ক্ষে} - \text{২ ল. জে} + ১)}{\text{ক}^{২}}$ ইহাতে $\text{ক}^{২}$ দ্বারা ($\text{ল}^{২}$ ক্ষে—২ ল. জ্যে + ১) অবশ্য অপবর্ত্তিত হইবে। তাহা না হইলে, $\text{ই}^{২} - \text{প্র}$ অভিন্ন হইতে পারে না। নূতন কনিষ্ঠের ক্ষেপ $\frac{\text{ই}^{২} - \text{প্র}}{\text{ক্ষে}}$ ইহার অংশীভূত $\text{ই}^{২} - \text{প্র} = \frac{\text{ক্ষে}\ (\text{ল. ক্ষে} - \text{২ লক্ষে} + ১)}{\text{ক}^{২}}$ হইলে; "ক্ষে" দ্বারা ইহা নিঃশেষে ভক্ত হইতেছে। তাহা হইলে কনিষ্ঠ ও ক্ষেপ, অভিন্ন সিদ্ধ হইল। কনিষ্ঠ ও ক্ষেপ অভিন্ন হইলে, জ্যেষ্ঠ সুতরাং অভিন্ন হইবে। তাহা স্পষ্টই আছে। অতএব শ্লোকোক্ত সকলই উপপন্ন হইল।

উঁদাহরণ—

"কা সপ্তষষ্টি গুণিতা কৃতিরেকযুক্তা ?"

কোন্ রাশিকে ৬৭ দ্বারা গুণ করিয়া এক যোগ করিলে বর্গ হয়।

প্র ৬৭, ক্ষে ১

ক ১, জ্যে ৮, ক্ষে —৩,

এখানে ভা ১, হা—৩, ক্ষেপ ৮, কল্পনা করিয়া কুট্টক কর, ক্ষেপকে হর দ্বারা তক্ষণ করিয়া যথোক্ত প্রকারে বল্লী ০ ২ ০ জাত লব্ধি ও গুণ ০ ও ২। তষ্টীকরণে লব্ধি বিষমা, এজন্য স্বতক্ষণ ১ ও ৩ হইতে শুদ্ধ লব্ধি ১ ও গুণ ১। ক্ষেপ তক্ষণ লাভাঢ্য লব্ধি ও গুণ ৩ ও ১। হর ঋণ এজন্য লব্ধিও ঋণ হইবে। অতএব লব্ধি—৩ ও গুণ ১। গুণ বর্গ ১। প্রকৃতি ৬৭ হইতে

অন্তর করিলে, শেষ ৬৬, ইহা অল্প নহে। অতএব—২ ইষ্ট কল্পনা করিয়া ইষ্টাহত স্ব স্ব হরযুক্ত লব্ধি—৫ ও গুণ ৭। গুণবর্গ ৪৯ ও প্রকৃতি ৬৭ অন্তর করিলে, শেষ ১৮। ক্ষেপ—৩ দ্বারা ভাগ করিলে ক্ষেপ—৬ প্রকৃতি অপেক্ষা গুণবর্গ ছোট, এজন্য ক্ষেপ ব্যস্ত হইবে, অর্থাৎ +৬ ক্ষেপ হইবে। লব্ধি, কনিষ্ঠ—৫ ইহার ঋণত্ব বা ধনত্বে উত্তরবর্ত্তী কার্য্যে কোন বিশেষ নাই, অতএব +৫ হইল। ইহার বর্গ প্রকৃতিদ্বারা গুণ করিয়া ৬ যোগ করিয়া মূল লইলে, জ্যেষ্ঠ ৪১,

পুনর্ব্বার কুট্টক কর।

ভা ৫, হা ৬, ক্ষেপ ৪১,

ইহা হইতে লব্ধি ও গুণ ১১ ও ৫। গুণবর্গ ২৫ ও প্রকৃতি ৬৭ উভয়ের অন্তর ৪২। ক্ষে ৬ দ্বারা ভাগ করিয়া ক্ষে ৭ পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত ক্ষে—৭, লব্ধি ১১ কনিষ্ঠ ইহা হইতে জ্যেষ্ঠ ৯০,

পুনর্ব্বার কুট্টক

ভা —১১, হা —৭, ক্ষে ৯০, হর তষ্টে ধনক্ষেপে ইত্যাদি নিয়মে জাত গুণ ৫ বিষম লব্ধি এজন্য তক্ষণ শুদ্ধ গুণ ২। —১ ইষ্টকল্পনা করিয়া —১ × —৭ = ৭। গুণ ২ ইহাতে যোগ করিলে, গুণ ৯। ইহার বর্গ ৮১ হইতে প্রকৃতি ৬৭ অন্তর করিলে, শেষ ১৪। ক্ষেপ —৭ দ্বারা ভাগ করিলে ক্ষেপ —২, লব্ধি, কনিষ্ঠ ২৭, ইহা হইতে জ্যেষ্ঠ ২২১,

ইহা দ্বারা তুল্য ভাবনা

ক ২৭, জ্যে ২২১, ক্ষে —২,

ক ২৭, জ্যে ২২১, ক্ষে —২,

উক্তবৎ, ক ১১৯৩৪, জ্যে ৯৭৬৮৪, ক্ষে ৪,

এক্ষণে —২ ইষ্ট মানিয়া ইষ্টবর্গহৃত ক্ষেপ ইত্যাদি নিয়মে

ক ৫৯৬৭, জ্যে ৪৮৮৪২, ক্ষে ১,

রূপশুদ্ধৌ খিলোদ্দিষ্টং বর্গযোগো গুণো নচেৎ।
অখিলে কৃতিমূলাভ্যাং দ্বিধারূপং বিভাজিতম্॥
দ্বিধা হ্রস্বপদং জ্যেষ্ঠং ততোরূপবিশোধনে।
পূর্ব্ববৃদ্বা প্রসাধ্যেতে পদে রূপবিশোধনে॥

—১ ক্ষেপ হইলে, যদি প্রকৃতি কোন দুইটী বর্গ রাশির যোগ তুল্য না হয়, তাহা হইলে, সে উদাহরণ দুষ্ট, অর্থাৎ উদাহরণই নহে। উদাহরণ দোষযুক্ত না হইলে, ১ কে দুই স্থানে স্থাপন কর। যে দুই বর্গের যোগ প্রকৃতি, সেই দুই বর্গের মূল দ্বারা ঐ দুই স্থানস্থিত ১কে ক্রমে ভাগ কর। তাহা হইলে দ্বিবিধ কনিষ্ঠ হইবে। তাহা হইতে —১ ক্ষেপে জ্যেষ্ঠ সাধন কর। অথবা পুর্ব্বোক্ত নিয়মে —১ ক্ষেপে কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সাধন কর।

উপপত্তি।

বর্গ প্রকৃতি নিয়ম অনুসারে $প্র. ক^{২} — ১ = জ্যে^{২}$ ইহা হইয়াই থাকে।

$$প্র. ক^{২} = জ্যে^{২} + ১$$

$$\therefore\ প্র = \frac{জ্যে^{২}}{ক^{২}} + \frac{১}{ক^{২}} = \left(\frac{জ্যে}{ক}\right)^{২} + \left(\frac{১}{ক}\right)^{২}$$

অতএব উপপন্ন হইল যে —১ ক্ষেপে প্রকৃতি বর্গযোগ তুল্যই হইবে। —১ ক্ষেপের যে উদাহরণের প্রকৃতি বর্গযোগ তুল্য নহে। সে উদাহরণই দোষ যুক্ত।

অন্য প্রকার ১ —ক্ষেপে কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সাধনের নিয়ম।

যদি $প্রকৃতি = যা^{২} + কা^{২}$, কনিষ্ঠ = ১, $ক্ষেপ = — যা^{২}$ অথবা $— কা^{২}$ কল্পনা কর, তাহা হইলে বর্গ প্রকৃতির নিয়মে,

$$কনিষ্ঠ = ১,\quad জ্যেষ্ঠ = কা,\quad ক্ষে = — যা^{২}$$

$$\text{অথবা}\ কনিষ্ঠ = ১,\quad জ্যেষ্ঠ = যা,\quad ক্ষে = — কা^{২}$$

এক্ষণে "ইষ্টবর্গহৃত ক্ষেপঃ" ইত্যাদি নিয়মে ই = যা অথবা কা কল্পনা করিলে,

$$কনিষ্ঠ = \frac{১}{যা},\quad জ্যেষ্ঠ = \frac{কা}{যা},\quad ক্ষে = —১$$

$$\text{অথবা}\ কনিষ্ঠ = \frac{১}{কা},\quad জ্যেষ্ঠ = \frac{যা}{কা},\quad ক্ষে = —১$$

ইহা দ্বারা সকলই উপপন্ন হইল।

স্ববুদ্ধ্যৈব পদে জ্ঞেয়ে বহুক্ষেপবিশোধনে।
তয়োর্ভাবনয়ানন্ত্যং রূপক্ষেপপদোত্থয়া ॥
বর্গছিন্নে গুণে হ্রস্বং তৎপদেন বিভাজয়েৎ।

বহু ধন ক্ষেপ বা ঋণ ক্ষেপ উপস্থিত পাইলে, নিজ বুদ্ধি অনুসারে ১ ক্ষেপের উপযোগী কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ নিরূপণ কর। পরে ১ ক্ষেপে কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠের ভাবনা দ্বারা অনন্ত কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ হইবে।

প্রকারান্তর বলিতেছেন :—

প্রকৃতি যদি কোন বর্গরাশি দ্বারা বিভক্ত হয়, তাহা হইলে, ভাগ করিয়া ভাগফলকেই প্রকৃতি কল্পনা করিয়া কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সাধন কর। সিদ্ধ কনিষ্ঠকে উক্ত বর্গ রাশির মূল দ্বারা ভাগ করিলে কনিষ্ঠ হইবে।

উপপত্তি।

$$প্রকৃতি = যা^{২}. কা,\ ক্ষেপ = ১,$$

$$\therefore\ যা^{২} কা. ক^{২} + ১ = জ্যে^{২}$$

$$যা^{২} কা. ক^{২} = জ্যে^{২} — ১$$

এক্ষণে একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, $যা^{২}. কা \times ক^{২}$ বা $কা \times যা^{২}. ক^{২}$ সমান অর্থ। অতএব এখানে কা = প্রকৃতি ও $যা^{২}. কা^{২}$ = কোন কনিষ্ঠ বর্গ, কল্পনা করিলে, কনিষ্ঠ = যা.ক হইবে। অতএব $যা^{২}$ ইহার মূল, যা দ্বারা কনিষ্ঠকে ভাগ করিলে প্রকৃত কনিষ্ঠ হইবে।

বর্গরূপ প্রকৃতিতে কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সাধনার্থ সূত্র।

ইষ্টভক্তো দ্বিধা ক্ষেপ ইষ্টো নাঢ্যো দলীকৃতঃ।
গুণমূলহৃতশ্চাদ্যো হ্রস্বজ্যেষ্ঠে ক্রমাৎ পদে ॥

ক্ষেপকে ইষ্ট অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিয়া দুই স্থানে স্থাপন কর। প্রথমস্থানে ইষ্ট ঋণ কর। দ্বিতীয় স্থানে ইষ্ট যোগ কর। প্রথম স্থানের অঙ্কের অর্দ্ধকে প্রকৃতির মূল দ্বারা ভাগ করিলে কনিষ্ঠ হইবে। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্কের অর্দ্ধ, জ্যেষ্ঠ হইবে।

উপপত্তি।

প্রকৃতি কোন বর্গরাশি অতএব $প্র = য^{২}$

$$ক^{২}. য^{২} + ক্ষে = জ্যে^{২}$$

$$জ্যে^{২} — ক^{২} য^{২} = ক্ষে$$

এখানে জ্যে — কয = ই কল্পনা কর।

$$\therefore \quad \text{জ্যে} + \text{কয} = \frac{\text{ক্ষে}}{\text{ই}}$$

$$\text{জ্যে} - \text{কয} = \text{ই}$$

$$২\ \text{জ্যে} = \frac{\text{ক্ষে}}{\text{ই}} + \text{ই}$$

$$২\ \text{কয} = \frac{\text{ক্ষে}}{\text{ই}} - \text{ই}$$

$$\text{জ্যে} = \left(\frac{\text{ক্ষে}}{\text{ই}} + \text{ই}\right)\frac{১}{২}$$

$$\text{ক} = \left(\frac{\text{ক্ষে}}{\text{ই}} - \text{ই}\right)\frac{১}{২\,\text{য}}$$

উদাহরণ।

কা কৃতির্নবভিঃ ক্ষুণ্ণাদ্বিপঞ্চাশদ্‌যুতা কৃতিঃ ?

কোন্ রাশির বর্গকে ৯ গুণ করিয়া ৫২ যোগ করিলে, বর্গ রাশি হয় ? ক্ষেপ ৫২ ইহাকে ইষ্ট অঙ্ক ২ দ্বারা ভাগ করিয়া দুই স্থানে স্থাপন কর, ২৬।২৬ ইষ্ট দ্বারা হীনও যুক্ত কর, ২৪।২৮ ইহাদের অর্দ্ধেক ১২।১৪ এই দুয়ের প্রথম স্থানের অঙ্ককে প্রকৃতির মূল ৩ দ্বারা ভাগ করিলে, কনিষ্ঠ ৪ জ্যেষ্ঠ ১৪ হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য।

সম্রাট্ জহাঁগীরের স্বলিখিত আত্ম-জীবনবৃত্তান্ত।*

ভূমিকা।

সরলতা ও মমতা, গম্ভীরতা ও বালকোচিত তরলতার আকর—অক্‌বর্। উদারতা ও দূরদর্শিতা, গভীররাজনীতিজ্ঞতা বা অনুগত-বৎসলতা, দয়াশীলতা অথচ কার্য্যকালে কঠোরতা—ইত্যাকার ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের মূর্ত্তিমান্ সুন্দর মনোহর চিত্তচমৎকারজনক আধার—মহামতি অক্‌বর্। সেলিম অথবা জহাঁগীর—সেই বরণীয় বন্দনীয় প্রাতঃস্মরণীয় পিতার পুত্র। তনয়, স্বকীয় মহানুভব-স্বভাব জনকজননীর সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হয়,—

* "সাহিত্য-সভার" ১৩০৮ সালের চৈত্রের অধিবেশনে পঠিত।

এটী একটী বিশ্বের বিধি-ব্যবস্থার অবহির্ভূত নিয়ম। স্থলে স্থলে এটী আবার তদ্বিপরীত—রীতিও বটে; হুমায়ুনের যাবতীয় গুণ, তৎসুত অক্‌বরে বর্ত্তে নাই। সেলিম উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সুত—একথা কোন মতে বলিতে পারা যায় না। তবে—

"বাপ্‌কা বেটা, সিপাহিকা ঘোড়া।
কুছ্ নেহি রহে, তো থোড়া থোড়া।"

এই মহাজন বচনের বলেই বলিতেছি, জনকের যত কিছু সুগুণ বিদ্যমান ছিল, তাহার কতক কতক অংশতঃ তাঁহাতে বর্ত্তিয়াছিল। ফলতঃ, হুমায়ুন ও অক্‌বরে গুণাংশে যাদৃশ সাদৃশ্য, অক্‌বর্ ও জহাঁগীরে তদপেক্ষাও স্বল্প সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও, জহাঁগীর পিতার ভারতবিজয়িনী বিপুল সুশিক্ষিতবাহিনীর উত্তরাধিকার পাইয়া, রাজকার্য্যের যে অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যের বহুল উপকার সংসাধিত হইয়াছিল।

ঈশ্বর-স্তোত্র।

যাঁহার পরম পবিত্র নাম, সর্ব্ব-শরীরের শিরায় শিরায়--ধমনীতে ধমনীতে বিদ্যমান,—যাঁহার অপার মহিমার সীমাবধারণ কাহারও সামর্থ্যাধীন নয়,—যাঁহার কীর্ত্তি, জগদ্‌গৃহের প্রকাণ্ড প্রাচীর-নিকরে মূর্ত্তিমতী,—যাঁহার অনুপম অসীম প্রেম. পৃথিবীর প্রাকারের অভ্যন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত,—যাঁহার নিরুপমা মূর্ত্তিমতী করুণা-কণা, অবিরাম নয়নাভিরাম সুদৃশ্য প্রদর্শন করে,—যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব, অবনীর মহানিকেতনের সুদীর্ঘ প্রাচীরে, প্রকাণ্ড স্তম্ভে উজ্জ্বলবর্ণে ক্ষোদিত, তাঁহার মহান্ শ্রীচরণে আমার কোটী কোটী প্রণতি। তিনি ইচ্ছাময়। অনন্ত তাঁহার গুণ। তদীয় কল্পনাও, অতুলন। তাই তাঁহার অভিলাষ, নিঃসংশয়িত রূপেই অশেষ। সেই পুরাণ পুরুষের বাসনা-বলেই, নিমেষ মাত্রেই দ্যুলোক ও ভূলোক, পাতাল ও রসাতল জীব-জন্তু, উদ্ভিজ্জ ও খনিজদ্রব্যসম্ভার, অনিবার সমুদ্ভূত। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ ভগবান্, মহান্ ও মহীয়ান্। তিনি শিল্পি-প্রধান। তাঁহার বিচিত্র কারুকৌশলে সকলে স্তম্ভিত ও স্তিমিত, বিস্মিত ও চমৎকৃত।

নীলনভোমণ্ডল—সুপ্রকাশ আকাশ-তল, যেন আতপ-নিবাবক একখণ্ড অখণ্ড চন্দ্রাতপ! মানবখচিত কারু-কার্য্য, যতই আশ্চর্য্য কৌশলপ্রদর্শক হউক না কেন, সেই বিশ্ববিধাতা শিল্প-কুশলীর লীলাখেলার কাছে তাহা তুচ্ছ, ছার ও অসার। নর-রচিত চন্দ্রাতপের কৃত্রিমতাই, তাহার অপ্রধানতার হেতুভূত। ব্রহ্মাণ্ড-নেতার অপরাপর চিত্র-বিচিত্র বিবিধ-বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা-মূলক ক্রিয়াকলাপ, যেন চিত্র-লিখিত সুচিত্রিত নানাবর্ণে রঞ্জিত প্রকৃত চন্দ্রাতপবৎ প্রতীয়মান।

পরমাত্মা, স্বকীয় পরম পূত প্রভায় ও মহানুভাব গৌরব-প্রভাবে অভূত-পূর্ব্ব বিক্রম বিকাশিত করিয়াছেন; তাহাতেই এই অগণ্য ধান্য-পরিপূর্ণ ধরা-ধাম—ধরণী-রাণী, কি অনির্ব্বচনীয় সুষমায় শোভিত! কি সুন্দর সাজেই সুসজ্জিত। তাঁহারই শ্রীপদে যেন আমার অচলা ভক্তি ও অহৈতুকী মতি থাকে। এই মাত্রই প্রভু! ত্বৎসন্নিধানে আমার বিনীত প্রার্থনা। দয়াময়! তদীয় সুগুণ-গীতি ও স্তুতি কীর্ত্তননিবন্ধন ভবদুদ্দেশে কৃতজ্ঞতা-স্রোতঃ প্রবাহিত হউক।

ভবিষ্যদ্বক্তার মহিমা।

আর, সেই প্রাণিসমূহাগ্রগণ্য মহম্মদও ধন্য! তাঁহার ক্রিয়া-কলাপও, সর্ব্বথা—প্রশংসনীয়। সুতরাং, তিনিই পুরুষোত্তম। পাপী তাপী প্রাণি-পুঞ্জকে অতলস্পর্শ অগাধ পাতকোদধির কলুষময় কল্মষ-পঙ্ক হইতে পরিত্রাণের প্রবৃত্তি ও আসক্তি, তাঁহারই শক্তির আয়ত্ত। শুধু আয়ত্ত নয়—প্রকৃতপ্রস্তাবে তত্তৎ কর্ম্মসমূহ তৎকর্ত্তৃক সুচারুরূপে সম্পাদিত! মুসলমানগণ, তাঁহারই অনুগ্রহে সুবিমল পুণ্য-ধর্ম্ম-সলিলে, ক্লেদ-ক্লিন্ন জীর্ণ শীর্ণ বিবর্ণ তনু বিধৌত করিয়া দিয়াছিল। মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-তন্ত্রের প্রভায় তজ্জাতীয় লোকচয়ের নিমিত্ত সুপরিষ্কৃত সত্য-পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। মুসলমানগণ বিবেচনা করেন—সেই মার্গ সম্যক্ মার্জ্জিত—সুসংস্কৃত। ভগবৎ-প্রদত্ত সামর্থ্য, তাঁহার বশীভূত। কারণ, তাঁহার করে লোকোত্তর ক্ষমতা, ঈশ্বরানুগ্রহে সমর্পিত হইয়াছিল। পরমেশ, সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা প্রদান করেন। সুতরাং, ইহলোকের লোকদিগের অভিধানে তাঁহার

মহাজনগণাগ্রগণ্য আখ্যান দেদীপ্যমান। মুষা, সর্ব্বপ্রথম স্বয়ং, তাঁহার এই সংসারের আবির্ভাবের কথা,—শুভাগমনের বার্ত্তা—ঘোষণা করিয়া দেওয়াতেই, তাঁহার অগণন সম্মান বর্দ্ধন হইয়াছিল। ইস্রেলও, তদীয় দীপ্তিময় দেহ-জ্যোতিঃ হইতে দ্যুলোকীয় দ্যুতির কারণ-স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ গুণ-সম্পন্ন মহম্মদ, জয়যুক্ত হউন।

কাল, চিরকালই অনাদি—অনন্ত—অসীম। ইতিহাস, সেই অনাদি অনন্ত কালের একাংশ। কালাংশ-সম্ভূত ইতিবৃত্তে আমার বিচিত্র জীবন-চিত্রের কোন কোন ঘটনার রেখা, অঙ্কিত থাকিবার সম্ভাবনা। ইতিহাসে সেই রেখা লেখা থাকিবার কথা—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা—বিশিষ্ট সংস্কার—বলবতী আশা। সেই আশায় সমাশ্বস্ত থাকিয়া—সেই আশ্বাস-কুহকে আক্রান্ত হইয়া, আমাকে নিজ-জীবনের কতক কতক কার্য্য, পরমাশ্চর্য্যবোধক না হইলেও, নিবদ্ধ করিতে হইতেছে। *

সিংহাসনারোহণ।

১০১৪ হিজিরার ৮ই জমাদি (১) বৃহস্পতিবার (২) প্রাতঃকাল (৩) আমার সিংহাসনাধিরোহণের কাল। তখন আমার বয়ঃক্রম ৩৮ (আটত্রিশ)

---

* ইহার পরই ৩৮ (আটত্রিশ) বর্ষের ঘটনা হইতে বর্ণনারম্ভ। জহাঁগীরের রাজ্যারোহণ প্রসঙ্গই আত্মজীবন বৃত্তান্তের প্রারম্ভ। অতএব জন্মাবধি ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বৎসরের বিবরণ বর্ণন করিতে হইতেছে।

(১) তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কাহারও মতে, ১০১৪ হিঃ, ২০শে জিম্‌দ (দ্বিতীয়) তাঁহার সিংহাসনাধিষ্ঠানের কাল।

(২) উহার ইংরাজি অব্দ ও মাস তারিখ ও বার, নিম্নে লেখা হইল। কিন্তু, উহার ইংরাজি অব্দাদি ঠিক নয়;—পরস্পর ভিন্ন মত নীচে ব্যক্ত হইল।

(ক) ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ, ১০ই অক্টোবর—প্রাইস্।

(খ) ,, ,, ১২ই ,, —ইনি ৬ষ্ঠ রাজ. ২৮৪ পৃঃ।

(গ) ,, ,, ২১শে ,, —Dow, Vol III. pp. 4—5.

(৩) কাহারও মতে, বেলা ১টার সময়। ডাউ বলেন, তখন তাঁহার ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বৎসর বয়ক্রম হইয়াছিল।—Dow, Vol III, pp. 4—5.

বর্ষ। ভারতের তদানীন্তন অন্যতম রাজ-ধানী (৪) আগ্‌রা-নগরী, ঐ মহোৎসব-ব্যাপারেরই গৌরব-প্রাপ্তির অধিকারিণী। কেননা, যে আগ্‌রা-পুরী, এবম্ভূত বহুবিধ মহোৎসবের বরাবরই প্রায় উৎস হইয়া আসিতেছিল, বিদ্যমান বিষয়েরও লীলাস্থলী—সেই মহাপুরী আগ্‌রা-নগরী। যখন আমি, সম্রাট্-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম, তখন আমি ৩৮শ (অষ্টত্রিংশ) বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃদেব, অষ্টবিংশ (২৮) বর্ষ বয়ক্রমাবধি সন্তান-সন্ততির আনন অবলোকনে বঞ্চিত ছিলেন। সুতরাং পুত্রের বদন-নিরীক্ষণ-জনিত আনন্দ সম্ভোগ করা, তাঁহার ভাগ্যে ঘটিতে পায় নাই। এই কারণে সদাই তাঁহাকে নিরানন্দে থাকিতে হইত। এত বড় বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী নাই—একথা যখনই তাঁহার অন্তরে উদিত হইত, তখনই তাঁহার মনঃক্ষোভের সীমা থাকিত না। কিন্তু অক্‌বর বা তৎসদৃশ ব্যক্তি, কেবল মনঃক্ষোভে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। তাঁহাকে উহার প্রতিকারে বদ্ধ পরিকর হইতে হইল। তাঁহাকে দরবেশদিগের (সন্ন্যাসীদিগের) সন্নিধানে প্রায়ই গতায়াত করিতে দেখা যাইত। তৎকালে ভারতে যত দরবেশ ছিলেন, মুনিনুদ্দীন চিস্তী, তাঁহাদের অগ্রগণ্য। ধর্ম্ম-প্রাণতার নিমিত্ত তিনি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। পিতার অভিলাষ হইল—ঐ সাধুর পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে পদব্রজে গমন করিবেন। আগ্‌রা এবং উক্ত সাধুর সমাধিক্ষেত্র—এতদুভয়ের মধ্যে একশত চল্লিশ ক্রোশের ব্যবধান। এই সুদূর পথ, বাদসাহ, পদব্রজে গমনে উদ্যত হন।

৯৭৭ হিজিরার ৭ই রবিয়ল্ আউল,—আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন। সেদিন বুধবার। বেলা, অনুমান ৭টার সময় আমার জন্ম হয়। রাজধানী আগরার সন্নিকটে সিক্‌রি নামক স্থানে "শেখ্ সেলিম্" নামক এক দরবেশ, তৎকালে বসতি করিতেন। আমার পিতা, ফকির, দরবেশ, প্রভৃতির প্রতি আসক্তিমান্ ছিলেন; সুতরাং দরবেশ্ "সেলিমের" সহিত

(৪) দিল্লী, লাহোর, আগ্‌রা ইত্যাদি নগর নিকর, মোগল রাজপুরুষ পুঙ্গব বর্গের রাজধানী।

সহজেই তাঁহার সম্প্রীতি ঘটিল। একদা কথাপ্রসঙ্গে দরবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পুত্রাদি হইবে কি না। যদি হয়, তাহাহইলে তাহাদের সংখ্যা কত হইবে? দরবেশের উত্তর হইল—তিন পুত্র জন্মিবে। সম্রাট্, তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, "আমার প্রথম সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার, আপনার উপর ন্যস্ত হইবে। আর, আপনার নামানুসারে তাহার নামকরণ হইবে।"

তদনুসারে মদীয় জননী, যখন আসন্ন-প্রসবা হইলেন, পিতৃদেবের অনুজ্ঞা-ক্রমে তিনি উল্লিখিত দরবেশের কুটীর-দ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় আমার জন্ম হয়। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির প্রতি অনুরাগ জন্য আমার নাম হইল—"সেলিম্" অথবা "সুলতান সেলিম্"। এখানে একটা কথা ব্যক্ত করিতে বাধা নাই যে, আমার পিতৃদেবকে আমি কোন দিনই উক্ত নাম-দ্বয়ের অন্যতরে—কি "মহম্মদ সেলিম" নামে আমাকে আহ্বান করিতে শুনি নাই। "সেখ বাবা" নামে আহ্বানই তাঁহার মধুর ও প্রিয় সম্বোধন। সিক্‌রি, আমার জন্মস্থান। সেই হেতুই উক্ত স্থান, তাঁহার নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। পিতৃদেব, তথায় তাঁহার নিজের অবস্থান জন্য প্রাসাদ প্রস্তুত করান; ঐ ঘটনাই, তাহার নিদান। যে "সিক্‌রি", ইতঃপূর্ব্বে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি অজস্র হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর আবাস স্থল ছিল—কয়েক বৎসরের মধ্যে, সেই "সিক্‌রি" সুন্দর মনোহারি স্থানে পরিণত হইয়া উঠিল। কালক্রমে নিতান্ত নিবিড় জঙ্গল-সঙ্কুল স্থল, সুশোভন উদ্যানপরম্পরা, সুবিশাল পান্থ-শালা ও বিবিধ প্রমোদ-নিবাস-স্থান দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। গুর্জর বিজয়ের অব্যবহিত পর হইতে "সিক্‌রি", "ফতেপুর সিক্‌রি" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এইবার আমার নাম পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিবার কামনা করি।

তুর্কির সুলতানের ও আমার নামে কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে, এই উদ্দেশ্যেই নাম পরিবর্ত্তনে আমার প্রয়াস। "জহাঁগিরি" অর্থাৎ রাজ্য-সংরক্ষণই—সম্রাটের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

অতএব সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার নাম জহাঁগীর রাখি-

লাম। আমি অতি শুভদিনে ও শুভক্ষণে রাজতক্তায় উপবিষ্ট হই। এজন্য আমি অপর একটী নামেও অভিহিত হইয়াছিলাম, সেটি "নুরউদ্দিন" অর্থাৎ জগজ্জ্যোতি। এতদ্বতীত "নুরউদ্দিন জহাঁগীর" এই সংজ্ঞাও আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। এরূপ সোপাধিনাম রাখিবার আমার বিশেষ কারণও ছিল। আমি বাদ্‌সাহ্‌ হইবার পূর্ব্বে বরাবর বিদ্বজ্জনগণ প্রমুখাৎ একটী ভবিষ্যদুক্তি শুনিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা বলিতেন যে, জলালউদ্দিন অক্‌বর বাদ্‌সাহের পর নুরউদ্দিন আখ্যাবিশিষ্ট একব্যক্তি বাদ্‌সাহ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন। আমি তাঁহাদের এই সুমহতী উক্তির পুরণার্থে শেষোক্ত অভিধা গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আগ্‌রা নগরীর বিবরণ।

আগ্‌রা নাম্নী সুন্দরী পূরীতে, আমি আমার করে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলাম। আগ্‌রা অতি সুপ্রাচীন সর্ব্বজনবিদিত বিখ্যাত নগরী। এই চিত্ত চমৎকার স্থান কত মহোৎসবেরই লীলাস্থলী হইয়াছে। যমুনা নদী তীরে এই ভারতগৌরব পুরীর এক সুবৃহৎ দুর্গ ছিল। এক্ষণে যে নেত্রশোভাকর বিচিত্র রক্তপ্রস্তরময় এক অপূর্ব্ব অষ্টদ্বারসংযুক্ত দুর্গ যমুনানদীর সুষমা সম্বর্দ্ধন করিতেছে—তাহা প্রাচীন দুর্গ নয়। পূর্ব্বে যমুনাতীরে যে এক বিস্তৃত দুর্গ সংস্থিত ছিল, আমার জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বে মদীয় পিতৃকর্ত্তৃক তাহার সম্যক্‌ উচ্ছেদ সাধিত হয়। অধুনাতন দুর্গ পুরাতন দুর্গের স্থানীয় নূতন দুর্গ। এই দুর্গ নির্ম্মাণে ১৬ বৎসর লাগিয়াছিল, এবং ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এক্ষণে আগ্‌রা নগরীর সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

সীমা—আগ্‌রার উত্তরে সম্বল প্রদেশ, ও দক্ষিণে চান্দিরি অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব সীমা কনোজসীমান্ত এবং পশ্চিম সীমা নাগোর। জলবায়ুঃ— আগ্‌রার জলবায়ু কাহারও কাহারও পক্ষে স্বাস্থ্যকর; কিন্তু অনেকের পক্ষে ইহা অস্বস্থতাসম্পাদক। যাহারা দুর্ব্বল ও উদরপীড়াগ্রস্থ, তাহাদের পক্ষে এ সহর বিশেষ অপকারী। যাহারা সর্ব্বদা বিমর্ষ ও সর্দ্দি যাহাদের সর্ব্বদা আশ্রয়, তাহাদের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর নয়। কফ ও বিমর্ষভাবাপন্ন গো অশ্ব

জাতির ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার জলবায়ু নিতান্ত উষ্ণ, সুতরাং অতি পরিষ্কার।

আগ্‌রার পূর্ব্ব বৃত্তান্তঃ—আগ্‌রা নগরী কিরূপে দিল্লীর সম্রাট্‌গণের রাজধানী স্বরূপ গৃহীত হয়, তাহা ক্রমে বিবৃত করিতেছি। লোদী-বংশীয়দিগের রাজত্বকালের পূর্ব্বে আগ্‌রা অতি প্রভাবশালী নগর ছিল। ইহাতে একটী শোভাশালী দুর্গও ছিল। সুলতান ইব্রাহিমের পুত্র এবং মহম্মদ গজনবীর প্রপৌত্র মহম্মদ এই দুর্গ অধিকার করেন। সাদ সলেমান তাঁহার এই দুর্গাধিকারে প্রীত হইয়া, এইরূপ প্রশংসাবাদ লিখেন, ধূলির মধ্য হইতে দুর্গটি যেন সুবৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছিল। তাহার এতদুক্তি দুর্গের উচ্চতা বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার কিছুকাল পরে সিকন্দর লোদী দিল্লী পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস স্থির করিবার অনতিকাল মধ্যে, আগ্‌রা ভারতীয় সম্রাটদিগের রাজধানী হইল। অতঃপর সিকন্দর লোদী বাদ্‌সাহ্‌ বাবর কর্ত্তৃক বিজিত ও হত হন। গৌরবসমন্বিত মোগল সম্রাটদিগের আদিপুরুষ মহাত্মা বাদ্‌সাহ্‌ বাবর ৯০৪ হিজরাতে লোদীবংশের শেষপুরুষ সিকন্দর সাহ্‌কে পানিপথ ক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, এবং তৎপরে রাণা সংগকে পরাজিত করিয়া মোগল শাসনাধীন করিলে পর, আমোদ প্রমোদ কৌতুকের জন্য ব্যস্ত হয়েন। এই সময়ে কুলু কুলু নিনাদিনী কৃষ্ণসলিলা যমুনার পূর্ব্ব কূলে, একটী নয়নরঞ্জন মনোমুগ্ধকর স্থানে, চারিটী সুন্দর ফলফুলশোভিত সুবৃহৎ উদ্যান স্থাপন করেন। তিনি এই সমুদয় উদ্যানের "গুলে আফগান" নাম দিয়াছিলেন। উদ্যান মধ্যে লোহিত বর্ণের উৎকৃষ্ট প্রস্তরদ্বারা একটী ক্ষুদ্র মনোহর হর্ম্ম্য, ও পার্শ্বে একটি মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করেন, এবং ইচ্ছা ছিল যে, একটি সুবৃহৎ প্রাসাদও তথায় নির্ম্মাণ করান, কিন্তু বিধাতা সে সাধ পূর্ণ করিতে দেন নাই। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকল সাধই হৃদয় মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

আমার পিতার রাজত্বকালে জগতে যত প্রকার সুমিষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে, প্রায় সমুদয়ই সংগ্রহ করিয়া আগ্‌রা ও তৎচতুস্পার্শবর্ত্তী স্থানসমূহে রোপণ করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন আম্র ও তরমুজ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের সুমিষ্ট ফলও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। ভারতের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী

স্থানসমূহের উৎপন্ন সুমধুর আঙ্গুর, কিশমিশ প্রভৃতি বহুবিধ ফল লাহোরের বাজারে আমদানী হইয়া থাকে। ইয়ুরোপের সমুদ্র কূলজাত সুস্বাদু আনারসও "গুল আফগানে" প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

"গুল আফগানের" ফুলরাজি অতি সুন্দর। চম্পক কেতকী, রাটনীল, সেঁউতি, চামেলী, মূলসরি প্রভৃতি মনপ্রাণহারী নয়নমুগ্ধকর সুরভিময় পুষ্প-সুশোভিত, ইহা ব্যতীত নানা রঙ্গের সুগন্ধি বিদেশীয় পুষ্পও উহার শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

আগ্রার অধিবাসিগণ ব্যবসায় ও বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নত। হিন্দু মুসলমান জৈন, য়িহুদী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের লোকই এথানে বসবাস করিয়া থাকে। যৌবনকালে দেখিতাম ও বুঝিতাম যে, অনেক সময় বিচারকগণ ন্যায়বিচার করিতেন না। তাঁহারা অভিযোগ সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া বিচার করিতেন; তজ্জন্য আমি রাজ্যাভিষেকের অনতিবিলম্বেই একটি ৩০ গজ দীর্ঘ ৬০টি ঘণ্টা সংলগ্ন চারিমণ ভারবিশিষ্ট স্বর্ণময় শৃঙ্খল টাঙ্গাইবার জন্য আদেশ করি। কারণ, প্রজাগণের সুবিচার না হইলে, তাহারা এই শৃঙ্খলে শব্দ করিলে, আমার নিকট সেই শব্দ পৌঁছিবে, এবং আমি পারক পক্ষে তাহাদের সবিশেষ অবস্থা শুনিয়া, যথার্থ বিচার করিতে চেষ্টা করিব। এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত দুর্গ মধ্যে একটি প্রস্তরে সংলগ্ন থাকে, এবং অপর প্রান্ত যমুনাতীরে একটী বৃহৎ প্রস্তরময় কলসে আবদ্ধ থাকে।

জগদ্‌যন্ত্রের মায়াপ্রপঞ্চে বিমোহিত হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সাংসারিক প্রলোভনে আমি আক্রান্ত হই নাই, এইহেতু কেহই যেন আমায় উপহাসাস্পদ জ্ঞান না করেন।

সলোমন, অনিলকে উপাধান স্থানীয় করিয়া মনোরম ভাবেই বিশ্রাম করিয়াছিলেন। প্রভঞ্জন, অদৃশ্য দ্রব্য। তথাপি তাঁহার ঐরূপ চেষ্টা হইয়াছিল। আমি তো সলোমন অপেক্ষা প্রধান বা গুণ-নিধান নহি—এইটি আমি মনে মনে ভাবিলাম।

শুভ সময়ে রাজদণ্ড ধারণ।

যে দণ্ডে আমি সিংসাসনে আসীন হইয়া করে বিচার-দণ্ড গ্রহণ করিলাম—ঠিক সেই দণ্ডেই ভাস্বর ভাস্কর, দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা অতিক্রমপুরঃসর,

উর্দ্ধগগনে উদিত হইলেন। এটী একটী, জয়সূচক ও মহাসুখে রাজত্ব সম্ভোগের নিদান। অন্ততঃ, আমি উহাকে তাদৃশ সঙ্কেত বলিয়াই ভাবিয়া লইলাম। সেই শুভ অবসরেই আমি, জহাঁগীর বাদ্‌সাহ (জগজ্জেতা) ও জহাঁগীর শাহ (জয়জয়ী অধিরাজ)—এই দুই উপনাম গ্রহণ করি। সাম্রাজ্যের মুদ্রায় যে বিবরণ মুদ্রণ-নিবন্ধন অনুরোধ করি—পশ্চাৎ তাহা বিবৃত হইতেছে,—

"সম্রাট্ অক্‌বরের তনয়—বসুন্ধরার অভয়দানকারী খুস্‌রু (সহাস্য-বদন) স্বীয় ধর্ম্মকর্ম্মের প্রভাস্বরূপ জহাঁগীর কর্ত্তৃক (রাজধানী) আগ্‌রা মহানগরীতে এই মুদ্রা ক্ষোদিত হইল।"

উৎসবায়োজন।

পিতৃ-পরিত্যক্ত সিংহাসনের ও অপরিমিত রাশিকৃত বিত্ত-সমস্তের যথোপযুক্ত ব্যবহারোদ্দেশে সূর্য্যদেবের মেষ রাশি-সংক্রমণ সময়ে (বৈশাখ মাসে) আমি নব-বৎসরীয় উৎসবের অনুষ্ঠানে অন্তঃকরণ নিয়োজিত করিলাম।

সিংহাসন নির্ম্মাণের ব্যয়।

এই সিংহাসন প্রস্তুত করিতে, ১০,০০০০০০০ (দশ ক্রোর) "আস্‌রফি" (১) অর্থাৎ ১৫০ কোটী টাকা ও হীরক, মাণিক্য, মুক্তা, চুনি, পান্না ইত্যাদি অগণ্য অমূল্য মহামূল্য শ্রেষ্ঠদ্রব্যাদির প্রয়োজন হইয়াছিল। সিংহাসন-নির্ম্মাণে কত সুবর্ণের আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাও এইখানেই আলোচ্য। ভারতবর্ষের ওজনের পরিমাণে ৩,০০ (তিন শত) মণ সুবর্ণে (২) সিংহাসন গঠিত হইয়াছিল। সিংহাসনের পাদদেশ ও গাত্র, ৫০ (পঞ্চাশ) মণ (৩) সুবর্ণ স্বর্ণ সুগন্ধি ওষধি-মণ্ডিত থাকিত। একারণ সন্ধি-স্থল সকল, স্থানান্তর-করণ নিবন্ধন কখন কখন পৃথক্-কৃত করার প্রয়োজন হইলেও, সদ্‌গন্ধ বন্ধ হইত না—বরং বরাবর তাহার গন্ধ অব্যাহতই থাকিত। সৌরভে গৌরবের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাতও হইত না। সিংহাসনের

(১) এখানে "আস্‌রফির" পরিমাণ নির্ম্মাণ আবশ্যক। ৫ (পাঁচ) মিতকাল=১ (এক) আস্‌রফি

(২) (এক) আসরফি=১ (এক) মোহর। ১ (এক) মোহর=১৫ (পনের) টাকা।

(৩) ভারতের ১ (এক) মণ=আরবদেশের ১০ (দশ) মণ।

যে যে স্থান, যতই বিস্তৃত হউক না কেন, তত্তৎ অংশকে সুগন্ধিত করিতে আর অপর সুগন্ধের আবশ্যকতা হইত না।

অকৃবরের সিংহাসন বর্ণন এবং তদানুষাঙ্গিক অন্যান্য সবিস্তর বিবরণ।

রাজাধীশ্বর অকবর, রাজপাটে উপবিষ্ট হইবার পর রাজমুকুটের উৎকর্ষ বিধান জন্য কি সুপরিবর্ত্তনই ঘটাইয়াছিলেন। কোন না কোন জটিল ও কুটিল, কূট ও উৎকট বিষয়ক অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই বক্ষ্যমাণ প্রকরণের অবতারণা করা হয় নাই। সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য বা কারুকার্য্যজনিত ভূমিপতি-দিগকে এদিকে কেমন যত্নবান্ ও আত্মমর্য্যাদাদিপরায়ণ হইতে হয়। অতি সারবতী রাজনীতি বিশারদবর্গ ব্যতিরেকে আর কে, এই সুগভীর বন্ধুর মার্গের তত্ত্ব সুবিদিত বল দেখি? ফলে গূঢ়গম্ভীর বুদ্ধিবলে কেবল সুদূরদর্শী মহীপালকুলেরই বোধগম্য ও মনোরম্য হয়—কোথায় অসম্ভব গৌরব বৃদ্ধির দরকার।—তাই পারস্যের মণ্ডলেশ্বরের শিরোভূষণের অনুকরণে এতটা অতিমাত্র প্রবৃত্তি। পূজ্যগণের প্রসাদ নির্ব্বিবাদে ছাত্রাদির সর্ব্বদা শিরোধার্য্য। আর্য্যবর্গের অনুগ্রহ লাভ যদি লোক সমূহের অনুকরণীয় না হয়—নাই হউক, কিন্তু আদর্শ-পুরুষপুঙ্গবের কদাপি তাহা লাঘবসূচক কার্য্য নয়। বলা বাহুল্য, জহাঁগীর, উত্তরাধিকারের সঙ্গে তাহারও অধিকারী হইলেন। সেই উৎকৃষ্ট মুকুটখানি গুণিজনাগ্রগণ্য রাজসত্তম সমবেত সাম্রাজ্য অগণ্য সৈন্য সমস্ত সামন্ত প্রভৃতি জনগণের সন্নিধানে মস্তকে পরিধান করায় কি পর্য্যন্ত সুশোভন হইয়াছিলেন?

এক ঘটিকার অধিককাল কিন্তু উহা শিরে ধারণে সমর্থ হইতে পারেন নাই! মুকুটটীর বারটী পল ছিল। প্রত্যেক পলে শোভাবর্দ্ধক এক একটি হীরক। প্রতি হীরার মূল্য—এক লক্ষ আস্রফি। অতএব বার পলে বারটি হীরা। পিতৃদেব স্বীয় রাজত্বকালে নিজোপার্জ্জিত বিত্তে ও বহুদিনের সঞ্চিত অর্থে উহার সংগ্রহ করেন। সেগুলি, কেবলই নিজস্ব; কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি নহে—রাজত্বের উদ্‌বৃত্ত অর্থে ক্রীত। মুকুটান্তর্গত তাবৎ হীরক সমস্ত নিজের সঞ্চিত। প্রত্যেক খণ্ড হীরকের

মূল্য—১০০,১০০ (এক লক্ষ) আস্রফি (?)। মুকুটস্থিত সুবর্ণ সমস্ত ও হীরকাদি, মদীয় পিতৃদেব, স্বীয় রাজত্বকালে সংগ্রহ করেন। তাঁহার পৈতৃক নহে—আমার পিতামহ বা প্রপিতামহাদির উপার্জ্জিত নহে। মুকুটের মধ্য মণি চারিমিতকাল ওজনের। তাহার মূল্য ১০০,০০০ (একলক্ষ) টাকা। ঐ মধ্যমাণিক্যের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রস্তর খণ্ডগুলির দর—এক মিতকাল। তাহাদের প্রত্যেক খানির মূল্য ৬০০০৲ (ছয়সহস্র মুদ্রা)।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

যদিও বিবিধ অনিবার্য্য প্রতিবন্ধকহেতু ইচ্ছাসত্ত্বেও পুষ্পিতা কামিনী উৎপথবর্ত্তিনী না হইতে পারে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেরই আর্ত্তব জরায়ুতে নিহিত হইয়া হংসের অসংযোগেও হংসীর অসার ডিম্বের মত সর্প, বৃশ্চিক, কুষ্মাণ্ডাকার প্রভৃতি বিকৃত প্রসব জন্মাইতে পারে, ইহা নিতান্ত জুগুপ্‌সার্হ। এরূপ ঘটনা এখনও শ্রুতিগোচরে উপস্থিত হয়।

এহেতু পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বেই অষ্টম নবম বর্ষে কন্যাকে পাত্রসাৎ করিবে। উক্তরূপ অপ্রাকৃতিক গর্ভের বিষয় শারীরতত্ত্ববিৎ ভগবান্ সুশ্রুতাচার্য্য শরীর স্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—*

---

(১) "রজস্বলা চ যা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে।
পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে॥"

* "যদানার্য্যাবুপেয়াতাং বৃষস্যন্ত্যৌ কথঞ্চন।
মুঞ্চন্ত্যৌ শুক্রমন্যোন্যমনস্থিস্তত্র জায়তে॥

অপর কেহ কেহ বালিকাবিবাহে এইরূপ যুক্তি নির্দ্দেশ করেন। তাহা এই ঃ—

বালিকা অবস্থায় বিবাহ হইলে, বধূকে শিক্ষদ্বারা সুগঠিত করিয়া শ্বশুরকুলের অবস্থানুরূপস্বভাবা করিয়া লইতে পারা যায়। তবেই চিরজীবন সুখস্বচ্ছন্দে গৃহকৃত্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া পুত্রবধূ গৃললক্ষ্মী বধূমাতা হইতে পারেন। অন্যথা সেই বধূ যদি ধনী লোকের আদরিণী কন্যা হয়, আর দাস দাসী দ্বারা সেবিতা হইয়া থাকে, গার্হস্থ্য কর্ম্ম দাস দাসীর কর্ম্ম বলিয়া মনে ধারণা করে, রন্ধন পাচক ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া সংস্কার জন্মায়, কেবল "কার্পেট বোনা", উপন্যাস পাঠ, গাত্রমার্জ্জন, কেশ প্রসাধন, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার ধারণ, দিনের মধ্যে তিনবার পরিধেয় বস্ত্র ও কঞ্চুলিকা পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বধূর অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্থির করে, তবে সেই বয়োধিকা যুবতী কন্যা বৌমা না হইয়া, জেঠাই মা রূপে মধ্যবিত্ত আর্য্যচরিত্রে গঠিত শ্বশুরালয়ে আসিয়া সত্য সত্যই মৃন্ময়ী লক্ষ্মীপ্রতিমার মতই কেবল গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিবে। সেই বধূর দ্বারা স্বামীর যে কিরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আনুকূল্য হইবে, তাহা মনীষিমাত্রেরই বিবেচ্য। পরন্তু চিরজীবন দুঃখ অশান্তিতেই যাইবে, দাম্পত্যপ্রণয় ত সুদূর পরাহত! এজন্যই বালিকা বিবাহ যুক্তিযুক্ত।

এখন অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে সকল অনার্য্য জাতি রজস্বলা সম্বন্ধে এত বাদ বিচার করে না, তাহাদিগকেও ত স্বস্থ দীর্ঘজীবী দেখা যায়। কথা সত্য। কিন্তু ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, কাহার শরীর কি জাতীয় উপাদানে গঠিত? যাহাদের আহার রজোগুণ তমোগুণ বর্দ্ধক, যাহারা পিতৃপিতামহাদি অসংখ্যপুরুষক্রমে অমেধ্য লশুন, পলাণ্ডু, কুক্কুটমাংস ও গোমাংসাদি আর্য্যবিগর্হিত বস্তু ভোজন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের শরীরে তমোগুণের উত্তেজক অপবিত্র সংসর্গ বরং হিতকরই হইবে,—অহিতকর হইতে পারে না। পরন্তু রজস্তমোগুণপ্রধান শরীরে সাত্ত্বিক সংসর্গ বা সাত্ত্বিক আহারই অপকারের কারণ হয়। যেমন "ঘৃত" বস্তুটী পরম পবিত্র ও আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ বটে। কিন্তু ঐ ঘৃত যদি নিয়মিতরূপে একটী কুক্কুরে খায়, তবে ষণ্মাসের মধ্যেই সেই কুক্কুরটী রোমস্খলিত অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর দুরিত পূতি দুর্গন্ধ মলমূত্রাদি ভোজনে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে। কেননা, কুক্কুরের শরীর পুরুষানুক্রমে ঐ জাতীয় উপাদানেই গঠিত। শুনিয়াছি, মগজাতি ঘৃত স্পর্শ করিলে হস্ত প্রক্ষালন করে, আর গলিত মৎস্য অতি উপাদেয়রূপে ভক্ষণ করে। ইহা বিচিত্র নহে। অতএব অনার্য্য সম্বন্ধে উক্ত প্রশ্নই উত্থিত হইতে পারে না। অথবা আর্য্যশাস্ত্র অনার্য্য ব্যবহারের জন্য দায়ী নহে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অনার্য্য শাস্ত্রেও এ সম্বন্ধে কোন না কোন বিধান থাকিতে পারে, তাহা এস্থানে অনালোচ্য।

ফলকথা, আর্য্য ঋষিরা মানবের হিতার্থ এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা অনার্য্যেরা শুনিলে বিস্ময়বিমূঢ় হইবে। আর্য্যশাস্ত্রে পতি পত্নীর একাঙ্গীভূত সম্বন্ধ। পতির দেহার্দ্ধভাগিনী পত্নী,—পত্নীর দেহার্দ্ধভাগী পতি। দুই দেহের একতা ভাব মন্ত্রশক্তিতে নিষ্পন্ন হয়। তাই বিবাহের মন্ত্রে কথিত আছে, * 'যে তোমার প্রাণ সেই আমার প্রাণ, যে তোমার হৃদয়, সেই আমার হৃদয়।'

আর্য্যশাস্ত্রে কথিত আছে, বর নিজ গোত্রের ও নিজ প্রবরের মাতামহ গোত্রের (১) কন্যা বিবাহ করিবে না। যদি করে, তবে সেই কন্যার

ঋতুস্নাতা তু যা নারী স্বপ্নে মৈথুনমাচরেৎ।
আর্ত্তবং বায়ুরাদায় কুক্ষৌ গর্ভং করোতি হি॥
মাসিমাসি বিবর্দ্ধেত গর্ভিণ্যা গর্ভলক্ষণং।
কললং জায়তে তস্যা বর্জ্জিতং পৈত্রিকৈর্গুণৈঃ॥
সর্পবৃশ্চিককুষ্মাণ্ডবিকৃতাকৃতয়শ্চয়ে।
গর্ভাস্ত্বেতে স্ত্রিয়াশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ পাপকৃত্তা ভৃশং॥"

* "যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥" ইত্যাদি।

(১) "সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণাদেব হীয়তে॥
"অসগোত্রা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"
"সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ॥"

গর্ব্ভে উৎপন্ন পুত্র চণ্ডালের ন্যায় নৃশংস দুষ্টপ্রকৃতি হইবে। কেননা স্বগোত্রের ও স্বপ্রবরের রক্ত-সংস্রবে বিরুদ্ধ গুণ সম্পন্ন পুত্র জন্মে,—ইহা বস্তুর স্বভাব। যেমন হরিদ্রা ও চুণ মিলিত হইলে, রক্তিমার উৎপত্তি হওয়া বস্তুর স্বভাব,—ইহাও তদ্রূপ। এবং বিবাহকর্ত্তাও ব্রাহ্মণ্য সত্ত্বগুণ হারাইয়া পশুপ্রকৃতি হইবে।

এমন কি বিবাহসম্বন্ধে নিজ অপেক্ষায় পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতামহপক্ষে পঞ্চম, পিতৃবন্ধু—পিতার পিসতুত ভাই, মাতৃবন্ধু—মাতার মাসতুত ভাই, এবং আত্মবন্ধু,—নিজের পিস্‌তুত ভাই, মাস্‌তুত ভাই প্রভৃতি পুরুষ বর্জ্জনীয়। উহাদের কন্যা বিবাহ করা অতি নিষিদ্ধ। পৈঠীনসী ঋষি অন্ততঃ পক্ষে ত্রিগোত্রব্যবহিতা কন্যার পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এজন্যই সমাজে এখনও বিবাহ বিষয়ে "সম্বন্ধ" শব্দের প্রয়োগ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সম্বন্ধ—অর্থে সংসর্গ, যথা—'এই কন্যার সহিত ঐ বরের "সম্বন্ধ" হইতে পারে, অথবা পারে না, ইত্যাদি।

এত সূক্ষ্ম বিচার, কিন্তু দ্বিজাতির পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট। তমঃপ্রকৃতি—শূদ্রবর্ণের পক্ষে নহে। শূদ্র সমান গোত্রের কন্যাও বিবাহ করিতে পারিবে, তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহাদেরও পিতৃপক্ষের সপ্তম ও মাতৃপক্ষের পঞ্চম পুরুষ ও উপরোক্ত বন্ধু বর্জ্জনীয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

"পিতুঃ পিতুঃস্বসুঃ পুত্রাঃ পিতুর্ম্মাতুঃস্বসুঃ সুতাঃ।
পিতুর্ম্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পিতৃবান্ধবাঃ॥"
মাতুর্ম্মাতুঃস্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুর্ম্মাতুঃস্বসুঃ সুতাঃ।
মাতুর্ম্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ॥
আত্মতাতস্বসুঃ পুত্রা আত্মমাতুঃস্বসুঃ সুতাঃ—।
আত্মমাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া আত্মবান্ধবাঃ—॥"

(উদাহতত্ত্ব)

কোজাগরি পূর্ণিমায়।*

(১)

আশ্বিনের পৌর্ণমাসী কৌমুদী রজনী,
নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র শোভে সমুজ্জ্বল,—
তারকাতরঙ্গে বহে ব্যোম-মন্দাকিনী,
সুমন্দহিল্লোলে ভাসে ফুল্ল শতদল।—

(২)

মকরন্দ পানে মত্ত মধুপনিকর,
লগ্ন কমলের দলে—কলঙ্কের ছলে—
উজ্জ্বল কিরণে দীপ্ত সুনীল অম্বর,
মরতে ক্ষীরোদ সিন্ধু আনন্দে উছলে।

(৩)

দুগ্ধাবর্ত্তে বহিতেছে তারাতরঙ্গিনী,—
নীলজলে ভাসে কত পারিজাত ফুল,
মর্ত্ত্যে কত বাপীনীরে ফুটে কুমুদিনী,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিছে মৃদুল।

---

* "আশ্বিনে পৌর্ণমাস্যান্তু চরেজ্জাগরণং নিশি।
কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কার্য্যা লোক বিভূতয়ে॥
কৌমুদ্যাং পূজয়েল্লক্ষ্মীমিন্দ্রমৈরাবতং স্থিরং।
সুগন্ধির্নিশি সদ্বেশশ্চাক্ষৈর্জ্জাগরণং চরেৎ॥
নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জাগর্ত্তীতিভাষিণী।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়াং করোতি যঃ॥
নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ পিতৄন্ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
বন্ধূংশ্চ প্রীণয়েত্তেন স্বয়ং তদশনোভবেৎ॥
নারিকেলোদকং পীত্বা অক্ষৈর্জ্জাগরণং নিশি।
তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি কো জাগর্ত্তি মহীতলে॥"

তিথিতত্ত্ব।

(৪)
পঙ্কজ-লক্ষণা ঋতু শরৎসুন্দরী
অতুল বিভূতি ল'য়ে বিমোহন সাজে ;
সৌন্দর্য্যসমুদ্রে কত শোভার লহরী ,
অম্বুজকম্বুর ধ্বনি চারিদিকে বাজে।

(৫)
চারুচন্দ্রিকায় দীপ্ত অঙ্গ বসুধার
খুলিয়া গিয়াছে উৎস যেন বা সুধার,
যেন আজি রত্নরাজি যত অলকার,—
ভাঙ্গিয়াছে অমরার শোভার ভাণ্ডার !

(৬)
গগনে পূর্ণেন্দু, সিন্ধু ক্ষীরোদ উথলে,
দেখি' ইন্দুসহোদরা ইন্দিরা সুন্দরী—
পদ্মালয়া পদ্মাসনা সুবর্ণকমলে,
রত্নঝাঁপি কক্ষে ল'য়ে সৌভাগ্য ঈশ্বরী—

(৭)
নিশীথে বরদা লক্ষ্মী মধুরভাষিণী
ইন্দুবিনিন্দিতবর্ণা ইন্দিরা সুন্দরী—
কহিলেন উচ্চকণ্ঠে শৌর্য্য বিলাসিনী,—
"কে জাগে জগতে আজি কৌমুদীশর্ব্বরী।"

(৮)
"নারিকেল চিপিটক করিয়া অর্পণ,
পূজে দেব পিতৃগণে ভক্তিভরে আজি ?
অক্ষক্রীড়া করি', রাত্রি করে জাগরণ ?"
প্রদান করিব তারে বিত্ত রত্নরাজি।"

(৯)
বিভূতির তরে সেই ভূত-পূর্ণিমায়,
পূজে ঐরাবতে ইন্দ্র--ইন্দিরা সুন্দরী—

নানারত্ন অলঙ্কারে উজ্জ্বল প্রভায় ;
কিন্তু জাগিল না কেহ কৌমুদীশর্ব্বরী !

(১০)
"পাশাক্ষ মালিকাম্ভোজ" আদি বন্দনায়
পূজে বঙ্গবাসী,—লক্ষ্মী কমলবাসিনী—
"রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরা",—ধ্যান ধারণায়
পূজে,—শ্রী কমলালয়া সৌন্দর্য্যদায়িনী।

(১১)
অলস বিলাসমত্ত বঙ্গবাসিজন
অনুনাসিকের সুরে গীতিকবিতায়
গাহিছে সঙ্গীত কত রমণীরঞ্জন !
(মধু বিনা শঙ্খনাদে কে আর মাতায়।)

(১২)
মণিরত্নস্বর্ণপূর্ণ ঝাঁপি কক্ষে ল'য়ে
কহিলেন পদ্মালয়া মধুরভাষিণী :—
"বিত্ত তারে দিব আজি সুপ্রসন্ন হ'য়ে,
জগতে জাগিয়া যারা কৌমুদী যামিনী।"

(১৩)
"কোজাগর-পূর্ণিমায় কে আছে জাগিয়া,"—
—ছুটিল সে প্রতিধ্বনি দিগ্‌দিগন্তরে,
মোহাচ্ছন্ন বঙ্গবাসী অদৃষ্ট লাগিয়া—
নিদ্রা গেল মহাসুখে গৃহ অভ্যন্তরে !—

(১৪)
শুনিল না বরদার "কোজাগর্ত্তি" বাণী,
বুঝিল না কিবা তত্ত্ব লক্ষ্মীর পূজায়,
ভাবিল, কমলা—শুধু সৌন্দর্য্যের রাণী—
ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী—ধ্যান ধারণায় !

(১৫)
"কোজাগর্ত্তি মহীতলে"—প্রতিধ্বনি তার
উঠিল অম্বর পথে;—জাগিল বারুণী !—
মণিরত্নবিমণ্ডিত অনন্ত ভাণ্ডার
ঐন্দ্রীর হইল শূন্য—সিন্ধুর নন্দিনী :—

(১৬)
বঙ্গধামে শূন্য তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার !
জঠর জ্বালায় আজি কাঁদে বঙ্গবাসী !
চারিদিকে উঠিয়াছে মহা হাহাকার !
দ্বারে দ্বারে ফিরে ঘোর দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী।

(১৭)
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস যাহাদের বাণী—
যাহারা কল্পনা বলে, সমুদ্র মন্থন
করিয়া তুলিল সুধা—সৌভাগ্যের রাণী,—
তারা সিন্ধুযাত্রা ল'য়ে করে আন্দোলন !

(১৮)
অনুরাগে নাহি জাগে কৌমুদীরজনী—
আর্য্যের উজ্জ্বল চক্ষুঃ জ্ঞানাঞ্জনহীন,
সিন্ধুবক্ষে নাহি যায় বাণিজ্যতরণী,
তাই ভারতের ভাগ্যে এ হেন দুর্দ্দিন !

(১৯)
শস্যশ্যামা বঙ্গভূমি মরুভূমি আজি—
মোহাচ্ছন্ন বঙ্গবাসী ভুলেছে পদ্ধতি,
তাই সে ভাণ্ডারে নাহি মণিরত্নরাজি,—
চঞ্চলা কমলা—একি বিধির নিয়তি !

(২০)
আশ্রয়ের দোষে লক্ষ্মী সতত চঞ্চলা,
অনুরাগে জাগে যারা কৌমুদী রজনী,

তাদের আলয়ে সদা ধনদা অচলা—
সাগরে সাগরে শত বাণিজ্যতরণী।—

(২১)
পদসেবা বাঙ্গালীর সৌভাগ্য সম্বল,
কেমনে করিবে তারা লক্ষ্মীর অর্চ্চনা ?
হস্তপদে বদ্ধ দৃঢ় লৌহের শৃঙ্খল—
ভাঙ্গিতে পারে না তাই দুঃসহ যাতনা।

(২২)
ইন্দীবরনেত্রা ফুল্ল অরবিন্দাননা—
কহিলেন পুনঃ পুনঃ মধুরভাষিণী—
কক্ষে রত্নঝাঁপি ল'য়ে, ফুল্লপদ্মাসনা—
"কে জাগে জগতে আজি কৌমুদী রজনী ?"

(২৩)
বঙ্গবাসী পান করি' নারিকেল জল,
অক্ষক্রীড়া করি' সুখে যাপিল যামিনী—
নিশ্চেষ্ট জড়ের মত রহিল নিশ্চল—
শুনিল না কমলার সঞ্জীবনী বাণী।

(২৪)
জগতে জাগিয়াছিল যেই নরগণ—
নিশীথে শুনিয়া সেই সঞ্জীবনী বাণী,
জাগিল উল্লাসে হ'য়ে আনন্দে মগন ;—
তাদের দিলেন বর,—সৌভাগ্যের রাণী—

(২৫)
অম্বুধি-নন্দিনী ফুল্ল অম্বুজবাসিনী,—
নিন্দি' ইন্দীবর নীল উজ্জ্বলনয়না—
ইন্দুকান্তিবিনিন্দিতা সৌভাগ্যদায়িনী,—
কর তাঁর পুনর্ব্বার আনন্দে বন্দনা।

(২৬)

কোজাগর-পূর্ণিমায় বঙ্গবাসিগণ—
ইন্দিরার পাদপদ্মে দেও পুষ্পাঞ্জলি,
কৌমুদীরজনী আজি কর জাগরণ—
হ'য়োনা বিপথগামী আর্য্যপথ ভুলি'।

(২৭)

কোজাগর রজনীতে জড়ের মতন,
ঘুমা'ওনা বঙ্গবাসী হ'য়ে অচেতন,
মোহনিদ্রা ত্যাগ করি' জাগ একবার,
ফিরিলে ফিরিতে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!

(২৮)

ভজনা করেন লক্ষ্মী গুণবিলাসিনী—
উদ্যোগী পুরুষবরে, আপনি আসিয়া,
ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী পঙ্কজবাসিনী।—
(কালস্রোতে তৃণ সম যে'য়োনা ভাসিয়া।)

(২৯)

ভাগ্যে যাহা থাকে থাক, ঘটিবে আপনি,
কর কর্ম্ম,—মনুষ্যের কর্ম্মে অধিকার,—
ত্যজিওনা মুগ্ধ হ'য়ে প্রাচীন সরণি,
কে বলিল, ফিরিবে না লক্ষ্মীর ভাণ্ডার?

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কার্য্য-বিবরণ।

তৃতীয় বর্ষ

(১৩০৯ সালের)

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

১। বিগত ১লা আষাঢ় (১৯০২।১৫ই জুন) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়, ১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থিত ভবনে সভার কার্য্যালয়ে সাহিত্যসভার ১৩০৯ সালের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন :—

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ বার্, এট্, ল।
২। ,, রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর এম,বি।
৩। ,, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।
৪। ,, মনোমোহন বসু।
৫। ,, অমৃতলাল মিত্র।
৬। ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ।
৭। ,, কবিরাজ অঘোর নাথ শাস্ত্রী।
৮। ,, আশুতোষ দেব এম, এ।
৯। ,, অমৃতলাল সরকার।
১০। ,, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
১১। ,, বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য আধ্যাত্মিক।
১২। ,, স্বরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর।
১৩। ,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
১৪। ,, পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।
১৫। ,, দ্বারকনাথ কাব্যতীর্থ।
১৬। ,, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম,এ,বিএল
১৭। ,, মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ।
১৮। ,, মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বিএল।
১৯। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ।
২০। ,, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম,এ।
২১। ,, নন্দলাল ঘোষ।
২২। ,, বিশ্বম্ভর মিত্র।
২৩। ,, সুরেশচন্দ্র দে।
২৪। ,, বঙ্কিম বিহারী মিত্র বি, এ।
২৫। ,, কুঞ্জ বিহারী বসু বি, এ।
২৬। ,, শিবকৃষ্ণ দত্ত।
২৭। ,, মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্য।
২৮। ,, নবনীক্রান্ত সেন।
২৯। ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
৩০। ,, শ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
৩১। ,, অমূল্যধন বন্দোপাধ্যায়।
৩২। ,, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়।
৩৩। ,, ডাঃ বিপিন বিহারী ঘোষ এম,বি।
৩৪। ,, রামদয়াল ভট্টাচার্য্য।
৩৫। ,, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৩৬। ,, পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ।

(সম্পাদক)

২। শ্রীল শ্রীযুক্ত ময়ূরভঞ্জের মহারাজ বাহাদুর সাহিত্যসভার অন্যতম সভ্য ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সভার অন্যতম অতিরিক্ত সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন, এই মর্ম্মে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের অধিবেশনে, যে দুইটী প্রস্তাব হইয়াছিল, সভাপতি মহাশয়কর্তৃক তাহা সভায় পঠিত ও উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইল।

৩। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

৪। পরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় "ন্যায়-দর্শনের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, আধ্যাত্মিক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু সমালোচনা করিলেন ও প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৬। পরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম,এ, মহাশয় বলিলেন শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু প্রবন্ধে নানা কথার আলোচনা করিয়াছেন, অদ্যকার সভায় তৎসমুদায়ের সমালোচনা অসম্ভব। যে সকল বিষয়ে সতীশ বাবুর সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই, তিনি কেবল সেই বিষয়গুলিরই উল্লেখ করিবেন ঃ—

(ক)। সতীশবাবুর মতে গোতম খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর লোক,—একথা বড়ই অসমীচীন। মনুসংহিতাতেও হেতুশাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। এক্ষণে যদি গোতমকে ঐ হেতু বা ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে, তিনি যে অতি প্রাচীনকালের লোক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কৃত "কাল-নির্ণয়" একেবারেই বিশ্বাস্য নহে।

(খ)। সতীশবাবুর মতে "ন্যায়দর্শন" কেবল যুক্তির উপর সংস্থাপিত,—একথাও প্রকৃত নহে। অন্যান্য আস্তিক হিন্দুদর্শনের ন্যায় ন্যায়-দর্শন যুক্তি ও আগম, এই উভয়ের উপর সংস্থাপিত।

(গ)। সতীশ বাবুর প্রবন্ধে, নব্য ও প্রাচীন ন্যায়ের যে ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। ন্যায়-দর্শন কেবল প্রমাণ পদার্থের বিচার লইয়াই ব্যস্ত, উহাতে তত্ত্ব-বিষয়ে আলোচনা নাই, একথা একেবারেই প্রমাণসহ নহে। নব্যন্যায়েও ঈশ্বর-তত্ত্বের বিশিষ্ট সমালোচনা

আছে। আচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি ও গঙ্গেশের ঈশ্বরানুমান চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

(ঘ)। দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থকার নব্য-ন্যায়ের প্রবর্ত্তক, ও গঙ্গেশ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন,—একথা একেবারেই বিচারসহ নহে। ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু ও গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের তুলনা করিলে, উহাদের মধ্যে প্রতিপাদ্যগত ও প্রণালীগত মহান্ ভেদ পরিলক্ষিত হয়। তত্ত্বচিন্তামণির তুলনায় ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু অতি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়।

(ঙ)। হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শনের সংঘর্ষ উভয় দর্শনের অবনতির কারণ নহে।—প্রত্যুতঃ ঐরূপ সংঘর্ষ হইতে উভয় দর্শনেরই প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক উপপ্লব, দুরূহতা ও মৈথিলদিগের ঈর্ষা প্রভৃতি নানা কারণে ন্যায় দর্শনের অবনতি হইয়াছে।

(চ)। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাৎস্যায়ন ও দিঙ্‌নাগের যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যুক্তি ও প্রমাণসহ বলিয়া বোধ হয় না।

(ছ)। গঙ্গেশোপাধ্যায়কে মূলকার বলিয়া স্বীকার করিলে, কাণভট্ট শিরোমণিকেও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়—প্রবন্ধকার কিন্তু তাহা করেন নাই—শিরোমণির মৌলিক গবেষণা উপেক্ষণীয় বস্তু নহে।

(জ)। উদ্যোতকর কোন স্থলেই দিঙ্‌নাগের নাম উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ন্যায়বার্ত্তিক প্রধানতঃ দিঙ্‌নাগের বিরুদ্ধে লিখিত, একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। উহা বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অনাস্তিক দর্শন মাত্রেরই বিরুদ্ধে লিখিত একথা বলাই অধিকতর অসঙ্গত।

(ঝ)। চৈতন্যদেব বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শিষ্য একথার কোন প্রমাণ নাই। এ সকল মতভেদ সত্ত্বেও, প্রবন্ধে গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। তজ্জন্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

৭। অতঃপর বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের সমালোচনার প্রত্যুত্তর উপলক্ষে, গৌতমের অর্ব্বাচীনতা, মনুর আবির্ভাব কাল, গঙ্গেশের গ্রন্থের সহিত বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের প্রণালীগত ঐক্য, দিঙ্‌নাগের কাল নির্ণয়, উদ্যোতকরাচার্য্যের গ্রন্থে কুতার্কিকদিগের প্রতি কটাক্ষ ও তৎসম্বন্ধে

বাচস্পতিমিশ্রের মত, পালি গ্রন্থোক্ত হৈতুকসম্প্রদায় প্রভৃতি নানাকথার অবতারণা করিলেন।

৮। উহার পর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, তিনি বৈষ্ণবদিগের কৃত কোন গ্রন্থেই চৈতন্যদেব যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন,একথার উল্লেখ দেখিতে পান নাই। তাঁহার মতে বরং সার্ব্বভৌম মহাশয়ই শেষ জীবনে চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

৯। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধে গবেষণার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। তজ্জন্য তিনি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদার্হ। তবে অনেক বিষয়ে প্রবন্ধোক্ত মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই। নব্য ও প্রাচীন ন্যায়ের প্রতিপাদ্যগত কোন ভেদ নাই। বিশেষ দুইটী কেবল কাল ভেদের সূচক। এক গোতমোক্ত মূল অবলম্বনেই গঙ্গেশ প্রভৃতি সকলেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থেও প্রাচীন ন্যায়োক্ত মনস্তত্ত্ব মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত ভাবে বিচার আছে। ঋষিদিগের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সমালোচনা অনাবশ্যক ও নিষ্ফল। ঋষিকৃত গ্রন্থের অনাদিত্ব শিষ্টসম্মত ও স্থলবিশেষে তাঁহাদিগের কৃত গ্রন্থের অর্ব্বাচীনতা ও কল্প ভেদানুসারে সমাধেয়। গঙ্গেশকে মূলকার বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ তিনিও স্বকৃত গ্রন্থে লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্য আকর প্রভৃতি শত শত প্রাচীনতর মূলগ্রন্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কেবল স্বগ্রন্থে প্রাচীনদিগের সংক্ষেপোক্তি বিস্তৃতভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। গঙ্গেশের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, গোতম প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থকারই তাঁহার আদর্শ, বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ নহে। শিরোমণি মূলকার না হইলেও তাঁহার মৌলিকতা গঙ্গেশ অপেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ হয়। অতঃপর বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধন্যবাদ করিয়া তিনি আসন পরিগ্রহ করিলেন।

১০। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক।	শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, সভাপতি।

৪ঠা শ্রাবণ রবিবার।
১৯০২।২০শে জুলাই অপরাহ্ন (৫.০) সাড়ে পাঁচ ঘটিকা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

[তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

সাহিত্য-সংহিতা।

(‘সাহিত্য-সভার’ মাসিক পত্রিকা)।

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস।

কলিকাতা
১০৬।১ নং, গ্রে ষ্ট্রীট, “সাহিত্য-সভা” হইতে প্রকাশিত।
১১ নং, সিমলা ষ্ট্রীট, “হরিশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্” হইতে
শ্রীগোষ্ঠবিহারি সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

☞ “সাহিত্য-সভার” সভ্যেরা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৶০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনরচিত দানসাগর গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহিত সাহিত্য-সংহিতায় মুদ্রিত হইতেছে। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রিমমূল্য প্রেরণ করিয়া সংহিতার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

২। ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলীসহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সটীক ও সানুবাদ মুদ্রিত হইতেছে। অর্দ্ধাংশে অধিক মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুগণ নাম ধাম পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৩। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ দেয় অগ্রিমমূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৪। সভার সভ্যগণ ও সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ টাকাকড়ি, প্রবন্ধ পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ।
সাহিত্য-সভার কর্ম্মচারী।
১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক
১। বাণভট্টের জীবন-চরিত।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।	
২। দার্শনিক মতের সমালোচনা।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।	
৩। ঈশ্বর-তত্ত্ব।	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব, এম, এ, এফ্, টি, এস্।	
৪। হিন্দু-বৈবাহিক বিজ্ঞান।	শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	
৫। জীবের স্বাধীনতা বা অদৃষ্টবাদ।	শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।	
৬। আত্মমেধ। (কবিতা)	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ।	
৭। দানসাগর।	শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	

☞ অগ্রহায়ণের সাহিত্য-সংহিতা যন্ত্রস্থ। এই সংখ্যা হইতে নিয়মিতরূপে গ্রন্থাদির সমালোচনা হইবে।

☞ প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

সাহিত্য-সংহিতা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, কার্ত্তিক। [সপ্তম সংখ্যা।

বাণভট্টের জীবন-চরিত।*

সংস্কৃত ভাষায় গদ্য অপেক্ষা পদ্যের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইলেও গদ্য সাহিত্যের একান্ত বা অত্যন্ত অসদ্ভাব নাই। কাব্য-মধ্যেও অনেক গদ্যরচনা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে সকল প্রাচীন কবি সংস্কৃত-ভাষায় গদ্য-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মহাকবি বাণভট্টই অগ্রগণ্য। এই কবির ন্যায় ললিত পদবিন্যাস ও সুমধুর বর্ণযোজনা করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। তাঁহার রচিত কাব্যের অনেকস্থলে বিশেষণ-প্রয়োগের এরূপ নৈপুণ্য ও বাক্যরচনার কৌশল বিদ্যমান আছে যে, উহা পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অল্পকথায় বলিতে হইলে, বাণভট্টের লেখা সংস্কৃত গদ্যরচনার আদর্শ। কত চিন্তা ও কতদূর বিদ্যাবত্তার ফলে, তিনি ঐরূপ পদবিন্যাস, উপমা ও অলঙ্কার-প্রয়োগে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

এই কবির কাব্য যে প্রকার কৌতুকাবহ, জীবন-বৃত্তান্তও তদপেক্ষা অল্প কৌতূহলোদ্দীপক নহে। সুখের বিষয়, ভারতীয় অন্যান্য প্রাচীন কবির জীবন বৃত্তান্তের ন্যায়, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্পূর্ণ তিমিরাচ্ছন্ন নহে। যদিও তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনা সুস্পষ্টরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাঁহার স্বীয় লেখনী-নিঃসৃত হর্ষচরিত ও কাদম্বরী হইতে, প্রৌঢ় বয়সে উপনীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁহার জীবনে কি কি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সাধারণ অংশ সঙ্কলন করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি যে নরপতির সভাসদ্ ছিলেন, তাঁহার বিজয়দুন্দুভি ভারতের প্রতিজনপদে

* এই প্রবন্ধটি ১৩০৯ সালের ৩০শে কার্ত্তিক তারিখে, সাহিত্যসভার ৫ম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

নিনাদিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই নরপতির আবির্ভাব-কাল নির্ণীত হওয়ায়, এই কবির জীবৎকাল নির্ণয়েরও অনেকটা সুবিধা ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষে স্থাণ্বীশ্বর অতি পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থের সন্নিহিত থানেশ্বরই প্রাচীনকালে স্থাণ্বীশ্বর নামে অভিহিত হইত। পূর্ব্বে উহার ন্যায় পবিত্র, উর্ব্বর ও শস্যশালী জনপদ অতি অল্পই ছিল। এই স্থাণ্বীশ্বরের অপর নাম শ্রীকণ্ঠ জনপদ। কথিত আছে, রাজা পুষ্পভূতি স্থাণ্বীশ্বর জনপদের অধীশ্বর ছিলেন। সেই সময়ে ভৈরবাচার্য্য নামক একজন দাক্ষিণাত্য তান্ত্রিক-ব্রাহ্মণ, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তান্ত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রণোদিত করেন। রাজা ঐ তান্ত্রিকের আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইলে, ভৈরবাচার্য্য বিদ্যাধরত্ব লাভের নিমিত্ত একদিন কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর মহানিশায় শ্মশানে তান্ত্রিকক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। রাজা তাঁহার উত্তরসাধক বা রক্ষক নিযুক্ত হন। সহসা সেই স্থানের ভূমি বিদীর্ণ করিয়া শ্রীকণ্ঠ নামে এক নাগ উত্থিত হয় এবং অর্চ্চনাভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার সহিত ভৈরবাচার্য্যের সংহারে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সময় রাজা সেই শ্রীকণ্ঠনাগের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এবং ঐ নাগ নরপতি কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া, ভৈরবাচার্য্যকে বিদ্যাধরত্ব প্রদান করে এবং রাজাকে বলে 'তোমার বংশে শ্রীহর্ষ নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি নিজ বাহুবলে সসাগরা পৃথিবী শাসন করিবেন ও চক্রবর্ত্তী উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইবেন'।

এই পুষ্পভূতির পুত্র রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন। তিনি অনুমান ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাণ্বীশ্বরের সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে হূনগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন স্বীয় বাহুবলে হূনবীরগণকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধু, গুর্জ্জর, লাট, গান্ধার, মালবপ্রভৃতি দেশ অধিকার করেন। তাঁহার মহিষীর নাম যশোবতী। যশোবতীর ন্যায় লাবণ্যবতী ধীরা ও মধুর-ভাষিণী রমণী অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যশীলা মহিষীর গর্ভে রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের রাজ্যবর্দ্ধন নামে প্রথম তনয় জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় তনয় ভারতের খ্যাতনামা চক্রবর্ত্তী রাজা হর্ষ। মহারাজ হর্ষ অতিশয় তেজস্বী, বিদ্বান্, কবি, গুণগ্রাহী ও ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া

জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। যে সময় হর্ষ ভূমিষ্ঠ হন, তখন ভোজক—ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত তারক নামক একজন জ্যোতিষী রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনকে বলিয়াছিলেন,—'পুরাকালে চক্রবর্ত্তী মান্ধাতা যেরূপ শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কুমারও সেইরূপ শুভসময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।' তাঁহার বাক্য যথার্থ হইয়াছিল। শ্রীহর্ষ সমগ্রভারত রাজ্যের সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমাদের উল্লিখ্যমান মহাকবি বাণভট্ট, এই শ্রীহর্ষের সভাসদ ছিলেন। তিনি রাজা হর্ষকে পুনঃ পুনঃ চক্রবর্ত্তী শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক হুয়েনসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে, উক্ত পরিব্রাজক যখন ভারতবর্ষে পর্য্যটন করেন, তখন মহারাজ হর্ষ ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম-পদে অধিরূঢ় ছিলেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে চীন-পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। অতএব বর্ত্তমান সময় হইতে অন্যূন ১২৫০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহর্ষ ভারতসাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড চরিচালন করিয়াছিলেন। হুয়েনসাঙ লিখিয়াছেন—মহারাজ হর্ষ বৈশ্যজাতীয় ছিলেন, কিন্তু প্রমাণান্তরের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। হর্ষের চরিত্র পাঠ করিলে অনুমিত হয়, তিনি প্রথম শৈব, তাহার পর বৈদান্তিক, তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রত্নাবলী নাটিকা, বেদান্ত পক্ষপাতের সাক্ষিণী। নাগানন্দ ও সমুদয় হর্ষচরিত, তাঁহার বৌদ্ধমতে আস্থার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। বাণভট্টের প্রভু মহারাজ হর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। এখন প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বাৎস্যায়ন গোত্রে কুবেরনামা এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চারি পুত্র। প্রথম অচ্যুত, দ্বিতীয় ঈশান, তৃতীয় হর, চতুর্থ কবি, পঞ্চম মহীদত্ত, ষষ্ঠ ধর্ম্ম, সপ্তম জাতবেদাঃ, অষ্টম চিত্রভানু, নবম ত্র্যক্ষ, দশম অহিদত্ত ও একাদশ বিশ্বরূপ। ইঁহারা সকলেই বিদ্বান্ এবং সোমযাজী ছিলেন। তন্মধ্যে অর্থপতির অষ্টম পুত্র চিত্রভানু সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজদেবী নাম্নী পত্নীর গর্ভে বাণ জন্মগ্রহণ করেন। বাণের শৈশবেই মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। সুতরাং পিতা চিত্রভানুই মাতৃস্থানীয় হইয়া অতিযত্নে তাঁহার পরিপালন করিয়াছিলেন। বাণের যথাবিধি উপনয়নাদি সংস্কার সম্পন্ন হইলে, তাঁহার পিতা দ্বিজজনোচিত যাবতীয় পুণ্যকর্ম্ম সমাপনান্তে

পার্থিব দেহ বিসর্জ্জন করেন। পিতার অন্তগমনে বাণ শোকে নিরন্তর দহ্যমানহৃদয় হইয়া অতিক্লেশে গৃহেই কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর শোক কথঞ্চিৎ উপশমিত হইলে, উপদেষ্টার অভাবে তিনি যৌবনারম্ভে স্বেচ্ছাচারী হইয়া নানাবিধ চপলতায় মনঃ-সংযোগ করিলেন। তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধুরাই এখন তাঁহার পরিচালক হইয়া উঠিলেন। এস্থলে তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গের পরিচয় প্রদান করা বোধ হয় তত অপ্রাসঙ্গিক নহে। প্রথম বন্ধুদ্বয়—তাঁহার পারশব* ভ্রাতা চন্দ্রসেন ও মাতৃসেন। অপর বন্ধু ঈশান—ইনি একজন ভাষাকবি। বাণ যুবা এবং বিলাসী হইলেও নিজে অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সুতরাং রুদ্র ও নারায়ণ নামে দুইটি বিদ্বান্ যুবা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিতেন। আর একজন সুহৃদ্ বায়ুবিকার,—ইনি প্রাকৃত-ভাষায় অসাধারণ কৃতি ছিলেন। ইহা ব্যতীত ভিষকৃপুত্র—মন্দারক, পুস্তকপাঠক—সুদৃষ্টি, লেখক—গোবিন্দ, চিত্রকর—বীরবর্ম্ম, মৃদঙ্গবাদক—জীমূত, গাথক—সোমিল ও গ্রহাদিত্য প্রভৃতি বাণের বন্ধুমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার বন্ধুসম্প্রদায়ে স্ত্রীজাতিরও সম্পূর্ণ অভাব ছিলনা। শিল্পকারিণী—কুরঙ্গিকা, নর্ত্তকী—হরিণিকা, গাত্র-সংবাহনকারিণী—কেরলিকা প্রভৃতিও উক্ত সম্প্রদায় অলঙ্কৃত করিয়াছিল। আর বংশীবাদক—মধুকর ও পারাবত, সংগীতশিক্ষক—দর্দ্দুরক, পাশক্রীড়ায় নিপুণ—আখণ্ডল, ধূর্ত্ত—ভীমক, বৌদ্ধভিক্ষু—বীরদেব, কথক—জয়সেন, শৈব—বক্রঘোণ, মন্ত্র-সাধক—করাল, ধাতুতত্ত্বজ্ঞ—বিহঙ্গম, ঐন্দ্রজালিক—চকোরাক্ষ প্রভৃতি আরও অনেক বন্ধু সর্ব্বদা বাণের সন্নিহিত থাকিতেন। অল্পকথায় বলিতে হইলে, বাণের বন্ধুসম্প্রদায় একটি কৌতুকাগার বা চিত্রশালিকাবিশেষ ছিলেন। ঐ সম্প্রদায়ে সকল কলায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই সমাগম হইয়াছিল।

এক সময় বাণ এইসকল ও অপর অনেক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া

* যখন অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীতে উৎপন্ন পুত্র পারশব নামে আখ্যাত হইত। বাণভট্টের জীবৎকালেও বোধ হয় অসবর্ণ বিবাহ প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল না। তজ্জন্যেই চিত্রভানুর শূদ্রাপত্নী গর্ভসম্ভূত পুত্রদ্বয় বাণের বন্ধু মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কৌতুহল-নিবন্ধন দেশান্তর দর্শনের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যদিও তাঁহার পিতৃ-পিতামহের উপার্জ্জিত ব্রাহ্মণজনোচিত বিভবের অভাব ছিলনা, তথাপি এইরূপ নবযৌবন সুলভ স্বেচ্ছাচারিতায় তিনি মহদ্ব্যক্তিদিগের সমক্ষে অত্যন্ত উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। বাণ যুবজনোচিত স্বেচ্ছাবিহারের নিমিত্ত প্রাচীন সমাজে উপহাসাস্পদ হইলেও, দেশ ভ্রমণকালে নিরন্তর বিদ্যাচর্চ্চায় বিরত ছিলেন না। তিনি প্রধান প্রধান রাজধানী, জ্ঞানালোক-সমুদ্ভাসিত মঠসমূহ, গুণবান্ ও বাগ্মীব্যক্তিদের সম্মিলনস্থল, পণ্ডিতমণ্ডলী-সমলঙ্কৃত স্বভাবগম্ভীর বিদ্বৎসমিতি প্রভৃতি বিবিধস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুনরায় স্বীয় বংশোচিত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বহুকাল বিদেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় স্বীয় জন্মভূমিতে সমাগত হইলেন। বহুকাল পরে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগত দেখিয়া, বাল্যবন্ধু ও জ্ঞাতিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সকলে মহাসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আগমন দিবস, যেন একটি মহা-উৎসবপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। বাণের বাসস্থলী পরমরমণীয় ছিল। উহার একাংশ ভস্মপুণ্ড্রকধারী শিখাবিশিষ্ট অধ্যায়ন-নিরত বটুগণের বেদধ্বনিতে মুখরিত, অপর দিক্ যাজ্ঞিকগণের পবিত্র হোমধূমে পরিব্যাপ্ত, কোন স্থান রাশীকৃত সমিধ্‌কাষ্ঠে সমাচ্ছাদিত, কোথায়ও তৃণভোজনে নিরত, হরিণশাবকদিগের দ্বারা আকীর্ণ, কোন স্থানে শিক্ষিত শুকশারিকাগণ অবিকল শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি দ্বারা উপস্থিত জনগণের চিত্তবিমোহনে সংসক্ত। এইরূপ আনন্দপূর্ণ ভবনে বাস করিয়া বাণের কিয়ৎকাল অতীত হইল। অনন্তর কিছুকাল পরেই নানাবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লইয়া সুখময় বসন্ত ঋতু সমাগত হইল। আবার উহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ গ্রীষ্ম সময়ের আবির্ভাব লক্ষিত হইল।

একদিন নিদাঘের মধ্যাহ্নে বাণ ভোজনান্তে স্বীয় গৃহে অবস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার পারশব ভ্রাতা পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রসেন সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "চতুঃসমুদ্রাধিপতি সকল-রাজচক্রচূড়ামণি রাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীহর্ষদেবের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব আপনার নিকট এক পদাতিক প্রেরণ করিয়াছেন। সে আপনার জন্য দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছে।" বাণ শ্রুতমাত্র তাহাকে আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। পদাতিক সমীপবর্ত্তী

হইয়া কৃষ্ণদেবের প্রেরিত একখানি পত্র প্রদান করিল। বাণ কৃষ্ণদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র পাঠ করিলেন। উহার মর্ম্ম এই—"কালাতিপাতে কার্য্যহানিঃ।" তাহার পর বাণ অন্যান্য পরিজনকে সেই স্থান হইতে যাইতে আদেশ করিয়া সেই পদাতিক মেখলককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কি আমার উপর কুপিত? সে বলিল, "অসহিষ্ণু লোকেরা নিরন্তর রাজার নিকট আপনার পুনঃ পুনঃ নিন্দা করায় রাজা বিশ্বাস না করিয়া কি করিবেন? আমরা সমুদয়ই জানি সুতরাং মহারাজকে জানাইয়াছি, প্রথম বয়সে সকলেই প্রায় চাপল্যের বশীভূত হয়। এ বিষয়ে শৈশবই অপরাধী। রাজা তাহা বুঝিয়াছেন! অতএব আপনি কালক্ষেপ না করিয়া রাজকুলে গমন করুন। মহারাজ আপনাকে সমাদর করিবেন না, কিন্তু তজ্জন্য সমীপ গমনে ভীত হইবেন না।"

এই সময় হইতেই বাণের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি মেখলককে বিদায় দিয়া শ্রীহর্ষের রাজধানীতে গমনের জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন। জ্যোতির্ব্বিদের দ্বারা শুভ সময় নির্ণয় করিয়া বন্ধুবান্ধব বয়োবৃদ্ধ পূজ্য ও মান্য ব্যক্তিদিগের যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। বাণ মাতৃহীন সুতরাং মাতার ন্যায় স্নেহবতী মালতী নাম্নী তদীয় পিতৃস্বসাই গমনকালের সমুদয় মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তিনি সকলের আশীর্ব্বচন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও উৎসাহিত হইয়া প্রীতিকূট নামক নিজ বাসগ্রাম হইতে যাত্রা করিলেন। এই প্রীতিকূট নামক গ্রাম কোথায়, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ। সম্ভবতঃ কাশীপ্রদেশের দক্ষিণাংশে শোণনদের পূর্ব্বতীরে এই প্রীতিকূট গ্রাম অবস্থিত ছিল। বাণ লিখিয়াছেন, "বিন্ধ্যস্য কর্পূরদ্রুমদ্রবপ্রবাহমিব * * * হিরণ্যবাহুনামানং মহানদং যং জনাঃ শোণ ইতি কথয়ন্তি"। বস্তুতঃ হিরণবাহু অথবা শোণ বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া পাটলিপুত্রের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আর তিনি স্বয়ংই লিখিয়াছেন, ইহারই তীরদেশে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যুষিত প্রীতিকূট গ্রাম বিদ্যমান। শোণের তীরদেশে রেবাপ্রদেশ, কাশীপ্রদেশ ও মগধপ্রদেশ অবস্থিত। রেবাপ্রদেশ কোনকালেই বিদ্যাব্রহ্মণ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলনা, এবং মগধে বিদ্যাচর্চ্চা বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু প্রায় দ্বাদশ

শত বৎসর পূর্ব্বে বাণের জীবৎকালে যাগযজ্ঞাদির তত প্রাচুর্য্য ছিল না। কারণ তখন মগধে বৌদ্ধসম্প্রদায় অত্যন্ত প্রবল। কাশীপ্রদেশে তখন বিদ্যাচর্চ্চা ছিল এবং বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠানেরও অভাব ছিল না। অতএব কাশীপ্রদেশে বাণের জন্মভূমি হওয়াই অধিক সম্ভব। আর তাঁহার বর্ণনাপাঠে জানা যায় তিনি বহু অরণ্যময় ভূভাগ অতিক্রম করিয়া স্থাণ্বীশ্বরের রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন। শোণনদের তীরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে রেবা প্রদেশই সমধিক অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত। অতএব বোধ হয় তিনি কাশী প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়া রেবা প্রদেশের মধ্যদিয়া কান্যকুব্জের রাজধানী স্থাণ্বীশ্বরে উপনীত হইয়াছিলেন। বাণ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দিবসের প্রথমভাগে নিরুদক পত্রহীনপাদপবহুল বিলম্বমানলতাজালসমাচ্ছাদিত চণ্ডিকাকানন অতিক্রম করিয়া মল্লকূট গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রাণসম ভ্রাতা জগৎপতির গৃহে বিশেষ অভ্যর্থিত হইয়া সুখে বাস করিলেন।

পরদিন ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া যষ্ঠিগৃহ গ্রামে নিশাযাপন করেন। তদনন্তর স্থাণ্বীশ্বরে উপস্থিত হইয়া রাজভবনের অনতিদূরে বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলেন। এবং স্নান ও ভোজন সমাপ্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মেখলকের সহিত দিবসের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে সম্রাটের সন্দর্শনার্থ সমাগত বহু নরপতির শিবির সন্নিবেশ সন্দর্শন করিতে করিতে রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নরপতির অসীম ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। কোন স্থানে পর্ব্বতাকার বিশালকায় গজবৃন্দে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন, কোথায়ও বেগবান্ তুরগসমূহ, কোন স্থানে বা বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য উষ্ট্র, একাংশে হংসশ্রেণী পরিশোভিত বিবিধ সরোবর, অপরাংশে বিকসিত কুসুমসংবলিত উদ্যানরাজি। দ্বারদেশে মহাবিক্রমশালী সশস্ত্র দ্বারপাল সকল সর্ব্বদা বিরাজমান। প্রবেশদ্বারে মহাজনতা। নানা দেশদেশান্তরের অসংখ্য ভাষাভাষী বহুবিধপরিচ্ছদধারী কত লোক রাজদর্শনের নিমিত্ত আসিতেছে ও যাইতেছে। কেহ প্রবেশ করিতেছে, কেহ নির্গত হইতেছে, কেহ কেহ দ্বারবান্‌দিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ভদ্র! অদ্য কি রাজদর্শন হইবে?" কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "অদ্য কি মহারাজ বাহির হইবেন?" কেহ কেহ দর্শনাশায় বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত দিন

অতিবাহিত করিতেছে। কত কত সামন্ত নরপতি মহারাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়া দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। আবার মহারাজের ভুজবলে বিজিত কত কত মহাপ্রতাপ-সম্পন্ন ভূপতি স্বীয় প্রার্থনা বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত দ্বারদেশের একান্তে উপবিষ্ট আছেন। কত কত জৈন-আর্হত-পাশুপত-পারাশরমতাবলম্বী ধর্ম্মোপদেষ্টা রাজদর্শনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। সর্ব্বদেশীয় এবং সমুদ্রোপকূলবাসী ম্লেচ্ছজাতীয় নরপতিগণের দূতসমূহ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার বাসনায় অপেক্ষা করিতেছেন।

বাণ দেখিলেন, সেই সাগরাম্বরা ধরার অধীশ্বর মহারাজ হর্ষের অসংখ্য জনাকীর্ণ রাজভবন যেন চতুর্থ ভুবনের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়া আছে। তাঁহার মনে হইল, 'কি আশ্চর্য্য! প্রজাস্রষ্টা বিধাতা এত প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন তথাপি তাঁহার উপাদানের অভাব হয় নাই, অথবা কালের অন্ত হয় নাই, কিংবা আয়ুর ক্ষয় হয় নাই। সঙ্গী মেখলক দ্বারপালদিগের নিকট বাণের পরিচয় জানাইয়া তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, রাজপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণে সমুজ্জ্বলকুণ্ডলবিশিষ্ট পারিযাত্র নামক একজন দৌবারিক বেত্রযষ্ঠি হস্তে বহির্গত হইয়া বাণকে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে বলিল, "আসুন, প্রবেশ করুন, মহারাজ অনুগ্রহ করিয়াছেন।" বাণ বলিলেন, 'ধন্য হইলাম, যেহেতু মহারাজের অনুকম্পা লাভ করিলাম।' এই বলিতে বলিতে তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গমনকালে দক্ষিণদিকে বৃহৎ মন্দুরা বা অশ্বশালা পরিলক্ষিত হইল। উহাতে আরট্ট, কাম্বোজ, সিন্ধু, পারসীক, শ্যাম ও তুরস্কপ্রভৃতি বহুদেশজাত অসংখ্য অশ্ব রহিয়াছে। আবার সেই বামদিকে দৃষ্টি নিপতিত হইল, অমনি বৃহৎ গজশালা তাঁহার নেত্রপথে উপস্থিত হইল। বাণ কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ এখানে কি করেন?" পরিযাত্র বলিল, "মহারাজের প্রিয়হস্তী দর্পশাত এখানে অবস্থান করে।" বাণ বলিলেন, ভদ্র! অনেক দিন হইতে দর্পশাতের কথা শুনিয়া আসিতেছি, যদি কোন দোষ না থাকে তবে আমাকে সেই গজরাজের নিকট লইয়া চল। তাহার দর্শনের জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে। পারিযাত্র বলিল, দোষ কি, চলুন, দেখিবেন। তাহার পর বাণ দূর হইতে বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে সচল হিমশৈলের

ন্যায় অবিরতমদস্রাবী সেই করীন্দ্রকে কিয়ৎক্ষণ অবলোকন করিলেন। তাহার পর পুনরায় রাজদর্শনের নিমিত্ত পরিযাত্রের সহিত অগ্রসর হইলেন। অনন্তর বাণ সহস্র সহস্র ভূপাল পরিব্যাপ্ত তিনটী কক্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ কক্ষে আস্থানমণ্ডপের পুরোভাগে মুক্তাময় শিলাপট্টে মহারাজ হর্ষকে উপবিষ্ট দেখিলেন। বাণ রাজাকে দেখিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনিই সেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর বিক্রমরাশি সুগৃহীতনামা চক্রবর্ত্তী শ্রীহর্ষ। তাহার পর নিকটে গিয়া স্বস্তি'উচ্চারণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু রাজা বাণের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট মালবরাজকে বলিলেন, ইনি একটী মহাভুজঙ্গ অর্থাৎ লম্পট। রাজার বাক্য শেষ হইলে, মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত রাজন্যবর্গ নীরব হইলেন। বাণ কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "মহারাজ! সমুদয় বৃত্তান্ত বিদিত না হইয়াই অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন। মানবজাতি স্বেচ্ছাচারী,—তাহাদের স্বভাব অদ্ভুত। মহদ্ব্যক্তিরা লোকের প্রবাদবাক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া যথার্থদর্শী হইবেন। আমাকে অন্যরূপ ভাবিবেন না। আমি বাৎস্যায়ন গোত্রে সোমপায়ী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যথাসময়ে আমার উপনয়নাদি সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। আমি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যথাশক্তি অন্যান্য শাস্ত্রও অভ্যাস করিয়াছি, দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছি,—আমার আবার ভুজঙ্গতা কি? অবশ্য আমার শৈশবকাল চাপল্যশূন্য ছিল না,—তাহা আমি অকপটচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি। কিন্তু এই ঘটনায় আমার চিত্ত সম্পূর্ণ অনুশোচনাযুক্ত হইয়াছে। সংপ্রতি স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় শান্তচিত্ত, মনুর ন্যায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরিপালয়িতা, সাক্ষাৎ দণ্ডধর মহারাজ অশেষ দ্বীপমালিনী সাগরাম্বরা ধরার শাসনকার্য্যে ব্যাপৃত। অতএব এসময়ে এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া মনে মনেও অবিনয়ের কল্পনা করিতে পারে? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ভৃঙ্গগণও মহারাজের প্রতাপে ভয়ে ভয়ে মধুপান করে। চক্রবাকও প্রিয়তমার অনুবৃত্তি করিতে লজ্জিত হয়। কপিরাও চপলতা করিতে গিয়া চকিত হইয়া উঠে। শ্বাপদেরাও ভয়ে ভয়ে মাংস ভোজন করে। আমি আর অধিক কি বলিব?

কালক্রমে মহারাজ স্বয়ংই সকল বিষয়ের তথ্য বিদিত হইতে পারিবেন।” এই বলিয়া নীরব হইলেন।

রাজা বলিলেন, ‘কি জানি, লোকমুখে ঐরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।’ এই বলিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। সম্ভাষণ, আসনদান অথবা প্রসন্নতা প্রদর্শন করিয়া কোনরূপ সম্মান দেখাইলেন না। কেবল স্নিগ্ধদৃষ্টি দ্বারা আন্তরিক সদ্ভাব প্রকাশ করিলেন মাত্র। তাহার পর ভগবান্ সবিতা অস্তগমনোন্মুখ হইলে, মহারাজ হর্ষ সমাগত রাজন্যবর্গকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাণও তথা হইতে নির্গত হইয়া স্বীয় বাসস্থানে উপনীত হইলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘মহারাজ হর্ষ অতীব মহানুভব, আমার অনেক বালচাপল্যসত্ত্বেও মহারাজ মনে মনে আমাকে স্নেহ করেন। যদি আমার প্রতি মহারাজের স্নেহ না থাকিত, তাহা হইলে আমাকে দেখা দিতেন না। আমি গুণবান্ হই, মহারাজ এইরূপ ইচ্ছা করেন। প্রভুরা বাক্যব্যয় ব্যতীত অনুরূপ ব্যবহারদ্বারাই মনুষ্য-দিগকে বিনয়শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমাকে ধিক্, আমি স্বীয় দোষ দর্শনে অন্ধ, অথচ এইরূপ উদারচরিত নরপতির সম্বন্ধে অন্যরূপ সম্ভাবনা করিতেছি। আমি সর্ব্বপ্রযত্নে সেইরূপ হইতে চেষ্টা করিব, যাহাতে মহারাজ কালক্রমে আমাকে অনুরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন জানিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হন।’ এইরূপ অবধারণ করিয়া, পরদিন তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বন্ধু-বান্ধবের গৃহে অব-স্থান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহারাজ হর্ষ বাণের উন্নত চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন। বাণও অবসরক্রমে কোন এক সময়ে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সম্মান, প্রণয়, বিশ্বাস, বন্ধুতা, ধন ও প্রভুত্বের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইলেন। অনন্তর কোন সময় শরৎ সমাগমে, বাণ রাজার অনুমতি লইয়া স্বজন ও বন্ধুগণের দর্শনের নিমিত্ত সেই শোণনদের তীরবর্ত্তী প্রীতিকূট গ্রামে আগমন করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, বাণ রাজার নিকট সাতিশয় সম্মান লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার আগমনে তাঁহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। বাণ গৃহে উপস্থিত হইয়া

যথাক্রমে গুরুজনদিগকে অভিবাদন করিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠেরা সত্বর আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিল। বয়োবৃদ্ধেরা সস্নেহে তাঁহার মস্তক চুম্বন করিতে লাগিলেন। বন্ধুরা আসিয়া সপ্রণয় আলিঙ্গনদ্বারা তাঁহার পরিতোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। বাণ তখন বহুসংখ্য বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। পরিজনেরা ব্যগ্রতাসহকারে তাঁহাকে আসন প্রদান করিল। তিনি প্রীতিপূর্ণ বাক্যে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এতদিন আপনারা সুখে ছিলেন ত? যজ্ঞক্রিয়া ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে? হুতাশন ত প্রীতিসহকারে যথাবিধি হব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন? বালকেরা ত যথাসময়ে অধ্যয়নে নিরত হইয়া থাকে? বেদাভ্যাস ত অবিচ্ছিন্ন আছে? পূর্ব্বের ন্যায় সকলেরইত যজ্ঞবিদ্যায় অভিনিবেশের অভাব হয় নাই? পরস্পর স্পর্দ্ধা ও আদরসহকারে ব্যাকরণবিদ্যা অনুশীলিত হইয়া থাকে ত? অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা মীমাংসা শাস্ত্রে সমধিক আদর ও অনুরাগ আছে ত? সেই পূর্ব্ববৎ সুধাবর্ষী কাব্যালাপ হইয়া থাকে ত?” গুরুজনেরা উত্তর করিলেন, ‘বৎস! মহারাজ হর্ষের পৃথিবী শাসনকালে আমাদের কোন কার্য্যেরই ব্যাঘাত হইতেছে না। বিদ্যাবিনোদন ও বৈতানবহ্নি আমাদের একমাত্র সহায় হইলেও আমরা অতীব সন্তোষসহকারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছি। বিশেষ তুমি যে সেই পৃথিবীর অধীশ্বর পরমেশ্বর শ্রীহর্ষের পার্শ্বে বেত্রাসনে অধিষ্ঠান কর, ইহাতে আমরা আরও অধিক পরিতুষ্ট এবং গৌরবান্বিত হইয়াছি। সকলেই যথাকালে যথাশক্তি যথা-বিভব বিপ্রজনোচিত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে। এইরূপ আলাপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। তাহার পর যথাবিধি স্নান মধ্যাহ্নকৃত্য ও ভোজনাদি সম্পন্ন হইলে, সকলেই আসিয়া বাণের নিকট সমবেত হইলেন। এই অবসরে তাঁহার পুরাতন বন্ধু পুস্তক-পাঠক—সুদৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (বোধ হয় বন্ধুদর্শনে আসিতেছেন বলিয়া) তৈল এবং আমলক দ্বারা মস্তকটি বেশ মসৃণ করিয়াছেন। তীর্থমৃত্তিকা ও গোরোচনা দ্বারা তাঁহার ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র বিরচিত হইয়াছে, শিখাগ্রন্থিতে দিব্যপুষ্প বিন্যস্ত, পুস্তক হস্তে আসিয়া তিনি মধুরস্বরে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়া পুরাণপাঠ আরম্ভ করিলেন।

সকলেই পুরাণ শ্রবণে অভিনিবিষ্ট, এমন সময়ে বৈদভ্যাসপ্রযুক্ত পবিত্রমূর্ত্তি বাণের চারিটী পিতৃব্য পুত্র সেখানে উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শ্যামল অত্যন্ত প্রিয়দর্শন, এবং বাণের অত্যন্ত স্নেহ-ভাজন। সে অতি বিনয় ও আদরের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়! পুরূরবা ব্রাহ্মণের ধনতৃষ্ণায় আয়ু বিযুক্ত হইয়াছিলেন। নহুষ পরকলত্রে অভিলাষ করিয়া মহাভুজঙ্গ হন। যযাতি বিপ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পতিত হন। সুদ্যুম্ন স্ত্রীময় হইয়াছিলেন। সোমকের প্রাণিবধে নিষ্ঠুরতা সুপ্রসিদ্ধ। মান্ধাতা সমরব্যসনে পুত্র পৌত্রের সহিত রসাতলগমনে বাধ্য হন। পুরুকুৎস মেথলকন্যাতে কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। কুবলয়াশ্ব নাগলোকে গমন করিয়াও অশ্বতর কন্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পৃথু পৃথিবীকে পরিভূত করিয়াছিলেন। নৃগ কৃকলাস হইয়াছিলেন। সৌদাস পৃথিবীকে পর্য্যাকুল করিয়াছিলেন। নল পাশক্রীড়ায় সমাসক্ত হইয়া কলি কর্ত্তৃক পরিভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংবরণ বন্ধু কন্যাতেও বিকৃতচিত্ত হইয়াছিলেন। দশরথ স্ত্রৈণতা নিবন্ধন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। কার্ত্তবীর্য্য গোব্রাহ্মণের অতি পীড়ন হেতু নিধন প্রাপ্ত হন। মরুত্ত বহু ধন ও সুবর্ণ দ্বারা যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেও দেবদ্বিজকর্ত্তৃক সমাদৃত হইতে পারেন নাই। শান্তনু বাহিনীবিযুক্ত হইয়া একাকী বিজনে বিলাপ করিয়াছিলেন। পাণ্ডু কাননে মৎস্যের ন্যায় একান্ত মদনাবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির গুরুসমীপে ভয়ে বিষণ্ন হইয়া সত্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ সর্ব্বদ্বীপের অধীশ্বর মহারাজ হর্ষ ব্যতীত কাহারই রাজ্য কলঙ্কস্পর্শ শূন্য নহে।'

এই নরপতির বহু আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব এই পুণ্যরাশি সুগৃহীতনামা নরপতির পূর্ব্বপুরুষ হইতে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি। আপনি অনুকম্পা করিয়া আমাদের কৌতূহল বিদূরিত করুন। এই অবসরে বাণ মহারাজ হর্ষদেবের চরিত্র বর্ণন করেন।

বাণকবির নিজের লেখা হইতে তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। অন্য কোন গ্রন্থেই তাঁহার চরিত সংক্রান্ত কিছু লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন, "মহারাজ হর্ষ শেষজীবনে

বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন বলিয়া, বৌদ্ধবিদ্বেষী বাণ, তাঁহার জীবনচরিত সমাপ্ত করেন নাই।" এই কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেন না বাণের রচিত হর্ষচরিত পাঠ করিলে, কথনই তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিদ্বেষী বলিয়া মনে হয় না। বাণ ও তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ যাগযজ্ঞে অনুরক্ত ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপে আস্থাবান্ হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না,—ইহা দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে। কারণ তিনি শ্রীহর্ষের সহিত কথোপকথনকালে, "সুগত ইব শান্তমনসি……দেবে" এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। আবার যথন ভগিনী রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধানার্থ মহারাজ হর্ষ বিন্ধ্যারণ্যে বৌদ্ধযতি দিবাকর মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথন কবি দিবাকর মিত্রও তাঁহার আশ্রমের এরূপ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা খ্যাপন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে মনে হয়, তাঁহার হৃদয় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি বড় আড়ম্বরপ্রিয় কবি ছিলেন। মঙ্গলাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহার এই আড়ম্বরের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি সংস্কৃতভাষা সমুদ্রের সমুদয় রত্ন সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার কাব্যনিচয় অলঙ্কৃত করিবেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি তাঁহার প্রধান দুই গ্রন্থ, "হর্ষচরিত" ও "কাদম্বরী" কোনথানিই সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঐ দুই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। হর্ষচরিত অসমাপ্ত অবস্থায় বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হয়। কিন্তু কাদম্বরী নামক সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা তাঁহার পুত্র পরিসমাপ্ত করেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পুত্রের নাম বজ্রবাণ। কিন্তু গ্রন্থ হইতে ঐরূপ নামের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। তাঁহার পুত্র কাদম্বরীর উত্তরভাগ বর্ণনের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ;—

যাতে দিবং পিতরি তদ্বচসৈব সার্দ্ধং
বিচ্ছেদমাপ ভুবি যস্ত কথাপ্রবন্ধঃ।
দুঃখং সতাং তদসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য
প্রারব্ধ এষ চ ময়া ন কবিত্বদর্পাৎ॥

পিতা স্বর্গে গিয়াছেন,' তাঁহার বাক্যের সহিত তাঁহার কথাপ্রসঙ্গ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, পণ্ডিতগণ দুঃথ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব এই

গ্রন্থের অসমাপ্তিজনিত দুঃখ দূর করিবার জন্যই আমার ইহা আরম্ভ করা, প্রত্যুত কবিত্বের অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য নহে। বাণ হর্ষচরিত ও কাদম্বরী ব্যতীত আর দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। একখানির নাম "চণ্ডিকাশতক" ও অপর খানির নাম "পার্ব্বতীপরিণয়"। শেষোক্ত খানি নাটক। অনেকে এই শেষোক্ত দুই গ্রন্থ, বাণের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। যাহা হউক সেই সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াও যে কবি সংক্ষেপে তাঁহার প্রথম ও মধ্যম জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বাণ যে শুধু কবি ছিলেন, তাহা নহে, তিনি একজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ছিলেন। তিনি হর্ষচরিতের প্রারম্ভে উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য ও গৌড়দেশের রচনার বিশেষত্ব বর্ণন করিয়াছেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাস, কালিদাস, প্রবরসেন, হরিচন্দ্র, সাতবাহন, সুবন্ধু ও হর্ষের কবিতার প্রশংসা করিয়া, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমি সময়াভাবে তাঁহার কাব্যের মনোহারিত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাঁহার কাদম্বরী মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে হৃদয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসে উদ্বেলিত হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

দার্শনিক মতের সমালোচনা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যুক্তি এইরূপ :—নৈয়ায়িক বলেন, বস্তু যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে, বস্তু যেক্ষণে উৎপন্ন হইবে, তাহার পরক্ষণেই তাহাকে বিনষ্ট হইতে হইবে। তাহা হইলে, বস্তু যে ক্ষণে উৎপন্ন হইবে, সেই ক্ষণেই বস্তুর বিনাশের কারণ-কলাপের সমবধান আবশ্যক। ইহা নিতান্ত নির্যুক্তিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ, সকল বস্তুই যে বিনাশের কারণকলাপ সমভিব্যাহারে লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা কদাচ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যে স্থলে শ্যামরূপ-বিশিষ্ট বস্তু পাকদ্বারা রক্তরূপবিশিষ্ট হইতেছে, সেই স্থলে শ্যামরূপনাশ

প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং পাককে অগত্যা শ্যামরূপনাশের কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। ঐ পাকও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কিন্তু যে বস্তুর স্থায়িত্ব দেখা যাই-তেছে, বিনাশের কোন কারণেরও উপলব্ধি হইতেছে না, সেই বস্তুকে দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট করিবার জন্য অপ্রত্যক্ষ কোন কারণের কল্পনা করা নিতান্ত সাহস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

নৈয়ায়িক বলেন, বৌদ্ধদিগের এতদূর কষ্ট কল্পনা করিয়া ক্ষণিকত্ব বাদ রক্ষা হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এবং বৌদ্ধগণ যে, জলধর পটলের দৃষ্টান্তদ্বারা ক্ষণিকত্ব বাদ স্থির করেন ঐ দৃষ্টান্তও উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নহে। কারণ, জলধর পটলের অধিক কাল স্থায়িত্ব না হইলেও, তাহার বিনাশে তিন চারি ক্ষণ সময় অপেক্ষনীয় হয়। দ্বিতীয়ক্ষণে কদাপি বিনষ্ট হইতে পারে না। প্রথমক্ষণে জলধর পটলের অন্তর্গত সূক্ষ্ম অবয়বের ক্রিয়া হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে ক্রিয়া জন্য বিভাগ হয়, অর্থাৎ সূক্ষ্ম অবয়বসকল পরস্পর বিভক্ত হয়। তৃতীয়ক্ষণে বিভাগ দ্বারা ঐ সকল সূক্ষ্ম অবয়বের পূর্ব্বজাত গাঢ়তর সংযোগ বিনষ্ট হয়। পরে চতুর্থক্ষণে জলধর পটল বিনষ্ট হয়। সুতরাং জলধর পটলও ক্ষণিক নহে যে, তাহার দৃষ্টান্তে অন্যের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইবে। "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।" যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে পরের সাধনে কিরূপে সমর্থ হইবে।

বৌদ্ধগণ অসৎ হইতে অর্থাৎ অভাব হইতে যে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহাতে কপিল বলেন যে, অসৎ হইতে কদাপি সতের উৎপত্তি হইতে পারে না। যদিও বীজনাশের পর অঙ্কুরের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, তথাপি বীজনাশ অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি উপাদান কারণ নহে। বীজ নষ্ট হইলেও বীজের যে সকল সূক্ষ্ম অবয়ব থাকে, ঐ সকল সূক্ষ্ম অবয়বই অঙ্কুরোৎ-পত্তির প্রতি উপাদান কারণ। যে বস্তু, যে বস্তু নাশের পর উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুর প্রতি সেই নষ্টবস্তুর অবয়বই উপাদান কারণ। যেরূপ মহাপট-ধ্বংসের পর যে স্থলে খণ্ড পটের উৎপত্তি হয়, সেইস্থলে মহাপটের অবয়ব যেরূপ খণ্ডপটের উপাদান, সেইরূপ বীজের অবয়বই অঙ্কুরের উপাদান। যে স্থলে ক্ষীর নাশের পর দধির উৎপত্তি হয়, সেই স্থলেও ক্ষীরাবয়বই দধির উপাদান। অভাব হইতে যদি ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে অভাব

সর্ব্বত্র সুলভ—সুতরাং সর্ব্বত্র সকল কার্য্যের উৎপত্তি হইত। এই বিষয়ে নৈয়ায়িকও বলেন যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে চূর্ণিত বীজ হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। যেহেতু বীজকে চূর্ণ করিলেই বীজের ধ্বংস হইবে। বৌদ্ধমতে বীজধ্বংসই অঙ্কুরোৎপত্তির কারণ। অতএব জলাভিষিক্ত ভূম্যবয়বের সহিত বীজাবয়বই অঙ্কুরের উপাদান কারণ। তবে অঙ্কুরের প্রতি বীজনাশ যে নিমিত্ত কারণ, এই বিষয়ে কোন বিবাদ নাই।

বেদান্তিমতে সতের অর্থাৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত অন্যাথা ভাব, অর্থাৎ ব্রহ্মের বিজাতীয় সত্ব ভাবে উৎপদ্যমান এই জগৎ প্রপঞ্চ, কেবল ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা—এই জগৎ প্রপঞ্চের পারমার্থিক সত্তা নাই, ব্যবহারিক সত্তা মাত্র। ঐ বিবর্ত্ত ব্রহ্মের অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত, এবং ব্রহ্মের জ্ঞান দ্বারা নিবর্ত্তনীয়, বিলক্ষণ পরিণাম স্বরূপ,—যাহা অন্যান্য ভাবাপত্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শুক্তি বিষয়ক অজ্ঞান ও শুক্তি ও রজতের সাদৃশ্য জ্ঞানজনিত সংস্কার থাকিলে, শুক্তিতে রজতজ্ঞান হয়। ঐ জ্ঞান, ইহা রজত, এইরূপ প্রত্যক্ষস্বরূপ। সুতরাং ঐ স্থলে মিথ্যারজত উৎপন্ন হয়। মিথ্যারজত উৎপন্ন না হইলে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে না। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ না হইলেও, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। ইহাকেই জ্ঞানাধ্যাস ও বিষয়াধ্যাস বলে।

অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটী শক্তি আছে। আবরণ শক্তি দ্বারা শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানের আচ্ছাদন হয়। ঐ আচ্ছাদননিবন্ধন শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানা যায় না। বিক্ষেপশক্তিদ্বারা শুক্তিতে মিথ্যা রজতের উৎপত্তি হয়। এইরূপ অনাদিকাল হইতে জীবের ব্রহ্ম বিষয়ে যে অজ্ঞান আছে, ঐ অজ্ঞানের আবরণ শক্তিদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়। এবং ঐ অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি ও জীবের মিথ্যা জ্ঞানমূলক অনাদি বাসনা,—এই উভয় দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মে দ্বৈত আকাশাদি মিথ্যা প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টি অনাদি, সুতরাং ভ্রমজ্ঞান হইতে সংস্কার ও সংস্কার হইতে আবার ভ্রমজ্ঞান, এইরূপে সংস্কারচক্র ও ভ্রমচক্র পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, প্রথম সৃষ্টি কিরূপে হইল, এই আশঙ্কা স্থান হইতে পারে না। বিকার ও বিবর্ত্ত ভাবে দুই প্রকার পরিণতি হয়। একটী বস্তু যথার্থভাবে অন্যরূপে পরিণত হইলে বিকার হয়,—যেরূপ সুবর্ণের বিকার কটক-কুণ্ডলাদি, মৃত্তিকার বিকার ঘট সরাবাদি,

দুগ্ধের বিকার দধি। এই অদ্বৈতবাদীর মতে আকাশাদি প্রপঞ্চ মিথ্যা। উহাতে পারমার্থিক সত্তা নাই। ব্যবহারদশাতে কেবল সৎ বলিয়া ভ্রম জ্ঞান হয়। সুতরাং অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে সত্যপ্রপঞ্চের উৎপত্তি না হওয়ায়, প্রপঞ্চানাত্মক ব্রহ্মকে প্রপঞ্চাত্মক বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীতি হয় মাত্র।

কপিল এই মতের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন যে, শুক্তিতে রজতজ্ঞান মিথ্যা হইলেও তদ্দৃষ্টান্তে আকাশাদি জগৎ প্রপঞ্চজ্ঞানের মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। কারণ, প্রথম সাদৃশ্য জ্ঞানমূলক শুক্তিতে রজতত্ব ভ্রম হয়। পরে ভ্রান্ত পুরুষ ঐ ভ্রমমূলক রজতানয়নে প্রবৃত্ত হইলে, যখন রজতপ্রবৃত্তি বিফলা হয়, তখন ভ্রান্ত পুরুষ মনে করে যে, ঐ জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান। সুতরাং উহা শুক্তি, রজত নহে। এই বাধকবশতঃ উত্তরকালে ঐ জ্ঞানের মিথ্যাত্ব স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু প্রপঞ্চপ্রত্যয় স্থলে প্রবৃত্তির বৈফল্য না হওয়ায়, উত্তর কালে কোন বাধক নাই। সুতরাং বাধিত স্থলরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা অবাধিত প্রপঞ্চের কদাচ মিথ্যাত্ব হইতে পারে না। যদি বলেন, এই স্থলে অদ্বৈতশ্রুতিই বাধিকা। ইহাও বলা যায় না। কারণ, কপিল অদ্বৈতশ্রুতির অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম।" এই অদ্বৈতশ্রুতি জাতিপর, অর্থাৎ সমান জাতীয় বহুজীবপর, নতুবা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, এতৎ পর নহে। "নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ" এই সাঙ্খ্যসূত্র দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ন্যায়মতেও অদ্বৈত মত যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, অদ্বৈতবাদের অবধারণ কোন প্রমাণ সাপেক্ষ। ঐ প্রমাণ যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে অসৎ প্রমাণ দ্বারা পারমার্থিক বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না। কোন গভীর হ্রদে ধূমায়মান বাষ্প দর্শনদ্বারা যদি বহ্নির অবধারণ হয়, তাহা হইলে ঐ অবধারণ ভ্রমাত্মক হয়। ইহার কারণ ঐ অবধারণের সাধন যে ধূমায়মান বাষ্পদর্শন, উহা ভ্রমাত্মক। সেইরূপ ভ্রমাত্মক সাধনদ্বারা যদি অদ্বৈতাবধারণ হয়, তাহা হইলে ঐ অবধারণও ভ্রমরূপ হইবে। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত আছে, "নহি ভ্রমাদ্ বস্তুসিদ্ধিঃ"। ভ্রম দ্বারা কোন বস্তুসিদ্ধি হইতে পারে না। অতএব অদ্বৈত সিদ্ধির উপায়ভূত যে প্রমাণ, উহাকে, বেদান্তির ইচ্ছা না থাকিলেও

সৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঐ প্রমাণ সৎ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুরও পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করা হইল। এবং ঐ স্বীকারের সঙ্গে দ্বৈতবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। যদি বলেন, ঐ প্রমাণ ব্রহ্মেরই অবয়ব ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। ইহাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, ব্রহ্মের যে নিরবয়বত্ব ইহা তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতশ্রুতি যাহা আছে, উহার ব্রহ্মৈক্য বোধেই তাৎপর্য্য। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর পারমার্থিক সত্তা নাই, এই বিষয়ে তাৎপর্য্য নহে। এবং ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, অজ্ঞান সহকৃত ব্রহ্ম হইতেই যদি মিথ্যা জগতের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ব্যবহারদশাতে সর্ব্বদাই সকল বস্তুর উৎপত্তি না হয় কেন? এবং কারণেরই বৈচিত্র্য না থাকায়, কার্য্যের বৈচিত্র্যই বা কোথা হইতে আসে?

যদি বলেন যে, ব্রহ্ম যখন যেরূপ ইচ্ছা করেন, তখন সেইরূপ বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহাতে জিজ্ঞাস্য যে, ঐ ব্রহ্মের ইচ্ছা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত, কি ব্রহ্মস্বরূপ (?) যদি ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত হয়, তাহাহইলে দ্বৈতবাদের শুভাগমন হইল। যদি ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সত্তাতেই ইচ্ছার সত্তা হইল; ইচ্ছা নাই এইরূপ সময় দুর্লভ হইয়া উঠিল।

যাহা হউক আমাদের নিকট সকল দর্শনই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা যে দর্শনই যখন মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করি, তখন সেই দর্শনেরই চমৎকারিতা মনে করি। কোন্ দর্শন কর্ত্তার যুক্তি দুর্ব্বলা, আর কোন্ দর্শন কর্ত্তার যুক্তি সবলা, ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহি। যদি সকল দর্শন কর্ত্তাকে একত্রিত করিয়া আমরা তাঁহাদের বিচার শুনিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের যুক্তির সবলতা বা দুর্ব্বলতা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। আমরা সভায় শুষ্ক চীৎকার করি মাত্র। যাঁহার অধিক চীৎকারসামর্থ্য আছে, তিনিই জয়লাভ করেন। আর যাঁহার তাহা নাই, তিনি পরাজিত হন। ফলকথা, ঐ চীৎকারের কোন মূলই নাই। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে সৎ হইতে, অর্থাৎ পরমাণু হইতে, অসতের অর্থাৎ কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে অবিদ্যমান দ্ব্যণুক ঘটাদির উৎপত্তি হয়। এই উভয়ই উৎপত্তি বাদী। কপিল যদি নিজের সৎকার্য্য বাদ সংস্থাপনদ্বারা এই

দুই জনের মত খণ্ডন করিতে পারেন, তাহা হইলেই কপিলের সর্ব্বত্র জয় হইবে।

কপিল সৎকার্য্যবাদী। তিনি বলেন, কোন বস্তুরই উৎপত্তি বা বিনাশ নাই,—আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। সকল বস্তুই কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কারণে অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে। কারণ ব্যাপারদ্বারা প্রকাশ পায় মাত্র। আবার কালে কারণেই অব্যক্ত ভাবে অবস্থান করে। কটক-কুণ্ডলাদি ও ঘট সরাবাদি নিজ নিজ কারণ সুবর্ণ মৃত্তিকাদিতে অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত ছিল, কারণ ব্যাপারদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। আবার কালে সুবর্ণ মৃত্তিকাতেই বিলীন হইবে। সুতরাং কপিলের নিকট সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হয়,—ইহা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। কপিল যে সকল যুক্তিদ্বারা তাঁহাদের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে যথাক্রমে প্রদর্শিত হইল।

তাঁহার প্রথম যুক্তি এই, কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে অবিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। যেরূপ নীলকে কোন শিল্পী পীত করিতে পারে না, সেইরূপ অসৎ কার্য্যের সত্ত্ব কোন কারণ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, অসত্ত্ব ও সত্ত্ব এই দুইটীই কার্য্যের ধর্ম্ম, অর্থাৎ কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে অসত্ত্ব কার্য্যের ধর্ম্ম, এবং কারণ ব্যাপারের পর সত্ত্বই কার্য্যের ধর্ম্ম,—ইহা বলা যায় না। কারণ, অসত্ত্ব কার্য্যের ধর্ম্ম হইলে, কার্য্য অবশ্য ধর্ম্মী হইবে। ধর্ম্মী হইলে তাহার বিদ্যমানতা আবশ্যক। দণ্ড পুরুষের ধর্ম্ম হইলেও, পুরুষের অবিদ্যমানতাবস্থায় দণ্ড পুরুষের ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে বস্তু যাহাতে সম্বদ্ধ হয়, সেই বস্তুই তাহার ধর্ম্মস্বরূপে পরিগণিত হয়। অতএব যেরূপ তিলেতে অভিভূত তৈল পীড়নদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়, সেইরূপ কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কারণে তিরোভূত কার্য্য কারণ ব্যাপারদ্বারা আবির্ভূত হয় মাত্র—উৎপন্ন হয় না।

কপিলের দ্বিতীয় যুক্তি এই,—যে কার্য্য যাহাতে তিরোভূত থাকে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে, সেই কার্য্যার্থিব্যক্তি তাহারই উপাদান করিয়া থাকে। কার্য্য যদি কারণে অসৎ হয়, তাহা হইলে পটার্থিব্যক্তি ঘটকারণ মৃত্তিকার উপাদান না করে কেন? সুতরাং বলিতে হইবে যে, কার্য্য কারণ

ব্যাপারের পূর্ব্বে কারণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। এইজন্য যাহাতে যে কার্য্য সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেই কার্য্যের আবির্ভাবের জন্য সেই কারণের উপাদান হইয়া থাকে।

কপিলের তৃতীয় যুক্তি এই,—তন্তু হইতেই পটের উৎপাদ দৃষ্ট হইতেছে। মৃত্তিকা হইতে পটের উৎপাদ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, যে কার্য্য যাহাতে সম্বদ্ধ, সেই কার্য্য সেই কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়—ইহাই নিয়ম। যদি অসম্বদ্ধ কার্য্য উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অসম্বদ্ধত্বের অবিশেষ প্রযুক্ত সকল হইতেই সকল উৎপন্ন হইত। অতএব কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে কারণে কার্য্য যে সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কপিলের চতুর্থ যুক্তি এই,—যে কারণে যে কার্য্যানুকূল শক্তি থাকে, সেই কারণই সেই কার্য্যের উৎপাদক, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, তিল হইতেই তৈল উৎপন্ন হয়, বালুকা হইতে তৈল উৎপন্ন না হয় কি কারণ (?) এতদুত্তরে অবশ্য ইহাই বলিতে হইবে যে, তিলেতেই তৈলোৎপাদিকা শক্তি আছে, বালুকাতে নাই। সেই শক্তি কারণে কার্য্যের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। সুতরাং কার্য্য কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেও সৎ।

কপিলের পঞ্চম যুক্তি এই,—যখন দেখা যাইতেছে যে, ব্রীহি হইতেই ব্রীহি উৎপন্ন হইয়া থাকে, যব হইতে উৎপন্ন হয় না। তখন এইরূপ নিয়ম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কারণ যদাত্মক কার্য্য ও তদাত্মক। ইহা কারণ কার্য্যের একরূপতা ভিন্ন সম্ভব হয় না। এক্ষণে যদি কারণ সৎ, আর কার্য্য অসৎ হয়, তাহা হইলে সদসতের একরূপতা কদাচ সম্ভব হয় না; সুতরাং নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের ইচ্ছা না থাকিলেও কার্য্যকে সৎ বলিয়া অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে।

এই স্থলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বলেন যে, কপিলের ঐ পাঁচটী যুক্তি কেবল আপাততঃ চক্ষুতে ধূলীক্ষেপ মাত্র। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ঐ যুক্তিগুলিকে যুক্ত্যাভাস বলিয়াই বোধ হইবে। প্রকৃত যুক্তি বলিয়া কদাচ বোধ হইবে না। কপিলের প্রথম যুক্তি এই, অসত্ব ও সত্ব এই উভয়টী কার্য্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ, অসত্ব কার্য্যের ধর্ম্ম হইলে, কার্য্য

অবশ্য ধর্ম্মী হইবে, ধর্ম্মী হইলে অসত্ত্বরূপ ধর্ম্মকে বহন করিবার জন্য কার্য্যকে বিদ্যমান থাকিতে হইবে, সুতরাং কার্য্য সৎ। এই যুক্তিকে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে, আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে নিতান্ত ভ্রম-সঙ্কুল বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগের, সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি হয়, এই বাক্যের যথাশ্রুতার্থের উপরি কপিলের ঐরূপ দোষ হইতে পারে সত্য,—কিন্তু তাঁহাদের বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে পারিলে ঐরূপ দোষ মনে উদিত হইতেও পারে না। তাঁহাদের বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য যে, কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বকাল কার্য্যের অনধিকরণ কাল। এবং কারণ ব্যাপারের উত্তরকাল কার্য্যের অধিকরণ কাল। সত্ব ও অসত্বের সহিত কার্য্যের ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাব ইহা অভিপ্রেত নহে। অতএব কপিলের ঐ আপত্তি স্থান পাইতে পারে না।

কপিলের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ যুক্তির নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক এককথায় খণ্ডন করেন। কপিল যেরূপ কার্য্যের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্যের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান স্বীকার করেন, সেইরূপ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকও সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান স্থলে কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কার্য্যের প্রাগভাব স্বীকার করেন। এক্ষণে দেখুন, যে কারণে যে কার্য্যের প্রাগভাব আছে, সেই কার্য্যার্থী ব্যক্তি সেই কারণের উপাদান করে। তন্তুতে পটরূপে কার্য্যের প্রাগভাব আছে, এই জন্যই পটার্থী ব্যক্তি পটকার্য্যের নির্ব্বাহের জন্য তন্তুর উপাদান করিয়া থাকে। মৃত্তিকাতে পটরূপে কার্য্যের প্রাগভাব নাই, সুতরাং পটার্থী ব্যক্তি পটনির্ব্বাহের জন্য মৃত্তিকার উপাদান করে না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিককে যদি কপিল জিজ্ঞাসা করেন যে, পটরূপ কার্য্যের প্রাগভাব তন্তুতেই আছে, মৃত্তিকাতে নাই ইহার কারণ কি? তাহা হইলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক কপিলকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তন্তুতেই পটের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান হয়, মৃত্তিকাতে পটের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান হয় না, ইহারই বা কারণ কি? ইহাতে কপিল যেভাবে উত্তর দিবেন, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকও সেইভাবে উত্তর দিবেন। কপিল যদি বলেন যে, তন্তু পটের কারণ এই জন্যই তন্তুতে পটের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান হয়। মৃত্তিকা পটের কারণ নহে, এইজন্য মৃত্তিকাতে পটের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান হয় না। তাহা হইলে

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকও বলিবেন যে, তন্তু পটের কারণ, এই জন্যই তন্তুতে পটের প্রাগভাব অবস্থান করে। মৃত্তিকা পটের কারণ নহে, এইজন্য মৃত্তিকাতে পটের প্রাগভাব অবস্থান করে না; যেহেতু কারণেই কার্য্যের প্রাগভাব বিদ্যমান থাকে। কপিল যে স্থলে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান স্বীকার করেন, সেইস্থলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক প্রাগভাব স্বীকার করেন। সুতরাং তাঁহাদের অতিরিক্ত প্রাগভাব কল্পনানিবন্ধন গৌরবদোষও হইবার সম্ভাবনা নাই। সূক্ষ্মভাবে অবস্থান ও প্রাগভাব এই উভয়ের তুল্যরূপতা। কারণ, সূক্ষ্মভাবে অবস্থান স্বভাবসিদ্ধ, প্রাগভাবও স্বভাবসিদ্ধ। কার্য্য উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব বিনষ্ট হয়, কার্য্য আবির্ভূত হইলে সূক্ষ্মভাবে অবস্থানও তিরোভূত হয়।—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ কার্য্যের আবির্ভাবকালেও কার্য্যের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান স্বীকার করিতে হয়।

ইহার দ্বারা কপিলের দ্বিতীয় যুক্তি প্রস্থান করিল, ও তৃতীয় যুক্তিও স্থান পাইল না। কারণ, তন্তুতেই পটের প্রাগভাব থাকায়, তন্তুতেই পটের উৎপত্তি। মৃত্তিকাতে পটের প্রাগভাব না থাকায় মৃত্তিকাতে পটের উৎপত্তি হইবে না। ইহার দ্বারা কপিলের চতুর্থ যুক্তিরও খণ্ডন হইল। কপিল্ বলেন, কারণে কার্য্যানুকুল শক্তি আছে। সেই কারণে কার্য্যের সূক্ষ্মভাবে অবস্থান ভিন্ন আর কি হইবে? ইহাতে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বলেন যে, ঐ শক্তি কার্য্যের প্রাগভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে কারণে যে কার্য্যের প্রাগভাব আছে, সেই কারণই সেই কার্য্যে শক্ত।

কপিলের পঞ্চম যুক্তির খণ্ডন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক এইরূপে করেন। কপিল, ব্রীহি হইতে ব্রীহি উৎপন্ন হয়, যব হইতে হয় না,—ইহা দেখিয়া কার্য্যে কারণের তাদাত্ম্য স্বীকার করেন। অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের অভিন্নতা স্বীকার করেন। ইহাতে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক বলেন যে, ঐ অভিন্নতা সজাতীয়তা মাত্র তদাত্মতা নহে। ব্রীহি হইতে ব্রীহি উৎপন্ন হয়, যব হইতে হয় না, এইজন্য উৎপন্ন ব্রীহি কারণব্রীহির সজাতীয় মাত্র—অভিন্ন নহে। এই সজাতীয়তা কারণের কোন একটী অসাধারণ ধর্ম্মদ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এইজন্য পার্থিব পরমাণু হইতে উৎপন্ন কার্য্য পার্থিব, জলীয় পরমাণু হইতে উৎপন্ন কার্য্য জল, ও তৈজস পরমাণু হইতে

উৎপন্ন কার্য্য তেজ, এবং বায়বীয় পরমাণু হইতে উৎপন্ন কার্য্য বায়ু হইয়া থাকে।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের উপরি কপিল যে সকল বাধক দিয়াছিলেন, তাহা নিরস্ত হইল। এক্ষণে কপিলের সৎ কার্য্যবাদ সঙ্গত হইতে পারে কি না,ইহাই সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। কপিলের সৎ কার্য্য বাদ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ ঘটাদি কার্য্যের উৎপাদ ও বিনাশ যখন সাধারণের অনুভবসিদ্ধ, তখন ঐ উৎপাদ ও বিনাশ যে ঔপচারিক, অর্থাৎ মিথ্যা, ইহা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। যেস্থলে উত্তরকালে কোন বাধক না থাকে সেই স্থলেই সাধারণের অনুভবের মিথ্যাত্ব কল্পনা করা যায়। যেরূপ শুক্তিতে রজতত্বের ও রজ্জুতে সর্পত্বের কল্পনা মিথ্যা হয়। কিন্তু যেস্থলে উত্তরকালে কোন বাধক না থাকে, সেইস্থলে সাধারণের অনুভবের মিথ্যাত্ব কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হয় না। কপিল যে সকল বাধক দিয়াছিলেন, তাহা নিরস্ত হইয়াছে। অপর আর কোন বাধকও নাই। যদি উত্তরকাল বাধক না থাকিলেও সাধারণের অনুভবের মিথ্যাত্ব হয়, তাহা হইলে বৈদান্তিক মতে যে প্রপঞ্চ প্রত্যয়ের মিথ্যাত্ব,ইহা সঙ্গত না হয়,কি কারণ (?) তাহা হইলে কপিলকে বৈদান্তিকের জয় স্বীকার করিতে হয়। বৈদান্তিককে পরাজিত করিতে হইলে, কপিলকে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের জয় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এবং কপিলের যে কার্য্য মাত্রেরই কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান—আর কারণ ব্যাপারের পর স্থূলভাবে অভিব্যক্তি—ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কূর্ম্ম সচেতন পদার্থ,—সে নিজ শরীরের সঙ্কোচ ও বিকাশ করিতে সমর্থ হইলেও, তদ্দৃষ্টান্তে অচেতন কার্য্য মাত্রেরই যে সঙ্কোচ বিকাশ-শক্তি স্বীকার করা ইহা কপিলের সাহস ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

যাহা হউক, কপিল আড়ম্বরের সহিত যে সকল যুক্তিদ্বারা কণাদ ও গৌতমের মতের খণ্ডন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তির সমীচীনত্ব অর্ব্বাগ্দর্শী অস্মদাদির স্থূলদৃষ্টিদ্বারা স্থিরীকৃত হইল না। তবে বলিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা কপিলের যদি আর সূক্ষ্মভাব থাকে। সেই সূক্ষ্মভাব মাদৃশ স্থূলদর্শীর স্থূল দৃষ্টির গোচর নহে। যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির গোচর হইতে পারে।

ভগবান্ কপিল যেরূপ প্রকৃতি মহত্তত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ব ও প্রমাণত্রয়বাদী,—সেইরূপ ভগবান্ পতঞ্জলিও ঐরূপ স্বীকার করেন। সৃষ্ট্যাদি প্রক্রিয়াতে ঐ উভয়ের কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু কপিল মতে জীবাতিরিক্ত সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই,—পতঞ্জলি মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে,—এইমাত্র উভয় মতের বৈলক্ষণ্য। এই জন্যই কপিল দর্শন নিরীশ্বর সাঙ্খ্যদর্শন পদবাচ্য। পতঞ্জলি দর্শন সেশ্বর সাঙ্খ্যদর্শন পদের প্রতিপাদ্য। পতঞ্জলি, কণাদ ও গৌতম যে সকল যুক্তি দ্বারা ঈশ্বর প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তি ঈশ্বর প্রামাণ্যবাদ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য এই প্রবন্ধে তাহা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইল না।

দর্শন শাস্ত্রের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ কোন্ দর্শন অগ্রবর্ত্তী, কোন্ দর্শন বা তৎপরবর্ত্তী, এই সম্বন্ধে, এবং দর্শনশাস্ত্র প্রণেতৃ ঋষিগণের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে, অর্থাৎ কোন্ ঋষি অগ্রবর্ত্তী, কোন্ ঋষি বা তৎপরপরবর্ত্তী, তৎসম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক। বস্তুতঃ ঋষিদিগের জন্মের সময় সম্বন্ধে অনেক বাদ প্রতিবাদ এক্ষণে শুনিতে পাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কারণ, দর্শনশাস্ত্রের যদি পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিত, তাহা হইলে সকল দর্শনেই সকল দর্শনের সমালোচনা কিরূপে সম্ভবপর হইত। মনে করুন, যদি কপিল দর্শন সর্ব্বপ্রথম হইত, তাহা হইলে কপিল দর্শনে গৌতম দর্শন মতের খণ্ডন কিরূপে হইত। কপিল দর্শন প্রণয়ন কালে গৌতমদর্শন কোথায় ছিল (?) এবং যদি কণাদ দর্শন প্রথম হইত, তাহা হইলে কণাদ্ দর্শনে অন্যান্য দর্শন মতের খণ্ডন কিরূপে হইত? কণাদ-দর্শন প্রণয়ন কালে অন্যান্য দর্শন কোথায় ছিল? এবং দর্শনশাস্ত্র যদি অনাদি না হইত, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে আন্বীক্ষিক্যাদি দর্শনের উল্লেখ কদাচ সঙ্গত হইতে পারিত না। তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রের আন্বীক্ষিক্যাদি দর্শনের পরিবর্ত্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। যে সকল শ্রুত্যাদিতে আন্বীক্ষিক্যাদি দর্শনের উল্লেখ আছে, সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইল যথা :—

"ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি শ্রুতিঃ।"

"পুরাণন্যায়মীমাংসেত্যাদি স্মৃতিঃ।

'মীমাংসান্যায়তর্কশ্চ উপাঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" ইতি পুরাণং।

"ত্রৈবিদ্যেভ্য স্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীং।

আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ", ইতি মনুঃ।

"অত্রোপনিষদং তাত পরিশেষন্তু পার্থিব।

মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাং" ইতি মোক্ষধর্ম্মঃ।

এক্ষণে বিবেচনা করুন যে, যদি আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অর্থাৎ ন্যায়দর্শন অনাদি না হইত, তাহা হইলে শ্রুতি স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে ন্যায়দর্শনের উল্লেখ কিরূপে হইত? অতএব ইহাই মীমাংসা করিতে হইবে যে, বেদ যেরূপ অনাদি, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বর শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্বসর্গীয় বেদের অনুরূপ বেদের প্রণয়ন করেন, অথবা বেদের নিত্যতা মতে পূর্ব্ব বেদকেই অভিব্যক্ত করেন,—সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র সকলও অনাদি।* সৃষ্টির প্রথমে গৌতমাদি ঋষি প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্বসর্গীয় দর্শন শাস্ত্রের অনুরূপ দর্শনশাস্ত্রের প্রণয়ন করেন। অথবা শব্দের নিত্যতা মতে পূর্ব্ব দর্শন গৌতমকেই অভিব্যক্ত করেন। এইরূপ দর্শনশাস্ত্র প্রণেতৃঋষিগণও অনাদি। তাঁহারা এক এক কল্পের প্রলয়কালে অন্তর্হিত হন,—আবার নূতন কল্পের সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন। বাচস্পতি মিশ্রের সন্দর্ভ দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। যথা,—"সর্গাদাবাদিবিদ্বান্ ভগবান্ কপিলো মহামুনির্ধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্য-সম্পন্নঃ প্রাদুর্বভূবেতি স্মরন্তি"।

সৃষ্টির প্রথম ধর্ম্ম-জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়া কপিল মহামুনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এবং ঋষিগণ অনাদি না হইলে "পরাশর-ব্যাস-শঙ্খ-লিখিতা দক্ষগৌতমৌ"—এই বৈদিক শ্রাদ্ধমন্ত্রে ব্যাসগৌতমাদি ঋষির উল্লেখ কদাচ সঙ্গত হইত না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও "কল্পভেদাদবিরুদ্ধং" ইত্যাদি সন্দর্ভদ্বারা এইরূপই মীমাংসা করিয়াছেন। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থেও এইরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। "গৌতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত্রস্মারকত্বমেব শ্রূয়তে, নতু বুদ্ধিপূর্ব্বককর্তৃত্বং।" তদুক্তং "ব্রহ্মাদ্যা ঋষি পর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ" ইতি। উক্তঞ্চ ন্যায়ভাষ্যে, "যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাৎ বদতাং বরং। তস্য বাৎস্যায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ" ইতি। শ্রুতিশ্চ

* বেদাদির অনাদিত্বের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রের অনাদিত্ব কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য।

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যাঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি ব্যাখ্যানান্যনুব্যাখ্যানান্যেতস্যৈব নিঃশ্বসিতানি।" ইতি।

অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে ঋষি পর্য্যন্ত ইহাঁরা স্মৃতিপুরাণ ইতিহাস দর্শনাদি শাস্ত্রের স্মারক মাত্র, কারক নহেন। উক্ত শ্রুতিদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বেদ স্মৃতিপুরাণ ও দর্শনাদি শাস্ত্র পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ পরমেশ্বরও অনাদি, ঐ সকল শাস্ত্র এবং ঐ সকল শাস্ত্রপ্রণেতৃগণও অনাদি—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং বেদপুরাণ দর্শনাদি শাস্ত্র ও ঐ সকল শাস্ত্র প্রণেতৃগণের সময়ানুসন্ধান আমার মতে কাকদন্তের অনুসন্ধানের ন্যায় নিষ্ফল। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

ঈশ্বর-তত্ত্ব।

গুরু শিষ্যের কথোপকথন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

শিষ্য। মুখ্য পূজা কাহাকে বলে?

গুরু। মুখ্য পূজায় কোন পাষাণাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তির, কিম্বা পুষ্প, পত্র, নৈবেদ্যাদি অথবা পশুবলির প্রয়োজন হয় না। বশিষ্টদেব বলিয়াছেন যে, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, আসক্তি, দ্বেষজনিত সুখ দুঃখ এবং জন্ম-মৃত্যুক্লেশ দেবগণেরও যেরূপ, সামান্য তির্য্যগ্‌জাতিরও সেইরূপ। তন্ত্রমতে কালী তমোগুণ হইতে, শিব রজোগুণ হইতে, এবং বিষ্ণু সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং উঁহাদিগকে পরব্রহ্ম বলিলে চলিবে কেন? পরব্রহ্ম গুণের অতীত। অনেকে বলেন যে, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগকে ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিতে দোষ কি? কিন্তু তাঁহারা একবার ভাবেন না যে, জানিয়াই হউক, কিম্বা না জানিয়াই হউক, অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে,

হস্ত নিশ্চিত দগ্ধ হইবে। বিষ্ণু প্রভৃতিকে ব্রহ্ম বলিয়াই উপাসনা কর, কিম্বা বিষ্ণু প্রভৃতিকে দেবতা বলিয়াই উপাসনা কর, তুমি গুণে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। তোমার পরমার্থ লাভ ঘটিবে না। পিত্তল প্রভৃতিকে সুবর্ণ ভাবিলে, যেমন তাহা সুবর্ণ হয় না, সেইরূপ কালী প্রভৃতিকে নির্ব্বিকল্প পরমাত্মা ভাবিলে তাহা পরমাত্মা হয় না। এই জন্যই দেবতাদিগকে শাস্ত্রে মনুষ্যদিগের ন্যায় মায়া বা ভ্রম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ সকল ভ্রমাত্মক বলিয়াই ধর্ম্মাত্মারা ভ্রমাতীতের নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিঃ পুষ্পে গন্ধঃ পয়োঽমৃতং।
দেহ মধ্যে তথা দেবঃ পুণ্যপাপ-বিবর্জ্জিতঃ॥"

(জ্ঞানসংকলিনী।)

অর্থাৎ, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন বহ্নি থাকে, পুষ্পে যেমন গন্ধ থাকে, এবং দুগ্ধে যেমন অমৃত থাকে, সেইরূপ এই দেহ মধ্যে পুণ্যপাপবর্জ্জিত অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত এক পরম দেবতা আছেন। তিনি চিদ্রূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই দেবের পূজা করিতে হইলে, এই দেহরূপ গৃহ শাস্ত্রোক্ত স্নান আচমনাদি সংস্কারে পবিত্র হইলেও ইহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই দেহের সাক্ষী চিদ্রূপে যে জ্ঞান, তাহাই পরম পবিত্র,—তাহাই যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। অন্তরে ধ্যান করাই এই পরম দেবের পূজা। এতদ্ব্যতীত ইহার পূজার আর কোন ক্রম নাই। এই দেবের পূজায় ধূপ, দীপ, কুসুম, চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর, অন্নাদি দান, বিভবার্পণ বা অন্যান্য বিচিত্র উপকরণের কিছুই প্রয়োজন হয় না। কেবল অনায়াসলভ্য শান্তিময় অবিনাশী আত্মবোধ সুধাতেই ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। ইহাই ইহার পরম ধ্যান, ইহাই ইঁহার পরম পূজা। ঐ ধ্যান বিষয়ে একাগ্রভাবে চেষ্টাই এই দেবপূজার কুসুম। ধ্যানই এতদীয় পূজার উপহার, ধ্যানই এতদীয় পূজার ব্যাপার, ধ্যানই পাদ্যার্ঘ্য। বিশুদ্ধ চিদাত্মক চৈতন্যই এতদীয় ধ্যান কুসুম। অধিক কি বলিব, ধ্যানই এই পরমদেবের পূজার যাবতীয় উপকরণ।

এই পূজার নামই আত্মসমর্পণ। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ইহার নামই অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা। যোগীশ্বর পরমপুরুষ দেবাদিদেব মহাদেব এই

পরম দেবের পূজা সম্বন্ধে বশিষ্ট মুনিকে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

“যে যেরূপ জাতি, শাস্ত্রে তাহার যেরূপ অধিকার কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে তদনুসারে আপন আপন বাঞ্ছিত বস্তু দিয়া পরম বিভু পরমাত্মদেবের পূজা করিবে। যে বহুবিভবশালী, সে যথাপ্রাপ্ত ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা শয়নে, উপবেশনে, গমনে সর্ব্ব সময়েই শান্তিময় আত্মদেবের পূজা করিবে। যে কান্তাসম্ভোগ ও বিবিধ সুরসভক্ষ্যভোজনবিলাসী, সে যথাপ্রাপ্ত আপন সুখ সম্ভার উপহার দিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক আত্মদেবের পূজা করিবে। যে আধিব্যাধিপীড়িত, মোহপঙ্ক নিমগ্ন, সে যথাপ্রাপ্ত আপন দুঃখসম্ভার দিয়াই আত্মদেবের পূজা করিবে। এই জগতে যত কিছু চেষ্টাবস্তু আছে, যাহার যাহা আয়ত্ত, সে তত্তদ্ বস্তু এবং মৃত্যু, জীবন, স্বপ্ন প্রভৃতি যাহা তাহার অভিলষিত, তাহা দিয়াই আত্ম দেবের পূজা করিবে। যে দরিদ্র সে আপন দারিদ্র্য দিয়া, যে রাজা সে আপন রাজ্য দিয়া, আত্মদেবের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি নিজ নিজ পুত্রকলত্রের সহিত কলহ করিয়া কালাতিপাত করে, তাহাকে আত্মদেবের পূজা করিতে হইলে, আপন আপন মনোবৃত্তি রাগদ্বেষাদি দিয়াই এই সাম্য আত্মদেবের পূজা করিতে হইবে। তবে প্রধানতঃ সর্ব্বভূতে সমতা-প্রদর্শনী মিত্রতাই এই আত্মপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা, মুদিতা, ক্রোধাদিনিগ্রহসামর্থ্য ইত্যাদি বিশুদ্ধ ভাবদ্বারাই আত্মার অর্চ্চনা করিতে হয়। বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত, যুক্ত বা অযুক্ত, ত্যক্ত বা অত্যক্ত, যাহা যাহার অভিপ্রেত, তদ্দ্বারাই সে পরম দেবের পূজা করিবে। এইরূপে নির্ব্বিকারভাবে যথাপ্রাপ্ত বস্তুদ্বারাই আত্মদেবের পূজা হইয়া থাকে। যাহা আপাত-রমণীয় বা যাহা আপাত-দুঃসহ তৎসমুদয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া আত্মপূজা ব্রত করিবে। “সেই এই আমি”, “ইহা আমি নহি” এবং প্রকার বিভাগ-কল্পনা পরিত্যাগ করিবে। “সমস্তই ব্রহ্ম” এই স্থির করিয়া আত্মপূজা করিবে। সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে সর্ব্বপ্রকার আকার বিকার সম্পন্ন যথাপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারাই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বময় আত্মার পূজা করিবে। যাহা অনিষ্ট, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, যাহা ইষ্ট তাহাও পরিত্যাগ করিয়া অথবা আত্মবুদ্ধিতে

উভয়কেই স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা নিত্য আত্মদেবের পূজা করিবে। দেশকাল ক্রিয়ার সহযোগে যে শুভ বা অশুভ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা নির্ব্বিকার ভাবে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা আত্মদেবের পূজা করিবে। ব্রহ্মৈক দৃষ্টিরূপ সমতাগুণে নিজে আকাশের ন্যায় হইয়া নির্ব্বিকার ভাবে মনোলয় পূর্ব্বক যে অবস্থান, তাহাই মুখ্য পূজা।” *

পরমগুরু মহাদেবই যখন এই কথা বলিয়া গিয়াছেন তখন কেন আমরা বাহ্য ও গৌণ পূজা লইয়া বিবাদ করিতেছি? অজ্ঞানে আবদ্ধ বলিয়া আমরা সেই পরমদেবের সাক্ষাৎ পাইতেছি না। যিনি সদ্‌গুরু তিনি দীক্ষা দ্বারা সেই পরমদেবের সাক্ষাৎ পাইবার উপায় বলিয়া দেন, এবং আমরা অজ্ঞানরূপ আবরণ উন্মোচন করিয়া সেই শুদ্ধ শান্ত পরম দেব যে কে, তাহা তখন জানিতে সমর্থ হই।

শিষ্য। দীক্ষা কাহাকে বলে? শুনিয়াছি যে, যতি কিম্বা সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে নাই, ইহা কি সত্য?

গুরু। দীক্ষা কাহাকে বলে শুন,—

“দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥”
(গৌতমীয় তন্ত্র)।

অর্থাৎ যদ্দ্বারা বিমল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, কর্ম্মবাসনা সকল ক্ষীণ হয়, তাহাকেই তত্ত্ববিদ্ মুনিরা দীক্ষা বলেন। অর্থাৎ যদ্দ্বারা জ্ঞান ও ধ্যানের উদয় হইয়া ‘আমরাই যে সেই ব্রহ্ম’ এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়, তাহাকে দীক্ষা বলে। আর লোকে বলে যে সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে নাই, তাহা মিথ্যা কথা। মহাপুরুষেরা প্রায় যোগী কিম্বা পরমহংস হন। তাঁহারাই উপদেষ্টা হইবার যথার্থ পাত্র; তাঁহাদের কাছে দীক্ষা না লইয়া কি মূর্খ গৃহীর কাছে দীক্ষা লইবে?

এখন বুঝিলে মুখ্য পূজা কি? তাহার জন্যই মনীষিরা বলিয়াছেন যে,—

“উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতিজপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥” (উত্তর গীতা)

* বঙ্গবাসীর সংস্করণ যোগবাশিষ্ট রামায়ণ বঙ্গানুবাদ (পৃঃ ৪৫৪—৪৫৫)।

অর্থাৎ যদ্দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ, মূর্ত্ত্যাদির ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম এবং, বাহ্য পূজা অধমেরও অধম বলিয়া জানিবে।

শিষ্য। তীর্থাদি দর্শনের দ্বারা পরমতত্ত্বের উদয় হয় কি না?

গুরু। তীর্থ কাহাকে কহে, বলিতেছি, শুন। যদ্দ্বারা মনুষ্যগণ এই ভবদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার নাম তীর্থ। সুতরাং মনুষ্যের পক্ষে সেই ব্রহ্মই তীর্থ। সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিই পরমতীর্থরূপে কথিত হন। "ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি"—(মনুস্মৃতিঃ)।

সেইজন্য ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"যত্তীর্থ বুদ্ধি সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।"

অর্থাৎ, যাহারা প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তিকে তীর্থস্বরূপ না ভাবিয়া নদ্যাদির জলকে তীর্থ মনে করে, তাহারা গো এবং খর তুল্য, অর্থাৎ নিতান্ত বিবেকহীন।

ধর্ম্মাত্মারা আরও বলিয়াছেন যে,—

"তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ॥" (উত্তরগীতা)

অর্থাৎ, আত্মধ্যানপরায়ণ যোগীরা, জলরূপী তীর্থাদির দর্শন কিম্বা পাষাণ ও মৃন্ময় দেবতাদির পূজা করেন না।

আবার দেখ, যাহারা আত্মতীর্থ জানে না, এবং বাহ্য তীর্থাদিদর্শন করিয়া বেড়ায়, তাহাদের কখনই মোক্ষ লাভ হয় না। সেইজন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"ইদং তীর্থং ইদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসাঃ জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে॥"(মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে)

হে দেবি ভগবতি! যাহারা আত্মতীর্থ জানে না, তাহাদের কিরূপে মোক্ষ হইবে? অজ্ঞানলোকে এ তীর্থ ও তীর্থ করিয়া বেড়ায়।

সেইজন্য মনু বলিয়াছেন যে,—

"অদ্ভি র্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।" (মনুস্মৃতিঃ)

অর্থাৎ, জলের দ্বারা শরীরের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের * দ্বারা মনের মলিনতা বিশোধিত হইবে।

* সত্য শব্দের ব্রহ্মজ্ঞান অর্থ কোথায় পাইলেন? স সং।

"তীর্থ পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধং," অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা বিষয়শূন্য মনকেই তীর্থ বলে। পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন, যখন মন বিশুদ্ধ হয়, তখনই দ্রষ্টা পুরুষ আপন স্বরূপে অবস্থান করেন,—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।" তখনই যথার্থ ভাব শুদ্ধি হয়।

আত্মতীর্থ সম্বন্ধে ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥"

(জ্ঞানসংকলিনী)

অর্থাৎ, আমাদের দেহের ভিতরই সকল বিদ্যা, সকল দেবতা, এবং সকল তীর্থ আছে। উহা কেবল গুরুবাক্যের দ্বারাই লাভ করা যায়।

তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে,—

"ঈড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ঈড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্নাচ সরস্বতী॥" (জ্ঞানসংকলিনী)

অর্থাৎ, ঈড়া নাড়ীই ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলাই যমুনা, এবং এবং ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্নাকেই সরস্বতী বলে। কেবল যোগীব্যক্তিরাই এই সকল আত্মতীর্থ অবগত আছেন।

"ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্রস্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

(জ্ঞানসংকলিনী)

অর্থাৎ, যে স্থানে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলন হইয়াছে, সেই স্থানকেই ত্রিবেণী কহে। সেই ত্রিবেণীসঙ্গমই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। সেই আত্মতীর্থে যদি স্নান করা যায়, তবে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শিষ্য। তাহা হইলে পার্থিব তীর্থাদির কি কোন পবিত্রতা নাই?

গুরু। মৃত্তিকার প্রভাব, জলের তেজ এবং মননশীল তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের অবস্থান, এই ত্রিবিধ কারণে পার্থিব তীর্থ সকলের পবিত্রতা হয়। যথা কাশীখণ্ডে,—

"প্রভাবাদদ্ভুতাৎ ভূমে সলিলস্যৈব তেজসা।
পরিগ্রহাৎ মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥"

শিষ্য। কাশী, গয়া, জগন্নাথ প্রভৃতি তীর্থের যদি কোন মহাত্ম্যই না থাকিবে, তবে তাহাদের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল ?

গুরু। তোমাকে পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন বৌদ্ধদিগের প্রভাব হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন অনেক ধার্ম্মিক বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের স্মরণচিহ্নের জন্য অনেক স্থানে বৌদ্ধস্তূপাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে উহারা ক্রমশঃ বৌদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাস হইল, তখন ব্রাহ্মণেরা প্রতিশোধার্থে, বৌদ্ধগণ যেখানে তীর্থাদি সংস্থাপন ও স্তূপ ও মূর্ত্ত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইখানে স্ব স্ব প্রাধান্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শত শত তীর্থ আবিষ্কার ও দেবদেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপন করিতে লাগিলেন, এবং সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য প্রাচীন পুরাণাদি আখ্যানের সহিত সেই সকল নবাবিস্কৃত তীর্থের মাহাত্ম্য ও প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি সংযোজিত করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত প্রায় তাবৎ পার্থিব তীর্থই আবিস্কৃত হইয়াছে। অনেকে এইরূপ বলেন যে, বৌদ্ধদিগের সময় হিন্দুতীর্থ বলিয়া বৃন্দাবন কিম্বা অযোধ্যার অস্তিত্ব ছিল না। বৃন্দাবন বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, চৈতন্যদেব বৃন্দাবন ও রামানুজ অযোধ্যা আবিষ্কার করেন। আমরা ইতিহাসাদি হইতে জানিতে পারি যে, যেস্থানে বৌদ্ধতীর্থ ছিল প্রায় সেই স্থানেই হিন্দুতীর্থ স্থাপিত হইয়াছে। বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী সারনাথ ও বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দির এবং গয়ার মন্দিরাদি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কাশী একটী অতি পুরাতন নগর। প্রথমে ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ ছিল, কিন্তু বৌদ্ধরাজগণের আধিপত্যের সময় ঐ স্থান হইতে হিন্দুধর্ম্মের একেবারে বিলোপ হয়, এবং উহা বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অবশেষে বহুবৎসরের পর হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত উহা হিন্দুতীর্থ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। গয়ার ও ঐ দশা হইয়াছে। 'কানিংহাম' সাহেব এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, গয়া পূর্ব্বে হিন্দুতীর্থ ছিলনা। গয়ায় বৌদ্ধপ্রভাবের যখন তিরোভাব হইল, তখন উহা হিন্দুতীর্থরূপে

পরিগণিত হয়। এখনও হিন্দুগণ বুদ্ধগয়াস্থ বোধিমূলে পিণ্ডদানাদি করিয়া থাকেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল আরও দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধগয়ার সমীপবর্ত্তী বিষ্ণুপদ বুদ্ধপদ মাত্র। এবং গয়া নগরের বহির্ভাগে পাঁচক্রোশের মধ্যে যত বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহাও হিন্দুতীর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

জগন্নাথদেবের দশাও ঐরূপ হইয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, হাণ্টার ফার্গুসান্ সাহেব প্রভৃতি বুধমণ্ডলী দেখাইয়াছেন যে, শ্রীক্ষেত্রের অদ্ভুত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি, বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নামক তিনটী মণ্ডল ছিল, তাহারই প্রতিরূপ মাত্র। ঐ সকল পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, বৌদ্ধদিগের উপাদান লইয়া জগন্নাথ দেবের সৃষ্টি হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের অবনতির পরে হিন্দুরা উহাকে হিন্দুতীর্থরূপে পরিণত করিয়াছেন এবং বুদ্ধকে বিষ্ণু অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেইহেতু অসাধারণ ওজস্বী এবং কুটিলনীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ সেই বুদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধরূপী জগন্নাথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়া ছিলেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং,
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে।"

এখন বুঝিলে, এই সকল তীর্থের অস্তিত্ব কোথা হইতে আসিল ? *

* বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কালমাহাত্ম্যে এই সকল কাল্পনিক অবিচার-জৃম্ভিত কথারও প্রতিবাদ করিতে হইতেছে। প্রবন্ধকার প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে, এ সকল আকাশ-কুসুমের অবতারণা করিতে সাহস করিতেন না। তাঁহার মতে দেখিতেছি যে, কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থ,—যাহা পঞ্চপাণ্ডব কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত আছে, তাহাও এখন বৌদ্ধতীর্থের ভগ্নাবশেষে পরিণত হইল ! যে গয়া সম্বন্ধে মহাভারতে,

"কৃষ্ণশুক্লাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ।
পুনাত্যাসপ্তমং রাজন্ কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

পুনশ্চ—"এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥"

(মহাভারত, বনপর্ব্ব তীর্থযাত্রাধ্যায়)

শিষ্য। তাহা ত' বুঝিলাম, কিন্তু মনে আরও সন্দেহ আসিতেছে। লোকে যে ব্রত ও উপবাস করে, তাহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় কি না?

গুরু। যদি মুখ্যভাব ত্যাগ করিয়া গৌণভাবে ব্রত করা যায়, তাহা হইলে কিছুই ফল হয় না। "ব্রত" অর্থে শুভকর্ম্ম। দেবলে উল্লিখিত আছে যে,—

"ব্রহ্মচর্য্যং তথাশৌচং সত্যমামিষ বর্জ্জনং।
ব্রতেষ্বেতানি চত্বারি বরিষ্ঠাণীতি নিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্মচর্য্য, শৌচ, সত্য এবং বিষয়াভিলাষরাহিত্য, এই চারিটী সমুদয় ব্রতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সকল শুভকর্ম্ম করিলে নিশ্চয় ব্রহ্মলাভ হয়। কিন্তু এসকল সহজসাধ্য নয় বলিয়া লোকে মুখ্যের পরিবর্ত্তে গৌণকেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

সকল ভোগের বর্জ্জনের নাম "উপবাস"। যখন পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয় পূর্ণভাবে নিগৃহীত হয়, তখনই যথাশাস্ত্র "একাদশীব্রত" অনুষ্ঠিত হয়। তাই বলিতেছিলাম যে, মুখ্যভাবে ব্রতাদি সাধন না করিলে, কোন ফলই হয় না। গৌণের দ্বারা কোন ফল হয় না। *

শিষ্য। আপনি ঈশ্বর কাহাকে বলেন? ব্রহ্মই বা কি?

গুরু। যদিও নামে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু যে অর্থে শ্রুতি, কালী দুর্গা ইত্যাদিকে ব্রহ্ম বলেন না, সেই অর্থে সাধারণ লোকে যাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলে, আমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি না। মনুষ্যেরা দুঃখে, কষ্টে ও পাপে ক্রন্দন করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ডাকিলেও, সেই ঈশ্বরের মৌন-ব্রত ভঙ্গ হয় না। † যদি ঈশ্বরের আরাধনায় সুখদুঃখভোগ ও নানা কামনা পূর্ণ হয়, এবং যাহারা তাঁহার আরাধনা না করে, যদ্যপি তাহাদিগকে তিনি শাস্তি দেন, তাহা হইলে সেই কল্পিত ঈশ্বর উৎকোচগ্রাহী হইলেন।

আফ্রিকার যুদ্ধে যে এত সহস্র সহস্র মনুষ্য ও পশ্বাদি নিহত হইতেছে, এবং "প্লেগে" ও দুর্ভিক্ষে এত সহস্র সহস্র লোক মরিতেছে, তাহাহইতে ভগবানের কি ন্যায় ও দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়? যে ভারতবাসীর ন্যায় ধর্ম্মশীল জাতি পৃথিবীতে কোনকালে ছিলনা, এবং এখনও নাই, সেই জাতির এত পদদলন ও লাঞ্ছনা কেন? যদি বল যে, কর্ম্মফল, তবে ঈশ্বরকে মানিবার আর প্রয়োজন কি? যদি সকল পদার্থ ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস কর, তবে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, কাম ও ক্রোধাদি তাঁহারই সৃষ্টি বলিতে হইবে। তবে আমি যে পাপ, পুণ্য করিতেছি, তাহাতে আমার কি দোষ? যদি পূজাদি ও ভগবানের নামে মানবের মুক্তি হইত, তাহাহইলে মুনি ঋষিরা অরণ্যে নানারূপ কষ্টভোগ করিয়া কি করিতেন?

সেইজন্য বলিতেছিলাম যে, মনুষ্যগণ ঈশ্বর বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝে, তাহাকে আমি ঈশ্বর বলি না, এবং তাহা শ্রুতিপ্রতিপদিত ঈশ্বরের স্বরূপ নহে। তাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন সাধারণ দৃষ্টিতে সুখসাধ্য হইলেও

—— ইত্যাদি উক্তি আছে। এবং বারাণসীর পুণ্যত্বকীর্ত্তন প্রাচীনতম শাস্ত্রে, এমন কি বেদাদিতেও উক্ত আছে—এবং মহাভারতে ও উল্লিখিত আছে—

"ততো বারাণসীং গত্বা অর্চ্চয়িত্বা বৃষধ্বজং"—
(মহাভারত বনপর্ব্ব ৭৩ অধ্যায়ঃ)

তাহাও বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষে পরিণত হইল। প্রবন্ধকার কি ললিতবিস্তরও পাঠ করেন নাই? তাহা হইলে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বভাবি হিন্দুর তীর্থের কথা অনেক জানিতে পারিতেন।

জগন্নাথদেবের কথা—উহা কলিযুগের তীর্থ। জগন্নাথদেবের মন্দির হিন্দুদিগের নির্ম্মিত। উহাতে বৌদ্ধস্থাপত্যের কোন নিদর্শন নাই। আর মন্দিরে তিনটী মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রবন্ধকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে উহা বৌদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পূজা—ইহাও বড় বিচিত্র!

যাহা হউক কালধর্ম্মই এক্ষণে বলবান্। এইজন্য কোন কোন নব্য মনীষী আবার 'সমস্ত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পরিগৃহীত'—একথাও বলিতে সঙ্কুচিত হন না। বৌদ্ধেরা সাধারণতঃ চৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং এখনও ভারতের সহস্র সহস্র স্থানে উহাদের নিদর্শন আছে। "কুটিল মতি ব্রাহ্মণেরা"—মনে করিলে, ঐ সমস্তই নিজস্ব করিয়া তাঁহাদের "কৌটিল্য" চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। হিন্দুরা যে বুদ্ধকে অবতার বলিয়াছেন, তাহার কারণ, হিন্দুর সার্ব্বজনীন উদারতা। "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ...যৎ যৎ বিভূতিমৎ"—ইত্যাদি তাহার শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ। স-সং।

* হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ অধিকারিভেদে বিভিন্ন। দুঃখের বিষয়, প্রবন্ধকার তাহা একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই।

† কে বলিল হয় না? কোন ক্রন্দনই তাঁহার নিকট নিস্ফল হয় না। তাঁহাকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে যে ভাবে ডাকে, তিনি তাহাকে সেই ভাবে উত্তর দেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।" স—সং।

যাহারা সত্যপিপাসু এবং সূক্ষ্মবিচারশীল তাহাদের দৃষ্টিতে সুখসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। "ঈশ্বর আছেন" এইরূপ বিশ্বাস অসভ্য লোকদিগেরও আছে, কিন্তু এই যে সহজ বিশ্বাস, ইহা মুক্তির কারণ নহে। তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এইরূপ আস্তিক ও নাস্তিকের ভিতর পার্থক্য কি? ঈশ্বর বলিতে লোকে সাধারণতঃ সগুণ পুরুষ বিশেষ (personal God) বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে, লৌকিক তর্ক দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহা দেখাইবার জন্য কপিল বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"। ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ দেখাইবার জন্য 'ঈশ্বর' নামক পদার্থ সম্বন্ধীয় অপূর্ণ বা ভ্রান্ত জ্ঞানের উচ্ছেদের জন্য ঈশ্বর সিদ্ধির প্রতিকূলে তিনি বহু তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। * কেবল জীবাত্মার জ্ঞান হইলেও যে, মোক্ষ হইয়া থাকে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য আত্মানাত্মবিবেকের প্রতিপাদন করিয়াছেন,—স্বশাস্ত্রে প্রয়োজনাভাব বশতঃ পরমেশ্বরের ব্যাবস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু ঘোর জড়বাদীকে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইবার শক্তি ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জলে যত, অদ্বৈতব্রহ্মবাদী বেদান্তদর্শনে তত নহে। নির্গুণ চিচ্ছক্তির কর্তৃত্ব হৃদয়ে ধারণা করা যত কঠিন, চিৎপ্রতিবিম্বিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্ব হৃদয়ঙ্গম করা তত কঠিন নহে। নিম্নে দুইএকটী কথা "ঈশ্বর" সম্বন্ধে বলা যাইতেছে।

সাধারণের ধারণা এই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই কথা স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে পক্ষপাতী কিম্বা অনবস্থিতচিত্ত বলিতে হয়। তাহা না হইলে তিনি কেনই বা এমন ইচ্ছা করিবেন, যাহাতে একজন সুখী এবং অপর ব্যক্তি দুঃখী হয়, একজন ধনী এবং অপরজন দরিদ্র, একজন ধার্ম্মিক অপর ব্যক্তি অধার্ম্মিক হয়? শাস্ত্র আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন যে, ঈশ্বর সাপেক্ষ, অর্থাৎ ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন। বেদান্ত বলিয়াছেন যে, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ", অর্থাৎ লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু। ইহাতে ঈশ্বরের কোন অপরাধ নাই। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, যদি প্রকৃতি বা পরমাণু এবং অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি কর্ম্ম বৈচিত্র্যের কারণ হয়, তবে আর অতিরিক্ত ঈশ্বর নামক পদার্থের অঙ্গীকারের প্রয়োজন কি?

* এ কথা নূতন শুনা গেল! স—সং।

যিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারেন না, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিব কেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতি, পরমাণু, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি অচেতন। চেতনের প্রণোদন ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম্ম সাধন করা জড়ের সাধ্য নহে। সুতরাং জড় কোন কার্য্যের স্বতন্ত্র কারণ হইতে পারে না। অতএব "ঈশ্বর" নামক স্বতন্ত্র কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

ন্যায়মতে পরমাণু জগতের উপাদান কারণ, এবং পুরুষের কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। পুরুষ কর্ম্ম করে, সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর মনুষ্যের পুরুষকারকে সফল করেন। পুরুষের কর্ম্মফল নিষ্পত্তি প্রকৃতি নানা স্বভাববিশিষ্টা বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও, ঈশ্বরের (অথবা কোন নিয়ামক-শক্তির) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যাহা কদাচিৎ হয়, কদাচিৎ হয় না, তাহা নিশ্চয়ই কোন নিয়ামক-শক্তির অধীন। প্রকৃতি যে কালের অধীন হইয়া পরিণাম সাধন করেন, তাহা স্বীকার্য্য। যদি তাহা না মানা যায়, তাহা হইলে বিশ্বজগতের সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইত, কদাচ প্রলয়াবস্থা প্রাপ্তি হইত না। অথবা ইহার চির প্রলয়াবস্থাতেই অবস্থান অবশ্যম্ভাবী হইত, কদাচ সৃষ্টি হইত না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। প্রকৃতি যে কালের মুখাপেক্ষা করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জ্ঞানশক্তিশূন্য অচেতন প্রকৃতির কালজ্ঞান থাকা অসম্ভব, কোন্‌কালে ইহা কর্ত্তব্য, কোন্‌কালে অকর্ত্তব্য তদবধারণ জ্ঞানশক্তি বিহীনের সাধ্য হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর নামক পদার্থ আছেন। ঈশ্বরের প্রেরণা ব্যতিরেকে প্রকৃতি স্বয়ং সাম্যাবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক বিষমত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে,—লোকশিক্ষার্থ অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে আপন বৈমাত্রেয় ভগিনী "সুভদ্রাকে" পিতৃস্বস্রেয় অর্জ্জুনের সহিত বিবাহ দিলেন? আর অর্জ্জুনই বা কিরূপে সাক্ষাৎ মাতুলভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিলেন? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিজেই অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

অর্থঃ—হে অর্জ্জুন! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করে, সমাজে অপরাপর লোকেও তাহাই আচরণ করে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণরূপে গ্রহণ করে, অপরাপর লোকেও তাহারই অনুসরণ করে।

তবে কেবল তিনি জানিয়া শুনিয়া কিরূপে ওরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ধর্ম্ম বিগর্হিত অনার্য্যোচিত কার্য্য করিলেন? এবং প্রদ্যুম্ন মাতুল রুক্মীর কন্যা, অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (১)। আর ভীমসেন দ্বিজাতি ক্ষত্রিয় জাতি হইয়া কিরূপেই বা অমেধ্য আমমাংসভোজী বনচর অনার্য্যজাতি রাক্ষসের দুহিতা "হিড়িম্বার" পাণিগ্রহণ করিলেন? তজ্জন্য ভীমকে লইয়া সমাজে গোলযোগ বাধিয়াছিল, তাহার ত কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় না।

প্রশ্নটা গুরুতর ও বিবেচ্য বটে।—কেহ কেহ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারেন যে, দাক্ষিণাত্য দেশে মাতুলভগিনী পিসতুতভগিনী বিবাহ দোষাবহ নহে। কেননা, সেই দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকার গুণে ঐ জাতীয় বিবাহে দুষিত সন্তান উৎপন্ন হয় না। এই হেতুতেই উক্তরূপ বিবাহ তদ্দেশে দেশাচার রূপেই প্রামাণ্য। ইহা প্রাচীনতম "গোবিন্দার্ণব" গ্রন্থে সংস্কারবীচি অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে যথা—

(১) হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৬১।১—১০।

"দক্ষিণতস্তাবৎ অনুপনীতেন সহ ভোজনং, ভার্য্যয়া সহ ভোজনং পর্য্যুসিতভোজনং মাতুলপিতৃস্বসৃদুহিতাপরিণয়ঞ্চ"।

আপস্তম্বোঽপি—

"যেষাং পরম্পরাঃ প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বজৈরপ্যনুষ্ঠিতাঃ।
ত এব তৈর্ন দুষ্যেয়ুরাচারৈর্নেতরে পুনঃ॥"

দেবলোঽপি—

"যস্মিন্দেশে য আচারো ন্যায়দৃষ্টস্তু কল্পিতঃ।
তস্মিন্নেব স কর্ত্তব্যো দেশাচারঃ স্মৃতো হি সঃ॥"

অর্থ—দক্ষিণদেশে (দাক্ষিণাত্যে) অনুপনীত বালকের সহিত ভোজন, স্ত্রীর সহিত ভোজন, পর্য্যুসিত অন্নব্যঞ্জন ভোজন, মাতুলভগিনী, পিসতুতভগিনী বিবাহ করা দেশাচার, ইহা দুষ্য নহে।

আপস্তম্ব ঋষিও এই কথা কহিয়াছেন - যাহাদের সেই আচার পারম্পর্য্য ক্রমে পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আচারে তাহারা দুষিত হয় না, কিন্তু অপরে দুষিত হইবে।

এবং দেবল ঋষিও বলিয়াছেন—যুক্তির দ্বারা যে দেশে যে আচার কল্পিত হইয়াছে, সেই দেশেই তাহা কর্ত্তব্য, কেননা তাহা দেশাচার বলিয়া প্রামাণ্য।

অতএব দাক্ষিণাত্যে ঐ জাতীয় বিবাহ আচারসিদ্ধ আছে বিধায়ই, হস্তিনাদেশ তাহার বিপ্রকৃষ্ট অন্তর হইলেও কৃষ্ণার্জ্জুন তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সকলের প্রীতিকর হইবে না বলিয়াই, যেন মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র—"দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থে দ্বাদশ পুত্রপ্রকরণে ঐ জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—

"হন্ত তর্হি যুধিষ্ঠিরঃ কথমশ্বমেধমকরোৎ, ন হি স কন্যাপ্যৌরসঃ,
কুন্তী বা কথং ত্রীন্ পুত্রান্ উপাত্তবতীতি।

অর্থ—হায়! যুধিষ্ঠির কিরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন? অশ্বমেধ যজ্ঞ ঔরস পুত্রেরই কর্ত্তব্য, ক্ষেত্রজ পুত্রের কর্ত্তব্য নহে যুধিষ্ঠির ত পাণ্ডুর ঔরস পুত্র নহেন।

আর কুন্তীরই বা নিয়োগ বিধির এক পুত্র উৎপাদনের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমে তিনটী পুত্র কিরূপে লাভ করিলেন?

ইহার উত্তরে কহিলেন,—

"চেৎ তে হি দেবকল্পাস্তেন ন তেষামাচারঃ পুরস্করণীয়ো ন বা তিরস্করণীয়ঃ।

তদুক্তং— 'কৃতানি যানি কর্ম্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।

নাচরেত্তানি ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ॥'

অর্থ—উক্ত প্রশ্ন ঠিক বটে, তাহার সিদ্ধান্ত এই যে,—যুধিষ্ঠির ও কুন্তী প্রভৃতি দেবতুল্য লোক, অতএব তাঁহাদের আচরণের তিরস্কার বা পুরস্কার করা উচিত নহে।

ইহা অপর ঋষিরাও কহিয়াছেন যে,—দেবতা ও মুনিগণ যে কর্ম্ম করেন, ধার্ম্মিক লোক তাহা করিবেন না, এবং ঐরূপ বিরুদ্ধ কর্ম্ম শুনিয়া দেবতা ও মুনিজনের নিন্দাও করিবে না।

এখন উক্তরূপ বাচস্পতি মিশ্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা আমরা এইরূপ বুঝিলাম যে,—

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা",—সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশনের যেমন অমেধ্য বস্তু ভোগ দোষের নহে, সেরূপ তেজস্বী লোকের পক্ষে উহা দোষাবহ নহে।

তেজস্বী অর্থে—যাঁহাদের সত্ত্বানল প্রদীপ্ত, সত্ত্বগুণ যাঁহাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাঁহাদের ঐরূপ দুষ্ক্রিয়া অর্থাৎ ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ করা, কুন্তীর সন্তানত্রয় উৎপাদন করা, অর্জ্জুনের মাতুল ভগিনী বিবাহ করা, ভীমের রাক্ষসী বিবাহ করা দুষ্য নহে। কেন না তাঁহারা দেবতুল্য লোক। দেবতারা সত্ত্বগুণ-প্রধান, ঐরূপ দুই একটা বিরুদ্ধ কর্ম্ম তাঁহাদের সত্ত্বানলে দগ্ধ হইয়া যায়।

মহর্ষি বশিষ্ঠের মত লোকে যদি দুই একটা "বৎসতরীং মড়মড়ায়তে" করে, তাহাতে তাঁহার প্রদীপ্ত সত্ত্বানলের কি হয়?। মহাত্মা ৺ তৈলঙ্গ স্বামী হাড়ী ডোম প্রভৃতির প্রদত্ত অন্নগ্রাস ভক্ষণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার কি হইয়াছিল? আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও ত তাঁহার পদতলে পড়িয়া কৃতার্থম্মন্য হইতাম।

কিন্তু আমরা নিস্তেজ নিঃসত্ত্ব হইয়া যদি ঐরূপ শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্য করি, তবে আমাদের দৈহিক মানসিক দুর্গতির আর অবধি থাকে না। কেননা, আমরা সামান্য সাত্ত্বিক আহারে, সামান্য জপ তপস্যায় কায়ক্লেশে যে কিছু বিন্দু বিন্দু সত্ত্ব সঞ্চয় করিয়াছি, ঐরূপ দুষ্ক্রিয়া করিলে হঠাৎ সেই সত্ত্বটুকু লুপ্ত হইয়া গেলে, আর তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

পরন্তু উক্তরূপ দুষ্ক্রিয়ার ফলে রজস্তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া পশুপ্রকৃতি হওয়াই সম্ভব। তাই লোকে কথায় বলে—

"দেবলোকে যত করে সব লীলা খেলা,
যত কিছু পাপ কেবল মানুষের বেলা।" *

শুধু লোকে কেন? বেদব্যাস ও তেজীয়ান্ বলীয়ান্ বড় লোকদের সম্বন্ধে লেখনী সঙ্কোচ করিয়া বলিয়াছেন যে, ধনী বড়লোকের সম্বন্ধে পাপ পুণ্য বিচারের বড় কঠোরতা নাই। বড়লোক যাহা করে তাহাই ধর্ম্ম, তৎসমস্তই পবিত্র, কেননা তাহাদের উপরে ত আর কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে না! যথা—

"সর্ব্বং বলবতাং পথ্যং সর্ব্বং বলবতাং শুচিং।
সর্ব্বং বলবতাং ধর্ম্মঃ, সর্ব্বং বলবতাং স্বকং॥"

(মহাভাঃ, আশ্রমঃ, ৩০।২৪)

অর্থ—বড়লোকের আবার খাদ্যাখাদ্যের বিচার কি? তাহারা যে কিছু আহার করে সকলই পথ্য—হিতকর, বড়লোকের সকলই পবিত্র, বড়লোক যাহা করে, সকলই ধর্ম্মকর্ম্ম, এবং জগতে দুর্ব্বলের যে কিছু ধন-সম্পত্তি থাকুক না কেন, তৎসমুদয়ই বলিষ্ঠের নিজের ধন।

অতএব কৃষ্ণার্জ্জুনের ঐরূপ গর্হিতাচরণ ধর্ত্তব্যই নহে। আর ভীমেরই বা কি? পবননন্দন ভীম ত সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ, তারপর আকৃতিতে, আহারে, বলে ও বুদ্ধিতেও রাক্ষস হইতে কোন মতেই ন্যূন নহেন, সুতরাং বিলক্ষণ যোটক মিল ছিল, তাই হিড়িম্বার পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন।

এখনও সমাজে প্রবলের জয়জয়কার বিরল নহে। অধিক দিনের কথা

* "নরের বেলা পাপ লিখে চিত্রগুপ্ত শালা।"
(পাঠান্তর)

নহে—এই কলির অন্ত হইতে সহস্র বৎসরের মধ্যে মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন যৌবনের প্রথমাবস্থায় প্রথমে অন্ত্যজাতি চণ্ডাল কন্যা, তৎপরে নটীকন্যা, তাহার কয় বৎসর পরে আবার বিক্রমপুর ধলেশ্বরীর তীরোত্থানে কোরি নামক চর্ম্মকার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। (*) তেমন গুণধর রাজাই ত আবার পবিত্র কৌলিন্য স্থাপন, দানসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সমাজের নেতা ছিলেন ? সেই জন্যই বলা হইল বড়লোকের কিছুতেই দোষ হয় না।

ফলতঃ সমাজে বড়লোকের কিছু হউক বা না হউক, কিন্তু পরলোকে যমদূতের লগুড়াঘাত লাভ হইবেই, এবং ঐ জাতীয় দূষিত কন্যার পরিণয়ে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা কখনই সম্যগ্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। কেননা, উক্ত বল্লালসেনেরই ঐ চামারীর গর্ভজাত পশুপ্রকৃতি পুত্র মাতার প্রতি জাতানুরাগ হইয়াছিল। (১)

এজন্যই ঋষিগণ বিবাহ সম্বন্ধে লোকহিতার্থে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে মানিয়া চলা উচিত। তাহা না মানিয়া যথেচ্ছাচার বিবাহ করিলে—যুবতী-বিবাহ, বিধবা-সংগ্রহ, সগোত্রা ও সপ্রবরা বিবাহ সংসর্গ করিলে সংক্রামিত বিষদোষে নিশ্চয়ই আমরা অকালে জরাজীর্ণ হইয়া অসুখ অশান্তিতে কালকবলে পতিত হইব।

(*) "অসেবি চণ্ডাল কন্যা রাজ্ঞা দ্বাদশ বার্ষিকী
নটীকন্যা চ সিদ্ধ্যর্থং পাষণ্ডমতবর্ত্তিনা ॥"
(বল্লাল চরিত, উত্তরখণ্ড, ১ অধ্যায়)

"আচক্ষ্ব মৈবমবনীশ্বর মাং কুমারীং
বংশঃ ক তে বিধুভবঃ ক চ সন্তবো মে।
চর্ম্মার-কোরিতনয়া বিদিতাস্মি লোকে,
জানীহি নাস্মি ভবতা পরিণেতুমর্হা ॥"
"চর্ম্মার্য্যা ঈদৃশং রূপং কিং স্যাদ্ভুবনমোহনং"
(বল্লালচরিত উত্তরং, ৩ অধ্যায়)

(১) "মাতরং যঃ কাময়তে দুরাত্মা মাং পতিব্রতাং।"
(বল্লালচরিত, ৪ অধ্যায়)

বর্ত্তমানে ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। আর সেই দুষ্ট বিবাহোৎপন্ন সন্তানও নানা দোষে আক্রান্ত হইয়া সমাজের অধঃপতন সাধন করিবে।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উক্ত প্রবন্ধে যত কিছু দোষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই যে "সংসর্গে" ঘটিয়া থাকে, সেই সংসর্গ কি ? তাহার শক্তি বা দোষগুণই বা কিরূপে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি ? তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

কথা সত্য, এজন্য "হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞানের" মতে অদ্য আমরা "সংসর্গ মাহাত্ম্য" বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যথা—

"সংসর্গমাহাত্ম্য" (*)

সংসর্গমাহাত্ম্য বুঝাইবার অগ্রে পাঠক মহোদয়দিগকে একটী প্রাচীন প্রসঙ্গ শ্রবণ করাইতেছি,—

কোনও এক পথিক প্রান্তরে প্রবল বাত্যা ও বৃষ্টিতে উৎপীড়িত হইয়া লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতেছিল। পথের অনতিদূরে এক গৃহস্থের গৃহ দর্শন করিয়া প্রাণরক্ষার্থ তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল, বাহিরের ঘরে কেহ নাই। পথিক গৃহের বস্তু সামগ্রী দেখিয়া বোধ করিল, উহা চর্ম্মকারের গৃহ, তথাপি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিল।

গৃহকোণে পিঞ্জরবদ্ধ একটী শুকপক্ষী ছিল। পক্ষীটী পথিককে দেখিবা-মাত্র চক্ষু আরক্ত ও ঘূর্ণিত করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "কেরে শালা তুই ? দূর হ, শালা, তুই চোর, দূর হ।" পথিক রুক্ষ স্বভাব ব্রাহ্মণ, সুতরাং সে পক্ষীর কটূক্তিও সহিতে পারিল না, এবং তথায় মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

তৎপরে যাইতে যাইতে অনতিদূরে আর একখানি পর্ণকুটীর দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। তখনি পথিক শ্রুতিমধুর সম্ভাষণ শুনিতে পাইল—"আহা মহাশয় ! আসুন আসুন, উঃ আপনার বড় ক্লেশ হইয়াছে, এই কম্বলাসনে উপবেশন করুন, আহা কতই কষ্ট পাইয়াছেন।"

(*) যদিও মৎপ্রণীত "সংস্কৃত চন্দ্রিকায়" ও "বিজ্ঞানকুসুম" গ্রন্থে "সংসর্গ শক্তি" কথঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এস্থানে ততোঽধিক বলিবার ইচ্ছায় পুনরুত্থান করিতেছি।

পথিক সেই অমৃতায়মান বচন শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, এবং দেখিল, ঐরূপ আর একটী শুকপক্ষী পথিককে মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছে।

পথিক তদ্দর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে শুক! আমি আজি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। দেখিতেছি তোমাদের দুইটী পক্ষীরই এক আকৃতি, কিন্তু প্রকৃতি অত্যন্ত বিসদৃশ। সেই চর্ম্মকারের গৃহস্থিত পক্ষীই বা আমাকে কেন বিনা কারণে তিরস্কার করিল? আর তুমিই বা কেন কোমল মধুর সম্ভাষণে আমাকে অমৃতাভিষিক্ত করিতেছ? ইহার কারণ কি?

তখন শুক পথিকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া সংস্কৃত বাক্যে কহিল—

"মাতাপ্যেকো পিতাপ্যেকো মম তস্য চ পক্ষিণঃ।
অহং মুনিভিরানীতঃ স চ নীতো গবাশনৈঃ॥
অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি, গবাশনানাং স শৃণোতি বাক্যং।
ন তস্য দোষো ন চ মে গুণো বা সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥"

অর্থ—(হে পথিক!) আমারও সেই চর্ম্মকার গৃহস্থিত পক্ষীর মাতা ও পিতা একই; কিন্তু দৈবপ্রযুক্ত আমাকে মুনিরা আনিয়াছেন, আর তাহাকে চর্ম্মকারেরা লইয়াছে সে পক্ষী সতত চর্ম্মকারগণের কথোপকথনই শুনিয়া থাকে। ইহাতে আমারও গুণ মনে করিবেন না, এবং সেই পক্ষীটীরও দোষ মনে করিবেন না। কেননা, দোষ ও গুণ যাহার যেমন সংসর্গ তদনুরূপই হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

জীবের স্বাধীনতা বা অদৃষ্টবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"যাহা হউক, আর আপনার অনুমানের দোষ দেখাইতে চাহি না। যে দিক দিয়া কেন দেখা যাউক না, কোন দিক হইতেই আপনার অনুমানকে দোষনির্ম্মুক্ত বলিয়া অবধারণ করিতে পারা যায় না। বুঝিয়াছি, আপনি বুদ্ধিমানের অগ্রগণ্য, বুঝিয়াছিলেন যে, অনুমানবলে আপনি দেহাত্মবাদ প্রমাণিত করিতে পারিবেন না; এই জন্যই প্রথমে অনুমান খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাতেও আপনার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার অনুমানে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং অনুমান খণ্ডন পূর্ব্বক দেহাত্মবাদের সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিমান্‌দিগের সমাজে আপনার বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের আনয়ন করিয়াছেন। আপনি দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার। বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের মধ্যে বৃহস্পতি একজন অগ্রগণ্য। তাঁহার অবতার হইয়া দেহাত্মবাদের অবতারণা করিয়া, নাস্তিক্য মতের সৃষ্টি করিয়া যে, কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিলেন, বুঝি না। শুনিয়াছি, অসুরমোহনের নিমিত্ত নাস্তিক্য মতের সৃষ্টি। "নগরদাহেতে দেবালয় কি অব্যাহতি পায়?" আপনার বিরচিত সূত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক দেবোপম সাধু-চরিত্রেরও মতিভ্রম ঘটিয়াছে। সংসার-মুগ্ধ বিমূঢ়-চিত্ত অসুরের আবার মোহ কি? তাহারা ত চিরকালই মোহনিদ্রার আশ্রয় লইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কাহার জন্য এই নাস্তিক্য মতের অবতারণা; বুঝিলাম না।" উদয়নের এই সমস্ত কথা শুনিয়া গঙ্গেশ বলিলেন, "দেখ উদয়ন, তুমি ঋষি কর্ত্তৃক চার্ব্বাকের স্তোত্র পাঠে নিয়োজিত হও নাই, তুমি চার্ব্বাক মত খণ্ডনে অনুজ্ঞাত। চার্ব্বাককে দেখিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার অবধারণ করিয়া ভীত হইয়া থাক, নিবৃত্ত হও, আমিই মহর্ষির অনুজ্ঞা প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হই।"

উদয়ন কহিলেন, "তুমি মিথিলাবাসী। মিথিলা প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে মানুষ স্বভাবতঃ উগ্র প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং তাহারা কথায় কথায় ক্রোধের বশীভূত হয়। বাঙ্গালী কোপনস্বভাববিশিষ্ট নহে; সুতরাং তাহারা ক্রোধের জয় করিতে অধিকতর সমর্থ। আমরা

আর্য্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ; সুতরাং গুণপক্ষপাতিতা আমাদিগের একান্ত সাধর্ম্ম্য। বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের মূলে, বেদের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। আর্য্য ঋষিগণ মহাশত্রু বুদ্ধের প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার নিজ বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত বুদ্ধিবিমোহনকারি মতের অবতারণা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার সেই প্রতিভার পূজা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে ভগবানের অবতারের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। বুদ্ধদেবের সেই নাস্তিক্য মত—সেই বেদ বিরুদ্ধ মত আর্য্য সমাজে গৃহীত হইল না; কিন্তু তাঁহার পূজা সমাজে প্রচারিত হইল। ভিন্ন দেশে ধর্ম্ম লইয়া পুনঃ পুনঃ নর শোণিতে বসুন্ধরা সিক্ত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে কখনও তাহা হয় নাই, হইবে না। ব্রাহ্মণ জাতি সভ্যতার আদর্শ, শিষ্টতা তাঁহাদিগের নিজস্ব। বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া সভ্যতার হস্ত হইতে, শিষ্টতার হস্ত হইতে, ভদ্রোচিত ব্যবহারের হস্ত হইতে, বিচ্যুত হইব কেন? শত্রুরও গুণের আদর করিব, শত্রুরও প্রতিভার পূজা করিব, যেহেতু আমি ব্রাহ্মণ। যাহা হউক, প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া, দেহাত্মবাদের সমালোচনা ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি আর অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরভাবে দেহাত্মবাদের সমালোচনা করিব। পূর্ব্ব প্রদর্শিত যুক্তি সমূহ দ্বারা দেহাত্মবাদের যুক্তিগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। আমরা জগতে দুইটি মাত্র পদার্থ দেখিতে পাই, একটি দেহ, অপরটি দেহ-ভিন্ন। দেহ আর আত্মা যদি অভিন্ন না হয়, এক না হয়, দেহও যাহা, আত্মাও তাহা, না হয়, তবে আত্মা দেহ-ভিন্ন না হইয়া আর কিছু হইতে পারে না; দেহ ও দেহভিন্ন ব্যতিরিক্ত আর পদার্থান্তর নাই।

এই অজস্র আলোকবিকীরণকারী আকাশরাজ্যের সম্রাট্ গ্রহপতি সূর্য্য, এই সুষমার আদর্শভূমি স্নিগ্ধ-কিরণ কুমুদবন্ধু চন্দ্র, এই হীরকপ্রদ্যোত স্বচ্ছজ্যোতিঃ অসংখ্য নক্ষত্রমালা, এই মুক্তামালা-ন্যক্কারি তরঙ্গসঙ্কুল জাহ্নবী, এই শ্বাপদভীষণ অরণ্যানী, এই মেঘ-চুম্বি-শৃঙ্গ-বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী; আর অধিক কি, দেহ ছাড়িয়া যাহা কিছু দেখিবেন, সমস্তই দেহভিন্ন। সমস্তের উপরেই দেহের ভেদ রহিয়াছে। এই জন্যই বলিতেছিলাম, দেহ ও দেহভিন্ন ব্যতীত অন্য পদার্থ নাই। আত্মা দেহ না হইলেই দেহ-ভিন্ন

হইবে। আপনি যখন দেহ ও আত্মা এক প্রমাণ করিতে পারিলেন না, তখনই দেহভিন্ন আত্মা একরূপ প্রমাণিত হইল। আপনি বলিতে পারেন; প্রমাণ না হইলেই যে সে পদার্থের সদ্ভাব নাই, এরূপ বলা যাইতে পারে না। দেহ ও আত্মা অভিন্ন আমি ইহা প্রমাণবলে প্রতিপন্ন করিতে পারিলাম না, নাই পারিলাম, তাই বলিয়াই যে আত্মা দেহভিন্ন ইহার প্রমাণ কি? আত্মা দেহ নয়, আমি যদি ইহা প্রমাণিত করিতে পারি, তাহা হইলে ত আপনি আত্মা দেহভিন্ন স্বীকার করিবেন। আজ আমি আপনাকে স্পষ্টতঃ দেখাইব, আত্মা দেহ হইতে পারে না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, একটি দ্রব্যে (matter) একটি গুণ (property) উৎপন্ন হইল; সেই গুণ সেই দ্রব্যেই থাকিবে, না অন্য দ্রব্যেও সেই গুণ যাইতে পারে? অন্য দ্রব্যেও অন্য দ্রব্যের গুণ যায়; ইহার ত আমরা প্রমাণ পাই না। আপনি একটি গাঢ় নীল বর্ণের কাচপাত্রের নিকটে একটী শুভ্র কাচপাত্র যদি এক বৎসরের ঊর্দ্ধকালের জন্যও রাখিয়া দেন, তাহাহইলেও সেই দীর্ঘ সময়ের পরে দেখিবেন, কখনও কেহ কাহারও গুণ গ্রহণ করে নাই। শুভ্র শুভ্রই আছে, নীল কাচপাত্র নীলই আছে। যেখানে একের গুণ অপরে গ্রহণ করে দেখা যায়, নিবিষ্ট চিত্তে দেখিবেন, সে কিছুই নহে, গুণ গ্রহণ করে নাই, যাহার গুণ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন; তাহার শুদ্ধ গুণ গুণগ্রহীতা দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে না। গুণ যাহাতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অবয়বের কিয়দংশ আসিয়া গুণগ্রহীতা দ্রব্যে মিশিয়াছে। আমরা অনেক সময়ে বস্ত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া থাকি। রঞ্জিত করা আর কিছুই নয়, সেই সেই বর্ণের চূর্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া মাত্র। যে দ্রব্যে পরমাণুর গাঢ় সংযোগ থাকে, তাহা হইতে সহসা পরমাণু, দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু বা ঈদৃশ অন্য সূক্ষ্মাবয়ব বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অন্য দ্রব্যেও যাইয়া সেই সূক্ষ্মাবয়ব সংযুক্ত হয় না বলিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের গুণ পরোক্ত দ্রব্যে সংক্রান্ত হয় না। যেমন কাচপাত্রদ্বয়। আবার যাহাতে অবয়বের শিথিল সংযোগ আছে, সেই দ্রব্য হইতে তাহার নিকটবর্ত্তী দ্রব্যে অনায়াসেই তাহার সূক্ষ্মাবয়বগুলি যাইয়া সংক্রান্ত হয়। এই অবয়ব সংক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে সেই গুণসংক্রম হয়। এই রূপেই আমরা দূরবর্ত্তী হইয়াও সমীরণের প্রসাদে

সুরভি কুসুমের সৌরভ উপভোগে সমর্থ হই। এই রূপেই আমরা আতপতাপে সন্তপ্ত হইয়া স্রোতস্বিনীর তীরভূমিকে আশ্রয় করিলে তাহার শীতস্পর্শ অনুভব করি। এইরূপেই আমরা অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইয়া জ্বলন্ত বহ্নির নিকটে উপস্থিত হইলে, তাহার উষ্ণতা শরীরে অনুভব করি। চারুদত্তের জাতি-পুষ্প-বাসিত প্রাবারেরও এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে। "বাসনা সংক্রম" বলিয়া বৌদ্ধ-দর্শনে যে একটি কথা আছে; সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে তাহার মূলে কিছুই নাই, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। ফলকথা গুণ দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না।

রামেশ্বর ন্যায়বাগীশ সেকালে একজন বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রাঙ্গণে বসিয়া ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতেছেন; আর বলিতেছেন, 'গুণ কখনই দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না।' তাঁহার পত্নী হৈমবতী দেবী সেই প্রাঙ্গণের অদূরে রন্ধনশালায় রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। ন্যায়বাগী-শের সেই "গুণ কখনই দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না", এই কথা যখন হৈমবতীর কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল, হৈমবতী তখন "ডাল্ সম্বরা" (দ্বিদল সম্ভার *) দিতেছিলেন; হৈমবতী উত্তপ্ত কটাহের উত্তপ্ত তৈলে কতক গুলি লঙ্কা নিক্ষেপ করিলেন। আর কোথায় যায়, পণ্ডিতের নাসারন্ধ্রে লঙ্কার "ঝাঁজ" প্রবিষ্ট হইল। পণ্ডিত ও ছাত্রের "হাঁচিতে হাঁচিতে" প্রাণান্ত। পণ্ডিত কহিলেন, "ও ব্রাহ্মণি, করিলে কি, আমাদিগের যে আর হাঁচির শেষ হয়না।" হৈমবতী বলিলেন, "দ্রব্য ছাড়িয়া গুণ অন্যত্র যায় কিনা দেখাইলাম।" সেকালের নিরক্ষর নৈয়ায়িকপত্নী এরূপ বলিতে পারেন বটে। বুদ্ধিমান্ চার্ব্বাক, আপনি কখনও এরূপ বলিতে পারেন না।

জন্মাবধি অন্ত পর্য্যন্ত আপনার কি এক শরীর আছে? না ভিন্ন-ভিন্ন শরীর উৎপন্ন হইয়াছে? এক শরীর বলিতে পারিনা; কারণ বাল্যশরীরে যেমন কম-নীয়তা ছিল, যেমন কোমলতা ছিল, যেমন একটি নবভাব ছিল, যৌবনে তাহা নাই। যৌবনে আবার অন্য অন্য ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যৌবনে অন্যবিধ গুণসঞ্চার—গুণ সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্যের কমনীয়তা স্বতন্ত্র, যৌবনের কমনীয়তা স্বতন্ত্র। বাল্যকালের হস্ত, বাল্যকালের পদ, বাল্যকালের নাসিকা, বাল্যকালের চক্ষু, বাল্যকালের ওষ্ঠাধর বাল্যকালেরই

* 'সম্বরা' দেওয়ার বৈদিক সংস্কৃতশব্দ=আঘার। স সং।

শোভাবর্দ্ধন করে, যৌবনের করেনা। আবার যৌবনের হস্তপদ প্রভৃতি বাল্যকালের শোভাবর্দ্ধন করেনা, যৌবনের শোভা বর্দ্ধন করে। আবার বার্দ্ধক্যের দেহে বাল্য যৌবনের কোনই গুণ দেখিতে পাওয়া যায়না; তাহাতে স্বতন্ত্র গুণ উৎপন্ন হইয়াছে। বৃদ্ধের দেহাবয়ব বালক ও যুবকের দেহাবয়ব হইতে যে স্বতন্ত্র, স্পষ্টতঃ তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাল্যকালে যাঁহাকে দেখিয়াছি, যৌবনে তাহাকে দেখিলে কখনই চিনিতে পারিনা; কারণ কি? কারণ বাল্যের শরীর যৌবনে নাই, যৌবনের শরীর ত আমি কখনও দেখি নাই; সুতরাং কি করিয়া তাহাকে চিনিব। অবয়ব স্বতন্ত্র হইলে তাহার অবয়বীকেও স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হইবে। হস্ত পদ প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইলে যাহার এই হস্তপদ প্রভৃতি সে দেহকেও স্বতন্ত্র বলিতে হইবে।

বাল্য শরীর হইতে যৌবন শরীর পৃথক্; যৌবন শরীর হইতে বার্দ্ধক্যের শরীর পৃথক্। আমার এইকথা শুনিয়া চার্ব্বাক, আপনি তীব্র ও ক্রোধোদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছেন কেন? আপনার এই "কট মটি চাউনি" (রোষ-কষায়িত দৃষ্টি) দেখিয়া এইরূপ দুই ব্যক্তির "কট মটি চাঁউনির" কথা মনে পড়িল। তাহা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কোন এক উচ্ছৃঙ্খল ধনাঢ্য যুবক কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পারিষদ লইয়া গঙ্গার বক্ষে নৌকারোহণে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। (বাচ খেলাইতে ছিলেন।) মধ্যাহ্ন-ভোজন পলান্নপ্রভৃতি পিপাসাবর্দ্ধক ভোজ্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই, সেই যুবক ধনীর জল তৃষ্ণা উপস্থিত হইল। একে পিপাসা, তাহাতে আবার যাহার জন্য পিপাসা, সেই পবিত্র নির্ম্মল জল তরঙ্গহিল্লোলে ঢল ঢল করিতেছে। ধনী একজন পারিষদকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই জল উঠাইয়া আমাকে দাও", আমি পান করিব।" বুদ্ধিমান্ পারিষদ উত্তরে বলিল, "আমি কোনও ক্রমে আপনার নির্দ্দিষ্ট জল উঠাইতে পারিব না।" ধনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি জান, আমি কে, তুমি কাহার কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছ?" পারিষদ বলিলেন, "আমি জানি, আমি ভৃত্য, আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার কথায় অবজ্ঞা করি নাই। আমি কেন, আপনার সেই জল আপনি বা অন্য কেহই উঠাইতে পারিবেন না। আপনি

যে জল দেখাইতেছিলেন, সে জল আর এস্থলে নাই, স্রোতে তাহা বহুদূর চলিয়া গিয়াছে।” ধনী শুনিয়া ক্রোধে বিচারশক্তিশূন্য হইয়া পারিষদকে তীব্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

সুবোধচন্দ্রকে পরিবেশন করিতেছেন,—তাহার মাতামহী হরসুন্দরী। তাঁহার পরিবেশিত সমস্ত পায়সান্নটুকু সুবোধচন্দ্র আহার করিয়াছে। আবার হরসুন্দরী তাহাকে পায়সান্ন প্রদান করিলেন। সুবোধচন্দ্র বলিল “এ পায়স ভাল হয় নাই “পান্‌সে্‌” হইয়াছে।” হরসুন্দরী বলিলেন; “তুমি যে পায়স খাইয়াছ, এ সেই পায়স্‌।” সুবোধচন্দ্র বলিল, “সেকি দিদিমা, আমি যাহা খাইয়াছি, তাহা আপনি পাইলেন কি করিয়া? সে পায়স ত আমার পেটের ভিতরে, এ পায়স সে পায়স হইতে পারে না।” সত্যসত্য সেই পায়স দিয়াছেন বলিয়া হর সুন্দরীর বিশ্বাস, অথচ ছেলেটা স্বীকার করেনা। সুতরাং হর সুন্দরী ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া “গরগর” করিতে করিতে “কট মট” ভাবে সুবোধকে দেখিতে লাগিলেন।

নিরক্ষর ধনী না বুঝিয়া, নিরক্ষর স্ত্রী হরসুন্দরী না বুঝিয়া ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। চার্ব্বাক আপনি সূক্ষ্মবুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইয়া, মহাপ্রতিভাশালী বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়া আমার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন কেন? বুঝি না। এ ক্রোধ-তীব্র-দৃষ্টি নিক্ষেপের অর্থ কি? বুঝাইয়া দিউন। আপনার হস্তে যে একটি যষ্টি দেখিতেছি, বোধ হয় উহা দ্বিহস্ত পরিমিত। ঐ পরিমাণের নাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, কি করা কর্ত্তব্য। বোধ হয়, ঐ যষ্টিকে ছিন্ন না করিলে, ভগ্ন না করিলে, কিয়দংশ দগ্ধ বা ঘৃষ্ট না করিলে সেই পরিমাণের বিনাশ করিতে পারা যায় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাহার পরিমাণ, সেই দ্রব্যের ধ্বংস না হইলে পরিমাণের ধ্বংস হয় না। পরিমাণের হ্রাসে যেমন পূর্ব্ব পরিমাণের ধ্বংস হয়; পরিমাণের বৃদ্ধিতেও তেমনি পূর্ব্বপরিমাণের ধ্বংস হয়। বাল্য শরীরে যে পরিমাণ থাকে, যৌবনে সেই পরিমাণের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং সে পরিমাণ থাকে না। বার্দ্ধক্যে আবার যৌবন শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা শরীরে পরিমাণের হ্রাস হয়। আশ্রয়ের নাশ ভিন্ন যখন পরিমাণের নাশ হয়না স্থির সিদ্ধান্ত; তখন বুঝিতে হইবে, বাল্য শরীরের নাশ হইয়া সেই পরিমাণের নাশ হইয়াছে। আবার যৌবন শরীরের নাশ হইয়া তাহার সেই পরিমাণের

নাশ হইয়াছে। এই জন্যই বলিতেছিলাম, বাল্যশরীর অপেক্ষা যৌবন শরীর পৃথক, যৌবন শরীর অপেক্ষা বার্দ্ধক্য শরীর পৃথক। শরীরই যদি আত্মা হয়; তবে বাল্য শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মার নাশ হইয়াছে, যৌবনে আর সে আত্মা নাই। আবার যৌবন শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে এ দ্বিতীয় আত্মারও নাশ হইয়াছে। বার্দ্ধক্যে আর সে দ্বিতীয় আত্মাও নাই। আবার তৃতীয় আত্মা উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মা যদি শরীরে রাসায়নিক সংযোগ বশতঃ আগন্তুক গুণের ন্যায় নূতন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাহইলেও বলিতে হইবে, অন্যান্য গুণের ন্যায় শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নাশ হয়। কিন্তু আপনি “চৈতন্য শরীরে উৎপন্ন হয়” বলিয়াছেন, “চেতন নূতন উৎপন্ন হয়,” বলেন নাই। সুতরাং ‘শরীরে আত্মা উৎপন্ন হয়”, আপনার মত নহে। “শরীরই আত্মা” আপনার মত। চৈতন্য চেতনের ধর্ম্ম, চেতনেরই নামান্তর আত্মা। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি কোন একটি বস্তু দর্শন করিয়াছে; কালান্তরে তাহারই সে বস্তু স্মরণ হয়, না সেই দর্শনে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক দর্শনে আর একব্যক্তিরও সেই বস্তু-স্মৃতি হয়। যদি বলেন, অন্যের কি করিয়া স্মরণ হইবে? যে দর্শন করিয়াছে, তাহার সেই বস্তু দর্শনজন্য একটি সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কারই কালান্তরে স্মরণের কারণ। সুতরাং একের দর্শনে অন্যের স্মরণ হয় না। কারণ, দর্শন ভিন্ন সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ভিন্ন স্মরণ হয়না।

এ বিষয়ে যখন আপনি আমার সহিত একমত; তখন বোধ করি আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাল্যে যাহা দেখিয়াছি, তাহা যৌবনে, বা যৌবনে যাহা দেখিয়াছি বার্দ্ধক্যে কি করিয়া তাহা স্মরণ করি? কারণ, বাল্যে আমি, যে আমি ছিলাম, যৌবনে আর আমি সে আমি নই। বার্দ্ধক্যে আবার আমি বাল্যের বা যৌবনের আমি নই। বাল্যের আমি স্বতন্ত্র, যৌবনের আমি স্বতন্ত্র, বার্দ্ধক্যের আমি স্বতন্ত্র। বাল্যের স্বতন্ত্র “আমি” দর্শন করিল, যৌবনের বা বার্দ্ধক্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আমি কি করিয়া তাহা স্মরণ করি? বাল্যে বাঙ্গালা, ইংরাজি ও সংস্কৃত বহুকষ্টে শিখিয়াছি। আপনার মতে শরীরকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে যৌবনে তাহার বিন্দুবিসর্গ কিছুরই স্মরণ হইতে পারে না। আপনার পার্শ্ববর্ত্তী মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধগণ ঈষদ্ধাস্যের

সহিত আমার উপরে ভ্রূক্ষেপ করিয়া মৃদুমন্দভাবে "বাসনা-সংক্রম" এই বাক্যের উচ্চারণ করিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্বে এতৎ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিলেও এক্ষণে পুনরায় কিছু বলা কর্ত্তব্য হইতেছে। "বাসনাসংক্রমের" উদাহরণ কোথায়? উদাহরণ—মৃগমদ-বাসিত বস্ত্র। একখানি বস্ত্রে যদি কিঞ্চিৎ কস্তূরী বদ্ধ করিয়া রাখা যায়; কিয়ৎকাল পরে সেই কস্তূরীকে পৃথক করিলেও সেই বস্ত্রে সেই কস্তূরীর ন্যায় সদ্গন্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং বলা আবশ্যক, দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে গুণের সংক্রম হয়। বাল্য শরীরে উৎপন্ন সংস্কারও সেইরূপ যৌবন শরীর পৃথক হইলেও তাহাতে সংক্রান্ত হয়। আমি ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিতেছি যে, যাহাতে উৎপন্ন গুণ তাহাকে (সেই দ্রব্যকে) পরিত্যাগ করিয়া কখনই অন্যত্র যায় না। মৃগমদ-বাসিত বস্ত্রে মৃগমদের কতকগুলি অবয়ব, কতকগুলি অংশ, মিলিত হইয়াছে। সেইজন্য আমরা তাহাতে ঐরূপ গন্ধ পাই। অবশ্য স্বীকার করি, বাল্য শরীরের কতকগুলি অবয়ব আসিয়া যৌবন-শরীরের উৎপাদন করিয়াছে; তাই বলিয়া বাল্য শরীরের সমস্ত গুণগুলি যৌবন-শরীরে আসিতে পারে না। অগ্নি-সংসর্গে যে রূপের (colour) উৎপত্তি হয়; তদ্‌ভিন্নরূপ এবং এইরূপের ন্যায় আরও কতকগুলি গুণ সমবায়ি-কারণে (যাহা কার্য্যে নিয়ত সম্বদ্ধ) থাকিলে কার্য্যে তজ্জাতীয় গুণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু জ্ঞান, সংস্কার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, যত্ন, দ্বেষ প্রভৃতি কতকগুলি গুণ আবার এজাতীয় গুণ নয়। ইহারা উৎপন্ন হইবার জন্য কারণ গুণের অপেক্ষা করে না। অপাকজরূপ (অগ্নিসংযোগ ভিন্ন উৎপন্নরূপ) উৎপন্ন হইবার জন্য সমবায়ি-কারণের রূপের অপেক্ষা করে। সমবায়ি-কারণে শুক্লরূপ থাকিলে কার্য্যেও শুক্লরূপ হয়, সমবায়ি-কারণে কৃষ্ণরূপ থাকিলে কার্য্যেও কৃষ্ণরূপ হয়। সমবায়ি-কারণে শুক্লরূপ না থাকিলে কার্য্যে শুক্লরূপ হয় না, সমবায়ি-কারণে কৃষ্ণরূপ না থাকিলে কার্য্যে কৃষ্ণরূপ হয় না। জ্ঞান, সংস্কার প্রভৃতি গুণে এইরূপ কার্য্য কারণ ভাবের স্বীকার করা একান্ত অকর্ত্তব্য।

মানিলাম, শরীরই আত্মা, মানিলাম, যৌবন-শরীরের সমবায়ি-কারণ বাল্য শরীরের অবয়ব। আবার মানিলাম, সেই বাল্য শরীরাবয়বে উৎপন্ন সংস্কার প্রভৃতি অপাকজ-রূপের ন্যায় যৌবন-শরীরীয়-সংস্কার প্রভৃতির

উৎপাদক (অসমবায়ি-কারণ)। কিন্তু আমি—এই শরীরাত্মক আমি—প্রথম যখন একটি বস্তু দর্শন করি, তখন আমাতে—এই শরীরাত্মক আমাতে—এই বস্তুর কোন সংস্কার ছিল না। এইরূপ প্রথম-দর্শনে আমাতে এই বস্তুর কোন জ্ঞানও ছিল না,। এইরূপ সুখজনক বস্তুর দর্শন স্পর্শন প্রভৃতির পূর্ব্বেও আমাতে তজ্জন্য সুখেরও উৎপত্তি হয় নাই। এই সকল গুণে কারণগুণ-পূর্ব্বকত্ব স্বীকার করিলে যে স্থলে কারণ গুণের সদ্ভাব নাই, সে স্থলে সংস্কার প্রভৃতির উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং এই এই স্থলেও বস্তুর প্রথম দর্শনেও সংস্কার, জ্ঞান, সুখ জন্মিতে পারে না। কারণ, তৎপূর্ব্বে সেই শরীরের কারণ-শরীরে সংস্কার, জ্ঞান, সুখ ছিল না। একখণ্ড বস্ত্রে যেমন কিয়ৎক্ষণমাত্র কিঞ্চিৎ কস্তূরী বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাতে সদ্গন্ধের উৎপত্তি হয়; সেইরূপ যদি সংস্কার প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি হইত; তাহা হইলে আর বিদ্যাভ্যাসের জন্য এরূপ পরিশ্রম করিতে হইত না। একজন মহাপণ্ডিতের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া একখণ্ড প্রাবারবস্ত্রে উভয়ে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। দুঃখের বিষয়! কিয়দ্দিন কেন? শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত যদি শিক্ষা ব্যতিরিক্ত পণ্ডিতের সহিত এক শয্যায় শয়ন করা যায়; তাহা হইলেও শিক্ষিত হওয়া যায় না। পিতা মাতার শুক্র শোণিতে তএই দেহের উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং পিতা যাহা দেখিয়াছেন, মাতা যাহা দেখিয়াছেন, আমাদিগেরও সেই সেই বিষয়ের স্মরণ হউক। পিতা মাতাতে অবশ্য তজ্জন্য সংস্কার জন্মিয়াছে, সুতরাং সেই সংস্কার আমাদিগেতে—দেহাত্মক আমাদিগেতে—সংক্রান্ত স্মরণের উৎপাদক হউক। আশ্চর্য্যের বিষয়, পিতা বা মাতার যদি কুষ্ঠ, উপদংশ বা যক্ষ্মরোগ থাকে, পুত্রে ও সেইপীড়া সংক্রান্ত হয়, অর্থাৎ সেই সেই রোগ পুত্রের দেহেতেও সেইসকল রোগের উৎপাদন করে। কিন্তু পিতা মাতার সংস্কার পুত্রের স্মরণের বা সংস্কারের কারণ হয় না ঈদৃশ রোগীর নিকটে থাকিলে সংক্রামকতা-গুণে সেই সকল রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতের নিকটে থাকিলে পণ্ডিত হওয়া যায়না। পূর্ব্ব-শরীরাবয়ব পরশরীরের কারণ বলিয়া সেই সেই অবয়বের গুণ পরশরীরে সেইরূপ গুণের উৎপাদন করে সত্য; কিন্তু সেই সেই অবয়বের যে যে অংশে সেই গুণ থাকে, পরশরীরেরও সেই অবয়বের

সেই অংশে সেই গুণ জন্মে, অন্যত্র হয় না। যেমন বাল্যকালের শরীরে যে অংশে যে চিহ্ন ছিল, যৌবনশরীরেরও ঠিক সেই অংশে সেই চিহ্ন দেখা যায়। জ্ঞান, সংস্কার, স্মরণ প্রভৃতি যদি দেহের গুণ হয়, তবে দেহাবয়ব যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতেই সংস্কার উৎপন্ন হওয়া উচিত, এবং স্মরণেরও অভ্যুদয় তাহাতেই হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও স্মরণের ব্যাঘাত হয় না। আমরা চক্ষুদ্বারা যাহা বিলোকন করিয়াছি, বিনা চক্ষুর সাহায্যেও আমরা তাহার স্মরণ করিয়া থাকি। বরং চক্ষু উন্মীলিত থাকিলে স্মরণের ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে আমরা চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া অবলোকিত বিষয়ের স্মরণ করি।

মহামনাঃ চার্ব্বাক, দেখিতেছি, আপনার দেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় শিষ্যই অধিক। তাঁহারা আবার মস্তিষ্কের কথা তুলিতেছেন; তাঁহারা বলিতেছেন; "চক্ষে বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, স্নায়বিক শক্তিবলে তজ্জন্য মস্তিষ্কে একটি ক্রিয়া হয়; সেই ক্রিয়াই জ্ঞানের উৎপাদক।" আমাদিগের সাংখ্যাচার্য্যেরাও "প্রতিবিম্ব দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়," বলেন। প্রতিবিম্ব দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয় বা না হয়, তৎ সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে চাহিনা। বাল্য শরীরে বিলোকিত বস্তুর যৌবনে স্মরণ হয় কি করিয়া, এই মাত্র আমার জিজ্ঞাস্য। মস্তিষ্কও ত শরীরের এক অংশ। সমস্ত শরীরের পরিবর্ত্তন হইলে মস্তিষ্কেরই বা কেন পরিবর্ত্তন হইবেনা? আপনার বিদেশীয় শিষ্য বৈজ্ঞানিকেরা ত "প্রত্যেক সাত বৎসর পরে একেবারে শরীরের পরিবর্ত্তন হয়", স্বীকার করেন, তাঁহারা আবার "সাত বৎসর পরে পূর্ব্বশরীরের একটিও পরমাণু পরশরীরে থাকেনা", বলেন। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বশরীরের মস্তিষ্ক পরশরীরে সংক্রান্ত হয়, এরূপ আশা করা একান্ত অসম্ভব।

অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই, মানুষ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট সমস্তই ভুলিয়া যায়। চিকিৎসাবলে বা সৌভাগ্যবলে আবার রোগমুক্ত হইলে, তাহার পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের বিকৃতিজন্যই ত উন্মাদ রোগের আবির্ভাব। রোগ-মুক্তির পরে নূতন মস্তিষ্কের সৃষ্টির পরে, কি করিয়া পূর্ব্ব-মস্তিষ্ক-প্রসূত-স্মৃতি আসিয়া নূতন মস্তিষ্কে সংক্রান্ত হয়? (১)

(১) বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন; বিকৃত মস্তিষ্কেরও ত আত্মার সত্ত্বা আছে। সংস্কার মস্তিষ্কে উৎপন্ন বা মস্তিষ্কের গুণ—স্বীকার না করিলে মস্তিষ্ক বিকারের সময়ে আত্মা সত্ত্বেও

জ্ঞান, স্মৃতি প্রভৃতি যে শরীরের নয়, এসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে, অবহিত চিত্তে যদি আমার কথা শ্রবণ করেন, বলিতে পারি। দ্রব্যের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুণের প্রত্যক্ষ হয়, এই নিয়ম। এই যে কাচপাত্রটি বিলোকন করিতেছেন,—সেই সঙ্গে তাহার গুণ শুক্লরূপ, পরিমাণ,—সংখ্যা প্রভৃতিও বিলোকিত হইতেছে। জ্ঞান, সংস্কার, স্মৃতি প্রভৃতি যদি শরীরের গুণ হইত, (২) তবে যখন আমি আপনার শরীর অবলোকন করিতেছি, তখনই আমি সেইসঙ্গে আপনার জ্ঞান, সংস্কার, স্মৃতি প্রভৃতিরও প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম। যখন তাহা পারিনা, তখন ঐ ঐ গুণ যে শরীরের নয়, ইহা অবধারিত। ইহার আশ্রয়স্বতন্ত্র আত্মা আছে—ইহা অবধারিত। পূর্ব্বে বলিয়াছিআশ্রয় দ্রব্যের নাশে পরিমাণ প্রভৃতি গুণের নাশ হয়। যখন আমার চক্ষের সহিত কোনও দ্রব্যের সম্বন্ধ হয়, (যে কোন প্রকারেই হউক) তখন তজ্জন্য সেইদ্রব্যের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানটি সংস্কারের উৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হয়। এইরূপ স্মরণও অধিক ক্ষণ থাকেনা, সুখও অধিক ক্ষণ থাকেনা, দুঃখও অধিক ক্ষণ থাকেনা। শরীর যদি আত্মা হইত, ঐ গুণগুলি যদি সেইরূপ শরীরের হইত, তাহা হইলে এ গুলিরও নাশের প্রতি সেই শরীরনাশ কারণ হইত। শরীরের নাশ হয় নাই, জ্ঞান প্রভৃতির নাশ হয় কি করিয়া? কারণ ভিন্ন কার্য্য হয়না। সাবয়ব দ্রব্যের নাশ তদ্গত গুণের নাশক, অর্থাৎ তদ্গত গুণ নাশের প্রতি কারণ। শরীর সাবয়ব, সুতরাং তাহার নাশই তদ্গত গুণের জ্ঞান প্রভৃতির নাশের প্রতি কারণ হওয়া উচিত। আবার জ্ঞান প্রভৃতি গুণগুলি যখন ক্ষণিক, অল্পক্ষণ স্থায়ী, তখন মূর্ত্তের গুণ নয়। শরীর যখন মূর্ত্ত তখন জ্ঞান প্রভৃতি তাহার গুণ হইতে পারেনা। মূর্ত্তগুণ মাত্রেই ক্ষণিক নয়, একবার বিবেক দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। (ক্রমশঃ।)

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

কেন স্মরণ হয়না? তাহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, তাঁহাদিগের মতে মস্তিষ্কেই ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সময়ে চক্ষুঃ সাহায্যের প্রয়োজন কি? যেমন কেবল মস্তিষ্ক বহিরিন্দ্রিয় ভিন্ন কোন জ্ঞানেরই উৎপাদক হইতে পারেনা, সেইরূপ মস্তিষ্করূপ করণ ভিন্ন আত্মার স্মরণ হয়না।

(২) অনুমানে যে পঞ্চাবাবয়ব বাক্যের প্রদর্শন করিতে হয়, বিস্তৃতিভয়ে এবং পুনঃ পুনঃ প্রদর্শনে পাঠকের বিরক্তিকর হইবে, এই ভয়ে এই স্থলে উপেক্ষিত হইল। এই প্রস্তাবের অগ্রভাগে কিরূপ করিয়া অনুমানকরিতে হয়, প্রদর্শিত হইয়াছে।

আত্ম-মেধ।

নাহি চাহি অমরার নন্দন-কানন,
—দিব্যাঙ্গনা অপ্সরার চারু-চন্দ্রানন।
মাটীর মানুষ আমি জন্মমৃত্যু অনুগামী
দিব্যাঙ্গনাকরচারুচামরব্যজনে,—
কি আনন্দ দিতে পারে মানুষের মনে?
যাহারা গড়িল স্বর্গ, ধর্ম্ম অর্থ চতুর্ব্বর্গ,—
যাহাদের কর্ম্মায়ত্ত—সাধনার ফল।
তুচ্ছ স্বর্গসুখে তারা হইবে চঞ্চল!
জ্ঞান-যজ্ঞ-হোমানলে, পূর্ণাহুতি কুতূহলে,
প্রদান করিল যাঁরা লভিয়া বিভূতি।
তাহাদের কাম্য—স্বর্গসুখ-অনুভূতি!
চাহিনা স্বর্গের তৃপ্তি, চাহিনা অনন্ত সুপ্তি—
নির্ব্বাণ-মুক্তিতে মম নাহি প্রয়োজন।
—আমি চাই কর্ম্মময় মানবজীবন।
থাকুক অমরাবতী, সুখময় সুখাবতী,
চারুকল্পতরু ফুল্ল পারিজাত ফুল।
মধুগন্ধে অলিকুল হউক আকুল!
হাস্যমুখী দেববালা লইয়া মন্দার মালা
কল্পনার শিল্পশালা করুক উজ্জ্বল।
উচ্চলক্ষ্য মানবের সাধনার ফল।
শাস্ত্রের আদর্শ স্মরি' 'আমিত্ব' বিস্তার করি'
মমত্বে বসুধা কর কুটুম্বের স্থল,
বিশ্বপ্রেম মহামন্ত্র করহ সফল।
অশ্বমেধ যজ্ঞে যদি স্বর্গলাভ হয়;
আত্মমেধে উচ্চফল লভিবে নিশ্চয়।

শ্রীপঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

সাহিত্য-সংহিতা।

('সাহিত্য-সভার' মাসিক পত্রিকা)।

সম্পাদক
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বি, এল,
এফ, আর, জি, এস।

কলিকাতা
১০৬।১ নং, গ্রে ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রকাশিত।
১১ নং, সিমলা ষ্ট্রীট, "হরিশ-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীগোষ্ঠবিহারি সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

☞ "সাহিত্য-সভার" সভ্যেরা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য।৵০ আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেনরচিত দানসাগর গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহিত সাহিত্য-সংহিতায় মুদ্রিত হইতেছে। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা গ্রন্থের গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রিমমূল্য প্রেরণ করিয়া সংহিতার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

২। ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলীসহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সটীক ও সানুবাদ মুদ্রিত হইতেছে। অর্দ্ধাংশের অধিক মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুগণ নাম ধাম পাঠাইয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৩। মফঃস্বলের গ্রাহকগণ দেয় অগ্রিমমূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

৪। সভার সভ্যগণ ও সাহিত্য-সংহিতার গ্রাহকগণ টাকাকড়ি, প্রবন্ধ ও পত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে বাধিত হইব।

শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি,এ,
(অস্থায়ী) সহকারী সম্পাদক।
১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

	বিষয়।	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক।
১।	কালতত্ত্বসমীক্ষা বা পঞ্চাঙ্গ তত্ত্বনির্ণয়।	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য।	৪০১
২।	ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ এক।	,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত।	৪১১
৩।	ধর্ম্মপদের মূল ও ব্যাখ্যা।	,, চারুচন্দ্র বসু।	৪১৯
৪।	হিন্দু-বৈবাহিক-বিজ্ঞান।	,, জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	৪২৪
৫।	ঈশ্বরতত্ত্ব।	,, আশুতোষ দেব এম, এ, এফ্, টি, এস্।	৪৩৭
৬।	শূন্যপ্রাণ (কবিতা)।	,, ,, ,,	৪৫০
৭।	সংযুক্তার পত্র (কবিতা)	,, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৪৫২
৮।	মহাবিদ্যা স্তুতিগীতং (সংস্কৃত-কবিতা)	,, জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।	৪৫৫
৯।	দানসাগর।	,, ,,	৪৯—৫৬

☞ প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।

সাহিত্য-সংহিতা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা

কালতত্ত্বসমীক্ষা বা পঞ্চাঙ্গ তত্ত্বনির্ণয়।

কালতত্ত্ব অতিশয় জটিল। কালতত্ত্ব নিরূপণের অভিপ্রায়েই জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্যই জ্যোতিষকে বেদের চক্ষু বলে (১)। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ যথাকালে সম্পন্ন হইলেই ফলপ্রদ হয়, অন্যথা নিষ্ফল হইয়া থাকে (২)। বলপূর্ব্বক বা কুতর্কের দ্বারা অকালকৃত বৈদিক ক্রিয়ার যথোক্ত ফললাভের আশা করা যায় না। কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বীকার বা অস্বীকার, কর্ম্মফলের নিয়ামক হয় না। ধর্ম্ম সত্যের সহচর। যাঁহারা কালতত্ত্ব নিরূপণে যত্নশীল, তাঁহাদিগকে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, জগতে কাল ব্যবহার কিরূপে চলিতেছে। কি বৈদিক ক্রিয়ার কাল, কি ব্যবহার কার্য্যের কাল, সকলই আকাশের সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ সূর্য্য ও চন্দ্রাদি গ্রহের আশ্রয়েই নিরূপিত হইয়া থাকে। বেদে, স্মৃতিশাস্ত্রে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে এইরূপই মত দেখিতে পাওয়া

---

(১) "শাস্ত্রাদস্মাৎ কালবোধো যতঃ স্যা
দ্বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষস্যোক্তমস্মাৎ।
বেদচক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং জ্যোতিষং।"
সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

(২) "অকালে চেৎ কৃতং কর্ম্ম কালে তস্য পুনঃ ক্রিয়া।
কালাতীতং তু যৎ কুর্য্যাদকৃতং তদ্বিনির্দ্দিশেৎ॥
অঙ্গত্বেঽপিচ কালস্য ন ত্যাগো নাঙ্গবৎ কৃতঃ।
অনুপাদেয়রূপত্বাৎ কালে কর্ম্ম বিধীয়তে॥
বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ॥" স্মৃতি।

যায় (৩)। বস্তুতঃও কি বৈদিক, কি ব্যবহারিক কালজ্ঞান অন্য কোন রূপেই উৎপন্ন হইতে পারে না। ঘটিকাদি যন্ত্রে কালগণনারম্ভ অন্য কোন প্রকারে হয় না। যেমন বর্ত্তমান সময়ে আলিপুর বেধালয়ে সূর্য্য দেখিয়া স্পষ্ট মধ্যাহ্ন নির্ণীত হয়। পরে ঘড়ি মিলাইয়া বেলা একটার সময় তোপধ্বনি করিয়া কলিকাতাবাসী সকল লোককে ঘড়ি মিলাইবার বা কালগণনারম্ভের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। সূর্য্য দিন ও রাত্রি বিধান করিতেছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। এই সূর্য্যের উদয় ও অস্তময়ে হোমাদি কার্য্যের বিধান আছে। এই সূর্য্যেরই উদয়ের প্রাগাসন্ন অনুদয় হোমীর যাগকাল (৪)। এই সূর্য্যই যে দিনমান বিধান

---

(৩) কালাদ্যুৎপত্তিং,মনুরাহ

"কালং কালবিভক্তিঞ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।" ১।২৪

"সৃষ্টিং সসর্জ্জ চৈবেমাং স্রষ্টুমিচ্ছন্নিমাঃ প্রজাঃ॥" ১।২৫

"তত্র যঃ সামান্যঃ কালঃ স বিশেষানুগতত্বাৎ তদপেক্ষয়া নিত্যো গ্রহগত্যাদিভিরনুমেয়ো ভূতোৎপত্তি নিমিত্তকারণম্ ইতি তার্কিক জ্যোতিষিকাদয়ঃ।"

কালমাধব।

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে—

মানসংখ্যা বুধৈর্জ্ঞেয়া গ্রহগত্যনুসারতঃ।

স চ দিবসো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বিবেচিতঃ।

দক্ষিণাঞ্চ যদা কাষ্ঠাং ক্রমাদাক্রমতে রবিঃ।

দিবসস্য তদা হানি র্জ্ঞাতব্যা তাবদেব তু॥ কালমাধব।

বেদে—অঘমর্ষণ মন্ত্রে—

আকৃষ্টেনেতি মন্ত্রে—

অস্যৈকোরশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে তদেতেনোপেক্ষিতব্য মাদিত্যতোঽস্য দীপ্তির্ভবতীতি। নৈঘুণ্টকং। কাণ্ডং ২ অ ২ পা ২থ

"সৃষ্ট্বা ভচক্রং কমলোদ্ভবেন গ্রহৈঃ সহৈতদিত্যাদি"

সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

(৪) বৃদ্ধপারাশরোঽপি

"সূর্য্যোঽস্তশৈলমপ্রাপ্তে ষট্‌ত্রিংশদ্ভি রথাঙ্গুলৈঃ।

প্রাদুষ্করণমগ্নীনাং প্রাতর্ভাসাঞ্চ দর্শনাৎ॥"

করেন, তাহাই পাঁচ অংশে বিভক্ত হইয়া প্রাতরাদি নাম ধারণ করে (৫)। এই প্রাতরাদিকালের আশ্রয়েই দেব ও পিতৃক্রিয়া, পূজা, যজ্ঞ, ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে এই ব্যবহারই প্রচলিত আছে। তিথিকে চন্দ্রের দিন বলে (৬)। ইহাও চন্দ্র ও সূর্য্যের গত্যন্তরে নিরূপিত হইয়া সৌরসাবন ঘটিকা প্রমাণে এই সূর্য্যেরই উদয় হইতে গণিত ও পঞ্জিকায় লিখিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রমাই দিন রাত্রি পূর্ব্বাহ্নাদি, তিথি প্রভৃতি তাবৎ কালের বিধাতা—এ পক্ষে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। পঞ্জিকায় স্থিরীকৃত তিথ্যাদির কালভেদ দেখিয়াই যখন সন্দেহ, তখন দেখা উচিত যে, পঞ্জিকায় থাকে কি? ইহাতে থাকে তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ ও বার। এই পাঁচ অবয়ব থাকে বলিয়াই, ইহার নাম পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা। এতদ্ভিন্ন দিনরাত্রিমান প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয়ও থাকে। বিচার পূর্ব্বক দেখিলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পঞ্জিকার প্রধান পাঁচটী অবয়বই সূর্য্য ও চন্দ্রমা বিধান করেন। বার ভিন্ন সহজে অপর চারিটী জানা যায় না, এই জন্যই গণিতের প্রয়োজন। এই সূর্য্য ও চন্দ্রমা আকাশে ক্রান্তিবৃত্তে কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা নিরূপণ করিবার জন্যই জ্যোতিষ শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পঞ্জিকার মূলভিত্তি আকাশের সূর্য্য ও চন্দ্রমা। পঞ্জিকার নির্দ্দিষ্ট সমস্ত পদার্থের মধ্যে তিথি ও দিনমানই প্রধান ও সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের মূল। বৈদিক বা পৌরাণিক

"পুরোদয়াৎ প্রাতঃ প্রাদুষ্কৃত্যোদিতে হনুদিতেবা প্রাতরাহুতিং জুহুয়াৎ॥"

গোভিলীয় গৃহ্যসূত্র।

(৫) কাত্যায়নঃ—

"লেখাদিত্যাৎ প্রভৃতয়ো মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব তু।

প্রাতস্ত স স্মৃতঃ কালো ভাগশ্চাহ্নঃ স পঞ্চমঃ॥"

"সঙ্গবস্ত্রিমুহূর্ত্তোঽথ মধ্যাহ্নস্তৎ সমঃ স্মৃতঃ।

ততস্ত্রয়ো মুহূর্ত্তাশ্চাথাপরাহ্নো বিধীয়তে॥"

"পঞ্চমোঽথ দিনাংশো যঃ স সায়াহ্ন ইতি স্মৃতঃ।" - কালমাধব।

(৬) "তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনং।"

ক্রিয়াকলাপ প্রধানতঃ তিথি ও দিনমানের উপর নির্ভর করে। এই দুইটির নিরূপণ হইলেই অপর গুলির নির্ণয় সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। তন্মধ্যে দিনমান ত প্রসিদ্ধই আছে। প্রচলিত পঞ্জিকার লিখিত দিনমানে যে অশুদ্ধি আছে, তাহা কোন পক্ষই সংশোধন করিতে আপত্তি করেন না। তবে তিথিতে যে মহতী অশুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, তাহাতেই একপক্ষ বিপ্রতিপন্ন। অতএব তিথির স্বরূপ শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহাই দেখান যাইতেছে। তিথির স্বরূপ জানিতে হইলে, স্ফুট চন্দ্র ও সূর্য্যের স্বরূপ জানা আবশ্যক। এজন্য স্ফুট চন্দ্র ও সূর্য্যের স্বরূপ, যাহা সূর্য্য-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তে লিখিত আছে, তাহাই প্রথমে বলিতেছি। এ বিষয়ে সাধারণ গোলজ্ঞান যেন পাঠকমহাশয়দিগের আছে, ইহা স্বীকার করা গেল। নতুবা গোলের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হইলে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহু বিস্তার হয়।

গোলে সূর্য্য উত্তরে যতদূর গমন করেন, তাহাকে উত্তর অয়নান্ত বলে। এইরূপ দক্ষিণে যত দূর গমন করেন, তাহার নাম দক্ষিণ অয়নান্ত। সমরাত্রিন্দিবকালে সূর্য্য বিষুবদ্বৃত্তের যেস্থানে আসেন, তাহার নাম সম্পাত। এই তিন স্থানের উপর দিয়া একটি বৃহদ্বৃত্ত অঙ্কিত করিলে তাহাকেই ক্রান্তিবৃত্ত বা রাশিচক্র বলে।

সূর্য্য তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত এই বৃত্তে জগৎকে প্রকাশিত করিয়া ভ্রমণ করেন। যখন এই বৃত্তের যেখানে থাকেন, তখন তাহাই সূর্য্যের ভোগ বলিয়া কথিত হয়। চন্দ্র সর্ব্বদা এই বৃত্তে ভ্রমণ করেন না। প্রায়ই ইহার উত্তরে বা দক্ষিণে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যখন ক্রান্তিবৃত্তে অবস্থিত হন, তখন যে বিন্দুতে অবস্থিত হন, তাহাকেই চন্দ্রের ভোগ বলে। যখন উত্তরে বা দক্ষিণে থাকেন, তখন চন্দ্রবিম্বের কেন্দ্র স্থানের উপর দিয়া এক কদম্বপ্রোত বৃত্ত—অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের উপর লম্বভাবে পতিত হয়—এরূপ একবৃত্ত করিলে ক্রান্তিবৃত্তে আসন্ন যে স্থানে সংলগ্ন হয়, তাহাই তৎকালে চন্দ্রের ভোগ বা স্ফুট চন্দ্র বলিয়া উক্ত হয়। (৭) এই সূর্য্য ও

(৭) "অয়নাদয়নঞ্চৈব কক্ষাতির্য্যক্ তথাপরা।
ক্রান্তিসংজ্ঞা তয়া সূর্য্যঃ সদা পর্য্যেতি ভাসয়ন্॥

চন্দ্র ভোগের যে অন্তরাভাব ইহাকে সূর্য্য ও চন্দ্রমার যোগ বা জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে অমাবস্যার অন্ত বলে। (৮)

এই যোগের পর, সূর্য্য ও চন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত প্রকার ভোগের অন্তর, যখন, ১২ অংশ হয়, তখনই শুক্ল প্রতিপদের অন্ত হয়। এইরূপ প্রতিদিন সূর্য্যভোগ অপেক্ষা চন্দ্রভোগ বাড়িতে থাকে ও প্রতিপূর্ণ ১২ অংশে এক এক তিথির অন্ত হয়। যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের ভোগের অন্তর ১৮০ অংশ অর্থাৎ বৃত্তার্দ্ধ তুল্য হয়, তখনই ১৫ তিথির অন্ত বা পূর্ণান্ত হইয়া থাকে (৯)। আবার এইরূপ অন্তর বাড়িতে বাড়িতে যখন ৩৬০ অংশ অন্তর হয়, তখন ৩০ তিথির অন্ত বা অমান্ত হইয়া হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তিথির স্বরূপ নির্দ্দেশ এইরূপই আছে। (১০) এই তিথি সাধন করিবার জন্যই গণিত করিতে হয়। এইরূপ তিথির অন্ত কখন হইল, তাহা স্থির করাই তিথি সাধন করা।

চন্দ্রাদ্যাশ্চস্বকৈঃ পাতৈরপমণ্ডলমাশ্রিতৈঃ।
ততোঽপকৃষ্টা দৃশ্যন্তে বিক্ষেপান্তেষ্বপক্রমাৎ॥" সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

"গোলযন্ত্রং সম্যগ্ ধ্রুবাভিমুখযষ্টিকং জলসমক্ষিতিজঞ্চ যথা ভবতি তথাস্থিরং কৃত্বা রাত্রৌ গোলমধ্যচিহ্নগতয়া দৃষ্ট্যা রেবতীতারাং বিলোক্য ক্রান্তিবৃত্তে যো মীনান্তস্তং রেবতীতারায়াং নিবেশ্য মধ্যগতয়ৈব দৃষ্ট্যা চন্দ্রং বিলোক্য তদ্বেধ-বলয়ং চন্দ্রোপরি নিবেশ্যং। এবং কৃতে সতি বেধবৃত্তস্য ক্রান্তিবৃত্তস্য চ যঃ সম্পাতঃ তস্য মীনান্তস্য চ যাবদন্তরং তস্মিন্ কালে তাবান্ স্ফুটচন্দ্রো বেদিতব্যঃ। ক্রান্তিবৃত্তস্য চন্দ্রবিম্বমধ্যস্য চ বেধবৃত্তেযবাদন্তরং ভাবাংস্তস্য বিক্ষেপঃ॥"

সিদ্ধান্তশিরোমণি।

(৮) "যঃ পরমঃ সঙ্কর্ষঃ সামাবস্যা।"

গোভিলীয় গৃহ্যসূত্র।

(৯) "যঃ পরমো বিপ্রকর্ষঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ সা পৌর্ণমাসী॥"

গোভিলীয়গৃহ্যসূত্র।

(১০) তদেতদ্বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বিস্পষ্টমভিহিতম্।

"চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যদা ভবেৎ

কি পরম পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ ঋষিগণ, কি গণিত পারংগত আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ—সকলেই আকাশের সূর্য্য ও চন্দ্রাদি গ্রহের অবস্থান নিরূপণ করিবার জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। (১১) সকলেই অমান্ত ও পূর্ণান্ত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত রূপই নির্ণয় করিতে বলেন। (১২) বঙ্গদেশ প্রচলিত পঞ্জিকায় নিণাত অমান্তে যদি চন্দ্র ও সূর্য্য ভোগ এক না হয় এবং অষ্টম্যন্তে যদি ৯৬ অংশ অন্তর না হয় বা তাহার আসন্নও না হয়, তাহা হইলে অশুদ্ধ না বলিয়া আর কি বলিতে পারি। যাহা অশুদ্ধ তাহা অবশ্যই হেয়। সুতরাং তাহা ত্যাগ করিয়া যাহা শুদ্ধ তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

"তদা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ং।
ভগণেন সমগ্রেণ জ্ঞেয়া দ্বাদশরাশয়ঃ।
ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে ॥
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্ত ভাগদ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাত্তদারাম তিথিরিত্যভিধীয়তে ॥"

কালমাধব।

"অকাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্রমানমংশৈস্ত জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ ॥"

কালমাধব ধৃত সিদ্ধান্তবচন ॥

অস্মদ্দেশীয় স্মার্ত্তাচার্য্যঃ রঘুনন্দনঃ।

"বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তেন রাশিদ্বাদশাংশ দ্বাদশাংশভোগাত্মক নির্গমরূপবি-য়োগেন শুক্লায়াঃ প্রতিপদাদিতত্তৎ তিথেরুৎপত্তিঃ। গোভিলোক্তপৌর্ণমাসী-ঘটকসপ্তমরাশ্যবস্থানরূপপরমবিয়োগানন্তরমর্কমণ্ডলপ্রবেশায় চন্দ্রমণ্ডলস্য রাশি-দ্বাদশাংশ দ্বাদশাংশভোগাত্মক প্রবেশরূপসন্নিকর্ষেণ কৃষ্ণায়াস্তত্তৎ তিথেরুৎপত্তিঃ।

(১১) "আচার্য্যঃ শিষ্যবোধার্থং সর্ব্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্ ॥"

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(১২) "যঃ পরমো বিপ্রকর্ষঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ সা পৌর্ণমাসী"
"যঃ পরমঃ সঙ্কর্ষ্যঃ সামাবস্যা ॥"

গোভিলীয়গৃহসূত্র।

ইহাতেও যদি কেহ এরূপ মনে করেন যে, যখন কোন গ্রন্থের আশ্রয়ে গণনা হইতেছে, তখন তাহা অশুদ্ধ হইতে পারে কিসে? এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যখন আকাশে পরিদৃষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রমার তুলনায় অশুদ্ধি পরিদৃষ্ট ও পরীক্ষিত হইতেছে, তখন তাহাই স্বীকার করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিবার বিধি কোন শাস্ত্রে নাই এবং কোন যুক্তিতেও হইতে পারে না। বরং পুস্তক অনুসারে গণনায় অশুদ্ধি পরিলক্ষিত হইলে তাহা স্বীকার না করিয়া যেরূপে সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়, তাহাই করিয়া তিথ্যাদি নিরূপণ করিবার বিধি মহর্ষি বশিষ্ঠ ও ব্রহ্মা করিয়া গিয়াছেন। (১৩) মহর্ষিদিগের বিধি অবনত মস্তকে স্বীকার্য্য। এবং যুক্তি অনুসারে দেখিতে গেলেও উক্ত বচনানুসারে চলাই কর্ত্তব্য স্থির হয়। কারণ অশুদ্ধ তিথি স্বীকার করা ত আর শাস্ত্রের অভিপ্রায় হইতে পারে না। সুতরাং যাহা যুক্তিযুক্ত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও মহর্ষিগণের বিধিবোধিত, তাহার অবহেলা করা কোনপ্রকারে কর্ত্তব্য নয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট সূর্য্যও চন্দ্রমার অবস্থান পর্য্যালোচনায় প্রায় দিনার্দ্ধ তুল্য তিথি অশুদ্ধ দৃষ্ট হয়, তখন তাহা স্বল্পান্তর বলিবারও উপায় নাই; এবং

---

(১৩) "সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদিযন্ত্রেভ্যঃ।
তৎ সংস্কৃতগ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ ॥"

মল্লারী টীকা প্রৌঢ় মনোরমা ও সৌর ভাষ্যধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত বচন।

"ইত্থং মাণ্ডব্য সংক্ষেপাদুক্তং শাস্ত্রং ময়োদিতং।
বিস্রস্তী বরিচন্দ্রাণ্ডে ভবিষ্যতি যুগে যুগে ॥
যস্মিন্ পক্ষে যত্রকালে যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যকং।
দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদি নির্ণয়ম্ ॥"

হোরারত্ন জ্যোতির্মহা নিবন্ধ প্রভৃতি ধৃত বশিষ্ঠ বচন

বীজ শব্দ ব্যাখ্যা;————

আর্য্য সিদ্ধান্ততো যে যে বিশেষা দৃষ্টি সিদ্ধয়ে ॥
স্ফুটী কৃতৌ প্রকল্প্যন্তে তে বীজত্বেন সম্মতাঃ

সিদ্ধান্ত বচন।

এরূপ অশুদ্ধির যদি সংশোধন না করা হয়, তবে আর গণিতের বা কি প্রয়োজন? স্ফুট চন্দ্র ও সূর্য্য লইয়াই ত তিথি। যে গণিত ক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্যকৃৎ তাহাকেই স্ফুটীকরণ বলে। সিদ্ধান্ত শিরোমণি সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তে স্ফুট গণিতের লক্ষণ, এইরূপই লিখিত হইয়াছে। (১৪) কেবল লিখনই বা কেন, বিচারপূর্ব্বক দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, আকাশের সূর্য্য ও চন্দ্রমার অবস্থান নিরূপণ করিবার জন্য গণিত করিব। গণিতে যদি বাস্তবিক অবস্থান নির্ণয় না হয়, তাহা হইলে গণিতের ফল কি? বাস্তবিক অবস্থান নিরূপণ করাই গণিতের উদ্দেশ্য। সিদ্ধান্তের গণিতকরা ত আর ক্রীড়া নয়—এবং গুণ ভাগ শিক্ষা করাও নয়। মনে করুন মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য গ্রহণ হইবে। গণিতের দ্বারা স্থির হইল। কিন্তু আকাশে যদি সে দিন গ্রহণ বাস্তবিক না হয়, তাহাহইলে গণিত কোন্ কাজে লাগিল। কেবল অঙ্কপাত করা কি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য? তাহা কখনই নয়। আরও বিবেচ্য যে, ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠের বচনাশ্রয়ে দিবাকর, নৃসিংহ ও রঙ্গনাথ প্রভৃতি দৈবজ্ঞগণ শুদ্ধ, নিরন্তর গণিত করিয়া তিথ্যাদি সাধন করিতে অসংকোচে মত প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন। (১৫) আর্য্যভট, দুর্গসিংহ, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ও কেশবদৈবজ্ঞ।

"যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলমিতি সূর্য্যসিদ্ধান্তবচনৈঃ স্বকালে যৎ সংস্কারেণ গণিতাগতগ্রহ আকাশে প্রমাণীভূতো ভবতি তদ্বীজমিত্যভ্যুপগমাদ্বীজত্বং। অতএব বীজং স্ব স্ব কালেঽনিয়তস্থিতিকং ভিন্নমেবেত্যুক্তপ্রায়মিত্যলম্।"

মরীচি।

(১৪) "যাত্রা বিবাহোৎসব জাতকাদৌ
খেটৈঃ স্ফুটৈরেবফল স্ফুটত্বং॥
স্যাৎ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাং
স্ফুটক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্য কৃদ্‌যা॥"

সিদ্ধান্তশিরোমণি।

"তত্তদ্ গতিবশান্নিত্যং যথা দৃক্তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রয়ান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ॥"

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(৫) ননু গ্রহানয়নং আর্ষশাস্ত্রাদেব কর্ত্তুং যুজ্যতে ন তু মানুষ্যাৎ তস্যাযথার্থত্বাদিতি চেৎ সত্যং। গ্রহানয়নং মুনিকৃতশাস্ত্রাদেব কর্ত্তুমুচিতং পরং তত্রাপি কালবশেন অন্তরং পততি। যত উক্তং সূর্য্যসিদ্ধান্তে। "শাস্ত্রমাদ্যং তদেবেদং যং পূর্ব্বংপ্রাহ ভাস্করঃ। যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলং॥" বাশিষ্ঠেঽপি। "ইত্থং মাণ্ডব্য সংক্ষেপাদুক্তং শাস্ত্রং ময়োদিতং। বিস্রস্তী রবিচন্দ্রাদ্যোঃ ভবিষ্যতি যুগে যুগে॥" বিস্রস্তিঃ বিস্রংসনং শিথিলত্বমিতি যাবৎ। তদন্তরং বীজসংজ্ঞং ব্রহ্মগুপ্তাদিভির্মানুষৈঃ স্বসত্তা কালে লক্ষয়িত্বা মুনিশাস্ত্রেষু নিক্ষিপ্য তাদৃশ-নিক্ষেপযুক্তাঃ স্বগ্রন্থা রচিতাঃ তদুক্তমেব। তদন্তরমতিন্দ্রিয়জ্ঞৈঃ মুনিভিশ্চাঞ্চল্যাৎ গ্রন্থবাহুল্যভয়াচ্চ নোক্তমপি দেয়মিত্যুক্তমেব। তথাচ ব্রহ্মসিদ্ধান্তে। "সংসাধ্য স্পষ্টতরবীজং নলিকাদি যন্ত্রেভ্যঃ। তৎ সংস্কৃত গ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ॥" ইতি॥

দিবাকরদৈবজ্ঞকৃত প্রৌঢ়মনোরমা।

নৃসিংহদৈবজ্ঞকৃত সৌরভাষ্যে—

ননু সূর্য্য প্রণীত শাস্ত্রাদিদং পৌলিশ রোমক প্রণীত সাবনাদি ভিন্নত্বাৎ শাস্ত্রং ভিন্নং। কথমস্মাভিঃ শ্রোতব্যং ইত্যত আহ। শাস্ত্রমাদ্যমিতি। ইদং তদেব আর্য্য শাস্ত্রং যদ্ যুগানাং পরিবর্ত্তেন ভাস্করঃ পূর্ব্বমাহ। ননু ভাস্করেণাপি যুগে যুগে মুনিভ্যো ভিন্নং কিমর্থমুপদিষ্টং। অত আহ। কালভেদোঽত্র কেবলমিতি। অয়মভিপ্রায়ঃ পূর্ব্বোপদিষ্টশাস্ত্রেঽন্তরং দৃষ্ট্বা তন্নিরন্তরং মুনিভ্যঃ প্রোক্তবান্। তেন মুনিভিরপি স্বকৃতগ্রন্থেষু গ্রহাণাং কালবশেন অন্তরং দৃষ্ট্বা তত্তদ্ দেয়মিত্যুপদিষ্টং ভবতি। তথাচোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। "সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি যন্ত্রেভ্যঃ। তৎ সংস্কৃত গ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ॥" ইতি॥ বশিষ্ঠসিদ্ধান্তেঽপি। "ইত্থং মাণ্ডব্য সংক্ষেপাদুক্তং শাস্ত্রং ময়োদিতং। বিস্রস্তী রবিচন্দ্রাদ্যে ভবিষ্যতি যুগে যুগে॥" বিস্রস্তিঃ বিস্রংসনং শিথিলত্বমিতি যাবৎ। অতএব আর্য্যভটব্রহ্মগুপ্তাদিভিঃ স্বসত্তাকালে অন্তরং উপলভ্য মুনিকৃতগ্রন্থেষু নিক্ষিপ্য গ্রন্থা রচিতাঃ। ননু কালবশেন যদন্তরং পতিতং তৎ কথং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানবদ্ভির্নোপলক্ষিতং, কথং চর্ম্মচক্ষু-

অস্তিব্র্হ্মগুপ্তাদ্যৈশ্চোপলক্ষিতং॥ ইতি উচ্যতে॥ মুনিভিরুক্তং তৎ তাদৃশমেব কিন্তু কালবশেন যদন্তরং পততি পুনস্তস্যাভাবঃ কিয়তা কালেন ভবতি। পুনরপি কিয়তাকালেন কিয়দন্তরং পততি। তৎপূর্ব্বাপেক্ষয়া বিলক্ষণমেবভবতি। কদাচিদন্তরাভাব এব। ইত্যেবং চাঞ্চল্যাৎ গ্রন্থবাহুল্যভয়াচ্চ নোক্তবন্তোঽপি ইদমূচুঃ। যদন্তরং তদোপলভ্য দেয়মিতি। আচার্য্যৈঃ স্বসত্তাকালে লক্ষয়িত্বা দীয়তে ইতি।

রঙ্গনাথ কৃত গূঢ়ার্থপ্রকাশে—

* * যুগমধ্যেঽপি অবান্তরকালে গ্রহচারেষু অন্তরদর্শনে তত্তৎকালে তদন্তরং প্রসাধ্য গ্রন্থাংস্তৎকাল বর্ত্তমানাভিযুক্তাঃ কুর্ব্বন্তি। তদন্তরং পূর্ব্বগ্রন্থে বীজমিত্যামনন্তি। ইতি।

হোরারত্নে—

"বিবাহে জাতকে যাত্রা প্রশ্ন বাস্তুব্রতাদিষু। জ্যোতিঃশাস্ত্রাৎ ফলং সর্ব্বং প্রস্ফুট-দ্যুচরাশ্রয়মিতি।" তত্র ব্রহ্মার্য্য সৌরাদি পক্ষভেদে সতি সর্ব্বেষাং পক্ষাণাং আপ্তবাক্যতয়া প্রমাণত্বে সতি কস্মাৎ পক্ষাৎ গ্রহ সাধনংকর্ত্তুমুচিত মিত্যুক্তং—জাতকসারে।

জাতকাদিষু সর্ব্বত্র গ্রহৈর্জ্ঞানং প্রজায়তে।
তস্মাৎ গণিতদৃক্তুল্যাৎ স্বতন্ত্রাৎ সাধয়েৎ গ্রহান্॥

বশিষ্ঠোঽপি

"যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যকং।
দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদিনির্ণয়ং॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য।

যাস্ক-সায়ণের বেদ-ব্যাখ্যা।

ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ এক।

(এবং উহাই স্বর্গ)

বেদাচার্য্য সায়ণ ও ঋষিকল্প মহামতি যাস্ক ভারতাকাশের দুইটী মহোজ্জ্বল দীপ্ত তারা। যদি ইঁহারা লেখনী ধারণ না করিতেন, যদি মহাবজ্ররূপী ইঁহারা বেদরূপ মহারত্নে ছিদ্র সমুৎকীর্ণ করিয়া না যাইতেন, যদি ইঁহাদের ভাষ্যরূপ মহাপ্রদীপ প্রজ্বলিত না থাকিত, তাহা হইলে আজ আমরা দুর্ব্বোধ দুরধিগম্য বেদের একটী বর্ণেরও অর্থাববোধ ও পদার্থ-গ্রহে সমর্থ হইতাম না। সত্য বটে, মহামতি ঔর্ণনাভ, স্থৌলষ্ঠিবী, শাকপূণি এবং স্কন্দাচার্য্য প্রভৃতি অভিরূপগোষ্ঠীও এবিষয়ে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মহামূল্য ভাষ্যপরম্পরা নানা কারণে কালের কুক্ষিগত হওয়াতে আমরা তাঁহাদিগের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। বর্ত্তমান যুগে যাস্ক ও সায়ণ ভিন্ন আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আমাদিগকে অতি সঙ্কুচিত ও অতি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে বলিতে হইতেছে যে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞানের লাঘব হেতু আমাদিগকে অনেক সময়ে তাঁহাদিগের ভাষ্যাদিতে অতৃপ্তি বোধ করিতে হইতেছে।

"বিভেত্যল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি" মহাভারত ও পদ্মপুরাণের এই মহাবাক্য, সর্ব্বদাই আমাদিগের মতন বোধবিক্লব বরাকগণের হৃৎকম্প জন্মাইয়া থাকে বটে, কিন্তু তথাপি আত্মপ্রত্যয় আমাদিগকে এতদূর মুখর ও উদ্ধত করিয়াছে যে, আমরা সায়ণাদির ন্যায় আচার্য্যকল্প মহাত্মগণের বিরুদ্ধেও অভ্যুত্থান করিতে আজি সাহসী হইতেছি।

ইহা আমরা বেশ জানি যে, একদিন আটলাণ্টিকের পার থাকার কথা বলিতে যাইয়া নিরপরাধ কলম্বস বহুধা লাঞ্ছিত ও যত্র তত্র বিগীত হইয়াছিলেন। জগন্মান্য পোপের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া মহাত্মা লুথরকেও পদে পদে বিপন্ন ও বাধা প্রাপ্ত হইতে হইয়া ছিল, এবং মহাত্মা কলম্বস ও

মহামতি লুথরের পদধূলি গ্রহণেরও অযোগ্য, তাঁহাদিগের পবিত্র নাম গ্রহণেরও সম্পূর্ণ অনধিকারী কীটাণুকীট আমরাও সায়ণ ও যাস্কের বিরুদ্ধে কথা বলিতে যাইয়া অভিরূপভূয়িষ্ঠ সংসৎসঙ্ঘের নিকট অবগীত হইব। কিন্তু কি করি মনোদেবতা আমাদিগকে যেরূপে আশ্বস্ত ও প্রোৎসাহিত করিয়াছেন্, যেরূপে আমরা আত্মবিশ্বাসপ্রণোদিত হইয়া অতিসাহসের দাস হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে আমরা আর কিছুতেই মনের গতি সংরুদ্ধ করিতে সমর্থ নহি।

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ"—কোথায় সেই বিদ্বদ্‌গণ-দুরধিগম্য অভ্রঙ্কষশেখর সুমহান্ বেদ মহাতরু, আর কোথাই বা আমাদিগের মতন পিপীলিকাপসদ ক্ষুদ্র কীটাণুকীট! বেদের ব্যাখ্যাকরা দূরে থাকুক, বেদের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতেও আমরা অনধিকারী। কিন্তু তথাপি "মনোরথানা মগতির্ন বিদ্যতে"—এই নিসর্গ বিধির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কিছুতেই বক্তুকাম হৃদয়কে সংযত করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনীষিগণ—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধুসর্ব্বং।
নচাপি কাব্যং নব মিত্যবদ্যং॥"

এই মহাবাক্য—এবং "ননু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যাবচনে বিপশ্চিতঃ" এই মহাজনবাক্যের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া এই মানব কীট আমাদিগের উক্তির যথার্থ্য নির্ণয় করিবেন।

আমরা আদিমানব, আদিজন্মভূমি, স্বর্গ-নরক,—পাতাল ও মাতারিশ্ব প্রভৃতি প্রবন্ধে সায়ণকৃত ভাষ্যের স্খলনের কথা বলিয়াছি—এই প্রবন্ধেও তাঁহার একটী ঋকের ভাষ্যগত স্খলনের কথা বলিব। ফলতঃ আমরা ও দেবতারা যে একই জিনিষ, স্বর্গের বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ যে বাস্কলি দৈত্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, আমরা যে সেই দেবগণেরই অনন্তর বংশ্য যাস্ক সায়ণ তাহা জানিতেন না। তাঁহারা জানিতেন না যে স্বর্গের উপাস্য দেবতারা ও মর্ত্ত্যের উপাসক আমরা একই। তাঁহারা জানিতেন না যে, দেবগণের নিবাস ভূমি স্বর্গ কোন আকাশচর পারলৌকিক পদার্থ নহে, এবং তাঁহারা ইহাও জানিতেন না যে, আমরা ভারতের আদিম নিবাসী নহি, পরন্তু আমরা আমাদের ভৌম পিতৃলোক স্বর্গ হইতে ভারতে আসিয়া স্থানভ্রষ্ট কুলীনের কৌলীন্যের ন্যায় দেবত্ব হারাইয়া আজি মানুষে

পরিণত হইয়াছি। তাই তাঁহারা বহু ঋকের ব্যাখ্যা বিষয়ে ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, বহু প্রত্নতত্ত্ব এই কারণে গুহানিহিত ধর্ম্মতত্ত্বের ন্যায় লোকলোচনের অবিষয় হইয়া রহিয়াছে। * আমরা এই প্রবন্ধে যে ঋক্‌টীর ভাষ্যের কথা লইয়া আলোচনা করিব সে ঋকটী এই—

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথীব্যা,
ইলায়া স্পদে সুদিনত্বে অহ্নাং।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপযায়াং,
সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥ ৪—২৩ সূ—৩ম।

তত্র সায়ণ ভাষ্যং—হে অগ্নে! ইলায়া গোরূপধারিণ্যাঃ পৃথিব্যা ভূমের্বরে বরিষ্ঠে শ্রেষ্ঠে পদে নাভিস্থানে উত্তরবেদ্যাং অহ্নাং সুদিনত্বে যজনীয়দিবসানাং শোভনদিনত্বার্থং যেষু দিনেষু ইন্দ্রাদয়ো বরীয়াংসো দেবা ইজ্যন্তে তানি সুদিনানি, তদর্থং ত্বা ত্বাং আনিদধে আসমন্তাৎ নিদধামি। উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি, দৃষদ্বত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিন্নদী তস্যাং মানুষে মনুষ্যসঞ্চারবিষয়ে তীরে আপযায়াং আপযা নাম কাচিন্নদী তস্যাং সরস্বত্যাং নদ্যাঞ্চ এতেষু উত্তমেষু স্থানেষু ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। মহর্ষয়ঃ সরস্বতী তীরে যজ্ঞাদি কর্ম্মাণি অকার্ষুঃ তথাচ ব্রাহ্মণং বৈশ্বষয়ো সরস্বত্যাং সত্র মাসতেতি।

আমরা সায়ণের এই ব্যাখ্যায় পরিতৃপ্ত নহি।

সায়ণ—"আনিদধে" ক্রিয়া পদটী বর্ত্তমানকালীন জ্ঞান করিয়া উহার প্রতি শব্দ "সম্যক্ নিদধামি" দিয়াছেন, ভট্ট মোক্ষমূলরও "I place thee" বলিয়া সায়ণের অনুগামী হইয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, এটী আ—নি ধা+লিট্ এ, পরন্তু লট্ এ নহে। হ্বাদিগণীয় ধা (ডু ধাঞ্ লি ধারণপোষণয়োঃ) ধাতুর রূপ উক্ত উভয় বিভক্তিতেই তুল্য, সুতরাং এখানে কেন বর্ত্তমান হইবে না, কেনই বা অতীতকাল হইবে, যিনি সর্ব্বাগ্রে একথার অনুসন্ধান না করিবেন তাঁহাকে অবশ্যই ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। আমরা কেন এখানে অতীত কাল বলিয়া উহার অর্থ "সম্যক্ সংস্থাপয়ামাস" করিতে চাহি তাহা যথাকালে বলিব।

* প্রবন্ধকারোক্ত পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্বকথাগুলি" অর্ব্বাক্‌দৃক্ স্থূলবুদ্ধি সায়ণের না জানিবারই কথা।—সং

আমাদিগের অন্যতর আপত্তি এই যে, সায়ণ যে এখানে প্রথমে বলিলেন 'ইলা গোরূপ ধারিণী" পৃথিবী, পরে বলিলেন "উত্তরবেদী"। এই অর্থদ্বয় পরস্পর পরিপন্থী। আমাদের প্রথম কথা এই যে বেদের কোন না কোন স্থলে ইলা শব্দ পৃথিবী অর্থবাচী হইলেও হইতে পারে, যাস্কও তদীয় নিরুক্তে ইলা শব্দ পৃথিবী অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন; করুন, কিন্তু আমরা ঋগ্‌বেদের কোন স্থলে ইলাশব্দ পৃথিবীঅর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা মনে করিতে প্রস্তুত নহি। পাঠকগণই ত ভাবিয়া দেখিতে পারেন, যদি পৃথিবী ও ইলা একই বস্তু হইবে, তাহা হইলে এই ঋকে ইলা ও পৃথিবী শব্দ যুগপৎ একত্র প্রযুক্ত হইবে কেন? "পৃথিব্যাঃ বরে ইলায়াঃ পদে" এরূপ প্রয়োগ দেখিলে কি ইহাই অনুভূত হয় না যে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ইলার পদ (স্থান) তাহাতে?। পক্ষান্তরে ইলা অর্থও পৃথিবী হইলে "পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে পৃথিবীর (ইলার) পদ তাহাতে, এহেন অর্থ কি সাধীয়ান্ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে?

অপিচ সায়ণ ইলা অর্থ একবার বলিলেন পৃথিবী, আবার পরক্ষণেই বলিলেন উত্তরবেদী। ইহা কি হাস্যজনক ব্যাপার নহে। পৃথিবী ও যজ্ঞের উত্তরবেদী এক বস্তু, একথা কেহ জানেন না, মানেনও না। অবশ্য ইলা শব্দের অর্থ যজ্ঞের উত্তরবেদী, ইহা আমরা কৃষ্ণযজুর্বেদের ২।১টী প্রয়োগ দ্বারা মনে করিয়া লইতে পারি, কিন্তু ইলা শব্দের সে অর্থটী একত্র সঙ্গত হইলেও এখানেও সঙ্গত হইবে, এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা দেখা যায় না। ইলাশব্দ এখানে সেঅর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু এখানে ইলার তাদৃশ অর্থ সঙ্গতও হইতেছে না। আমরা তাহাই বলিতে চাহি। কৃষ্ণযজুর্বেদের সে স্থানটী এই—"সোমপীথস্তমেব অবরুন্ধতে উত্তরবেদ্যাং নিবপতি, পশবো বা উত্তর বেদিঃ পশবো হারি যোজনীঃ পশুষ্বেব পশূন্ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি।" ৪০১ পৃষ্ঠা। "ইড়াং উপহ্বয়তে পশবো বা ইড়া পশূনেব উপহ্বয়তে। ৪১৯ পৃষ্ঠা"। *

* প্রবন্ধকার সায়ণের সংস্কৃতের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া সায়ণের ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান আপত্তি সায়ণ একই ইলা শব্দ একই ঋকে "গোরূপধারিণী পৃথিবী" ও উত্তরবেদী এই অর্থদ্বয়ে প্রয়োগ করিয়াছেন ও এই রূপপ্রয়োগ বড় "হাস্যজনক"। আমরা কিন্তু দেখিতেছি সায়ণ ঐরূপ কোন অপরাধ করেন নাই। তিনি 'ইলা' শব্দ 'গো' এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, পৃথিবী শব্দ পৃথিবী অর্থে ও "পৃথিব্যা বরে পদে" এই পদসমষ্টি উত্তরবেদী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রবন্ধকার কি দেখিতে পান নাই যে, ইলা, পৃথিবী, বর ও পদ এই চারিটী ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রহিয়াছে ও ঐ চারিটী শব্দ হইতেই সায়ণ পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন? সায়ণ পৃথিবী ও যজ্ঞের উত্তর বেদী এক বস্তু, একথা বলেন নাই—পৃথিবীর বর পদ শব্দেরই উত্তর বেদীরূপ অর্থে ভাবানুবাদ করিয়াছেন। তিনি সাধারণতঃ ঋক্ সমূহের আধ্যাত্মিক অর্থ ত্যাগ করিয়া যজ্ঞপর অর্থই করিয়াছেন। যাজ্ঞিকেরা যে উত্তরবেদীকে পৃথিবীর বর পদ বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? আর ঐরূপ অর্থ যে ব্রাহ্মণ সম্মত সায়ণ তাহাও দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধকারের বৃথা বাগ্‌জাল ও আস্ফালন দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি ক্লীবের ন্যায় শূন্যে অস্ত্রচালনা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার বৃথা ব্যায়াম মহামতি সায়ণকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। এইরূপ অন্যান্য আপত্তি ও বড়ই অকিঞ্চিৎকর—তৎসমুদয়ের বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক। নৈষ স্থাণোরপধাধো যদন্ধ এনং ন পশ্যতি—"অন্ধ ব্যক্তি যে স্থাণু দেখিতে পান না। ও না দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত সঙ্ঘর্ষে কষ্ট পান তাহা স্থাণুর অপরাধ নহে।—সং—

সায়ণও ব্রাহ্মণহইতে দুই একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া ইলাশব্দের উত্তরবেদী অর্থ সমর্থন করিয়াছেন, করুন। কিন্তু আমরা এই ঋকে সে অর্থগ্রহণ সঙ্গত মনে করি না। যদি ইলা অর্থ উত্তরবেদী হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ "ইলায়াং" এই কথাটী দিলেই ত হইত?। বলিবে, এটা একটা বৈদিক উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগ? তথাস্তু, "ইলায়াস্পদে" শব্দদ্বারাই না হয় বুঝিয়া লইতাম যজ্ঞভূমির উত্তরবেদীতে। কিন্তু যজ্ঞবেদীকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান বলা হইবে কেন? যজ্ঞবেদীকে না হয় পবিত্রতম বা পুণ্যতমাদি কোন বিশেষণদ্বারাই বিশেষিত করা হইত? "পৃথিব্যাঃ বরে" এই কথাটী থাকাতে আমরা ইলার অর্থ এখানে উত্তরবেদী বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি।

মহামতি যাস্ক বৈদিক নিঘণ্টুতে ইলা শব্দ পৃথিবী অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার শিষ্টপ্রয়োগ ত একটী ও দেন নাই?। তিনি তাঁহার নিরুক্তের ১০ম পৃষ্ঠায় ইলা শব্দের নিরুক্তি বলিতে যাইয়া শিষ্ট প্রয়োগ স্বরূপ ঋগ্‌বেদের ৩টী ঋকের নাম লইয়াছেন, কিন্তু সে তিনটী ঋকের একটী ইলা শব্দও পৃথিবী অর্থবোধক নহে। তিনি ইলা শব্দের অর্থ অন্ন-বাক্য ও গোও বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রস্তুত বিষয়ের বহির্ভূত পদার্থ। সে

অর্থগুলি সঙ্গত, কিন্তু তাহার স্থানও স্বতন্ত্র। যাস্কের সে ঋক ৩টী-এই—

"ইলায়া স্তা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি।
জাতোবেদ নিধীমহি অগ্নে হব্যায় বোঢ়বে। ৪ ॥ ৪—২৯সূ—৩ম
অধা হোতা ন্যসীদো যজীয়ান্ ইলস্পদ ইষয়ন্নীড্যঃ সন্" ইত্যাদি।
২—১সূ—৬ম।

"জোহূত্রো অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেব ইলস্পদে মনুষান্ধ যত্ সমিমঃ।" ১—১০-২

এখানে প্রথম ঋক্‌টী লইয়া বিচার করিতে যাইয়া আমারা পুনরায় পৃথিবী ও ইলা শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং এখানেও এ ইলা অর্থ পৃথিবী নহে। এখানেও বলা হইতেছে।—পৃথিব্যাঃ নাভা (শ্রেষ্ঠ) ইলায়াঃ পদে। অতএব এই ইলা এরূপ একটী পবিত্র স্থান, যাহা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল।

দ্বিতীয় ঋক্‌টীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সায়ণ বলিয়াছেন, "অধ অধুনা হে অগ্নে যজীয়ান্ অতিশয়েন যষ্টা ত্বং হোতা হোমনিষ্পাদকঃ সন্ ইলঃ ভূম্যাঃ বেদীলক্ষণায়াঃ পদে স্থানে ন্যসীদো নিষণ্ণবানসি" ইত্যাদি।

সায়ণের এ ব্যাখ্যা আরও অদ্ভুত। যাস্ক ইলা অর্থ পৃথিবী বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য সায়ণ প্রথমতঃ ইলা অর্থ ভূমি (কাজেই পৃথিবী) বলিলেন। কিন্তু পৃথিবী অর্থ করিলে পদার্থ-গ্রহ হয় না, এজন্য সায়ণ উহাকে টানাটানি করিয়া বেদী অর্থে লইয়া গেলেন। যাস্ক কিন্তু কুত্রাপি ইলা শব্দের বেদী অর্থ অভিব্যক্ত করেন নাই। আমরা মনে করি—ইলা অর্থ স্বতন্ত্র কিছু কি ? তাহা ক্রমে বলিব। ৩য় ঋক্‌টীতেও সায়ণ বলিতেছেন—

"জোহূত্রঃ সর্ব্বৈর্যজ্ঞার্থং হ্বাতব্যো হোতব্যো বা তাদৃশঃ প্রথমঃ অগ্নির্বৈ দেবানাং প্রথম ইত্যাম্নানাৎ মুখ্যঃ যো অগ্নিঃ যত্ যদা ইলঃ ইলায়াঃ পদে উত্তরবেদ্যাত্মকে স্থানে মনুষা মনুষ্যেণ যজমানেন সমিদ্ধঃসোঽগ্নিঃ।" ইত্যাদি।

সায়ণ এখানে ইলার অর্থ যাস্কের মুখের দিক চাহিয়া পৃথিবীও করিলেন না। তিনি করিলেন উত্তরবেদী। কিন্তু এ অর্থ ভ্রান্তিপূর্ণ। ইলা অর্থ এখানে না পৃথিবী না উত্তরবেদী। শ্রীযুক্ত দত্তজ মহাশয়

ইলার অর্থ ঠিক করিয় কিছু লিখেন নাই, তথাপি তাঁহার ব্যাখ্যাদ্বারা কতক সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার ব্যাখ্যাটী এই—

"অগ্নি সকলের হোতব্য ও প্রথম এবং পিতার ন্যায়। তিনি মনুষ্য কর্ত্তৃক ইলা পদে প্রজ্জ্বালিত হইয়াছেন"।

এখন দেখ, অগ্নি প্রথম কোথায় প্রজ্জ্বালিত হইয়া ছিলেন ?। অগ্নি কি, প্রথমে পৃথিবীতে প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিলেন ? না। মহর্ষি অথর্ব্বা তাঁহাকে পুষ্কর পর্ণ ঘর্ষণে সর্ব্বাদৌ স্বর্গধামে প্রজ্জ্বালিত করেন। পরে দেবতারা উহা পৃথিবীতে অনিয়াছিলেন।

যথা—"ত্বামগ্নে পুষ্করাদধি অথর্ব্বা নিরমন্থত।
মূর্দ্ধ্নো বিশ্বার্য বাথতঃ ॥" ১৩—১৬ সূ—৬ ম।
"দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে আগ্নঃ।" ১—৪৫ সূ ১০ ম।

তথাহি—"সুবর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ সুবর্গমেব লোকং সমারোহতি আগ্নি মূর্দ্ধা দিবঃ। দেবলোকাদেব মনুষ্যলোকে প্রতিতিষ্ঠতি অয়ং।"কৃষ্ণযজুঃ ৩৮পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বভারত সন্তান গ্রীক্‌দিগের মধ্যেও স্বর্গহইতে অগ্নিকে চুরি করিয়া আনয়নের কথা প্রবাদ আছে। যথা—

অতএব ইলার অর্থ পৃথিবী নহে, এস্থলে উহার অর্থ স্বর্গ। এবং "প্রথম" পদটী আমরা বিভক্তি ব্যত্যয়ে প্রথমং করিয়া "সমিদ্ধ" গৌণক্রিয়ার বিশেষণ করিতে চাহি।

যাহা হউক যাস্ক পৃথিবী অর্থের পোষণার্থ এই তিনটী ঋকের অধ্যাহার করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। সায়ণের স্বাতন্ত্র্য ও বৃথা অবলম্বিত হইয়াছে।

আমাদিগের মত এই যে—ইলা শব্দ বেদের কুত্রাপি পৃথিবী অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। উহার বিশদার্থ স্বর্গ বা ইলাবৃত বর্ষ। ইলা শব্দ, ইলাবৃত বর্ষ শব্দের একদেশ, তজ্জন্য উহা স্বর্গার্থবাচী। ইলা শব্দের অর্থ বুধপত্নী। সম্ভবতঃ বুধপত্নী ইলা একদিন স্বর্গে আধিপত্য করিয়া থাকিবেন, তজ্জন্য স্বর্গ "ইলায়াঃ পদং" (ইলায়াঃ স্থানং) বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকিবে।

ইলা বা ইলায়াঃ পদং শব্দে যে স্বর্গ বুঝাইয়া থাকে, তাঁহার প্রমাণ জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত ঋক্‌গুলির পুনঃ ঋকের অধ্যাহার করিব। যথা—

"জোহুত্রো অগ্নিঃ প্রথমঃ পিতেব ইলাস্পদে মনুষা যৎ সমিদ্ধঃ।"

এখানে এই "ইলায়াঃ পদে" ভাগ দ্বারা স্বর্গার্থ স্ফুটীকৃত হইতেছে। কেননা অগ্নি অতি প্রথম স্বর্গেই মহর্ষি অথর্ব্বাকর্ত্তৃক প্রজ্বালিত হয়েন। যথা—

"দিবস্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নি রস্মদ্ দ্বিতীয়ং পরিজাত বেদাঃ।"

১—৪৫ সূ—১০ম।

"অগ্নির্জাতো অথর্ব্বণা বিদদ্ বিশ্বানি কাব্যা।" ৫—২১ সূ—১০ম

"ত্বামগ্নে পুষ্করা দধি অথর্ব্বা নিরমন্থত। মূর্দ্ধা বিশ্বস্য বাঘতঃ॥" ১৩—১৬—৬ম

তত্র সায়ণঃ—"অগ্নিঃ প্রথমং পূর্ব্বং দিবোদ্যুলোকস্য পরি উপরি আদিত্যাত্মনি জজ্ঞে জাতঃ।"

"অথর্বণা এতন্নাম্না ঋষিণা জাতঃ জনিতঃ অগ্নিঃ" ইত্যাদি।

হে অগ্নে অথর্বা এতৎসংজ্ঞক ঋষিঃ ত্বাং পুষ্করা দধি পুষ্করপর্ণে নিরমন্থত। অরণ্যোঃ সকাশাৎ অজনরৎ ইত্যাদি।

কাণা গরুর ভিন্ন পথ চিরপ্রসিদ্ধ। তজ্জন্য আমরা এই ৩টী ঋকের এইরূপ অর্থ করিতে চাহি।

অথর্ব্বা ঋষি (দধীচি মুনির পিতা) আদি স্বর্গ মেরু পর্ব্বতে (ইলাবৃত বর্ষস্থ মেরুপর্ব্বত—বর্ত্তমান আলটাই) খেলাস্থলে শুষ্ক পদ্মপত্র ঘর্ষণ করিতেছিলেন, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ইহার পূর্ব্বে অগ্নি ছিল না। তৎপরে যখন বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ মন্বাদিসহ ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হয়েন, তখন তাঁহারা অগ্নিকে স্বর্গ হইতে আমাদের পার্থিব লোক এই ভারতে আনয়ন করেন।

অতএব যে ইলাতে বা ইলাপদে অগ্নির প্রথম উৎপত্তি হয়, অগ্নি স্বর্গ প্রভব বলিয়া সেই ইলাই স্বর্গ হইবার কথা। সে ইলার অর্থ পৃথিবী বা উত্তর বেদী কিছুই হইতে পারে না। *

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

* প্রবন্ধটী বৃথা বাগ্‌জাল ও অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। প্রবন্ধকার সায়ণ কি বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া একেবারেই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—ইহাই দুঃখের বিষয়, অথবা ইহা কালের দোষ।—সং—

লোকবগ্‌গো তেরসমো।

হীনং ধম্মং ন সেবেয্য পমাদেন ন সংবসে।
মিচ্ছাদিট্‌ঠিং ন সেবেয্য ন সিয়া লোকবদ্ধনো ॥ ১ ॥

অন্বয়,—হীনং ধম্মং ন সেবেয্য, পমাদেন ন সংবসে, মিচ্ছাদিট্‌ঠিং ন সেবেয্য, লোকবদ্ধনো ন সিয়া।

সংস্কৃত,—হীনং ধর্ম্ম ন সেবেত, প্রমাদেন ন সংবসেৎ, 'মিথ্যাদৃষ্টিং' (অসত্যদর্শনং) ন সেবেত, লোকবর্দ্ধনঃ (লোকরঞ্জকঃ) ন স্যাৎ।

'মিচ্ছাদিট্‌ঠি'—মিথ্যাদৃষ্টি—'দিট্‌ঠি' অর্থাৎ দৃষ্টি শব্দের (childers) চাইল্ডার্স সাহেব ('false doctrine ; heresy') 'মিথ্যানীতি' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 'দৃষ্টি' শব্দের একটী প্রতিশব্দ 'দর্শন'। 'দর্শন' শব্দ যে বিশেষ অর্থে (philosophy) ব্যবহৃত হয়, বোধ হয় 'দৃষ্টি' শব্দও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত। তবে 'অনুসয়,' 'ওঘ,' 'যোগ,' 'উপাদান' প্রভৃতির মধ্যে যে 'দিট্‌ঠি' শব্দ দৃষ্ট হয়, উহা মন্দ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতে অনুমিত হয়, পরে এই শব্দ বিকৃত অর্থে (wrong philosophy ; false doctrine) ব্যবহৃত হইয়াছিল। (childers) চাইল্ডার্স সাহেবও এই অর্থ সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে এ অর্থের কোনই প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না। অধিকন্তু উহা গ্রহণ করিলে 'মিথ্যা' এই বিশেষণের কোনই সার্থকতা থাকে না। ধম্মপদের অন্যত্র * ঠিক এই অর্থে 'মিচ্ছাদস্‌সন' (মিথ্যাদর্শন) এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অন্ততঃ ধম্মপদে, 'দিট্‌ঠি' এবং 'দস্‌সন' এই দুইটি শব্দই এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুবাদ,—হীন ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে না, প্রমত্ত ভাবে (অর্থাৎ চিন্তাহীন হইয়া) জীবন যাপন করিবে না, মিথ্যা দর্শনের (মতের) অনুসরণ করিবে না, পৃথিবীকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যগ্র হইবে না।

উত্তিট্‌ঠে নপ্‌পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ ॥ ২ ॥

অন্বয়,—উত্তিট্ঠে, নপ্পমজ্জেয্য, সুচরিতং ধম্মং চরে; ধর্ম্মচারী অস্মিং লোকে পরম্হি চ সুখং সেতি।

সংস্কৃত,—উত্তিষ্ঠেৎ, ন প্রমাদ্যেৎ, সুচরিতং ধর্ম্মং চরেৎ; ধর্ম্মচারী অস্মিল্লোকে পরস্মিঞ্চ ন সুখং শেতে।

অনুবাদ,—উঠ, অলস হইয়া থাকিও না, সদ্ধর্ম্ম আচরণ কর! ধর্ম্মচারী ইহ এবং পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন।

ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ ॥ ৩ ॥

অন্বয়,—সুচরিতং ধর্ম্মং চরে, ন তং দুচ্চরিতং চরে; ধর্ম্মচারী অস্মিং লোকে চরম্হি চ সুখং সেতি।

সংস্কৃত,—সুচরিতং ধর্ম্মং চরেৎ, ন তৎ দুশ্চরিতং চরেৎ; ধর্ম্মচারী অস্মিল্লোঁকে পরস্মিংশ্চ সুখং শেতে।

অনুবাদ,—সদ্ধর্ম্ম আচরণ করিবে, অসদ্ধর্ম্ম (অর্থাৎ পাপের ধর্ম্ম) আচরণ করিবে না; ধর্ম্মচারী ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখে থাকেন।

যথা বুব্বুলকং পাস্স যথা পস্সে মরীচিকং।
এবং লোকং অবেক্খন্তং মচ্চুরাজা ন পস্সতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়,—যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা (চ) মরীচিকং পস্সে, এবং লোকং অবেক্খন্তং (পুগ্গলং) মচ্চুরাজা ন পস্সতি।

সংস্কৃত,—যথা বুদ্বুদকং পশ্যেৎ যথা চ মরীচিকাং পশ্যেৎ তথা লোকং অবেক্ষমানং পুরুষং মৃত্যুরাজঃ ন পশ্যতি।

অনুবাদ,—লোকে বুদ্বুদকে যেরূপ দেখে এবং মরীচিকাকে যেরূপ দেখে, এই পৃথিবীকে যদি সেইরূপ দর্শন করে, তবে যমরাজ তাহাকে অবলোকন করেন না।

এথ পস্সিইমং লোকং চিত্তং রাজরথূপমং।
যথ বালা বিসীদন্তি নত্থি সঙ্গো বিজানতং ॥ ৫ ॥

অন্বয়,—এথ, ইমং লোকং চিত্তং রাজরথূপমং পস্সথ, যথ বালা বিসীদন্তি, যথ বালা বিসীদন্তি, (যথ) বিজানতং সঙ্গো নত্থি।

সংস্কৃত,—এত, ইমং লোকং চিত্রং রাজরথোপমং পশ্যত, যত্র বালাঃ বিষীদন্তি, যত্র বিজানতাং সঙ্গঃ নাস্তি।

অনুবাদ,—এস, এই জগৎকে বিচিত্র রাজরথের ন্যায় অবলোকন কর, যেখানে মূর্খেরা শোক প্রাপ্ত হয়, যেখানে জ্ঞানিগণ আসক্ত হয়েন না।

যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো নপ্পমজ্জতি।
সোহমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তোহব চন্দিমা ॥ ৬ ॥

অন্বয়,—যো পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা নপ্পমজ্জতি, সো অব্ভা মুত্তো চন্দিমা ব ইমং লোকং পভাসেতি।

সংস্কৃত,—যঃ পূর্ব্বং প্রমাদ্য (প্রমত্তো ভূত্বা) পশ্চাৎ ন প্রমাদ্যতি (অপ্রমাদী ভবতীত্যর্থঃ), সোহভ্রাৎ (মেঘাৎ) মুক্ত চন্দ্রমা ইব ইমং লোকং প্রভাসয়তি (প্রকাশীকরোতি, উজ্জ্বলীকরোতি)।

অনুবাদ,—যে পূর্ব্বে প্রমত্ত থাকিয়া পরে অপ্রমাদী হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগৎকে উজ্জ্বল করে।

যস্স পাপং কতং কম্মং কুসলেন পিথীয়তি।
সোহমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মত্তো ব চন্দিমা ॥ ৭ ॥

অন্বয়,—যস্স কতং পাপং কম্মং কুসলেন পিথীয়তি, সো অব্ভা মুত্তো চন্দিমা ব ইমং লোকং পভাসেতি।

সংস্কৃত,—যস্য কৃতং পাপং কর্ম্ম কুশলেন (কর্ম্মণেতি শেষঃ) অপি স্তীর্য্যতে (আব্রিয়তে), সোহভ্রাৎ মুক্তশ্চন্দ্রমা ইব ইমং লোকং প্রভাসয়তি।

অনুবাদ,—যাহার কৃত পাপ কর্ম্ম কুশল কর্ম্মের পুণ্য দ্বারা আবৃত হয়, সে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জগৎকে উজ্জ্বল করে।

অন্ধভূতো অয়ং লোকো তনুকেহত্থ-বিপস্সতি।
সকুন্তো জালমুত্তো ব অপ্পো সগ্গায় গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়,—অয়ং লোকো অন্ধভূতো, অথ তনুকো বিপস্সতি; জালমুত্তো সকুন্তো ব অপ্পো সগ্গায় গচ্ছতি।

সংস্কৃত,—অয়ং লোকঃ অন্ধভূতঃ, অত্র তনুকঃ (অল্প এব) বিপশ্যতি (সম্যগবেক্ষতে); জালমুক্ত শকুন্ত ইব অল্পঃ (জনঃ ইতি শেষঃ) স্বর্গায় (অপবর্গায়) গচ্ছতি।

অনুবাদ,—এই পৃথিবী অন্ধকারময়, এখানে অল্প লোকেই উত্তমরূপে দেখিতে পায় ; অল্প লোকেই জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

হংসাদিচ্চপথে যন্তি আকাশে যন্তি ইদ্ধিয়া।
নীয়ন্তি ধীরা লোকস্মা জেত্বা মারং সবাহিনিং ॥ ৯ ॥

অন্বয়,—হংসা আদিচ্চপথে যন্তি, (তে) ইদ্ধিয়া আকাসে যন্তি ; ধীরা সবাহিনিং মারং জেত্বা লোকস্মা নীয়ন্তি।

সংস্কৃত,—সংসাঃ (পক্ষিবিশেষা বদ্বা সাধবঃ) আদিত্যপথে যন্তি, তে ঋদ্ধ্যা আকাশে যন্তি ; ধীরাঃ সবাহিনীকং মারং জিত্বা (অস্মাৎ) লোকাৎ নীয়ন্তে।

অনুবাদ,—হংসগণ আদিত্যপথে গমন করে, তাঁহারা ঋদ্ধিদ্বারা আকাশে বিচরণ করেন ; ধীর ব্যক্তিগণ সসৈন্য মারকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী হইতে নীত হন।

একং ধম্মং অতীতস্স মুসাবাদিস্স জন্তুনো।
বিতিণ্ণ পরলোকস্স নত্থি পাপং অকারিয়ং ॥ ১০ ॥

অন্বয়,—একং ধম্মং অতীতস্স মুসাবদিস্স বিতিণ্ণ পরলোকস্স জন্তুনো অকারিয়ং পাপং নত্থি।

সংস্কৃত,—একং ধর্ম্মমতীতস্য মৃষাবাদিনঃ (মিথ্যাকথনশীলস্য) বিতীর্ণ পরলোকস্য (অনাদৃত স্বর্গমার্গস্য) (জন্তনঃ জনস্যেত্যর্থ) অকার্য্যং পাপং নাস্তি।

অনুবাদ,—যে একটিও শাসনবাক্য লঙ্ঘন করিয়াছে, যে মিথ্যাবাদী, যে পরলোকবিষয়ে অবহেলা প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তির অকার্য্য পাপ কিছুই নাই।

ন বে কদারিয়া দেবলোকং বজন্তি বালা হবে ন প্পসংসন্তি দানং।
ধীরো চ দানং অনুমোদমানো তেনেব সো হোতি সুখী পরথ ॥১১॥

অন্বয়,—কদরিয়া বে দেবলোকং ন বজন্তি, বালা হবে দানং ন প্পসংসন্তি, ধীরো চ দানং অনুমোদমানো তেনেব সো পরথ সুখী হোতি।

সংস্কৃত,—'কদর্য্যাঃ'(কৃপণাঃ, অদানরতাঃ)বৈ দেবলোকং ন ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি) বালাঃ (মূর্খাঃ) হবৈ দানং ন প্রশংসন্তি, ধীরশ্চ (জ্ঞানী চ) দানং অনুমোদমানঃ (প্রশংসন্) তেনৈব পরত্র (পরকালে) সুখী ভবতি।

'কদরিয়া'—কদর্য্যাঃ—পালিতে কদর্য্য শব্দ 'কৃপণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অনুবাদ,—কৃপণ ব্যক্তিরা দেবলোকে প্রাপ্ত হয় না ; মূর্খেরাই দানকে প্রশংসা করে না, কিন্তু জ্ঞানিগণ দানকে প্রশংসা করেন এবং তদ্দ্বারাই পরলোকে সুখী হয়েন।

পথব্যা একরজ্জেন মগ্গস্স গমনেন বা।
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং ॥ ১২ ॥

লোকবগ্গো তেরসমো।

অন্বয়,—পথব্যা একরজ্জেন, মগ্গস্স গমনেন, সব্বলোকাধিপচ্চেন বা সোতাপত্তিফলং বরং।

সংস্কৃত,—পৃথিব্যাঃ ঐকরাজ্যাৎ (একাধিপত্যাৎ), স্বর্গস্য গমনাৎ, সর্ব্বলোকাধিপত্যাদ্বা 'স্রোত আপত্তিফলং' বরং (শ্রেষ্ঠং)।

সোতাপত্তিফলং—স্রোতআপত্তিফলং—বৌদ্ধসাধনকাণ্ডে চারিটি মার্গ আছে, সোতাপত্তি, সকদাগমনং (সকৃদাগমনম্), অনাগমনং ও অরহত্তং (অর্হত্ত্বম্) সোতাপত্তি অর্থাৎ (মার্গরূপ স্রোত প্রাপ্তি, স্রোতে আগমন ; এই মার্গে প্রবেশ করিলে জীবকে আরও সাত বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সকদাগমনং অর্থাৎ একবার আগমন ; যিনি এই মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন (সকদাগামী) তাঁহাকে আর একবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অনাগমনং অর্থাৎ না আসা ; যিনি এই মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন (অনাগামী তাঁহাকে পৃথিবীতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। অরহত্তং অর্থাৎ যে অবস্থায় সকলের পূজনীয় হওয়া যায় ; যিনি এই সর্ব্বোচ্চ মার্গে প্রবেশ করিয়াছেন (অরহা) তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ইহার প্রত্যেকটী আবার উচ্চতা অনুসারে দুইভাগে বিভক্ত, যথা সোতাপত্তি মগ্গো (স্রোত আপত্তি মার্গ, ইহা 'সোতাপত্তি'র সাধন কাল) সোতাপত্তিফলং (স্রোত আপত্তির ফল বা সিদ্ধি) সকদাগামিমগ্গো, সকদাগামিফলং ; অনাগামিমগ্গো, অনাগামিফলং ; অরহত্তমগ্গো, অরহত্তফলং।

অনুবাদ,—পৃথিবীর ঐকরাজ্য, স্বর্গগমন, কিম্বা সর্ব্বলোকাধিপত্য অপেক্ষা 'স্রোত আপত্তিফল' শ্রেষ্ঠ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

হিন্দু-বৈবাহিক বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ঋষি এই আখ্যায়িকা দ্বারা এই তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিলেন যে, সংসর্গের এমনই শক্তি, মনুষ্যের ত হইবেই, কিন্তু সংসর্গ জনিত দোষ এবং গুণ পশু-পক্ষীতে পর্য্যন্ত সংক্রমিত হইয়া থাকে।

এখন স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সংসর্গের আবার দোষ কি? আর গুণই বা কি? কেনই বা সংসর্গ দ্বারা গুণ বা দোষের উপচয় বা অপচয় হইবে?

এই বিষয়টী বুঝিতে বা বুঝাইতে হইবে। প্রথমতঃ "সংসর্গ" কি বস্তু তাহা ভাবিতে হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা সংসর্গের অর্থ, শক্তি, গুণ, দোষ ও প্রকারাদি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইতে উদ্‌যুক্ত হইতেছি—তবেই হিন্দু-বৈবাহিক বিজ্ঞান আরও বিশদভাবে বুঝাইতে হইবে।

জগতে এক বস্তুর সম্বন্ধ হয় না, সম্বন্ধ দুই তিন বা ততোঽধিক বস্তুর "সংসর্গ" বা সংস্রব। সেই সংসর্গ অনেকপ্রকার—শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক। তাহাও আবার স্থান বিশেষে বিষয় বিশেষে বহু প্রকার, যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, পরম্পরা সম্বন্ধ, দূরত্ব সম্বন্ধ, সামীপ্যসম্বন্ধ, প্রতিকূলত্ব সম্বন্ধ, এবং অনুকূলত্ব সম্বন্ধ ইত্যাদি—

যেমন অগ্নি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া কাষ্ঠ ভস্ম করে, সূর্য্যরশ্মি সংযোগে পদ্ম বিকসিত করে, রসনাগ্রে মনে মনে অম্ল সংযোগের চিন্তা করিলে রসনায় সূক্ষ্মরূপে অম্লরস অনুভূত ও জল উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি।

আবার ইহাও বুঝিতে হইবে, যে দুই বস্তুর সম্বন্ধ হয়, সেই দুই বস্তুর পরস্পরের গুণ দুই বস্তুতেই সংক্রমিত হয়। যেমন গোলাপ ফুল ও জল, এই দুইয়ের সংযোগে গোলাপ ফুলের সদ্‌গন্ধ জলে, ও জলের শীতলতা গোলাপ ফুলে সংক্রমিত হয়। কিন্তু কোথাও সেই সম্বন্ধ জনিত সংক্রমিত গুণের উপলব্ধি প্রত্যক্ষরূপে স্থূলতঃ বুঝিতে পারা যায়, কোথাও বা উহা

এত সূক্ষ্মরূপে থাকে যে, তাহা অনুভব করা যায় না। ফলতঃ পরস্পরের গুণের পরিবর্ত্ত হইবেই হইবে—ইহা নিশ্চয়।

তন্মধ্যে প্রবল গুণই দুর্ব্বল গুণকে নিস্তেজ করিয়া স্ফুটরূপে প্রকাশমান হয়; দুর্ব্বল গুণের কার্য্য ততটা পরিস্ফুট হয় না।

শাস্ত্রকারগণ পাপী ও পাপের সংসর্গ মনে মনে করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। চণ্ডালের ছায়া স্পর্শও করিবে না, পাষণ্ড নাস্তিকের সহিত আলাপরূপ সম্বন্ধও করিবে না, ধর্ম্মধ্বজী ও বিড়ালতপস্বীকে পানার্থ জল প্রদানও করিবে না,—প্রদান করিলে পাপ জন্মিবে। যথা মনু ৪।১৯২—

"হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ।"

" বার্য্যপি ন প্রদদ্যাত্তু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।

ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাঽবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥"

কি ভয়ঙ্কর কথা! কি লোপহর্ষণ ব্যাপার! পিপাসার্ত্ত ধর্ম্মধ্বজীকে জল পর্য্যন্তও দিবে না? মনু কি এতই নৃশংস? আপাততঃ তাহাই বোধ হয় বটে; দেখা যাউক ইহার অন্তর্নিহিত কিছু রহস্য আছে কি না?

অনেক শাস্ত্রে অনেক দেশে সৎসংসর্গের, কত প্রশংসা আছে এবং সৎ-সংসর্গ করিবার বিধিও যথেষ্ট আছে,—অনেকে তাহা করিয়াও থাকেন।

ভাবিয়া দেখুন, এইমাত্র আপনি কোনও তৈলঙ্গ স্বামীর মত এক মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখনই আপনার হৃদয়ে অতর্কিতভাবে অজ্ঞাতরূপে বিনয়, আর্জ্জব সত্যবাদিতা ও দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ অবশ্যই উপস্থিত হইবে। সেই হৃদয়াঙ্কিত বিনয়াদির চিহ্ন স্বরূপ অঞ্জলিবদ্ধ প্রভৃতি শরীরেও জন্মিবে,—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

আবার সে স্থান হইতে আপনি যেই স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তখনই আপনি সেই বিনয়, দয়া, শিষ্টতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল হারাইতে লাগিলেন। সাধুর সাক্ষাতে যে বিনয়াদির তরঙ্গ উঠিয়াছিল, পথে আসিতে সেই তরঙ্গ ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। অবশেষে এককালে তিরোহিত হইয়া গেল, আপনি পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখনও ঠিক তাহাই হইলেন।

কেন এমন হইল? আপনি ইহার আর উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

তবে মোটামুটি বুঝিতে পারিলেন যে, সৎসংসর্গের ঐরূপ মাহাত্ম্য। এখন একটুকু ভাঙ্গিয়া স্ফুটরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।——

জগতে যে কিছু বস্তুর অস্তিত্ব দেখা যায়, তৎসমুদয়ই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে উৎপন্ন। সত্ত্বের ধর্ম্ম—সুখ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রকাশাদি সদ্‌গুণ, রজোগুণের ধর্ম্ম দুঃখ, লোভ, কার্য্যোত্তম, অভিমান ইত্যাদি; তমোগুণের ধর্ম্ম—অজ্ঞান, আলস্য, নিদ্রা ও জড়তা প্রভৃতি। আবার উক্ত সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞান প্রভৃতিও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক রূপে তিন তিন প্রকার বিভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক।

সেই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের ইহাও একটী স্বভাব আছে যে, একগুণ অপর গুণকে দমন করিয়া নিজে বড় হয়, যথা—

"পরস্পরাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ" (সাংখ্যকারিকা ১২) যখন যে ব্যক্তির সত্ত্বগুণে রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করে, তখন ঐ ব্যক্তি শান্ত, সুখী ও সাধুরূপে পরিণত হয়। এবং যখন যাহার রজোগুণ উত্তেজিত হইয়া সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভুত করে, তখন সে ব্যক্তি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাহার শরীরে বিনয়, দয়া, হিতাহিত বোধ কিছুই থাকে না। আবার যখন তমোগুণ উচ্ছলিত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে, তখন সে ব্যক্তি অজ্ঞান, অলস বা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে, এমন কি জড় প্রস্তরখণ্ডের মত হইয়া পড়ে। তখন তাহার এক অঙ্গ ছিন্ন করিলেও অনুভব হয় না।

কেন এক গুণ উর্ত্তেজিত হইয়া অপর গুণকে পরাভূত করে? কেনই বা এক গুণ বলবান্ হয়, আর কেনই বা অপর গুণ দুর্ব্বল হয়? ইহার কারণ নানারূপ বস্তুর সংসর্গ।

যেমন কোনও পথিক প্রখর রৌদ্র সংযোগে সত্ত্বগুণ হারাইয়া উত্তপ্ত হইয়া দুঃখ অনুভব করিকেছিল, এমন সময় শীতল জলে অবগাহন করিল, শর্করা মিশ্রিত সুশীতল জল পান করিল, তরুতলে শীতল সমীরণ সেবন করিল, তখন সেই জল ও সমীরণের সংযোগ সংসর্গে তাহার শরীর ও মনের সত্ত্ব গুণ উদ্রিক্ত হইল,—সেই উদ্রিক্ত সত্ত্বে রজস্তমোগুণকে পরাভূত করিল,—সুতরাং পথিক সুখী হইল।

এইরূপ মনে করুন, কোনও একটী প্রকৃতিস্থ লোক প্রথমে আনন্দ ও ধ্যেয় বস্তুতে লক্ষ্য স্থির করিবার আশায় অল্প মাত্রায় মদ্য পান করিল, আবার সুরা ঢালিল, আবার খাইল, মাত্রা অতিক্রম করিল, রজোগুণ উচ্ছলিত হইয়া সত্ত্বগুণকে লুপ্ত করিয়া দিল, ক্রমে সে তমোগুণের সহায়তায় জলে স্থল ও স্থলে জল, আকাশে অশ্ব হস্তী উঠিতেছে দেখিতে পাইল।—ভাইকে শ্যালা, শ্যালাকে বাবা বলিয়া চীৎকার করিল,—হাসিল,—কাঁদিল। বমন করিল, তাহা গায়ে মাখিল—তাকিয়া ছিঁড়িল, ঘরময় তুলা উড়াইল—কাপড় ছাড়িল, নৃত্য করিল, পাখী হইয়া উড়িল, আর ঘাড় ভাঙ্গিল। তখন সুরাদেবীর পানসংসর্গে তাহার সত্ত্বগুণ অপহৃত হইয়াছিল, কাজেই প্রকৃতি হারাইয়া নানারূপে অসুখী বা বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

আবার সেইরূপ কোনও দুষ্টব্রণরোগীকে "ক্লোরোফর্ম" (মূর্চ্ছাকারী ঔষধ বিশেষ) দ্বারা অজ্ঞান করিয়া যদি কাটিয়া ছিঁড়িয়া বা পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তখন সেই রোগীর "ক্লোরোফর্মের" আঘ্রাণ সংসর্গে সত্ত্ব ও রজোগুণ প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায়, জ্ঞান মাত্র থাকে না বলিয়া দুঃখানুভব করিতে পারে না। কারণ, তখন সে ঘোর তমসাবৃত হইয়া পড়ে।

রৌদ্র-প্রতপ্ত, মদ্যপায়ী ও ব্রণরোগীর অবস্থা যেমন স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, সংসংসর্গ বা অসৎ সংসর্গের কার্য্য তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে শনৈঃ শনৈঃ পরিস্ফুট হইয়া কালে প্রত্যক্ষপথে উপস্থিত হয়।

যাহারা রজোগুণবহুল, প্রকৃতিদুর্জ্জন, লম্পট, হিংস্র, তাহাদিগের মধ্যে যদি একজন সাধু চুপ করিয়া বসিয়াও থাকে, তথাপি সেই সকল অসতের শরীর হইতে উষ্মার সহিত দৌর্জ্জন্য, লাম্পট্যও হিংসা প্রভৃতি দোষরাশি ক্রমশঃ প্রসৃত হইয়া সেই সাধুর শরীরে একটু একটু করিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে। কিছুদিন পরে তাহার সাধুবৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। এবং চিত্তে কুভাব, কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তা উদিত হইতে পারে। কেননা অসতের সহিত একস্থানে উপবেশনরূপ সংসর্গের স্রোতে অসৎবৃত্তিসকল সাধুর শরীরে সংক্রমিত হইয়াছিল, ইহাই হেতু। কিছুদিন এইরূপ সংসর্গ গাঢ়তর হইলে তখন সে আর সাধু থাকিবে না, অসাধু হইয়া পড়িবে। এজন্যই অসতের সংসর্গ নিষিদ্ধ।

এতদূর চিন্তা করিয়াই ভগবান্ মনু নাস্তিকের সহিত আলাপরূপ সংসর্গ এবং বিড়ালতপস্বীর সহিত জল প্রদানরূপ সংসর্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহা না হইলে উহাদিগকে স্নানার্থ জল দিলেই যে জাতি কুল নষ্ট হইবে—তাহা নহে।

ইহা মহর্ষি বৃহস্পতিও বলিয়াছেন, যথা—

"একশয্যাশনং পঙ্‌ক্তির্ভাণ্ডপক্কান্ন মিশ্রণং।
যাজনাধ্যাপনং যোনিস্তথা চ সহভোজনং ॥
নবধা সঙ্করঃ প্রোক্তো ন কর্ত্তব্যোঽধমৈঃ সহ ॥"

(প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে পতিতসংসর্গ প্রকরণে)।

অর্থ—একাসনে উপবেশন, এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন, পাকপাত্র মিশ্রণ ও পক্কান্ন মিশ্রণ, এই পাঁচটী লঘু সংসর্গ এবং যাজন, অধ্যাপন, যৌনও একপাত্রে একত্র ভোজন—এই চারি প্রকার গুরুতর সংসর্গ। উক্ত নববিধ সংসর্গ পতিতের সহিত করিবে না।

মহর্ষি পরাশর বলেন—

"আসনাচ্ছয়নাদ্ যানাৎভাষণাৎ সহ ভোজনাৎ।
সংক্রমন্তি হি পাপানি তৈল বিন্দুরিবাম্ভসি ॥"

(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ঐ)

অর্থ—যেমন তৈল বিন্দু জলে ফেলিবামাত্র ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ এক শরীর হইতে পাপ বৃত্তি সকল একসঙ্গে উপবেশন, যাজন, গমন, পরস্পর আলাপ ও একত্র ভোজনরূপ সংসর্গে অপরের শরীরে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

মহর্ষি দেবল বলেন—

"সংলাপস্পর্শ নিঃশ্বাসসহ[illegible]যাসনাশনাৎ।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥"

(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ঐ)

অর্থ—পরস্পর আলাপ, স্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র আহার, যাজন, অধ্যাপন ও যৌনসংসর্গে এক শরীর হইতে অপর শরীরে পাপ সংক্রমিত হয়।

মহর্ষি ছাগলেয় বলেন—

"আলাপাদ্‌গাত্রসংস্পর্শান্নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং ॥"

(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ঐ)

অর্থ—আলাপ, দেহস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন, একত্র শয়ন ও একত্র অধ্যয়ন সংসর্গে পাপবৃত্তিগুলি অপর ব্যক্তিতে সংক্রান্ত হয়।

এজন্যই প্রাচীনেরা অন্ত্যজাদি স্পর্শ করিতেন না এবং অপরের নিশ্বাস বা হাঁচি (ক্ষুৎ) গায় লাগিলে দোষ মনে করিতেন।

শরীর তত্ত্ববিৎ ভগবান্ চরকাচার্য্যও দুষ্ট ব্যক্তির সংসর্গ বর্জ্জন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

"পাপবৃত্তবচঃসত্ত্বাঃ সূচকাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
মর্ম্মোপহাসিনো লুব্ধা পরবৃদ্ধিদ্বিষঃ শঠাঃ ॥
পরাপবাদরতয়ঃ পরনারীপ্রবেশিনঃ।
নির্ঘৃণাস্ত্যক্তধর্ম্মাণঃ পরিবর্জ্জ্যা নরাধমাঃ ॥"

(সূত্রস্থান, ৭ম অধ্যায়)

অর্থ—যাহাদের মন ও বাক্য কেবল পাপ বিষয়েই নিরত, যাহারা মিথ্যাবাদী, কলহপ্রিয়, যাহারা মর্ম্মান্ত কথা কহিয়া উপহাস করে, যাহারা লোভী, পরশ্রীকাতর, শঠ, পরাপবাদে যাহাদের আনন্দ, চঞ্চল প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, নির্দ্দয় ও পাপাত্মা, সেই নরাধমদিগের সহিত সংসর্গ বর্জ্জন করিবে।

ওলাউঠা রোগীর নিশ্বাসের সহিত পাকাশয় হইতে ওলাউঠার সূক্ষ্ম বীজ সমস্ত বাহির হইয়া অপরের শরীরে উষ্মা (তাড়িত) বা প্রশ্বাসের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া দুর্ব্বল সত্ত্ব পুরুষের সেই রোগ জন্মায়, এজন্য ওলাউঠা প্রভৃতি কতকগুলি রোগ সংক্রামক বলিয়া প্রসিদ্ধ। আলাপ, স্পর্শ, সহভোজন একশয্যায় শয়ন, একাশনোপবেশন, রোগীর বস্ত্র, রোগীর মালা ও রোগীর উৎকৃত চন্দন তৈলাদি ধারণে সংক্রামক রোগগুলি অন্যের শরীরে সংক্রান্ত হয়।

মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—কুষ্ঠ, সন্নিপাত জ্বর, শোষ, নেত্রাভিষ্যন্দ এবং

ঔপসর্গিক উৎপাতাদি জনিত মড়ক, যেমন বসন্ত, ওলাউঠা ও "বিউবোনিক্" (গ্রন্থিস্ফীতি) প্রভৃতি রোগ সংক্রামক। (১)

কিন্তু রোগাদি স্থূল বিষয়গুলি অনুভব করা যায়, আর সংক্রামক কুবৃত্তি বা কুভাব সকল স্ফুট বেদ্য নহে। পরন্তু প্রনিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

উপরোক্ত প্রবন্ধ সন্দর্ভ দ্বারা অসতের সংসর্গে সদ্ব্যক্তিও অসৎ হয়, যেমন বুঝিলাম, তেমন প্রবলসত্ত্বগুণসম্পন্ন সাধুব্যক্তির সংসর্গেও অসাধু ব্যক্তি সাধু হয়, ইহা শরীরতত্ত্ববিৎ হারিত ঋষি বলিয়াছেন,—

"হন্যাদশুদ্ধঃ শুদ্ধন্তু শুদ্ধোঽশুদ্ধন্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধশ্চ তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুধ্যতি ॥"

(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, পতিত সংসর্গে)

অর্থ—পাপী পুণ্যাত্মাকে অভিভূত করিতে পারে, অর্থাৎ পাপীর পাপবৃত্তিগুলি পুণ্যাত্মাতে সংক্রামিত হইলে তিনি আর পুণ্যাত্মা থাকেন না, পাপী হইয়া উঠেন, যেহেতু "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"।

কিন্তু যিনি অত্যন্ত পুণ্যাত্মা অর্থাৎ যাহার সত্ত্বগুণ এত সমধিক উদ্রিক্ত, যে শত শত পাপীর দেহ হইতে বিচ্ছুরিত পাপরাশিও তাঁহার সত্ত্বাগ্নিতে তৃণের মত পুড়িয়া যায়, সেই পুণ্যাত্মা শত শত পাপীকে মহাত্মা গৌরাঙ্গদেবের মত উদ্ধার করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহার শরীর হইতে সদ্বৃত্তিগুলি প্রসৃপ্ত হইয়া পাপীর শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তজ্জন্য পাপীর পাপবৃত্তিসমূহ জগাই মাধাই-এর মত তিরোভূত হইয়া যায়। তখন মলিনাত্মা পাপীও শুদ্ধের সংস্রবে বিশুদ্ধ হয়, কিন্তু এক দিন কি দুই দিনে সংসর্গের শক্তি তত বিকাশ পায় না, দীর্ঘকালেই তাহা জাগিয়া উঠে। অতএব বৌধায়ন প্রভৃতি ঋষিরা বলিয়াছেন—

(১) "প্রসঙ্গাদগাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এবচ।
ঔপসর্গিক রোগশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরং ॥"

(নিদান স্থান ৫ম, অধ্যায়)।

"ন সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্"

অর্থ—পতিত ব্যক্তির সহিত অন্ততঃ এক বৎসর কাল একত্র ভোজনাদি সংসর্গ করিলে শুদ্ধ ব্যক্তিও পতিত হয়। তন্মধ্যে গুরুলঘু সংসর্গের প্রভেদানুসারে নানাপ্রকার তারতম্যের উপদেশ আছে।

তন্ত্র শাস্ত্রে কথিত আছে—

"রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নীপাপঞ্চ ভর্ত্তরি।
তথাশিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥

(কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার)

অর্থ—মন্ত্রিকৃত পাপ রাজাতে, পত্নীর পাপ ভর্ত্তাতে, ও শিষ্যের পাপ গুরুতে সংক্রান্ত হয়।

অধিক কি বলিব? যদি ভোজন সময় এক পঙ্‌ক্তিতে একজন পাপী ব্রাহ্মণ উপবেশন করে, তবে তাহার মানসিক ও দৈহিক পাপবৃত্তিগুলি অপরের সম্মুখস্থ অন্নেতে সংক্রান্ত হয়। যে সেই অন্ন ভোজন করে, তাহার শরীরে ঐ পাপবৃত্তি প্রবিষ্ট হয়, অতএব সমস্ত পঙ্‌ক্তিকে দূষিত করে বিধায় সেই পাপী ব্রাহ্মণকে "পঙ্‌ক্তিদূষক" কহে। পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণ কত প্রকার? তাহা মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫২—১৬৭ শ্লোকে ৯৩ তিরনব্বই প্রকারে নির্ণীত আছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ী, দেবল, মাংস বিক্রয়ী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অতি নিকৃষ্ট, এমন কি উহারা এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার উপযুক্ত নহে, শাস্ত্রকারদিগের ইহাই মত।

কিন্তু গৃহস্থসমাজে ওরূপ কঠিন নিয়ম রক্ষা করা সম্ভবপর নহে। এজন্য উক্ত প্রকারে পাপ সংক্রমণের ভয় হইতে রক্ষার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস উপায় উদ্ভাবন করিয়া বলিয়াছেন—

"অপ্যেকপঙ্‌ক্তৌ নাশ্নীয়াৎ সংবৃত্তঃ স্বজনৈরপি।
কো হি জানাতি কস্যান্তে প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ।
ভস্ম-স্তম্ভ-জলদ্বারমার্গৈঃ পঙ্‌ক্তিঞ্চ ভেদয়েৎ ॥"

(আহ্নিক আচার তত্ত্ব)

অর্থ—অন্যের কথা আর কি বলিব? কিন্তু নিজের বন্ধুবান্ধবের সহিতও পরিবৃত হইয়া এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিবে না, কেন না কাহার

শরীরে কি কি মহাপাপ প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, তাহা কে জানে? কিন্তু তাহা অসম্ভব বিধায়, সেই পাপ বৃত্তি সংক্রমণের বাধার নিমিত্ত ভস্ম, তৃণ অথবা জলদ্বারা বেষ্টন করিয়া পঙ্‌ক্তি ভেদ পূর্ব্বক আহার করিবে।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল, সকলেরই শরীরের তেজঃপদার্থ, উষ্মা, বা তাড়িত উত্তাপরূপে ইতস্ততঃ অনবরত বিকীর্ণ হইয়াই থাকে, সেই তেজ তেজেতেই সমধিক আকৃষ্ট হয়। তেজের অসম্পৃক্ত অপক্ক ফল মূলাদিতে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং অগ্নি জল লবণাদি দ্বারা পাচিত অন্নাদি তেজে পাপীর কায়িক তেজে ঝটিতি সংক্রামিত হয়। কিন্তু মধ্যে যদি ভস্ম, তৃণ বা জলবেষ্টিত থাকে, তবে সেই উষ্মা ভস্ম, তৃণ বা জলে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়, আর অন্নে বা ভোক্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।

তেজের সংক্রমণ তেজেতেই সমধিক হয়, ইহার আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি যথা—

"চকোরস্য বিরজ্যেতে নয়নে বিষদর্শনাৎ।"

অর্থ—বিষ দর্শন করিলেই অর্থাৎ বিষের সহিত চক্ষুসংযোগ সংসর্গেই চকোর পক্ষীর চক্ষু বিরক্ত হয়,—চক্ষু ঝলসিয়া উঠে, কেন? না তীক্ষ্ণবীর্য্য বিষের তেজ চকোর পক্ষীর তৈজসেন্দ্রিয় চক্ষুকেই শীঘ্র আক্রমণ করে, সেই জন্যই ঋষিরা চকোর পক্ষীর নামান্তর "বিষদর্শনমৃত্যু" রাখিয়াছেন। (১) এতদ্দর্শনে চরকাদি বৈদ্যশাস্ত্রেও রাজার ভোজনের সময় চকোর পক্ষীকে অন্নের সাক্ষাতে রাখিবার উপদেশ দিয়াছেন। কেননা রাজার ভক্ষ্যবস্তুতে বিষ মিশ্রিত থাকিলে, চকোর পক্ষীর দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে। (১)

এ জন্যই চকোর পক্ষী দিবাভাবে বিষাক্ত (১) সূর্য্যরশ্মি ভয়ে লুকাইয়া থাকিয়াও কথঞ্চিৎ প্রবিষ্ট বিষজ্বালা নিবৃত্তির জন্য সুশীতল চন্দ্ররশ্মি পান করিয়া সুস্থ হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছে;—

"শ্বস্পৃষ্টং পতিতেক্ষিতং"

"উদক্যাস্পৃষ্টং" (আচাং ১৬৩)

অর্থ—যে অন্ন কুক্কুরে ও রজঃস্বলা নারী বা উচ্ছলিত বিষ পাপবৃত্তি নারী স্পর্শ করে, আর পতিত ব্যক্তি দর্শন করে, সে অন্ন আহার করিবে না।

(১) শব্দকল্পদ্রুমে, হেমচন্দ্রঃ।

হার তাৎপর্য্য এই যে—তমোগুণ প্রধান মলমূত্রভোজী কুক্কুরের ও বিষাক্ত পাপবৃত্তি রমণীর স্পর্শে ও সংসর্গে এবং তমোগুণবহুল পতিত ব্যক্তির দর্শন সংসর্গে অন্নেতে কুক্কুরের ও পতিতের তামসবৃত্তি আসিয়া সংক্রামিত হয়। সেই অন্ন ভোজনে সত্ত্বপ্রকৃতি আর্য্যজাতীয় মনুষ্যের শারীরিক বা আন্তরিক পুষ্টিসাধন বা সুখ শান্তি কথনই হইতে পারে না।

কোন কোনও জন্তু ও মনুষ্যের দৃষ্টিতেই ভক্ষ্যবস্তুতে বিষবৃষ্টি হয়। যথা।—(১)

"হীনদীনক্ষুধার্ত্তানাং পাপষণ্ডৈণ রোগিণাং।
কুক্কুটাদিশুনাং দৃষ্টির্ভোজনে নৈব শোভনা॥"

অর্থ—নীচজাতি, দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, পাপী, ক্লীব, হরিণ, রোগাতুর, কুক্কুট, ও কুক্কুরের দৃষ্টি ভোজন বিষয়ে ভাল নহে, অর্থাৎ উহাদের দৃষ্টি সংসর্গে চক্ষুর তেজের সহিত বিষাবশেষ প্রবিষ্ট হইয়া অন্ন দূষিত করে; সেই অন্ন আহারে অপকার হয়।

কিন্তু অনেক সময় উক্ত নিয়ম রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। অতএব উক্ত দৃষ্টির দোষনিবৃত্তির জন্য ঋষিরা দুইটী মন্ত্রপাঠ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, যথা—

"অন্নং ব্রহ্ম রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভুঞ্জানো দৃষ্টিদোষং ন বাধতে" ॥ ১ ॥
"অঞ্জনাগর্ভসম্ভূতং কুমারং ব্রহ্মচারিণং।
দৃষ্টিদোষবিনাশায় হনুমন্তং স্মরাম্যহং" ॥ ২ ॥

অর্থ—এই অন্ন সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, আর এই অন্নগত যে রস, তাহা স্বয়ং বিষ্ণু, আর এই অন্ন যিনি ভোজন করিতেছেন, তিনি হলাহল বিষ ভোক্তা মহেশ্বর,—এইরূপ চিন্তা করিয়া আহার করিলে, পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিদোষে লোক আক্রান্ত হয় না। ১।

১) "দৃষ্টি-নিঃশ্বাস-দংষ্ট্রাশ্চ নখ মূত্র মলানি চ।
শুক্রং লালামুখং স্পর্শঃ সংদংশশ্চাবমর্দ্দিতং।
গুদাস্থি পিত্তশুক্রাণি দশবট্ জঙ্গমাশ্রয়াঃ॥
(শব্দকল্পদ্রুম)

সেই অঞ্জনানন্দন কুমার ব্রহ্মচারী হনুমানকে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিদোষ বিনাশের জন্য আমি স্মরণ করিতেছি ॥ ২ ॥

আবার কোন কোনও প্রাণীর দৃষ্টিসংসর্গে অন্নাদিতে অমৃতও বৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব ভোজনের সময় তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী রাখা উচিত। যথা—

"পিতৃমাতৃসুহৃদ্বৈদ্যাপাপকৃদ্ধংসবর্হিণাং।
সারসস্য চকোরস্য ভোজনে দৃষ্টিরুত্তমা।

অর্থ—স্নেহাধার পিতামাতা, প্রিয়জন, বৈদ্য, ধার্ম্মিক, হংস, ময়ূর, সারস, ও চকোরের দৃষ্টি ভোজনের সময় প্রশস্ত, ইহাদিগকর্ত্তৃক অবলোকিত অন্নে অমৃতায়মান স্নেহ সংস্পৃষ্ট হয় বিধায়, সেই অন্ন ঝটিতি পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পুষ্টিসাধন করে।

অতএব যাঁহারা নীরোগশরীর, দীর্ঘজীবন ও সুখশান্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের যাহার তাহার পক্কান্ন খাওয়া উচিত নহে। কেননা, অপবিত্র পাচকের বা বাবুর্চ্চির শরীরগত তাড়িতের সহিত তামসিক প্রবৃত্তি অন্নে সংক্রান্ত হয়,—সেই অন্ন আহারে সাত্তিক প্রকৃতি হিন্দুর শরীরে সঞ্চিত সত্ত্বটুকু বিলুপ্ত হইবে, এবং পাচকের তামসিক বৃত্তি বলবতী হইবে। তাহা হইলেই সুখ শান্তির আশা সুদূরপরাহত হইবে।

এজন্যই শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য্য বিধানে এবং সত্ত্বোদ্রেকের নিমিত্ত পরান্ন অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রীয়ের পক্কান্ন ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। (১) নিজের স্ত্রী ও নিজের পুত্রাদি যদি যেমন তেমন করিয়া পাক করিয়া দেয়, তাহাও বিশেষ হিতকর হইবে। কেননা আপন গৃহলক্ষ্মী পত্নীর সেই সত্ত্বগুণের পরিণাম অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম স্নেহ তাড়িতের সহিত অন্নে সংক্রামিত হইয়া অন্নকে পবিত্র করিবে। কিন্তু বেতনভুক্ চাকর পাচক বা "বাবুর্চ্চি" সেই শ্রদ্ধা—সেই স্নেহ কোথায় পাইবে। তাহারা স্নান করা ত দূরের কথা, হয়ত রাত্রিবাস না ছাড়িয়াই, কতকগুলি শাক শবজী না দেখিয়া

(১) "অসগোত্রেণ যৎ পক্কং শোণিতং তদপি স্মৃতং।
অভক্তেন চ যৎ পক্কং স্ত্রিয়া পক্কং তথৈব চ" ॥ ৯ ॥
অভক্তয়া স্ত্রিয়া ইত্যর্থ। শ.ক.দ্রুঃ।

না ধুইয়া যৎকুৎসিতরূপে অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া দিয়া পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া নিষ্কৃতি পাইল, এখন তুমি খাও—আর না খাও, বাঁচ বা মর তাহা কি আর সে দেখিবে?

পূর্ব্বে পঙ্‌ক্তি দূষক ব্রাহ্মণের সংসর্গ শক্তি দেখান হইয়াছে। এখন "পঙ্‌ক্তি পাবন" ব্রাহ্মণের সংসর্গ শক্তি বলিতেছি ;—

পদ্মপুরাণে উক্ত আছে ;—

"ইমে হি মনুজশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
বিদ্যাবেদব্রত স্নাতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্ব এব হি" ॥

স্বর্গখণ্ড ; ৩৫।১—

অর্থ হে রাজন! যে যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রতাদিনিয়ম ও যথা বিধি স্নানাদি ক্রিয়ায় তৎপর, তাহারাই "পঙ্‌ক্তিপাবন"। উক্ত "পঙ্‌ক্তি পাবন" ব্রাহ্মণ অনেক প্রকার (১) ;—

উক্তরূপ একটীমাত্র পঙ্‌ক্তিপাবন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আহারের সময় যদি এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করেন, তাহা হইলে সমস্ত পঙ্‌ক্তি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ সেই সাত্ত্বিক পুরুষের শারীরিক তেজঃপ্রবাহে প্রবল সাধু বৃত্তি-সকল প্রসৃত হইয়া প্রথমে অন্নে, তৎপরে অন্নের সহিত ভোক্তৃবর্গের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। কাজে কাজেই সেই অন্ন সংসর্গে ভোক্তৃবর্গের মন পবিত্র হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? এই হেতুতেই সত্ত্ববহুল সাধুকে শাস্ত্রকারেরা "পঙ্‌ক্তি পাবন" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সংসর্গের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব? পাঠকগণ প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন যে, কোনও শ্রেষ্ঠ লোকের সহিত যে ব্যক্তি আহারে বিহারে সর্ব্বক্ষণ সংসর্গ করে, সেই শ্রেষ্ঠ লোকের আচার ব্যবহার, ভাব ভঙ্গি হাসি কণ্ঠস্বর, ও মুখ ভঙ্গি প্রভৃতি পর্য্যন্ত সহচর-বর্গের উপরে সংক্রামিত হয়।

ইহাই মহর্ষি মনু কৌশলে বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"যাদৃশেনৈব ভর্ত্তা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা" ॥

অর্থ—স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যদি অকৃত্রিম ভাবে স্নেহাদি সংসর্গ ঘটে,

তবে স্বামী যাদৃশ গুণবিশিষ্ট পত্নীও ঠিক তেমন গুণবিশিষ্ট হইবে। যেমন সমুদ্রের সংসর্গে মধুরজলা অপরাপর নদীও লবণাক্তা হইয়া যায়, সেইরূপ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার যে গুণ বেশী সেই গুণই সংসর্গ বিশিষ্ট ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হয়। স্ত্রী যদি সতী এবং সমধিক সাধুশীলা হয়, তবে তৎসংসর্গে দুষ্টপ্রকৃতি স্বামীও ক্রমে সাধুশীল হইবে। আবার স্ত্রী সমধিক দুষ্টা হইলেও তৎসংসর্গে স্বামীও দুষ্টত্তম লইবে।

এই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবেচনা করিয়াই দম্পতির পরস্পর মঙ্গল কামনায় আর্য্যঋষিগণ বালিকা বিবাহের জন্য মাথার দিব্য দিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উক্ত বালিকা বিবাহের সংসর্গের যুক্তিতেই যুবতিবিবাহ ও বিধবাসংগ্রহ নিষিদ্ধ ইহা প্রতিপন্ন হইল।

কিন্তু আর্য্য ঋষিদের মত অবহেলা করিয়া যাহারা কেবল রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া যুবতিবিবাহ বা যুবতি বিধবাসংগ্রহ করে,—যদি দৈবাৎ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন প্রযুক্ত যুবজানির বা যুবতী বিধবাপ্রণয়ীর মধ্যে উভয়ের শারীরিক বিষভাগ সমশক্তি প্রযুক্ত সমঞ্জস্য ভাবে থাকে, তবে এ যাত্রা রক্ষা পাইবার কথা। কিন্তু তাহা প্রায় ঘটিয়া উঠা দুষ্কর,—অন্যথা অচিরদিনেই পরলোকের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব সর্ব্বতোভাবেই বালিকাবিবাহই সুপ্রশস্ত—এই মুনি-বাক্যই আমাদের শিরোধার্য্য ॥

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

ঈশ্বরতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

যাঁহারা জগৎকে অকস্মাৎ উৎপন্ন * বলিয়া ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ফেলেন, তাঁহাদিগের ঐ যুক্তি কতদুর সত্য তাহা দেখা যাউক। তাঁহারা যে, কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে তাঁহারা বলেন যে, উহা অকস্মাৎ উৎপন্ন, অর্থাৎ কার্য্যের যে উৎপত্তি হয় তাহা কোন হেতুর অপেক্ষা করেনা,—কার্য্য বিনা হেতুতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল নাস্তিকদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে,—কার্য্যের উৎপত্তি যদি হেতু সাপেক্ষ না হয়, তবে ইহা সর্ব্বদা উৎপন্ন হয় না কেন? উৎপত্তি সময়ের পরিচ্ছেদ থাকে কেন? সুতরাং বিনা হেতুতে কার্য্যোৎপত্তিরূপ আকস্মিকতা সম্ভব পর নহে। 'অকস্মাৎ উৎপন্ন' যদি উৎপত্তির অভাব, অর্থাৎ আপনা হইতেই আছে,—উৎপত্তি হয় নাই, এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাহইলেও ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের ন্যায় মধ্য বা বর্ত্তমান কালেও উৎপত্তির অভাব হইয়া থাকে; কিন্তু মধ্যবর্ত্তী বা বর্ত্তমান কালের কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং ঐরূপ অর্থ অকিঞ্চিৎকর। 'অকস্মাৎ' অর্থে যদি কার্য্য স্বাত্মহেতুক বলা যায়, অর্থাৎ কার্য্যই যদি কার্য্যের হেতু হয়,—কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মের ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাবের বিরোধ হয়। এক পদার্থই পূর্ব্ব, এবং এক পদার্থই অপর হইতে পারে না। সুতরাং এই অর্থ সারহীন। কার্য্যকে যদি নির্ধর্ম্মক বলা-যায়, অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে,—কার্য্যোৎপত্তির সিদ্ধির জন্য অদৃষ্ট কারণ অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই,—এইরূপ যুক্তি নাস্তিকেরা দিয়া থাকেন। নাস্তিকগণের প্রিয় যুক্তি এই যে, অগ্নির দাহিকা শক্তি, কণ্টকের তীক্ষ্নতা, জলের শৈত্য বিনা কারণে হইয়া থাকে,—অন্যদিকে এই জন্য কোন বাহ্য কারণের অপেক্ষা করিতে হয় না। কিন্তু এই আপত্তি অক্লেশে খণ্ডিত হয়।

* বৌদ্ধেরা ইহাকে 'সজ্বটন' (Accidental or result of chance) বলেন।

কর্ম্মফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন—তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে গৌতম বলিয়াছেন যে, পুরুষ চেষ্টা করিয়াও কদাচিৎ সফল কদাচিৎ বিফল হইয়া থাকে। অতএব অনুমান করিতে হইবে যে, পুরুষের কর্ম্মফল প্রাপ্তি পরাধীন। "ঈশ্বর কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ" পুরুষের কর্ম্মফল প্রাপ্তি যাঁহার অধীন—তিনিই ঈশ্বর। কিন্তু এখানে আর এক প্রশ্ন উঠিয়া থাকে যে, যদি ফল নিষ্পত্তি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে পুরুষের চেষ্টা ব্যতিরেকে ফলনিষ্পন্ন হয় না কেন? সুতরাং কর্ম্মকে ফলনিষ্পত্তির কারণ না বলিয়া ঈশ্বরকে কারণ বলিবার হেতু কি? ন্যায় দর্শন বলিয়াছেন যে, "ন পুরুষ কর্ম্মাভাবে ফলনিষ্পত্তেঃ"—"তৎকারিতত্বাদ হেতুঃ"—অর্থাৎ ফল লাভার্থে যাহারা যত্ন করে এমন লোককে ঈশ্বর ফলদান দ্বারা অনুগৃহীত করেন; ফললাভার্থে চেষ্টা না করিলেও ঈশ্বর ফলদান করিবেন, ইহা বলা হয় নাই। কর্ম্ম যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে প্রার্থনা রূপ ফলপ্রাপ্তি হয় না। পুরুষ চেষ্টা করিয়াও যেখানে বিফলপ্রযত্ন হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মই কর্ম্মের ফলদাতা; ঈশ্বরকে কর্ম্মফলদাতা বলিবার প্রয়োজন কি? যখন ফললাভের প্রবল ইচ্ছা থাকে, তখন কি জন্য কর্ম্ম যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় না? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির হীনতা, বা প্রতিবন্ধক শক্তির প্রতিবন্ধকতা তাহার কারণ। আমরা পরিচ্ছিন্ন জীব, সুতরাং আমাদের প্রতিপদে হীনতা অনুভুত হয়, অতএব কর্ম্ম কর্ম্মের ফলদাতা হইতে পারে না। সেই জন্য গৌতম বলিয়াছেন যে, শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর সুখ ও দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যেমন আমাদের লৌকিক সম্রাট্ স্বকৃত নিয়ম অনুসারে সাধুকে অনুগ্রহ এবং দুষ্টকে নিগ্রহ করেন এবং স্বকৃত নিয়ম সমূহের অনুবর্ত্তন করিলেও যেমন তাঁহার স্বাধীনতা বাধিত হয় না, সেইরূপ কর্ম্মানুসারে ফল দেওয়াও বিশ্বসম্রাটের নিয়ম। পাপের জন্য জীব দুঃখ পায়—পুণ্যহেতু সুখভোগ করিয়া থাকে। জীবের কর্ম্মবৈচিত্রই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ।

সংসারে জ্ঞানের যখন তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে,—একব্যক্তি হইতে অপর এক ব্যক্তিকে, তাহা হইতে অপর এক ব্যক্তিকে যখন আমরা অধিকতর সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন অনুমান হয়, এইরূপ কোন এক পুরুষ আছেন, যাঁহার জ্ঞান নিরতিশয়, যাঁহাতে জ্ঞানের এই তারতম্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে স্থানে জ্ঞান নিরতিশয়তা প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রে তিনি ঈশ্বর এই নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মহাপুরুষগণ জগৎকে অনাদি বলিয়া মানিয়া গিয়াছেন। যদি অনাদি বলিয়া না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জগতকে 'অকস্মাৎ উৎপন্ন' বলিয়া মানিতে হয়। সূক্ষ্মাবস্থা হইতে স্থূলাবস্থায় গমনের নাম সৃষ্টি। জগৎ অনাদি হইলেও, ইহা চিরকাল একভাবে বিদ্যমান নাই,—থাকিতেও পারে না। প্রকৃতি বা পরমাণু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা মানিলেও, প্রকৃতি বা পরমাণু সমূহ যে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বরের প্রেরকত্বই তাহার কারণ। ইহারা আপনা হইতে কোন কর্ম্ম করে না। জড় বা নিরবধিক, অর্থাৎ যাহা বিনা কারণে, বিনা নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উৎপন্ন না হইবে কেন? সেইজন্য দেশতঃ কালতঃ এবং বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সমূহকে 'অকস্মাৎ উৎপন্ন' বা স্বভাবসিদ্ধ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলিয়াছেন যে,—

"কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।"

অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অপৃথগ্ভূতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়াই বিশ্বজগতের কারণ; কাল, স্বভাব ও আকাশাদি ভূতসমুহের পরমেশ্বরই অধিষ্ঠাতা, তিনিই ইহাদের নিয়ামক, ইহারা তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,——

"স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ।
স সঙ্কোচবিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেপি চ স্থিতঃ॥"

অর্থাৎ, ঈশ্বর নিজেই প্রকৃতির ক্ষোভক এবং স্বভাবাদির উদ্বোধক। পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ক্ষোভক, এবং রূপান্তরে তিনিই ক্ষোভ্য। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ সঙ্কোচ এবং গুণক্ষোভরূপ বিকাশ,—বিষ্ণুই এই অবস্থাদ্বয়োপেত প্রধান বা প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান আছেন। বিশ্বজগৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণাম; প্রকৃতিই বিষ্ণুর শক্তি। শক্তিমান্ হইতে, শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহে; পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তি সঙ্কোচ-বিকাশশীলা।

শ্রুতি 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুর্ণশ্চ ॥"

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম, তিনি একদেব (অদ্বিতীয় দ্যোতন স্বভাব), সর্ব্বভূতগূঢ় (সর্ব্বপ্রাণিতে সংবৃত), সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সর্ব্বভূতাধিবাস (যিনি সর্ব্বভূতে বাস করেন), কর্ম্মাধ্যক্ষ (সর্ব্বপ্রাণিকৃত নানাপ্রকার কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা), সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবল (নিরুপাধিক) এবং নিগুর্ণ।

বেদ বলিয়াছেন যে—

ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বভুব্যক্রামৎ সাশনাশনে অভি ॥

(পুরুষসূক্ত)।

অর্থাৎ, পরমাত্মা চতুষ্পাৎ, তাঁহার একপাদ অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্ত অবস্থায় পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে, অর্থাৎ পরমাত্মার একপাদ মায়াযুক্ত অপর পাদত্রয় মায়াবিনির্মুক্ত। পরমাত্মার অন্য ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ, অপরিণামী। ত্রিপাদ পুরুষই নিগুর্ণ ব্রহ্ম এবং জন্মাদি ভাববিকারাত্মক জগৎ সগুণব্রহ্ম। সুতরাং পরমাত্মার মায়াযুক্ত প্রথম পদকে ত্রিগুণাধিষ্ঠিত চিচ্ছক্তি বা সগুণব্রহ্ম বলা যায়। সাংখ্য-দর্শন ইহাঁকে 'ঈশ্বর' বলিয়াছেন। শ্রুতি সগুণ ব্রহ্মকেই হিরণ্যগর্ভ, বিরাটপুরুষ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রুতিতে 'ঈশ্বর' শব্দ শুদ্ধ, চিন্ময়, নিগুর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া কোন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে এবং কোন স্থলে সগুণ বা মায়াযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষ বিশেষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া লোকের এত সন্দেহ হয়। সাধারণ লোকে যাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলে, সেইরূপ 'ঈশ্বর' মানিলে পূর্ব্বোল্লিখিত দোষ সকল আইসে বলিয়া পতঞ্জলি মুনি, "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ,"—অর্থাৎ, অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, জাতি, আয়ু ও ভোগ এবং সংস্কার এই সমস্ত যাহাতে নাই এরূপ পুরুষবিশেষকে

ঈশ্বর বলে,—এই বলিয়া ঈশ্বর ও ব্রহ্মের একার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং পতঞ্জলি যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, সাংখ্যকার তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বেদান্তকার তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋষিরা তাঁহাকেই বলিয়াছেন যে,—"অচিন্ত্যোপাধিবিনির্মুক্তং অনাদ্যন্তং শুদ্ধং শান্তং নিগুর্ণং নিরবয়বং, নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং ব্রহ্মঃ।" নিরালম্বোপনিষৎ।

অর্থাৎ, যিনি চিন্তার অতীত, উপাধিহীন, আদি অন্তরহিত, শুদ্ধ, শান্ত, নিগুর্ণ, নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, খণ্ড রহিত, অদ্বিতীয় এবং চৈতন্যময়, তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁহার প্রণিধানের দ্বারা,—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা,"—যে লোকের মোক্ষ বা নির্ব্বাণ হইবে—তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? সেই জন্যই তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা "ঈশ্বর প্রণিধান" অর্থাৎ এক নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। ঐ উপাসনাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলিয়া জানিবে। সেই সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে রোগ, শোক, দুঃখ, জাতিভেদ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারাদি কিছুই থাকে না। সেই "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ" তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এবং ভববন্ধন মুক্ত হয়। সেই জন্য সাংখ্যকার লিখিয়াছেন "জ্ঞানান্মুক্তিঃ"। "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ" তত্ত্ববিদ্যা লাভ হয়, এবং তাহা হইতেই মোক্ষলাভ হয়। সেই জন্য বেদান্তকার বলিয়াছেন যে, "বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ,"—বিদ্যাদ্বারা মুক্তিলাভ এবং কর্ম্মদ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হয়। "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ" সংস্কার ও কামনা নিবৃত্ত হইয়া মোক্ষলাভ হয়। সেই জন্য বৈশেষিক দর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "তদাভাবে সংযোগাভাবো প্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ"—অর্থাৎ, জীবাত্মার সংস্কার ও কামনা নিবৃত্ত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ" অন্তঃকরণ বৃত্তিশূন্য হইয়া, কৈবল্যলাভ হয়,—তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, "সত্ত্ব পুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি"—অর্থাৎ, অন্তঃকরণ বৃত্তিশূন্য হইলে এবং পুরুষের কল্পিত ভোগ শূন্য হইলেই মোক্ষলাভ হয়। "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ" যথার্থ ভক্তি, অর্থাৎ ভাবের অতীত অবস্থা আসিয়া থাকে। এই অবস্থায় ব্রহ্মচিন্তা হয়। জ্ঞান ও ভক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যেমন মনুষ্য ও তাহার ছায়া ভিন্ন নহে, অর্থাৎ যেখানে মনুষ্য আছে

সেখানে তাহার ছায়াও আছে, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। যেখানে জ্ঞান সেইখানেই ভক্তি। ভক্তি না হইলে জ্ঞান হয় না এবং জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না। "ঈশ্বর প্রণিধান" দ্বারা যখন জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয়, তখন জীবাত্মা পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া থাকে।

সেই পরব্রহ্ম উৎকোচগ্রাহী ভগবান্ নহেন, তিনি কালী নহেন—কিম্বা পশুবলি চাহেন না। তিনি গঙ্গাস্নান করিতে বলেন না। তিনি আমাদের আরাধনা পাইবার জন্য কাতর নহেন। তিনি বিষয়াদি ভোগের বাসনা চাহেন না। সাধারণ লোকে তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত নহে। তিনি দ্বৈতও নহেন অদ্বৈতও নহেন, সেইজন্য উক্ত হইয়াছে যে,—

"দ্বৈতমিচ্ছন্তি কেচিৎ
অদ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
সমং তত্ত্বং ন বিন্দতি
দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্॥"

(গোরক্ষ সংহিতা)।

অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মকে কেহ দ্বৈত বলিয়া ভাবিয়া থাকে, কেহ বা অদ্বৈত বলিয়া ভাবিয়া থাকে। কিন্তু তিনি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জ্জিত; তাঁহার এই সমতত্ত্ব জ্ঞানীভিন্ন কেহ জ্ঞাত নহে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ "ঈশ্বর" কাহাকে বলে, মহাপুরুষেরা তাহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। মায়াযুক্ত সগুণ ব্রহ্মকে "ঈশ্বর" বলা যায়। পরমার্থ হিসাবে দেখিতে গেলে মায়ারূপী ভ্রমজ্ঞানকেই "ঈশ্বর" বলা হয়। এবং মায়ারহিত শান্ত চিদাকাশরূপ যে নির্ম্মল জ্ঞান—তাহাকেই "ব্রহ্ম" বলে। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে, আমি জগতের কারণকে ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম—বলি না। কারণ, প্রথমে পরমার্থতঃ সৃষ্টির কোন 'কারণ' নাই। স্বপ্নদ্রষ্টা চিন্ময় আত্মাই জগৎরূপে প্রতিভাত হন, অর্থাৎ জগৎ স্বপ্নদর্শন করেন। আকাশে যেরূপ শূন্যতা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, সমুদ্রে যেমন জল ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, তেমনি চিদাত্মা ব্যতিরেকে জগতের আর কিছুই সার নাই। দ্বিতীয়তঃ 'ব্রহ্ম' যে নিজেই বিশ্ব, একথা বলাও ভ্রম। স্বপ্নে পুরুষের যেরূপ নগরদর্শন ঘটে, সেইরূপ সেই চিদা-

কাশের যে নগরবৎ ভাণ, সেই ভাণকেই বিশ্ব বলা হয়। স্বপ্নে অশিলাই যেমন শিলা বলিয়া প্রতিভাত হয়, অনাকাশই আকাশ বলিয়া বোধ হয়, চিন্ময় ব্রহ্মে দৃশ্য প্রপঞ্চের অবস্থিতিও মহাপুরুষেরা তদ্রূপ মনে করেন। নিরাকার শান্ত চিৎ, স্বপ্নবৎ নিজের যে চিৎস্বরূপের অনুভব করেন, সেই অনুভবকেই জগৎ বলা হয়। ব্রহ্ম অনাদি, নিরাকার, আভাসশূন্য চিদাকাশ। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই জগদ্ভাণ ভাণই নহে, পরমার্থ বিচারে ইহা শূন্য চিদাকাশ। অজ্ঞ ব্যক্তির কথা কহিতেছিনা, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহার সিদ্ধান্তের কথাই বলিতেছি,—তত্ত্বজ্ঞানী জানেন, ইহা শূন্য চিদাকাশ।

শিষ্য। সেই তত্ত্বজ্ঞান বা নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা কিরূপে হইতে পারে?

গুরু। সেই পরব্রহ্মকে জানিতে হইলে তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়। যথা, সৎগুরুগম্য মহাবাক্য,জ্ঞান ও ধ্যান। সর্ব্বদা সচ্ছাস্ত্রের আলোচনা করিবে এবং গুরু যেরূপ উপদেশ দিবেন,—সেইরূপ জ্ঞান ও ধ্যান শিক্ষা করিবে। তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান আপনি উদয় হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের জন্য কোন অর্থব্যয় নাই, এবং পুরোহিতকে অনুরোধ করিতে, কিম্বা দেবতা দিগকে উৎকোচ দিতে হয় না। মনুষ্য শব্দের অর্থ মনের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া—অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" মহা বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মকে যিনি অনুভব করিয়াছেন—তিনিই মনুষ্য। যিনি মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, জগতে নানারূপ পূজাদি উপক্রিয়াকে তিনি কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন। তখন তিনি জানেন যে,—

"মন্ত্রপূজা তপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াম্।
সন্ন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ॥"

(জ্ঞান সংকলিনী।)

অর্থাৎ, জ্ঞানী লোকেরা মন্ত্র, পূজা, তপ, ধ্যান, হোম, জপ, বলিক্রিয়া, সন্ন্যাস ইত্যাদি লৌকিক কার্য্য ত্যাগ করেন। সেই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে,—

"সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থেষু যৎফলং লভতে শুচিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥"

(জ্ঞান সংকলিনী।)

অর্থাৎ, সর্ব্বদা সকল তীর্থে স্নান করিয়া শুচিব্যক্তি যে ফল লাভ করেন, তাহা ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা যে পুণ্য হয়, তাহার ষোল কলার এক কলারও ফলের তুল্য নহে।

স্থূলতঃ উদাহরণ দ্বারা বলিতে হইলে,এইরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্ম রজত মুদ্রা বা টাকার ন্যায়; টাকা যেমন বলিতেছেনা যে—আমায় লইয়া ব্যয় কর—মদ্যাদি পানে অর্থাৎ অসৎ পথে ব্যয় কর, কিম্বা দানাদি কর্ম্মে অর্থাৎ সৎপথে ব্যয় কর,—কিন্তু সমস্ত ব্যাবহারিক জগৎ টাকার শক্তিতে চালিত হইতেছে। এখানে যেমন টাকা এক প্রকার নির্গুণ হইলেও উহার শক্তি বিশেষের দ্বারা চলিতে হইতেছে, ব্রহ্ম ও ঠিক সেইরূপ, উহা নির্গুণ হইলেও উহার নির্গুণ শক্তি বিশেষে (যাহাকে মায়া বলা যায়)—এই বিশ্ব সংসার চালিত হইতেছে। টাকাকে যেমন আমরা আধুলি করিতে পারি, আধুলিকে সিকি, সিকিকে দুয়ানি এবং দুয়ানি কে পয়সা প্রভৃতি করিয়া খণ্ড করা যায়, সেই রূপ আমরা অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে মায়া, মায়া হইতে মহতত্ব, মহতত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মন প্রভৃতি ভাগ কল্পনা করিয়া লই। পয়সা হইতে দুয়ানি, দুয়ানি হইতে সিকি, সিকি হইতে আধুলি এবং আধুলি হইতে যে টাকা—সেই টাকাই থাকে, সেইরূপ মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে মায়া এবং মায়া হইতে যে ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মই থাকেন।

শিষ্য। আপনি যে পূর্ব্বে তপস্যার কথা বলিলেন, উহা ত কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার বলিয়া কথিত আছে। উহা কেমন করিয়া অন্যজাতির অধিকার হইবে?

গুরু। গলায় উপবীত ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। উহা কৌলিন্য প্রথার ন্যায় বংশ গত নহে *। যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন শাস্ত্রে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন যে,—

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রবন্ধকার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হইলেন? বঙ্গবাসী হিন্দুর হৃদয়ে যে এরূপ কল্পনার আবির্ভাব হয়—ইহাই বিচিত্র! সং।

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।"*

*　*　*　*　*

অর্থাৎ শূদ্রাদি যদি ব্রাহ্মণের মত কার্য্য করে, তবে তাহারা ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রের মত কার্য্য করেন তবে তিনি শূদ্র হইবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির সম্বন্ধেও এই মত জানিবেন।

আরও দেখ, পূর্ব্বকার বিখ্যাত ঋষিদিগের ভিতর কয়জন ব্রাহ্মণ ছিলেন? উল্লিখিত আছে যে,—

"বৈশ্যাগর্ভ সমুৎপন্নো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনি।
দাসীগর্ভ সমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনি॥
কৈবর্ত্তীগর্ভ সমুৎপন্নো ব্যাসশ্চৈব মহামুনি।
ক্ষত্রীগর্ভ সমুৎপন্নো বিশ্বামিত্রঃ মহামুনি॥
মৃগীগর্ভসমুৎপন্নো ঋষ্যশৃঙ্গঃ মহামুনি।
কুম্ভাচ্চৈব সমুৎপন্নো অগস্ত্যশ্চ মহামুনি॥
শূদ্রীগর্ভ সমুৎপন্নো কুশীকশ্চ মহামুনি।
তপসা ব্রাহ্মণো ভূয়াৎ তস্মাৎ জাতির্ন কারণম্॥" *

অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভজাত বশিষ্ঠ, দাসীগর্ভজাত ব্যাস, ক্ষত্রীগর্ভজাত বিশ্বামিত্র, মৃগীগর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গ, কুম্ভ হইতে উৎপন্ন অগস্ত্য এবং শূদ্রীগর্ভজাত কুশীক,—ইহারা সকলেই মহামুনি হইয়াছিলেন।—তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; জাতি তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

সেই জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"যাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং তাবজ্জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ॥"

(জ্ঞানসংকলিনী।)

* কোন্ শাস্ত্র হইতে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে জানিতে পারিলে সংশোধন করা যাইতে পারিত। কাহার ভুল বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধকারের সিদ্ধান্তে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। লক্ষ লক্ষ ঋষির মধ্যে ৫ জন ব্রাহ্মণেতর ক্ষেত্রজ বলিয়া গুরু স্থির করিলেন যে, "কয়জন ঋষি ব্রাহ্মণ ছিলেন?" কেবল বিশ্বামিত্র ব্যতীত অন্য সকলেই ব্রাহ্মণঔরসজাত। সং।

অর্থাৎ যতক্ষণ লোকের বর্ণ, কুল, ইত্যাদি থাকে; ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় না, যখন ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, তখন লোকে সর্ব্ববর্ণ বিবর্জ্জিত হয়।

আরও দেখ, যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব তখন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় লোকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। তখন কয় জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? উঃ অনেক। সং। এবং পরে কিরূপেই বা আবার সকলে হিন্দু হইয়া ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি ভেদ হইয়াছে ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে।

শিষ্য। আপনি ধর্ম্ম কাহাকে বলেন?

গুরু। এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহার মীমাংসা সাধারণ লোকে করিতে পারে না। প্রথমতঃ পাপ ও পুণ্য; আমরা যাহাকে পাপ বলিতেছি, অন্য জাতি তাহাকে পুণ্য বলিতেছে,—আমাদিগের যাহা পাপ বলিয়া ধারণা, অন্য জীবের তাহা পাপ বলিয়া ধারণাই নাই। দ্বিতীয় হইতেছে মায়া। মায়ার সৃষ্টি কবে হইয়াছে কেহ তাহা জানেনা; যিনি শুদ্ধ পরমাত্মা তাহার আবার মায়া কি? সেই অনন্তের সহিত মায়া কিরূপে যুক্ত হইল। ইহার যথার্থ মীমাংসা করিতে অজ্ঞানী লোকে পারে না। তৃতীয় হইতেছে কর্ম্মফল, জীব কর্ম্মফলে জন্মাইতেছে—না পরমাত্মা হইতে আসিতেছে। যদি পরমাত্মা হইতে আসিয়া থাকে, তাঁহার ন্যায় শুদ্ধ, শান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি হয় না কেন। আর যদি কর্ম্মফলে জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই কর্ম্ম করে কে? যদি বল আত্মা, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য আত্মা নির্লিপ্ত হইয়া কিরূপে কর্ম্ম করিতেছে? যদি বল মন কর্ম্ম করিতেছে এবং তাহার ফলও ভোগ করিতেছে, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মন যখন জন্মগ্রহণ করে তখন প্রতিবারে এক আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, না ভিন্ন ভিন্ন আত্মা লইয়া জন্মায়। যেমন আকাশ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে যে আকাশ থাকে তাহাকে ঘটাকাশ বলে, যেমন এক পাত্রের ঘটাকাশ অন্যপাত্রের ঘটাকাশ হইতে উপাধি ভেদে ভিন্ন, অর্থাৎ যেমন খণ্ডাকাশ সকল মহাকাশের অংশ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আকাশ মাত্র, সেইরূপ কোন জীব যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে—তাহার মন প্রত্যেক বারে একই ঘটাকাশরূপী আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, না ভিন্ন ঘটাকাশরূপী আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে।

আরও দেখ শাস্ত্রে বলে বাসনাও একরূপ সূক্ষ্ম ধর্ম্মস্বরূপ কর্ম্মের আত্মাবস্থা এবং তাহার ফলস্বরূপ লোকে যেরূপ বাসনা করে তাহার সেইরূপ ফললাভ হয়। এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে প্রায় সকল ব্যক্তিই ত' অর্থ চাহিতেছে, যিনি রাজা তিনি আরও অধিক অর্থ বাসনা করিতেছেন, যে দরিদ্র সেও অর্থ চাহিতেছে, তবে পৃথিবীতে এত দরিদ্রতা কেন? আর আমরা যে কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি—তাহা ভবিষ্যৎ জন্মের কর্ম্মফল কিম্বা ইহকালের কর্ম্মফল, তাহাও বা কিরূপে জানা যায়? এই সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সাধারণ লোকে করিতে পারে না। চতুর্থ হইতেছে জন্ম মরণ। লোকে কেন জন্মায়? যদি বল বাসনার জন্য জন্মায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে শরীরের ভিতর এমন কি বস্তু আছে, যাহার ধ্বংস করিলে বাসনার নাশ হইবে এবং আর জন্ম-মৃত্যু হইবে না? মৃত্যুর পরই বা লোকের কি অবস্থা হয়? সংবিতের কিরূপে পরিবর্ত্তন হয়, জীব কতদিন জন্মায় না, কিম্বা কিরূপেই বা জীব পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করে, ইত্যাদিরও কোন মীমাংসা নাই। পঞ্চম হইতেছে প্রারব্ধ,—সকলে কি এমন প্রারব্ধ করিয়াছে যাহার জন্য একদিনে শত সহস্র লোক মরিতেছে? যখন কেহ বজ্রাঘাতে, নৌকাডুবি হইয়া, বন্যায় বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মরিয়া যায়, তখন তাহার কি এমন প্রারব্ধ ছিল যাহার জন্য তাহার এরূপ অপঘাত মৃত্যু হইবে? ষষ্ঠ হইতেছে স্বর্গ ও নরক; এই সকল রাজত্বের সংবাদ কে দিয়াছে? যাহারা স্বর্গে ও নরকে যায়, তাহারা কি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্বর্গ বা নরকের বর্ণনা করে? সপ্তম হইতেছে সাধারণ লোকে যাহাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বলে; এবং অষ্টম হইতেছে লোকে যাহাকে ঈশ্বর বলে। এই সকলের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা সাধারণ লোকে করিতে পারে না। এই সকলের মীমাংসার নামই যথার্থ ধর্ম্ম। ব্রহ্মোপাসনায় অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিতেই এই সকলের মীমাংসা হইয়া থাকে।

শিষ্য। সমাধি অবস্থায় "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এইরূপ একাকার জ্ঞান যদি সকলের হয়, তবে সকলে বিভিন্ন-মতাবলম্বী কেন? কেহবা চার্ব্বাক, কেহবা বৈদান্তিক, কেহবা সাংখ্যের পক্ষপাতী, ইত্যাদি ভিন্নতা দৃষ্ট হয় কেন? এবং চার্ব্বাকাদি মতকে আপনি সত্যমত বলেন কি?

গুরু। আমি চার্ব্বাকাদি মতকেও সত্যমত বলি। কারণ বলিতেছি

শ্রবণ কর। একমাত্র অনুভব জ্ঞানকেই ঋষিরা নিখিল সিদ্ধান্তের সার বলিয়া গিয়াছেন। অন্তরে সূক্ষ্ম বিষয়ের যে দৃঢ় জ্ঞান হয় তাহাকে অনুভব জ্ঞান বলে। সংবিৎ অন্তরে যেরূপ নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে, অনুভবও ঠিক সেইরূপ হইবে। জলের শান্ত অবস্থায় হউক তরঙ্গ অবস্থায় হউক জলের জলত্ব সকল অবস্থায় সমান। সেইরূপ চিদাকাশ যেরূপ অবস্থায় থাকুক না কেন, চিদাকাশ চিদাকাশই থাকিবে, অর্থাৎ বহিরাকাশ যেমন সর্ব্বগামী ও শান্ত, চিদাকাশও সেইরূপ সর্ব্বগামী,—চার্ব্বাকাদি-কল্পিত দেহাত্মবাদ দ্বৈত ও বেদান্তী পণ্ডিতদিগের অনুভব সিদ্ধ ঐক্যও—সেই চিদাকাশ,—তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই সম্ভবপর হইতে হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থায়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ মহাপ্রলয় দশাতেও উক্ত চিদাকাশ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহার কারণ এই যে, চিকাকাশের কোন কারণ নাই, চিদাকাশ বিশাল ব্রহ্মরূপে সর্ব্বকালেই অবস্থিত। এই চিদাকাশকে কেহ ব্রহ্ম বলে, কেহ শূন্য বলে, কেহ গুড় তণ্ডুল সংযোগে মত্ততা শক্তির ন্যায় পদার্থের শক্তি বলে, কেহ সংবিদাকাশ বলে, কেহ আত্মা বলে। চৈতন্যে যে অবিদ্যা আছে, সেই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন অনুভবরূপে পরিণত হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সপ্রদায় কর্ত্তৃক উহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে উক্ত হইলেও চিন্মাত্র থাকে; কখনই তাহার অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না। যখন অবিদ্যা বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়, তখন উহা বিশুদ্ধ চিদাকার হইয়া মোক্ষ ফলের পাত্র হয়। মনুষ্যদিগের অবিদ্যাক্রান্ত চৈতন্যই জীব। মনোমধ্যে সর্ব্বদা যাদৃশ অনুভবের উদয় হয়, পুরুষও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্যই আত্মা আনন্দময় হইলেও জীব দৃঢ় অনুভব বলে দুঃখভোগ করিয়া থাকে। যে যেপথে যাউক না কেন, অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে। চার্ব্বাকাদির অভিমত দেহ, সাংখ্যমতানুমোদিত পুরুষ, মীমাংসকদিগের অভিমত ভোক্তাজীব, উক্ত অনুভব হইতে পৃথক করিতে গেলে কিছুই থাকে না, এই জন্যই অনুভবই সকলের কল্পনার স্থল, অনুভবই সত্য; অনুভবরূপা চৈতন্যই এই জগৎ অনুভব করিতেছে।

এ পৃথিবীতে অনুভব লইয়াই যত খেলা। যে যাহা অনুভব করিতেছে তাহার কাছে তাহাই সত্য। প্রত্যেক অনুভব অনন্ত চিদাকাশের এক একটী তরঙ্গ স্বরূপ। কল্পনা দ্বারাই চিদাকাশের অনুভব রূপী তরঙ্গ উঠিতেছে। তরঙ্গ যেরূপ উঠুকনা কেন চিদাকাশের চিদাকাশত্ব সকল অবস্থায় সমান রহিয়াছে। সুতরাং যে যেরূপ অনুভব করুকনা কেন, অর্থাৎ অনুভব সত্যই হউক আব মিথ্যাই হউক, চিদাকাশ ভিন্ন তাহারা আর কিছুই নহে। কল্পনারূপী অবিদ্যা। ভিন্ন অনুভবের কারণ যখন কল্পনারূপী অবিদ্যা দূর হয়, তখন যে চিদাকাশ সেই চিদাকাশই থাকে, তখন সকল মতই সত্য বলিয়া বোধ হয়। তত্ত্বজ্ঞানী—মহতেরা এই পৃথিব্যাদি ভূত সমূহ ক্ষণিক কি অক্ষণিক তাহার বিচার আদৌ করেন না, কিম্বা এই বিশ্বে দেবতা অথবা ভূতযোনিগণ অবস্থিতি করেন কিনা তাহারও বিচার আদৌ করেন না,—তাহা করা নিস্প্রয়োজন ভাবেন,—তাঁহারা জানেন যে, অজ্ঞানকল্পিত অনন্ত চৈতন্যই এই পৃথিব্যাদি ভূতরূপে এবং দেবতা ও ভূতযোনি ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত হইতেছেন। সেই অজ্ঞানরূপী কল্পনাকে তাঁহারা দূর করিতে চেষ্টা করেন।

এখন বুঝিলে 'ঈশ্বরতত্ত কি?' যে আসনে তুমি বসিয়া আছ, ঐ আসন হইতে বতক্ষণ না তুমি উঠিবে ততক্ষণ ঐ আসনে অপর কাহারও বসিবার স্থান নাই। সেইরূপ তোমার মনোরূপ আসনে দেবতা পূজা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি সংস্কার বসিয়া রহিয়াছে। উহাদিগকে তাড়াইয়া আসন শূন্য করিয়া দাও, তখন পরমাত্মা আপনি আসিয়া ঐ আসনে বসিবেন। উহা কিরূপে শূন্য করা যায়, ইহার উত্তরে মহাত্মারা বলিয়াছেন যে,—

"নিষ্ক্রিয়ৈব পরাপূজা,
মৌনমেব পরং তপঃ।
অনিচ্ছৈব পরং ধাম,
অচিন্তৈব পরং পদং॥"

অর্থাৎ, নিক্রিয়াই শ্রেষ্ঠ পূজা, মৌনই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, অনিচ্ছাই শ্রেষ্ঠধাম এবং অচিন্তাই শ্রেষ্ঠ পদ। যখন তপস্যার দ্বারা তুমি এই সকল করিতে পারিবে তখনই তোমার মনোরূপ আসন শূন্য হইবে এবং তখনই তোমার

ব্রহ্মজ্ঞান হইবে। তখন তুমি জানিবে যে "রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"—অর্থাৎ এই দেহরূপ রথে যখন তুমি সেই পরাৎপরকে দেখিবে, —যখন তোমার মায়ারূপ আবরণ দূর হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার হইবে, তখন আর তোমার জন্ম মৃত্যু হইবে না। তখন তুমি চিরশান্তি পাইবে। ইহাকেই পুরুষ প্রকৃতির মিলন, শিব শক্তির মিলন, কৃষ্ণরাধার মিলন বা আত্মা পরমাত্মার মিলন বলে। ইহাই নির্ব্বাণ। *

শ্রী আশুতোষ দেব।

শূন্য প্রাণ।

(১)

আমি জানিনা সেরূপ দেখিতে কেমন,
তাই ত পাইনা দেখিতে।
কোটি জনমেও শুনিনি সে নাম
—পারিনাক তাই ডাকিতে।
সাধন, মনন, ভজন, পূজন,
রতি, মতি, প্রেম, ভাব-উদ্দীপন,
আর কত শত বিধি অগণন,
কত মত, কত ধারা.

---

* প্রবন্ধকার ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই, অনেক বৃথা অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার অনেক উক্তিই উন্মত্তপ্রলাপের ন্যায় উপেক্ষণীয়। "ব্রাহ্মণ্য কৌলিন্য প্রথার ন্যায় বংশগত নহে"—একথা কোন ইংরাজের মুখে শুনিলে বিস্মিত হইবার কারণ ছিল না। শিক্ষিত হিন্দুর মুখে একথা শুনিলে প্রলাপের ন্যায় প্রতিবাদের অযোগ্য স্থির করিতে হয়। লক্ষ লক্ষ ঋষির মধ্যে ৫ জন ব্রাহ্মণ ঔরসজাত কিন্তু ব্রাহ্মণেতরক্ষেত্রজ ঋষির নাম করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিলেন— "কয়জন ঋষি ব্রাহ্মণ ছিলেন?"—ইহাতে একটী কৌতুকজনক কথা মনে পড়ে। বিবাহ-কৌতুকবদ্ধ শিশুপাল ভীষ্মকরাজার আলয় হইতে নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "এরূপ ঘটনা কি কাহারও ঘটিয়াছিল?" নারদ উত্তর করিলেন, "আপনার ন্যায় অনেকেরই এরূপ হইয়াছিল।" সং।

আমি যে গো তার কিছুই বুঝিনা
সদা তাই দিশেহারা!
উঠিছে কোথায় বোল হরিবোল,
ঈশা, মুশা, রাম, রহিমাদি রোল,
নাম শুনে ভাবি এযে কোলাহল,
কে জানে কোথায় হরি!
তারা কোন্‌খানে তাহারাই জানে,
আমি শুধু শূন্য হেরি।

(২)

আমার হৃদয় বড়ই বিষম
রেণুময় মরু যেন,
উপরের মত নীচেও আকাশ
ঊর্দ্ধ অধঃ নাই কোন।
নাহি কোন মেঘ নাহিক বিজলী,
চন্দ্রমা তারকা নাহি অংশুমালী,
অবাক্ অন্তরে আমি মাত্র খালি
কেহ নাহি সেথা আর।
অনিমেষ আঁখি জানি না কি দেখে
মহাশূন্য চারিধার।
ভাবনা করিলে ভাব যেগো নাই,
সুধাইব কিবা বিষয় না পাই,
জ্ঞান যে আমার অজ্ঞানের ছাই,
কোন ঠিক নাহি তার।
উদ্দেশ্য বিহীন পাগল যেন গো
কিম্ভূত কিমাকার!

শ্রীআশুতোষ দেব।

সংযুক্তা।

("পৃথ্বীরাজ চৌহান" নামক নাট্যকাব্যের হস্তলিপি
হইতে উদ্ধৃত)।

সংযুক্তা। পিতৃদেব, একি শুনি! অস্পৃশ্য যবনে
বাঁধিয়াছ নাকি তুমি দৃঢ় আলিঙ্গনে?
দেবদ্বেষী দ্বিজদ্রোহী শত্রু ম্লেচ্ছাধিপে
বিকটভ্রুকুটীভঙ্গে না সম্ভাষি' হায়,
ইষ্টকারী সখা জ্ঞানে হাস্য মুখে নাকি
আলাপিছ তার সনে? সত্য এ বারতা?
অপবিত্র যেই কর গোরক্তে রঞ্জিত,
চন্দনচর্চ্চিতকরে স্পর্শিছ তাহায়?
যেই বজ্র করাঘাতে অভ্রভেদী শত
দেব মন্দিরের চূড়া লুটায় ভূতলে,
শাণিতকুঠারে তারে ছিন্ন নাহি করি—
কনোজেশ জয়চন্দ্র জনক আমার—
প্রসূনমালায় তারে করিছ বেষ্টন?
যে হৃদয় ভারতের সর্ব্বনাশ তরে
দিবানিশি ক্রূরতায় হ'তেছে ধূমিত,
—সে হৃদয় পদাঘাতে চূর্ণ নাহি করি
সাহসউৎসাহে তারে করিছ বর্দ্ধন?—
সে হৃদয় রোষানলে ভস্ম নাহি করি,
সখ্য সুধারসে সুখে করিছ সেচন?
পিতঃ! যদি প্রতিহিংসা-দানবীর তৃষা
নিতান্তই তনয়ার উষ্ণরক্ত বিনা

নাহি হয় নির্ব্বাপিত,—কহিলেনা কেন?—
আনন্দে সংযুক্তা নিজ কণ্ঠরক্ত দিত,—
যবনের দ্বারদেশে দিতনা দাঁড়াতে!
দিল্লীশ্বর প্রতি দ্বেষ, দমিতে তাঁহায়
দারুণ প্রতিজ্ঞা তব, পাণ্ডববিশ্রুত
ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকারে একান্ত সাধনা,—
নিমেষের তরে তাহে অন্তরে আমার
নাহি দুঃখ কভু;—কিন্তু হায় পিতৃদেব,
যবনসংসর্গে স্বার্থ করিতে উদ্ধার
হইয়াছ ব্রতী,—তুমি যেই শুনিলাম,—
কি দারুণ মর্ম্মদাহী উর্ম্মি যন্ত্রণার
অন্তর আলোড়ি বেগে লাগিল বহিতে—
জানেন অন্তরযামী!—এর চেয়ে যদি
শুনিতাম আসিয়াছ রুদ্রতেজে সাজি,—
দাঁড়ায়েছ রুদ্ররূপে দিল্লীর দুয়ারে,
ভীষণ সংহার শূল করিয়া উদ্যত
নাশিতে চৌহান বংশ, শোণিতে তাহার
নির্ব্বাপিতে অপমান অনলের জ্বালা—
হাসিমুখে সর্ব্বনাশে পিতৃআশীর্ব্বাদে
লইত এ মাথা পাতি জয়চন্দ্রসুতা
ইন্দ্রপ্রস্থ অধিশ্বরী! যদি দেখিতাম
পার্শ্বে তব বজ্রধর দীপ্রবজ্র ধরি
বিচূর্ণিতে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়েন হুঙ্কার,
রাঠোর বিজয়ছটা বৈজয়ন্তীরূপে
মহাকালদণ্ডধরি অন্তক আপনি—
হেরিতাম দাঁড়াইয়া পশ্চাতে তোমার,

ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপ ভ্রুকুটীভঙ্গীর
আঁধারে আঁধার করি যমুনাজীবন,
তথাপি হৃদয় হেন নাহি বিচলিত।
শান্ত যদি রোষোচ্ছ্বাস নাহি হয় পিতা—
অদম্য হিংসার বেগ না পার রোধিতে—
তীক্ষ্ণ দন্তাঘাত তার অসহ্য এতই,
জ্বলিও জ্বলিও পিতা জ্বালিয়া হৃদয়ে
অনন্ত নরকানল!—তথাপি কখন
যবনের পদরেণু মাখিওনা শিরে!
অথবা হা প্রতিহিংসা মূলমন্ত্র যদি—
সর্ব্বনাশী আশা যদি এতই দুর্ব্বার,—
দৈত্যদানা অধিষ্ঠিত প্রেতমুখরিত—
যাও পিতা রসাতলে অন্ধতমধামে,
কঠোরতপস্যাচারে উগ্রসাধনায়
কক্ষগত ক্ষুদ্র চক্ষু রক্তদৃষ্টি ক্রূর
বক্র ওষ্ঠ কৃষ্ণকায় শুষ্ককাষ্ঠ প্রায়,—
হিংসাদেবে তুষ্ট করি গুপ্তহত্যা বরে
বরঞ্চ বিষাক্ত বাণে বধ বৈরি তব—
তথাপি তথাপি পিতা প্রাণান্তে কখন
বিধর্ম্মীর পদপ্রান্তে চাহিওনা কৃপা!
শুধু কি দিল্লীর শিরে হ'বে বজ্রাঘাত?
জ্বলিবে না সে অনলে কনোজ শরীর?
বিধর্ম্মী যে ক্রূরতর কালসর্প হ'তে!
তক্ষক অধিক তীক্ষ্ণবিষদন্ত তার!
উগ্রতর দাহ তার নরকাগ্নি হ'তে!
সোণার ভারতে করি সে অগ্নি অর্পণ,
ভস্মসাৎ করিও না এই নিবেদন!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাবিদ্যা-স্তুতিগীতং।

ভৈরবরাগেণ—দ্রুতত্রিতালীতালেন।

১

জয় জগদীশ্বরি! ধূং—
জয় জগদীশ্বরি! কালি! কুলেশ্বরি!
অসুরভয়ঙ্করি! পাপযুতং।
নাদচলিতগিরি— পূরিত কন্দরি!
জয় শিবসুন্দরি! পাহি সুতং॥

২

নীলসরস্বতি! তারে! ভগবতি!
হরজড়তা-শতমাত্মগতং।
পৃথু-লম্বোদরি! ভূষণবিষধরি!
জয় শিবসুন্দরি! পাহি সুতং॥

৩

ঈশ্বর-কেশব রুদ্র-কমলভব—
শিরসি সদাশিব উদবসিতং।
হে ত্রিপুরেশ্বরি! ভবসাগর তরি!
জয় শিবসুন্দরি! পাহি সুতং॥

৪

ইন্দুমুকুটবতি! লোহিত ভাস্বতি!
বেদভুজে! নতমার্ত্তরুতং।
হে ভুবনেশ্বরি! সুরকুলশঙ্করি!
জয় শিবসুন্দরি! পাহি সুতং॥

৫

মাতর্ভৈরবি! দূরিত তিমিররবি
রঙ্ত্রিরজো হরিগিরিশ স্তুতং।
সেবক হিতকরি শঙ্কর সহচরি!
জয় শিব সুন্দরি! পাহি সুতং॥

৬

ছিত্বা নিজশির আপিবসি রুধির
মসিহস্তারুণভা পতিতং।

রতি, মদনোপরি— পদমর্দ্দন করি !
জয় শিবসুন্দরি ! পাহি সুতং ॥

৭

ধূমাবতি ! সতি ! ভক্ষিতনিজপতি !
রথমারোহসি করটযুতং।
তনুরুচি ধূসরি ! কলহ প্রমদকরি !
—জয় শিবসুন্দরি পাহি সুতং ॥

৮

ধৃত রিপুরসনে ! পীতকবসনে !
জহি গদয়া দ্বিষতামযুতং।
প্রণত দয়া-দরি ! বগলে ! জিত্বরি !
জয় শিব সুন্দরি পাহি সুতং ॥

৯

পাশাঙ্কুশমসি খেটং প্রবহসি
হংসি রিপুং শুচি রোষ-হুতং।
মাতঙ্গি ! কদরি— বিদলন কুঞ্জরি !
জয় শিব সুন্দরি ! পাহি সুতং ॥

১০

দ্বিরদ চতুষ্টয়— বিধৃত কনকময়—
কলসৈঃ স্নাপনমাচরিতং।
গমলে ! গত্বরি ! হরিধৃতিতস্করি !
জয় শিবসুন্দরি পাহি সুতং ॥

১১

শ্রীবিজয়ার্থং বিশদসদর্থং
দ্বিজ জয়চন্দ্রকৃতং স্তুতিগীতং।
কৃতনতি পঠিতং সুস্বর ঘটিতং
মহতীর্ব্বিদ্যা জনয়তি নিয়তং ॥

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ (তিন) টাকা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, পৌষ ও মাঘ। [৯।১০ সংখ্যা।

সাহিত্য-সংহিতা

('সাহিত্য-সভার' মাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্. এ., বি. এল.,
এফ্. আর্. জি. এস্.।

সূচী পত্র

(সংখ্যা)	(বিষয়)	(প্রবন্ধ-লেখকের নাম)	(পত্রাঙ্ক)
১।	বৌদ্ধধর্ম্ম—মহাযান ও হীনযান	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ...	৪৫৭
২।	যবন-জাতি	শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত	৪৭৬
৩।	বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কি না? ...	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ...	৫০০
৪।	জীবের স্বাধীনতা	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন	৫৪২
৫।	পঞ্চাঙ্গতত্ত্ব বা কাল-সমীক্ষা	শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য ...	৫৫২
৬।	দান-সাগর	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	৫৭—৮০

কলিকাতা

১০৬।১ নং, গ্রে ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রকাশিত।

৫৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, "বকুলণ্ড প্রেস্" হইতে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

☞ "সাহিত্য-সভার" সভ্যেরা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৶০ আনা।

সাহিত্য-সংহিতা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, পৌষ ও মাঘ। [৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

বৌদ্ধধর্ম্ম—মহাযান ও হীনযান।*

বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—মহাযান ও হীনযান। মহাযান শব্দের অর্থ বিপুল রথ ও হীনযান শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ রথ। যাঁহারা নির্ব্বাণ পদের প্রার্থী তাঁহাদের এতদুভয় রথের অন্যতর অবশ্য অবলম্বনীয়। মহাযানের অপর নাম বুদ্ধ-যান। সম্যক্ সম্বুদ্ধ ও লোকোদ্ধরণ-ব্রত বোধিসত্ত্বগণ এই যান বা রথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে বুদ্ধযান বলে। ইহা চিরযান, একযান, প্রথম যান, অগ্র যান, উত্তম যান, শ্রেষ্ঠ যান ইত্যাদি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধগণের অবলম্বিত রথের নাম হীনযান। যাঁহারা কেবল ধর্ম্ম শ্রবণ করেন, কিন্তু লোকের নিকট উহা প্রচার করেন না, তাঁহাদিগকে শ্রাবক বলে। আর যাঁহারা কেবল স্ব স্ব মুক্তিলাভের জন্য ব্যস্ত,—কিন্তু অপর লোককে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন না, তাঁহাদিগের নাম প্রত্যেক-বুদ্ধ। এই শ্রাবক ও প্রত্যেক-বুদ্ধগণ যে রথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, উহাতে সর্ব্বসাধারণের স্থান নাই বলিয়া উহাকে হীনযান বলে। মহাব্যুৎপত্তি নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধসংস্কৃতগ্রন্থে মহাযান ও হীনযানের এইরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহাযানকে উদীচ্য সম্প্রদায় ও হীনযানকে দাক্ষিণাত্য সম্প্রদায় নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ উদীচ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্গত;—সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ দাক্ষিণাত্য সম্প্রদায় নামে অভিহিত। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই মত সর্ব্বাংশে

* এই প্রবন্ধ সাহিত্যসভার ৭ম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধকার কর্তৃক পঠিত হয়।

সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বোক্ত মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থের সহিত এই মতের সামঞ্জস্য করা দুরূহ ব্যাপার। মহাব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যার সহ এই মত মিলাইলে বোধ হয়, যেন তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণই কেবল জগতের উদ্ধার ব্রতে দীক্ষিত,—তাঁহারাই কেবল সৎ ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত। আর যেন সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি জনপদের লোক সকল কেবল স্বকীয় মুক্তিলাভের জন্য ব্যস্ত,—তাঁহারা যেন অপর লোকের নিকট ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কখনও প্রয়াস করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস দৃষ্টে বোধ হয়, উদীচ্য বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম প্রচারে যতদূর চেষ্টা করিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণ তাহার অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন করেন নাই। অতএব উদীচ্য বৌদ্ধগণ মহাযান-পন্থী ও দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণ হীনযান-পন্থী এ কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

কেহ কেহ বলেন, পালিভাষায় যে বৌদ্ধমত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে হীনযান বলে, আর সংস্কৃতভাষায় যে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই মহাযান মত। এই সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত নহে। কারণ খৃষ্টীয় ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, চীনদেশীয় পুস্তকালয়ে উহার কতক অংশ মহাযান ও অপর অংশ হীনযান গ্রন্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। আবার চীনপরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙ্ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে সিংহল দেশীয় পালিগ্রন্থেও মহাযান মত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব সংস্কৃত ভাষাতেই কেবল মহাযান মত প্রচারিত আছে, আর পালিভাষায় সমস্তই হীনযান মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য নহে।

মহাযান ও হীনযান শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমি এস্থলে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিতেছি।—

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

আশয়ো ধর্ম্মালোকমুখং হীনযানাস্পৃহণতায়ৈ সংবর্ত্ততে।
অধ্যাসযোগো ধর্ম্মালোকমুখম্ উদারবুদ্ধধর্ম্মাবলম্বনতায়ৈ সংবর্ত্ততে।

বিতর্ক ধর্ম্মলাভের একটী আদিম সোপান। ইহাতে হীনযানের প্রতি অস্পৃহা উৎপাদন করে। আর সমাধি ও ধর্ম্মলাভের একটী আদিম সোপান, উহাতে উদার বুদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দেয়।

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে আর্য্যদেব স্বীয় চিত্ত-বিশুদ্ধি-প্রকরণ নামক গ্রন্থে মহাযান ও হীনযানের লক্ষণ নিম্নলিখিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

হীনযানাভিরূঢ়ানাং মৃত্যুশঙ্কা পদে পদে।
সংগ্রাম-জয়স্তু তেষাং দূর এব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥
মহাযানাভিরূঢ়স্তু করুণা-ধর্ম্ম-বর্ম্মিতঃ।
কৃপা-নয়-ধনু-র্বাণো জগদুদ্ধরণাশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
মহাসত্ত্বো মহোপায়ঃ স্থিরবুদ্ধিরতন্দ্রিতঃ।
জিত্বা দুস্তরসংগ্রামং তারয়ত্যপরানপি ॥ ৫৪ ॥
পশবোঽপি হি ক্লিশ্যন্তে স্বার্থমাত্রপরায়ণাঃ।
জগদর্থবিধাতারো ধন্যাস্তে বিরলা জনাঃ ॥ ৫৫ ॥
শীতবাতাদিদুঃখানি সহন্তে স্বার্থলম্পটাঃ।
জগদর্থপ্রবৃত্তাস্তে ন সহন্তে কথং নু তে ॥ ৫৬ ॥
নারকাণ্যপি দুঃখানি সোঢ়ব্যানি কৃপালুভিঃ।
শীত-বাতাদি-দুঃখানি কস্তান্যপি বিচারয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
নানিষ্টকল্পনাং কুর্য্যাৎ নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্।
স্নানশৌচং ন চৈবাত্র গ্রামধর্ম্মং বিবর্জয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
নখদন্তাস্থিমজ্জানঃ পিতুঃ শুক্রবিকারজাঃ।
মাংস-শোণিত-কেশাদি মাতৃশোণিতসম্ভবম্ ॥ ৫৯ ॥
ইত্থম্ অশুচি-সম্ভূতঃ পিণ্ডোঽহ্যশুচিপূরিতঃ।
কথং সন্ তাদৃশঃ কায়ো গঙ্গাস্নানেন শুধ্যতি ॥ ৬০ ॥
ন হ্যশুচি-ঘটস্তোয়ৈঃ ক্ষালিতোঽপি পুনঃ পুনঃ।
তদ্বদশুচিসম্পূর্ণঃ পিণ্ডোঽপি ন বিশুধ্যতি ॥ ৬১ ॥
প্রতরন্নপি গঙ্গায়াং নৈব শ্বা শুদ্ধিমর্হতি।
তস্মাদ্ ধর্ম্মধিয়াং পুংসাং তীর্থস্নানন্তু নিষ্ফলম্ ॥ ৬২ ॥
ধর্ম্মো যদি ভবেৎ স্নানাৎ কৈবর্ত্তানাং কৃতার্থতা।
নক্তং দিবং প্রবিষ্টানাং মৎস্যাদীনাং তু কা কথা ॥ ৬৩ ॥
পাপক্ষয়োঽপি স্নানেন নৈব স্যাদিতি নিশ্চয়ঃ।
যতো রাগাদিবুদ্ধিস্তু দৃশ্যতে তীর্থসেবিনাম্ ॥ ৬৪ ॥

হীনযানপন্থীদিগের সংগ্রাম জয়ের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের পদে পদে মৃত্যুশঙ্কাই ঘটিয়া থাকে। মহাযানপন্থী লোক সকল করুণারূপ ধর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, কৃপাই তাঁহাদের ধনুর্ব্বাণ এবং জগতের উদ্ধার কার্য্যই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত। মহাসত্ত্ব, মহোপায়, স্থিরবুদ্ধি ও অনলস মহাযানপন্থিগণ স্বয়ং দুস্তর সংগ্রাম জয় করিয়া অপরকেও বিমোচন করেন। স্বার্থমাত্র সিদ্ধির নিমিত্ত পশুগণও ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে—কিন্তু যাঁহারা জগতের উপকার বিধানের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করেন তাঁহারাই ধন্য। স্বার্থসাধনের জন্য লোক সকল শীতবাতাদি দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, জগতের উপকার সাধনের জন্য তাহারা কেন দুঃখ সহ্য করে না? কৃপালু ব্যক্তিগণ পরোপকার বিধানের জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিবেন, শীতবাতাদি দুঃখের বিচার করা তাঁহাদের একেবারেই উচিত নহে। পরের অনিষ্টকল্পনা করিবে না, উপবাসাদি ক্রিয়ারই বা ফল কি? স্নানশৌচেরই বা প্রয়োজন কি? এই সমস্ত গ্রাম্য ধর্ম্ম বিবর্জন করিবে। নখ, দন্ত, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি পিতার শুক্র হইতে উৎপন্ন, আর মাংস, শোণিত, কেশ ইত্যাদি মাতৃ-শোণিত হইতে সমুৎপন্ন। অতএব এই অশুচি-সম্ভূত দেহ-পিণ্ড সর্ব্বদা অশুচিপূর্ণই থাকে। এতাদৃশ দেহ গঙ্গাস্নান দ্বারা কিরূপে বিশুদ্ধ হইবে? যেমন কোন অপবিত্র ঘট জল দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও উহা বিশুদ্ধ হয় না সেইরূপ এই অপবিত্র দেহ কোনক্রমেই বিশুদ্ধ হয় না। গঙ্গা পার হইয়া গেলেও কুক্কুর বিশুদ্ধিলাভ করে না, অতএব ধার্ম্মিক পুরুষগণের তীর্থ-স্নান নিষ্ফল। যদি তীর্থস্নান করিলেই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ডুবুরীরাই অত্যন্ত ধার্ম্মিক,—আর যে মৎস্যাদি দিবারাত্র তীর্থজলে অন্তর্লীন থাকে তাহারা ত পরম ধার্ম্মিক। সুতরাং স্নান দ্বারা পাপক্ষয় হয় না ইহাই নিশ্চিত কথা। যেহেতু তীর্থসেবিগণেরও রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়।

আর্য্যদেবের চিত্ত-বিশুদ্ধি-প্রকরণ নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়,—মহাযানপন্থিগণ কৃপালু ও উদার, তাঁহারা সর্ব্বদাই জগতের উদ্ধার ব্রতে দীক্ষিত। আর হীনযানপন্থীরা সর্ব্বদাই স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। তাঁহারা স্বকীয় পবিত্রতা লাভের নিমিত্ত গঙ্গা-স্নানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন কিন্তু জগতের লোককে পবিত্র করিব—এরূপ

অভিপ্রায় তাঁহাদের হৃদয়ে কখনও স্থান পায় না। বস্তুতঃ যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়ান তাঁহারাই মহাযান পন্থী, আর যাঁহারা নিজে বুঝেন—কিন্তু উহা অপরের নিকট প্রচার করেন না তাঁহারাই হীনযানপন্থী।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে (প্রথম বিবর্ত্তে) মহাযানের যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইলঃ—

"এবম্ উক্তে আয়ুষ্মান্ সুভূতি র্ভগবন্তম্ এতদ্ অবোচৎ। মহাযানং মহাযানমিতি ভগবন উচ্যতে। সদেবাসুরমনুষ্যলোকমভিভবন্ নির্যাস্যতি আকাশ সমতয়া অতি মহত্তয়া তন্মহাযানম্। যথা আকাশে অপ্রমেয়াণাম্ অসংখ্যেয়ানং সত্ত্বানামবকাশঃ, এবম্ এব ভগবন্ অস্মিন্ যানে অপ্রমেয়াণাম্ অসংখ্যেয়ানং সত্ত্বানামবকাশঃ। অনেন ভগবন্ পর্য্যায়েণ—মহাযানম্ ইদং বোধিসত্ত্বানাং মহাসত্ত্বানাম্। নৈবাস্য আগমো দৃশ্যতে নৈবাস্য নির্গমো দৃশ্যতে নাপ্যস্য স্থানং সংবিদ্যতে। এবম্ অস্য ভগবন্ মহাযানস্য নৈব পূর্ব্বান্ত উপ-লভ্যতে নাপি মধ্য উপলভ্যতে, অথ সমং ভগবংস্তদ্যানম্। তস্মাৎ মহাযানং মহাযানমিত্যুচ্যতে।"

এই কথা শুনিয়া আয়ুষ্মান্ সুভূতি ভগবান্‌কে বলিলেনঃ—ভগবন্ মহা-যানকে "মহা"—যান বলে। দেব, অসুর ও মনুষ্য লোককে অভিভব করিয়া এই যান প্রধাবিত হয়। ইহা আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও অতি মহৎ এই হেতু ইহাকে মহাযান বলে, যেমন আকাশে অপ্রমেয় ও অসংখ্যেয় সত্ত্বের আশ্রয়, সেইরূপ এই যান অপরিমিত ও সংখ্যাতীত জীবের আশ্রয়। বোধিসত্ত্ব মহা-সত্ত্বগণ এই যান অবলম্বন করেন। এই যান কোথা হইতে আগমন করিতেছে, কোথায় অগ্রসর হইতেছে ও কিসের উপর অবস্থিত রহিয়াছে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। ভগবন্ এই যানের আদি, অন্ত ও মধ্য কিছুই উপলব্ধ হয় না, ইহার সর্ব্বভাগে সমান বিস্তার। এই হেতু মহাযানকে "মহা"-যান বলে।

করুণাপুণ্ডরীক ও শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রন্থে হীনযানপন্থিগণের বিশেষ নিন্দা লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে হীনযানপন্থিগণ সাধারণতঃ শ্রাবকযান ও প্রত্যেক-বুদ্ধযান পন্থী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। করুণাপুণ্ডরীক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইলঃ—

"যৎ ত্বং ব্রাহ্মণ স্বপ্নম্ অদ্রাক্ষীঃ অপরে মনুষ্যা মহিষ-রথাভিরূঢ়া সুমনো-

মালালঙ্কৃতশিরসঃ অপথেন দক্ষিণাভিমুখং গচ্ছন্তি তে অপি ত্বয়া ব্রাহ্মণ কুলপুত্রাঃ ত্রিষু পুণ্যক্রিয়াবস্তুষু প্রতিষ্ঠাপিতাঃ কেবলম্ আত্মদমনার্থম্ আত্মশমনার্থং শ্রাবকযান-সংপ্রস্থিতাঃ, তেষাং শ্রাবকযানসংপ্রস্থিতানাং ব্রাহ্মণ-পুদ্গলানাম্ ইদং পূর্ব্বনিমিত্তম্।"

হে ব্রাহ্মণ তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলে যে অপর মনুষ্যগণ মহিষের রথে আরোহণ পূর্ব্বক মস্তকে পুষ্পমালা ধারণ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে। হে ব্রাহ্মণ সেই সকল মনুষ্য ও বুদ্ধধর্ম্ম এবং সংঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা আত্মদমনের নিমিত্ত ও আত্মশমনের নিমিত্ত কেবল শ্রাবকযান অবলম্বন করিয়াছে। হে ব্রাহ্মণ তোমার স্বপ্ন—সেই শ্রাবকযান বিষয়ক।

শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রন্থে শ্রাবকযান সংপ্রস্থিত লোকগণ পশুরথগতিক বোধিসত্ত্বনামে অভিহিত হইয়াছেন। পশুগণ যে রথে চড়িয়া গমন করে, শ্রাবকযানপন্থিগণও সেই রথে গমন করেন।

এস্থলে নিষ্প্রয়োজন বোধে অন্যান্য গ্রন্থের মত উদ্ধৃত হইল না। উপরে, যে কয়েক খানি গ্রন্থের মত উল্লেখ করিয়াছি তাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাঁহারা নিজে জ্ঞানী হইয়া অপরকেও জ্ঞানবান্ করিবার চেষ্টা করেন, যাঁহারা নিজে ধার্ম্মিক হইয়া অপরকেও ধার্ম্মিক করিতে প্রয়াস করেন—তাঁহারাই মহাযানপন্থী। মহাযান সংপ্রস্থিত লোকগণের জীবনের ব্রত কি—তাহা শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাযানপন্থী লোকগণ বলিতেছেনঃ—

সর্ব্বাসু দিক্ষু সংবুদ্ধান্ প্রার্থয়ামি কৃতাঞ্জলিঃ।
ধর্ম্মপ্রদীপং কুর্ব্বন্তু মোহাদ্দুঃখপ্রপাতিনাম্॥
নির্ব্বাতুকামাংশ্চ জিনান্ যাচয়ামি কৃতাঞ্জলিঃ।
কল্পান্ অনন্তাংস্তিষ্ঠন্তু মাভূদন্ধমিদং জগৎ॥
আকাশস্য স্থিতির্যাবৎ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ।
তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াদ্ জগদ্দুঃখানি নিঘ্নতঃ॥
যৎকিঞ্চিজ্জগতো দুঃখং তৎ সর্ব্বং ময়ি পচ্যতাম্।
বোধিসত্ত্বশুভৈঃ সর্ব্বৈর্জগৎ সুখিতমস্তু চ॥

সর্ব্বদিকের সমস্ত জ্ঞানিগণকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন জগতে ধর্ম্ম প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া দেন,—জগতের লোক যেন মোহ-বশতঃ দুঃখ সমুদ্রে নিমগ্ন না হয়। নির্ব্বাণাভিলাষী জিনগণকে আমি যাচ্ঞা করিতেছি, তাঁহারা যেন আরও অনন্তকাল এই জগতে অবস্থান করেন, তাঁহাদের অভাবে জগৎ যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া না পড়ে। যত দিন আকাশ বিদ্যমান থাকে তত দিন যেন আমি জীবিত থাকিয়া জগতের দুঃখ নিবারণ করি। জগতে যে কিছু দুঃখ থাকে সেই সমস্ত আমাতে আগমন করুক, আর বোধিসত্ত্বগণের পুণ্যদ্বারা জগৎ সুখী হউক।

এই সকল বচনদ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম-প্রচারকগণের কতদূর আদর ছিল। আজকাল খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ (Christian Missionary) যেমন জগতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন,—দ্বি-সহস্রাধিকবর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণও সেইরূপ অকুতোভয়ে ও অদম্য-উৎসাহে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া জগতে বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। আমি এস্থলে দৃষ্টান্তচ্ছলে কুমারজীবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। তিনি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে লাহোরের সন্নিহিত কোন স্থান হইতে গমন করিয়া মধ্য এসিয়ার গোবি মরুভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ সহস্র সহস্র ধর্ম্মপ্রচারক স্ত্রীপুত্র পরিবার ত্যাগ করিয়া অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করিয়া দেশ বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করতঃ চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়, তিব্বত ইত্যাদি দেশকে ভারতের অধীন করিয়াছিলেন। বিনা অস্ত্রে যাঁহারা এই প্রকারে প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্যসমূহ জয় করিয়াছিলেন—তাঁহারাই বাস্তবিক মহাযানপন্থী। তাঁহাদের হৃদয় যথার্থই জগতের দুঃখে দুঃখিত, এবং তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে জগৎকে সুখী করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। যে সমস্ত বৌদ্ধ নিজে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতেন, তাঁহারাই হীনযানপন্থী। আর্য্যদেব ও শান্তিদেব শুধু নিশ্চেষ্ট বৌদ্ধগণকে কেহ বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকেও এই হীনযানের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। কারণ, যাঁহারা বেদোক্ত ধর্ম্মপালন করিতেন, তাঁহারাও প্রায়শঃ উক্ত ধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচার করিবার প্রয়াস করেন নাই।

মহাযান ও হীনযানের প্রকৃত অর্থ কি তাহা এ পর্য্যন্ত জগতের কোন

পণ্ডিতই ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। আমি বিগত ১৯০০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ ইংলণ্ডদেশীয় "রয়েল্ এসিয়াটিক সোসাইটীর" পত্রিকায় প্রকাশিত করি। "রয়েল্ এসিয়াটিক সোসাইটীর" সদস্যগণের অনুরোধানুসারে অধ্যাপক বেণ্ডল্ প্রতিবাদ করিয়া আমার প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই অপর একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তদনন্তর আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে উক্ত বিষয়ে কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহারা কেহই মহাযান ও হীনযানের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতা মহাবোধি-"সোসাইটীর" পত্রিকায় অপর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া উক্ত বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। যাহাহউক এইরূপ বাদানুবাদে কালক্রমে এই দুরূহ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে। এস্থলে আমি উক্ত বিতণ্ডা সমূহের উল্লেখ না করিয়া হীনযান ও মহাযানের উৎপত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মহাবংশের ৪র্থ পরিচ্ছেদে ও চুল্লবগ্গের ১২শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে কালাশোকের রাজত্বকালে বৈশালী নগরীর বজ্জিগণের মধ্যে ১০০০০ ভিক্ষু সমবেত হইয়া দশটী প্রস্তাব প্রচারিত করেন। অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ঐ সকল অবগত হইয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, উক্ত দশটী প্রস্তাব ন্যায় ও ধর্ম্মের বিরোধী। অনন্তর রাজা কালাশোক প্রস্তাবকারী ভিক্ষুগণকে বৌদ্ধসংঘ হইতে পৃথক্ করিয়া দেন। এইরূপে খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে দশহাজার ভিক্ষু মূল বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইয়া একটী স্বতন্ত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। এই সম্প্রদায়ের নাম মহাসংঘিক। তদনন্তর গোকুলিক, একব্যবহারিক, প্রজ্ঞপ্তিবাদী, বাহুলিক, চৈত্য, সর্ব্বার্থী, ধর্ম্মগুপ্তিক, কাশ্যপীয়, সংক্রান্তিক, সূত্র, হৈমবত, রাজগিরীয়, সিদ্ধার্থিক, পূর্ব্বশৈলেয়, অপর শৈলেয় ও বজ্রীয় এই ষোলটী পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর ২ শত বৎসর মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ এই সতরটী সম্প্রদায় ও মূল স্থবিরবাদ একুনে আঠারটী মতের উদ্ভব হয়। কাশ্মীরের রাজা কনিষ্কের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৩৩ অব্দে ভারতে এই আঠারটী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থে এই আঠারটী সম্প্রদায়ের নাম কিছু পৃথক্ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

আর্য্য-সর্ব্বাস্তিবাদ	আর্য্য-সম্মিতীয়	মহাসাংঘিক
(১) মূল সর্ব্বাস্তিবাদ	(৮) কুরুকুল্লক,	(১১) পূর্ব্ব শৈলেয়,
(২) কাশ্যপীয়,	(৯) আবন্তিক,	(১২) অপর শৈলেয়,
(৩) মহীশাসক,	(১০) বাৎসীপুত্রীয়,	(১৩) হৈমবত,
(৪) ধর্ম্মগুপ্তীয়,		(১৪) লোকোত্তরবাদী,
(৫) বহু শ্রুতীয়,		(১৫) প্রজ্ঞপ্তিবাদী।
(৬) তাম্রপটীয়,		
(৭) বিভজ্যবাদী।		

আর্য্যস্থবির

(১৬) মহাবিহার
(১৭) জেতবনীয়
(১৮) অভয় গিরিবাসী।

মহাবংশে বর্ণিত অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও মহাব্যুৎপত্তি গ্রন্থে বর্ণিত অষ্টাদশ সম্প্রদায় বোধ হয় পরস্পর অভিন্ন। মহাসাংঘিক, প্রজ্ঞপ্তি, সর্ব্বার্থী, ধর্ম্মগুপ্তিক, কাশ্যপীয়, হৈমবত, পূর্ব্বশৈলেয় ও অপর শৈলেয় এই আটটী নাম উভয় গ্রন্থে একই রূপ দৃষ্ট হয়।

ত্যাঙ্গর নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থের ৯০ নবতি অধ্যায়ের তিন খানি গ্রন্থের মত অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধগণের সাম্প্রদায়িক বিভাগের কারণ সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্নমত লিপিবদ্ধ আছে। ভাব্য প্রণীত কায়ভেদ বিভঙ্গ, বিনীতদেব প্রণীত সময়ভেদ প্রবচনচক্র, এবং ভিক্ষু বর্ষাগ্রপৃচ্ছা নামক গ্রন্থে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের যে মত * বিবৃত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল:—

* ভাব্যের মতে বৌদ্ধগণ প্রথমতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত:—যথা, স্থবির ও মহাসাংঘিক।

স্থবিরগণ ক্রমে দশ সম্প্রদায় ও মহাসাংঘিক আট সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন।

স্থবিরের দশ সম্প্রদায়; যথা, (১) যথার্থ স্থবির বা হৈমবত, (২) সর্ব্বাস্তিবাদী, (৩)

(১) মহাসাংঘিক—বহু ভিক্ষুর সংঘ অর্থাৎ সমবায়ে এই সম্প্রদায়ে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে মহাসাংঘিক বলে।

একব্যাবহারিক—যাঁহারা বলিতেন ভগবান্ বুদ্ধের মত সমূহ একপ্রকার অনির্বচনীয় প্রজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধ করা যায় তাঁহাদিগকে একব্যাবহারিক বলে। তাঁহাদের মতে তথাগতগণ সাংসারিক নিয়মের অধীন নহেন। সকল তথাগতের ধর্ম্ম চক্র সমান নহে। তথাগতগণের বাক্যের মর্ম্ম মান্য করিতে

বিভজ্যবাদী, (৪) হেতুবিদ্যা বা মুরুন্তক, (৫) বাৎসীপুত্রীয়, (৬) ধর্ম্মোত্তরীয়, (৭) ভদ্রযানীয়, (৮) সম্মিতীয় বা কুরুকুল্লক বা আবন্তক, (৯) মহীশাসক, (১০) ধর্ম্মগুপ্তীয়, (১১) সদ্ধর্ম্মবর্ষক বা কাশ্যপীয়, (১২) উত্তরীয় বা সংক্রান্তিবাদিন্।

হেতুবিদ্যা বা মুহুন্তক ও সর্ব্বাস্তিবাদী ইহাঁরা একই সম্প্রদায়। সম্মিতীয়গণকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া না ধরিলেই স্থবিরের দশ সম্প্রদায় অবশিষ্ট থাকিবে।

মহাসাংঘিকগণের আট সম্প্রদায়; যথা—(১) মহাসাংঘিক, (২) একব্যাবহারিক, (৩) লোকোত্তরবাদিন্, (৪) বহুশ্রুতীয়, (৫) প্রজ্ঞপ্তিবাদিন্, (৬) চৈত্যক, (৭) পূর্ব্বশৈল ও (৮) অপর শৈল।

মহাব্যুৎপত্তিগ্রন্থে অষ্টাদশ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের যে রূপ বিভাগ আছে, ভিক্ষুবর্ষাগ্রপৃচ্ছায় অবিকল সেইরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয়।

ক্রমে মহাযান মত বিকৃত হইয়া তান্ত্রিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। অঙ্গুলিমালীয় সূত্রে মহাযানের অনেক লক্ষণ বর্ণিত আছে। মহাযানপন্থিগণের মত এই যে, সত্ত্বগণ তথাগতের গর্ভে অবস্থান করে, কিন্তু শ্রাবকযান (হীনযান) এর মত এই যে সত্ত্বগণ আহারদ্বারা জীবন ধারণ করে। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখধ্বংসের উপায় এই চারিটী শ্রাবকযানের আর্যসত্য। কিন্তু তথাগত অনন্ত, তথাগত নিত্য, তথাগত পরম মহান্, এবং তথাগত রাগহীন এই চারিটী মহাযানের আর্য্যসত্য। শ্রাবকযানের মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় কিন্তু তথাগতের নিত্যত্ব চিন্তা করাই মহাযানের পঞ্চ ইন্দ্রিয়। শ্রাবকযানের মতে চক্ষু কর্ণ ইত্যাদিই ষড়ায়তন। কিন্তু মহাযানের মতে তথাগতের নিত্যত্ব ভাবনা করাই ষড়ায়তন। শ্রাবকযানের মতে সম্যক্ দৃষ্টি ইত্যাদিই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। মহাযানের মতে তথাগতের নিত্যত্ব দর্শনই আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

তথাগতের তিন শরীর; যথা, (১) ধর্ম্মকায়, (২) সম্ভোগকায়, ও (৩) নির্ম্মাণকায়।

ধর্ম্মকায় ও বৈরোচন, সম্ভোগকায় ও রজন (অমিতাভ) এবং নির্ম্মাণকায় ও শাক্যমুনি ইহাঁরা পরস্পর অভিন্ন।

মহাযানের এই নিত্য তথাগত হইতে আদিবুদ্ধ ও ধ্যানীবুদ্ধের মত সৃষ্ট হইয়াছে।

হইবে। বোধিসত্ত্বগণ ভূমিষ্ঠ হইবার কালে কলল, বুদ্বুদ, পেশী ইত্যাদির অবস্থা প্রাপ্ত হননা, তাঁহারা ইচ্ছা মাত্রেই স্থূলশরীরে মাতার কুক্ষি হইতে নির্গত হন বোধিসত্ত্বগণের কাম সংজ্ঞা নাই। ষড়্বিধ জ্ঞানই রাগের অধীন। চক্ষুই রূপ দর্শন করে। সংযমই আসক্তি নিরোধের উপায়।

লোকোত্তরবাদিন্—যাহারা বলিতেন তথাগতগণ লৌকিক নিয়মের অধীন নহেন তাঁহাদিগকে লোকোত্তরবাদী বলে।

বহুশ্রুতীয়—বহুশ্রুতীয় নামক আচার্য্যের শিষ্যগণ বহুশ্রুতীয় নামে পরিচিত। ইহাঁদের মতে সংস্কার সমূহ দুঃখময় এইরূপ জ্ঞানই বিশুদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়। সংঘগণ সাংসারিক নিয়মের অধীন নহেন। দুঃখ সত্যই পরমার্থ সত্য।

প্রজ্ঞপ্তিবাদিন্—যাঁহারা বলিতেন সমস্ত সংস্কারের সহ দুঃখ মিশ্রিত তাঁহাদিগকে প্রজ্ঞপ্তিবাদী বলে। তাঁহাদের মতে দুঃখ একটী স্কন্ধ নহে, আয়তন (ইন্দ্রিয়) সমূহ অসম্পূর্ণ, সংস্কার সমূহ পরস্পর সাপেক্ষ, দুঃখই পরমার্থ, মন হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহা যথার্থ মার্গ নহে, মরণ অসময়ে হইতে পারে না। মনুষ্য কিছুরই কর্ত্তা নহে, এবং দুঃখ সমূহ কর্ম্ম হইতে সমদ্ভূত হয়।

মহাবিহার—ইহারই এক সম্প্রদায়ের নাম ধর্ম্মোত্তরীয়।

চৈত্যক—যাঁহারা চৈত্য নামক পর্ব্বতের উপর অবস্থান করিবেন তাঁহাদিগকে চৈত্যক বলে।

পূর্ব্বশৈল—যাঁহারা পূর্ব্বশিলার (অর্থাৎ পূর্ব্বনামক পর্ব্বতের) উপর অবস্থান করিতেন তাঁহাদিগকে পূর্ব্বশৈল বলে।

অপর শৈল—যাঁহারা অপরশিলার (অর্থাৎ অপর নামক পর্ব্বতের) উপর বাস করিতেন তাঁহাদিগকে অপর শৈল বলে।

হৈমবত—যাঁহারা হিমবৎ পর্ব্বতের উপর বাস করিতেন তাঁহাদিগকে হৈমবত বলে। ইহাঁদের মতে বোধিসত্ত্ব সামান্য মর্ত্ত্য নহেন। পুদ্গল স্কন্ধাতিরিক্ত বস্তু যেহেতু নির্ব্বাণ লাভ হইলে স্কন্ধের নাশ হয়, কিন্তু পুদ্গলের নাশ হয় না। অষ্ট আর্য্যমার্গের জ্ঞান দ্বারাই কেবল দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

সর্ব্বাস্তিবাদিন্—যাঁহারা বলিতেন বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই

তিনেরই অস্তিত্ব আছে তাঁহাদিগকে সর্ব্বাস্তিবাদী বলে। ইহাঁদের মতে পঞ্চস্কন্ধ এক দেহ হইতে অন্যদেহে গমন করে। সকলই ক্ষণিক। পদার্থ দুই প্রকার মূল ও যোগজ। শূন্যতা, অনিমিত্ততা ও অপ্রণিহিততা এই তিনের জ্ঞানদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। যাহারা বিশুদ্ধ সত্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই কামধাতুর অতীতে গমন করিয়াছেন।

অভয়গিরিবাসিন্—

জেতবনীয়—

বিভজ্যবাদিন্—কেহ বলিতেন কোন পদর্থ বিদ্যমান থাকে (যথা যে অতীত-কর্ম্মের এখন ও পরিপাক প্রাপ্ত হয় নাই (সেই কর্ম্ম)। কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে না (যথা যে কর্ম্ম ফল প্রসব করিয়াছে) যাঁহারা এইরূপে পদার্থ সমূহের বিভাগ করিতেন—তাঁহাদিগকে বিভজ্যবাদী বলে।

বাৎসী পুত্রীয়—যাঁহারা বলিতেন স্ত্রীই সন্তানের বাসস্থান, সন্তানগণ এই বাসস্থান হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাদিগকে বাৎসী পুত্রীয় বলে। তাঁহাদের মতে এক দেহ হইতে পরবর্ত্তী দেহে কিছুই গমন করে না। পঞ্চস্কন্ধ বিশিষ্ট জীবেরই জন্মান্তর ঘটিয়া থাকে। সংস্কার সমূহের কতকগুলি ক্ষণিক আর কতকগুলি অক্ষণিক। নির্ব্বাণ সৎ ও নহে, অসৎ ও নহে।

ধর্ম্মোত্তরীয়—ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের শিষ্যগণকে ধর্ম্মোত্তরীয় বলে। তাঁহাদের মতে জন্মই অবিদ্যা, এবং জন্মের নিরোধই অবিদ্যার নিরোধ।

সম্মিতীয়—সম্মতের শিষ্যগণকে সম্মিতীয় বলে। তাঁহাদের মতে ভবিষ্যতের কোন ফল অবশ্যই ঘটিবে ও কোন ফল রোধ করা যাইতে পারে। জন্ম ও মরণের নিয়ম এবং ধ্বংসের নিয়মে বিশ্বাসই ইহাঁদের প্রধান লক্ষণ।

আবন্তক—অবন্তী নগরীর ভিক্ষুগণকে আবন্তক বলে।

তাম্রপটীই –ইহাঁদের মতে কোন পুদ্গল নাই।

আর্য্যস্থবির—যাঁহারা বলিতেন স্থবিরগণই যথার্থ আর্য্য—তাঁহাদিগকে আর্য্যস্থবির বলে।

কুরুকুলক—যাঁহারা কুরুকুল্ল পর্ব্বতের উপর বাস করিতেন তাঁহাদিগকে কুরুকুল্লক বলে।

মহীশাসক—যাঁহারা বলিতেন মানবগণ পরিণামে মহীকেই আশ্রয়রূপে

প্রাপ্ত হইবে তাহাদিগকে মহীশাসক বলে। তাঁহাদের মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ মিথ্যা, বর্ত্তমান সংস্কার সমূহই কেবল সত্য। চতুরার্য্য সত্যের প্রত্যক্ষ দ্বারাই দুঃখের সম্যক্ জ্ঞান হয়। দুই জন্মের মধ্যে কোন অন্তরাভব নাই, দেবলোকেও ব্রহ্মচর্য্য আছে, অর্হদ্গণেরও ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে। সর্ব্ব শরীরে পুদ্গল বিদ্যমান আছে। শ্রাবক বুদ্ধের মুক্তি একই প্রকার। পুদ্গলকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সংস্কার সমূহ ক্ষণিক। এমন কোন অবস্থা নাই—যাহার ধ্বংস নাই। সংস্কার সকলের ভেদ জ্ঞানই বিশুদ্ধ সত্য। বুদ্ধ সংঘের মধ্যে অন্তর্নিহিত।

ধর্ম্মগুপ্তীয়—ধর্ম্ম গুপ্তের শিষ্যগণকে ধর্ম্ম গুপ্তীয় বলে। তাঁহাদের মতে সংবুদ্ধ সংঘের অতীত। বুদ্ধকে উপহার অর্পণে মহাফল হয় কিন্তু সংঘকে অর্পণে কিছুই হয় না। সুরলোকেও ব্রহ্মচর্য্য আছে। লাভালাভ ইত্যাদি সংসারধর্ম্ম।

কাশ্যপীয়—কাশ্যপের শিষ্যগণকে কাশ্যপীয় বলে। তাঁহাদের মতে কর্ম্মের পুরস্কার আছে। প্রতীত্য সমুৎপাদের নিয়ম অনুসারে সংসার চলিতেছে। নিষ্পাপ না হইলে পূর্ব্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অন্যান্য মত ধর্ম্ম গুপ্তীয় সম্প্রদায়ের ন্যায়।

সঙ্ক্রান্তিবাদিন্—যাঁহারা বলিতেন পুদ্গল এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগকে সংক্রান্তিবাদী বলে। ইহাঁদের মতে সকলই ক্ষণিক।

উত্তরীয়—উত্তরের শিষ্যগণকে উত্তরীয় বলে।

"স্রুম্ পই ছোই জুঙ্" নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কনিষ্ক খৃঃ পূঃ ৩৩ অব্দে কাশ্মীর, গুজরাট, সিন্ধু, দিল্লী, মথুরা ইত্যাদি জনপদের অধীশ্বর হন। তাঁহার রাজত্বকালে কাশ্মীরের জালন্ধর নামক স্থানে পার্শ্ব নামক পণ্ডিতের সভাপতিত্বে বৌদ্ধগণের চতুর্থ মহাসভার অধিবেশন হয়। ইহাতে উপদেশ, বিনয় বিভাষা ও অভিধর্ম্ম বিভাষা নামে তিন খানি পুস্তক প্রণীত হইযাছিল। কথিত আছে মহাযান সম্প্রদায়ের ইহাই আদিম গ্রন্থ। এই ৪র্থ বোধিসভায় ৫০০০ ভিক্ষু ও ৫০০ অর্হৎ উপস্থিত ছিলেন। বৌদ্ধগণ যে অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য সংস্থাপন করাই এই সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সমগ্র অষ্টাদশ সম্প্রদায় একত্র মিলিত না হইয়া দুইটী প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা কনিষ্কের মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহারাই মহাযান পন্থী। অবশিষ্ট সকল সম্প্রদায়ই হীনযান পন্থী।

চীন দেশীয় ত্রিপিটকের বিভাগ অনুসারে ও চীন পরিব্রাজক হুয়েন্ সাঙের বৃত্তান্ত অনুসারে জানা যায়, ধর্ম্ম গুপ্তীয়, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্ব্বাস্তিবাদ, মহাসাংঘিক, লোকোত্তরবাদী, মহাবিহারবাসী ও সম্মিতীয় ইত্যাদি কয়েকটী সম্প্রদায় হীনযান নামে পরিচিত। অবশিষ্ট কয়েকটীর নাম মহাযান। অভয়গিরিবাসিগণ মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত চারিটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই চারিটী শ্রেণীর নাম :—(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) সৌত্রান্তিক ও (৪) বৈভাষিক। হুয়েন সাঙের মতে মাধ্যমিক ও যোগাচার মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এবং সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে নাগার্জ্জুন নামক বোধিসত্ত্ব দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। মাধ্যমিক মতে সত্য দুই প্রকার—পরমার্থ ও সংবৃতি। এই পরিদৃশ্যমান জগতের সাংবৃতিক (ব্যবহারিক) সত্তা আছে বটে কিন্তু পারমার্থিক ভাবে বিচার করিলে দৃষ্ট হইবে— এই জগৎ শূন্যতামাত্র। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইহারা এই মায়াময় জগতের ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে বটে কিন্তু ইহাদের কাহারও পারমার্থিক সত্তা নাই। মাধ্যমিক সূত্র, সমাধিরাজ সূত্র, বুদ্ধাবতংসক, রত্নকূট সূত্র ইত্যাদিই মাধ্যমিক মতের প্রধান গ্রন্থ।

যোগাচার দর্শনের মতে বাহ্য জগৎ মিথ্যা হইলেও উহার জ্ঞান অলীক নহে। আলয়বিজ্ঞান বা অহমাস্পদ জ্ঞানই—আমাদের যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেছে। যোগ দ্বারা এই আলয় বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। নন্দ, উত্তর সেন, সম্যক্ সত্য প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণ এই মতের প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু আর্য্য অসঙ্গই এই মতের বিশেষ পুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন। এই হেতু কেহ কেহ তাঁহাকেই যোগাচার মতের প্রতিষ্ঠাতা

বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। গণ্ডব্যূহ, মহাসময় প্রভৃতি গ্রন্থই যোগাচার মতের প্রধান পুস্তক। নালন্দ নামক প্রসিদ্ধ বিহারের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক শীলভদ্রের নিকট হুয়েন্ সাঙ্ ৬০২—৬৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যোগাচার মত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি চীনদেশে গমন করিয়া বহু পণ্ডিতকে ঐ মত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য "কুয়েইছি" ৬৩২-৬৮৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যোগাচার দর্শন সমস্ত চীনদেশে প্রচারিত করেন। হুয়েন সাঙের পূর্ব্বেও পরমার্থ, বোধিরুচি ও গুণমতি নামক পণ্ডিতত্রয় ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করিয়া যোগাচার দর্শনের মত প্রচারিত করিয়াছিলেন। যোগাচার দর্শনের মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া মধ্যভারতের অচিন্ত্য-বিহারে (Ajant cave) এই মতের আলোচনা করিতেন।

"সুম্‌পই ছোই জুঙ্" গ্রন্থের মতে কাশ্মীরের সূত্র নামক একজন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ সৌত্রান্তিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মোত্তর বা উত্তরধর্ম্ম নামক পণ্ডিত এই এই দর্শনের প্রচার বৃদ্ধি করেন। সুপ্রসিদ্ধ কুমারলব্ধ সৌত্রান্তিক মতাবলম্বী ছিলেন। সৌত্রান্তিক দর্শনের মতে জ্ঞান সত্য এবং বাহ্য জগৎ অনুমেয় অর্থাৎ আমরা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি।

খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে মনোরথ নামক পণ্ডিত বিভাষা শাস্ত্র বা বৈভাষিক দর্শনের সৃষ্টি করেন। লামা তারানাথ বলেন, ধর্ম্মত্রাত বৈভাষিক দর্শনের এক প্রধান নেতা ছিলেন। বৈভাষিকগণের মতে জ্ঞান ও বাহ্য জগৎ উভয়ই সত্য।

উদ্যোতকর, কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, রামানুজ, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দুদার্শনিকগণ মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক দর্শনের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ ভারত, সিংহল, প্রভৃতি দেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন কোন্ কোন্ দেশে হীনযান ও কোন্ কোন্ দেশে মহাযান মত প্রচলিত ছিল।

তাঁহার সময়ে নিম্নলিখিত দেশে মহাযান মত প্রচলিত ছিল :—

খোটান, কাবুল, লম্‌ঘন, পোলুষ, দন্তলোক, শুভবস্তু, তক্ষশিলা, সিংহপুর, উরস, কাশ্মীর, কুলুত, বীরাসন, মহাশাল, গয়া, কলিঙ্গ, কোশল, ধনকটক, দ্রাবিড়, ভরুকচ্ছ, সৌরাষ্ট্র, বরণ, চক্ষুট, ইয়ালুং ইত্যাদি।

যে যে দেশে হীনযান মত প্রচলিত ছিল তাহার নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

বলভী, গুর্জার, সিন্ধু, সেন্-সেন্, তোলি, গান্ধার, পোলুষ, শাকল, তামসবন, পারিযাত্র, স্থানেশ্বর, শ্রুঘ্ন, মতিপুর, গোবিষাণ, কপিথ, নবদেবকুল, হয়মুখ, কৌশাম্বী, বিশাখ, গাজীপুর, গির্য্যেক, হিরণ্যপর্ব্বত, চম্পা, কর্ণ সুবর্ণ, মালব, আনন্দপুর, ও—তিয়েন্—পো—চি—লো, পারস্য, পীতশীলা, অবন্ধ, কিয়েপৌতা, ইত্যাদি।

যে যে দেশে মহাযান ও হীনযান উভয় মত প্রচলিত ছিল তাহার নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

আফগানিস্থান, সাঙ্কাশ্য, পাটনা, জালন্ধর, মথুরা, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, বজ্জি, নেপাল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সিংহল, কোঙ্কণপুর, কচ্ছ, উজ্জয়িনী, পর্ব্বত, লঙ্গোল, কুন্দুজ, মহারাষ্ট্র, ইত্যাদি।

চীন ভাষায় মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থই সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। চীনভাষায় মহাযান ও হীনযান সম্বন্ধীয় যে যে গ্রন্থের অনুবাদ বিদ্যমান আছে তাহার নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

মহাযান—সূত্র।

মহা প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, দশসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, সুবিক্রান্ত বিক্রমি পরিপৃচ্ছা, বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, পঞ্চশতিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, প্রজ্ঞাপারমিতা অর্দ্ধশতিকা, প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র, সপ্তশতিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, ইত্যাদি। মহারত্নকূট সূত্র, ত্রিসংবর নির্দ্দেশ, অনন্তমুখ বিনিশোধন নির্দ্দেশ, তথাগতাচিন্ত্যগুহ্য নির্দ্দেশ, স্বপ্ন নির্দ্দেশ, তথাগতাচিন্ত্যগুহ্যনির্দ্দেশ, বিনিশোধন নির্দ্দেশ, স্বপ্ন নির্দ্দেশ,

অমিতায়ুর্ব্যূহ, সুখাবতীব্যূহ, অক্ষোভ্যস্য তথাগতস্য ব্যূহ, বর্ম্মব্যূহনির্দ্দেশ, ধর্ম্মধাতু হৃদয়সংবৃত নির্দ্দেশ, দশধর্ম্মক, সমন্তমুখ পরিবর্ত্ত, রশ্মিনির্হার সঙ্গীতি, বোধিসত্ত্বপিটক, গর্ভসূত্র, মঞ্জুশ্রী বুদ্ধ ক্ষেত্র গুণব্যূহ, পিতা পুত্র সমাগম, পূর্ণ পরিপৃচ্ছা, রাষ্ট্রপাল পরিপৃচ্ছা, উগ্র পরিপৃচ্ছা, অক্ষর কোষ সূত্র, ভদ্র মায়াকার পরিপৃচ্ছা, মহা প্রতিহার্য্যোপদেশ, মহাকাশ্যপ সঙ্গীতি, বিনয় বিনিশ্চয় পরিপৃচ্ছা, সুবাহু পরিপৃচ্ছা, সুরত পরিপৃচ্ছা, বীরদত্ত পরিপৃচ্ছা, উদয়ন বৎসরাজ পরিপৃচ্ছা, সুমতি দারিকা পরিপৃচ্ছা, গঙ্গোত্তরোপাসিক পরিপৃচ্ছা, অশোকদত্ত ব্যাকরণ, বিমল দত্ত পরিপৃচ্ছা, গুণরত্ন সঙ্কুসুমিত পরিপৃচ্ছা, অচিন্ত্যবুদ্ধবিষয় নির্দ্দেশ, সুস্থিত মতি পরিপৃচ্ছা, সিংহ পরিপৃচ্ছা, জ্ঞানোত্তর বোধি সত্ত্ব পরিপৃচ্ছা, ভদ্রপাল শ্রেষ্ঠি পরিপৃচ্ছা, শুদ্ধশ্রাদ্ধদারিকা পরিপৃচ্ছা, মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছা ধর্ম্মাষ্ট, কাশ্যপ-পরিবর্ত্ত, রত্নরাশি, অক্ষয়মতি পরিপৃচ্ছা, ব্যাস পরিপৃচ্ছা, ইত্যাদি।

মহাবৈপুল্য মহাসন্নিপাত সূত্র, সূর্য্যগর্ভসূত্র, চন্দ্রগর্ভ বৈপুল্য, দশচক্র ক্ষিতিগর্ভ, সুমেরুগর্ভ, আকাশ গর্ভসূত্র, অক্ষরমতি নির্দ্দেশ সূত্র, ভদ্রপালসূত্র, তথাগত মহাকারুণিক নির্দ্দেশ, মূককুমার সূত্র, সর্ব্ব তথাগত বিষয়াবতার, ইত্যাদি।

বুদ্ধাবতংসক মহাবৈপুল্যসূত্র, শ্রদ্ধাবলাধানাবতার মূদ্রাসূত্র, তথাগত গুণজ্ঞানাচিন্ত্য বিষয়াবতার নির্দ্দেশ, দশভূমিকসূত্র, বোধিহৃদয়ব্যূহসূত্র ইত্যাদি।

মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র, চতুর্দারক সমাধিসূত্র, মহাকরুণাপুণ্ডরীকসূত্র ইত্যাদি। সুবর্ণপ্রভাস সূত্র, সর্ব্বপুণ্যসমুচ্চয়সমাধি সূত্র, নিত্যানিত্যাগতি মুদ্রাবতার, সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক সূত্র, করুণাপুণ্ডরীকসূত্র, বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ, অবৈবর্ত্ত্য সূত্র, অপরিমর্ত্ত্য সূত্র, রত্নমেঘ সূত্র, সন্ধি নির্মোচন সূত্র, ললিত বিস্তর সূত্র, মহাদ্রুমকিন্নররাজপরিপৃচ্ছা, সর্ব্বধর্ম্মপ্রবৃত্তিনির্দ্দেশ সূত্র, বসুধার সূত্র, বুদ্ধ ভাষিত মহাভিষেকর্দ্ধিধারিণী সূত্র, রত্নকারণ্ডকব্যূহসূত্র, ভৈষজ্য গুরু পূর্ব্ব প্রণিধান, অজাতশত্রুকৌকৃত্য-বিনোদন, লঙ্কাবতার সূত্র, মহাসত্য নিগ্রন্থপুত্রব্যাকরণসূত্র, মহাকরুণাপুণ্ডরীকসূত্র, মঞ্জুশ্রীবিক্রীড়িত নির্দ্দেশ, মহামেঘসূত্র, মহাযানাভিসময় সূত্র, বুদ্ধভাষিতামিতায়ুর্বুদ্ধধ্যান সূত্র, সুখাবতীব্যূহ, মৈত্রেয় ব্যাকরণ, পরমার্থধর্ম্মবিজয়সূত্র, সর্ব্বধর্ম্মোচ্চার্য্য সূত্র, কুমার-মূক-

সূত্র, চন্দ্রপ্রভাকুমার সূত্র, শ্রীগুপ্ত সূত্র, বৎস সূত্র, গয়াশীর্ষ, সর্ব্ববুদ্ধবিষয়াবতার, রাজাববাদক, অদ্ভুত ধর্ম্মপর্য্যায়, সিংহনাদিক সূত্র, মঞ্জুশ্রী পরিপৃচ্ছা, চতুষ্ক নির্হার সূত্র, প্রতীত্য সমুৎপাদসূত্র, শালিসম্ভব সূত্র, ভবসংক্রামিত, অষ্টবুদ্ধক, অমোঘপাশহৃদয়, ষড়ক্ষর বিদ্যামাত্র, পুষ্পকুট, সর্ব্ব দুর্গতি-পরিশোধন-উষ্ণীষ বিজয় ধারণী, বুদ্ধভাষিত ধারণী সংগ্রহ, সপ্ত বুদ্ধক সূত্র, বজ্রমন্ত্র ধারণী, বোধিসত্ত্ব বোধিবৃক্ষ, মহামায়াসূত্র, সর্ব্বগুণ পুণ্যক্ষেত্র সূত্র, তথাগত গর্ভসূত্র, লোকানুবর্ত্তন সূত্র, কনকবর্ণ পূর্ব্বযোগ, সুরঙ্গম সমাধি, অদ্ভুত ধর্ম্ম পর্য্যায়, বুদ্ধসংগীতি সূত্র, কুসুম সঞ্চয় সূত্র, ভদ্রকল্পিক সূত্র, শতবুদ্ধনাম সূত্র, কুশলমূল সম্পরিগ্রহ সূত্র, প্রদীপদানীয় সূত্র, অঙ্গুলিমালীয় সূত্র, অনবতপ্ত নাগরাজ পরিপৃচ্ছা, ঘন ব্যূহসূত্র, সাগর নাগরাজ পরিপৃচ্ছা, চৈত্য প্রদক্ষিণগাথা, অন্তরাভব সূত্র, চক্ষু বিশোধন বিদ্যা, বুদ্ধ হৃদয় ধারণী, সমন্ত ভদ্র ধারণী, জ্ঞানোল্কধারণী সর্ব্বদুর্গতি পরিশোধনী, সর্ব্বধর্ম্ম গুণ ব্যূহরাজ, ভদ্রকরাত্রি, বুদ্ধভূমি, অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র, সহস্র বুদ্ধনিদান সূত্র, দশদিগন্ধকার বিধ্বংসন সূত্র, ভবসংক্রান্তি সূত্র, মহাবৈরোচনাভিসম্বোধি, ইত্যাদি।

মহাযান—বিনয়।

বুদ্ধভাষিতমঞ্জু শ্রী শুদ্ধবিনয়, বোধিসত্ত্বচর্য্যা নির্দ্দেশ, ব্রহ্মজালসূত্র, উপাসকশীলসূত্র, পরমার্থ সংবৃতি সত্য নির্দ্দেশ মহাযান সূত্র, কর্ম্মাবরণ প্রতিসরণ, বুদ্ধ পিটক নিগ্রহ নাম মহাযান সূত্র, বোধিসত্ত্ব প্রাতিমোক্ষ, বুদ্ধ ভাষিত দশভদ্র কর্ম্ম মার্গ সূত্র, শুদ্ধবিনয়বৈপুল্য সূত্র, সমন্তভদ্রবোধসত্ত্ব সূত্র ত্রিস্কন্ধক, ইত্যাদি।

মহাযান—অভিধর্ম্ম।

বজ্রচ্ছেদিকা সূত্র শাস্ত্র, যোগাচার্য্য ভূমি শাস্ত্র, আলম্বন প্রত্যয়ধ্যান শাস্ত্র, পঞ্চস্কন্ধ বৈপুল্য শাস্ত্র. প্রজ্ঞামূলশাস্ত্রটীকা, দশভূমিবিভাষাশাস্ত্র, সূত্রালঙ্কার শাস্ত্র, মহাযান সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রদীপশাস্ত্রকারিকা, অষ্টাদশাকাশ শাস্ত্র, শতশাস্ত্র, গয়াশীর্ষ সূত্র টীকা, বুদ্ধভূমি সূত্রশাস্ত্র, বিদ্যামাত্রসিদ্ধিশাস্ত্র, মহাযানাভিধর্ম্মসংগীতি শাস্ত্র, অপরিমিতায়ুঃ সূত্র শাস্ত্র, নির্ব্বাণ শাস্ত্র, প্রতীত্য সমুৎপাদ শাস্ত্র, ন্যায়প্রবেশকতারকশাস্ত্র, বিদ্যানির্দ্দেশ শাস্ত্র, কর্ম্মসিদ্ধপ্রকরণ শাস্ত্র, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকসূত্রশাস্ত্র, রত্নকুটসূত্রশাস্ত্র, মহাপুরুষশাস্ত্র, মধ্যান্তবিভাগ শাস্ত্র, শতাক্ষর শাস্ত্র, উপায় কৌশল্যশাস্ত্র, ইত্যাদি।

হীনযান—সূত্র।

মধ্যমাগম সূত্র, একোত্তরাগম সূত্র, সংযুক্তাগম সূত্র দীর্ঘাগম সূত্র, মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র, ব্রহ্মজালসূত্র, মধ্যম-ইত্যুক্ত শাস্ত্র, চতুঃসত্যসূত্র, নিদান সূত্র, মাতঙ্গী সূত্র, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্র, নন্দপ্রব্রজ্যা সূত্র, জাতকনিনান, সদ্ধর্ম্মস্মৃত্যুপস্থান সূত্র, বুদ্ধচরিত, অভিনিষ্ক্রমণ সূত্র, কর্ম্মবিভাগ ধর্ম্মগ্রন্থ, স্কন্ধ ধাত্বায়তন সূত্র ইত্যাদি।

হীনযান—বিনয়।

প্রতিমোক্ষবিনয়, মহাসর্ব্বাস্তিবাদ বিনয়. ধর্ম্মগুপ্তবিনয়, মহাসংঘবিনয়, মহীশাসক বিনয়, সংঘভেদক বস্তু, বিভাষা বিনয়, সর্ব্বাস্তিবাদ বিনয়সংগ্রহ, বিনয়-নিদান-সূত্র, বিনয়মাতৃকা শাস্ত্র, মহাশ্রমণৈকশতকর্ম্মবাচা, শ্রমণের কর্ম্মবাচা ইত্যাদি।

হীনযান—অভিধর্ম্ম।

চতুঃসত্যশাস্ত্র, প্রত্যেকবুদ্ধনিদানশাস্ত্র, অভিধর্ম্মমহাবিভাষাশাস্ত্র, ন্যায়ানুসারশাস্ত্র, অভিধর্ম্মপ্রকরণশাসনশাস্ত্র, অভিধর্ম্মকোষশাস্ত্র, সারিপুত্রাভিধর্ম্মশাস্ত্র, সম্মিতীয়নিকায়শাস্ত্র, অভিধর্ম্মজ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্র, সত্যসিদ্ধি শাস্ত্র, অভিধর্ম্মামৃতশাস্ত্র, বিভাষা শাস্ত্র, অভিধর্ম্মবিজ্ঞানকায়পদ, পঞ্চবস্তুবিভাষা শাস্ত্র, অষ্টাদশ নিকায়শাস্ত্র, সংযুক্তাভিধর্ম্ম হৃদয় শাস্ত্র, অভিধর্ম্মস্কন্ধপাদ, ইত্যাদি।

প্রেসিডেন্সী কলেজ,

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভুষণ।

———

যবনজাতি।

আমাদের দেশের আপামর সাধারণ সকলেরই দৃঢ়তর বিশ্বাস ও ধারণা যে, মুসলমানগণ যবন এবং ইংরেজগণ ম্লেচ্ছ। আবার শব্দকল্পদ্রুমের উপকরণ সমাহৃতৃগণ বলিতেছেন—"যবনঃ মোসলমানেঙ্গরাজোভয়জাতিবাচকঃ।" কিন্তু ইহার একটী কথাও সমূলক বা প্রকৃত সত্য নহে। যবনদিগের কেহ কেহ মুসলমান হইয়াছেন বটে, কিন্তু মুসলমান মাত্রই যবন বা যবন মাত্রই মুসলমান নহেন। আবার মুসলমান ও ইংরেজ উভয় জাতিই ম্লেচ্ছ বটেন, কিন্তু ইংরেজগণ কোন কারণে যবন বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন না—অথবা কোন দিন আখ্যাত হয়েনও নাই। অপিচ মুসলমান ও ইংরেজ মাত্রই ম্লেচ্ছ, আর কেহ ম্লেচ্ছ পদবাচ্য নহে—তাহাও কেহ চরিতার্থ মনে করিবেন না।

বারণাবত গমন উপলক্ষে বিদুর ও যুধিষ্ঠির পরস্পর ম্লেচ্ছ ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন জগতে ইংরেজ নামের জাতকর্ম্মও সম্পাদিত হয় নাই—ভবিষ্যতে যে হইবে তাহাও কেহ জানিত না। শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ শব্দের এই পরিভাষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

"গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
ধর্ম্মাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥" ইতি বৌধায়নঃ।

কিন্তু এ পরিভাষা পৌরাণিক যুগের। বৈদিক যুগে ভারতীয় ঋষিগণ রীতিমত গোমাংসাশী ছিলেন। স্মার্ত্তযুগের সায়াহ্ন পর্য্যন্তও তাঁহাদিগের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণের 'জের' চলিতে ছিল। ফলতঃ মুসলমানগণ যে অর্থে "কাফের" শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমরাও এক সময় ঠিক সেই অর্থেই "ম্লেচ্ছ" শব্দের ব্যবহার করিতাম। ক্রমে গোমাংসাশী অসংবদ্ধপ্রলাপী অনাচারী লোকদিগকেই আমরা ম্লেচ্ছ শব্দে নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু ম্লেচ্ছ হইলেই সে হিন্দু জাতির বাহিরে গেল এরূপ নহে। নেপালী নটদিগকে আমরা ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকি—কিন্তু তাহারা অহিন্দু নহে। সগর কোপে শকযবনাদি ক্ষত্রিয়গণ ম্লেচ্ছ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অতিদিষ্ট শূদ্র ভিন্ন অহিন্দু হইয়া যান নাই। চীন, জাপান ও মগগণ ম্লেচ্ছ পদবাচ্য হইতে পারেন, কিন্তু তাহারা কেহই যবন পদবাচ্য নহেন।

পূজ্যপাদ স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে যবনান্ন ভক্ষণে বিধেয় প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং মাননীয় সুকবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় পদ্মিনী উপাখ্যানে বলিতেছেন ঃ—

"একতায় হিন্দু রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন,
সে ভাব থাকিত যদি পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?"

এখানে রঘুনন্দন ও রঙ্গলাল বাবু মুসলমান গণকেই যবন শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। মুসলমান হইলেই সে "যবন" হইবে এরূপ বুঝিবার বা ভাবিবার কারণ নাই। ভারত নির্ব্বাসিত যে সকল যবন সন্তান আরবে যাইয়া মুসলমাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যবন ও মুসলমান উভয় শব্দ বাচকই বটেন কিন্তু মহম্মদ মুহালিব্, মহম্মদ কাশিম, মহম্মদ ঘোরী ও সুলতান মামুদ প্রভৃতি যে সকল মুসলমান যোদ্ধৃপুরুষ সর্ব্বাগ্রে সিন্ধু পার হইয়া ভারতে সমাগত হয়েন, তাঁহারা প্রকৃত যবন ছিলেন কি না তাহা অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয়। পাঠান ও মোগলবংশীয় রাজগণ যে যবন ছিলেন না—তাহা ধ্রুব সত্য।

মহারাজ যযাতির অন্যতম পুত্র মহারাজ দ্রুহ্যু অপগস্থানের সামন্তরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র অরুদ্ধ, অরুদ্ধের পুত্র গান্ধার। সেই গান্ধারের নাম হইতে তদীয় জনপদ গান্ধার নামে প্রথিত হয়। কুরুকুল-কেশরী দুর্য্যোধন এই গান্ধার দেশের দৌহিত্র ছিলেন। অপর—রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, অপগস্থান গন্ধর্ব্বদিগের জন্মভূমি ছিল। ভরত উঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া আপনার পুত্র পুষ্কল ও তক্ষের নামে পুষ্কলাবতী ও তক্ষশীলা নামক দুইটী নগর স্থাপন করিয়া আপনার উক্ত পুত্রদ্বয়কে মহারাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রয়াগের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠান নামে একটী নগর ছিল। তদ্দেশীয় যাদবগণ জরাসন্ধভয়ে পলাইয়া যাইয়া কাবুলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই প্রতিষ্ঠানগণ পুক্থন্ ও ক্রমে পাঠান নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কাবুল সন্নিহিত শলাতুর নগরে জগদ্বিশ্রুত পাণিনি প্রাদুর্ভূত হয়েন। তদ্ভিন্ন তালজঙ্ঘ্য, হৈহয়, পারদ, পহ্লব, ও কাম্বোজ

প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয়সন্তান অপগস্থানের সর্ব্বত্র বিরাজমান ছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সমূলে মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বাহ্লীকের ভূরিশ্রবা ও সোমদত্তের অনন্তর বংশেরাও ঐরূপে মহম্মদের ধর্ম্মকে সমালিঙ্গন করেন। ইঁহারা সকলেই মুসলমান পদবাচ্য। মোগলগণ, মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়া বা ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসী—তাঁহারাও যবন নামের কোন সালক্ষ্য সংস্রবী ছিলেন না। সুতরাং সিন্ধু পার হইয়া মুসলমান ভারতে আগমন করিলেও তন্মধ্যে প্রকৃত যবন কে কে আসিয়াছিলেন—তাহা সহজে নির্ণেয় নহে। তবে আরবীয় যোদ্ধৃগণের মধ্যে অনেকেই যবন ছিলেন—ইহা মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে।

মুসলমানগণ বিধর্ম্মী হিন্দু প্রভৃতিকে কাফের বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, হিন্দুরাও তাঁহাদিগকে যবন ও তুরুষ্ক বলিয়া গালি দিয়া মনের আশা মিটাইয়া থাকেন। কিন্তু এই যবন ও তুরুষ্ক শব্দ কোন কারণে গালি সংসূচক হইতে পারে না। যবনগণ মহারাজ যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্ব্বসুর অনন্তর বংশ্য। তাঁহারা বিশুদ্ধ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সন্তান এবং তুরুষ্ক দেশবাসিগণ তুরুক নামের বিষয়ীভূত—ইহা গালিজনক হইবার কোন হেতুই বিদ্যমান নাই। তবে বোধ হয় মহারাজ সগর কর্ত্তৃক পরাভূত ও মুণ্ডিতশিরস্ক ও ভ্রষ্টধর্ম্ম হওয়ার জন্য যবন শব্দ এক সময়ে অপকর্ষবোধক হইয়াছিল। এবং এখন যেমন 'বাঙ্গাল' শব্দ কোন কোন কারণে গ্লানিজনক, সম্ভবতঃ তুরুক শব্দ এক সময়ে সেইরূপ অপকর্ষ বোধক হইয়াছিল। যাহা হউক যবন শব্দ যে গালি বা অপকর্ষজনক নয়—তাহা ধ্রুব সত্য। যবনগণ একদিন অযোধ্যার সিংহাসন হস্তগত করিয়া দিগ্‌দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ন্যায় রণদুর্ম্মদ পরাক্রান্ত জাতি জগতে অতি বিরল।

তবে প্রকৃত যবন কে? প্রকৃত যবন তুর্ব্বসুর বংশধরগণ। তাঁহারাই পূর্ব্ব যবন, পশ্চিম যবন (পারস্য) তুরুষ্ক, আরব, মিশর, গ্রীস, ও ইটালীতে বসবাস নিবন্ধন হিব্রু, গ্রীক লাটিন ও মুসলমান (আরবীয়গণ) প্রভৃতি নামে সমাখ্যাত হইয়াছেন। এবং সেই যবন বংশধরগণের কেহ কেহ যে এখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কিংবা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পদার্থান্তরে পরিণত হইয়া না রহিয়াছেন—তাহাই বা কে বলিতে পারে? শকসূনুগণ ইউরোপে যাইয়া 'শাকসন' (Saxon) জাতিতে পরিণত হইলেও যখন কতকগুলি ম্লেচ্ছীভূত শকসন্তান অদ্যাপি শাসদেশী (?) কায়স্থ নাম ধারণপূর্ব্বক আপনাদের পূর্ব্ব আর্য্যশোণিতের পরিচয় প্রদান করিতেছে—তখন যবন সন্তানেরাও কেহই যে আর পূর্ব্বপিতামহগণের হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোনস্থানে বিদ্যমান নাই—তাহা কে বলিতে পারে?

মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ মহাশয় অনুমান করেন যে, যে সকল জাতি কোন জাতিভেদ মান্য না করিয়া সকলের সহিতই তুল্যভাবে মিশ্রিত হইয়া থাকে—তাহাদের নাম যবন।" যথা—"যৌতি মিশ্রয়তি বা মিশ্রীভবতি সর্ব্বত্র জাতিভেদাভাবাৎ ইতি যবনঃ। যু ন. মিশ্রণে অস্মাৎ অধিকরণে অনট্‌॥"

"According to some sanskrit writers, the word Yavana is derived from the root "yu" to mix, implying a mixed race or one in which no distinction of caste is observed."

Indo-aryan Vol. ii, page 176.

এবং শব্দকল্পদ্রুম সঙ্কলয়িতা পণ্ডিতমণ্ডলী বলিয়াছেন—"যবনঃ স তু যবন দেশোদ্ভব যযাতিরাজপুত্র তুর্ব্বসুবংশঃ"।

কিন্তু আমরা ইহার কোন অর্থেরই অনুমোদন বা সমর্থনে সমুৎসুক্ নহি। যবনগণ তুর্ব্বসু সন্তান, সুতরাং তাঁহারা মহোচ্চচন্দ্রবংশপ্রসূতি—তাঁহারা জাতি মানিতেন না ত কে মানিত? তাঁহারা কি সগরকর্ত্তৃক জাতিভ্রষ্ট হইবার পরে যবন নাম পাইয়াছিলেন--না সে নাম তাঁহাদের জাতিতে থাকিবার সময়েই ছিল? মিত্রজ মহাশয় সূক্ষ্ম বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা সাধীয়ান্‌ নহে। এবং শব্দকল্পদ্রুম যে বলিতেছেন যে, যবন দেশোদ্ভবগণ যবন তাহাও অপ্রকৃত কথা। ফলতঃ যু ধাতুর মিশ্রণার্থ, কিংবা যবন দেশের নাম যবন সংজ্ঞার নিদান নহে।

শ্রদ্ধাভাজন অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও বলিতেছেন যবন শব্দ পূর্ব্বে জনপদবাচী ছিল, পরে জানপদবাচী হইয়াছে। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ প্রমাদসমাঘ্রাত। ফলতঃ তুর্ব্বসুর বংশসমুদ্ভব যবন নামক ব্যক্তির নাম হইতে তাঁহার জাতি যবন জাতি ও দেশ যবনদেশ বা যাবনীন নামে সমাখ্যাত হইয়াছে। উক্ত যাবনীন শব্দই ভাষার বিকারে Ionian যুনানি ইউনান প্রভৃতি

মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। আমরা অনেক আর্ম্মেণিয়ান সাহেবকে (Younana) ইউনান পদটী ধারণ করিতে দেখিয়া থাকি। উক্ত 'ইউনান' শব্দ যবন শব্দের উচ্চারণ ভেদমাত্র। সংস্কৃতগ্রন্থে যবন শব্দ প্রথমে দেশবাচক ছিল, পরে জাতিবাচক হইয়াছে—ইহা আমরা জানি না। আমরা জানি যে, ব্যক্তি, জাতি ও দেশ, সকল বাচক ভাবই সংস্কৃত শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। এবং রাজেন্দ্র বাবু যে বলিয়াছেন, কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি যবন শব্দকে তাঁহার মতানুসারে ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন, আমরা এরূপ ব্যুৎপত্ত্যর্থপ্রকাশক কোন লোকও খুঁজিয়া পাইলাম না।

মহাভারতে লিখিত আছে (আদিপর্ব্ব—৩৪—৫অ)

"যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ।
দ্রুহ্যোঃ সুতাস্তু বৈ ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছ জাতয়ঃ॥"

মৎস্য পুরাণে—বিবৃত রহিয়াছে—

যদোস্তু জাতা যাদবাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ সুতাঃ।
দ্রুহ্যোস্তু তনয়া ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।

সুতরাং এই প্রমাণ দ্বারা যেন সপ্রমাণ হইতেছে যে, যবন শব্দ জাতিবাচক বলিয়াও পূর্ব্বাচার্য্যেরা অবগত ছিলেন। মেদিনী একত্র বলিতেছেন—

"জূরাকাশে সরস্বত্যাং পিশাচ্যাং জবনেঽপি চ।"

সুতরাং এখনও যবন শব্দ জাতিবাচক বলিয়া প্রতীত হইতেছে? তবে বলিতে পার যে—এই জাতি বাচকত্ব দেশবাচক যবন শব্দ হইতে সমুদ্ভূত? কিন্তু তাহা নহে। যখন মহারাজ যযাতি তুর্ব্বসুকে ভারতের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকের সাম্রাজ্য প্রদান করেন, তখন তিনি কখনও একথা বলেন নাই যে, তোমাকে "যবন" দেশের আধিপত্য প্রদান করিলাম। তখন যবন নামে একটী দেশ বা জাতি জানাও ছিল না। তবে তুর্ব্বসুর বংশে যে যবন নামে একজন জন্ম গ্রহণ করেন—তাঁহার নাম হইতেই তাঁহার বংশীয়গণ (যেমন রঘুর বংশীয়গণ রাঘব, যদুর বংশীয়গণ যাদব) যবন নাম প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার রাজ্যও তাঁহার ঐ নামানুসারে যবন দেশ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল।

রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি ও বহু পুরাণ এবং উপপুরাণে যবনগণের কাহিনী বিবৃত রহিয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কলহ সময়ে

বশিষ্ঠ ধেনু শবলার যোনিদেশ হইতে যবন সৈন্য প্রাদুর্ভূত হয়। আমরা ইহার অতিরঞ্জিত ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইহা হইতে এই সত্যটী মাত্র গ্রহণ করিতে পারি যে, তৎকালে যবন সৈন্যগণ বশিষ্ঠের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যবনগণের উৎপত্তিকাহিনী বস্তুতঃ ঈদৃশ প্রহেলিকা প্রচ্ছাদিত নহে।

আমরা বাইবেলে দেখিতেছি—নোহার বংশে যবন নামে একব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই নোহা আমাদের নহুষ ভিন্ন আর কেহ নহেন। নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু, যবন তুর্ব্বসুর অনন্তর বংশ্য। সুতরাং বাইবেলের এই বর্ণনা দ্বারা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, তুর্ব্বসুর বংশে যবন নামে একজন রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের শাস্ত্রে মনুর সময়ে জলপ্লাবন সংঘটিত বলিয়া বিবৃত,—পক্ষান্তরে বাইবেলে নোহার সময়ে হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত। কিন্তু নোহা বা নহুষ, মনুর ঔরস পুত্র, সুতরাং তাহাতে কাল ঘটিত কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। সুতরাং উল্লিখিত নানা কারণে নোহা ও নহুষ যে এক ব্যক্তি ইহা মানিয়া লওয়া যুক্তিবিগর্হিত কার্য্য নহে। ইহাতে সম্ভব যে তুর্ব্বসুর বংশে যবন জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহারই নাম হইতেই তাঁহার জাতি ও দেশ যবন নাম ধারণ করিয়াছে। যথা—"যবনো দেশবাসিনঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

তবে এখানে বিতর্ক এই হইতে পারে যে, বাইবেলের ও পুরাণের বংশাবলীতে নামগত বহু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

বাইবেল—

(নোহের বংশের বিবরণ।)

অথ নোহের পুত্র শেম্ হেম ও জেফতের বৃত্তান্ত। জলপ্লাবনের পর তাহাদের (এই সকল) সন্তান সন্ততি হয়। গোময় ও মাগোল, মাদয় ও যবন ও তুবল ও মেশক ও তীরস্ ইহারা জেফতের সন্তান। আস্কনস্ ও রিফৎ তোগর্ম্ম, ইহারা গোময়ের সন্তান। এবং ইলীশা ও তর্শিশ ও কিত্তিম ও দোদানীম, ইহারা যবনের সন্তান। এই সকল হইতে পরজাতীয়দের দ্বীপনিবাসীরা আপনাদের দেশ বিদেশে স্ব স্ব ভাষানুসারে ব্যাপ্ত হইয়া আপন আপন জাতির নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়। ১০অ—আদি পুস্তক।

পুরাণ—

যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ।

মহাভারত।

পৌরজানপদৈস্তুষ্টৈরিত্যুক্তে নাহুষস্তদা॥
অভিষিচ্য ততঃ পুরুং স্বরাষ্ট্রে সুতমাত্মনঃ॥ ৮৭
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং তং ন্যবেশয়ৎ।
দক্ষিণাপরতো রাজা যদুং জ্যেষ্ঠং ন্যবেশয়ৎ॥ ৮৮
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ দ্রুহ্যং চানুঞ্চ তাবুভৌ।
ব্যভজৎ পঞ্চধা রাজা পুত্রেভ্যো নাহুষস্তদা॥ ৮৯

৩১ অ—৪, থ।

তুর্ব্বসোস্তু সুতো বহ্নিঃ বহ্নের্গোভানুরাত্মজঃ।
গোভানোস্তু সুতো বীরস্ত্রিসানুরপরাজিতঃ॥ ১
করন্ধমস্ত্রিসানোস্তু মরুত্তস্তস্য চাত্মজঃ।
অন্যস্ত্বীক্ষিতো রাজা মরুত্তঃ কথিতঃ পুরা॥ ২
অনপত্যো মরুত্তস্তু স রাজাসীৎ ইতি শ্রুতং।
দুষ্কৃতং পৌরবং চাপি স বৈ পুত্রমকল্পয়ৎ॥ ৩
এবং যযাতি শাপেন জরায়াঃ সংক্রমেণ তু।
তুর্ব্বসোঃ পৌরবং বংশং প্রবিবেশ পুরাকিল॥ ৪
দুষ্কৃতস্য তু দায়াদঃ শরূথো নাম পার্থিবঃ।
শরূথাত্তু জনাপীড়ঃ চত্বারস্তস্য চাত্মজাঃ॥ ৫
পাণ্ড্যশ্চ কেরলশ্চৈব চোলঃ কুল্যস্তথৈবচ।
তেষাং জনপদাঃ কুল্যাঃ পাণ্ড্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥ ৬

৩৭ অ,—বায়ু।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি নানা গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিরোধের মধ্যে এই যে, বিষ্ণুপুরাণে দুষ্কৃত নামের বিনিময়ে দুষ্মন্ত নাম গৃহীত রহিয়াছে। যাহা হউক আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহি যে, পুরাণ কর্ত্তারা যে মরুত্তকে নিঃসন্তান করিয়া তাঁহাকে পৌরব বংশীয় দুষ্কৃত বা দুষ্মন্তকে পোষ্যপুত্র ঘটাইয়া দিয়াছেন—তাহা অলীক।

পাণ্ড্য-কেরল-চোল প্রভৃতি দেশ পৌরববংশীয় দুষ্মন্তের পুত্রগণদ্বারা সংস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত তুর্ব্বসু সন্তান মরুত্তের কোন সংস্রবই নাই এবং ছিল না। পুরাণ কর্ত্তা নিজেই বলিতেছেন যে,

"অনপত্যো মরুত্তস্তু স রাজাসীদিতি শ্রুতং"

সুতরাং শ্রুতমাত্র—প্রমাণ নহে। মরুত্ত ভারতের দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে রাজত্ব করিতেছিলেন। পুরাণ কর্ত্তা যে নৈমিষারণ্যের কুটীরে বসিয়া সেই সুদূরস্থিত তুর্ব্বসু রাজার কোন সংবাদ পাইতেছিলেন—তাহা নহে। কাজেই একটা 'আন্দাজী' কথা লিখিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ইহা একটী স্বীকৃত তথ্য যে, যাদবগণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা তজ্জন্যই সুদূর সমুদ্রসৈকতসংস্থ। দক্ষিণাপথে তুর্ব্বসু বা তদীয় বংশীয়গণের যাওয়ায় কোন হেতুই ছিল না। প্রকৃত কথা এই যে, যেমন কুলপঞ্জিকাকারগণ দেশান্তরিত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশবাসিগণের নাম ধাম ও বংশ বিবৃতি করিয়া থাকেন, পুরাণকারেরাও তাহাই করায় তুর্ব্বসু বংশের সকলের নাম তাঁহাদের পুরাণে দেখা যায় না।

পক্ষান্তরে বাইবেল লেখক আপনাদের আদি পুরুষ নহুষ হইতে বংশ গণনা করিয়াছেন। যাঁহারা মূষার নিকট বংশের নাম বলিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের তুর্ব্বসু প্রভৃতি পুরাণ লিখিত নাম গুলি বিস্মৃতিবশতঃ বলেন নাই,—মূষাও লিখিতে অসমর্থ হইয়াছেন। আমারাও ত আমাদের অতি পূর্ব্ব পুরুষের নাম করিতে পারিলেও মধ্যবর্ত্তী অনেকের নাম করিতে পারি না, ও অদ্যাপি পারিতেছি না। তৎপরে ভাষার বিকারে ঘোরতর বিকার ঘটায় নামগত সাম্য প্রদর্শন অসম্ভব হইয়াছে। যাহাহউক আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা যতদূর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সম্পূর্ণ সমর্থ যে, "যবনগণ নহুষ পৌত্র তুর্ব্বসু সন্তান। তুর্ব্বসু চন্দ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও অতীব মহোচ্চকুলপ্রভব। সুতরাং যবনগণও যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির ন্যায়, মহোচ্চকুলপ্রসূত। এ হেন যবন বংশ কতদূর সপর্য্যাভাজন—অথবা কতদূর গালি সংসূচক—তাহা মনীষিগণই ভাবিয়া দেখুন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রত্যেক চেতস্বান ব্যক্তিই স্বীকার

করিবেন যে, যবনগণ বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিতবাহী মহাকুল জাত। এই যবন জাতিকে কেহই অনাচরণীয় অহিন্দু মুসলমান বা ম্লেচ্ছ বলিয়া ভাবিতে সমর্থ নহেন। তবে যে আমরা আরব হিব্রু, প্রভৃতিকে যবন বলিয়া আখ্যাত করিয়া আসিয়াছি,—তাহাও প্রমাদসন্দুষ্ট নহে। আমাদের বিশুদ্ধ আর্য্য শোণিতসম্বন্ধী বিশুদ্ধ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়সূনু তুর্ব্বসু সন্তান যবনগণই আরবাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া ঐ সকল নামে আখ্যাত ও প্রথিত হইয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, উক্ত যবনগণ যথন পারস্য দেশে ব্যবসায় করিতে ছিলেন, তখন সগরপিতা মহারাজ বাহু বা অসিত সাকেত বা অযোধ্যার সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। শক, যবন, পারদ, পহ্লব, তালজঙ্ঘ, হৈহয় ও কাম্বোজাদি রণদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ সমবেত হইয়া উক্ত বাহুকে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত করেন। তাহাতে মহারাজ বাহু আপন অন্তর্বত্নী মহিষী সহ ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমোপকণ্ঠে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁহার উপরতি ঘটিলে রাজমহিষী ঔর্ব্বের আশ্রমে যাইয়া বাস করেন। তথায় মহারাজ সগর ভূমিষ্ঠ হইলে ঔর্ব্ব তাঁহাকে শাস্ত্রে ও শস্ত্রে সুপণ্ডিত করেন। কোন কোন গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে, সগর স্বর্গে যাইয়া ভার্গবের নিকট আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিয়া তৎসাহায্যে হৈহয়গণকে প্রায় নির্ম্মূল করেন। পরে শক যবনাদি আসিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলে তাঁহার কথামত সগর উহাঁদিগের প্রাণ বধ না করিয়া উহাঁদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ করেন, এবং যবনগণের শিরোমুণ্ডন, শকগণের অর্দ্ধ মুণ্ডন প্রভৃতি করাইয়া দেন। মুসলমানগণ এখনও যে মুণ্ডিতশিরস্ক,—সেই মান্ধাতার আমলে সগর শাসনই তাহার একমাত্র নিদান। কালে স্বেচ্ছায় বা রাজপীড়নে দেশত্যাগ পূর্ব্বক অনেকে তুরুস্কে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারাই হিব্রু বা জু (Yu) জাতি। এই জু শব্দ যবন শব্দেরই দূরবর্ত্তী বিকার। পালি ভাষার যবন শব্দ জোন শব্দের বিকৃত। ঐ জোন আবার বিকারে 'জু'তে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণ যে (Jo) 'যো' হইতে যবন বা (Ionian) 'আইওনিয়ান' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কয়েন, উহা প্রমাদদুষ্ট। ফলতঃ যবন শব্দই জু জোন্ যুনানি ইউনান ও আইওনিয়ান শব্দের নিদান। আরবগণ ইস্রাইল বংশপ্রভব। সুতরাং তাঁহারা হিব্রুগণের একটী প্রশাখা মাত্র। কাজেই তাঁহারাও যবন পদবাচ্য হইতেছেন। উক্ত হিব্রুগণের যে শাখা মিশর হইতে গ্রীশদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারাই গ্রীক যবন। এবং গ্রীক যবনেরাও অনেকে ইটালীতে যাইয়া লাটিন জাতির উপচিতি সংবর্দ্ধন করিয়াছেন। সুতরাং হেলেনিক আর্য্যবংশ্য এই উভয় জাতিকেও যবন বলা গেল। আমরা সগর রাজার যবন দমন বিষয়ে উপরে যাহা যাহা লিখিয়াছি, আমাদের পুরাণে তাহা এইরূপে বিবৃত রহিয়াছে :—

"ত্রিশঙ্কোর্হরিশ্চন্দ্রঃ। তস্মাৎ রোহিতাশ্বঃ। ততশ্চ হরিতঃ। হরিতাৎ চঞ্চু চঞ্চোর্বিজয়দেবৌ। রুরুকো বিজয়াৎ। রুরুকস্য চ বৃকস্ততঃ বাহুঃ (রামায়ণে অসিতঃ) যোঽসৌ হৈহয় তালজঙ্ঘাদিভিরবজিতঃ অন্তর্বত্ন্যা মহিষ্যা সহ বনং প্রবিবেশ ॥ ১৫ ॥

স চ বাহুর্ব্বৃদ্ধভাবাৎ ঔর্ব্বাশ্রমসমীপে মমার ॥ ১৬ ॥ তেনৈব ভগবতা স্বাশ্রমমানীয়ত। কতিপয় দিনান্তরে অতি তেজস্বী বালকো জজ্ঞে। তস্য ঔর্ব্ব জাতকর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য সগর ইতি নাম চকার। কৃতোপনয়নঞ্চ এনমৌর্ব্বো বেদান্ শাস্ত্রাণি অশেষাণি অস্ত্রঞ্চ আগ্নেয়ং ভার্গবাখ্যং অধ্যাপয়ামাস।* উৎপন্নবুদ্ধিশ্চ মাতরমপৃচ্ছৎ অম্ব! কথমত্র বয়ং! ক্ব বা তাতঃ? তাতোঽস্মাকং কঃ? ইত্যেবমাদি পৃচ্ছতস্তন্মাতা সর্ব্বমবোচৎ। ততঃ পিতৃরাজ্যহরণামর্ষিতঃ হৈহয়তালজঙ্ঘাদিবধায় প্রতিজ্ঞামকরোৎ। প্রায়শ্চ হৈহয়ান্ জঘান। শকযবনকাম্বোজপারদপহ্লবা হন্যমানাস্তদ্‌গুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ ॥ ১৮ ॥

অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ—বৎস অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ ॥ ১৯ ॥ এতেচ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ ॥ ২০ ॥ স তথেতি তদ্‌গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বং অকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ, অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্। প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্ নিঃস্বাধ্যায়বষটকারান্ এতান্ অন্যান্ চ ক্ষত্রিয়ান্ চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাৎ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ ॥ ২১ ॥ ৩ অ—৪ অংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, হরিবংশ প্রভৃতি অন্যান্য পুরাণাদি শাস্ত্রেও এই কাহিনী

* "আগ্নেয়মস্ত্রং লব্ধ্বা তু ভার্গবাৎ সগরো নৃপঃ। জঘান পৃথিবীং গত্বা তালজঙ্ঘান্ স হৈহয়ান্ ॥" বায়ু।

ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বর্ণিত আছে। বাহুল্য বোধে সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না। যাহা হউক ইহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন—যবনগণ হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন।

মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রজ মহাশয় বলিয়াছেন, কোলব্রুক প্রিন্সেপ্ উইলসন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, আমারা নিম্নলিখিত কারণ চতুষ্টয় হেতু মনে করি যে, গ্রীক্‌গণ সংস্কৃতশাস্ত্র সমুদিত যবন জাতি। যথা—

"1st. Similarity of sound of the Greek Ionia with the Persian—Yunan, the Hebrew Javana, and the Sanskrit Yavana.

2nd. The use of the word Jona, the Pali form of the Sanskrit Yavana, to indicate an Ionian Prince.

3rd. References made in Sanskrit astronomical works to foreign treatises on astronomy which, it is presumed, must have been Greek.

4th. The intercourse of the Indians with the Greek successors of Alexander in North Western India.

আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, গ্রীক্ 'আইওনিয়ান' ও আমাদের 'যবন' শব্দ অভিন্ন এবং তাঁহারা আমাদের তুর্ব্বসুপ্রভৃতি যবনের অনন্তর বংশ্য। অবশ্য আমরা তাঁহাদের এই ৩য় কারণটির বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু গ্রীক্‌গণ যে আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত যবন জাতি তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। এবং পাশ্চাত্যগণ ভাষা ও গ্রীক্ দেবতাগণের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইবেন—গ্রীক্ ভাষা সংস্কৃতের আসন্ন বিকৃতি এবং তাঁহাদের (Pawn) 'প-ন'ও (Jupiter) 'জুপিটর' প্রভৃতি দেবগণ—আমাদের পবন ও দ্যুপিতরঃ প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা পাশ্চাত্যগণের উক্ত হেতু ভিন্ন মহামতি মিল্‌টন তাঁহার "প্যারাডাইজ্ লষ্ট" নামক মহাকাব্যে যাহা বলিয়া গিয়াছেন—তাহাতেও গ্রীক্‌গণকে ভারতীয় যবন বলিয়া স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষী। মিল্‌টন বলিতেছেন ঃ—

"The Ionian gods of Javan's issue held gods, yet confessed later than Heaven and Earth, their boasted parents."

Note—Javan's issue = Fourth son of Japhet and the grand son of Noah.

Belived to be gods yet admitted to be later. Because all Greek divinities were the off-spring of Heaven (Uranus) and and the earth (Gaia).

এখানে মিল্‌টন এই তর্ক করিতেছেন যে, গ্রীক্‌গণ আপনাদিগকে যবনের সন্তান দেবতা বলিয়া দাবি করে, আবার ইহা বলিয়াও গর্ব্ব করে যে, আমরা স্বর্গ ও পৃথিবীর সন্তান। কিন্তু ইহা সঙ্গত হইতে পারে না। যাঁহারা দেবতা তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টির পূর্ব্বেই হইয়াছিলেন—তবে তাঁহারা আবার কি প্রকারে পরে সৃষ্ট স্বর্গ ও পৃথিবীর সন্তান হইতে পারেন?

আমরা এখানে গ্রীক্‌দের উক্তিই প্রকৃত বলিয়া মনে করি। মিল্‌টন এখানে প্রকৃত মর্ম্মের অনুসন্ধান না পাইয়া বৃথা বিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রীক্‌গণ যে যবন সন্তান তাহাতে কোন সন্দেহই নাই এবং তাঁহারা যে স্বর্গ ও পৃথিবীর সন্তান বলিয়া গর্ব্ব করেন—তাহাও ভিত্তিশূন্য নহে।

আমরা "মানুষ দেবতা" এবং "দেবগণের মর্ত্ত্যলোকে আগমন" এই প্রবন্ধদ্বয়ে দেখাইয়াছি যে, মানুষ ও দেবতা এবং স্বর্গের (আল্‌টাই পর্ব্বত অথবা মেরুর) অধিবাসী মনুষ্যগণ তথায় দৈবসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ছিলেন। আমাদের ও যবনগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই স্বর্গ হইতে বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য্য, মনু, অত্রি ও বায়ুসহ ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে বহুকাল বসবাসের পর যবনেরা পারস্য হইয়া তুরুস্ক, আরব ও গ্রীস্ প্রভৃতি দেশে গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা আপনাদিগকে স্বর্গ ও পৃথিবীর পুত্র বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্ত্তা স্বর্গ অর্থে "উরনস" করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্গ মেরু পর্ব্বত—'উরনস' স্বর্গ নহে। 'উরনস' (Uranus) শব্দ আমাদের বরুণস্ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। বরুণ অপগস্থান ও পারস্যের রাজা ছিলেন। যবনেরাও বহুকাল পারস্যে বাস করিয়া গিয়াছেন। এখনও পারস্যে রামপুর নামক একটী নগর তথায় হিন্দু বসবাসের শেষ চিহ্ন সূচিত করিতেছে। উক্ত পারস্য বরুণের রাজ্য বলিয়া উহাকে উরনস্ বলা যাইতে

পারে। কিন্তু উহা স্বর্গ নহে। টীকাকর্ত্তা (Earth পৃথিবী) শব্দের অর্থস্থলে (Gaia) "গৈইয়া" শব্দ বলিয়াছেন। উহা ঠিক হইয়াছে। যেমন ভারতবর্ষ পৃথু রাজার রাজ্য বলিয়া পৃথ্বী বা পৃথিবী নামে কথিত। পৃথিবীর অপর নাম "গো" এই গোরূপধারিণী পৃথিবীকে পৃথু রাজা দোহন করিয়াছিলেন। যবনেরাও প্রথমে স্বর্গবাসী পরে পৃথ্বী (Earth) বা ভারতবাসী ছিলেন। তজ্জন্য আপনাদিগকে স্বর্গ ও "গৈয়ার" পূর্ব্ব নিবাসী বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও গ্রীক্ যবনগণের ভারত সন্তানত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। "পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ" মনুর এই উক্তি দ্বারা আমাদের ও যবনদের পূর্ব্ব দেবত্ব সূচিত হইয়া থাকে। এবং "পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ" এই উক্তি দ্বারাও দৈত্য দানবগণের পূর্ব্বদেবত্ব সূচিত হয়। গ্রীক্‌যবনেরা যে পূর্ব্বনিবাস ভূমিকে মাতা পিতা বলিয়াছেন উহা তদানীন্তন রীতি বিশেষ ছিল। মরুদ্‌গণও পৃশ্নিমাতরঃ (পৃথিবী মাতৃকাঃ) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অতএব মিল্‌টনের বর্ণনা দ্বারাও গ্রীক্‌গণের যবনত্ব, সুতরাং ভারতসন্তানত্ব ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

কিন্তু এখানে আমরা এইমাত্র বিতর্ক করিতে অভিলাষী যে, সংস্কৃত গ্রন্থে যত যত স্থানে যবন জাতির সমুল্লেখ হইয়াছে, তাহার একটী শব্দও শাস্ত্র কর্ত্তৃগণ গ্রীক্ হিব্রু বা আরবীয়গণকে অববোধিত করিতে প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহারা যে বিশুদ্ধ যবনবংশপ্রসূতি তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সংস্কৃতগ্রন্থকারগণ তাহা জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। কেননা তাঁহারা ভারতসাম্রাজ্যের বহির্ভূত কোন জাতিকে যবন বলিয়া জানিতেন না। ততদূর সংবাদ লইয়া কোন কথা লিখিবার চেষ্টা তাঁহাদের থাকিলে আজি কেন আমরা ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ে এত পশ্চাৎপদ হইয়া থাকিব? প্রাচীন মুনি ঋষিরা নাসিকায় নস্য দিয়া কেবল ঘটত্ব পটত্ব করিয়াছেন আর বেদ, উপনিষৎ স্মৃতি, পুরাণ লিখিয়াছেন। পার্থিব জগৎ তাঁহাদিগের আনন্দের অতীত পদার্থ ছিল। উহা তাঁহাদিগের নয়নের নিকট ভাসিয়া বেড়াইত। কি রামায়ণ, কি মহাভারত, কি হরিবংশ, কি পুরাণ উপপুরাণনিচয় কি, বৃহৎ সংহিতাদি জ্যোতিষসমূহ—ইহার যেখানে যত যবন শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সেই রণদুর্ম্মদ পারস্যবাসী হিন্দু যবনজাতিকে নির্দ্দেশ করিয়াছে।

মোক্ষমূলর (Maxmuller) কোলব্রুক ও উইলসন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য

বিদ্বৎকুল ও তাঁহাদিগের পদাবনতমূর্দ্ধা কোন কোন ভারতসন্তান বলিয়া থাকেন যে, আমরা গ্রীকদিগের নিকট হাঁটিতে শিখিয়াছি,—গ্রীকগণ আমাদিগের জ্যোতিষগুরু। কিন্তু আমরা অতীব ঘৃণার সহিত তারস্বরে এ উন্মত্ত প্রলাপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি। যে হিন্দুগণ আজন্ম জ্ঞানগরীয়ান্, যাঁহাদিগের জ্ঞানমহাসাগরের কণিকামাত্র বারিবিন্দু পান করিয়া সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে শিখিল—সেদিনকার অর্ব্বাচীন শিশু গ্রীক যবনগণ সেই জগদ্‌গুরু হিন্দুগণের শিক্ষক? মনু বলিয়াছেন।—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥" ২০—২ অ।

যে ভারতীয় ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীর সমুদায় নরনারী জ্ঞানশিক্ষা করিতে আসিত, সেই জগদ্‌গুরু হিন্দুর গুরু—দেশ নির্ব্বাসিত অন্তেবাসিদেশীয় গ্রীক যুবা? সেই মান্ধাতার আমলে ও যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যখন সমুদায় জগৎ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল—যখন আদি জন্মভূমি একমাত্র স্বর্গ ও ভারত ভিন্ন আর কোথায়ও জ্ঞানের একটী প্রদীপও জ্বলিত না—ভারতীয় হিন্দুগণ—সেই প্রাচীনতম বৈদিক যুগে বাইবেলের জন্মেরও দুই যুগ পূর্ব্বে—জ্যোতিষের কথা লইয়া লীলা খেলা করিতেছেন। আর সেই জ্ঞান গরীয়ান্ বর্ষীয়ান্ হিন্দু কিনা স্তন্যপায়ী শিশুর নিকট পদক্রম শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন! হে একদেশদর্শিন্ পাশ্চাত্যগণ! তোমরা কি "এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা" নামক বৃহৎ কোষগ্রন্থে "জিওমেট্রী" (জ্যামিতি) শাস্ত্রে বারংবার বল নাই যে,—

সমুদায় ইউরোপ জিওমেট্রী (জ্যামিতি) প্রভৃতি গণিতের জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী—গ্রীস্ আবার সে বিষয়ে আরবের নিকট মহাঋণী এবং আরব আবার তজ্জন্য ভারতীয় ঋষিবৃন্দের নিকট দুশ্ছেদ্য ঋণ-শৃঙ্খলে বদ্ধগ্রীব? এহেন ভারত গিয়াছিলেন শিষ্যের শিষ্য গ্রীসের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে? সত্য বটে আমরা এখন তোমাদের চক্ষে (Heathen) "হিদেন ও নিগার" বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি—তোমরা আমাদিগকে পশু অপেক্ষাও অবরজ বলিয়া মনে করিয়া থাক—কিন্তু ইহা কি ঠিক নহে যে, একদিন আমরা তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া অক্ষর পরিচয় শিক্ষা দিয়াছি—শৈশবকালে যখন দাঁড়াইতে জানিতে না

তখন অঙ্গুলি ধরিয়া পদে পদে পদক্রম শিখাইয়াছি? সত্য বটে বরাহমিহির, তদীয় বৃহৎসংহিতায় বলিয়াছেন।—

"ম্লেচ্ছাহি যবনাস্তেষুসম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতং।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈবজ্ঞদ্বিজঃ॥"

অর্থাৎ যবনগণ ম্লেচ্ছ হইলেও তাহারা এই জ্যোতিষ শাস্ত্রে অতীব পারদৃশ্বা বটে। তাহারাও ঋষির ন্যায় এ বিষয়ে পূজনীয়—দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগের নিকট কোথায় লাগে?

হাঁ একথা যথার্থ বটে, একদিন যবনগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে সত্য সত্যই অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ এরূপ নহে যে, তাঁহারা ভারতীয়গণের শিক্ষাগুরু ছিলেন,—ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের নিকট কোন ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। বরাহমিহির সরল হৃদয়ে গুণীর গুণের কথা শতমুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার কিঞ্চিৎ অতিবাদ সংমিশ্রও না হইতে পারে তাহা নহে। কিন্তু এই যবনগণ, পারস্যদেশবাসী ভারতসন্তান ভিন্ন সুদূর গ্রীস্‌বাসী গ্রীক্‌গণ নহেন। আমাদের প্রত্যেক জ্যোতিষগ্রন্থেই এই কথা রহিয়াছে যে, যবন ছাত্রগণ অল্পমতিক জড়বুদ্ধি—তাহাদিগের জন্য সহজ সহজ বিষয়ের শিক্ষা দান কর্ত্তব্য। এ হেন যবনগণ ভারতীয় যবনগণের ছাত্র ভিন্ন শিক্ষক ছিলেন না। যবনগণকে যে ম্লেচ্ছ বলাতে কেহ মনে করিবেন না যে, তাহারা ইংরাজ বা গ্রীক্ ম্লেচ্ছ। পারস্যবাসী যবনগণ যে সগরশাসনে ম্লেচ্ছত্ব বা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল,—তাহা কি শাস্ত্রকারগণ, বহুত্র সংকীর্ত্তন করেন নাই? আমরা যে বিষ্ণুপুরাণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দ্বারা ইহাই সমর্থিত হইতেছে। এ ম্লেচ্ছ যবনের অর্থ অতিদিষ্ট শূদ্র যবন। তাঁহারা বেদাদিতে নিরধিকার ও ক্রিয়া লোপে বৃষলীভূত হইলেও রীতিমত শাস্ত্রাধ্যায়ন করিতেন। জ্যোতিষ প্রভৃতিও শিখিতেন। বরাহ মিহির তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সকলেই জানেন যবনজাতক নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ প্রচলিত আছে। উহা সংস্কৃত ভাষায় নাগরাক্ষরে লিখিত এবং উহার প্রারম্ভভাগ এইরূপ ঃ—

শ্রীগণেশায় নমঃ। অথ যবনজাতকপ্রারম্ভঃ। অথ পত্রিকাদৌ আশীর্ব্বাদ শ্লোকাঃ। স জয়তি। ১। যস্তোদয়াস্ত সময়ে। ২।

"শ্রীমৎ পঙ্কজিনীপতিঃ কুমুদিনীপ্রাণেশ্বরো ভূমিভূঃ,
শশাঙ্কিঃ সুররাজবন্দিতপদো দৈত্যেন্দ্রমন্ত্রী শনিঃ।
স্বর্ভানুঃ শিখিনাং গণো গণপতির্ব্রহ্মেশলক্ষ্মীধরাঃ,
তং রক্ষন্তু সদৈব যস্য বিমলা পত্রী ময়া লিখ্যতে॥

এখন বিবেকশীল পাঠক চিন্তা করিয়া বলুন দেখি, এই লেখা কোন গ্রীক্ যবনের না প্রকৃষ্ট পৌরাণিক হিন্দুর? গ্রীক্‌গণও বৈদিক হিন্দুত্ব লইয়া দেশ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। বৈদিকযুগের লোকেরা কি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ ও কৃষ্ণ বন্দনা করিতেন? না তৎকালে পৌরাণিক দেবদেবীর কোন প্রসঙ্গও কেহ জানিতেন? অতএব বরাহমিহির যে ম্লেচ্ছীভূত যবনের প্রশংসাগীতি গান করিয়াছেন—তাঁহারা সগরকর্ত্তৃক ম্লেচ্ছীভূত হিন্দুযবন ভিন্ন গ্রীক্‌যবন নহেন।

কোন কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—ঐ দেখ—"অরুণৎ যবনঃ সাকেতং" ** "যবনাৎ লিপ্যাং যবনানী" প্রভৃতি কথা পাণিনির বার্ত্তিক ও মহাভাষ্যাদিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই যবনানী শব্দের অর্থ গ্রীক্ অক্ষরাবলী।—একদিন সেই গ্রীক্‌গণ ভারতের বক্ষঃস্থলে আসিয়া পরম পবিত্র অযোধ্যা পর্য্যন্ত পরাভূত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ অবিতথ ও অমূলক। যে যবনেরা মহারাজ বাহুকে পরাভূত করিয়া অযোধ্যাতে আপনাদিগের বিজয়বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন করিয়াছিল—তাহারা সমরপরাজিত সেই ম্লেচ্ছীভূত হিন্দুযবন ভিন্ন আর কেহই নহেন। এবং পাণিনি যে যবনলিপির কথা বলিয়াছেন—তাহাও পারস্যবাসী যবনগণের বিকৃত নাগরাক্ষর মাত্র। পারস্যবাসী ভারতনির্ব্বাসিত আহুরগণ (পার্শী) পহ্লবী অক্ষরে লেখা পড়া করিতেন। প্রতিষ্ঠানগণ এখনও পুষ্তন্ ভাষায় লেখা পড়া করিতেছেন। তদ্রূপ পারস্যবাসী যবনগণ বিকৃত দেবনাগরে লেখাপড়া করিতেন। উহা পুনা প্রভৃতি স্থানের নাগরাক্ষরের ন্যায় কিঞ্চিৎ বিভিন্ন বস্তু ছিল মাত্র। হিব্রু অক্ষরাবলীও বিকৃত নাগরাক্ষর। হয় ত যবনানী হিব্রু ও পঞ্জাব প্রদেশের অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী কোন বিকৃত নাগরাক্ষর হইবে। তবে একথা ঠিক যে, আমরা কাবুলের পাণিনির পদানুগ বিনীত দাস। তৎকালের পারস্য, গান্ধার, অপগস্থান, পুষ্কলাবতী, তক্ষশিলা, পারদ, কাম্বোজ ও বহ্লীকাদি

স্থান আমাদিগের ভারতীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি দ্বারা পরিবৃত ছিল। তত্তদ্দেশ-বাসিগণ একালের ন্যায় কাবুলী পেশোয়ারী মুসলমান ছিলনা। তাহারা ও আমরা এক ছিলাম। তদবস্থায় তাঁহারা আমাদের নিকট বা আমরা তাহাদিগের নিকট কোন কথা শিক্ষা করিয়া থাকিলেও তাহাতে কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে, আমরা গ্রীস্‌দেশে জ্যোতিষ শিখিতে গিয়াছিলাম—বা গ্রীক্ যবনেরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আমাদিগকে জ্যোতিষ শিখাইতে ভারতে আসিয়াছিলেন।

তৎপরে মাননীয় মুইর (Muir) সাহেব বলিতেছেন :—

"We learn indeed from the works of the ancient astronomer Varaha Mihira, that a few astronomical and astrological forms of Greek or Arabic derivation had been borrowed from the Arabian astronomers, and introduced into Sanskrit books. I allude to such words as Hora, Drikana, Lipta, Anapha, Sunapha, which are of Greek origin and Makarina, Mukvila, Tosdi, Tasli etc. which are derived from the Arabic."

Sanskrit Text Book, Vo II Page 5.

কিন্তু ইহাও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রজ্ঞাবৈক্লব। কেননা হোরা প্রভৃতি শব্দ গ্রীক্ আরবী ও সংস্কৃত সকল ভাষাতেই আছে—তাহাতে কেন এ কথা ভাবিতে হইবে যে, আমরা গ্রীক্‌দের নিকট শিখিয়াছি,—গ্রীকেরা আমাদের নিকট শিখে নাই? ভারতীয়গণের নিকট আরবীয়গণ শিখিয়াছিলেন ভিন্ন ভারতীয়গণ অন্যের নিকট কিছু শিখিয়াছিলেন,—এরূপ কিংবদন্তীও কি কেহ কোন দিন শ্রুতিগোচর করিয়াছেন? প্রসিদ্ধ আরব্য উপন্যাস হিন্দু কথা-সরিৎ সাগরের অবিকল অনুলিপি। এইরূপ হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র, হিন্দুর

* অনেকে আমাদের জ্যোতিষগ্রন্থে রোমকসিদ্ধান্ত প্রভৃতির নাম সন্দর্শনেও মনে ভাবিয়া থাকেন—আমরা যেন রোম প্রভৃতি দেশের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মানুষ হইয়াছি। কিন্তু রোমকসিদ্ধান্ত অপগস্থানসংস্থ রোমকপত্তনের লোকদিগের লেখা হইতে পারে। এই রোমকপত্তনের অনুকরণেই হিন্দুযবনেরা ইটালীতে যাইয়া রোমনগরের নামকরণ করিয়াছিলেন।

গণিত, হিন্দুর বিজ্ঞানই মুসলমানেরা সময়ে সময়ে অনুবাদ করিয়া লইয়া গিয়া ইউরোপে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুরা কেবল ২।৩টী কথা শিখিতে মক্কা বা এথেন্‌সে গিয়াছিলেন,—এ কথা মনে করাই বাতুলতা। তবে কথা এই—গ্রীক্, আরব, হিব্রু ও হিন্দু,—ইহারা সকলেই এক বংশ জাত। উল্লিখিত হোরা প্রভৃতি শব্দ সকলেরই সাধারণ পৈতৃক সম্পত্তি—ইহা কেহই কাহার নিকট শিক্ষা করেন নাই। ইহা—যেমন আমরা পৈতৃকস্বত্বে স্বত্ববান্ হইয়াছি—তাঁহারাও তদ্রূপ হইয়াছেন। সুতরাং এই সামান্য সাম্য বশতঃ মনে করা উচিত নহে যে, আমরা তাঁহাদিগের বা তাঁহারা আমাদিগের নিকট এ বিষয়ে ঋণী। সমুদায় গ্রীক, লাটিন ও ইংরাজী, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতবহুল, ও আমাদেয় সংস্কৃতভাষার বিকার বিশেষ মাত্র। এখন কি ইহাই মনে করিতে হইবে যে, আমরা গ্রীক বা ইংরেজের নিকট ভাষা শিখিয়াছি? মনে কর—

"ফারাক"

শব্দটী তোমরা আমরা সকলেই জানি ওটী বিশুদ্ধ আরবী শব্দ—না হয় অন্ততঃ পারস্যভাষা। কিন্তু আমরা এখন দেখিতেছি যে, উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত "পরাকে" শব্দের আসন্ন বিকৃতি মাত্র। মহামতি যাস্কের নিরুক্তে আছে—

"আকে, পরাকে, পরাটেঃ, আরে পরাবতঃ"
ইতি পঞ্চ দূর নামানি।"

ঋগ্‌বেদে রহিয়াছে।—

"ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে" (৫—৬—২৫—৫)

অতএব এখন আরবী বা পারস্য ভাষা আমাদের নিকট ঋণী না আমরা তাহাদের নিকট ঋণী? এই "পরাকে" শব্দের বিকারেই কি যাবনিক 'ফারাক' ও পাশ্চাত্য Far (ফার) শব্দের জননক্রিয়া সম্পাদিত হয় নাই? ঐরূপ মূইর সাহেবের উল্লিখিত শব্দ সমূহও নিশ্চয় বেদের কোন না কোন ঋকে অবিকৃত অবস্থায় আছে—বা ছিল। আমরা সেই ঋকের অদর্শনে বা বিলোপে এইক্ষণে প্রকৃত শব্দের নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। হোরা প্রভৃতি উল্লিখিত শব্দ সকল আমাদের সকলেরই পৈতৃক সম্পত্তি। উহা আমারা কেহ কাহার নিকট

হইতে ঋণ গ্রহণ করি নাই। যদি করিয়া থাকি হিন্দুযবনগণের নিকট করিয়াছি—আরব বা গ্রীক যবনের নিকট নহে।

অতঃপর আমরা যবনগণের বাসস্থান বিষয়ে দুই চারি কথা বলিব। মাননীয় রাজেন্দ্র লাল মিত্রজ মহাশয় বলিয়াছেন—যবনগণ বাকৃট্রিয়াদেশবাসী। কেননা সংস্কৃতগ্রন্থে শক-যবন-কাম্বোজ প্রভৃতি শব্দের যুগপৎ নাম গ্রহণ বহুত্র হইয়াছে। অতএব যবনগণ নিশ্চয়ই বাকৃট্রিয়া-প্রভব।* কিন্তু সেই বাকৃট্রিয়াও যে কি পদার্থ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে নানা পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কাহার মতে পারস্যের কিয়দংশ,—কাহার মতে উহা স্বাধীন-তাতারের প্রদেশ বিশেষ। এ দিকে শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন ঃ—

"প্রথমে যবন শব্দ জনপদবাচক হইলেও ক্রমে জাতিবাচক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন যবন জাতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র মধ্য এশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়া পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তাহাদের কোন কোন শাখা বাহুবলে ভারতবর্ষেও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিল। এবং খৃষ্টাবির্ভাবের অত্যল্পকাল পূর্ব্বে কিয়দ্দিবসের জন্য সে চেষ্টা সফল হইয়াও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, মথুরা, অযোধ্যা ও বারাণসী পর্য্যন্ত যবনাধিকার সম্প্রসারিত করিয়াছিল। কবি কহ্লণ, এই নরপালগণকে তুরুষ্কান্বয় সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" বঙ্গ দর্শন ১৩০৯ ভাদ্র—২৫০ পৃষ্ঠা।

আমরা রাজেন্দ্র বাবুর কথায় পরিতৃপ্ত নহি। কেননা পৌরাণিকগণ যে নাম সংকীর্ত্তন করেন, তাহাতে অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, তাঁহারা কাশীর সহিত হয় ত সৌরাষ্ট্রের নাম লইয়া যাইতেছেন। সুতরাং শুদ্ধ ঐ কারণে যবনদেশ কাম্বোজের সন্নিহিত ছিল,—এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এ বিষয়ে পৌরাণিকগণের কোন শৃঙ্খলাজ্ঞানই ছিল না। তাঁহারা কুত্রাপি সে বিষয়ে এই নিয়মের অধীন হয়েন নাই। তার পর বাকৃট্রিয়াই যে যবন দেশ,—ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত হয় নাই। অবশ্য গ্রীকৃযবনেরা তথায় বদ্ধমূল হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে মৌলিক হিন্দুযবনের বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হইল, এরূপ নহে। অক্ষয় বাবু যাহা বলিতেছেন,—তাহাতে দেখা

* Indo-Aryan...p. 186.

গেল তিনিও গোলযোগের দিকেই যান নাই। যবন দেশের অবস্থানবিন্দু নির্দ্দেশ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ মুনিব্রতাবলম্বী। যবনেরা যে মধ্যএশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল—তাঁহার এ কথাও প্রসাদগুণোপেত নহে। আরব যবনেরাও মধ্যএশিয়ায় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু মৌলিক হিন্দু যবনেরা করেন নাই। কহ্লণও যে তৌরুষ্ক গণের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাও হিব্রুযবন ভিন্ন হিন্দুযবন নহেন। সুতরাং ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, উঁহাদিগের মত প্রজ্ঞাচক্ষু ব্যক্তিরা এ বিষয়ে প্রকৃত পন্থার অনুসরণে প্রয়াসী হয়েন নাই।

আমরা দেখিতেছি পৌরাণিকগণ ভারতের সীমা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ।
বর্ষং তৎ ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা॥
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ।"

৮২-৪৫অ—বায়ু।

কিন্তু ভারত সামজ্যের ঠিক পশ্চিম প্রদেশ পারস্য,—অতএব পারস্যকে যবন দেশ বলা যাইতে পারে। পারস্যবাসিগণও একদিন আপনাদিগকে 'ইউনান' বলিয়া জানিতেন। অপিচ মহারাজ রঘু যে পারস্য জয় করেন তাহাতে তিনি তদ্দেশবাসিনী রমণীগণকে যবনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"পারসিকান্ ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূন্ তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥
যবনী মুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানাং অকালজলদোদয়ঃ॥" রঘু—৪ সর্গ।

অতএব পারস্য একদিন যবন দেশ বলিয়া কথিত হইত—তাহা জানা গেল। অপিচ পৌরাণিকেরা যে ভারত সাম্রাজ্যের অবান্তর প্রদেশগুলির নাম লইয়াছেন—তাহাতে বলিতেছেন ঃ—

গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধুসৌবীরমদ্রকাঃ।
শকা হ্রদাঃ পুলিন্দাশ্চ পরিতা হ্যায় পূরিকাঃ॥ ১১৬
বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
অপরীতাশ্চ শূদ্রাশ্চ পহ্লবাশ্চর্ম্মখণ্ডকাঃ॥ ১১৭

রমঠা বদ্ধকটকাঃ কেকয়া দশমানিকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ॥ ১১৮
কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ প্রিয়লৌকিকাঃ।
চীনাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহ্লবা বাহ্যতোদরাঃ॥ ১১৯
আত্রেয়াশ্চ ভরদ্বাজা প্রস্থলাশ্চ কশেরুকাঃ।
লম্পকা স্তনপাশ্চৈব পীতিকা জুহুতৈঃ সহ॥ ১২০
অপগাশ্চালি মদ্রাশ্চ কিরাতানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তোমরা হংসমার্গাশ্চ কাশ্মীরা গুলিনাস্তথা। ১২১
চুলিকাশ্চালুকাশ্চৈব পূর্ণদর্ব্বাস্তথৈবচ।
এতে দেশা হ্যুদীত্যাশ্চ প্রাচ্যান্ দেশান্ নিবোধত॥

১২১—৪৫ বায়ু।

পাঠক এখন দেখিতেছেন যে, পুরাণ কর্ত্তা যবন দেশকে গান্ধার সন্নিহিত বলিতেছেন।—কাম্বোজ অতিদূরে সংস্থাপিত হইয়াছে। স্থতরাং লিপিগত সান্নিধ্য অবস্থানগত সান্নিধ্যদ্যোতক নহে। তবে একথা এখানে ঠিক যে, গান্ধার সন্নিহিত পারস্য যবনদেশ তাহা রঘুবংশের বর্ণনা সাহচর্য্যে অনুমান করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণকর্ত্তা ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী দেশাদির কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূদ্রাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ।
কারুষা মালধাশ্চৈব পরিপাত্রনিবাসিনঃ॥ ১৬
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হুণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয় স্তথা॥" ১৭—৩অ ২ অংশ।

এখানে আমরা একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাইতেছি।—বায়ু পুরাণ পারস্যকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ভারতের পশ্চিম সীমায় যবনদেশের নাম লইয়াছেন এবং পারস্যের নামও তৎকর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত হইয়াছে।

এখানে পুরাণকর্ত্তা পারস্য ও যবন দেশ অভিন্ন কি পৃথক ভাবিয়াছেন, তাহা দুর্নির্ণেয়। কিন্তু পারস্য দেশের কোন এক ভাগ—কি সমগ্র পারস্য-দেশ যে একদিন যবন দেশ ছিল—তাহা নিঃসন্দেহ। কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সীতান্বেষণ প্রকরণে বাল্মীকি বলিয়াছেন ঃ—

কাম্বোজযবনাংশ্চৈব শকানাং পত্তনানি চ॥
অন্বীক্ষ্য দরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ॥ ১২—৪২ সর্গ।

এখানে কাম্বোজ, যবন, শক ও দরদ প্রভৃতি দেশ যুগপৎ উল্লিখিত হইতেছে। পারস্য কাম্বোজ হইতে বহু দূরের স্থান নহে। স্থতরাং বাল্মীকির এ বর্ণনা দ্বারা পারস্যের যবন দেশত্ব নিরাকৃত হইতেছে—এরূপ নহে। কিন্তু পারস্যই কি প্রকৃত ও আদি যবন দেশ? তাহা কখনই নহে। আমরা শাস্ত্রে পাইতেছি যে, যবনগণ তুর্ব্বসুর সন্তান এবং সেই তুর্ব্বসু ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে রাজ্য পাইয়াছিলেন। পারস্য বা বাকৃট্রিয়ার একটী দেশও ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বদিক্-সংস্থ নহে। স্থতরাং পারস্যদেশ একতর যবনদেশ হইলেও উহা যবনগণের আদি সূতিকাগার হইতেছেনা। তবে কোন্ দেশ সে প্রাথমিক যবনভূমি? আমরা রামায়ণের সীতান্বেষণ প্রকরণে পূর্ব্বদিগ্‌গামী বানর চমূর প্রতি কোন্ কোন্ দেশ অন্বেষণ করিতে হইবে—এ বিষয়ে যে একটী বিবৃতি দেখিতে পাইতেছি,—উহাতে একটী পূর্ব্বযবন দেশের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। যথা—

"অধিগচ্ছ দিশং পূর্ব্বাং সশৈলবনকাননাং।
তত্র সীতাং চ বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ॥ ১৯
মার্গধ্বং গিরি দুর্গেষু বনেষু চ নদীষু চ॥ ২০
সর্ব্বঞ্চ তদ্ বিচেতব্যং মৃগয়দ্ভিস্ততস্ততঃ॥ ২৪
কর্ণপ্রাবারণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্টকর্ণকাঃ।
ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ॥ ২৬
অক্ষয়া বালবন্তশ্চ তথৈব পুরুষাদকাঃ।
কিরাতাস্তীক্ষ্নচূড়াশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ॥ ২৭
আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতা দ্বীপবাসিনঃ।
অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রা ইতি শ্রুতাঃ॥ ২৮
যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপকং দ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতং॥" ৩০—৪০ সর্গ কিষ্কিন্ধা।

এই বর্ণনা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এখানে বাল্মীকি এই হেমাভ

প্রিয়দর্শন কিরাত শব্দে ব্রহ্মদেশাদি পূর্ব্বোপদ্বীপবাসী মগদিগকে অববোধিত করিতেছেন। অতএব এই পূর্ব্ব যবনদেশ নিশ্চয়ই ব্রহ্মদেশের বা সমগ্র পূর্ব্বোপদ্বীপের সন্নিহিত ছিল। আমরা যেরূপ পূর্ব্ব কিরাত ও পশ্চিম কিরাত (বিলাত) দুই পাইতেছি—তেমনই যবনদেশও পূর্ব্ব পশ্চিম দুইটী পাওয়া যাইতেছে। এই পূর্ব্ব যবনদেশটী ভারতের দক্ষিণপূর্ব্ব রাজ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কেননা পূর্ব্বোপদ্বীপও তখন ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অতএব মহারাজ তুর্ব্বসু যে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে রাজ্য পাইয়াছিলেন—তাহা এই রামায়ণ উল্লিখিত পূর্ব্ব যবন দেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমরা আজ ৯।১০ বৎসর যাবৎ—ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ও চীন গবর্ণমেণ্টের সহিত সহিত একটি ইউনানী প্রদেশের সীমা লইয়া বিবাদ চলিতে—দেখিয়া আসিতেছি। ঐ দেশটী চীনের দক্ষিণে আসামের পূর্ব্বে অবস্থিত। মাননীয় শরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত, রায় বাহাদুর, সি, আই, ই, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঐ সীমা নির্দ্ধারণ-ব্যাপারে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত চীন সেনাপতি নিহপংএর কথোপকথনও হইয়াছিল। দাস মহাশয় একবার তিব্বত হইতে প্রত্যাগমন কালে উক্ত ইউনানী প্রদেশ হইয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে নব্যভারত ও সঞ্জীবনীতে প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। অতএব এই প্রাচ্য ইউনানী প্রদেশই যে পূর্ব্ব ও প্রাথমিক যবনদেশ তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। এ দেশে কোন দিন গ্রীক্ যবনগণ পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং ইহা যে তুর্ব্বসুর বংশধর যবনের নামানুসারে যাবনীন বা ইউনানী নাম ধারণ করিয়াছিল—তাহা সুনিশ্চিত। আমরা জানি যে, কাশ্মীরের পশ্চিম প্রান্তসংস্থ কাম্বোজবাসী ক্ষত্রিয়গণ আসামের পূর্ব্বে কাম্বোডিয়া বা কাম্বোজদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐরূপ কোন বিশেষ কারণে আসামপ্রান্তসংস্থ পূর্ব্ব যবনদেশবাসী যবনেরা পারস্যে যাইয়া থাকিবেন। অতএব পূর্ব্ব ইউনানী প্রদেশই যে আদি যবনরাজ্য তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

আমরা এখানে আর একটী অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মাননীয় মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন যে, পুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে—যবনেরা সগরকোপে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল—আবার মনুতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, শকযবনাদি ক্রিয়ালোপে ও ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে।* এখানে এই একটী বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। কিন্তু আমরা কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাইলাম না। সগর যবনদিগের উপর সামাজিকশাসন করিয়াছিলেন; কাজেই ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের যজনযাজনা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণগণ এ বিষয়ে সগর দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিলেন যথা ঃ—

"দ্বিজসঙ্গ পরিত্যাগং কারিতাঃ" * * "ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তাঃ"।

সুতরাং পুরাণের এ বর্ণনা, মনুর বর্ণনায় বিরোধী কোথায় হইল ? মনু সংক্ষেপে বলিয়াছেন পুরাণকর্ত্তৃগণ উহা বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছেন—এই মাত্র প্রভেদ।

যাহা হউক অতঃপর বোধ হয় কেহ মনে করিবেন না যে, যবন একটী ভীষণ গালিবাচক শব্দ, এবং উহা মুসলমান বা গ্রীক্ বাচক বিদেশীয় শব্দ,— উহার সহিত আমাদের কোন সাগন্ধ্য বর্ত্তমান নাই। ফলতঃ যবনগণ চন্দ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সন্তান ছিলেন। দেশ ত্যাগ করিয়া এই ক্ষণে তাঁহারা আরবীয় মুসলমান, পারসীয়ান মুসলমান, হিব্রু ও আংশিক আর্ম্মেনিয়ান, গ্রীক্ এবং আংশিক লাটিন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। পরন্তু কে জানে যে, সেই প্রাথমিক হিন্দুযবনগণের কোন সন্তান সন্ততি এখনও প্রাথমিক যবনদেশ—আসামীয় ইউনানী প্রদেশে বর্ত্তমান থাকিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর উপচিতি সম্পাদন না করিতেছে ?

শ্রীউমেশ চন্দ্র গুপ্ত।

---

* "শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকা শ্চৌড্রা দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥" ৪—১০—মনু।

* বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ শাক্যসিংহ কি না ?

ভক্ত কবি জয়দেব এক দিন গাহিয়াছিলেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং,
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং।
কেশব ! ধৃতবুদ্ধশরীর !
জয় জগদীশ ! হরে ॥"

অর্থ—হে কেশব ! তুমি বুদ্ধ শরীর ধারণ করিয়াছিলে,—তোমার হৃদয়ে দয়ার উৎস উথলিয়াছিল,—আহাহা তাই তুমি যজ্ঞার্থে পশুহিংসার অনুকূলে যে সকল শ্রুতি আছে তাহাতে নিন্দা প্রদর্শন করিয়াছিলে—হে জগদীশ্বর ! হরে ! তোমারই জয়, তুমিই ধন্য।

ভগবদবতার—ইহা আর্য্য শাস্ত্রেরই কথা। —যথা—

"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ (রামশ্চ) বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ ॥"

(বরাহঃ ৪। ২)

কিন্তু মহাভারতে দশাবতার স্থলে বুদ্ধের নাম দেখা যায় না। যথা :—

"হংসঃ কূর্ম্মশ্চ মৎস্যশ্চ প্রাদুর্ভাবা দ্বিজোত্তম।
বরাহো নরসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ ॥
রামো দাশরথিশ্চৈব সাত্বতঃ কল্কিরেব চ ॥"

(মহাভারত, শান্তি, মোক্ষধর্ম্ম, ৩৩৯। ১০৪)

অর্থ—হংস—পরমহংসাবতার, কূর্ম্মাবতার, মৎস্যাবতার, তৎপর বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি—রাম, সাত্বত বলরাম (১) এবং কল্কি,—এই দশ অবতার।

---

(১) "রামো হলী মুষলিসাত্বতকামপালাঃ।"

(অভিধান চিন্তামণি। ২।১৩৮)

* প্রবন্ধকারমহাশয় সাহিত্যসভার ৮ম মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাতে বুদ্ধকে না ধরিলেও বৌদ্ধের সমপর্য্যায় ক্ষপণক শব্দ মহাভারতের স্থানে স্থানে আছে,—তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। এবং রামাবতারের পূর্ব্বেও বৌদ্ধের পরিচয় রামায়ণে পাইতেছি,—তাহাও পরে প্রদর্শিত হইবে।

আর্য্য শাস্ত্রই অবতার নির্ণয়ের জন্য দায়ী।—যেমন মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার মৎস্য পুরাণাদিতে সবিস্তর বিবৃত আছে,—সেইরূপ বুদ্ধাবতারের কথাও উক্ত পুরাণাদিতেই থাকা উচিত, এবং তাহাতেই উহার প্রামাণ্য অবধারিত হয়।

উপরোক্ত গীতের প্রতিপাদ্য বুদ্ধ—তিনি কে ? তিনিই কি বিষ্ণুর অবতার শাক্য-সিংহ ? শাক্যসিংহকেই লক্ষ্য করিয়া কি জয়দেব বুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ? না অপর কোন বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়াছেন ? বিষ্ণুর অবতার কোন্ বুদ্ধ যজ্ঞবিধির শ্রুতিসমূহকে নিন্দা করিয়াছেন ? অদ্যকার এই প্রবন্ধের ইহাই আলোচ্য বিষয়।—আমাদের কিন্তু অনেকেরই ধারণা।

"শাক্য—সিংহই" বিষ্ণুর অবতার—

এখন দেখা যাউক "শাক্যসিংহ" এই শব্দটী আমরা কোন্ কোন্ শাস্ত্রে দেখিতে পাই। প্রথমতঃ দেখিতে পাই—বুদ্ধ পণ্ডিত অমর সিংহ লিখিয়াছেন।—যথা—

"স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ ॥"
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবী সুতশ্চ সঃ।"

অর্থ—তিনি শাক্যসিংহ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, এবং শৌদ্ধোদনি অর্থাৎ শুদ্ধোদন রাজার পুত্র। গৌতম, অর্কবন্ধু, মায়াদেবীসুত।—এই কয়টী নাম শাক্য বংশীয় বুদ্ধের নাম। এই অমরকোষে "শাক্যসিংহের" নাম পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন "অভিধান শব্দরত্নাবলীতেও "শাক্যসিংহের নামান্তর উল্লিখিতত আছে। যথা—

খজিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধি, মহাবল, বহুক্ষম, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শক,।

প্রধানতম বুদ্ধ পণ্ডিত হেমচন্দ্র শাক্যসিংহকে সপ্তম বুদ্ধের স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন—তৎপূর্ব্বে ছয়জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ—ইহাই আমরা জানি।

প্রথমতঃ তিনি লিখিয়াছেন,—সাত জন বুদ্ধের উপাধি সাতটী যথা—(১)

১ মারজিৎ, ২ লোকজিৎ, ৩ খজিৎ, ৪ ধর্ম্মরাজ, ৫ বিজ্ঞানমাতৃক, ৬ মহামৈত্র, ৭ মুনীন্দ্র,—এই সাতটী উপাধি। উক্ত উপাধি বিশিষ্ট সাত জন এই—

১ম, বিপশ্বী, ২য় শিখী, ৩য় বিশ্বভূ, ৪র্থ ক্রকুচ্ছন্দ, ৫ম কাঞ্চন, ৬ষ্ঠ কাশ্যপ, ৭ম শাক্যসিংহ।—

হেমচন্দ্র শেষ বুদ্ধ উক্ত শাক্যসিংহের পর্য্যায় এইরূপ লিখেন—অর্কবান্ধব, রাহুলসূয়, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, গৌতমান্বয়, মায়াসুত, শুদ্ধোদনসুত, দেবদত্ত ও অগ্রজ। অগ্রজ অর্থাৎ যাহার প্রজা—(পুত্র কন্যা) নাই।

উক্ত অমরকোষ ও অভিধান চিন্তামণি ব্যতীত আমরা অনেক অনুসন্ধানেও আর কোনও হিন্দুশাস্ত্রে শাক্যসিংহের নাম জানিতে পারি নাই। বিশেষতঃ উক্ত দুই গ্রন্থও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরই বিরচিত।

কিন্তু সামান্যতঃ বুদ্ধের পর্য্যায়ে যে সকল নাম আছে, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের অনেক স্থানেই দেখিতে পাই—তাহা পরে দেখাইব। বুদ্ধগণ কোন্ কোন্ নামে প্রখ্যাত তাহাই সম্প্রতি দেখাইতেছি ঃ—

অমর সিংহ বুদ্ধের এই সকল নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ তথাগত সমন্তভদ্র, ভগবান, মারজিৎ লোকজিৎ, জিন, ষড়ভিজ্ঞ, অদ্বয়বাদী, দশবল, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তাও মুনি। (২)

(১) "মার-লোক খজিদ্ধর্ম্মরাজো বিজ্ঞানমাতৃকঃ।
মহামৈত্রো মুনীন্দ্রশ্চ বুদ্ধাঃ স্যুঃ সপ্ত তে স্বমী॥
বিপশ্বী শিখী বিশ্বভূঃ ক্রকুচ্ছন্দশ্চ কাঞ্চনঃ।
কাশ্যপশ্চ সপ্তমস্ত শাক্যসিংহোঽর্কবান্ধবঃ॥
তথা রাহুলসূঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধো গোতমান্বয়ঃ।
মায়া শুদ্ধোদনসুতো দেবদত্তাগ্রজশ্চ সঃ।"
অভিধান চিন্তামণি ২। ১৪৯—১৫১।

(২) "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥

অগ্নিপুরাণে বুদ্ধের পর্য্যায় এইরূপ দেখা যায়—সুগত ও তথাগতঃ। (১)

হেমচন্দ্র বুদ্ধের এই সকল নাম নির্দ্দেশ করেন—যথা—অর্হৎ, জিন, পারগত, ত্রিকালবিৎ, ক্ষীণাষ্টকর্ম্মা, পরমেষ্ঠী, অধীশ্বর, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, ভগবান্, জগৎপ্রভু, তীর্থঙ্কর, তীর্থকর, জিনেশ্বর, স্যাদ্বাদী, অভয়দ, সার্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, কেবলী, দেবাধিদেব, বোধিদ, পুরুষোত্তম, বীতরাগ, মুমুক্ষু, শ্রমণ, যতি, ক্ষপণক, আপ্ত, নিগ্রন্থ ও ভিক্ষু। বুদ্ধের এত পর্য্যায়ের মধ্যে কেবল "বুদ্ধ" "জিন" "জৈন" ও "আর্হত" "শ্রমণ" ও "ক্ষপণক"—এই কয়টী নামই শাক্যসিংহ হইতে যুগ-যুগান্তর পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণ প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রে দেখিতে পাই ঃ—বুদ্ধ, জৈন, আর্হত, শ্রমণ, ও ক্ষপণক ইত্যাদি শব্দ কোন্ কোন্ শাস্ত্রে কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং বুদ্ধ অবতারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। বুদ্ধ, জৈন, আর্হত—এই কয়েকটি নাম এক পর্য্যায়ে আছে, এই হেতু—এবং প্রত্যেকেই যজ্ঞীয় বেদনিন্দা দেখা যায়—দেখিয়া, এজন্য বিশেষ সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া আমরা এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, জৈন, ও আর্হতকে এক বৌদ্ধ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব। সূক্ষ্ম বিচারে বিভিন্ন হয় হউক। মেদিনীকার বুদ্ধগণকে জিন, অর্হৎ, ক্ষপণক ও বুদ্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মে। ৮।

দেবীভাগবতে এইরূপে জৈনের উৎপত্তি দেখা যায়। যথা—(৪। ১০। ৪০)।

এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তায় অসুরগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিলে, পরাজিত অসুরেরা শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া কহিল,—"হে ব্রাহ্মণ! আপনি তপোবল সম্পন্ন হইয়াও অসুরকুলের সাহায্য করিতেছেন না কেন? আপনি আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত যদি সহায়তা না করেন, তবে আমরা আর এই পৃথিবীতে বাস্তব্য করিতে পারিতেছি না, আমাদের শীঘ্রই পাতালে আশ্রয় লইতে হইবে।"

ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ॥
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ (অমরকোষ—১। ৮—৯।)

(১) দেবদ্বিষোঽসুরা দৈত্যাঃ সুগতঃ স্যাত্তথাগতঃ॥"
(অগ্নি পুরাণ—৩৬০। ৩)

শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"হে দৈত্যগণ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজোদ্বারা ও মন্ত্রৌষধ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব, তোমরা মনের দুঃখ পরিত্যাগ কর।" (১)

দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের বাক্যে আশ্বস্ত হইল। এ দিকে গুপ্তচরের মুখে ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রণা শুনিতে পাইলেন। পুনর্ব্বার ইন্দ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন,—অসুরগণও পুনর্ব্বার শুক্রের শরণাপন্ন হইল।

শুক্রাচার্য্য অসুরদিগকে কহিলেন—"হে দানবগণ! তোমরা ভীত হইও না, আমি তপস্যার্থ চলিলাম।—আমি তপস্যায় ভগবান্ শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিয়া, তোমাদের রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিব। তোমরা কিছুকাল প্রতীক্ষা কর" এই কথা কহিয়া শুক্রাচার্য্য মহাদেবের কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। (২) (দেবী ভাগবত—৪। ১১—১২ অধ্যায়)

এ দিকে ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের তপস্যায় ভীত হইয়া আপন কন্যা শ্রীমতী জয়ন্তীকে কহিলেন—"জয়ন্তী! আমি তোমাকে পত্নীরূপে শুক্রাচার্য্যের নিকট সমর্পণ করিলাম। অতঃপর তুমি পত্নীরূপে শুক্রাচার্য্যের সেবায় নিযুক্ত হও।"

(১) "ততঃ সুরৈর্জ্জিতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা।
বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যভ্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ॥
ততঃ পরাজিতা দৈত্যা কাব্যস্য শরণং গতাঃ।
কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্॥
স্থাতুং ন শক্নুমোঽত্র চ প্রবিশামো রসাতলং।
যদি ত্বং ন সহায়োঽসি ত্রাতুং মন্ত্রবিদুত্তমঃ॥"

(২) "ইত্যুক্তঃ সোঽব্রবীদ্দৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ।
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা তেন ভোঽসুরাঃ॥
মন্ত্রৈস্তথৌষধীভিশ্চ সাহায্যং বঃ সদৈবহি।
করিষ্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ॥"
(দেবীভাগবত, ৪। ১০। ৪০)

জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তপোনিষ্ঠ শুক্রাচার্য্যের সেবায় নিযুক্ত হইল। (১)

শুক্রাচার্য্য তপস্যায় সফলমনোরথ হইয়া জয়ন্তীকে কহিলেন,—"হে সুশ্রোণি! তুমি দশ বৎসর কাল সকল প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া যদৃচ্ছায় আমার সহচারিণী হইয়া থাক" (২)। এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীকে লইয়া অদৃশ্য হইলেন।
(দেবীভাগবত ৪। ১২। ৪৫)

এ দিকে ইন্দ্র শুক্রাচার্য্যের ওরূপ প্রচ্ছন্নভাবে জয়ন্তীর সহিত অবস্থান জানিতে পারিয়া, বৃহস্পতিকে কহিলেন—"হে গুরো! এই সময় দৈত্যগণের পরাজয়ের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লউন, আপনার বুদ্ধির অগম্য উপায় কিছুই নাই।"

তখন বৃহস্পতি কহিলেন, "এখন বড়ই সুবিধার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

(১) "ইত্যুক্ত্বা শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতমুত্তমং।
ধূমপানরতঃ শান্তো মন্ত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ॥"
"বিমৃষ্য মনসা শক্রো জয়ন্তীং স্বসুতাং তদা।
উবাচ কন্যাং চার্ব্বঙ্গীং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ॥
গচ্ছ পুত্রি ময়া দত্তা কাব্যায় ত্বং তপস্বিনে।
সমারাধয় তন্বঙ্গি! মৎকৃতে তং বশং কুরু॥"
(৪। ১২ ২০)

(২) "ময়া সহত্বং সুশ্রোণি. দশবর্ষাণি ভামিনি।
সর্ব্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া॥" (৪। ১২ ৪৫)
"রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ তং গুরুং।
বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কর্ত্তব্যমতঃপরং॥
গচ্ছাদ্য দানবান্ ব্রহ্মণ মায়য়া ত্বং প্রলোভয়।
অস্মাকং কুরু কার্য্যং ত্বং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য মানদ!
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যং রমমাণং সুসংবৃতং।
জ্ঞাত্বা তদ্রূপমাস্থায় দৈত্যান্ প্রতিযযৌ গুরুঃ॥"
(৪। ১২। ৫১)

শুক্রাচার্য্য ঐরূপ প্রচ্ছন্ন থাকিতে থাকিতে আমিই শুক্রাচার্য্যের রূপ ধারণ করিয়া পুরোহিতভাবে দৈত্যগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিব”—“আমি তপস্যায় শঙ্করকে তুষ্ট করিয়া তোমাদের কল্যাণকর মন্ত্রণা লাভ করিয়াছি। বৃহস্পতির উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ মুগ্ধ হইয়া শুক্রাচার্য্যের রূপধারী বৃহস্পতিকে প্রণাম করিয়া কহিল—“অদ্য হইতে আমরা দেবগণের ভয় পরিত্যাগ করিলাম।”

তখন শুক্রাচার্য্যের বেশধারী মহাত্মাবৃহস্পতিদ্বারা বিশেষরূপে প্রবোধিত হইলে, দৈত্যগণ তাঁহাকেই আপনাদের গুরু শুক্রাচার্য্য ভাবিয়া বিশ্বাস-পরায়ণ হইল। (১)

দৈত্যগণ বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত ও প্রতারিত হইয়া বিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য শুক্রাচার্য্য বোধে তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

এদিকে যখন দশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া সমাপন করিয়া যজমান অসুরগণকে স্মরণ করিলেন। তিনি

(১) “শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যৎকৃতং গুরুণা তদা।
কৃত্বা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা॥
গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মত্বা কাব্যং স্বকং গুরুং।
বিশ্বাসং পরমং কৃত্বা বভূবুস্তন্ময়াস্তদা॥
বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মত্বাতিমোহিতাঃ।
গুরুণা বিপ্রলব্ধাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহ্যতি॥
দশবর্ষাত্মকে কালে সম্পূর্ণসময়ে তদা।
জয়ন্ত্যা সহ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যুজ্যানচিন্তয়ৎ॥
আশয়া মম মার্গন্তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল।
গত্বা তান্ বৈ প্রপশ্যেঽহং যাজ্যানতিভয়াতুরান্॥
মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মদ্ভক্তানাং ভবেদিতি।
সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমাস্থায় জয়ন্তীং প্রত্যুবাচ হ॥
দেবানেবোপসংযান্তি পুত্রা মে চারুলোচনে।
সময়স্তেঽদ্য সম্পূর্ণো জাতোঽয়ং দশবার্ষিকঃ॥”

ভাবিতে লাগিলেন—‘দৈত্যগণ আমার আগমন পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে, আমি সেই ভয়াতুর যজমানগণের নিকটে যাইব। তাহারা আমার ভক্ত,অতএব দেবগণ হইতে যাহাতে তাহাদের ভয় না হয়, আমার তাহা করা কর্ত্তব্য।’ ইহা ভাবিয়া কহিলেন—“হে জয়ন্তি তোমার গর্ভজাত আমার সন্তানগণ দেবগণের নিকট যাউক। তোমার দশ বৎসর সময় অদ্য পূর্ণ হইল, অতএব আমি আমার যজমান অসুরগণের নিকট যাইতেছি।”—এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য দানবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। (১)

তিনি দেখিলেন দানবগণের সন্নিধানে ছদ্মরূপধারী বৃহস্পতি বসিয়া নিজ প্রণীত “জৈনধর্ম্ম” অসুরদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন, এবং হিংসাদি দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বেদোক্ত যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন। তিনি কহিতেছেন—“হে দৈত্যগণ! আমি তোমাদিগের হিতকর সত্যবাক্যই কহিতেছি,—অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অধিক কি বলিব, যদি কেহ তোমাদিগকে অস্ত্র প্রহার করিতে উদ্যত হয়, সেই আততায়ীদিগকেও তোমাদের প্রতিঘাত করা উচিত নহে।

(১) “তস্মাদ্ গচ্ছাম্যহং দেবি! দ্রষ্টুং যাজ্যান্ সুমধ্যমে।
পুনরেবাগমিষ্যামি তবান্তিকমনুদ্রুতঃ॥
তথেতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্ম্মবিত্তমা।
যথেষ্টং গচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞ ন তে ধর্ম্মং বিলোপয়ে॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতস্ততঃ।
অপশ্যদ্দানবানাং স পার্শ্বে বাচস্পতিং তদা॥
বুদ্ধরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তং ছলেন তান্।
জৈনং ধর্ম্মং কৃতং স্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা॥
ভো দেবরিপবঃ সত্যং ব্রবীমি ভবতাং হিতং।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মোঽহন্তব্যা হ্যাততায়িনঃ॥
দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্বেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ।
জিহ্বাস্বাদপরৈঃ কামমহিংসৈব পরাসতা॥
এবং বিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাণি চ।
ব্রুবাণং গুরুমাকর্ণ্য তোঽহসৌ ভৃগোঃ সুতঃ॥”

তোমরা নিশ্চিত জানিবে—ভোগনিরত চতুর ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ রসনার তৃপ্তির জন্যই বেদে পশুহিংসার অবতারণা করিয়াছে। কিন্তু নিশ্চিত জানিবে অহিংসার তুল্য উৎকৃষ্ট নির্ম্মল ধর্ম্ম এ জগতে আর কিছুই নাই।"

(দেবীভাগবত ৪।১৩।৪৪)।

হে জনমেজয়! বৃহস্পতি বেদনিন্দাপূর্ব্বক উপর্য্যুক্ত বাক্য সকল কহি-তেছেন শ্রবণ করিয়া, শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন—এই বৃহস্পতি নিশ্চয়ই আমার বিদ্বেষী ধূর্ত্ত; ইহাদ্বারা আমার যজ-মানগণ প্রতারিত হইতেছে। হায় লোভের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, যিনি সকল দেবগণের গুরু—তিনিও অজয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাষণ্ডের মত অবলম্বন করিলেন। আজ লোভের বশে যখন বৃহস্পতিও পাষণ্ড পণ্ডিত সাজিয়াছেন তখন লোভবশে অপরাপর মূঢ়গণ কি অকার্য্যই না করিবে? (১)

এই ত এক প্রকার জৈন—অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু ইহার আবিষ্কর্ত্তা বৃহস্পতি। তিনিই অসুরদিগের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত যজ্ঞবিধির শ্রুতিজাতকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি ত বিষ্ণু নহেন। সুতরাং বুঝা গেল "কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর"—ইহার লক্ষ্য নহে—এবং ইনি শাক্য-সিংহ বুদ্ধও নহেন

উক্ত বৃহস্পতির আবিষ্কৃত বৌদ্ধধর্ম্ম সত্যযুগে প্রবর্ত্তিত হয়। তৎকালে

(১) "চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল।
বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্ত্তেন যাজ্যা মে নাত্র সংশয়ঃ॥
ধিগ্ লোভং পাপবীজং বৈ নরকদ্বারমূর্জ্জিতং।
গুরুরপ্যনৃতং ব্রুতে প্রেরিতো যেন পাপ্মনা॥
প্রমাণং বচনং যস্য সোঽপি পাষণ্ডধারকঃ।
গুরুঃ সুরাণাং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥
কিং কিং ন লভতে লোভাৎ মলিনীকৃতমানসঃ।
অন্যোঽপি গুরুরপ্যেবং জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ॥"
(৪।১৩।৪৪—৬১)

প্রহ্লাদ উপস্থিত ছিলেন (১)। আমরা অন্য প্রকারেও বৌদ্ধের আবির্ভাব মৎস্যপুরাণে দেখিতে পাই। যথা—(২৪।৩৭—৪৯)।

এক সময়ে প্রহ্লাদের সহিত ইন্দ্রের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যুদ্ধে কাহারও জয় পরাজয় লক্ষিত হইতেছে না দেখিয়া, দেবাসুর ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেব আমাদের মধ্যে কাহার জয়লাভ হইবে?" ব্রহ্মা কহিলেন,—"নহুষের পুত্র মহাবীর রজি যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, সে পক্ষেরই জয়লাভ হইবে।" তাহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র রজির শরণাপন্ন হইলেন। তখন রজি ইন্দ্রপক্ষ হইয়া দানবগণকে পরাজয় করিলেন। ইন্দ্রও সর্ব্বান্তঃকরণে রজিকে পুত্রবৎ আরাধন করিতে লাগিলেন। সেইহেতু রজি নিজের রাজ্যাধিকার ইন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন।

পিতার ওরূপ অন্যায় আচরণ দেখিয়া রজির শতপুত্র পৈতৃক রাজ্য অধিকারার্থ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল এবং ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া পৈতৃক রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিল। যজ্ঞভাগে ইন্দ্রাদি দেব-গণকে বঞ্চিত করিয়া নিজেরাই তাহা গ্রহণ করিল। তখন পরাজিত রাজ্যভ্রষ্ট ইন্দ্র উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। ইন্দ্র অতীব দীনভাবে কহিলেন, "দেব! রজিপুত্রগণ কর্ত্তৃক আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইলাম,—যজ্ঞভাগ হারাইলাম,—অতএব আপনি ইহার উপায় উদ্ভাব করুন।" তখন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে আশ্বস্ত করিয়া নিজে জিনধর্ম্মাবলম্বনের ভাণ করিয়া অসুরদিগকে মোহিত করিয়া বেদাচার হইতে ভ্রষ্ট করিলেন। তৎপরে রজিপুত্রগণ প্রত্যেক ধর্ম্ম কর্ম্ম হেতু অনুসন্ধানে তৎপর হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তখন ইন্দ্র অক্লেশে বজ্রাঘাতে তাহাদিগকে নিপাত করিলেন (২)। বৃহস্পতিই এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক।

(১) দেবীভাগবত ৪।৯।৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(২) "পুত্রত্বমগমৎ তুষ্টঃ তস্যেন্দ্রঃ কর্ম্মণা বিভুঃ।
দত্ত্বেন্দ্রায় তদা রাজ্যং জগাম তপসে রজিঃ॥
রজিপুত্রৈস্তদাচ্ছিন্নং বলাদিন্দ্রস্য বৈভবং।
যজ্ঞভাগঞ্চ রাজ্যঞ্চ ততো বলগুণান্বিতৈঃ॥

মৎস্যপুরাণে বৃহস্পতির উদ্ভাবিত—এই যে জৈন—অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও শাক্যসিংহের নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম জয়দেবের "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং"—এই উক্তির লক্ষ্য নহে।

মৎস্যপুরাণের অপর স্থানে (২৭১।১১৬-১৩) শাক্যের উল্লেখ দেখা যায় বটে, কিন্তু এই "শাক্য" সেই শাক্যসিংহ নয় বলিয়াই—আমার ধারণা। কেননা—দেখা যায়, ইক্ষ্বাকুবংশীয় কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণেজয়, তৎপুত্র সঞ্জয়, সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র রাজা শুদ্ধোদন, তৎপুত্র সিদ্ধার্থ, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক ইত্যাদি। (১)

প্রাহ বাচস্পতিং দীনঃ পীড়িতোহস্মি রজেঃ সুতৈঃ।
ন যজ্ঞভাগো রাজ্যং মে নির্জ্জিতশ্চ বৃহস্পতে।
রাজ্যং লাভায় মে যত্নং বিধৎস্ব ধিষণাধিপঃ॥
ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতং।
গ্রহশান্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কর্ম্মণা॥
গত্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ।
জিনধর্ম্মং সমাস্থায় বেদবাহ্যং স বেদবিৎ॥
বেদত্রয়ী পরিভ্রষ্টাংশ্চকার ধিষণাধিপঃ।
বেদবাহ্যান্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমন্বিতান্॥
জঘান শক্রো বজ্রেণ সর্ব্বান্ ধর্ম্মবহিষ্কৃতান্॥"
(মৎস্যপুরাণ, ২৫।৩৭—৪৯)

(১) "কৃতঞ্জয় সুতো বিদ্বান্ ভবিষ্যতি রণে জয়ঃ।
ভবিতা সঞ্জয়শ্চাপি বীরো রাজা রণে জয়াৎ॥
সঞ্জয়স্য সুতঃ শাক্যঃ শাক্যাচ্ছুদ্ধোদনো নৃপঃ।
শুদ্ধোদনস্য ভবিতা সিদ্ধার্থঃ পুষ্কলঃ সুতঃ॥
প্রসেনজিত্ততো ভব্যঃ ক্ষুদ্রকো ভবিতা ততঃ।"
ক্ষুদ্রকাৎ কুলকো ভাব্যঃ কুলকাৎ সুরথঃ স্মৃতঃ॥

এই মৎস্যপুরাণোক্ত "শাক্য"—"শাক্যসিংহ নহে। কেননা—এই শাক্যের পুত্র শুদ্ধোদন। কিন্তু আমাদের উদ্দিষ্ট "শাক্যসিংহ" শুদ্ধোদনের পুত্র। সুতরাং পিতার নামের মিল নাই বলিয়াই উক্ত শাক্য—শাক্যসিংহ নহে স্থির করা যাইতে পারে।

তবে এস্থলে এই একটী কথা বলা যাইতে পারে যে, এই মৎস্যপুরাণের শ্লোকে—

"শুদ্ধোদনস্য ভবিতা সিদ্ধার্থঃ পুষ্কলঃ সুতঃ॥

অর্থাৎ শুদ্ধোদনের শ্রেষ্ঠ পুত্র 'সিদ্ধার্থ' হইবে—এই প্রমাণের বলে যদিও শুদ্ধোদনের পুত্র "সিদ্ধার্থ"কেই আমাদের উদ্দিষ্ট "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" অর্থাৎ শাক্যসিংহকে ধরা যাইতে পারে। ইহাতে কোনও ক্ষতি হয় না। যদিও অমরকোষ ও অভিধানচিন্তামণিতে শাক্যসিংহের নামস্থলে "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—"সিদ্ধার্থ" এই নামটী পাওয়া যায় না। কিন্তু শব্দ রত্নাবলী অভিধানে শাক্যসিংহের পর্য্যায়ে "সিদ্ধার্থ" এই নামটী উল্লিখিত আছে,—তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে,—ইত্যাদি কারণে নিঃসন্দেহরূপে উক্ত শুদ্ধোদনের পুত্র "সিদ্ধার্থকেই" শাক্যসিংহ বলা যাইতে পারে।

বলা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু শুদ্ধোদনের পুত্র "সিদ্ধার্থ" যে বিষ্ণুর অবতার শাক্যসিংহ এবং এই সিদ্ধার্থ—শাক্যসিংহ যে যজ্ঞ বিধির শ্রুতিজাতকে দয়া পরতন্ত্র হইয়া নিন্দা করিয়াছেন,—এমন কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সুতরাং এই সিদ্ধার্থকে কিরূপে জয়দেবের "কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর" এই বুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? সুতরাং বলিতে হইবে—তাহা পারা যায় না।

তবে উক্ত মৎস্যপুরাণের প্রমাণ দ্বারা এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে,—

সুমিত্রঃ সুরথাজ্জাতশ্চান্যস্তু ভবিতা নৃপঃ।
এতৈশ্চেক্ষ্বাকবঃ প্রোক্তা ভবিষ্যা যে কলৌ যুগে॥
"ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তং ভবিষ্যতি।
সুমিত্রং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ॥"
(মৎস্য পুরাণ। ২৭১।১১—১৬)

ইক্ষ্বাকুবংশীয় শাক্যের পুত্র শুদ্ধোদন,* শুদ্ধোদনের পুত্র—সিদ্ধার্থ, এই সিদ্ধার্থ—শাক্য বংশের মধ্যে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধার্থকে "শাক্যসিংহ" বলা যাইতে পারে বটে,—কিন্তু তাহাতেই ইঁহার বিষ্ণুর অবতারত্বে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কিন্তু ভগবান্ শাক্যসিংহ যে ইক্ষ্বাকুবংশীয়,—তাহার প্রমাণ দেখা যায়, যথা—

"শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।
তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতিশ্রুতাঃ॥"
(অমর টীকায় ভরত ও রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী)

অর্থ—এক সময়ে পিতার শাপে কোনও ইক্ষ্বাকু বংশীয় এক জন রাজা গৌতম বংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে শাক বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া বাস করিয়াছিলেন, তদবধি ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা "শাক্য" নামে অভিহিত হন।

এবং "ইক্ষ্বাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি"—ইত্যাদি মৎস্যপুরাণের ইক্ষ্বাকুবংশকীর্ত্তনে শুদ্ধোদনাদির নাম উল্লিখিত আছে বিধায় শাক্যসিংহকে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলা যাইতে পারে—এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নাই।

এখন শ্রীমদ্ভাগবতে এক বুদ্ধের নাম উল্লিখিত আছে—দেখিতে পাই। ইনিই সেই ভগবান্ শাক্যসিংহ কি না—তাহা বিচার্য্য।—যথা—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৫)

অর্থ—অনন্তর কৃষ্ণাবতারের পরে কলিযুগের সম্যক্ প্রবৃত্তি হইলে অসুরপ্রকৃতি মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে মোহিত করিবার নিমিত্ত মগধ অর্থাৎ গয়া প্রদেশে অঞ্জন নামক কোনও ব্যক্তির পুত্র "বুদ্ধ" নামে জন্ম গ্রহণ করিবে।

এই শ্লোকে "অঞ্জন সুত" এই পদের স্থানে "অজিনসুত"ও কোন কোন পুস্তকে পাঠ দেখা যায়। যাহাই হউক অঞ্জনই হউক, আর অজিনই হউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ শাক্যসিংহ অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য শাক্যসিংহের বিষয়ে তাহা ঘটে না। কেননা তিনি ত অঞ্জনের পুত্র নহেন,—তিনি রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র।

যদি বলা যায়—শুদ্ধোদনেরই নামান্তর "অঞ্জন"—ভাল তাহাই যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহা হইলেও বুদ্ধপণ্ডিত অমরসিংহ ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি কেহ না কেহ শুদ্ধোদনের পর্য্যায়ে তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিতেন। কৈ তাহা ত দেখা যায় না।—এহেতু অনেকে মনে করেন যে,—যখন উক্ত শ্লোকে "কীকটেষু ভবিষ্যতি" এই ভবিষ্যদ্বিভক্তির প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন বুদ্ধ নামে অঞ্জনের পুত্র বিষ্ণুর অংশে ভবিষ্যতে হইবেন,—পূর্ব্বে হন নাই। অতএব উক্ত অঞ্জনসুত বুদ্ধ শাক্যসিংহ নহেন।

আরও বিশেষ কারণ এই যে, শ্লোকে "শাক্যসিংহোঽঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি"—এইরূপ শাক্যসিংহের নাম উল্লেখ না করিয়া "বুদ্ধ" এই নাম দেওয়া হইল কেন? "বুদ্ধ" ইহা কিছু ব্যক্তি বিশেষের নাম হইতে পারে না। এজন্য উক্ত অঞ্জনসুত বুদ্ধ নামক ব্যক্তি প্রস্তাবিত "শাক্যসিংহ" হইতে পারে না।

এখন অগ্নি পুরাণে এক বুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। ইনি জয়দেব বর্ণিত বিষ্ণুর অবতার কি না দেখা যাউক।—অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।—যথা—

অগ্নিরুবাচ।

"বক্ষ্যে বুদ্ধাবতারঞ্চ পঠতঃ শৃণ্বতোঽর্থদং।
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যৈর্দ্দেবা পরাজিতাঃ॥
রক্ষ রক্ষেতি শরণং বদন্তো জগ্মুরীশ্বরং।
মায়ামোহস্বরূপোঽসৌ শুদ্ধোদনসুতোঽভবৎ॥
মোহয়ামাস দৈত্যাংস্তান্ ত্যাজিতান্ বেদধর্ম্মকং।
তে চ বৌদ্ধা বভূবুর্হি তেভ্যোঽন্যে বেদবর্জ্জিতাঃ॥
আর্হতঃ সোঽভবৎ পশ্চাৎ আর্হতানকরোৎ পরান্।
এবং পাষণ্ডিণো জাতা বেদধর্ম্মাদিবর্জ্জিতাঃ॥
নরকার্হং কর্ম্ম চক্রুর্গ্রহীষ্যন্ত্যধমানপি।
সর্ব্বে কলিযুগান্তে তু ভবিষ্যন্তি চ সঙ্করাঃ॥

দস্যবঃ শীলহীনাশ্চ (বেদো বাজসনেয়কঃ ?)।
দশ পঞ্চ চ শাখা বৈ প্রমাণেন ভবিষ্যতি॥
ধর্ম্মকঞ্চুকসংবীতা অধর্ম্মরুচয়স্তথা।
মানুষান্ ভক্ষয়িষ্যন্তি ম্লেচ্ছাঃ পার্থিবরূপিণঃ॥"

অর্থ—অগ্নি কহিলেন—এখন আমি বুদ্ধাবতারের কথা কহিব। যাহা শ্রবণ করিলে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বকালে—অর্থাৎ সত্যযুগে দেব-দানবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে দানবগণ দ্বারা দেবগণ পরাজিত হইয়া, আমাদিগকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই বলিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েন। তখন বিষ্ণু মায়ামোহ রূপ (অর্থাৎ মায়ার দ্বারা অপরকে বঞ্চনা করিতে পারে এই প্রকার বেশ) ধারণ করিয়া শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ওরূপ মায়ামোহের (বাজিকরের) বেশ ধরিয়া দৈত্যগণের মোহ উৎপাদন করতঃ তাহাদিগকে বৈদিক ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিলেন। উক্ত বেদাচারপরিভ্রষ্ট অসুরেরাই পরে "বৌদ্ধ" নামে অভিহিত হইয়াছিল। আবার তাহাদের দেখা দেখি অপরাপর অসুরেরাও বেদাচারচ্যুত হইয়াছিল। পরে সেই মায়ামোহ-বেশধারী বুদ্ধ "আর্হত" হইলেন (হেমচন্দ্র আর্হত শব্দে বাদবাদীকে বুঝায় বলিয়াছেন, অর্থাৎ বেদাচার বিষয়ে কেবল বিবাদকারী) এবং নিজের দলের শিষ্য প্রশিষ্যকেও "আর্হত" করিলেন। এইরূপে পৃথিবীতে বৈদিকাচারভ্রষ্ট পাষণ্ডের উৎপত্তি হইল। তাহারা বৌদ্ধের দলে নীচ জাতি হইতেও নরকে গমনের উপযোগী কর্ম্মকলাপ শিক্ষা করিত। উহারা সকলেই কলিযুগের অন্তে সঙ্কর জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং চরিত্রহীন দস্যু তস্কর হইবে। উক্ত বৌদ্ধদের মধ্যে পঞ্চদশ প্রকার সম্প্রদায় ভেদ হইবে। তাহারা ধর্ম্মসাজে সজ্জিত হইয়া অধর্ম্মপরায়ণ হইবে,—এবং সেই বৌদ্ধরাজগণ ম্লেচ্ছাচারী হইয়া মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিবে।

উপর্য্যুক্ত অগ্নি পুরাণের বুদ্ধকে অনায়াসে সেই জয়দেবের "কেশব ধৃতবুদ্ধ শরীর"—স্বীকার করা যাইতে পারে। কেননা, ইনি বুদ্ধও বটে, শুদ্ধোদনের পুত্রও বটে। কিন্তু "পুরা দেবাসুরের যুদ্ধের"—পুরার অর্থটা থাকে না। "পুরা-দেবাসুরে যুদ্ধে" ইহার স্বতঃসিদ্ধ অর্থ সত্যযুগের দেবাসুরের যুদ্ধই বুঝায়। কিন্তু ভগবান্ শাক্যসিংহ ত সত্যযুগের নহেন। তিনি কলিরযুগের ইহাই

সর্ব্ববাদিসিদ্ধ এবং উক্ত অগ্নিপুরাণে "শাক্যসিংহ" নামটীও উল্লিখিত নাই। যাহা হউক না হয়, "পুরা" শব্দের ভবিষ্যৎ অর্থই স্বীকার করিলাম। অনেক স্থানে "পুরার" ভবিষ্যদর্থে প্রয়োগও দেখা যায়। (১)

আর শাক্যসিংহ নাম না থাকিলেও মায়ামোহ বা বুদ্ধনামেই শাক্য-সিংহকে বুঝিয়া লইলাম। কিন্তু অগ্নিপুরাণকেই আধুনিক বলিবার উপায় কি ? আধুনিক বলিবার কারণও যথেষ্ট আছে। যদিও আধুনিকতা প্রতি-পাদনের কারণসমূহ এ স্থানে সমালোচ্য নহে, তথাপি দুই একটী কারণ দেখাইতেছি। যথা—

অগ্নিপুরাণে ছন্দোমঞ্জরীর মত ছন্দঃশাস্ত্র আছে,—সাহিত্যদর্পণের মত কাব্যলক্ষণ, নাটকলক্ষণ, রসনিরূপণ, রীতিনিরূপণ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দোষ, গুণ, একাক্ষর কোষ, কলাপব্যাকরণের মত সন্ধি-চতুষ্টয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত, উণাদিবৃত্তি, আখ্যাত, কৃৎ, সমস্তই আছে। হায়, বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিলেন, তবুও তাঁহার সাধ মিটিল না। পরিশেষে বৃদ্ধ বয়সে পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবালকদের জন্য পাঠ্যনির্ব্বাচনে শর্ব্ববর্ম্মার কলাপব্যাকরণ নকল করিলেন। অধিক কি বলিব ? অগ্নিপুরাণের অভিধান দেখিলে বোধ হয়, অগ্নিপুরাণের অভিধানই কি অমরসিংহ নকল করিয়াছেন ? না অমরসিংহের অভিধানই বেদব্যাস নকল করিয়াছেন ?—ইহা নিশ্চয় করা যায় না। যেমন—

"বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষরক্ষো গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥"
"ঐরাবতোঽভ্রমাতঙ্গৈরাবণাভ্রমুবল্লভাঃ।"
"হ্রাদিনী বজ্রমস্ত্রী স্যাৎ কুলিশং ভিদুরং পবিঃ॥"
"শুচিরপিত্তমৌর্ব্বস্তু বাড়বো বড়বানলঃ।
বহ্নের্দ্বয়োর্জ্জালকীলা বর্চ্চির্হেতিঃ শিখাস্ত্রিয়াং॥"

(১) অধীষ্ব মানবক! পুরা বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। পুরা শব্দাত্তবি-ষ্যদবগমে সতি তদা তস্য বর্ত্তমানতা"—কলাপব্যাকরণ আখ্যাতবৃত্তি।

"সত্বরং চপলং তূর্ণমবিলম্বিতমাশু চ।
সততেহনারতাশ্রান্তসন্ততাবিরতানিশং॥
নিত্যানবরতাজস্রমপ্যথাতিশয়ো ভরঃ।
অতিবেলভৃশাত্যর্থাতিমাত্রোদ্গাঢ়নির্ভরং॥
তীব্রৈকান্তনিতান্ত নি গাঢ়বাঢ়দৃঢ়ানি চ॥"

(অগ্নিপুরাণ ৩৬০ অধ্যায়)

ইত্যাদি যেমন অবিকল অমরকোষ—মধ্যে মধ্যে দুই একটু ন্যূনাধিক্য আছে—তাহা অগ্নিপুরাণ দেখিলেই বুঝা যাইবে।

সুতরাং অগ্নিপুরাণকে আধুনিক বলিয়া যদি অপ্রমাণ করা যায়—অর্থাৎ উহা বেদব্যাসের রচিত নহে—যদি স্বীকার করা যায়, তবে তল্লিখিত বুদ্ধাবতারও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রমাণার্হ হইবে না। কাজেকাজেই অগ্নিপুরাণের বুদ্ধ জয়দেবের "কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর" হইতে পারে না।

আমরা "লঙ্কাবতার সূত্র" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এক "শাক্যসিংহকে" দেখিতে পাই। যদিও উক্ত গ্রন্থের কোনও স্থানেই "শাক্যসিংহ" নামটি না থাকুক, কিন্তু শাক্যসিংহের সমপর্য্যায় "বোধিসত্ত্ব" নামটী প্রায় প্রতিস্তম্ভেই আছে এবং পূর্ব্বাপর গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় বোধিসত্ত্বই শাক্যসিংহ ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। অধিকন্তু একস্থানে শাক্যবংশ ইক্ষ্বাকুসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ আছে যথা—

"শাক্যবংশঃ কথং কেন কথমীক্ষ্বাকুসম্ভবঃ"

সুতরাং লঙ্কাবতার সূত্রে প্রযুক্ত বুদ্ধ ও "বোধিসত্ত্ব" শব্দে যে ভগবান্ শাক্যসিংহকে বুঝাইয়াছে—তাহাতে আর সন্দেহের আবশ্যকতা নাই।

উক্ত লঙ্কাবতার সূত্রে লঙ্কেশ্বর দশানন রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও অশোকবনের উল্লেখ আছে। যথা—

"একদা লঙ্কেশ্বর রাবণ শুনিতে পাইলেন যে, বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহ সপ্তরাত্রের পর মহাসাগর হইতে উত্থিত হইয়া তটে অবস্থিত আছেন। তখন শুক সারণ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত পরিবৃত হইয়া বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, "আমি দশানন রাবণ, রাক্ষসের অধীশ্বর, আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার লঙ্কায় চলুন। পূর্ব্বতন বুদ্ধেরাও

আমার লঙ্কার রত্নখচিত শিখর দেশে অবস্থিত হইয়া আত্মতত্ত্ব বিচার করিতেন। আপনি যদি লঙ্কার মলয় পর্ব্বতে উপস্থিত হন, তাহা হইলে মহাযানপরায়ণ আমার পুরবাসিকুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ আপনার নিকটে আত্মার গতি বিষয়ক প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবে। আমার অশোক বনে আপনি আশ্রম স্বীকার করুন, আমাকে বুদ্ধগণের দাসানুদাস জানিবেন।" (১)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—এ কোন্ লঙ্কা? কোন্ দশানন রাবণ? আর এই কুম্ভকর্ণই বা কে? বুঝিতে পারিলাম—ইহারা পূর্ব্বাবধিই পরম বৌদ্ধ—বুদ্ধের দাসানুদাস। লঙ্কাবতার সূত্রের রাবণ কুম্ভকর্ণকে দেখিতেছি, বৌদ্ধের দাসানুদাস বৌদ্ধচূড়ামণি, অহিংসা পরমধর্ম্মে দীক্ষিত—তবে কি এই জিতেন্দ্রিয় পরম বৌদ্ধ রাবণ নির্লিপ্তভাবে পরদারহরণ ব্রতারম্ভ করিয়াছিলেন? না কুম্ভকর্ণাদি বৌদ্ধগণ নির্লিপ্তভাবে মনুষ্যের আমমাংস চর্ব্বণ করিতেন? তবে এই লঙ্কা কি বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কা? না এই রাবণই বাল্মীকি রামায়ণের রাবণ?

আমরা বাল্মীকি রামায়ণ পাঠে জানিয়াছি (২) রাবণ মহাশৈব,—রাবণ

(১) "রাবণোহহং দশগ্রীবো রাক্ষসেন্দ্র ইহাগতঃ।
অনুগৃহ্নাহি মে লঙ্কাং যে চাস্মি পুরবাসিনঃ॥
পূর্ব্বৈরপি চ সম্বুদ্ধৈঃ প্রত্যাত্মগতি গোচরং।
শিখরে রত্নখচিতে পুরমধ্যে প্রকাশিতং॥"
"আয়াতু ভগবান্ শাস্তা লঙ্কামলয়পর্ব্বতং।
কুম্ভকর্ণপুরোগাশ্চ রাক্ষসাঃ পুরবাসিনঃ॥
শ্রোষ্যন্তি প্রত্যাত্মগতিং মহাযানপরায়ণাঃ।"
"রম্যাঞ্চাশোকবনিকাং প্রতিগৃহ্ণ মহামুনে।
আজ্ঞাকরোহস্মুদ্ধানাং যে চ তেষাং জিনাত্মজাঃ॥"

(২) "পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্ব্বিজয়সংশ্রিতান্॥
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ।
"সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চ্চিঃ সধূমকলুষোদয়ঃ।
মন্ত্রসংজ্ঞহুতোহপ্যগ্নির্ন সম্যগভিবর্দ্ধতে॥" "লঙ্কা ১০।৮—১৫।

অগ্নিহোত্রী,—রাবণের গৃহে সর্ব্বদা বৈদিক যজ্ঞ হইত,—সর্ব্বদা বেদধ্বনি হইত, লঙ্কায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল—ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার সর্ব্ব প্রসিদ্ধ। অথচ লঙ্কাবতারসূত্র গ্রন্থখানিকে সর্ব্বথা অপ্রামাণ্য বা অবজ্ঞেয় বোধ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, উক্ত গ্রন্থখানির বিষয় অতি উপাদেয় এবং উচ্চস্তরের সদুপদেশে পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে আমরা সর্ব্বথা অসমর্থ। কেননা রাবণ ত্রেতাযুগের, আর শাক্যসিংহ কলিযুগের,—উভয়ের সমাধিকরণ আলোক অন্ধকারের ন্যায় সুদূরপরাহত।

এখন কি উপায়ে বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম অবতার বুদ্ধের তথ্য নির্ণয় করা যায়? আর্য্যশাস্ত্র অবতার নির্ণয়ের জন্য দায়ী,—শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ অবতার নির্ণয়ের জন্য দায়ী। এই ক্ষেত্রে অনন্যোপায় হইয়া আমরা বিষ্ণু-পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পৌরাণিক অবতার বুদ্ধকে পুরাণের দ্বারাই উপপন্ন করা যুক্তিযুক্ত।

পুরাণসমূহের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ খানি অতীব প্রাচীন, এবং এই পুরাণখানি বিকলাঙ্গ বা প্রক্ষিপ্তাদি দোষ দুষ্ট নহে। ইহার প্রমাণ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভূয়সী প্রশংসার সহিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব এই পুরাণখানির যে সর্ব্বথা প্রমাণ সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ইহা বলাই অতিরিক্ত।

একদা মৈত্রেয় ঋষি বেদব্যাসের পিতা মহর্ষি পরাশরের প্রমুখাৎ বিবিধ সদ্বিষয় শ্রবণের পরে শুনিলেন—

"ষণ্ডাপবিদ্ধচাণ্ডাল পাষণ্ডোন্মত্তরোগিভিঃ। *
কৃকবাকু-শ্ব-নগ্নৈশ্চ বানরগ্রামশূকরৈঃ॥
উদক্যা সূতকাশৌচি মৃতাহারৈশ্চ বীক্ষিতে।
শ্রাদ্ধে সুরা ন পিতরো ভূঞ্জতে পুরুষর্ষভ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১৬।১২—১৩।)

অর্থ—হে মৈত্রেয়! ষণ্ড প্রভৃতি ত্রয়োদশ জনে যদি মানুষের ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধ দর্শন করে, তবে তাহাতে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন না। ষণ্ড—নপুংসক, অপবিদ্ধ—যাহাকে সজ্জনেরা সমাজের বহির্ভূত করিয়াছে,—চাণ্ডাল

* পাষণ্ড—অর্থ বৌদ্ধ, শব্দকল্পদ্রুম, ও বাচস্পত্যে হারাবলী।

—মুর্দ্দফরাস", পাষণ্ড বৈদিককর্ম্ম পরিত্যাগী, মহারোগগ্রস্ত, কৃকবাকু—(কুক্কুট) শ্বা-কুক্কুর, নগ্ন, বানর, গ্রাম্যশূকর, রজস্বলা স্ত্রী, জননাশৌচী, মরণাশৌচী, এবং শবাদাহোপজীবী, এই তের জনকে শ্রাদ্ধের নিকটে থাকিতে দিবে না।

ইহা শুনিয়া মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভগবন্ পরাশর! আপনার কথিত শ্রাদ্ধস্থানে থাকিবার অযোগ্য ষণ্ড, অপবিদ্ধ প্রভৃতি সকলই বুঝিলাম,—কিন্তু "নগ্ন" অর্থে কি ধরিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। অতএব এস্থানে "নগ্ন" অর্থে কি বুঝিব, তাহা বলুন।"

তখন পরাশর কহিলেন—

"ঋক্ যজুঃ সাম সংজ্ঞেয়ং ত্রয়ীবর্ণাবৃতির্দ্বিজ।
এতামুজ্ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ॥
ত্রয়ী সমস্তবর্ণানাং দ্বিজ! সংবরণং যতঃ।
নগ্নো ভবত্যুজ্ঝিতায়ামতস্তস্যামসংশয়ং॥"

(বিষ্ণু পুং, ৩।১৭।৩—৬)

অর্থ—হে দ্বিজ! মৈত্রেয়! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ এই তিন বেদই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরিধান বস্ত্র।—এই বস্ত্র যাহারা না বুঝিয়া ভ্রান্তিজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে "নগ্ন" কহে। উক্ত বেদই সর্ব্ববর্গের উত্তরীয় বস্ত্রও বটে, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ যে বেদাচার পরিত্যাগ করে, তাহাকেই নগ্ন বলা যায়।

এ সম্বন্ধে মহাত্মা ভীষ্মদেবের নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠ যে ইতিহাস বলিয়াছিলেন,—তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"পূর্ব্বকালে সপ্তবর্ষব্যাপী দেবাসুরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়া ক্ষীরোদসাগরের তীরে যাইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। অপরাপর নানাবিধ স্তুতির পরে বলিলেন—

"যদ্যপ্যশেষ ভূতস্য বয়ং তে চ তবাংশকাঃ।
তথাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পশ্যামহে জগৎ॥
স্ববর্ণধর্ম্মাভিরতা বেদমার্গানুসারিণঃ।
ন শক্যা স্তেহরয়ো হন্তুমস্মাভিস্তপসান্বিতাঃ॥"

(বিষ্ণু পুং, ৩।১৭।৩৮—৩৯)

অর্থ—হে নারায়ণ! যদিও আমরা এবং এই দৃশ্যমান অশেষ জগৎ আপনারই অংশভূত, তথাপি আমরা অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন হইয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছি না,—

হে ভগবন্! আমাদের শত্রু অসুরগণ নিজ নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত, বেদমার্গানুসারে জপতপস্যায় নিরত। একেই অসুরেরা দৈহিক বলে আমাদের অপেক্ষায় সহস্রগুণে বলীয়ান্ তাহাতে আবার বৈদিক স্বকীয় ধর্ম্মবলে আরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে। এহেতু আমরা কিছুতেই উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতেছি না।

অতএব আপনি এরূপ একটা উপায় উদ্ভাবন করুন যাহাতে আমরা অক্লেশে অসুরদিগকে পরাজয় করিতে পারি। (১)

পরাশর কহিলেন—

দেবগণের উক্ত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু নিজের শরীর হইতে একটী "মায়ামোহ্" উৎপাদন করিয়া কহিলেন—

"মায়ামোহোঽয়মখিলান্ দৈত্যাংস্তান্ মোহয়িষ্যতি।
ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ॥
তদ্ গচ্ছত ন ভীঃ কার্য্যা মায়ামোহোঽয়মগ্রতঃ।
গচ্ছত্বদ্যোপকারায় ভবিতা ভবতাং সুরাঃ॥"

অর্থ—হে দেবগণ! আমার শরীর হইতে উৎপন্ন এই মায়ামোহ—মায়াবী পুরুষ,—মায়াবলে মুগ্ধ করিয়া সমস্ত অসুরদিগকে বেদাচারভ্রষ্ট করিবে। তখন ধর্ম্মবলে অসুরেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অনায়াসে বধ করিতে পারিবে। অতএব তোমরা ভয় করিও না, যাও, তোমাদের অগ্রে এই মায়ামোহ যাইতেছেন,—ইনি তোমাদের উপকার করিতে পারিবেন।

পরাশর কহিলেন—

"তপস্যভিরতান্ সোঽথ মায়ামোহো মহাসুরান্।
মৈত্রেয় দদৃশে গত্বা নর্ম্মদাতীরসংশ্রয়ান্॥

(১) "তমুপায়মমেয়াত্মন্নস্মাকং দাতুমর্হসি।
যেন তানসুরান্ হন্তুং ভবেম ভগবন্ ক্ষমাঃ॥" (বিষ্ণু, ৩।১৭।৪০)

ততো দিগম্বরো মুণ্ডো বর্হিপত্রধরো দ্বিজ।
মায়ামোহোঽসুরান্ শ্লক্ষ্মমিদং বচনমব্রবীৎ॥"

অর্থ—অনন্তর মায়ামোহ বিষ্ণুর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া দেখিলেন, অসুরগণ নর্ম্মদা নদীর তীরে তপস্যা করিতেছে। তাহা দেখিয়া মায়ামোহ মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিগম্বর হইলেন, এবং ময়ূর পুচ্ছের গুচ্ছ হস্তে ধারণ করিয়া —সেই অপূর্ব্ববেশে অসুরদিগের নিকটে যাইয়া মনোমুগ্ধকর বাক্য কহিলেন। —(বিষ্ণুপুরাণ ৩। ১৮। ৩)

"ভো দৈত্যপতয়ো ব্রূত যদর্থং তপ্যতে তপঃ।
ঐহিকং বাথ পারত্র্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ॥" ৩

অর্থ—হে দৈত্যপতিগণ! তোমরা কিসের জন্য তপস্যা করিতেছ বল? ঐহিক সুখের নিমিত্ত—না পরকালের সুখের নিমিত্ত?

ইহা শুনিয়া অসুরগণ কহিল—(৩। ১৮। ৪)

"পারত্র্যফললাভায় তপশ্চর্য্যা মহামতে।
অস্মাভিরিয়মারব্ধা কিংবা তেঽত্র বিবক্ষিতং॥" ৪

অর্থ—হে বিচক্ষণ! আমরা পরকালে সুখলাভার্থ এই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তোমার এ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে বল?—

তখন মায়ামোহ কহিলেন—(৩। ১৮। ৫)

"কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতং॥ ৫
ধর্ম্মো বিমুক্তেরর্হোঽয়ং নৈতদস্মাৎ পরঃ পরঃ।
অত্রৈবাবস্থিতাঃ স্বর্গং বিমুক্তিং বা গমিষ্যথ॥
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ সর্ব্বে যূয়ং মহাবলাঃ॥" ৬

অর্থ—হে দৈত্যগণ! যদি তোমরা মুক্তি ইচ্ছা কর, তবে আমার বাক্য পালন কর। আমার কথিত ধর্ম্মই নির্ব্বাণপদে যাইবার একমাত্র বিবৃতদ্বার। মুক্তির উপযোগী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহা ছাড়া আর নাই। মদুক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই ইচ্ছা হয় ত স্বর্গে যাইবে, না হয় নির্ব্বাণপদে যাইবে। অতএব তোমরা যেরূপ মহাবলসম্পন্ন, তাহাতে তোমরাই মদুক্ত ধর্ম্মগ্রহণের যোগ্য পাত্র।

পরাশর কহিলেন—(৩। ১৮। ৭—১৪

"এবং প্রকারৈর্ব্বহুভির্যুক্তিদর্শনবর্দ্ধিতৈঃ।
মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদপাকৃতাঃ॥ ৭
ধর্ম্মায়ৈতদধর্ম্মায় সদেতন্ন সদিত্যপি।
বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্বিমুক্তিং সংপ্রযচ্ছতি॥ ৮
পরমার্থোঽয়মত্যর্থং পরমার্থো ন চাপ্যয়ং।
কার্য্যমেতদকার্য্যঞ্চ নৈতদেবং স্ফুটন্ত্বিদং॥ ৯
দিগ্বাসসাময়ং ধর্ম্মো ধর্ম্মোঽয়ং বহুবাসসাং।
ইত্যনৈকান্তবাদঞ্চ মায়ামোহেন নৈকধা॥ ১০
তেন দর্শয়তা দৈত্যাঃ স্বধর্ম্মাস্ত্যাজিতা দ্বিজ।
অর্হথেমং মহাধর্ম্মং মায়ামোহেন তে যতঃ॥ ১১
প্রোক্তাস্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমার্হতাস্তেন তেঽভবন্।
ত্রয়ীধর্ম্মসমুৎসর্গং মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ॥ ১২
কারিতাস্তন্ময়া হ্যাসং স্তথান্যে তৎপ্রবোধিতাঃ।
তৈরপ্যন্যে পরে তৈশ্চ তৈরপ্যন্যে পরে চ তৈঃ॥ ১৩
অল্পৈরহোভিঃ সন্ত্যক্তা তৈর্দ্দৈত্যৈঃ প্রায়শস্ত্রয়ী।
পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃঙ্ মায়ামোহোঽজিতে ক্ষণঃ।
অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদ্বল্পমধুরাক্ষরং॥ ১৪

অর্থ—এই প্রকার বহুবিধ যুক্তি ও শুষ্ক তর্ক দ্বারা বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া মায়ামোহ দৈত্যগণকে বেদাচার হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বেদমার্গ ত্যাগের এইসকল কারণ দেখাইলেন—হে দৈত্যগণ! ইহাতে ধর্ম্ম উহাতে অধর্ম্ম, ইহা সৎ, উহা অসৎ, এই কর্ম্মে মুক্তি হয়, এই কর্ম্মে হয় না, ইহা ঠিক, উহা ঠিক নহে, ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উহা নহে, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, উহা বহুবস্ত্রধারীর ধর্ম্ম,—ইত্যাদি বেদবাক্যের ফল কোথাও স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। উক্ত বাক্যের ব্যভিচার অনেক দেখান যাইতে পারে। —ইত্যাদি স্তোভ মনোহর কথায় অসুরদিগকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইলেন। "তোমরা মদুক্ত মহাধর্ম্মের অর্হ (যোগ্য),"—এই বলিয়া মায়ামোহ উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন বিধায়—এই অসুরগণ তদবধি "আর্হত" নামে অভিহিত হয়। এইরূপে

মায়ামোহ অসুরদিগকে ভালরূপে বেদ ধর্ম্মত্যাগ করাইয়া দিলে পরে, তাহারাও অপরাপর অসুরদিগকে বুঝাইয়াছিল, আবার তাহারাও অপরকে, আবার তাহারাও অপরকে বুঝাইয়া দিলে পর, অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রায় অসুর গুলি বেদ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল। পুনর্ব্বার উক্ত মায়ামোহ কষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নেত্রে অঞ্জন ধারণ করিয়া অবশিষ্ট অসুরদিগকে অল্পাক্ষর মধুরস্বরে বৌদ্ধমত বুঝাইতে কহিলেন—(৩। ১৮। ১৫ ১৭)

"স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্ব্বাণার্থমথাসুরাঃ।
তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত॥ ১৫
বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছত।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমুদীরিতং॥ ১৬
জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থ তৎপরং।
রাগাদি দুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে॥" ১৭

অর্থ—হে অসুরগণ! যদি তোমাদের স্বর্গরাজ্যের অভিলাষ হইয়া থাকে, অথবা নির্ব্বাণপদলাভের জন্য যদি অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে যজ্ঞে পশুহিংসা করিও না। বৈদিক যজ্ঞে পশুহিংসা—মহানৃশংসেরই ধর্ম্ম; ইহা তোমরা বুঝিয়া দেখ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিজ্ঞানময় ইহা হৃদয়ঙ্গম কর, এবং আমার এই বাক্যই যে, পণ্ডিতগণ সম্যক্ প্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন—তাহাও বুঝিয়া দেখ। এই জগতের কোনই আধার নাই, কেবল ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ীভূত শব্দাদি—ঘট পটাদি সেই সেই বিষয় কল্পিত করিয়াছে—কেবল রাগাদি দোষে উক্ত বিষয়সমূহ দূষিত হইয়া এই জগৎ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে।

পরাশর কহিলেনঃ——(৩।১৮।১৮—৩৪)

"এবং বুধ্যত বুধ্যধ্বং বুধ্যতৈবমিতীরয়ন্।
মায়ামোহঃ স দৈতেয়ান্ ধর্ম্মমত্যাজয়ন্নিজং॥ ১৮
নানাপ্রকারবচনং স তেষাং যুক্তিযোজিতং।
তথা তথা চ তদ্ধর্ম্মং তত্যজুস্তে যথা যথা॥ ১৯
তেঽপ্যন্যেষাং তথৈবোচুরন্যৈরন্যে তথোদিতাঃ।
মৈত্রেয় তত্যজুর্ধর্ম্মং বেদস্মৃত্যুদিতং পরং॥ ২০

অন্যানপ্যন্যপাষণ্ডপ্রকারৈর্ব্বহুভির্দ্বিজ।
দৈতেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহোঽতিমোহকৃৎ॥ ২১
স্বল্পেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্ব্বাং ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথাং॥
কেচিদ্বিনিন্দাং বেদানাং দেবানামপরে দ্বিজ।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য তথান্যে চ দ্বিজন্মনাং॥
নৈতদ্ যুক্তিসহং বাক্যং হিংসাধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতং॥ (১)
যজ্ঞৈরনেকৈর্দ্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ॥
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে॥
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভোক্তুমন্যেন চেত্ততঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥
জনশ্রদ্ধেয়মিত্যেতদবগম্য ততো বচঃ।
উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাং যন্ময়েরিতং॥
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ!
যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়ান্যৈশ্চ ভবদ্বিধৈঃ॥
মায়ামোহেন তে দৈত্যা প্রকারৈর্ব্বহুভিস্তথা।
ব্যুত্থাপিতা যথা নৈষাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ॥
ইত্থমুন্মার্গযাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেঽমরাঃ।
উদ্যোগং পরমং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥
ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্দ্বিজ!
হতাশ্চ তেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ॥
স্বধর্ম্মকবচস্তেষামভূদ্ যঃ প্রথমং দ্বিজ।
তেন রক্ষাভবৎ পূর্ব্বং নেশুর্নষ্টে চ তত্র তে॥ ৩৩

(১) নাস্তিক-চার্ব্বাকের উক্তি সদৃশ। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ দ্রষ্টব্য।

ততো মৈত্রেয় তন্মার্গবর্ত্তিনো যেঽভবন্ জনাঃ।
নগ্নাস্তে তৈর্যতস্ত্যক্তং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা॥" ৩৪

(বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮।১৮—৩৪)

অর্থ—আমি যাহা বলিতেছি তাহা এইরূপে বুঝ, এইরূপে বুঝ, না হয় আবার বুঝ,—এই প্রকারে "বুধ্যত বুধ্যদ্ধং" কহিয়া মায়ামোহ অসুরগণকে নিজধর্ম্ম ত্যাগ করাইলেন এবং তদবধি উহারা "বৌদ্ধ" নামে খ্যাত হইল। এবং যেরূপে বুঝাইলে অসুরেরা বৈদিক ধর্ম্ম ত্যাগ করে, সেই প্রকারে নানারূপ মায়াময় বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া যুক্তির অনুসরণ করাইয়া দিলে তাহারা নিজ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিল। আবার তাহারা অপরকে, আবার তাহারাও অপর অসুর-দিগকে—ঐরূপ বুঝাইয়া দিলে—তাহারা বেদোক্ত স্মৃত্যুক্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বোক্ত পশুহিংসাদি ভিন্ন আরও অনেকানেক হেতুবাদ প্রদর্শন করাইয়া (তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে আছে), বিষ্ণুর অবতার মায়ামোহ অসুরদিগকে ভুলাইলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই এই ভারতবর্ষে সমস্ত অসুরেরা বেদোক্ত ধর্ম্ম ছাড়িয়া বৌদ্ধ হইল,—তখন আর তাহারা বেদের কথাও শুনিতে পারিত না। তখন কেহ বা বেদের নিন্দা করিত, কেহবা ব্রাহ্মণগণকে ও দেবতাগণকে গালাগালি করিত, এবং বৈদিক যজ্ঞের উপর নানাপ্রকারে দোষারোপ করিত।—তাহারা এইরূপে কুতর্ক করিত।——"অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" অর্থাৎ অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে পশুবধ করিবে,—এই হিংসার অনু-মোদক বাক্যটী কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, এই শ্রুতিতেই পশুহিংসা নিষিদ্ধ হইতেছে এবং অগ্নিতে ঘৃত পোড়াইলে পুণ্য হয়—ইহা ত বালকের কথা,—অনর্থক কথা,—ইহার কোন অর্থই নাই। এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া লোকে ইন্দ্রত্ব লাভ করে, স্বর্গের রাজা হয়,—রাজা হইয়া যজ্ঞের শমীবৃক্ষের কাষ্ঠ, অর্ক, পলাশ ও খদির কাষ্ঠ চর্ব্বণ করিয়া খান। হায় হায়, পরিণামে যজ্ঞের এই ফল দাঁড়াইল? বরং কর্কশ কাষ্ঠভোজী ইন্দ্র অপেক্ষায় বৃক্ষের কোমল পত্রভোজী পশুই ত অনেকাংশে ভাল। আর যজ্ঞে নিহত পশুর যদি সদ্গতি হয়—যদি স্বর্গে যায়,—তবে যজ্ঞকর্ত্তারা বৃদ্ধপিতাকেই ত যজ্ঞে বলিদান করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া দিতে পারেন! পিতার স্বর্গের জন্য এত কাণ্ড কারখানা—গয়া-

শ্রাদ্ধ, পিণ্ড দান কেন করা হয়? আর পিতার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে আকণ্ঠ ভোজন করাইলে স্বর্গীয় পিতার তৃপ্তি হয়। ভাল, তবে বন্ধুবর্গ বিদেশে যাইতে ডাল চাউল সঙ্গে না লইলেই ত চলে। প্রবাসীর পুত্রাদি বাড়ী বসিয়া শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিল, আর ব্রাহ্মণকে বেশ করিয়া ভোজন করাইল, তাহাতেই প্রবাসী পিতার তৃপ্তি হইবে। অতএব নির্যুক্তিক নীচলোকের অন্ধ বিশ্বাসযোগ্য যজ্ঞাদি বিষয়ে পূর্ণ বেদবাক্য তোমরা পরিত্যাগ কর। আর আমি যাহা বলি, তাহাই তোমরা গ্রহণ কর,—ইহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। যদি মনে কর—বেদ আপ্তবাক্য—অর্থাৎ অভ্রান্তপুরুষ—ঈশ্বরের বাক্য, তাহা কি উপেক্ষা করা উচিত? ইহা ঠিক নহে। কেননা—ইহা বিচার করিয়া দেখা উচিত—যে আপ্তবাক্য কিছু স্বভাবতঃ আকাশ হইতে পড়ে নাই। কিন্তু যুক্তিযুক্ত বচনই তোমাদের ও আমার গ্রাহ্য। বেদবাক্যে পূর্ব্বোক্তরীতিতে যজ্ঞে পশুহিংসাদি বা শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে কোনই যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। অতএব বেদ সর্ব্বথা অশ্রদ্ধেয়।

বিষ্ণুর অবতার মায়ামোহ এই প্রকারে বহুবিধ শুষ্ক স্থূল যুক্তি দ্বারা এরূপভাবে অসুরগণের বেদের উপরে অনাস্থা জন্মাইয়া দিলেন যে, আর তদবধি অসুরদিগের বেদে রুচি হইল না।

এই প্রকারে দৈত্যগণ উন্মার্গগামী স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে, দেবগণ পুনর্ব্বার মহা আড়ম্বরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অসুরকুলকে নির্ম্মূল করিলেন। কেননা পূর্ব্বে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ অসুরগণ অভেদ্য ধর্ম্মকবচে আবৃত ছিল বিধায় দেবগণের হস্তে বিনষ্ট হয় নাই।

হে মৈত্রেয়! অসুর বৌদ্ধগণ বেদের আবরণ—আচ্ছাদন পরিত্যাগ করিলে পরে, তদবধি "নগ্ন" নামে অভিহিত হইয়াছিল।

হে মৈত্রেয়! তোমরা জান—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চতুরাশ্রম ছাড়া পঞ্চমাশ্রম নাই। যাহারা গার্হস্থ হইতে বানপ্রস্থ, বা প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ না করে, তাহাদিগকে "নগ্ন" কহে (১)। উপর্য্যুক্ত নগ্ন

(১) ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থস্তথাশ্রমাঃ।
পরিব্রাড়্ বা চতুর্থোঽত্র পঞ্চমো নোপপদ্যতে॥

অর্থাৎ বৌদ্ধগণের সহিত সংসর্গ করা নিতান্ত দোষাবহ,—তাহা শ্রবণ কর—

যাহারা নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা বন্দনাদি একদিন না করে, তাহারা পাপভাগী হয়। কিন্তু বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিলে পূত হয় (১)। হে মৈত্রেয়, যে মানব একপক্ষ

যস্তু সন্ত্যজ্য গার্হস্থং বানপ্রস্থো ন জায়তে।
পরিব্রাড়্ বাপি মৈত্রেয় স নগ্নঃ পাপকৃন্নরঃ॥" ৩৬
(বিষ্ণু পুরাণ ৩।১৮.৩৫ – ৩৬)

(১) "নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিপ্র তস্য হানিরহর্নিশং।
অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পততি তদ্দিনে॥ ৩৭
প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনাপদি।
পক্ষং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্ত্তা মৈত্রেয় মানবঃ॥
সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোঽভিজায়তে।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা॥
স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্ম্মহামতে।
পুংসো ভবতি তস্যোক্তা ন শুদ্ধিঃ পাপকর্ম্মণঃ॥
দেবর্ষিপিতৃভূতানি যস্য নিঃশ্বস্য বেশ্মনি।
প্রযান্ত্যনর্চ্চিতান্যত্র লোকে তস্মান্ন পাপকৃৎ॥
দেবাবিনিঃশ্বাসহতং শরীরং যস্য বেশ্ম চ।
ন তেন সঙ্করং কুর্য্যাৎ গৃহাসনপরিচ্ছদৈঃ॥
সম্ভাষণানুপ্রশ্নাদি সহাস্যাঞ্চৈব কুর্ব্বতঃ।
জায়তে তুল্যতা পুংসস্তেনৈব দ্বিজ বৎসরং॥
অথ ভুঙ্‌ক্তে গৃহে তস্য করোত্যস্যাং তথাসনে।
শেতে চাপ্যেকশয়নে স সদ্যস্তৎসমো ভবেৎ॥
দেবতাপিতৃভূতানি তথানভ্যর্চ্চ্যোঽতিথীন্।
ভুঙ্‌ক্তে স পাতকং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য কীদৃশী॥
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ যে বর্ণা স্বধর্ম্মাদন্যতো মুখং।
যান্তি তে নগ্নসংজ্ঞাস্তু হীনকর্ম্মস্ববস্থিতাঃ॥ ৪৬

বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করে, তাহারা বিশেষ প্রায়শ্চিত্তার্হ। এক বৎসর যে বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করে, তাহাকে দেখিয়া সূর্য্যাবলোকন করিতে হয়,—আর স্পর্শ করিলে সচেল স্নান করিতে হয়। পরন্তু সেই ক্রিয়ালোপকারী পাপীর আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অতএব দেব ঋষি পিতৃগণ যাহার গৃহে সমুচিত অর্চ্চিত হন না, প্রত্যুত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যত্র যান, তাহাদের (বৌদ্ধের) গৃহ, আসন ও বস্ত্রাদির সহিত সংস্রব করিবে না।

যে তাহাদের সহিত এক বৎসর আলাপাদি সংসর্গ করে তাহারা তত্তুল্য হয়। আর যাহারা বৌদ্ধের গৃহে ভোজন, আসনে উপবেশন, আর শয্যায় শয়ন করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ বৌদ্ধ তুল্য হয়।

অতএব হে মৈত্রেয়! বেদাচার পরিত্যাগে দূষিত উক্ত "নগ্নের" আলাপাদি সংসর্গ সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবে। হে মৈত্রেয়! অধিক কি বলিব—যে মানব শ্রদ্ধাকর্ম্মে বা দেবপূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সময় যদি উপর্য্যুক্ত নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধদ্বারা দৃষ্ট হয়, তবে পিতৃগণ ও দেবগণ উহাতে তৃপ্ত হন না।

এ সম্বন্ধে একটী ইতিহাস শ্রবণ (২) কর ঃ—"পূর্ব্বকালে শতধনু রাজা ও

চতুর্ণাং যত্র বর্ণানাং মৈত্রেয়াত্যন্ত সঙ্করঃ।
তত্রাস্যা সাধুবৃত্তীনামুপঘাতায় জায়তে ॥ ৪৭
অনভ্যর্চ্চ্য ঋষীন্ দেবান্ পিতৄন্ ভূতাতিথীংস্তথা।
যো ভুঙ্‌ক্তে তস্য সম্ভাষাৎ পতন্তি নরকে নরাঃ ॥
তস্মাদেতান্নরো নগ্নাং স্ত্রয়ীসন্ত্যাগদূষিতান্।
সর্ব্বদা বর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞ আলাপস্পর্শনাদিষু ॥
শ্রদ্ধাবদ্ভিঃ কৃতং যত্নাৎ দেবান্ পিতৃপিতামহান্।
ন প্রীণয়তি তচ্ছ্রাদ্ধং যদেভিরবলোকিতং ॥

(২) শ্রূয়তে চ পুরা খ্যাতো রাজা শতধনুর্ভুবি।
পত্নী চ শৈব্যা তস্যাভূদতিধর্ম্মপরায়ণা ॥ ৫১

তৎপত্নী শৈব্যা কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথিতে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন, পথে একজন পাষণ্ড অর্থাৎ বৌদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাজা তাহার সহিত আলাপ করেন। তিনি সেই পাষণ্ডের সহিত আলাপের দোষে মরণান্তে প্রথমে কুক্কুর পরে শৃগাল তৎপরে কাক ও সর্ব্বশেষে ময়ূর হন। রাজর্ষি জনক যখন অবভৃথ স্নান করেন, তখন ঐ প্রিয় ময়ূরটীকে স্নান করান। মরণান্তে ময়ূর অবভৃথ স্নানের ফলে উক্ত পাষণ্ডের সহিত আলাপজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জনকরাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর বিবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দেহান্তে স্বর্গলাভ করে।

হে মৈত্রেয়! এই তোমাকে পাষণ্ডের সম্ভাষণজনিত দোষ ও অশ্বমেধে অবভৃথস্নানের মাহাত্ম্য বলা হইল।

পরাশর কহিলেন——(১।১৮।৯৬—১০২)

"তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপস্পর্শনে ত্যজেৎ।
বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ ॥ ৯৬

স তু রাজা তয়া সার্দ্ধং দেবদেবং জনার্দ্দনং।
আরাধয়ামাস বিভুং পরমেণ সমাধিনা ॥ ৫২
হোমৈর্জ্জপৈস্তথাদানৈরুপবাসৈশ্চ ভক্তিতঃ।
পূজাভিশ্চানুদিবসং তন্মনা নান্যমানসঃ ॥
একদা তু সমং স্নাতৌ তৌ তু ভার্য্যাপতী জলে।
ভাগীরথ্যাঃ সমুত্তীর্ণৌ কার্ত্তিক্যাং সমুপোষিতৌ ॥
পাষণ্ডিনমপশ্যেতামায়ান্তং সম্মুখং দ্বিজ।
চাপাচার্য্যস্য তস্যাসৌ সখা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥
অতস্তদ্গৌরবাত্তেন সহালাপমথাকরোৎ।
ন তু সা বাগ্‌যতা দেবী তস্য পত্নী যতব্রতা ॥
উপোষিতাস্মীতি রবিং তস্মিন্দৃষ্টে দদর্শ চ ॥
সমাগম্য যথা ন্যায়ং দম্পতী তৌ যথাবিধি ॥ ৫৮
(বিষ্ণু পুরাণ ৩।১৮।৩৭—৫৮)

ক্রিয়াহানির্গৃহে যস্ত মাসমেকং প্রজায়তে।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যং পশ্যেত মতিমান্ নরঃ॥ ৯৭
কিং পুনর্যৈস্তু সংত্যক্তা ত্রয়ী সর্ব্বাত্মনা দ্বিজ।
পরান্নভোজিভিঃ পাপৈর্ব্বেদবাদবিরোধিভিঃ॥
পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥" ৯৯
দূরাদপাস্তঃ সম্পর্কঃ সহাস্যাপি চ পাপিভিঃ।
পাষণ্ডিভির্দ্দুরাচারৈস্তস্মাত্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১০০
এতে নগ্নাস্তবাখ্যাতা দৃষ্ট্যা শ্রাদ্ধোপঘাতকাঃ।
যেষাং সম্ভাষণাৎ পুংসাং দিনপুণ্যং প্রণশ্যতি॥
এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা ন হ্যেতানালপেদ্বুধঃ।
পুণ্যং নশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবং॥ ১০২

(বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮।৯৬—১০২)

অর্থ—অতএব পাষণ্ডদিগের সহিত আলাপ ও স্পর্শাদি সংসর্গ করিবে না। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকালে এবং যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বথাই আলাপাদি বর্জ্জন করিবে। সাধারণতঃ যে সকল আর্য্যজাতির গৃহে একমাস কাল স্বজাতীয় ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত না হয়, তাহাদিগকে দেখিলে নিজের শুদ্ধির নিমিত্ত সূর্য্য দর্শন করিতে হয়। আর যে অসুরগণ বহুদিন যাবৎ সর্ব্ব প্রকার বৈদিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, বেদবাক্যে যাহারা সর্ব্বদা বিরোধী—সেই পাপিষ্ঠগণের সহিতও কোন মতেই আলাপাদি সংসর্গ করা উচিত নয়।

পাষণ্ড *—অর্থাৎ স্বধর্ম্মত্যাগী নিষিদ্ধ কর্ম্মাচারী, বিড়ালতপস্বী—যাহারা

* "ভ্রষ্টঃ স্বধর্ম্মাৎ পাষণ্ডো বিকর্ম্মস্থো নিষিদ্ধকৃৎ।
যস্য ধর্ম্মধ্বজো নিত্যং সুরধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ॥
প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতং।
প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং॥
ত্যক্তোপরোধচেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ।
সন্দেহকৃদ্ধেতুভিশ্চ সৎকর্ম্মসু সহেতুকঃ॥

বাহিরে ধর্ম্মের বেশভূষা করিয়া গোপনে পাপ করে, শঠ—(যাহারা সাক্ষাতে প্রিয় কথা কহে পরোক্ষে অপ্রিয়াচরণ করে) হৈতুক—(যাহারা সৎকর্ম্মমাত্রেই হেতু অনুসরণ করে) বকবৃত্তি—(যাহারা স্বার্থপর, মিথ্যাবিনীত) ইহাদিগের সহিত কথাও কহিবে না।

অর্থ—উক্ত দুরাচার পাপী পাষণ্ডগণের সহিত যে কোন সম্পর্ক অর্থাৎ বাক্যালাপ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধের লক্ষণ তোমাকে বলিলাম। ইহাদের দৃষ্টিপাতেই শ্রাদ্ধ নষ্ট হয়,—আর ইহাদের সহিত আলাপ করিলে, তদ্দিনকৃত পুণ্য নষ্ট হয়।

এই ত গেল বিষ্ণুপুরাণে পাষণ্ডের কথা। এখন অন্যান্য পুরাণে এসম্বন্ধে কি কি আছে দেখা যাউক।—

মৎস্য পুরাণে কলিযুগের লক্ষণ লিখিত আছেঃ—

"রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠাঃ পাষণ্ডানাং প্রবৃত্তয়ঃ।
কাষায়িণশ্চ নিষ্কচ্ছাস্তথা কাপালিনশ্চ হ॥" (১৪৪।৪০)

অর্থ—কলিযুগে শূদ্রজাতির মধ্যেই অধিক রাজা হইবে, এবং পাষণ্ডগণের এরূপ প্রবৃত্তি হইবে যে, তাহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিবে, কাছা দিবে না, এবং ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে——(২৯।১১—১৬)

"কুশীলচর্য্যাপাষণ্ডৈর্ব্বৃথারূপৈঃ সমাবৃতাঃ।
"শুক্লদন্তাঞ্জিতাক্ষাশ্চ মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।"
"কাষায়িণোঽথ নির্গ্রন্থাস্তথা কাপালিনশ্চ যে।"

অর্থ—বৃথা বেশধারী পাষণ্ডের সহিত মানবগণ কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

পাষণ্ডেরা শুক্লদন্ত (অর্থাৎ তাম্বুল ভক্ষণ করিবে না), চক্ষুতে অঞ্জন পরিবে, মস্তক মুণ্ডিত করিবে ও গেরুয়া বস্ত্র পরিবে।

অর্ব্বাগ্ দৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতা॥ নীলকণ্ঠ—টীকা।

উক্ত গেরুয়াধারীরা "নির্গ্রন্থ" নামে অভিহিত এবং ভিক্ষাপাত্র-ধারী হইবে।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—(২২৭।২৫)

"দস্যুৎক্লিষ্টা (?) জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ ॥" ২২৭। ২৫

অর্থ—কলিযুগে নগরীসমূহ দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে, বেদসকল পাষণ্ড কর্ত্তৃক দূষিত হইবে।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে।—(৪০।৪০)

"বর্ণাশ্রমাণাং যে চান্যে পাষণ্ডাঃ পরিপন্থিনঃ ॥" (৪০।৪০)

অর্থ—কলিযুগে পাষণ্ডেরা বর্ণাশ্রমের বৈরী হইবে।

লিঙ্গপুরাণ স্বপ্নাধ্যায় (৯১—১৭)।

"ছিদ্রং বা স্বস্য কণ্ঠস্য স্বপ্নে যো বীক্ষতে নরঃ।
নগ্নং বা শ্রমণং দৃষ্ট্বা বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতং॥ (৯২—১৭)

অর্থ—যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের কণ্ঠের ছিদ্র দর্শন করে, অথবা নগ্ন বৌদ্ধ দর্শন করে—তাহার শীঘ্রই মৃত্যু হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে—

"যেষাং কুলে ন বেদোঽস্তি ন শাস্ত্রং নৈব চ ব্রতং।
তে নগ্নাঃ কীর্ত্তিতাঃ সদ্ভিস্তেষামন্নং বিগর্হিতং ॥"
নগ্নাঃ পাতকিনশ্চৈব হন্যুর্দ্দৃষ্টা পিতৃক্রিয়াং ॥" মার্ক ৩২।২০।

(সদাচং—নগ্ন শব্দ—শ. ক. দ্র)।

"নগ্নং ক্ষপণকং স্বপ্নে হসমানং মহাবলং।
এবং সংবীক্ষ্য বল্গন্তং বিদ্যান্মৃত্যুমুপস্থিতং ॥"

(৪৩।১৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—(৪২)

"শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজ !
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বলোকেষু গর্হিতঃ ॥"

(পদ্মপুরাণ ৪২ অধ্যায়)।

অর্থ—যে শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত সদাচার অনুষ্ঠান না করে, তাহাকে সর্ব্বলোক নিন্দিত পাষণ্ডী কহে।

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে—

"ন চৌরা নৈব পাষণ্ডা বঞ্চকা দম্ভকাস্তথা ॥" (৫ ২০।৩৬)

অর্থ—মহিষাসুর নিহত হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ শত্রুঘ্নকে পৃথিবীর রাজত্ব প্রদান করেন।—তাঁহার রাজত্বকালে দেশে চোর, পাষণ্ড, বঞ্চক ও দাম্ভিক ছিলনা।

দেবী ভাগবতের স্থানান্তরে "সৌগত" শব্দও দেখা যায়। যথা—

"সৌগতানাং মতং চেত্ত্বং স্বীকরোষি বরাননে।
তথাপি যৌবনং প্রাপ্য ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ॥" (৫।১৫।১২)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"সোঽপশ্যদথ পথি নগ্নং ক্ষপণকমাগচ্ছন্তং ॥" (১৩।১২৪)

অর্থ—উতঙ্ক ঋষি গুরুদক্ষিণা প্রদানের জন্য পৌষরাজ হইতে কুণ্ডল লইয়া যাইবার সময় পথে দেখিলেন, একটী নগ্ন ক্ষপণক আসিতেছে—তদ্দর্শনে তিনি কুণ্ডল গোপনে রাখিয়া স্নানার্থ নদীতে অবতরণ করিলে, ঐ বৌদ্ধরূপধারী তক্ষক কুণ্ডল চুরি করিয়াছিল। এবং মহাভারতের স্থানান্তরেও বৌদ্ধমতের উল্লেখ দেখা যায়। যথা বন্দ্যুবাচ—

"এক এবাগ্নির্ব্বহুধা সমিধ্যতে, একঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"

অর্থ—অষ্টাবক্রের সহিত বন্দী রাজার যখন বিচার হয়, তখন তিনি বৌদ্ধ মত উত্থাপন করিয়া কহিলেন (১) একই অগ্নি বহুপ্রকারে দীপ্তি করিতেছে, একই সূর্য্য সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছে—এইরূপে বন্দী রাজা প্রথমে বৌদ্ধ পক্ষ উত্থাপন করিলেন।

আবার মহাভারতের স্থানান্তরে বৌদ্ধের লক্ষণ দেখিতে পাই।—যথা—

"পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপোজ্যোতীশ্চ পঞ্চমং"
ইন্দ্রিয়াণি নরে পঞ্চ ষষ্ঠন্তু মন উচ্যতে ॥
সপ্তমীং বুদ্ধিমেবাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুনরষ্টমঃ।"

---

(১) "বন্দিমুখেন বৌদ্ধমতমুত্থাপয়তি এক এবেতি।"
"ইত্যেবং প্রথমমুপগতো বন্দিনা বৌদ্ধপক্ষঃ ॥"

(বনপর্ব্ব ১৩৪।৮) নীলকণ্ঠ টীকা।

এস্থলে অবশ্য মূলে বৌদ্ধমতের কোন কথাই নাই, সুতরাং নীলকণ্ঠের কথা কতদূর প্রামাণিক তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন।-সং—

ইতি বুদ্ধিগতীঃ সর্ব্বা ব্যাখ্যাতা যাবতীরিহ।
এতদ্বুদ্ধ্বা ভবেদ্বুদ্ধঃ কিমন্যদ্বুদ্ধ লক্ষণং॥"
(শান্তি, মোক্ষ ২৮৫।২—৩২)

অর্থ—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অনল, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জীবাত্মা—ইহা সমস্ত বুদ্ধির পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল। ইহা যে ব্যক্তি বুঝে, তাহাকে প্রকৃত বুদ্ধ বলা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্য আর বুদ্ধের লক্ষণ হইতে পারে না। অর্থাৎ—ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, বা শূন্যবাদীরা বুদ্ধপদবাচ্য হইতেই পারে না, কেননা বুদ্ধ কথা অতি উচ্চ ভাবপূর্ণ, ইহা যাহাকে তাহাকে বলা যাইতে পারে না। চৈত্য ও বিহার (৪৮।১ পৃষ্ঠা)

এখন বিচার্য্য এই হইতেছে—আমরা উপরে মৎস্যপুরাণ, কুর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, এবং মহাভারতে—বুদ্ধ, বৌদ্ধ, জিন, সৌগত, পাষণ্ড, নগ্ন ও ক্ষপণক প্রভৃতি যে সকল শব্দ দেখিতে পাইতেছি—তাহা সমস্তই বৌদ্ধদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ঐ সকল শব্দের প্রতিপাদ্যই যে বৌদ্ধ তাহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই নির্দ্ধারিত। তবে এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, "শাক্যসিংহই কি এই মৎস্যপুরাণাদি রামায়ণ মনু বা মহাভারতের উল্লিখিত বুদ্ধ? ইহা আমরা কোনও যুক্তি বা প্রমাণ দ্বারা কিছুতেই উপপন্ন করিতেছি না। কেননা—উক্ত পুরাণাদির উল্লিখিত বিশেষতঃ মহাভারতের স্থানান্তরে ইহাও বর্ণিত দেখা যায় যে, বৌদ্ধগণের "বিহারের" (১) নাম হইতেই মগধেরই নামান্তর বিহার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যথা—

"নিরাময়ঃ সুবেশাঢ্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ।
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা॥

(১) বিহারো ভ্রমণে স্কন্ধে লীলায়াং সুগতালয়ে॥ মেদিনীর ৩।

(২) যদিও চৈত্য শব্দের অর্থ যজ্ঞ স্থানাদিও আছে বটে, কিন্তু এস্থানে বিহার শব্দের সাহচর্য্যে চৈত্য শব্দের অর্থ বৌদ্ধদিগের উপাসনার স্থানই বুঝিতে হইবে। কেননা মেদিনী চৈত্যশব্দ বুদ্ধের নামে ধরিয়াছেন। (৩।২)

তথা ঋষিগিরিস্তাত শুভাশ্চৈত্যেক পঞ্চমাঃ।
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গাঃ পর্ব্বতাঃ শীতলদ্রুমাঃ॥"
(সভাং, ২১।২—)

অর্থ—কৃষ্ণ ভীমকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছেন,—"তাত! এই যে মগধ দেখিতেছ, এদেশ অতি সুদৃশ্য, অত্রত্য লোকেরা উত্তমবেশে সজ্জিত ও নীরোগ, এবং এস্থান বৌদ্ধদিগের বিহারে ব্যাপ্ত। এই দেশের বরাহ ও বৃষগুলি শৈলখণ্ডের মত বিপুল,—ইহাতে "ঋষিগিরি" নামক এই পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। ইহার পাঁচটী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ, এইশৃঙ্গগুলি বৌদ্ধদের চৈত্য দ্বারা (২) সুদৃশ্য ও বিস্তৃত। অপরাপর পর্ব্বতগুলিও শীতলতরুবিশিষ্ট।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেও মগধে বৌদ্ধের প্রাবল্য বা চিহ্ন ছিল। বুদ্ধ কলিতে প্রাদুর্ভূত শাক্যসিংহ হইতে যুগযুগান্তর পূর্ব্ববর্ত্তী,—এবং কৃষ্ণের বহু পরবর্ত্তী শাক্যসিংহের প্রবর্ত্তিত চৈত্য বা বিহারের উল্লেখ—কৃষ্ণের মুখে কিরূপে সঙ্গত হয়?

অতএব আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের বিষ্ণুর অবতার "মায়ামোহ"ই দশাবতারের অন্যতম বুদ্ধ। তিনিই পুনঃপুনঃ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যজ্ঞবিধির শ্রুতি সমূহকে নিন্দা করিয়াছিলেন। অতএব এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, উক্ত বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত প্রহ্লাদের সমকালীন বেদব্যাসের স্বীকৃত বিষ্ণুর অবতার মায়ামোহই প্রথম বুদ্ধ। তাহা হইলে মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে উল্লিখিত—পাষণ্ড, জৈন, আর্হত, শ্রমণ ও ক্ষপণকাদি শব্দের প্রতিপাদ্য বৌদ্ধের সহিত আর কোনও গোল থাকে না। তবেই ইহার দ্বারা বুঝা যায় জয়দেব কর্ত্তৃক গীত—সেই—

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতং,"
"কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর!"

এই গানের প্রতিপাদ্য বুদ্ধ বিষ্ণুপুরাণের "মায়ামোহ"ই হইবেন, "শাক্যসিংহ" নহেন। কেন না শাক্যসিংহের নাম অন্ততঃ আমাদের দৃষ্ট কোন প্রচলিত আর্য্য শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। অতএব হেমচন্দ্রের সপ্তম বৌদ্ধই—শাক্যসিংহ—ইহা যুক্তিযুক্ত।—তিনি বিষ্ণুর অবতার নহেন।

যদি কেহ অন্যায়রূপে অযুক্তভাবে পুরাণ বা মহাভারতের উপরে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাহা করুন,—না হয় তর্কানুরোধে তাহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু রামায়ণ, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা প্রদর্শিত পাষণ্ডশব্দাদি প্রতিপাদ্য বৌদ্ধের যে উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহারা কি উত্তর দিতে পারেন? তাহা দেখিয়াও তাঁহারা বলিতে কি সাহস করেন যে, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ মত প্রবর্ত্তক—"শাক্যসিংহ"? দেখুন মনু কি বলেন?

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥"
(মনু। ২। ১১)

মেধাতিথি অনুসারে অর্থ—(১) যে ব্রাহ্মণ হেতুশাস্ত্র, অর্থাৎ বৌদ্ধ ও চার্ব্বাকাদির শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া সকল শাস্ত্রের মূলীভূত শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করে, তাহাকে সজ্জনেরা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যজনাদি কর্ম্ম হইতে বর্জ্জিত করিবেন। কেননা যে বেদের নিন্দা করে, তাহাকেই নাস্তিক বলা যায়,—নাস্তিক সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়॥ এবং—

পাষণ্ডিনো (২) বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্॥
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥"
(মনু ৪। ৩০)

মেধাতিথি ও কুল্লুকানুসারে অর্থ—

পাষণ্ডী—অর্থাৎ কষায় বস্ত্রধারী নগ্ন চরকাদি, (মেধাতিথি)। বেদবহির্ভূত ব্রতধারী, শাক্য ভিক্ষু ক্ষপণকাদি (কুল্লুক)। নিষিদ্ধ কর্ম্মচারী, বিড়ালব্রতধারী, শঠ, হৈতুক, নাস্তিক ও বকব্রতধারীদিগকে বাক্যের দ্বারাও সম্মান করিবে না।

(১) "হেতুশাস্ত্রং নাস্তিকতর্কশাস্ত্রং বৌদ্ধচার্ব্বাকাদি শাস্ত্রং।"

(২) "রক্তপটনগ্ন চরকাদয়ঃ" মেধাং। "শাক্য ভিক্ষু ক্ষপণকাদয়ঃ। কুল্লুং

এ সকল স্থলে টীকাকার মহাশয়দিগের কথা কতদূর প্রামাণিক তাহা বুদ্ধিমান পাঠক বিবেচনা করিবেন, প্রবন্ধকার তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া, ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।-সং-

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

(৩) "পাষণ্ডনাশ্রিতাস্তেনা ভর্ত্তৃঘ্ন্যঃ কামগাদিকাঃ।
সুরাপ্য আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদকভাগিনঃ॥"
(প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, অশৌচপ্রং ৬)

মিতাক্ষরা ও মদন পারিজাতানুসারে অর্থ—

পাষণ্ডী অর্থাৎ নরশিরঃকপালধারী এবং বেদাচারবহির্ভূত চিহ্ন গৈরিকাদি বস্ত্রধারী বৌদ্ধ, অনাশ্রমী, স্বুবর্ণচৌর, কুলটা, মদ্যপায়ী, আত্মহত্যাকারিণী ভর্ত্তৃঘাতিনী স্ত্রী—ইহাদের মরণে অশৌচ গ্রহণ ও উদকদান করিতে হয় না।

রামায়ণে বৌদ্ধের এই নামটী না থাকিলেও বৌদ্ধ পর্য্যায়ক "শ্রমণ" নাম দেখা যায়—যথা—

"ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে॥
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে।"
(১। ১৪। ১২)

উক্ত মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বচনে যে পাষণ্ড শব্দ প্রযুক্ত আছে, তাহাতে বেদাচার—বিরুদ্ধ কষায়বসনাদিচিহ্নধারীকে বুঝায়। সুতরাং এই পাষণ্ড শব্দের প্রতিপাদ্য বৌদ্ধই হইবে; নাস্তিক নহে। কেননা নাস্তিকগণ বেদবিরুদ্ধবাদী হইলেও তাহারা নাস্তিকতার পরিচায়ক কোনও কষায়বসনাদিচিহ্নধারী নহে।

অতএব অতি প্রাচীন রামায়ণে ও সংহিতাতেও যখন বৌদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন কোন্ যুক্তি বা শাস্ত্রের দ্বারা বহুকাল পরবর্ত্তী শাক্যসিংহকে অবতার রূপে ধরিতে পারা যায়? সুতরাং বা অগত্যা বিষ্ণুপুরাণের বিষ্ণুর অবতার "মায়ামোহ"ই বরাহ পুরাণের দশাবতারের অন্যতম অবতার "বুদ্ধ"—ইহা নিশ্চয় রূপে বুঝা যায়। কেননা পৌরাণিক অবতার পুরাণদ্বারাই প্রতিপন্ন করা যুক্তিসঙ্গত।

যাহাই হউক শাক্যসিংহ বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন তথাপি তিনি

(৩) "শ্রুতি বাহ্য লিঙ্গ ধারণং পাষণ্ডং" মিতাং। "বেদবাহ্য লিঙ্গ ধারণং পাষণ্ডং" মদনপাং॥ অশৌচপ্রং।)

আমাদের অবজ্ঞেয় নহেন। তিনি যে এক জন অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার না হইলে যে আমাদের ভক্তিভাজন হইবেন না, তাহা নহে। তাঁহাকে মহাযোগী বলিতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্য অষ্টাবক্র প্রভৃতি ঋষিরা বিষ্ণুর অবতার ছিলেন না, কিন্তু তাহাদের নিকট কত কত অবতার অলৌকিকশক্তিতে পরাস্ত হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস ভগবান্ শাক্যসিংহ যোগশক্তির প্রভাবে এক ব্রহ্মাণ্ডকে বিধ্বস্ত করিয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারিতেন। যদি তিনি যৌগিকশক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন, ঈশ্বর সদৃশই ছিলেন, তবে অবতারের জন্য তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করি কেন? এতগুলি অলৌকিকশক্তি সত্ত্বে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যাদির মত অবতার নাই হইলেন, তাহাতে কি বহিয়া যায়? কিন্তু ইদানীন্তন আমাদিগের যেন অবতার না হইলে আর চলে না—এজন্য বড় টানাটানি করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার করিতে হয়। তবে ভাগবতের মতে তাঁহাকে বিষ্ণুর ঋষ্যবতার সহস্রবার স্বীকার করা যাইতে পারে। যথা—

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃস্যুঃ সহস্রশঃ॥
ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

(১।৩।২৭—২৮)

অর্থ—হে দ্বিজগণ! অপক্ষয়রহিত সেই হরির অবতারের সংখ্যা করা যায় না। যেমন মহাসাগর হইতে যে সমস্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী জন্মিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না—সেইরূপ ঋষি সকল মনু, মনুর পুত্র দেবগণ ও প্রজাপতিগণ সকলই হরির অংশাবতার।

যাহা হউক পুরাণ প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রে বৌদ্ধদিগকে এত কদর্য্য রূপে বিগীত করা হইয়াছে যে, তাহা যেন ভাল দেখা যায় না,—যেন গালিতে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করা হইয়াছে। এত তিরস্কারের কারণ কেবল বেদনিন্দা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। আর্য্যঋষিগণ সকলদুঃখ—এমন কি দধীচি ঋষি পরোপকারের জন্য নিজের প্রাণান্ত পর্য্যন্ত দুঃখ সহিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শত পুত্রের নিধনদুঃখ সহিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরবাক্য বেদের নিন্দা

জনিত দুঃখ একটি ঋষিও সহিতে পারেন নাই। সেই জন্যই যেন ঋষিগণ সমস্বরে বেদনিন্দক বৌদ্ধগণকে এত তিরস্কার করিয়াছেন;—সমাজের বহির্ভূত করিয়াছেন, তাহাদের সংসর্গ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

বেদের নিন্দা করায় বেদমূলক স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস সকলই বৌদ্ধ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইল,—আর্য্য ঋষিগণের যেন যথা সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইল,—তাই তাঁহারা ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উহাদিগকে অজস্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

আবার ঋষিদিগের দেখা দেখি সংগ্রহকর্ত্তৃগণও বৌদ্ধদের তিরস্কার করিতে ত্রুটী করিলেন না—

ষড়দর্শনের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র বলিয়া উঠিলেন—

"আপ্তগ্রহণেন চাযুক্তাঃ শাক্য-ভিক্ষু-নিগ্রন্থক-সংসারমোচকাদীনামাগমাভাসা নিরাকৃতা ভবন্তি। অযুক্তত্বঞ্চৈতেষাং বিগানাৎ, ছিন্নমুলত্বাৎ, প্রমাণবিরুদ্ধার্থাভিধানাৎ কৈশ্চিদেব চ ম্লেচ্ছাদিভিঃ পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈঃ পরিগ্রহাদ্বোধ্যং॥"

(সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী ৫)

অর্থ—সাংখ্যকারিকার বিশেষ প্রমাণের লক্ষণে "আপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু" ইহার অর্থাবসরে (অর্থাৎ যুক্ত আপ্তশ্রুতির নাম আপ্তবচন—ইহা স্বতঃ প্রমাণ) আপ্ত শব্দোপাদানদ্বারা অযুক্ত শাক্য শাক্যসিংহমতাবলম্বী বৌদ্ধ বিশেষ, ভিক্ষু—বৌদ্ধ বিশেষ, নিগ্রন্থক মুক্তকচ্ছ, সংসারমোচক, বিবসন, আর্হত প্রভৃতির বাক্য নিষিদ্ধ হইল, অর্থাৎ ইহাদের বাক্য প্রমাণ নহে। কেননা ইহাদের শাস্ত্র নিন্দনীয়,—যেহেতু ইহাদের শাস্ত্রের কোনও মূল নাই, এবং ইহাতে প্রমাণ বিরুদ্ধ অর্থের উপপত্তি করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহাদের বাক্যে কতকগুলি ম্লেচ্ছাদি পশুসদৃশ নীচলোকেই আদর করিয়াছে।

বাচস্পতিমিশ্র এইরূপ তিরস্কার করিয়াছেন।—

আবার মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত বাচস্পতিমিশ্রও শ্রাদ্ধচিন্তামণি গ্রন্থে বৌদ্ধদিগকে নিন্দা করিতে ছাড়েন নাই।—যথা—বায়ুপুরাণে—

"নগ্নাদয়ো ন পশ্যেয়ুঃ শ্রাদ্ধমেবং ব্যবস্থিতং।
প্রতিগচ্ছন্তি তৈর্দৃষ্টান্ পিতৄনথপিতামহান্॥"

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রয়ীসংবরণং যতঃ।
তাং ত্যজন্তি তু যে মোহাত্তে বৈ নগ্নাদয়ো জনাঃ॥"

অর্থ—নগ্ন অর্থাৎ বৌদ্ধ দ্বারা শ্রাদ্ধ দৃষ্ট হইলে পিতৃপিতামহগণ ফিরিয়া যান, কেননা সকলেরই আবরণ বেদ,—না বুঝিয়া যাহারা সেই বেদ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগকে নগ্ন বলা যায়।—যেহেতু তাহারা আশ্রয় হীন হইল।

বেদবিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধদিগকে যে ঋষিগণ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ত অল্পকথা।—শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য মুক্তির সাধন জ্ঞান, কর্ম্ম নহে এই বিশ্বাসে কর্ম্ম প্রতিপাদক শ্রুতি সমূহকে খণ্ডিত করিয়াছেন,—এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময়—সত্য নহে, এই অপরাধে সাংখ্যদর্শন—ধৃত পদ্মপুরাণ শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।—যথা—

পার্ব্বতীর প্রতি শিববাক্য——(বিজ্ঞান ভিক্ষু)
"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥"
"দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
বৌদ্ধ শাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকং॥"
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতং।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে॥
সর্ব্বকর্ম্ম পরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে॥"
"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥"

অর্থ—হে দেবি! ক্রমে তোমাকে তামস অর্থাৎ অজ্ঞানীর শাস্ত্র কহিতেছি।—যাহা অধ্যয়ন করিলে জ্ঞানিগণও পতিত হন। প্রথমতঃ দৈত্যগণের বিনাশার্থ বিষ্ণু বুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া নিকৃষ্ট বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাহাতে নগ্নত্ব ও নিষিদ্ধ নীলবস্ত্র পরিধানের বিধি আছে। হে দেবি আমিই কলিযুগে ব্রাহ্মণরূপ অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য হইয়া মায়াবাদ রূপ নিকৃষ্ট শাস্ত্র আবিষ্কার

করিয়াছি। তাহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলা যায়। আমি শ্রুতি বাক্যের লোক বিগর্হিত বিপরীত অর্থ করিয়া সৎকর্ম্ম ত্যাগের যুক্তি দেখাইয়াছি,—সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছি, জীবাত্মা পরমাত্মার একতা প্রতিপাদন করিয়াছি। হে দেবি! জগৎ সংহারের নিমিত্ত বেদবিরুদ্ধ মায়াবাদ মহাশাস্ত্র রচনা করিয়াছি।

অতএব দেখা যায়,—ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন, আর শিবই হউন বেদ নিন্দা যিনিই করুন না কেন, তাঁহাদিগকেই ঋষিগণ সম্মার্জ্জনীর পুষ্পাঞ্জলীতে পূজা করিয়াছেন; তাহাদিগেরই উপর আর্য্যশাস্ত্র খড়্গ হস্ত, কেননা বেদ ঋষিগণের অতি যত্নের ধন।

যাহা হউক সুপ্রসিদ্ধ দশাবতারের অন্যতম অবতার "বুদ্ধ" সম্বন্ধে সুপ্রচলিত বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র হইতে যতদূর পারিয়াছি সাধক বাধক প্রমাণ উদ্ধার করিলাম।—উহা আমার স্বকপোলকল্পিত নহে, তাহাতে যে বৌদ্ধদিগের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে তাহার জন্য আমি দোষী নহি। তবে আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি—শাস্ত্র অনন্ত, হয়ত কোন না কোনও আর্য্য শাস্ত্রে তদপেক্ষায় বিশেষ প্রমাণ থাকিতে পারে,—অসম্ভব নহে আমি বিতণ্ডার জন্য প্রবৃত্ত হই নাই—তথ্যনির্ণয় করাই আমার মুখ্য লক্ষ্য। এজন্য বুদ্ধ সম্বন্ধে কতকগুলি উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিদ্বজ্জনের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এ সম্বন্ধে আমার ভ্রম প্রমাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। সুধীগণ বিচারপূর্ব্বক তাহার তথ্য নির্ণয় করুন।—আর আমার ধৃষ্টতা; চপলতা ও অপরাধ ক্ষমা করুন—ইহাই সবিনয়ে ভূয়সী প্রার্থনা।

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

প্রবন্ধকার প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের উক্তি সম্বন্ধে অর্বাচীন টীকাকারদিগের ঐতিহাসিক ভ্রমমূলক ব্যাখ্যা প্রমাণরূপে পরিগ্রহ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইহা পণ্ডিতগণ অবশ্য বুঝিতে পারিবেন। রামায়ণোক্ত 'শ্রমণ' শব্দ সাধারণ সন্ন্যাসিগণ' একথা টীকাকারকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই জন্য প্রবন্ধকারের সিদ্ধান্ত অভিযুক্তগণের আদরণীয় হইতে পারে না।-সং—

জীবের স্বাধীনতা বা অদৃষ্টবাদ।

(ধর্ম্ম পূজা)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আচার্য্য উদয়ন এই পর্য্যন্ত বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিতেছেন; এমন সময়ে মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত মুণ্ডিতমস্তক কাষায়বসনপরিধারী প্রশস্তললাট পরমপূজনীয় এক ব্যক্তি অগ্রসর হইলেন। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে তাদৃশ-পরিচ্ছদধারী সেই রূপ প্রতিভা-বিশিষ্ট আরও চারিটি শিষ্য রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবার শিষ্যানুশিষ্য অনেক আছে। পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষের মুখশ্রী দেখিলে,—পুণ্ডরীকসদৃশ নিমেষশূন্য চক্ষুর্দ্বয় দেখিলে,—দৈহিক কমনীয়তা বিলোকন করিলে,—বুঝা যায়, তিনি যেন এই পৃথিবীতে অহিংসা ধর্ম্মের প্রচার করিবার জন্য প্রাদুর্ভূত,—তিনি যেন এই দ্বেষহিংসা-পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ পৃথিবী হইতে দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অসাধু গুণগুলিকে বিতাড়িত করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ,—তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়উৎস হইতে দয়া-নির্ঝরিণীর উদ্ভাবন করিয়া,—তিনি যেন সমস্ত আপ্লাবিত করিবার জন্য ধরাধামে সমাগত,—তিনি যেন এই মরভূমিতে অমরত্ব আনয়ন করিবার জন্য অধিষ্ঠিত। পরদুঃখে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত। পরদুঃখ নিবারণ করিবার জন্য—জাগতিক দুঃখের অপসারণ করিবার জন্য—তিনি অগ্রসর। এই দুঃখ নিবারণের জন্য অনেকেই সচেষ্ট; কিন্তু তাঁহার যেন সর্ব্বাপেক্ষা ব্যগ্রতা অধিক।

তিনি ব্যগ্রভাবে উদয়নকে কি বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন,—এমন সময়ে একটি বাঙ্গালী যুবক আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় পরিচ্ছদবিশিষ্ট অগ্রসর হইয়া, উদয়নাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি, এই মহাপুরুষকে চিনিয়াছেন? ইনি ভগবান্ শাক্যসিংহ। আমাদিগের পুরাণে যে দশাবতারের কথা আছে,—সেই দশাবতারের মধ্যে ইনিই নবম অবতার বুদ্ধদেব। এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত ছিল। এক্ষণে যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের তাদৃশ প্রভাব নাই,

তথাপি ডোম ও পোদ জাতিতে এক্ষণেও বৌদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। ডোম ও পোদেরা ধর্ম্মরাজের পূজা করে। "ধর্ম্মরাজ" বুদ্ধেরই নামান্তর। কাটোয়ার অন্তর্বর্ত্তি পাটুলির নিকট-স্থিত—সোণাগাছীতে একটি "ধর্ম্মরাজের" মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের পুরোহিত ময়রা। অগ্নি-পক্ক না করিয়া "ধর্ম্মরাজের" ভোগ প্রদানের ব্যবস্থা। মূর্ত্তিতে, সিন্দুর-ম্রক্ষিত-প্রস্তর-খণ্ডে অথবা জলপূর্ণ-ঘটে ধর্ম্মরাজের পূজা হইয়া থাকে। প্রস্তর-খণ্ডে কতক-গুলি পিত্তল-শলাকা প্রোথিত থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাস—সেইগুলি দেবতার চক্ষুঃ। নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা শিব বলিয়া তাহার পূজা করে। ধর্ম্মরাজের মন্ত্র—"যাঁহার অন্ত নাই, আদি নাই, মধ্য নাই, যাঁহার হস্ত নাই, পদ নাই, যাঁহার শরীর নাই, আকৃতি নাই, জন্ম নাই, সেই যোগীন্দ্র, যাঁহাকে একমাত্র জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি সমস্ত মনুষ্যের বন্ধু, সমস্ত জীবের রক্ষক,—যিনি সত্য ও নির্দ্দোষ, যিনি মানুষের বরদাতা, যিনি আকৃতিশূন্য—তিনিই তোমাদিগকে রক্ষা করুন।" মন্ত্রস্থ শব্দগুলি দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহার শূন্যত্ব ধর্ম্ম, এবং জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়,—অর্চ্চনা দ্বারা নহে। ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় যে, মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা ধর্ম্মরাজ (বুদ্ধ)—বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রতিমা—কোন স্বতন্ত্র দেবতার প্রতিমা নহে। মুক্তাত্ম-মনুষ্যদিগের প্রতিমূর্ত্তি। সেই প্রতিমূর্ত্তিগুলিই পূজিত হয়। অগ্নি-পক্ক বস্তু ভক্ষণ করিলে, তাহা অপবিত্র (উচ্ছিষ্ট) হয়, সুতরাং বৌদ্ধমূর্ত্তির উদ্দেশে অগ্নি-পক্ক ভোজ্য প্রদানের ব্যবস্থা নাই। সেই পূজনীয় দেবতা ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ, ইহাও একটি তাহার প্রমাণ।

লামা তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন ডোমাচার্য্য—ত্রিপুরাবাসীদিগের নিকট "ধর্ম্ম" নামে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎকালে তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য হয়। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম—ত্রিপুরা, বঙ্গ ও রাঢ়দেশের অধিবাসি-কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। ধর্ম্মের পূজাদ্বারা বজ্রযোগিনী, বজ্রবারাহী, বজ্রভৈরব (ক্ষেত্রপাল) বজ্রডাকিনী, নাথ এবং এইরূপ অন্যান্য বৌদ্ধ দেবতার পূজা বুঝায়। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের ধার্ম্মিক রক্ষক দিক্‌পাল ও ধর্ম্মপালেরাই বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদিগেব পূজার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান

সময়েও ক্ষেত্রপালের পূজা এতদ্দেশে রহিয়াছে। কোন বৃক্ষবিশেষ ক্ষেত্রপালের প্রতিনিধিত্বে পরিগৃহীত হইয়াছে। যে ভূমিখণ্ডে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই ভূমির মৃত্তিকার বন্ধ্য-দোষ নিবারণের অথবা পুত্র-সন্তান-প্রদানের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। এইরূপ একটি বৃক্ষ, কলিকাতার নিকটবর্ত্তি-খড়দহে এবং অন্য একটি বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী শিঙ্গীতে আছে। অধিকাংশ ধর্ম্ম-মন্দিরেরই পুরোহিত কোন কোন পীড়ায় "অব্যর্থ ঔষধ" বলিয়া ঔষধ প্রদান করে। ধর্ম্ম-প্রতিমার সহিত প্রায়ই শীতলা এবং অন্যান্য রোগনিবারণ-কারি-নীচ-শ্রেণীর দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়"। *

---

* "In a paper read before the Asiatic Society in January 1895 Mahámahopádhyáya Haraprasad Sastri pointed out that there are survivals of the later form of Tantric Buddhism in the religious beliefs of some of the lower castes and especially of the *Doms* and *Pods*, from whose ranks the priest is usually recruited. It chiefly takes the form of the worship of Dharma Raja, which is one of the names of Buddha. There is, for instance, a Dharma temple at Songachhi near Patuli in the Katwa Subdivision of Burdwan, the priest of which belongs to the Mayra caste.

The Mantra by which Dharma Raja is meditated on is—

He who has no end, no beginning and no middle, he who has neither hands nor legs, who has no germ of body; he who has no form, no primordial form; he who has no birth; that Yogindra, approachable by knowledge, friendly to all men, one protector of all creatures, the true, the spotless, the giver of boons to mortal men, whose form is emptiness or void; may he protect you.

His atribute of emptiness; his accessibility by knowledge,not worship, and his title of Yogindra, all point to Dharma Raja being Buddha. The fact that cooked food is not offered, goes in the same direction. Buddhist and Jain idols are regarded as emancipated men rather than as deities; consequently cooked food, which becomes unclean when eaten by men, is never offered to them.

In Lama Táránáth's history of Buddhism, it is stated that a certain Domácháryya "preached the Tantrik doctrine of Buddhism, called Dharma, to the people of Tippera, and obtained numerous followers. The Dharma Buddhism, in its Tantrik phase, became greatly honoured and followed by the people of Bengal, Rarh, and Tippera. By the worship of Dharma is meant that of the Buddhist deities, such as Vajra-Yogini; Vajra-Váráhi; Vajra-Bhairava (Khetrapála). Vajra Dákini; the Natha, and so on. In fact, in latter days of Buddhism, the Dik-pálas and Dharmapálas and other Spiritual protectors of Buddhism, became the object of worship to the exclusion of the Buddhas and Bodhisattvas."

Kshetrapála is worshipped. It is represented by some tree. The earth on which it grows has the miraculous power of removing barrenness or of giving male offspring. There is one such tree at Khardaha near Calcutta and another at Singi in Burdwan.

At most of the Dharma temples the priest administers some sort of medicine as a specific for some disease, and the idol of Dharma is frequently associated with Sitalá or some other godling of disease. The deity is sometimes worshipped in temples sometimes under trees, and sometimes in the open air. Sometimes an image, sometimes a piece of stone covered with vermillion, and sometimes an earthen pot filled with water represent the deity. Taps or brass nails driven through the stone is a principal feature. The nail heads represent, they say, the eye of the deity. Brahmans are allowed to enter the temple, and sometimes a low class Brahman makes votive offerings to Dharma as Siva on behalf of other Brahmans.

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাঙ্গালী বাবু আরও বলিলেন যে, "আপনি যাঁহার ধর্ম্মমত খণ্ডন করিবার উদ্দেশে "বৌদ্ধাধিকার" * নামক পুস্তকের প্রণয়ন করিয়াছেন, ইনি সেই বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ"। আচার্য্য উদয়নকে সম্বোধন করিয়া উপাধ্যায় গঙ্গেশ বলিলেন, "সাবধান উদয়ন, বাঙ্গালী বাবুর সহিত অতি সাবধানে কথা কহিও, চার্ব্বাক বা বুদ্ধের সহিত কথা কহা সহজ, আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহিত কথা কহা সহজ নয়। জগতে যাহা প্রচলিত, গ্রন্থকার নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলীবাবু তাহা বিশ্বাস করেন

---

* কোন এক সময়ে মাননীয় মহামহোপাধ্যায় কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ,এম, এ মহাশয় ৺কাশীধামে গিয়াছিলেন; কাশীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক ন্যায়াদি সর্ব্বদর্শনে মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে কথা-প্রসঙ্গে "বৌদ্ধাধিকারের" নাম "বৌদ্ধ-ধিক্কার" বলিয়াছিলেন। নব্য ন্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার গদাধর ভট্টাচার্য্য কিন্তু "বৌদ্ধাধিকারেব" টীকা লিখিতে গিয়া "বৌদ্ধাধিকারবিবৃতি" লিখিয়াছেন। শাস্ত্রি-মহাশয়ের মতে বোধ হয়, "বৌদ্ধাধিকার" কর্ত্তিত করিয়া "বৌদ্ধধিক্কারবিবৃতি" করা উচিত। ছন্দ যায়, যাউক।

না, শিক্ষিত বাঙ্গালী কেবল কল্পনার ভিত্তি অবলম্বন করিয়া জগতের সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই কল্পনাই তোমার চিরপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাধিকারকে "বৌদ্ধধিকার" নাম প্রদান করিয়াছেন। "বৌদ্ধধিক্কার" নাম শুনিয়া একটি কবিরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত একখানি তালিকার কথা আমার মনে পড়িল। কোন এক কবিরাজ কোন এক রোগে একখানি পাচনের তালিকায় তেজপত্র (তেজপাত) লিখিতে গিয়া "ত্যাজ্যপত্র" লিখিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, "তেজপাতের" সংস্কৃত অবশ্যই "ত্যাজ্যপত্র" হওয়াই উচিত, এবং তাহাই ঠিক"। শিক্ষিত বাঙ্গালীর যুক্তিমতে (কল্পনাবলে) "কালিদাস" কালিদাস নহেন। "মাতৃগুপ্ত" কালিদাসের আসন অধিকার করিয়াছেন। যদিও "ঋতুসংহারে" "ইতি শ্রীকালিদাসবিরচিতং" আছে; যদিও তুমি পিতামহীর মুখে "অস্তি কশ্চিদ্-বাগ্ বিশেষঃ" শুনিয়াছিলে, তথাপি তাহা কালিদাসের নহে; শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট কালিদাসের লেখনী, ঋতুসংহারে কালিদাসের মত ভাবের ও শব্দ-গ্রন্থনের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আবাল্য তুমি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছ, আবাল্য আমি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছি; তুমি আমি না বুঝিলেও, শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝিতে পারেন, এই শব্দগ্রন্থনের তারতম্য। এই তারতম্য আছে বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়, "পুরুষসূক্ত" বৈদিক ঋষিপ্রণীত সূক্ত নহে, ইহা অনেক পরে জাতিভেদের সৃষ্টির পরে ঋগ্বেদে সংযোজিত। এই তারতম্য আছে বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়, "মহাভারত" এক সময় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। মহাভারতে তিনটি স্তর আছে, এক একটি স্তর, বিভিন্ন সময়ে রচিত এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতা। হয়ত ইহাঁদের যুক্তি যে, তোমার গ্রন্থ, আমার বলিয়া পরিচিত হইবে, আমার গ্রন্থ, তোমার বলিয়া পরিচিত হইবে, হয়ত তুমি আমি হইবে, আমি তুমি হইব। এই জন্য বলিতেছি, অতি সাবধানে কথা কহিবে। উদয়ন, গঙ্গেশের কথায় ঈষদ্ধাস্য করিয়া বাঙ্গালী বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সংগ্রহ করা আমার শক্তির অতীত। ইতিহাসের আবিষ্কারে আপনারাই সমর্থ। যদিও আমার এ বিষয়ে সামর্থ্য নাই, তথাপি একবার দেখা আবশ্যক, আপনার এই মত কত দূর প্রমাণসহ। আপনার আবিষ্কৃত বৌদ্ধ

ধর্ম্মের ইতিহাস যে গুলি, প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে, দেখা আবশ্যক, সেই প্রমাণবলে আপনার ইতিহাসের স্থাপন হয় কি না। আপনার মতে বিষ্ণুর নবম অবতার ভগবান্ বুদ্ধদেবই শাক্যসিংহ। এতদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন। বুদ্ধদেবই শাক্যসিংহ, ইহার প্রমাণ কি? বৌদ্ধ অমরসিংহ "নামলিঙ্গানুশাসনং" নামক অভিধানে বুদ্ধদেবের নাম কীর্ত্তন করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ। সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ। ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ। মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু সঃ। স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ"। যদি শাক্যসিংহ ও বুদ্ধদেব অভিন্ন হয়েন; তবে অমরসিংহ "তিনিই শাক্যমুনি, তিনিই শাক্যসিংহ,—তিনিই শুদ্ধোদনের পুত্র শৌদ্ধোদনি, তিনিই মায়াদেবীর পুত্র—এত "তিনি" "তিনি" বলিলেন কেন? অন্য দেবতার নাম কীর্ত্তন করিতে যাইয়া কৈ "তিনি" (সঃ) "তিনি" (সঃ) কীর্ত্তন করিয়াছেন? প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলাতে—শপথ করিয়া—বলাতে সন্দেহ আসিয়াছে। অমরসিংহেরসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক গুরু—শাক্যসিংহ। সুতরাং অমরসিংহের নিকট শাক্যসিংহ বুদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইবেন আশ্চর্য্য কি? এইভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকটে চৈতন্যদেবের, ন্যায় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নিকটে শাক্যসিংহ বুদ্ধের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আবার পক্ষান্তরে অমরসিংহ যে "ত্বন্তাথাদি ন পূর্ব্বভাক্" অর্থাৎ "তু" অন্তে আছে, অথবা "অথ" আদিতে আছে যাহার, সে শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তি শব্দার্থের বাচক নহে বলিয়া গ্রন্থের আদিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; সেই নিয়মানুসারে বিচার করিলে বুঝা যায়, শাক্যমুনি ও শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব হইতে ভিন্ন। কারণ, "শাক্যমুনির" পর "তু" আছে। "শাক্যমুনিস্তু" শব্দের পরে "তু" আছে, সুতরাং "শাক্যমুনি" ও "শাক্যসিংহ" বুদ্ধদেবেয় নাম নহে। ডোম ও পোদেরা "ধর্ম্মরাজের" পূজা করে। কি করিয়া জানিলেন উহা বুদ্ধের পূজা! বুদ্ধের তালিকায় অবশ্য "ধর্ম্মরাজ" শব্দও আছে; সেই, জন্যই কি "ধর্ম্মরাজের" পূজা অর্থে বুদ্ধের পূজা স্থির করিলেন! চতুর্থী তিথিতে "বিনায়কনামক ব্রতের" বিধান আছে। এই ব্রতে "বিনায়কের" (গণেশের) পূজা করিবে, স্পষ্টতঃ শাস্ত্রে আছে, কাশীক্ষেত্রে এই সময়ে গণেশ পূজার

বড়ই ধূম। এই উৎসব উপলক্ষে সে স্থানে গণেশের অনেক প্রতিমূর্ত্তি বিক্রীত হয়। বুদ্ধদেবের নামের তালিকায় "ধর্ম্মরাজ" শব্দের মত "বিনায়ক" শব্দও স্থান পাইয়াছে। আবার গণেশের নামের তালিকাতেও "বিনায়ক" শব্দ প্রবেশাধিকার লাভ কয়িয়াছে। আপনি যদি বিনায়ক পূজাতেও আপনার সেই গণেষণা-পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে আমার আর বলিবার কিছুই থাকিত না। প্রতিদিন, বিশেষতঃ, দীপান্বিতার পূর্ব্ববর্ত্তি চতুর্দ্দশীতে যমতর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে (১)। সেই মন্ত্রে "ধর্ম্মরাজের" তর্পণ আছে; আপনার মতে হয়ত তাহাও বুদ্ধদেবের তর্পণ! তবে আর ডোম ও পোদজাতির মধ্যে বুদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে, বলেন কেন? ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম্ম অধিকার লাভ করিয়াছে, এইরূপ বলুন। আশ্চর্য্যের বিষয়—বৌদ্ধ অমরসিংহ, যমের নামের তালিকাতেও "ধর্ম্মরাজ" শব্দ প্রয়োগ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, তিনি "ধর্ম্মরাজঃ পিতৃপতিঃ সমবর্ত্তী পরেতরাট্" ইত্যাদি বলিয়াছেন। জৈন হেমচন্দ্রও "হর্য্যন্তক-ধর্ম্মরাজঃ" ইত্যাদি বলিয়া যমের পর্য্যায়ে "ধর্ম্মরাজ" শব্দের কীর্ত্তন করিয়াছেন। মনুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক (২) দেখিলে বোঝা যায়, মহর্ষি মনুর সময়েও যম অর্থে ধর্ম্মরাজ শব্দ ব্যবহৃত হইত। সুতরাং ধর্ম্মরাজের পূজা অর্থে যমের পূজা নয় কি করিয়া বুঝিব? অধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও মহাভারত-কার "ধর্ম্মরাজ" শব্দে (৩) অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতেও যে মনুর ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। রঙ্গপুরেও ধর্ম্মরাজের পূজা প্রচলিত আছে। বৈশাখ মাসের রবিবারে অতি প্রত্যূষে প্রাতঃস্নান করিয়া সূর্য্যাভিমুখে ধর্ম্মরাজের পূজা করিয়া থাকে। ধর্ম্মরাজের সেই পূজায় সূর্য্যের মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। রঙ্গপুর অবশ্য লক্ষণা করিয়া যমের পিতা সূর্য্যে "ধর্ম্ম-রাজ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ পুরোহিতের কার্য্য

(১) ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ। তিথিতত্ত্বধৃতলিঙ্গপুরাণ। "যমায় ধর্ম্মরাজায়" ইত্যাদি মন্ত্র।

(২)—সোহর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।

(৩) তমব্রবীদ্ধর্ম্মরাজঃ প্রহস্য। বিরাটপর্ব্ব। ৬৭ অঃ।

করিলে পূজনীয় দেবতা বুদ্ধ হইবেন, ইহারই বা প্রমাণ কি? ডোম, হাড়ী, বাগ্‌দি প্রভৃতি নীচ জাতির পুরোহিত সেই সেই জাতি। সেই সেই নীচ জাতীয় পুরোহিতেরাই সেই সেই নীচ জাতীয় যজমানের সমস্ত পূজা ও সংস্কার কর্ম্মে পৌরোহিত্য করে। দিনাজপুরে হাড়ীর স্থাপিত একটি কালীমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। অদ্যাপি তাহার পূজা হাড়ী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। সুতরাং ময়রা পুরোহিত বলিয়া "ধর্ম্মরাজ" 'বুদ্ধ' এবিষয়ে প্রমাণ নাই। আপনার অনুমানে হেতু নাই। যে হেতু প্রদর্শন করিতে আপনি ইচ্ছুক, তাহাও সদ্ধেতু নহে। আমি নৈয়ায়িক, প্রমাণ ভিন্ন প্রমেয় স্থাপন দেখিলে বিস্মিত হই। আপনিও বাঙ্গালী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, আপনার পূর্ব্ববর্ত্তি-বংশে অনেক খ্যাতনামা নৈয়ায়িক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার মুখে ন্যায়বিরুদ্ধ কথা শুনিলে দুঃখিত হইতে হয়। মূর্ত্তিতে পূজা, সিন্দূর-ম্রক্ষিত প্রস্তর খণ্ডে পূজা, জলপূর্ণ ঘটে পূজা এ গুলিও কি বুদ্ধ পূজার পরিচায়ক? শারদীয়া দুর্গাপূজাতে আমরা সমস্তই দেখিতে পাই, মূর্ত্তি আছে, জলপূর্ণ ঘট আছে, আবার অনেক স্থানে শালগ্রাম শিলাও আনীত হয়। বাকী কেবল সিন্দূর ম্রক্ষণ। সিন্দুর ম্রক্ষণ হইয়াছে বলিয়া প্রস্তর খণ্ডের পূজ্যতা হইয়াছে? না— প্রস্তর খণ্ডে পূজ্যতা আছে বলিয়াই উহাতে সিন্দুর ম্রক্ষণ হইয়াছে! আপনার এইরূপ নৈয়ায়িকতা দেখিলে জগৎ বিস্মিত হইবে, সন্দেহ নাই। নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণে "শিব" বলিয়া পূজা করে, নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণে পূজা করে; অতএব "ধর্ম্মরাজ" বুদ্ধ? না "শিব" বলিয়া পূজা করে, অতএব "ধর্ম্মরাজ" বুদ্ধ? অথবা নীচশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজা ও শিব বলিয়া পূজা এই উভয় ধর্ম্ম আছে বলিয়া ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ? একবার নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যে গ্রামে তাঁহার বিধবা শ্যালিকা অন্নপূর্ণা দেবী বাস করেন, সেই গ্রামে গিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা, ভগিনীপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। অভিমান-ভরে অন্নপূর্ণা, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলিলেন, "বিদ্যারত্ন, তুমি কত বার এই নিমন্ত্রণে আসিয়াছ, কৈ আমার সঙ্গে দেখা কর নাই, এই কি তোমার সজ্জনতা?" বিদ্যারত্ন বলিলেন, "কৈ আমি ত কখনও এ গ্রামে আসি নাই।" অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমি একটী পণ্ডিতকে আসিতে দেখিয়াছি, সেই পণ্ডিতের একটি নস্যধানী ছিল, ও মাথা নেড়া ছিল; সুতরাং

তুমি ভিন্ন আর কে হইবে ?” ভুবনমোহন বিত্থারত্ন হাসিয়া বলিলেন, “নস্যধানী থাকিলে যদি আমি হই, তবে হাতি-বাগানের চন্দ্র চূড়ামণিরও নস্যধানী আছে, স্থতরাং সে চন্দ্র চূড়ামণি নয়, সে আমি; আর যদি নেড়া মাথা হইলে আমি হই, তবে রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন নহে, সে আমি। আর যদি নস্যধানী ও নেড়া মাথা উভয় থাকিলে আমি হই, তবে আর রাখালদাস ন্যায়রত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন বলিয়া দাবি করিতে পারেন না, তিনিও আমি হইয়া যাই।” বৌদ্ধ ধর্ম্মে অন্য দেবতা নাই, মুক্তাত্মারাই দেবতা বলিয়া পূজিত হয়েন। অগ্নিপক্ক বস্তু এক জনে আহার করিলে অন্যের পক্ষে তাহা অপবিত্র হয়। ধর্ম্মরাজ-পূজায় অগ্নি-পক্ক বস্তু প্রদান করে না, অপক্ক বস্তু প্রদান করে, এ জন্য ধর্ম্মরাজ বুদ্ধ; কারণ সেই প্রসাদ সকলে ভক্ষণ করিবে। আপনি এই মত প্রকাশ করিয়া ন্যায়-শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতার একশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অপক্ক হইলে উচ্ছিষ্ট হয় না, আপনি কোন শাস্ত্রে পাইলেন ? প্রায়শ্চিত্তবিবেকে “পীতশেষ-জল-পানে” (১) পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। শূদ্র যে পক্কান্ন দেবতাকে দিবে না, শাস্ত্র আছে (২) আপনার কি তাহাও অবিদিত !!! নীচ বর্ণের তো কথাই নাই। আপনার আর এক প্রমাণ—ধর্ম্মরাজের মন্ত্র। নৈয়ায়িকেরা আত্মা ও ঈশ্বর উভয়কেই নিরবয়ব বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের শরীর নাই। কাজে কাজেই হস্ত, পদ ও আকৃতি নাই। উভয়কেই বিভু বলিয়াছেন; স্থতরাং তাঁহাদিগের আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না। “স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ” মিত্যাদি ঈশোপনিষৎ শ্রুতি, “অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং মহান্তং বিভুমাত্মানমিত্যাদি”—কঠ-শ্রুতি, “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধ-বচ্চ যৎ অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং” ইত্যাদি কঠশ্রুতি, “তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং” প্রশ্নোপনিষৎ। “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ” মুণ্ডকোপনিষৎ। “প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ” কঠোপনিষৎ। “বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে” ঈশোপনিষৎ। এই সকল উপনিষদের প্রতিপাদ্যও কি বুদ্ধদেব ? ধর্ম্মরাজের মন্ত্রে যাহা আছে, এই সকল উপনিষদেও অবিকল তাহাই আছে। তপস্যা বা অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। এক্ষণে কি বলিতে চাহেন ! উপনিষদে যাঁহার গুণবর্ণনা আছে, তিনিও আর কেহ নহেন—তিনি বুদ্ধদেব ! মহাদেবের বর্ণনে অনেক স্থলে “যোগীন্দ্র” বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণকেও “যোগীশ্বর” বলা হইয়াছে। আর কত কি বলিব ? আপনি “ধর্ম্মরাজ” বলিতে বলিতে, “ধর্ম্মপাল” বলিয়া ফেলিলেন। আবার আপনার কথায় বুঝা যায়, “ধর্ম্মরাজ” বুদ্ধ নহেন, ইনি “ধর্ম্মপাল” (বৌদ্ধ ধর্ম্মের রক্ষয়িতা)। আপনি বোধ হয়, কয়েক দিন পরে আরও বলিবেন, শাস্ত্রে যে রামচন্দ্রের পূজা আছে, রামচন্দ্রের মন্ত্র লইবার ব্যবস্থা আছে, এ রামচন্দ্র, আর কেহ নহেন, ইনি ‘রামপাল’। (আজও পূর্ব্ববঙ্গে “রামপাল” নামে যাঁহার দীর্ঘিকা বিদ্যমান রহিয়াছে)। দিকৃপাল, ক্ষেত্রপাল, বজ্রযোগিনী, বজ্রডাকিনী প্রভৃতিও কি আপনার মতে মানুষ ! ধর্ম্মপালের মত পালবংশীয় রাজা ও রাণী ? ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে যেমন বিলাতের পণ্ডিতেরা “মিত্রাবরুণের” সহিত ও “মৈত্রেয়” ঋষির সহিত শব্দাংশের মিল আছে বলিয়া, ব্রাহ্মণ স্থির করিয়াছিলেন ! আপনিও কি সেইরূপ ক্ষেত্রপাল ও দিকৃপালে “পাল” শব্দ আছে বলিয়া তাহাদিগকে পালবংশীয় রাজা স্থির করিলেন ? “ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতিঃ * * * পূর্ব্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ” আমরা তো ইন্দ্রাদি দেবতাকে দিকৃপাল জানি, অনেক কার্য্যে ক্ষেত্রপালের পূজা হইয়া থাকে। এক বার “জ্যোতিষ্‌তত্ত্ব” দেখিবেন। “ক্ষেত্রপাল বৃক্ষ যাহাতে জন্মে; সেই মৃত্তিকা বন্ধ্যাদোষ নাশ করিতে পারে, পুত্র সন্তান প্রদান করিতে পারে।” আপনার এই বাক্যের মর্ম্মার্থ কি ? পুত্র সন্তান প্রদান করিলেই তো বন্ধ্যাদোষ নাশ হয়, আবার বন্ধ্যাদোষ নাশ করিতে পারে, বলিবার তাৎপর্য্য কি ? বন্ধ্যাদোষ নাশ করে; ইহার অর্থ—কন্যা প্রদান করিয়া অথবা পুত্র প্রদান করিয়া বন্ধ্যাদোষ

(১) গ্রাসশেষন্তু নাশ্নীয়াৎ পীতশেষং পিবেন্ন তু। প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ।
পীতাবশেষিতং পীত্বা পানীয়ং ব্রাহ্মণঃ ক্বচিৎ।
ত্রিরাত্রন্তু ব্রতং কুর্য্যাৎ।—প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত শঙ্খ।

(২) ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং।—তিথিতত্ত্বধৃত।

নাশ করে? আচ্ছা, তাহা হইলেও পুত্র প্রদান করিতে পারে, ইহার আর কিছু তাৎপর্য্য থাকে না। কারণ, বন্ধ্যাদোষ নাশের মধ্যেই তো পুত্র প্রদান ও কন্যা প্রদান আছে! আবার পুত্র প্রদান পদের প্রয়োগ কেন? ফলে, আপনার নৈয়ায়িকতা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। আর আপনার সহিত বিচার করিতে ইচ্ছা নাই। এক্ষণে বৌদ্ধদিগের সহিত দুই এক কথা বলা আবশ্যক।

ক্রমশঃ

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

পঞ্চাঙ্গতত্ত্ব বা কাল-সমীক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নমু গ্রহানয়নমার্ষশাস্ত্রাদেব কর্ত্তুং যুজ্যতে ন তু মানুষ্যাৎ তস্যাযার্থ্যাদিতি চেৎ সত্যং গ্রহানয়নং মুনিকৃতশাস্ত্রাদেব কর্ত্তুমুচিতং পরং তত্রাপি কালবশেনান্তরং পততি।

উক্তঞ্চ সূর্য্যসিদ্ধান্তে—

শাস্ত্রমাদ্যং তদেবেদং যৎ পূর্ব্বং প্রাহ ভাস্করঃ।
যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলম্॥

বশিষ্ঠসিদ্ধান্তেঽপি—

ইত্থং মাণ্ডব্যসংক্ষেপাদুক্তং শাস্ত্রং ময়োদিতং।
বিস্রস্তী রবিচন্দ্রাদ্যে ভবিষ্যতি যুগে যুগে॥—(মূল)।
বিস্রংসনং বিস্রাস্তিঃ শিথিলত্বমতি যাবৎ।—(টীকা)।

তদন্তরং বীজসংজ্ঞং ব্রহ্মগুপ্ত-মকরন্দমিশ্রাদিভি র্নলিকা-বেধেন স্বসত্ত্বাকালে লক্ষয়িত্বা মুনিশাস্ত্রজেষু গ্রহেষু সংস্কৃতং যত্নুক্তমেব।

তথাচ ব্রহ্মসিদ্ধান্তে।

সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি-যন্ত্রেভ্যঃ।
তৎসংস্কৃতগ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ॥

উক্তঞ্চ—

জ্যোতির্ম্মহানিবন্ধে

জাতকাদিষু সর্ব্বত্র গ্রহৈর্জ্ঞানং প্রজায়তে।
তস্মাৎ গণিতদৃক্তুল্যাৎ স্বতন্ত্রাৎ সাধয়েদ্ গ্রহান্॥
বিবাহে বিগ্রহে যাত্রা-প্রশ্নকাল-ব্রতাদিষু।
জ্যোতিঃশাস্ত্রাৎ ফলং সর্ব্বং প্রস্ফুটদ্যুচরাশ্রয়ম্॥

গণেশদৈবজ্ঞ প্রভৃতি আচার্য্যগণ, দৃগ্‌গণিতৈক্যের অনুরোধে তিথ্যাদি-সাধনের গণিত পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। (১৬)

ধর্ম্মকার্য্যের মূলীভূত তিথ্যাদি সাধনের গণিত তাঁহারা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কেন? গড্ডলিকা-প্রবাহে পতিত না হইয়া বিবেকের আশ্রয় লইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, তাঁহারা আকাশের চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থানের সহিত গণিত-সিদ্ধ চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থানের একতা না দেখিয়া, বশিষ্ঠ ও ব্রহ্মা প্রভৃতির বচনের আশ্রয়ে যেরূপ পরিবর্ত্তন করিলে, ঠিক অবস্থান নির্ণীত হয়, তদর্থই চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষণে যে, শত গ্রন্থ আশ্রয়ে গণনা করিলে শতপ্রকার তিথির উৎপত্তি হয় এবং শত পঞ্জিকা দর্শন করিলে যে, শতপ্রকার তিথির দণ্ড

তথাচ বশিষ্ঠঃ

যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যকম্।
দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদি-নির্ণয়ম্॥
কিং তেনাপি সুবর্ণেন কর্ণঘাতং করোতি যৎ।
তথা কিং তেন শাস্ত্রেণ যন্ন প্রত্যক্ষতঃ স্ফুটম্॥

(১৬) ব্রহ্মাচার্য্য-বশিষ্ঠ-কশ্যপমুখৈ র্যৎথেটকর্ম্মোদিতং তত্তৎ কালক্রমেব তথ্যমথ তদ্ভূরি ক্ষণেভুচ্ শ্লথম্। প্রাপাতোঽথ ময়াসুরঃ কৃতযুগান্তেঽর্কাৎ স্ফুটং তোষিতাৎ। তচ্চাস্তি স্ম কলৌ তু সান্তরমথাভূচ্চারু-পারাশরঃ। তজ্জ্ঞাস্বার্য্যভট্টঃ খিলং বহুতিথে কালেঽকরোৎ প্রস্ফুটং।, তৎ ভ্রস্তং কিল দুর্গসিংহ-মিহিরাদ্যৈস্তন্নিবদ্ধং স্ফুটং। শ্রীকেশবঃ স্ফুটতরং কৃতবান্ হি সৌরার্য্যাসন্নমেতদপি ষষ্টিমিতে গতেঽব্দে। দৃষ্ট্বা শ্লথং কিমপি তত্তনয়ো গণেশঃ স্পষ্টং যথা স্বকৃতদৃগ্‌গণিতৈক্যমত্র॥—বৃহত্তিথিচিন্তামণি।

ও পল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি? বিবেকের সাহায্যে অবশ্যই বুঝা যায় যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ, যখন যেরূপ পরিবর্ত্তন করিলে, আকাশের চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত মিল হয়, মনে করিয়াছেন,—তখন তাঁহারা, সেইরূপই পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে কোন দেশের পঞ্জিকার তিথির সহিত অন্য দেশের পঞ্জিকার তিথি, দেশান্তর-জন্য সংস্কারাদি করিলেও, মিল হয় না। কিন্তু জগতে তিথির অন্ত একই। কোন পণ্ডিতের কথায় বা কোন পুস্তকের মধ্যে তাহা নিবদ্ধ নাই। চক্ষুরুন্মীলন করিলে কে না বলিবে যে, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষই, একমাত্র পথ-প্রদর্শক। প্রত্যক্ষ, যাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তাহাই প্রমাণ। প্রাচীন মহর্ষিগণ এ বিষয়ের মীমাংসা এই রূপই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠেই বলিয়াছেন যে, যে গণিতের ফল, আকাশে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রমাণ (১৭)। তাহাই তিথ্যাদি-নিরূপণে মান্য। তাঁহারা ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রহ-গণিতের কোন পুস্তক, চির-কাল এক প্রকারে চলিতে পারে না। সময়ের পরিবর্ত্তন অনুসারে গ্রহগতির বৈলক্ষণ্য হয়; তদনুসারে গণিত-পুস্তকের পরিবর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য। যে গণিতের ফল,—গ্রহণ, গ্রহযুতি, ভেদযোগ, নক্ষত্রযোগ প্রভৃতি, আকাশে ঠিক্ ঠিক্ মিলে, সেই গণিতই যথার্থ। তাহার আশ্রয়েই তিথ্যাদি নির্ণয় করিতে হয়। ইহার অন্যথা করিলে অশাস্ত্রীয় ও স্বেচ্ছাচার করা হয়। ইহা সুব্যক্তই আছে।

---

(১৭) যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যকং।
দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাত্তিথ্যাদি-নির্ণয়ং ॥——বশিষ্ঠ।
সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি-যন্ত্রেভ্যঃ।
তৎসংস্কৃত-গ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ ॥—ব্রহ্মা।
আগমাদনুমানাচ্চ প্রত্যক্ষাদুপপত্তিতঃ।
পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত্যা শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা।
চক্ষুঃ শাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতে বুদ্ধিরুত্তমা।
পঞ্চৈতে হেতবো জ্ঞেয়া জ্যোতির্গণ-বিচিন্তনে ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

তথাপি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় যে—দিনমান, লগ্ন, সায়ন-সংক্রান্তি, গ্রহণ, গ্রহযুতি প্রভৃতি শুদ্ধ গণিতের আশ্রয় করিয়া ও তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতি অপরিবর্ত্তিত—সুতরাং অশুদ্ধ সূর্য্য-সিদ্ধান্তের অঙ্ক-মাত্র আশ্রয়—করিয়া করিতে বলেন, তাহাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। কতকগুলি অশুদ্ধ করিব, আর কতক কতকগুলি শুদ্ধ করিব, ইহা নিতান্ত স্বেচ্ছাচার। কোন মুনিই এরূপ বিধান করেন নাই যে, কতক অংশ শুদ্ধ কর, আর কতক অংশ অশুদ্ধ রাখ। অপিচ কোন মহর্ষিই শুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন নাই। প্রত্যুত, ব্রহ্মা-বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ শুদ্ধ করিতে বিধি করিয়াছেন। তখন শুদ্ধ না করিব কেন?

আরও বিচার্য্য এই যে, স্পষ্ট চন্দ্র ও সূর্য্যের ভোগের অন্তর ১২ অংশ তিথি। যে গণিতক্রিয়া দৃক্তুল্য নয়, তাহা স্পষ্টীকরণ নয় (১৮)। বাস্তবিক চন্দ্র-সূর্য্যের ভোগ নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যেই গণিত (১৯)। বশিষ্ঠ ও ব্রহ্মা প্রভৃতি বাস্তবিক ভোগ নির্ণয় করিয়া তিথ্যাদি স্থির করিতে বিধি করিয়া

শিররহস্য-সৌরপুরাণয়োঃ।
জ্ঞাত্বৈবং সূর্য্য-চন্দ্রাভ্যাং তিথিং স্ফুটতরাং ব্রতী।
একাদশীং তৃতীয়াঞ্চ ষষ্ঠীং চোপবসেৎ সদা ॥
হেমাদ্রি।

(১৮) অতঃ কুমধ্যাদ্ গত থার্দ্ধসূত্রে দৃক্তুল্যতামেতি নভশ্চরো যঃ।
স এব শুদ্ধঃ পরমার্থতঃ স্যাৎ স্ফুটস্ততোঽন্যে বিহগাস্ত্বতথ্যাঃ।
ভূপৃষ্ঠং সর্ব্বদেশানাং মধ্যমেব যতঃ সমং।
তত্তুল্য খেচরানীতং তিথ্যাদ্যেব বরং ততঃ ॥
বীজোপনয়-গ্রন্থ।

(১৯) তত্তদ্ গতিবশান্নিত্যং যথাদৃক্তুল্যতাং গ্রহাঃ ॥
প্রযান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ ॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

স্ফুটক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্যকৃদ্ যা ॥
সিদ্ধান্তশিরোমণি।

ছেন। বাস্তবিক ভোগ নির্ণয় না করিয়া তিথি সাধন কর, এরূপ বিধি কোন শাস্ত্রে নাই। আর কোন মহর্ষিই বাস্তবিক ভোগ স্থির করিতে নিষেধ করেন নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তে গণিতের পরিবর্ত্তনের কথা দেখিতে পাওয়া যায় (২০)। এই কারণে প্রাচীন কালের ও বর্ত্তমান কালের প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণিতের আশ্রয়ীভূত পরীক্ষালব্ধ ফলস্বরূপ অঙ্কগুলি এক নহে (২১)।

(২০) শাস্ত্রমাদ্যং তদেবেদং যৎ পূর্ব্বং প্রাহ ভাস্করঃ।
যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলং॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(২১) এতেন সর্ব্বেণ প্রায়ো বরাহমিহির-কালিক-
সূর্য্যসিদ্ধান্তীয়া ভৌমাদি-ভগণা মহাযুগীয়-সাবন-
দিবসাশ্চ আর্য্যভটীয়-ভৌমাদি-ভগণ-সাবন-দিনৈ-
স্তুল্যাঃ সন্তীত্যনুমীয়তে আর্য্যভটীয় ভগণাদি-
গ্রহণে প্রকারাণাং উপপন্নত্বাৎ।
সুধাকর।

প্রাচীন-সূর্য্যসিদ্ধান্তে চন্দ্র-মন্দোচ্চ ভগণাঃ...৪৪৮২১৯।
আধুনিক-সূর্য্যসিদ্ধান্তে ,, ,, ...৪৪৮২০৩।
অশীত্যংশ-সমং রবের্ম্মন্দোচ্চং কল্পিতং।
সাম্প্রতকালিক-সূর্য্যসিদ্ধান্তমতেন সপ্ত-
সপ্ততিরংশারবেরুচ্চমায়াতি।
সুধাকর।

(প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তে)
রবে র্মন্দ-পরিধিঃ ১৪ সমো বিধোশ্চ ৩১ মিতঃ কল্পিতঃ॥
সুধাকর।

রবের্ম্মন্দপরিধ্যংশা মনবঃ শীতগোরদাঃ॥
(বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্তে)।
প্রাচীনসূর্য্যসিদ্ধান্তেমহাযুগীয়-সাবনদিবসাঃ ১৫৭৭৯১৭৮০০
আধুনিক ,, ,, ১৫৭৭৯১৭৮২৮।

ইহাতে দ্বিবেদীজীই প্রমাণ। যদি কেহ মনে করেন, দ্বিবেদীজীই পঞ্জিকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, তিথ্যাদি চিরকাল একরূপ আছে। ইহাও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতারণা। চন্দ্র ও সূর্য্য লইয়া তিথি। প্রাচীন ও আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তেই চন্দ্রোচ্চ ভগণ, চন্দ্রের মন্দ পরিধি, সূর্য্যোচ্চ ও মহাযুগীয় সাবন দিবস এক নহে। তিথি সাধনের এ সমুদয় উপকরণ। এই উপকরণীভূত অঙ্ক-গুলির প্রাচীন ও আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তে ভেদ আছে, ইহা দ্বিবেদীজীও বলেন। সুতরাং তাহার ফলস্বরূপ—তিথি, প্রাচীন ও আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত-অনুসারে অবশ্যই ভিন্ন হইবে। উহা কখনও এক হইতে পারে না। কারণভেদে যে, কার্য্যভেদ হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আরও বিচার্য্য যে, বরাহমিহির, গ্রন্থরচনাকালে সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে গণিত করিয়া চন্দ্রের ক্ষেপাঙ্ক যাহা লিখিয়াছেন, পণ্ডিত দ্বিবেদীজীও, তাহা আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তের আশ্রয়ে গণনা করিয়া মিলাইতে পারেন নাই। বরাহমিহিরের গণনায় গ্রন্থারম্ভে চন্দ্রের ক্ষেপাঙ্ক ৬৭০২১৭; পণ্ডিত দ্বিবেদীজীর গণনায় তৎকালে আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে ৬৭০১৯৭। সুতরাং অসংশয়ে বলা গেল যে, বরাহমিহিরের কালের সূর্য্যসিদ্ধান্তের ও প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের তিথি, এক নহে।

সূর্য্যদেব, কৃতযুগান্তে ময়াসুরকে গ্রহগণিতের দৃক্তুল্য গণিত প্রকার শ্রবণ করান। তাহাতে কোন অংশ ত্রুটিত বা অসম্পূর্ণ ছিল না (২২)। এই ইতিহাস-মূলক কোন ঋষিপ্রণীত সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রস্তাবমূলক অনেক সূর্য্যসিদ্ধান্তই যে, সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্যসিদ্ধান্তদ্বয়ের গণিত ভেদ দেখিয়া অসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সূর্য্য নিজেই বলিয়াছেন—তিনি যুগে যুগে মহর্ষিদিগকে সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। এক কল্পে সহস্র যুগ। অতএব অনেক বার সূর্য্যকে

(২২) মদংশঃ পুরুষোঽয়ং তে নিঃশেষং কথয়িষ্যতি॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।
তত্তদ্‌গতিবশান্নিত্যং যথাদৃক্তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রযান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত বলিতে হইয়াছে। (২৩) এইরূপ বার বার সিদ্ধান্ত বলিবার কারণ, সূর্য্য এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কাল-ভেদে গ্রহগতির ভেদ হয়; এজন্য পূর্ব্ব-কথিত সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য চলিতে পারে না। অতএব পুনরায় তাঁহাকে, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বলিতে হয় (২৪)। কালভেদে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত অনেক উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং কোন দেবানুগ্রহে কোন মানুষেরও যে, তাহা স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, ইহাও সূর্য্যদেবের উক্তি হইতেই জানা যাইতেছে (২৫)। পণ্ডিত দ্বিবেদীজী বলেন—(২৬) বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সূর্য্য ও ময়াসুর-সংবাদ আশ্রয় করিয়া কোন ঋষি রচনা করেন নাই। আর্য্যভট্টের সমকালে কোন পণ্ডিত, উক্ত পুরাণ-কথা অবলম্বন করিয়া, এই বর্ত্তমান প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছেন। বাস্তবিকও ত্রিকালজ্ঞ অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিপ্রণীত বলিতে হইলে, ঐ গ্রন্থে তাহার অনেক অভাব দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন আর্য্যভট্টের গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামটী পর্য্যন্ত নাই। ভাস্করাদির গ্রন্থেও ইহার তত আদর দেখা যায় না। কিন্তু তথাপি এই পুস্তকে যুক্তিযুক্ত যে সকল কথা আছে, তাহা সাক্ষাৎ সূর্য্যের উক্তি বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। গণিত শাস্ত্রের আচার্য্যদের মত এই,—যে সকল শাস্ত্রবাক্য, উপপত্তি-যুক্ত—গণিতস্কন্ধে তাহাই প্রমাণ (২৭)। দ্বিবেদীজীর লেখার ভাবে ইহাও পাওয়া যায় যে, আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্ত-সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে কোন গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ছিল না। তখন কোন্ সূর্য্যসিদ্ধান্তের অঙ্ক লইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া গণিতের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তিথির লক্ষণে লক্ষ্য না করিয়া তিথি গণনা করিতে চান, তাহা বোঝা ভার। ইহা তবে সাধারণ বুদ্ধির অগম্য বোধ হয়। অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী সূর্য্যদেবের নিঃশেষে গ্রহ-গণিত বলিতে আদেশ দেখিয়া (২৮) ও দৃক্তুল্য স্ফুটীকরণ বলিতেছি এই রূপ প্রতিজ্ঞা দেখিয়া (২৯) এবং গণিতের সকল ফল, শিষ্যকে প্রত্যক্ষ দেখাইবার কথা উপসংহারে দেখিয়া (৩০) দৃক্‌সিদ্ধ গণনাই সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতোক্ত স্থির করেন। তাঁহার বিরোধী হইতে হইলে অবশ্যই বিপরীত বলিতে হইবে। বিপরীত বলিলে গণিতের পরিবর্ত্তন-ভীরু শ্রদ্ধাজড়দিগের কাছে ও আর্য্যদিগের অবজ্ঞা-প্রতিপাদনপ্রিয় খৃষ্টানদিগের কাছে সমাদরও আছে।

(২৩) যুগে যুগে মহর্ষীণাং স্বয়মেব বিবস্বতা।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(২৪) যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলম্।
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(২৫) যুগে যুগে সমুচ্ছিন্না রচনেয়ং বিবস্বতঃ।
প্রসাদাৎ কস্যচিদ্ভূয়ঃ প্রাদুর্ভবতি কামতঃ॥
সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(টীকা)

যুগে যুগে বহুকালে ইত্যর্থঃ। সমুচ্ছিন্না লোকে লুপ্তা। কস্যচিৎ মাদৃশস্য। প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ। ভূয়ঃ বারং বারং। প্রাদুর্ভবতি ব্যক্তীভবতীত্যর্থঃ।

রঙ্গনাথ।

(২৬) সূর্য্যসিদ্ধান্ত-রচনাকালস্তু নিত্যানন্দেন সিদ্ধান্তরাজকৃতা কলেঃ ষট্‌ত্রিংশচ্ছতমিতে অস্তগণে ব্যতীতে নিগদ্যতে। স কালস্তু আর্য্যভট-সিদ্ধান্তস্য প্রসিদ্ধ এব। তেন সূর্য্যসিদ্ধান্ত আর্য্য-ভট-সিদ্ধান্তঃ সমকালিক এব সিধ্যতি। বিভাতি চ তথ্যং নিত্যানন্দ-প্রতিপাদিতং আর্য্যভটীয়-সিদ্ধান্তে ন কুত্রাপি সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মত-প্রতিপাদনাৎ। সাম্প্রতং প্রচলিতসূর্য্যসিদ্ধান্তঃ কৃত-যুগান্ত-কালিকস্তু। কেন-চিদন্যেন প্রকল্পিতো নবীন ইতি স্ফুটমেব সূক্ষ্মবিচারঃ প্রবৃত্তানাং গণকানাং॥—সুধাকর।

(২৭) অত্র গণিতস্কন্ধে উপপত্তিমানেবাগমঃ প্রমাণম্।—ভাস্করাচার্য্য।

(২৮) মদংশঃ পুরুষোঽয়ং তে নিঃশেষং কথয়িষ্যতি॥—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(২৯) তত্তদ্গতিবশান্নিত্যং যথাদৃক্তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রয়ান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ॥—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(৩০) আচার্য্যঃ শিষ্যবোধার্থং সর্ব্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্॥—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

এই একমাত্র কারণ! এতদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণের তো দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্যসিদ্ধান্ত যে, সর্ব্বত্র আকাশের সূর্য্য ও চন্দ্রাদি গ্রহ-সাধনার্থ রচিত এবং দৃক্‌সিদ্ধ গণিত করাইবে, তাহার সর্ব্বত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা "পঞ্চাঙ্গ-প্রভাকরের" প্রথম পুস্তকে সবিস্তর বর্ণিত আছে। অন্য বিচার্য্য এই যে—দিনমান, লগ্ন, সায়ন-সংক্রান্তি, গ্রহণ প্রভৃতিসম্পাদক চন্দ্র-সূর্য্য ও তিথিসম্পাদক চন্দ্র-সূর্য্য, কি এক নহে? না, তিথিসম্পাদক চন্দ্রসূর্য্যের আকাশে উদয় হয় না? যে দিনমানাদি সাধন করিতে এক সূর্য্য লইব, আর তিথি সাধন করিতে অন্য সূর্য্য অবলম্বন করিব, এরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রের ভেদ করিতে যে, দ্বিবেদীজী লজ্জা বোধ কেন করেন না, তাহা সূর্য্যই জানেন। দিনমান, তাবৎ বৈদিক ও পৌরাণিক ক্রিয়ার মূল। তাহার পরিবর্ত্তন যদি স্বীকৃত হইল, তাহা হইলে তিথির দোষ কি? আর দিনমান পরিবর্ত্তন করিলে কি তিথির দণ্ড পল পরিবর্ত্তিত হয় না? উদয়াবধি তিথির স্থিতি তো লিখিতে হইবে। সে সময়ে আকাশের সূর্য্যের কাছে আসিতেই হইবে, নতুবা উপায় নাই। তবে তিথি-সাধনে আকাশের সূর্য্যের আশ্রয় না লইবেন কেন? না লওয়ার পক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণ নাই। যদিও দিনমানের ন্যায় তিথি, সাধারণের প্রতীতি-গোচর নয়, তাহাতেই বা দোষ কি? সাধারণ দৃগ্‌গোচর না হইলেই যে, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা ত কোনরূপে সঙ্গত হইতে পারে না। প্রাচীন আচার্য্য বরাহমিহির লিখিয়াছেন (৩১) যে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মা ও বশিষ্ঠ, যে তিথ্যানয়ন লিখিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য।

---

(৩১) পৌলিশ-রোমক-বাশিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহাস্ত পঞ্চ সিদ্ধান্তাঃ।
পৌলিশতিথিঃ স্ফুটোহসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকঃ প্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ॥

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।

For favour of review and exchange

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ (তিন) টাকা।

তীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র। [১১।১২ সংখ্যা।

সাহিত্য-সংহিতা

('সাহিত্য-সভার' মাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্. এ., বি. এল্.,
এফ্. আর্. জি. এস্.

সূচী পত্র।

ংখ্যা)	(বিষয়)	(প্রবন্ধ-লেখকের নাম)	(পত্রাঙ্ক)
১	থিওসফি	শ্রীআশুতোষ দেব, এম্, এ, এফ, টি, এস্,...	৫৬১
২	ধম্মপদ	শ্রীচারুচন্দ্র বসু ...	৫৭১
৩	অধ্যাত্ম তত্ত্ব	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ ...	৫৭৮
৪	অহঙ্কার	শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৮৮
৫	কাল ও কালী	শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ ...	৫৮৯
৬	'বেতালে' বহুরহস্য	শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, এম্. এ, বি, এল, ...	৬০৫
৭	মহাসমাধি (কবিতা)	শ্রীআশুতোষ দেব, এম্, এ. এফ্, টি, এস্ ...	৬৩২
৮	পুরী যাইবার পথে	ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু রায় বাহাদুর ...	৬৩৩
৯	মালবিকাগ্নিমিত্র	শ্রী অঃ ——— ...	৬৬৮
১০	কার্য্য-বিবরণ	——— ...	৬৮২

কলিকাতা

১০৬।১ নং, গ্রে ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-সভা" হইতে প্রকাশিত।
৫৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট "বকুলগু প্রেস্" হইতে
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

☞ "সাহিত্য-সভার" সভ্যেরা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইয়া থাকেন।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

দুঃসাধ্য জীর্ণ জটিল হতাশ রোগে প্রত্যক্ষফলদাতা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎ

গবর্ণমেণ্টসম্মানিত রাজনিয়োগপ্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীঅঘোরনাথ শাস্ত্রী জ্যোতির্ভূষণ এফ, টি, এস্,

হিন্দু-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

২১২ নং অপার্‌চিৎপুর রোড্, বাঁধা বটতলা, কলিকাতা।

"চিকিৎসা", "তন্ত্র", "জ্যোতিষ্", ত্রিবিধ শাস্ত্রের সামঞ্জ মতে, সমুদয় কঠিন কঠিন রোগের অকৃত্রিম অব্যর্থ শাস্ত্রসম্মত যথার্থ ব্য সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বদা বিনা ব্যয়ে দেওয়া হয়। যে রোগ আরোগ্য হইবার বা যাহাতে রোগীর নিশ্চিত জীবনাবসান হইবে, তাহা স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া সর্ব্ববিধ ধাতুরত্নঘটিত ও দুষ্প্রাপ্য বনৌষধিজাত মহৌষধি—তৈল, ঘৃত, বটি চূর্ণ, আসব, অরিষ্ট, অবলেহ প্রভৃতি—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ মতে শাস্ত্রানু অকৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত আছে। অত্যুৎকৃষ্ট অকৃত্রিম মৃগনাভি ও ষড়্গুণবলিজা মকরধ্বজ, বোধ হয়, একমাত্র এই স্থলেই পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎ সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য জাত—উৎকৃষ্ট পুরাতন ঘৃত, পুরাতন শোধিত পুরাতন বনজ মধু এবং সর্ব্ববিধ নিখুঁত টাটকা পাচন দ্রব্যা এখানে সাধারণের উপকারার্থে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত আছে।

শর্ম্মা শাস্ত্রীর জগদ্বিখ্যাত "বটতলার পাঁচন"

সর্ব্ববিধ পুরাতন ও নূতন জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

দেশব্যাপিত ম্যালেরিয়াজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বর, নেবা, পাণ্ডু, কাশভুক্তজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, পালাজ্বর, কালাজ্বর, কম্পজ্বর, বিষম দোকা মজ্জাভেদী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুঃসাধ্য জীর্ণ জটিল কঠিন পুরাতন ও নূতন ইহাতে নিশ্চিত আরোগ্য হয়।

ঔষধ লইবার সময় 'হাতি মার্কা' ও কবিরাজ অঘোরনাথ শাস্ত্রীর নাম দেখিয়া লইবেন এবং ইহা ব্যতীত অপর সমস্ত কৃত্রিম ও জাল বলিয়া জানিবেন।

মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ আনা। বড় বোতল ১৷৷০ টাকা।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সংহিতা।

তৃতীয় খণ্ড] ১৩০৯ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র [১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

থিওসফি।

'থিওসফি' (Theosophy) নবাবিষ্কৃত বিষয় কিংবা য়ুরোপীয়দিগের মস্তিষ্কপ্রসূত নূতন বিষয় নহে। 'থিওসফি' এই কথাটি, যে দুইটী শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের অর্থ এই হইতেছে যে, দেবতাদিগের জ্ঞান বা দৈবজ্ঞান। 'থিওসফির' পুরাতন এবং সংস্কৃত নাম হইতেছে 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'পরা বিদ্যা।' সুতরাং সমুদয় ধর্ম্মের ভিত্তি হইতেছে 'থিওসফি।' কোন ধর্ম্ম-বিশেষের নাম 'থিওসফি' নহে। অতি পুরাকাল হইতে 'থিওসফি' সর্ব্বজনীন নীতি এবং সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম রূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পঞ্চ সহস্র কিংবা তত্যোধিক বর্ষের পূর্ব্বকার 'থিওসফির' পুস্তকাদি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা মাণ্ডুক্য উপনিষৎ হইতে অবগত হই যে, বিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত,—পরা ও অপরা। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ইত্যাদিকে অপরা বিদ্যা বলা যায় এবং যাহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলে। বেদেও এই দুই বিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পরা বিদ্যা, প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল এবং পরে শিষ্য-পরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং যত দিন মনুষ্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তত দিন 'থিওসফির' প্রচলন আছে, বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালের 'থিওসফি' 'থিওসফির সভার' (Theosophical Society) সহিত বিশেষ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে। 'থিওসফি' অতি পুরাতন হইলেও, 'থিওসফির সভা' আধুনিক এবং পাশ্চাত্য মনীষিগণ কর্ত্তৃক গঠিত। অধ্যাত্মিক তত্ত্বে সমুন্নত কতকগুলি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বা মহাত্মা, এই সভার যথার্থ স্থাপয়িতা। তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে রুস দেশীয় জনৈক উচ্চবংশোদ্ভবা ব্ল্যাভাট্‌স্‌কি নামক রমণী (H. P. Blavatasky) এবং আমেরিকা-বাসী

অল্‌কট্ (Colonel Alcot) নামক জনৈক উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষ এবং জাজ্ (W. Q. Judge) নামক জনৈক বিলাতি-আইন-ব্যবসায়ী, ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে এই সভা আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে স্থাপন করেন। ঐ তিন জন পাশ্চাত্যের দ্বারা পরা বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য এই সভা স্থাপিত করার এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, সেই সময়ে আমাদের দেশের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল যে, এমন কি, শিক্ষিত সমাজও ইংরাজিতে লিখিতেন এবং মোক্ষমূলার, হাক্‌স্‌লি প্রভৃতি পাশ্চাত্য কর্ত্তৃক অনুমোদিত পুস্তকাদি ভিন্ন আর কিছুই পাঠ করিতেন না। যত ক্ষণ না তাঁহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাদাতৃগণ বলিয়াছিলেন যে—রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণ—এই সকল পাঠোপযোগী—তত ক্ষণ তাঁহারা ঐ সকল পুস্তকাদিতে স্বজাতীয় শৈশব অবস্থার বাল-ভাষিত-শব্দযোজনা-মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐ সকল শিক্ষাদাতৃগণ, জড়বাদে পরিপূর্ণ থাকায় এবং আধ্যাত্মতত্ত্বের কোন ধার ধারিতেন না বলিয়া, সঙ্কেত কিংবা রূপকের আবরণের ভিতর যে, ধর্ম্মের অমূল্য রত্ন সকল নিহিত থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। এই জন্য তাঁহাদের অনুগমনকারী শিক্ষিত সমাজও ধর্ম্মের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। যখন দেশের এইরূপ গতি হইয়াছিল যে, পাশ্চাত্যেরা, যাহা না বলিবেন, তাহা ঠিক্ নহে; সুতরাং তাহা গ্রাহ্য বিবেচিত হইত না, তখনই মহাপুরুষদিগের আদেশে ভিন্নদেশীয় তিন জন পাশ্চাত্য কর্ত্তৃক ঐ সভা গঠিত হইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ ভক্তি এবং আগ্রহ পূর্ব্বক মানিবে বলিয়াই পাশ্চাত্য কর্ত্তৃক ঐ সভা গঠিত হইবার অন্য উদ্দেশ্য। বিশ্বজনীন ভালবাসা এবং ভাতৃভাব বিস্তার করাই, এই সভার প্রধান লক্ষ্য। যে কোন ধর্ম্মের ‘গণ্ডির’ ভিতর আবদ্ধ থাকিলে, কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যাহাতে পরোপকার করা যায়, তাহাই এই সভার বিশেষ চেষ্টা। ইহা ভিন্ন ঐ সভার আরও দুইটী গৌণ উদ্দেশ্য আছে। একটি হইতেছে, আর্য্য এবং অন্যান্য প্রাচ্য সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করা এবং অপরটী হইতেছে—প্রকৃতির গূঢ় নিয়মের এবং মনুষ্যের ভিতর যে সকল গুপ্ত আধ্যাত্মিক (Psychic) ক্ষমতা আছে, তাহাদিগের তথ্যানুসন্ধান করা। প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা জড়বাদ দূরীভূত হইয়া আধ্যাত্মতত্ত্বের উদয় হইবে বলিয়া, এই সভা, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের ভ্রান্তসংস্কার এবং বিশ্ব-ব্যাপক সন্দেহ দূর করিবার জন্য, মনুষ্য যে, তাহার নিজের ভাগ্য গঠন করিয়া থাকে এবং ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার পরও যে তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য, যাহাকে আমরা আশ্চর্য্য ঘটনা বলি, তাহা যে, প্রকৃতির নিয়মের অভিব্যক্তি-মাত্র, তাহা বুঝাইবার জন্য এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ প্রাণীর কর্ত্তব্য কার্য্য কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য, ঐ সভার স্থাপনা হইয়াছে! ঐ সভার স্থাপনার দ্বারা ভবিষ্য-যুগধর্ম্মের সূত্রপাত করা হইয়াছে। যে সকল মহাপুরুষ, মনুষ্যের হিতের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, সেই সকল অতীন্দ্রিয় মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহাতে মনুষ্যের উপকার করা যায়, তাহার জন্য ঐ সভা, প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ।

পরোপকার করাই, জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং সত্য ঘোষণা করাই, ‘থিওসফির’ প্রধান উদ্দেশ্য। বিশ্বজনীন ভালবাসার দ্বারাই যে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া থাকে এবং পৃথিবীস্থ তাবৎ মনুষ্যই যে, ভ্রাতার ন্যায়—তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ‘থিওসফি’ দূতস্বরূপে উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য ঐ সভা, প্রথম নিয়ম করিয়াছেন যে, সভ্য হইতে হইলে, সকলকেই ভ্রাতৃভাবে দেখিতে হইবে। এই নিয়মটী সকলকে পালন করিতে হয়; আর দুইটী নিয়ম, সভ্যগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব, যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহার জন্য তৃতীয় নিয়মটী করা হইয়াছে। এই নিয়মটীর উদ্দেশ্য হইতেছে যে, নিজে কে, তাহার বৃত্তান্ত কি ইত্যাদি জ্ঞাত হওয়া। তাহা জানিতে পারিলে লোকে দেখিবে যে, সকলেই, ভ্রাতার ন্যায়। তখন ভ্রাতৃভাব, আরও দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মটি হইতেছে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করা; এইরূপ করিলে, আমরা পরস্পরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কিছু না কিছু শিখিতে পারি। এই প্রকারে পরস্পরের উপকার হইয়া থাকে। তখন আর বিভিন্ন জাতীয় বলিয়া মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় না। এই নিয়মটির দ্বারাও যাহাতে ভ্রাতৃভাব, দৃঢ় হয়, তাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে।

‘থিওসফি’ আরও শিখাইয়াছে যে, যেমন বিভিন্ন প্রকারের পরিমাণযুক্ত,

আকৃতিযুক্ত এবং সজ্জিত পাত্রসমূহে একই প্রকার জল রাখা যাইতে পারে এবং যখন তৃষ্ণা হয়, তখন যে কোন পাত্রের জল দ্বারা তৃষ্ণা মিটাইতে পারা যায়,—সেইরূপ সমুদয় ধর্ম্মরূপ পাত্রসমূহে একই আধ্যাত্ম পিপাসার জল পাওয়া যায় এবং সেই জল দ্বারা তৃষিত আত্মার পিপাসা মিটিয়া যায়। সুতরাং কাহারও ধর্ম্মের নিন্দা করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি, যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, সে যাহাতে নিজের ধর্ম্ম, অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিতে পারে, তাহার জন্য, 'থিওসফি' উপদেষ্টৃ-স্বরূপ। 'থিওসফিকে' কোন বিশেষ ধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না; ইহার দ্বারা নিজ নিজ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। 'থিওসফি' যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছে, সেই সকল সত্যকে ভ্রান্ত বিশ্বাসের সহিত অনুসরণ করিতে 'থিওসফি' কখনই পরামর্শ দেয় নাই। 'থিওসফি' বলিয়াছে যে, যে সকল সত্য, আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। জড়বাদ ও ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করিবার জন্য 'থিওসফি' আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে বলিতেছে। এইরূপ আশা করা যায় যে, পারমার্থিকতা (Spiritualism) দ্বারা ক্রম-বিকাশ-বাদ (Evolution) ও দৈবপ্রকাশ (Revelation) এক সঙ্গে প্রমাণ পূর্ব্বক এবং নিজের উন্নতির জন্য স্বীয় দায়িত্ব ও স্বকীয় উদ্যমরূপ আদর্শ ধারণ পূর্ব্বক 'থিওসফি' বিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

"থিওসফি" আলোচনা করিলে, নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান সত্য, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। যথা—

(১) ভগবানের অস্তিত্ব আছে এবং তিনি সৎ। তিনিই সকলকে জীবন দান করিয়াছেন, তিনি আমাদের ভিতরেও আছেন এবং বাহিরেও আছেন। তিনি অবিনশ্বর এবং জীবের উপর পরম দয়ালু। তাঁহাকে শুনিতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় না, কিংবা স্পর্শ করিতে পারা যায় না; কিন্তু যাহারা তাঁহাকে অনুভব করিবার জন্য চেষ্টা করে, তাহারা তাঁহাকে অনুভব করিয়া থাকে।

(২) মনুষ্য অবিনশ্বর; তাহার ভবিষ্যতের জন্য অসীম গৌরব ও সৌন্দর্য্য সঞ্চিত রহিয়াছে।

(৩) নিখুঁত ন্যায়-বিচার-রূপ ঐশ্বরিক নিয়মের দ্বারা এই পৃথিবী, চালিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বয়ং তাহার ভাল-মন্দের বিচারকর্ত্তা, তাহার মন্দ কিংবা শুভ ফলের প্রদানকর্ত্তা, ও তাহার জীবন এবং পুরস্কার কিংবা দণ্ডের বিধানকর্ত্তা।

প্রথম সত্য হইতে আমরা অবগত হইয়া থাকি :—

(১) বাহ্য দৃষ্টিতে অসমানতা প্রকাশ পাইলেও, সমুদয় বিষয়, মঙ্গলের দিকে চালিত হইতেছে। অবস্থা-সকল, প্রতিকূলে না আসিলেও, যখন যাহা হইতেছে, তাহা ভালর জন্যই হইয়া থাকে এবং সেই সময়ের যথার্থ উপযোগী। চতুর্দ্দিকস্থ বিষয়সমূহের দ্বারা আমরা বাধা না পাইয়া, বরং সাহায্য পাইতেছি।

(২) যখন সমুদয় বিষয়, মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য সাধিত হইতেছে, তখন মনুষ্যের সেই সত্য, হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

(৩) মনুষ্য, যখন ঐ সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে, তখন তাহার মঙ্গলের পথে কার্য্য করা উচিত।

দ্বিতীয় সত্য হইতে আমরা উহা উপলব্ধি করি :—

(১) যিনি যথার্থ মনুষ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি হইতেছেন—আমাদিগের আত্মা। আমাদের শরীর, আত্মার আচ্ছাদনমাত্র।

(২) সেই জন্য প্রত্যেক বিষয়ই, আত্মার ভিত্তি হইতে দেখা উচিত; এবং যখনই অন্তরে ঝটিকা প্রবাহিত হইতে থাকিবে, তখনই মনুষ্য, নিজেকে 'চিৎ' বলিয়া ধারণা করিবে।

(৩) যাহাকে আমরা মনুষ্যের পার্থিব জীবন বলিতেছি, তাহা বাস্তবিক তাহার মহৎ ও উচ্চতর জীবনের এক একটী দিবস-মাত্র।

(৪) যাহাকে আমরা মৃত্যু বলিয়া জানি, তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, তাহার দ্বারা আমাদের জীবনের শেষ হয় না। মৃত্যুতে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা রূপান্তর ও অবস্থান্তর-মাত্র।

(৫) মনুষ্য, ক্রম-বিকাশের (Evolution) বহু সোপান অতিক্রম করিয়াছে। পশ্চাতের সোপানসমূহ আলোচনা করিলে, অনেক বিষয় শিক্ষা করা যায়।

(৬) মনুষ্যের সম্মুখে ক্রম-বিকাশের যে সোপানাবলি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে, আরও অধিক শিক্ষা করা যায়।

(৭) ক্রম-বিকাশ হইতে মনুষ্য, যত দূর ভ্রষ্ট হইতে পারে, ভ্রষ্ট হউক, কিন্তু কালক্রমে সে, ক্রম-বিকাশের শ্রেষ্ঠ সোপানে উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তৃতীয় সত্য হইতে আমরা অবগত হই :—

(১) প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক কৃতি, নির্দ্দিষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে। উহার ফলস্বরূপ আমরা কোন পারিতোষিক কিংবা শাস্তি বাহির দিক্ হইতে পাই না। কর্ম্মের ভিতর ঐ সকল নিহিত থাকে। সুতরাং কর্ম্ম এবং তাহার ফল, একই সত্যের দুইটী ভিন্ন অংশমাত্র।

(২) মনুষ্য, স্বভাবের অন্যান্য নিয়মসমূহ যেরূপ জ্ঞাত রহিয়াছে, সেই প্রকার কর্ম্মের নিয়মও জ্ঞাত হওয়া উচিত এবং সেই নিয়ম মানিয়া চলা উচিত।

(৩) মনুষ্যের নিজেকে শাসনে রাখা উচিত। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মফলের নিয়ম অনুসারে নিজেকে বুদ্ধি পূর্ব্বক পরিচালনা করিতে পারিবে।

'থিওসফি' আলোচনা করিলে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ঐ প্রকার জ্ঞান জন্মিলে, জীবনের গতিও, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে যে সকল সুবিধা লাভ করা যায়, তাহার মধ্যে কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) জীবনের কি উদ্দেশ্য, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেমন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, এবং কেনই বা তাহা উচিত, তাহা বিশেষ বুঝিতে পারা যায়। এই সত্য, হৃদঙ্গম হইলে, আমরা অবগত হই—জীবন-ধারণের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

(২) কিরূপে আপনাকে শাসন করিতে হয় এবং কিরূপে উন্নত হওয়া যায়, তাহা আমরা শিখিয়া থাকি।

(৩) যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদিগকে কিরূপে সাহায্য করা যায়, যাহাদিগের সংস্রবে আমরা আসিয়া থাকি, তাহাদিগের প্রয়োজনে এবং অবশেষে সমুদয় মানবজাতির প্রয়োজনে, কিরূপে আমরা আসিতে পারি, তাহা আমরা শিক্ষা করিয়া থাকি।

(৪) স্বার্থত্যাগ করিয়া, বিস্তৃত দার্শনিক ভিত্তি হইতে আমরা সমুদয় বিষয় দেখিতে শিখিয়া থাকি।

(৫) সুতরাং আমরা তখন জীবনের কষ্টসমূহ তত ভোগ করিব না।

(৬) আমাদের ভাগ্য-সম্বন্ধে অন্যায় বিচার, কিংবা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অন্যায় বিচার হইতেছে, এরূপ বলিব না।

(৭) আমরা মৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকি।

(৮) যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদিগের মৃত্যুতে আমাদিগকে আর তত কষ্ট অনুভব করিতে হয় না।

(৯) মৃত্যুর পর, জীবনের গতি, কি হয়—তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

(১০) আমাদের ভবিষ্য-ভাগ্যের অনিশ্চিততা-সম্বন্ধে আমরা আর ব্যস্ত হই না এবং নির্ভয়ে ও শান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হই।

সুতরাং 'থিওসফির' মনোবিজ্ঞানসমূহ আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাইব, উহা নূতন নহে; উহা আমাদেরই (হিন্দুশাস্ত্রেরই) কথা। তবে নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করা হইয়াছে মাত্র। 'থিওসফির' দর্শনসমূহও, হিন্দু-দর্শনের ন্যায় এইরূপ শিক্ষাদান করিয়া থাকে,—(১) কেবলমাত্র এক হইতেই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, সেই একেই সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেই একেই সকলে পুনরায় মিলিত হইয়া যাইবে; এবং (২) বাক্য কিংবা চিত্ত দ্বারা সেই এক সতের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না; আমাদের ন্যায় অভিব্যক্ত (Manifested) এবং পরিচ্ছিন্ন (finite) জীব, সেই অব্যক্ত এবং অপরি-চ্ছিন্নকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে সমর্থ হয় না। এই দুইটী তথ্য, 'থিওসফি' অতি সুন্দররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। আমার শরীর যে 'আমি' নহি, মৃত্যুর পরও যে, মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকে, এই পার্থিব জীবন ভিন্ন যে, অপরাপর জীবন আছে, কর্ম্ম করিলেই যে, তাহার ফল ভোগ করিতে হয়, আমাদিগের নিজের কর্ম্মের জন্য যে আমরাই দায়ী, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা কি, ইত্যাদি বিষয়-সম্বন্ধে 'থিওসফি' যেরূপ আলোচনা করিয়াছে এবং পরীক্ষাসিদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

ভূত ও আত্মা সম্বন্ধে 'থিওসফি' যাহা বলিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পৃথিবীতে দুইটী বিষয়ের অস্তিত্ব আছে। একটি হইতেছে—আত্মা এবং অপরটী হইতেছে, পদার্থ। একটী চিৎ, অপরটি জড়। এক পরমাত্মা হইতে আত্মা-সমূহ ও পদার্থসকল উৎপন্ন

হইয়াছে। 'থিওসফিতে' কম্পন এই কথাটীর ব্যবহার প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। আধুনিক পাশ্চত্য-বিজ্ঞানবাদীরাও, বিজ্ঞানের তথ্যসমুদয় কম্পনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচ্য বিজ্ঞানবাদীরা, ঐরূপ সিদ্ধান্তে অনেক দিন পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকল বিষয়ের মূল হইতেছে, গতি বা শক্তি (Motion)——জীবনও গতি-বিশেষ। চিৎ বা সংবিৎও (Consciousness) গতিবিশেষ। ঐ গতি, যখন কোন বিষয়ের দ্বারা বাধিত হয়, তখন কম্পন উৎপন্ন হয়। আমরা কেবলমাত্র সেই এক অখণ্ডকে গতিহীন কিংবা নির্ব্বিশেষ গতি (Absolute Motion) যুক্ত বলিয়া, পরিবর্ত্তন-শূন্য-রূপে কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু যখন আমরা পূর্ব্ব অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড অংশ সমূহ কল্পনা করিতে যাই, তখনই আমাদের মনে গতির ভাবনা উদয় হইয়া থাকে। যখন এক হইতে বহু হইতে থাকে, তখনই গতির আরম্ভ হয়; যখন ঐ গতি, তালে তালে (Rhythmic) এবং নিয়ম মত (Regularly) হইতে থাকে, তখনই তাহাকে স্বাস্থ্য, জ্ঞান কিংবা জীবন বলা হয়, কিন্তু যখন উহা বেতালা এবং অনিয়ম মত হয়, তখন অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান এবং মৃত্যু বলা যায়। সুতরাং জীবন এবং মৃত্যুকে গতিরূপ একই পিতার যমজ কন্যারূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

যখন "একোঽহং বহু স্যাং," অর্থাৎ যখন সেই অখণ্ড, বহু-রূপে পরিণত হইয়াছিলেন, তখন হইতেই গতির প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। যখন সেই এক সর্ব্বব্যাপী, বিভিন্ন বিন্দুরূপে প্রকাশিত হন, তখন অনন্ত শক্তির প্রকাশ হয়। কারণ, অনন্ত গতিই, সর্ব্বব্যাপিত্বের পরিচায়ক। ভূতের ধর্ম্ম হইতেছে, পার্থক্য এবং আত্মার ধর্ম্ম হইতেছে একতা; কিন্তু দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় যখন ভূত ও আত্মা, এক সঙ্গে মিলিত হইয়া এক হয়, তখন অবিশ্রান্ত ও অনন্ত গতির দ্বারাই সেই একের সর্ব্ব-ব্যাপকত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভূতের ভিত্তি কিংবা আত্মার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেক বিন্দুর শক্তি দুই প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে। ভূতের (Matter) ভিত্তি হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, একই মুহূর্ত্তে এবং একই স্থানে বিন্দুর গতি একই প্রকার। কিন্তু আত্মার (Spirit) ভিত্তি হইতে দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, ঐ গতি, পরিপূর্ণ (Absolute) অর্থাৎ যখন আমরা আত্মার ভিত্তি হইতে

দেখি, তখন আমরা কেবল অখণ্ড এক দেখিতে পাই, কিন্তু যখন ভূতের ভিত্তি হইতে দেখি, তখন খণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

যে পদার্থের দ্বারা এই অনন্ত গতির বিকাশ হয়, সেই পদার্থে ঐ শক্তি, কম্পনরূপে নিয়ম-মত তালযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক জীবাত্মা, (সংবিতের একটি বিন্দুস্বরূপ) পদার্থের আবরণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অন্যান্য জীব হইতে পৃথক্ হইয়াছে। প্রত্যেক জীব, পদার্থের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। যখন ঐ সকল ভৌতিক আবরণ কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের কম্পন, চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থে সঞ্চারিত হয়। অন্তরের কম্পন, বাহিরে সঞ্চারিত করিবার জন্য জীবের আবরণরূপ পদার্থকে মধ্যস্থ (Medium) স্বরূপ বলা যাইতে পারে; এবং এই মধ্যস্থ তাহার নিজের কম্পন, অপর একটি জীবের আচ্ছাদনে অক্লেশে সঞ্চারিত করিতে পারে; সুতরাং প্রথম জীবের ন্যায় দ্বিতীয় জীব, অক্লেশে কম্পন করিতে থাকে। যেমন যদি দুইটী বীণায় তন্ত্রী, সমান-স্বর-যুক্ত হয়, তাহা হইলে একটি বীণার তন্ত্রীতে আঘাত করিলে, তাহার সেই কম্পন, চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুতে সঞ্চারিত হয় এবং অবশেষে ঐ কম্পন, দ্বিতীয় বীণার তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হইলে, সেই বীণার তন্ত্রীতে প্রথম বীণার তন্ত্রীর শব্দের ন্যায় অবিকল শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। জীব-জগতেও ঠিক্ এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে; প্রথমে একটি জীবের কম্পন আরম্ভ হইলে, তাহার শরীর-রূপ আচ্ছাদন, সেই কম্পন গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং উহা কম্পিত হইতে থাকে। পরে ঐ কম্পন, শরীরের বহিঃস্থ পদার্থে সঞ্চালিত হইলে পর, অপর একটী জীবের শরীরে ক্রমশঃ সেই কম্পন সঞ্চারিত হয় এবং সর্ব্বশেষে শরীরের অভ্যন্তরস্থ জীবও, কম্পিত হইতে থাকে। এইরূপে কম্পনের একটী শৃঙ্খল লাগিয়া থাকায়, এক জন, আর জনকে জানিতে পারিয়া থাকে। কিন্তু প্রথম জীবের ন্যায় দ্বিতীয় জীবও, কম্পনশীল;—সুতরাং বাহির হইতে উহারা যে কম্পন গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা নিজেদের কম্পন এবং বাহিরের কম্পনের সমষ্টিমাত্র। এইরূপে ধারাবাহিক কম্পনসমূহ, এক জীব হইতে অন্য জীবে সঞ্চারিত হইতেছে এবং সমুদয় প্রাণীই, এইরূপে সংবিতের দ্বারা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

ভৌতিক (Physical) রাজত্বে আমরা কম্পনের ভিন্ন ভিন্ন ধারাকে ভিন্ন

ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যেমন এক প্রস্তকে আলোক বলি, অন্যকে তাপ বলি, অন্যকে বিদ্যুৎ বলি, অপরকে শব্দ বলি, ইত্যাদি; কিন্তু সকল প্রস্ত, একই প্রকারের। সকল গুলিই ঈথরের (Eather) কম্পনমাত্র। বেগের (velocity) হিসাবে ভিন্ন এবং ঈথরে তরঙ্গ হিসাবে কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ। ভাবনা (thought), বাসনা (desire) এবং কৃতি (action) যথাক্রমে পদার্থের জ্ঞান (knowledge) ইচ্ছা (will) এবং সামর্থ্যের (energy) জীবন্ত বিকাশমাত্র, সকল গুলিই এক ধরণের। কারণ, সকল গুলিই কম্পন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বিকাশের হিসাবে ভিন্ন। কারণ, তাহাদের কম্পনসকল, বিভিন্ন প্রকারের। কোন বিশিষ্ট পদার্থে বিশিষ্ট প্রকারের কোন ধারাবাহিক কম্পনকে আমরা ভাবনা কম্পন বলিয়া থাকি। অপর এক ধারাবাহিক কম্পনকে আমরা বাসনা কম্পন বলি। অপর এক কম্পন, কৃতি-কম্পনাখ্য। এক প্রকারের ঈথরের কম্পন, আমাদের চক্ষুকে আঘাত করিলে, আমরা সেই কম্পনকে আলোক-কম্পন বলিয়া থাকি। কিন্তু তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ঈথরের কম্পন দ্বারা যখন আমাদের অনুভূতি হইয়া থাকে, তখন আমরা ঐ কম্পনকে চিন্তা করিয়া থাকি। বিভিন্ন প্রকারের ভারযুক্ত বিভিন্ন পদার্থের দ্বারা আমরা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি এবং আমাদের স্থূল কিংবা তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ সকল পদার্থের যে প্রকার অনুভব হইয়া থাকে, আমরা তাহাদিগকে সেইরূপ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। কতকগুলি গতি, যখন আমাদের চক্ষুকে আঘাত করে, তাহাদিগকে আমরা আলোক বলি; আমাদের অন্য ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ মনকে যখন কতকগুলি গতি, আঘাত করে, তাহাদিগকে আমরা চিন্তন বলিয়া থাকি। যখন দৃশ্য এবং দ্রষ্টার মধ্যে যে আলোকবাহী ঈথর আছে, সেই ঈথর, যখন তরঙ্গ-সঙ্কুলিত হয়, তখনই 'দর্শন'-কার্য্য সম্পন্ন হয়; কোন বস্তু এবং মনের ভিতর যে ভাবনাবাহী ঈথর আছে, সেই ঈথর, যখন তরঙ্গসঙ্কুলিত হয়, তখন 'ভাবনা' হইয়া থাকে। প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়টী কোন প্রকারেই অল্প বা অধিক রহস্যময় নহে। এই প্রকারেই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের ভিতর সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাসনা এবং কৃতি-সম্বন্ধেও এইরূপ ধারা, বর্ত্তমান আছে।

শ্রীআশুতোষ দেব, এম্. এ।

বুদ্ধবগ্গো চতুদ্দসমো।

যস্স জিতং নাবজীয়তি জিতমস্স নো যাতি কোচি লোকে।
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ ॥ ১ ॥

অন্বয়—যস্স জিতং নাবজীয়তি, যস্স জিতং লোকে কোচি নো যাতি, তং অনন্তগোচরং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্সথ।

সংস্কৃত,—যস্য জিতং (জয়ঃ) নাবজীয়তে (কেনাপীতি শেষঃ), যস্য জিতং (জয়ং) লোকে (পৃথিব্যাং) কশ্চিৎ নো (ন) যাতি (প্রাপ্নোতি), তং অনন্তগোচরং (অনন্তজ্ঞানং) অপদং (অপরিচ্ছিন্নং) বুদ্ধং কেন পদেন (মার্গেণ) নেষ্যথ (চালয়িষ্যথ)।

অনুবাদ,—যাহার জয়কে কেহ পুনরায় পরাজিত করিতে পারে না, যাহার জয়, পৃথিবীতে কেহ লাভ করিতে পারে না, সেই অনন্ত-জ্ঞানশালী অগোচর বুদ্ধকে কোন্ পথে লইয়া যাইতে পার?

যস্স জালিনী বিসত্তিকা তন্‌হা নত্থি কুহিঞ্চি নেতবে।
তং বুদ্ধমনন্তগোচরং অপদং কেন পদেন নেস্সথ ॥ ২ ॥

অন্বয়.—যস্স কুহিঞ্চি নেতবে জালিনী বিসত্তিকা তন্‌হা নত্থি, তং অনন্তগোচরং অপদং বুদ্ধং কেন পদেন নেস্সথ।

সংস্কৃত,—যস্য কুহচিৎ (কুত্রচিৎ) নেতুং জালিনী (জালবতী, জালসহিতেত্যর্থঃ) বিষাত্মিকা (গরলস্বভাবা) তৃষ্ণা (বাসনা) নাস্তি, তং অনন্তগোচরং (অশেষজ্ঞানসম্পন্নং) অপদং (অপরিছিন্নং) বুদ্ধং কেন পদেন (মার্গেণ) নেষ্যথ (চালয়িষ্যথ)।

অনুবাদ,—ইতস্ততঃ লইয়া যাইবার জন্য যাঁহার জালসম্পন্না (অর্থাৎ বন্ধনকারিণী) এবং বিষস্বভাবা তৃষ্ণা নাই, সেই অনন্ত-জ্ঞান-শালী অগোচর বুদ্ধকে কোন্ পথে লইয়া যাইতে পার?

যে ঝানপসুতা ধীরা নেকৃথ*ম্মূপসমে রতা।
দেবাইপি তেসং পিহয়ন্তি সম্বুদ্ধানং সতীমতং ॥ ৩॥

অন্বয়—যে ঝানপসুতা ধীরা নেকৃথম্মূসমে রতা, সতীমতং সম্বুদ্ধানং তেসং দেবাইপি পিহয়ন্তি।

সংস্কৃত,—যে ধ্যানপ্রসীতাঃ (ধ্যানপরায়ণাঃ) ধীরাঃ (জ্ঞানিনঃ), নৈষ্কর্ম্ম্যোপশমে রতাঃ (সংসারত্যাগ-জনিত-শান্তৌ অবস্থিতাঃ), স্মৃতিমতাং (সতত-স্মৃতি-যুক্তানাং) সম্বুদ্ধানাং (বোধিজ্ঞানমাপন্নানাং) তেষাং (পুরুষাণাং) (সৌভগ্যায় ইতি শেষঃ) স্পৃহয়ন্তি (অত্যর্থমভিলষন্তি)।

অনুবাদ,—যিনি ধ্যানপরায়ণ, বৈরাগ্য-বান্, সতত স্মৃতিযুক্ত ও বোধি-জ্ঞান-সম্পন্ন, সেরূপ ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্য, দেবতাদিগেরও স্পৃহনীয়।

কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চানং জীবিতং।
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবণং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপ্পাদো ॥ ৪ ॥

অন্বয়—মনুস্সপটিলাভো কিচ্ছো, মচ্চানং জীবিতং কিচ্ছং, সদ্ধম্মসবণং কিচ্ছং, বুদ্ধানং উপ্পাদো কিচ্ছো।

সংস্কৃত,—মানুষ্যপ্রতিলাভঃ (মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তিঃ) কৃচ্ছ্রঃ (দুর্ল্লভঃ) মর্ত্ত্যানাং (মরণশীলানাং নরাণাং) জীবিতং (জীবনং) কৃচ্ছ্রং (দুরক্ষ্যং), সদ্ধর্ম্মশ্রবণং কৃচ্ছ্রং (দুর্ল্লভং), বুদ্ধানাং উৎপাদঃ কৃচ্ছ্রঃ (জন্ম দুর্ল্লভং)।

অনুবাদ,—মানব-জন্মলাভ দুর্ল্লভ, মরণশীল মনুষ্যের জীবন রক্ষা করা কঠিন। সত্যধর্ম্মশ্রবণ দুর্ল্লভ, বুদ্ধগণের উৎপত্তি দুর্ল্লভ।

সব্বপাপস্স অকরণং কুশলস্স উপসম্পদা।
সচিত্তপরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানং সাসনং ॥ ৫ ॥

অন্বয়,—সব্বপাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা, সচিত্তপরিয়োদপনং, এতং বুদ্ধানং সাসনং।

* "নেক্‌খম্মং"—এই শব্দটি—চিলডার্স (Childers) সাহেব 'নৈষ্ক্রম্যং' এই সংস্কৃত শব্দের প্রতিরূপ কহেন, এবং ইঁহাকে 'নৈষ্কর্ম্ম্যং' এই শব্দের প্রতিরূপ বলিতে আপত্তি করেন। তাহার প্রধান কারণস্বরূপ তিনি এই কথা বলেন যে, নৈষ্কর্ম্য বলিলে যাহা বুঝায়, বৌদ্ধ-সন্ন্যাস ধর্ম্মে তাহা নাই। বৌদ্ধসন্ন্যাসের উদামশীলতাই বিশেষত্ব।

সংস্কৃত,—সর্ব্বপাপস্য অকরণং, কুশলস্য (পুণ্যকর্ম্মণঃ) উপসম্পদা (প্রাপ্তিঃ, করণমিত্যর্থঃ), স্বচিত্ত-পর্য্যবদাপনং (আত্মচিত্তনির্ম্মলীকরণং) এতৎ (ইদং) বুদ্ধানাং শাসনম্ (আদেশঃ)।

অনুবাদ,—কোন প্রকার পাপ কর্ম্ম না করা, কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, এবং আপন চিত্তকে নির্ম্মল করা, ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন।

খন্তী পরমং তপো তিথিকৃথা, নিব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।
ন হি পব্বজিতো পরূপঘাতী সমনো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো ॥

অন্বয়,—খন্তী পরমং তপো, তিতিকৃথা পরমং নিব্বাণং (ইতি) বুদ্ধা বদন্তি। পরূপঘাতী ন হি পব্বজিতো, পরং বিহেঠয়ন্তো (ন চ) সমনো হোতি।

সংস্কৃত,—ক্ষান্তিঃ পরমং তপঃ, তিতিক্ষা পরমং নির্ব্বাণং ইতি বুদ্ধা বদন্তি। পরোপঘাতী ন হি প্রব্রজিতঃ (ভিক্ষুঃ), পরং বিহেঠয়ন্ (উৎপীড়য়ন্, জন ইতি শেষঃ) ন চ শ্রমণো ভবতি।

অনুবাদ,—বুদ্ধগণ বলেন, ক্ষান্তিই পরম তপস্যা, তিতিক্ষাই পরম নির্ব্বাণ। পরঘাতী, ভিক্ষু হইতে পারে না; পর-পীড়নকারী ব্যক্তি, শ্রমণ হইতে পারে না।

অনূপবাদো অনূপজাতো পাতিমোক্‌খে চ সংবরো।
মত্তঞ্ঞুতা চ ভত্তস্মিং পন্থঞ্চ সয়নাসনং।
অধিচিত্তে চ আযোগো এতং বুদ্ধানং সাসনং ॥ ৭ ॥

অন্বয়,—অনূপবাদো, অনূপজাতো, পাতিমোক্‌খে চ সংবরো, ভত্তস্মিং মত্তঞ্ঞুতা চ, পন্থং অয়নাসনঞ্চ, অধিচিত্তে আযোগো চ, এতং বুদ্ধানং সাসনং।

সংস্কৃত,—অনুবাদঃ, অনুপজাতঃ, প্রাতিমোক্ষ্যে (পঞ্চশীলেষু দশশীলেষু বা) সংবরশ্চ (সম্যগনুষ্ঠানত্বম্) ভক্তে (আহারে) মাত্রাজ্ঞতা চ (মিতাহারশ্চ ইত্যর্থঃ), প্রান্তং (একদেশে) শয়নাসনঞ্চ, অধিচিত্তে (সমাধৌ) আয়োগশ্চ (অবস্থানঞ্চ), এতৎ বুদ্ধানাং শাসনং।

'পাতিমোক্‌খে সংবরো'—প্রতিমোক্ষ্যে সংবরঃ।

অনুবাদ—কাহারও নিন্দা করিবে না, কাহাকেও প্রহার করিবে না, পঞ্চশীলে বা দশশীলেই চিত্তকে সুদৃঢ় রাখিবে, ভোজনে মিতাহারী হইবে, উপ-বেশনে ও শয়নে সংযত হইবে ও সর্ব্বদা মনকে যোগযুক্ত রাখিবে, ইহাই বুদ্ধের আদেশ।

ন কহাপণবস্‌সেন তিত্তি কামেসু বিজ্জতি।
অপ্পস্‌সাদা দুখা কামা ইতি বিঞ্‌ঞায় পণ্ডিতো॥ ৮॥

অন্বয়,—কহাপণবস্‌সেন কামেসু তিত্তি ন বিজ্জতি; কামা অপ্পস্‌সাদা দুখা (চ) ইতি বিঞ্‌ঞায় (পুগ্‌গলো) পণ্ডিতো (হোতি)।

সংস্কৃত,—কার্ষাপণবর্ষেণ (কার্ষাপণেতি মুদ্রাবিশেষস্য বর্ষেণ) কামেষু তৃপ্তি র্ন বিদ্যতে; কামা অল্পস্বাদা দুঃখাঃ (দুঃখকরাঃ) ইতি বিজ্ঞায় নরঃ পণ্ডিতো ভবতি।

অনুবাদ,— কার্ষাপণ (মুদ্রাবিশেষ—কড়ি) বর্ষণ করিলেও, বাসনার তৃপ্তি হয় না; বাসনাসকল, অল্পস্বাদযুক্ত এবং দুঃখকর, ইহা জানিতে পারিলে, মনুষ্য, পণ্ডিত হইয়া থাকে।

অপি দিব্বেসু কামেসু রতিং সো নাধিগচ্ছতি।
তনহক্‌খয়রতো হোতি সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো॥ ৯॥

অন্বয়,—সম্মাসম্বুদ্ধসাবকো দিব্বেসু অপি কামেসু রতিং ন অধিগচ্ছতি; তন্‌হক্‌খয়রতো হোতি।

সংস্কৃত,—সম্যক্‌সম্বুদ্ধশ্রাবকঃ (বুদ্ধদেশিত-ধর্ম্মাচারী ভিক্ষুঃ) দিব্যেষু (স্বর্গীয়েষু দেবোচিতেষু ইত্যর্থঃ) অপি কামেষু রতিং নাধিগচ্ছতি (ন প্রাপ্নোতি), পরন্তু তৃষ্ণাক্ষয়রতো ভবতি।

অনুবাদ—বৌদ্ধভিক্ষু, স্বর্গীয় (অর্থাৎ দেবোচিত) বাসনাসকলেও সুখানুভব করেন না, কিন্তু তৃষ্ণাক্ষয় করিতে রত থাকেন।

বহুং বে সরণং যন্তি পব্বতানি বনানি চ।
আরামরুক্‌খচেত্যানি* মনুস্‌সা ভয়তজ্জিতা॥ ১০॥

অন্বয়,—মনুস্‌সা ভয়তজ্জিতা (সন্তা) পব্বতানি বনানি আরামরুক্‌খচেত্যানি চ (ইতি) বহুং বে সরণং যন্তি।

সংস্কৃত,—মনুষ্যাঃ ভয়তর্জ্জিতাঃ (সন্তঃ) পর্ব্বতানি বনানি আরামবৃক্ষচৈত্যানি (উদ্যান-বৃক্ষ-চৈত্যানি) চ (ইত্যাদিম্) বহুং বৈ শরণং (আশ্রয়ং) যান্তি।

* চেত্য—চৈত্য: অস্থি, দন্ত ইত্যাদি বুদ্ধ-শরীরাবশেষের উপর নির্ম্মিত মন্দিরাদিকে চৈত্য বলে।

অনুবাদ,—মনুষ্য, ভয়বিহ্বল হইয়া পর্ব্বতে, বনে, উদ্যানবৃক্ষে, চৈত্যে, ইত্যাদি বহু স্থানে শরণ লইয়া থাকে।

নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং।
নেতং সরণমাগম্য সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি॥ ১১॥

অন্বয়,—এতং খো খেমং সরণং ন (হোতি) এতং উত্তমং সরণং ন (হোতি), এতং সরণং আগম্য সব্বদুক্‌খা ন পমুচ্চতি।

সংস্কৃত,—এতৎ (পর্ব্বতাদিকং) খলু ক্ষেমং (নিরাপদং) শরণং ন ভবতি, এতৎ উত্তমং শরণং ন ভবতি, এতৎ শরণং আগম্য (লব্ধা) (মানবঃ) সর্ব্বদুঃখাৎ ন প্রমুচ্যতে।

অনুবাদ,—কিন্তু এ সকল নিরাপদ আশ্রয় নহে; এ সকল উত্তম আশ্রয় নহে। এ সকলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো।
চত্বারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি॥ ১২॥
দুক্‌খং দুক্‌খসমুজ্জাদং দুক্‌খস্‌স চ অতিক্কমং।
অরিয়ঞ্চঽচট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গং দুক্‌খুপসমগামিনং॥ ১৩॥
এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং।
এতং সরণমাগম্য সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি॥ ১৪॥

অন্বয়,—যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো; দুক্‌খং, দুক্‌খসমুপ্পাদং, দুক্‌খস্‌স অতিক্কমঞ্চ, দুক্‌খূপসমগামিনং অরিয়ং অট্‌ঠঙ্গিকং মগ্‌গঞ্চ ইতি চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মসপঞ্‌ঞায় পস্‌সতি; এতং খো খেমং সরণং (হোতি), এতং উত্তমং সরণং (হোতি), এতং সরণং আগম্ম (পুগ্‌গলো) সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।

সংস্কৃত,—যশ্চ যদি (কোঽপীত্যর্থঃ) বুদ্ধঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ (বৌদ্ধভিক্ষুমণ্ডলীঞ্চ) শরণং গতঃ; দুঃখং, দুঃখ-সমুৎপাদং (দুঃখোৎপত্তিং) দুঃখস্য অতিক্রমঞ্চ, দুঃখোপশমগামিনং আর্য্যং অষ্টাঙ্গিকং মার্গং ইতি চত্বারি আর্য্যসত্যানি সম্যক্‌প্রজ্ঞয়া (সম্যগ্‌-জ্ঞানেন) পশ্যতি; (তদা) এতৎ খলু (নিশ্চিতং) ক্ষেমং (নিরাপদং) শরণং (আশ্রয়ঃ) ভবতি, এতৎ উত্তমং শরণং ভবতি, এতৎ শরণং আগম্য (প্রাপ্য, আশ্রিত্য) (মনুষ্যঃ) সর্ব্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে।

"বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ—বুদ্ধ, বুদ্ধ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধভিক্ষুমণ্ডলী (সঙ্ঘ)।

এই তিনটিকে বৌদ্ধশাস্ত্রে ত্রিরত্ন বলে। প্রত্যেক বৌদ্ধকেই এই তিনটিকে সম্মান করিতে হয় এবং ইহাদের শরণ লইতে হয়।

"চত্তারি অরিয়্সচ্চানি"—দুঃখ আছে, দুঃখের উৎপত্তি অর্থাৎ কারণ আছে, দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং অষ্টাঙ্গ-মার্গ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার উপায়, এই চারিটি সত্যকে বৌদ্ধশাস্ত্রে আর্য্য সত্য কহে।

"অট্ঠঙ্গিকং মগ্গং"—সম্মাদিট্ঠি (সম্যক্ দৃষ্টি), সম্মাসঙ্কপ্পো (সম্যক্‌সঙ্কল্প), সম্মাবাচা (সম্যক্ বাক্য), সম্মাকম্মন্তো (সম্যক্ কর্ম্মান্ত অর্থাৎ উত্তম ব্যবসায়), সম্মাআজীবো (সম্যগাজীব অর্থাৎ উত্তম জীবিকা), সম্মা-ব্যায়াম (সম্যক্ ব্যায়াম অর্থাৎ উত্তম চেষ্টা), সম্মাসতি (সম্যক্ স্মৃতি), সম্মা সমাধি (সম্যক্ সমাধি অর্থাৎ ধ্যান) এই আটটিকে অষ্টাঙ্গমার্গ বলে।

অনুবাদঃ—যদি কেহ বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণ লয় এবং দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের অতিক্রম ও দুঃখোপশমকারী আর্য্য অষ্টাঙ্গ-মার্গ—এই চারিটি আর্য্য সত্য, সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দেখে, তবে তাহাই নিরাপদ আশ্রয়; তাহাই উত্তম আশ্রয়। সেই আশ্রয় অবলম্বন করিলে, সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

দুল্লভো পুরিসাজঞ্ঞো ন সো সব্বথ জায়তি।
যত্থ সো জায়তি ধীরো তং কুলং সুখমেধতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়;—পুরিসাজঞ্ঞো দুল্লভো, সো সব্বথ ন জায়তি, যত্থ সো ধীরো জায়তি, তং কুলং সুখমেধতি।

সংস্কৃত,—পুরুষাজানেয়ঃ (পুরুষশ্রেষ্ঠঃ বুদ্ধ-বদিতি ভাবঃ) দুর্লভঃ, সঃ সর্ব্বত্র ন জায়তে। যত্র স ধীরঃ (জ্ঞানী) জায়তে, তৎ কুলং সুখং এধতে।

অনুবাদ,—(বুদ্ধের ন্যায়) পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্লভ। তদ্রূপ লোক, সর্ব্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না, সেই প্রকার মহাত্মা, যেথানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুলের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়।

সুখো বুদ্ধানং উপ্পাদো সুখা সদ্ধম্মদেসনা।
সুখা সঙ্ঘস্স সামগ্গি সমগ্গানং তপো সুখো ॥ ১৬ ॥

অন্বয়;—বুদ্ধানং উপ্পাদো সুখো, সদ্ধম্মদেসনা সুখা, সঙ্ঘস্স সামগ্গি সুখা সমগ্গানং তপো সুখো।

সংস্কৃত—বুদ্ধানাং উৎপাদঃ (উৎপত্তিঃ, জন্ম) সুখঃ (সুখকরঃ) সদ্ধর্ম্মদেশনা (সদ্ধর্ম্মোপদেশঃ) সুখা (সুখদায়িকা) সঙ্ঘস্য সামগ্রী (শান্তিঃ) সুখা, সমগ্রাণাম্ (শান্তানাম্) তপঃ সুখম্।

অনুবাদ—বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুখজনক; সদ্ধর্ম্মের উপদেশ সুখকর; সঙ্ঘের শান্তি সুখদায়িকা। শান্তগণের তপস্যা সুখদ।

পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে যদি ব সাবকে।
পপঞ্চ-সমতিক্কন্তে তিণ্ণসোকপরিদ্দবে ॥ ১৭ ॥
তে তাদিসে পূজায়তো নিব্বুতে অকুতোভয়ে।
ন সক্কা পুঞ্ঞং সংখ্যাতুং ইমেত্তমপি কেনচি ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধ-বগ্গো চতুদ্দসমো ॥
পঠমকভাণধারং নিট্ঠিতং ॥

অন্বয়;—পূজারহে বুদ্ধে যদি ব সাবকে পূজয়তো, পপঞ্চসমতিক্কন্তে, তিণ্ণসোকপরিদ্দবে তাদিসে নিব্বুতে অকুতোভয়ে তে পূজয়তো ইমেত্তমপি পুঞ্ঞং সংখ্যাতুং ন কেনচি সক্কা।

সংস্কৃত,—পূজার্হান্ (পূজনীয়ান্) বুদ্ধান্ যদি বা শ্রাবকান্ (তচ্ছিষ্যান্ ভিক্ষূন্) পূজয়তঃ প্রপঞ্চসমতিক্রান্তান্ (তৃষ্ণাদৃশ্যমান-প্রপঞ্চাতিক্রান্তান্), তীর্ণশোকপরিদ্রবান্ তাদৃশান্ নির্বৃতান্ (সুখিতান্) অকুতোভয়ান্ তান্ পূজয়তাম্ নরাণাং পুণ্যং সংখ্যাতুং ন কেনচিৎ শক্যাঃ।

অনুবাদ—যিনি সকল প্রকার প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়াছেন, শোক মোহ প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সকল প্রকার বাসনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন ও যিনি অকুতোভয়, এরূপ পূজার্হ যে বুদ্ধ, কিংবা বৌদ্ধ-শ্রাবকদিগকে যিনি পূজা করেন, কোন ব্যক্তিই, তাঁহাদের পুণ্যের কোন সংখ্যা করিতে পারে না।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

অধ্যাত্মতত্ত্ব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যুক্তিযোগে ও প্রমাণ-বলে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে উহার কতকগুলি আপত্তি নিরসন পূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছি।

যদি চক্ষুঃ তৈজসিক হয়, তবে কেন স্বীয় চক্ষুর রূপ দৃষ্ট হয় না? কেনই বা চক্ষুর রশ্মি, ইতস্ততঃ নির্গত হয় না? তেজের গুণ রূপ। রূপ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়। কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের রূপ বা রশ্মি দেখিতে পায় না। অপিচ তাহার উষ্ণতা, গুণ অনুভূত হয় না। অতএব চক্ষুকে তেজোময় বলা সঙ্গত নয়।

ইহার উত্তর—সর্ব্বত্র তেজঃ প্রত্যক্ষ হয় না এবং তাহার উষ্ণতার উপলব্ধি হয় না। অনুদ্ভূতাবস্থায় কোনও বস্তুরই জ্ঞান হয় না। যাহা কখন প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার পরোক্ষতা বশতঃ বস্তুর অস্বীকার যুক্তিসঙ্গত হয় না, বরফেও অনুদ্ভূতাবস্থায় তেজঃ থাকে, কিন্তু উপলব্ধি হয় না; তাই বলিয়া কি তত্রত্য তেজের অস্বীকার করিতে হইবে?

বিশেষতঃ, কাহা দ্বারা নিজের চক্ষু দেখিব? সাধনাভাবে কার্য্য সাধিত হয় না। যেমন দর্পণে সেই দর্পণের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় না। সেইরূপ চক্ষুঃ, স্বীয় কর্ম্ম দেখিতে পায় না; কিন্তু—

"নক্তঞ্চর-নয়ন-রশ্মি-দর্শনাচ্চ।" ইতি গোতম।

রাত্রিতে বা অন্ধতমসাবৃত স্থানে বিড়ালাদির চক্ষুর রশ্মি দৃষ্ট হয়। দিবসে দিবাকরের প্রবল তেজে অভিভূত হওয়ায়, বিড়ালাদির নেত্ররশ্মি ভাল প্রতিভাত হয় না। প্রবল শক্তির নিকট ক্ষুদ্র শক্তি প্রকাশ পায় না। এই কারণে দিবসে উল্কাপাত দৃষ্ট হয় না, এবং নভোমণ্ডল, নক্ষত্রচক্রে খচিত হয় না। যখন বিড়ালের নেত্ররশ্মি প্রত্যক্ষ হয়, তখন দৃষ্ট পরিকল্পনা-

ন্যায়ে মানবীয় চক্ষুতে রশ্মির স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি—চক্ষু টিপিয়া ধরিলে, তাহা হইতে রশ্মি নির্গত হওয়ায় চক্ষুর তৈজসিকত্ব স্বীকার অসঙ্গত নয়।

আর এক আপত্তি—পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীকার না করিয়া এক ত্বগিন্দ্রিয় স্বীকার করিলে লাঘব হয়। লাঘব-সত্ত্বে গৌরব স্বীকার অসঙ্গত। যেমন এক আকাশ, ঘটাদি উপাধিভেদে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই ত্বক্, স্থানভেদে কখন চক্ষুঃ, কখন কর্ণ, কখন নাসিকা, কখন ত্বক্, কখন বা রসনা নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্ণ-বিবর-গত ত্বক্ই, বায়ু-বলে আনীত বা তরঙ্গ-সন্তানবৎ সঞ্জাত শব্দ শ্রবণ করে। চক্ষুর্গত ত্বক্ই, চক্ষুতেই প্রতি-ফলিত ঘটকে প্রত্যক্ষ করে। রসনাগত ত্বক্ই, রসের আস্বাদন করে। সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি বস্তুর বিশ্লিষ্ট পরমাণু-নিচয়, বায়ুভরে নাসারন্ধ্রগত ত্বকে আকৃষ্ট হওয়ায় গন্ধ আঘ্রাত হয় এবং সর্ব্বাবয়ব-গত ত্বক্ই, শীতোষ্ণাদি স্পর্শ করে। অতএব একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয় স্বীকার করিলে চরিতার্থতা হয়, তবে কেন পাঞ্চভৌতিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীকার করি?

ইহার প্রথম উত্তর—কার্য্যভেদে কারণের ভেদ-স্বীকার ন্যায়সঙ্গত। কার্য্য যখন দর্শনাদি-পঞ্চক, তখন কারণও, চক্ষুরাদি-পঞ্চক। স্থান-ভেদে ত্বকের পঞ্চধা স্বীকার করাও যা, আর পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীকার করাও তাই। বিশেষতঃ, এক জাতীয় ত্বক্, কখনই ক্ষিত্যাদি-পঞ্চকের গন্ধাদি-পঞ্চক গ্রহণ করিতে পারে না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সজাতি সজাতির আকর্ষণ করে। বায়ুবিকৃত ত্বক, দর্শনাদি করিতে সমর্থ হয় না। তাদৃশ ত্বক্, কেবল স্পর্শ করিতে সমর্থ। অতএব বলিতে হইবে, চক্ষুঃ-কোটরগত ত্বক্, তৈজসিক রসনাগত ত্বক্, জলীয় ইত্যাদি। এইরূপ উপাদান ভেদে ত্বকের পার্থক্য স্বীকার অপেক্ষা পাঞ্চ-ভৌতিক পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বীকার, লঘু।

দ্বিতীয় উত্তর—ত্বক্, সন্নিকৃষ্ট বস্তু স্পর্শ করে, বিপ্রকৃষ্ট বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। তখন নেত্রগত ত্বক্, দূরস্থিত বস্তু দেখিতে পাইবে কেন? প্রায় সকল ইন্দ্রিয়, নিকটের বিষয় গ্রহণ করে, কেবল চক্ষুঃ দূরের বিষয় গ্রহণ করে। অতএব চক্ষুর সহিত ত্বকের বিজাতীয় ভাব, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

অপিচ, যখন বিষয়,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচ প্রকার, তখন তাহার গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও, পাঁচ প্রকার স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ত্বকের দ্বারা স্পর্শ হয়, রূপ দর্শন হয় না ; অতএব রূপ-দর্শনের জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে অন্যান্য ইন্দ্রিয় স্বীকার্য্য। এক চক্ষুঃ—নীল, পীত নানাবর্ণ দেখিতে পায় বলিয়া, নানা চক্ষুঃ-স্বীকার যুক্তিসঙ্গত নয়। কেন না, নীল-পীতাদি সকলই রূপ-জাতীয়। সকলেরই দর্শনরূপ এক ক্রিয়া ; অতএব ক্রিয়াগত ভেদানুসারে কারণগত-ভেদ-স্বীকারের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল।

তৃতীয় উত্তর—উপাদান-কারণের ভেদে ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। চক্ষুঃ, রূপাভিব্যঞ্জক ; অতএব চক্ষুঃ, রূপের আশ্রয় তেজের অংশ। কর্ণ, শব্দ গ্রহণ করে ; অতএব কর্ণ, শব্দসমবায়ী আকাশস্বরূপ। নাসিকা-যুগল, গন্ধ আঘ্রাণ করে, অতএব নাসা, গন্ধের আশ্রয়—ক্ষিতির বিকার। রসনায় রসের আস্বাদ হয়, অতএব রসনা, রসের আশ্রয় জলের রূপান্তর। ত্বকে স্পর্শ জ্ঞান হয়, অতএব ত্বক্, স্পর্শ-গুণবান্ বায়ুর বিকার। ইহার যুক্তি, প্রথম প্রস্তাবে বিস্তৃত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রূপে উপাদান-ভেদে ইন্দ্রিয়গণের পঞ্চধা স্বীকৃত হইয়াছে।

ইহার উপর আর এক আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। আকাশের একমাত্র গুণ—শব্দ। যখন কর্ণ, একমাত্র শব্দ গ্রহণ করে, রূপাদি গ্রহণ করিতে পারে না, তখন স্বীকার করা যাইতে পারে,—কেবল আকাশ হইতে কর্ণ সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ত্বক্, কেবল বায়ুর বিকার, ইহা স্বীকার করা, কিরূপে সঙ্গত হয়? বায়ুতে দুটী গুণ লক্ষিত হয়—এক স্পর্শ, দ্বিতীয় শব্দ। সকলেই জানেন, বায়ু ভোঁ ভোঁ শব্দে প্রবহমান হয় বলিয়া বায়ুর প্রত্যক্ষতা, কর্ণের দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং বায়ুর শৈত্য-গুণটী, ত্বকের দ্বারা অনুভূত হয়। যাহার কারণে যে গুণ থাকে, সেই কার্য্যে সেই গুণ সংক্রান্ত হয়। অথচ ত্বকে কেবল স্পর্শ অনুভূত হয়। অতএব দেখুন, তেজে তিনটী গুণ রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। অগ্নির রূপ বেশ দৃষ্ট হয়, তাহার উষ্ণতা অনুভূত হয় এবং ভুগু ভুগু বা ধক্ ধক্ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। যদি নেত্র এহেন অগ্নির অংশে জন্মিয়া থাকে, তবে কেন সে, পৈতৃক সমস্ত গুণে বঞ্চিত হয়? সকলেই জানেন, চোক কেবল রূপ দর্শন করে, স্পর্শ ও শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব চক্ষুকে খাঁটি

অগ্নিকুমার বলিতে পারা যায় না। জলে চারিটি গুণের উপলব্ধি হয়—রস, রূপ, শব্দ ও স্পর্শ? কিন্তু তাহার সন্তান রসনায় রস বই কিছু উপলব্ধি না হওয়ায় জারজ বলিয়া ভ্রম হয়। এই প্রকার নাসা, পৃথিবীর (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের) সমগ্র সম্পত্তির অধিকারিণী হয় না। * এই প্রকার আপাততঃ ইন্দ্রিয়কে ভৌতিক শাঙ্করতা-দোষে দোষী করা যাইতে পারে।

বাস্তবিক আকাশ ব্যতীত অন্যান্য ভূতের সাধারণ ও অসাধারণ দুইপ্রকার গুণ আছে। শ্রুতিতে আছে—'এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে॥ অর্থাৎ এতাদৃশ আত্মা (পরমেশ্বর) হইতে প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু,

---

* শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ॥
প্রতিধ্বনি-বিয়চ্ছব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনং।
অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগু-ভুগু-ধ্বনিঃ॥
উষ্ণঃ স্পর্শঃ প্রভারূপং জলে চুলু-চুলু-ধ্বনিঃ।
শীতঃস্পর্শঃ শুক্লোরূপং রসোমাধুর্য্যমীরিতং।
ভূমৌ কড় কড়া শব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ।
সুরভীতর-গন্ধৌদ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ॥—পঞ্চদশী।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী পঞ্চভূতের গুণ। তাহার মধ্যে আকাশাদিতে একটী, দুটী, তিনটী, চারিটী ও পাঁচটী যথাক্রমে অবস্থান করিতেছে। আকাশের একমাত্র প্রতিধ্বনিরূপ শব্দ গুণ। বায়ুতে 'বী সী' এই প্রকার অব্যক্ত শব্দ ও নাতিশীতোষ্ণ-স্পর্শ এই দুটী গুণ, অগ্নির "ভগু ভগু" ধ্বনি, উষ্ণস্পর্শ ও প্রভারূপ এই তিন গুণ, জলে 'চুলু চুলু' ধ্বনি, শীতল স্পর্শ, শুক্লরূপ ও মাধুর্য্য রস এই চারি গুণ এবং পৃথিবীতে 'কড় কড়' শব্দ, কাঠিন্য স্পর্শ, নীল, লোহিত প্রভৃতি বিচিত্র রূপ, মধুরাদি ষট্ রস, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ এই পঞ্চ গুণ বিরাজ করিতেছে। পণ্ডিতগণ এইরূপ মীমাংসা স্থির করিয়াছেন।

বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী সমুৎপন্ন হইয়াছে। আত্মা নির্গুণ। কাজেই আকাশ, পৈতৃক সম্পদের অধিকারী হয় নাই। তাহার নিজগুণ একমাত্র শব্দ। বায়ুর স্বীয় গুণ স্পর্শ, পরকীয় গুণ শব্দ। অগ্নির আত্মগুণ রূপ এবং পৈতৃক গুণ শব্দ ও স্পর্শ। জলের নিজগুণ রস; অন্যদীয় গুণ রূপাদি এবং ক্ষিতির অসাধারণ গুণ ও সাধারণ গুণ শব্দাদি চতুষ্টয়। অসাধারণ গুণযুক্ত ক্ষিতি প্রভৃতিই, ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের উৎপাদক।

"সংসর্গাচ্চানেক-গুণ-গ্রহণং।"—গোতম।

অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতে এক একটী গুণ থাকে; সংসর্গবশতঃই গুণান্তর পরিলক্ষিত হয়। পার্থিব পুষ্পাদিতে জলাদির সংযোগ-বশতঃই রূপাদি গুণের সত্তা দৃষ্ট হয়। দৃশ্যমান পুষ্পাদি কেবল পার্থিব নয়। পঞ্চীকৃত পৃথিবীর বিকার। পৃথিবীর অংশ বেশী থাকায় পার্থিব নামে ব্যবহৃত হয়। "অধিকে ন ব্যপদেশা ভবন্তি"—এই ন্যায়-বলে যাহার অংশ অধিক থাকে, তাহার নামে ব্যবহৃত হয়। বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া আকাশের সহিত সংসৃষ্ট হয় বলিয়াই, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুটী গুণ বিদ্যমান থাকে। এই প্রকার অগ্নি প্রভৃতিতে গুণান্তরের সংসর্গ হয়।

ইন্দ্রিয়-নিচয়, যেমন বাহ্য বস্তুর গ্রহণ করে, সেইরূপ অন্তরের বস্তুও গ্রহণ করে। পঞ্চদশী বলিতেছেন—

"কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দান্তরঃ।
প্রাণ-বায়ৌ জঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্ন-ভক্ষণে।
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরঃ স্পর্শো মীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রস-গন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরঃ গ্রহঃ॥

অর্থাৎ কর্ণ, অঙ্গুলি দ্বারা আচ্ছাদন করিলে, প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নি হইতে উত্থিত শব্দ শ্রুত হয়। জলপান ও অন্ন-ভক্ষণ-কালে আন্তরিক স্পর্শ অনুভূত হয়। নেত্র মুদ্রিত করিলে অন্তরে অন্ধকারবৎ এক প্রকার রূপ দর্শন হয়। (যোগিগণের মুদ্রিত নেত্রে জ্যোতির্ম্ময় দেব-মূর্ত্তির বিকাশ হয়)। উদ্গার-কালে রসনায় রস ও নাসিকায় গন্ধের উপলব্ধি হয়। এই প্রকারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বাহিরের ন্যায় অন্তরের জ্ঞান সম্পন্ন হয়।

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় রূপ। রূপ, সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত থাকে।

রূপ, নিজের আশ্রয়ভূত দ্রব্য পরিহার করে না। গুণমাত্রই নিজের আশ্রয় ত্যাগ করে না। গন্ধ, যেমন দ্রব্যের প্রতি-অণুতে থাকে,—রূপ সেরূপ অণুতে অণুতে থাকে না। যদি রূপ, প্রত্যেক অণুতে থাকিত, তবে নিয়ত বিশ্লিষ্ট রূপ, বায়ুভরে চক্ষুর সন্নিধানে নীত হইত। পুষ্পাদির গন্ধ, যেমন নাসিকার উপর আঘ্রাত হয়; সেইরূপ রূপের প্রত্যক্ষতাও, চক্ষুর উপর হইত। পুরোবর্ত্তী দ্রব্যের নিকট সে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সাধিত হইত না। তাহা যখন হয় না, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, মনই দর্শনকালে চাক্ষুষ তেজের সহিত দর্শনীয় বস্তুর সমীপে ধাবিত হয়। কেন না, কারণ ও কার্য্য, এক অধিকরণে থাকে। অন্য স্থানে কারণ থাকিলে, স্থানান্তরে তাহার কার্য্য সাধিত হয় না। এক গ্রামে ঘটের কারণ-স্বরূপ দণ্ড, সলিল, সূত্র, চক্র ও কুম্ভকার থাকিলে, অন্য গ্রামে ঘট প্রস্তুত হয় না। যদি কার্য্য-কারণের এক অধিকরণ হওয়ার নিয়ম না থাকিত, তবে গ্রামান্তরে ঘট প্রস্তুতের বাধা থাকিত না। অতএব মনই শরীর ছাড়িয়া ঘটাদি দ্রব্য দেখিতে বাহিরে যায়। ইহা বৈদান্তিকের মত।

বড়ই বিস্ময়ের কথা—মনঃ, স্বাশ্রয় পরিহার করিয়া, ঘট দেখিতে ঘটের নিকট যায়। দাহিকা শক্তি, যেমন অগ্নি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে না, সেইরূপ মনেরও অন্যত্র গমন, আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রণিধানে এ আপত্তি, অকিঞ্চিৎকর প্রতীত হয়। ধর্ম্ম, ধর্ম্মী পরিহার করিতে পারে না সত্য; কিন্তু মনঃ, কাহার ধর্ম্ম? দেহের, না আত্মার? এ দেহাবসানে যখন মনের অস্তিতা স্বীকৃত হইয়াছে, তখন উহাকে দেহের ধর্ম্ম বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। মনঃ, আত্মারও ধর্ম্ম হইতে পারে না। কেননা, সুষুপ্তিকালে আত্মার সহিত মানসিক সংযোগের ধ্বংস হয়। তখন মনঃ, আত্মা ছাড়িয়া পুরীততী নাড়িতে অবস্থিতি করে।

অনেকে বলিতে পারেন—বিষয়-দেশে মনের গমনের আবশ্যকতা কি? প্রদীপ, যেমন একপ্রান্তে থাকিয়া সমস্ত গৃহ আলোকিত করে, সেইরূপ মনঃ, স্বস্থানে থাকিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে। ফলতঃ, কেহই এক স্থানে থাকিয়া স্থানান্তরের কার্য্য সাধন করিতে পারে না। এক গ্রামে ঢেঁকি পড়িলে, গ্রামান্তরে লোকের শিরঃপীড়া হয় না। প্রদীপের কথা বলি। প্রদীপও,

স্থানান্তর আলোকিত করিতে পারে না। প্রদীপ ও প্রদীপের প্রভা, স্বতন্ত্র বস্তু নয়; অথবা আমরা ধর্ম্মি-ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন নয়। অর্থাৎ প্রদীপ ধর্ম্মী, প্রভা তাহার ধর্ম্ম নয়। প্রদীপ ও প্রভা, একই বস্তু। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"নিবিড়াবয়বং হি তেজো দ্রব্যং প্রদীপঃ।
প্রবিলাবয়বং হি তেজো দ্রব্যং প্রভা।"

অর্থাৎ যে তেজের অবয়ব (পরমাণু), ঘন-সংশ্লিষ্ট তাহার নাম প্রদীপ। আর, যে তেজের অবয়ব, বিশ্লিষ্ট হইয়া চারি দিকে ছড়িয়া পড়ে, তাহার নাম প্রভা। প্রভা, প্রদীপ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিষয়-দেশে গমন করিয়া বিষয়কে প্রকাশ করে। স্থানান্তরস্থিত প্রদীপ, কাহাকে প্রদীপ্ত করিতেছে, ভাবা উচিত। আপত্তি করিতে পার, প্রদীপ ও প্রভা, যদি ভিন্ন হয়, তবে প্রদীপ নির্ব্বাণ করিলে প্রভা থাকে না কেন? তাহার কারণ—প্রভা, অতি তীব্রভাবে প্রদীপ হইতে নির্গত হইয়া স্বকারণ বায়ুতে অবিলম্বে বিলীন হয়। প্রভা, নির্গত হইলেও যে, প্রদীপের ক্ষয় দেখি না, তাহার কারণ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীয়মাণ প্রদীপের দেহ, তৈলে পূরিত হয়। আবার নিয়তই নূতন নূতন প্রভার নির্গম হেতু উহার (প্রভার) লয়, সাধারণ ধারণার অগোচর। তাই সেই সেই প্রভার অভাবেও প্রভার অভাব পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু প্রদীপের অভাবে প্রভার অভাব হয়। অতএব প্রদীপের দৃষ্টান্তে অভীষ্ট সাধন করিতে পারা যায় না।

আর এক আপত্তি—প্রভা, যেমন একবার প্রদীপ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে, সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না, সেইরূপ মনের সে অবস্থা হয় না কেন? কিন্তু মনঃ, দেহ হইতে নির্গত হইয়া দর্শন দ্বারা দেহে সঙ্গত হয়। সুষুপ্তিকালে মনের আত্মার প্রবর্ত্তনের যে হেতু, এখানেও সেই হেতু। সুষুপ্তিকালে মনঃ, আত্মার সহিত বিযুক্ত থাকে। সুষুপ্তির অনন্তর অদৃষ্ট ভোগের জন্য সংস্কার বশতঃ পুনর্ব্বার যুগল-মিলন হয়। বেদান্তপরিভাষায় চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ-সন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে,—"যথা তত্র তড়াগাদিকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারং প্রবিশ্য তত্তদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি, তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত্য ঘটাদির্বিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে। স এব পরিণামো বৃত্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ তড়াগাদির জল, ছিদ্র বহিয়া ক্ষেত্রে পতিত হইয়া, ক্ষেত্রাকার ধারণ করে। ক্ষেত্র—যদি চতুষ্কোণ হয়, তবে জলও, চতুষ্কোণ হয়; ত্রিকোণ হইলে ত্রিকোণ হয়। সেইরূপ তৈজস অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া নির্গত হইয়া বিষয়দেশে গমন করিয়া ঘটাদির আকার ধারণ করে। চিত্তের তাদৃশ পরিণামের (অবস্থার) নাম বৃত্তি। প্রত্যক্ষকালে চিত্তবৃত্তি, তাদৃশ হয় বলিয়া, স্মৃতিকালেও তাদৃশ রূপের স্মরণ হয়। চাক্ষুষ জ্ঞানের স্থলে মনঃ, বিষয়দেশে গমন করে। এই হেতু চাক্ষুষ জ্ঞানের ভাণ বিষয়দেশে হয়। স্পর্শ, আস্বাদ ও আঘ্রাণের সময়ে মনঃ, ইন্দ্রিয়ের নিকট উপস্থিত থাকে; তাই স্পর্শাদি জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সমীপে অনুভূত হয়। এখন শব্দজ্ঞানের কথা বলি।

"সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে"।

সমস্ত শব্দ, আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে বর্ত্তমান; তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। যে শব্দ শ্রোত্রসমীপে সমুৎপন্ন হয়, তাহাই শোনা যায়; দূরস্থ শব্দ শ্রবণগোচর হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এক স্থানে কারণ থাকিলে, অন্যস্থানে তাহার কার্য্য হয় না। আমি কথা কহিলে অন্যে শুনিতে পাইবে কেন? আমার কথা আমার সমীপে। তাহার কাণ, তাহার নিকট। এই জন্য বলিয়াছেন—"শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে"। কিন্তু কিরূপে সে শব্দ শ্রোত্রে উৎপন্ন হয়?

"বীচি-তরঙ্গ-ন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।
কদম্ব-কোরক-ন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে"॥—ভাষাপরিচ্ছেদ।

বীচিতরঙ্গবৎ শব্দের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ যেমন একটী তরঙ্গ, কোন প্রকারে উৎপন্ন হইলে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে শত শত তরঙ্গমালা সঞ্চালিত হইয়া স্রোতোমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে তাদৃশ অবিকল শব্দান্তর সমুৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে শব্দটী কর্ণসমীপে সঞ্জাত হয়, সেই শ্রোত্রোৎপন্ন শব্দের জ্ঞান হয়। কাহারও মতে যেমন কদম্ব-কোরক, একেবারে দশ দিকে বিকশিত হইয়া কেশর বিস্তার করে, সেইরূপ শব্দ, চারি দিকে উৎপন্ন হইয়া কর্ণশস্কুলী আঘাত করিলে, তাহার উপলব্ধি হয়। এই উভয় মতে মনকে শব্দ শ্রবণকালে বিষয়দেশে যাইতে হয় না। কর্ণসমীপে শ্রবণজ্ঞান জন্মে, তবে সেই শব্দ কাহার, কত দূর হইতে আসিতেছে, ইত্যাদি জ্ঞান, অনুমানবলে সাধিত হয়।

বেদান্তমতে শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয়দেশে গমন করে, তাই বিষয়দেশে চাক্ষুষ জ্ঞানের ন্যায় শ্রবণজ্ঞান হয়। অতএব বেদান্ত-পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি স্ব স্ব বিষয়সংযুক্তান্যেব প্রত্যক্ষজ্ঞানং জনয়ন্তি। তত্র ঘ্রাণ-রসন-ত্বগাত্মকানীন্দ্রিয়াণি স্বস্থানস্থিতান্যেব গন্ধ-রস-স্পর্শোপলব্ধানি জনয়ন্তি। চক্ষুঃশ্রোত্রে তু বিষয়দেশং গত্বা স্বং স্বং বিষয়ং গৃহ্নীতঃ।

সমস্ত ইন্দ্রিয়, স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সংযুক্ত (সমানাধিকরণ) হইয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। তাহার মধ্যে ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্, স্বস্থানে অবস্থান করিয়াই গন্ধ, রস ও স্পর্শের জ্ঞান উৎপাদন করে, কেবল চক্ষুঃ ও কর্ণ, বিষয়দেশে গমন করিয়া দর্শন ও শ্রবণ-জ্ঞান জন্মায়। এই জন্য দর্শন-জ্ঞান, চক্ষুর উপর না হইয়া ঘটাদি দূরস্থিত পদার্থে হয় এবং ভেরীশব্দ কর্ণসমীপে শ্রুত না হইয়া বিষয়-দেশে (ভেরীসমীপে) শ্রুত হয়।

করুণাময় পরমেশ্বর, ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন। ভাবিলে, কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয়। হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়ে সমাবিষ্ট, নতুবা চলিবার সময় দুই হস্ত দ্বারা বাহ্য বায়ুতে ভর দেওয়া ঘটিত না এবং উভয় পার্শ্বস্থ বস্তুনিচয়ের গ্রহণে অসুবিধা হইত। দৃষ্টিপূত স্থানে গমন করিতে হয়, তাই চরণযুগল অগ্রতাবিহারী। এক চক্ষুঃ, এক কর্ণ ও এক নাসারন্ধ্রে, দুই পার্শ্বের বিষয়গ্রহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না বলিয়া, ভগবান্ দুটী দুটী দিয়াছেন। অথচ এক জনের দুই চক্ষুতে একই দর্শন হয়, দুই কর্ণে একই শব্দ শোনা যায়, দুই নাসা-রন্ধ্রে, এককালে এক গন্ধ আঘ্রাত হয়। ব্যক্তি এক জন। তাহার মনঃও, একটী। ঠিক্ এক সময়ে দুয়ের নিকট যাইতে পারে না। গৃহ, সহস্রদ্বারময় হইলেও, এক ব্যক্তি, এক সময়ে সকল দ্বার দিয়া বহির্গত হইতে পারে না; যে সময়ে যে দ্বার দিয়া বহির্গত হইবার প্রয়োজন হয়, তখন সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হয়।

হস্ত-পদ ভিন্ন কর্ম্মেন্দ্রিয় এক; উহাদের দ্বৈতভাবের প্রয়োজন নাই।

সম্মুখে ভোজ্য বস্তু উপস্থিত। শরীর-পোষণের জন্য ভোজনের প্রয়োজন। তৃপ্তিও, আহারের প্রয়োজনানন্তর। সে ভোজ্য, পুষ্টিপ্রদ ও তৃপ্তিপ্রদ কি না পরীক্ষা করা উচিত; কিন্তু সে পরীক্ষার জন্য আয়াস করিতে হয় না। হস্ত দ্বারা

স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা কর, সুখস্পর্শ কি না। পরে চাক্ষুষ পরীক্ষা কর, সে তোমার ভোজ্য কি না। ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধের পরীক্ষা কর, পূতিগন্ধ কি না। অনন্তর রসনায় পরীক্ষা কর, সুরস কি না। অবশেষে স্বকার্য্য সাধন কর। এতগুলি পরীক্ষা, ইন্দ্রিয়ের সুচারু-সমাবেশ-বশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। জিহ্বার পরীক্ষায় একটু বিশেষ আছে। পাকস্থলীর অপাক-বশতঃ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া জিহ্বায় প্রলেপ জন্মে। প্রলিপ্ত রস-নায় প্রকৃত রসের তার পাওয়া যায় না। স্বেচ্ছাকিঙ্কর হইয়া যথেচ্ছ আহারে প্রবৃত্ত হইলেও, বিকৃত তার অনুভূত হয়। জিহ্বার প্রলেপের দ্বারা অনুকূল আহার স্থির করা যাইতে পারে। যদি দেখ—জিহ্বা, শাকপত্রবৎ প্রভাধারী, তবে বায়ুর অনুলোমকারক আহার কর। যদি উহা হরিদ্রাভ হয়, তবে পিত্তনাশক বস্তুই পথ্য। যদি প্রলেপ শুক্ল হয়, তবে শ্লেষ্মনাশক বস্তু হিতকর। ফলতঃ, জিহ্বা, প্রলিপ্ত থাকুক বা না থাকুক, হিতকর বস্তুরই অবিকৃত আস্বাদ অনুভূত হইবে। অতএব জিহ্বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভোজ্যই, ভোজন করা উচিত। যদি নাসিকাদি পশ্চাদ্ভাগে সমাবিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে শিরোবেষ্টন পূর্ব্বক আঘ্রাণাদি করিয়া আহার করিতে হইত। তাদৃশ অসুবিধা দূর করিবার জন্য করুণাময়, যথাযুক্ত অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পায়ু (মলদ্বার), পশ্চাদ্-দেশে অবস্থিত। তাই উৎসৃষ্ট মলের দুর্গন্ধের আঘ্রাণজনিত চিত্তের প্রতিকূল-বেদন, সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে হয় না। যে, এইরূপ বিচিত্র শিল্পের শিল্পীর স্বীকার করিতে চায় না, তাহার মত অদূরদর্শী দ্বিতীয় নাই।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

অহঙ্কার।

চিরদিন সমভাবে কখন কি যায় রে ?
দু' দিনের তরে আসে,
মনোহর ঋতুরাজ,
দু' দিনের তরে ধরা,
ধরে কত নব সাজ,
দু' দিনের তরে পিক, সুধা-স্বরে গায় রে।
আবার যখন হায়!
বসন্ত চলিয়া যায়,
তা'রই সনে ধীরে ধীরে সকলই ফুরায় রে:
তেমতি দু' দিন তরে,
কৃষ্ণ পক্ষ আসে যবে,
হায়! রে প্রকৃতি-ধনী
মলিনবদনা তবে,
শশীও, তখন হায়! গগনে লুকায় রে।
আবার পূর্ণিমা আসে,
আবার চন্দ্রমা হাসে,
আবার প্রকৃতি-বালা, হাস্য-নেত্রে চায় রে।
মানব-জীবন হায়!
ধরাতলে এই মত ;—
যেই জন ছিল কল্য
রাজ্য-সুখ-ভোগে রত,
আজি সে, মাগিছে অন্ন, ছিন্নবেশে হায় রে!
আবার সে জন আজ
করি'ছে দাসের কাজ,
সেই নর, হের—কল্য রাজ্য-পদ পায় রে।

সংসার-সাগরে জীব,
উঠি' ঊর্ম্মি-মালা-প্রায়
অদৃষ্ট-সমীর-সনে
ক্ষণ-কাল-তরে, হায়!
খেলা করি', তাহাতেই আবার মিশায় রে।
কেহ যায়—কেহ আসে—
কেহ কাঁদে—কেহ আসে—
চিরসুখে—চিরদুঃখে—কাহারও কি যায় রে!
কেন রে, মানব-তরে,
কেন, বৃথা এ সংসারে
সদাই থাকহ মত্ত
বৃথা নিজ-অহঙ্কারে!
জান না কি, দেহ ছাড়ি' পরাণ পলায় রে?
থাকিবে কি অহঙ্কার!
হ'বে সব ছার-খার ;—
চির দিন সমভাবে কভু নাহি যায় রে।

শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাল এবং কালী।

কালের যে, কি অপরূপ মহিমা, তাহা কে পরিস্ফুট ভাবে সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন? কালশক্তিবিষয়ে আর্য্য ঋষিগণ, আত্মচিন্তাপ্রসূত কত মতই প্রকাশ করিয়াছেন! কিন্তু কেহই "ইদমিহ তথ্যং" বলিতে সাহসী হন নাই; সুতরাং আমি একটী কীটাণু হইয়া, কালশক্তি বুঝাইতে পারিব, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তবে আর্য্য ঋষিগণের মুখোচ্ছিষ্ট যাহা সকলেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখিব—ইহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণেও কালশক্তির রহস্য, প্রণিধানপথে উপস্থিত করা যায় কি না।

আমি কেবল এতদ্বিষয়ে একটুকু চিন্তার সৌকর্য্যার্থ প্রবীণ পাঠকবর্গকে

কতক কতক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। ইহার সাধুতা ও অসাধুতার বিচারের ভার, পাঠকগণেরই সরল প্রবৃত্তি ও নিরপেক্ষ বিচারের উপর ন্যস্ত হইল। "কালশক্তি বা কালী" বুঝিতে হইলে, প্রথমে "কাল" কি পদার্থ? তাহার স্বরূপ কি? তাহাই বুঝিতে হইবে। সেই জন্য এখন কালের বিষয়, বিবৃত করা যাইতেছে। সকলেই জানেন, যিনি অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল, তিনিই মহাকাল। কাল—পরম মহান্, পরম নিত্য, পরম নিরবচ্ছিন্ন, পরম সূক্ষ্ম, পরম স্থূল, অতি ব্যবহিত, অতি সন্নিকৃষ্ট। এমন দেশ নাই, যে দেশে কাল নাই। কাল, সকলের বিনাশক, নিজে অনিশ্বর। কাল সকলের আছে, কাল নিজে অনাদি। কাল সকলের প্রভু; কালের প্রভু কেহ নাই। কাল অতীন্দ্রিয়, কেবল স্পন্দনাদি ক্রিয়া দ্বারা অনুমেয়।

একটী কথার কথা বলি। যদি অকস্মাৎ সূর্য্য না উদিত না হন, যদি চন্দ্রমা বিলুপ্ত হন, নক্ষত্রমালা অন্তর্হিত হইয়া যায়, গ্রহচক্র পড়িয়া যায়, যদি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা না থাকে, যদি সমীরণ, না প্রবাহিত হয়, পক্ষী না উড়ে, প্রানিমণ্ডলীর নিশ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, মানবগণ না হাসে, না কাঁদে, না ঘুমায়, না খায়, না চলে, না কথা কহে, না দেখে, না চক্ষুর পলক ফেলে, অধিক আর কত কহিব? যদি এক কালে এই জগৎ, অন্ধীভূত হইয়া পড়ে, তবে কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, যাম, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসর, কিরূপে ব্যবহৃত হইত? কিছুই হইত না।

এজন্য বলিতে হইবে যে, একমাত্র সূর্য্যাদির ক্রিয়া দ্বারাই সেই অখণ্ড দণ্ডায়মান কালই, কলা কাষ্ঠা ইত্যাদি রূপে কল্পিত হইয়াই লোকের ব্যবহারে আসিতেছে। যেই ঘটিকা-যন্ত্রের গোলকটী দুলিতে আরম্ভ করিল, অমনই এক সেকেণ্ড, ক্রমে এক মিনিট ও ঘণ্টা প্রভৃতি কাল নির্ণীত হইতে লাগিল। যখন সূর্য্যদেব উদিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার আবর্ত্তন (বা পৃথিবীর আবর্ত্তন) (১) হইতে লাগিল। তখনই অনুপল, বিপল, পল, দণ্ড ও মুহূর্ত্তাদি কাল, কল্পনার পথে আসিয়া দিবারাত্রি, সংবৎসর ও যুগ যুগান্তর রূপে পরিণত হইতে লাগিল। যদি ঘড়ীর দোলকের দোলন বন্ধ হইয়া যায়, যদি সূর্য্য না চলেন, তবে ছোট ছোট কালগুলির ব্যবহার করিবার উপায় থাকে না, তখন অনবচ্ছিন্ন অবিভক্ত অনাদি অনন্ত এক মহান্ অখণ্ড কালই, থাকিয়া যায়।

(১) "ভপঞ্জর স্থিরো ভুবে বাবৃত্যাবৃত্য প্রতিদিবসীয়মুদয়াস্তময়ং সম্পাদয়তি নক্ষত্র-গ্রহাণাং"—আর্য্যভট্ট।

"চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যদা ভবেৎ।
তদা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ং॥

কাল-সম্বন্ধে নৈয়ায়িকের মত।

ন্যায়-মতে কাল, নববিধ দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম দ্রব্য। "ভাষাপরিচ্ছেদে" যথা "ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ ব্যোম কাল দিগ্ দেহিনো মনো দ্রব্যাণি"। উক্ত কালে পাঁচটী গুণ আছে—সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। অখণ্ড মহাকালে একত্ব সংখ্যা আছে। আর, খণ্ড কালে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে) ত্রিত্ব সংখ্যা, এক-মাসাত্মক কালে ত্রিংশত্ব সংখ্যা। এই রূপে বর্ষাদি যুগ পর্য্যন্ত কালে সেই সেই সংখ্যা আছে। কালে পরিমাণ আছে। যেমন একদণ্ড পরিমিত কাল, দুই দণ্ড পরিমিত কাল। অখণ্ড কালের পরিমাণ পরম মহৎ ইত্যাদি। কালে পৃথক্ত্ব আছে। যথা কাল—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, প্রভৃতি হইতে পৃথক্। কালের সংযোগ আছে। যেমন—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, পবন ও মনের সহিত কাল, সংযোগ-সম্বন্ধে সংবদ্ধ। কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই রূপে তিন ভাগে বিভক্ত। কলা-কাষ্ঠাদিরূপে নানা প্রকারেই ঋষিরা কালের বিভাগ উপপন্ন করিয়াছেন। যথা—"সংখ্যাদি পঞ্চকং কাল-দিশোঃ।" ৩৩॥ "কাল-খাত্ম-দিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ" ইত্যাদি। কাল, সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই জনক: কাল, সমস্ত জগতের আধার। জ্যেষ্ঠত্ব ও

ভগনেন সমগ্রেণ জ্ঞেয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ।
ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাশে র্ভাগ ইত্যভিধীয়তে॥
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্ত ভাগ-দ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাৎ তদা রাম! তিথিরিত্যভিধীয়তে॥
অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্ যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্রমানসংশৈস্ত জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ॥

—কালমাধব।

কনিষ্ঠত্ব ইত্যাদি ব্যবহারের কারণও—কাল। যথা—"জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ। পরাপরত্ব-ধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ" ॥ ৪৫ ॥ যে ব্যক্তিতে যে ব্যক্তি অপেক্ষায় বহুতর সূর্য্যের সম্বন্ধ থাকে,—সেই ব্যক্তিই জ্যেষ্ঠ। আবার যে ব্যক্তিতে যদপেক্ষায় অল্পসংখ্যক সূর্য্যের সম্বন্ধ থাকে, সেই ব্যক্তি তদপেক্ষায় কনিষ্ঠ। যথা—"পরত্বং সূর্য্যসম্বন্ধভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ। অপরত্বং তদল্পত্বং বুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিতং ॥" ১২২ ॥ ন্যায়-মতে খণ্ড কাল ও মহাকাল, এই দুই প্রকার। অবচ্ছিন্ন অহোরাত্রাদি কালকে খণ্ডকাল কহে। যে কাল—বিভু, সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী—মহাপ্রলয়েও যে বিনষ্ট হয় না, তাহাকে মহাকাল কহে। অহোরাত্রাদির ব্যবহারের কারণ—খণ্ড কাল। কেননা, সূর্য্যের পরিস্পন্দ দ্বারাই আমরা দিবারাত্রি প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকি, উক্ত খণ্ড কালের যেমন পাঁচটি গুণ, মহাকালেও সেই পাঁচটী গুণই, বিদ্যমান আছে। কোন কোন নৈয়ায়িক, সমগ্র জন্য বস্তুকেই খণ্ড কাল বলেন। অপরাপর নৈয়ায়িক, ক্রিয়া-মাত্রকেই কাল বলেন। আবার কোন কোন নৈয়ায়িক—

"দিক্-কালয়োরীশ্বরানতিরেকাদ্ গগনমপি তথা ॥"

এই বাক্য দ্বারা কালকেই ঈশ্বর কহেন।

সংখ্যাচার্য্য কপিল বলেন,—

"দিক্-কালাবাকাশাদিভ্যঃ।" ২। ১২ ॥

নিত্য দিক্ ও নিত্য মহান্ কাল, আকাশেরই পরিণাম-বিশেষ। আর খণ্ড কাল, সেই সেই কর্ম্মরূপ উপাধি-সম্বন্ধে আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত সূত্রস্থ আদি শব্দের দ্বারা উপাধি গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বকথিত মহাকালই, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, এ হেতুতেই ইনি "ঈশ্বর।" দেখা যায়—কৃষকগণ, ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া একই দিনে একই সময়ে দুই প্রকারের ধান্য মিশ্রিত করিয়া চৈত্র বা বৈশাখ মাসে বপন করে। তন্মধ্যে কোন ধান্য, শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে জন্মে, কোনও ধান্য বা অগ্রহায়ণ অথবা পৌষ মাসে পরিপক্ক হয়। যদিও দ্বিবিধ ধান্যের একই কর্ষণ, একই বর্ষণ, একদাই বপন হইয়া থাকুক, তথাপি, কিন্তু দুই শস্য, আপন আপন সময়েই জন্মিবে। আশু ধান্য, অগ্রহায়ণ মাসের অপেক্ষা করিবে না, আর

পৌষ-ধান্য, আশু ধান্যের উদ্গম দেখিয়া লাফাইয়া উঠিবে না, সে আপন কালের প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া থাকিবে। ইহাতেই জানা যাইতেছে, উক্ত দ্বিবিধ ধান্য-সৃষ্টিসম্বন্ধে কালই, একমাত্র কারণ। কালই, উহাদিগকে জন্মাইতেছে। এইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী যে কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ই, যথাকালেই জন্মিয়া থাকে,—অসময়ে জন্মে না; সুতরাং উহাদিগের সৃষ্টির কারণ যে, কাল—ইহা সিদ্ধ হইল। কাল, সৃষ্ট জগতের স্থিতির কারণ। যেমন জননীজঠরে উৎপন্ন শিশু, পিতা মাতা বা অপর বন্ধুর সহায়তা না পাইয়াও, রক্ষিত হইতেছে,—সুতরাং বলিতে হইবে, সেই অবস্থায় দশ-মাসাত্মক কালই, তাহাকে রক্ষা থাকে* ;—সেইরূপ পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদিতেও বুঝিবে। কালই, সৃষ্ট জগতের প্রলয়ের কারণ। কেননা, যৌবনাবস্থার পর হইতেই কাল, আমাদিগের প্রলয় সাধন করিতে বসে। অদ্য একটী দাঁত পড়িয়া গেল, এই একটু মৃত্যু হইল। কল্য আর একটী দাঁত পড়িল, এই আবার আর একটুকু মৃত্যু হইল। ক্রমে চুল পাকিল, বা উঠিয়া গেল, কান্তি গেল, শরীর কুব্জ হইয়া পড়িল, দৃষ্টি গেল, শ্রুতি গেল, স্মৃতি গেল, বল গেল, ক্ষুধা গেল, ভাল-মন্দের বিচারশক্তি গেল ; সংস্কার গেল, সংজ্ঞা গেল, শেষে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসও গেল, তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হইল। এ সকল তো কালই করিল।

দেখা যাইতেছে, এক খানা তেতালা বাড়ী খুব দৃঢ় ছিল, সেই বাড়ীখানার উপাদান চুণ, শুরকি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ছিল, গাঁথুনি খুব পাকা ছিল, কিন্তু হাজার বা দুই হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবুও তাহার কিছুই হয় নাই, আবার চারি হাজার বৎসর পরে দেখিবে, উহা ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপাকারে পরিণত ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। সেই সুদৃঢ়-ভিত্তি-যুক্ত গৃহকে কে, অমন করিল? কে তাকে প্রলীন করিল? অগত্যা বলিতে হইবে,—কালই, তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়াছে। অতএব কালই, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা,—ইহা সিদ্ধ হইল। এ জগতে যাহা কিছু হইতেছে, তৎসমস্তই কালের দ্বারা সংসাধিত দেখিতেছি। আমি কালে জন্মিয়াছি, কালে বর্দ্ধিত হইলাম, লেখা পড়া শিখিলাম, পরীক্ষায়

* অনন্তর জননের পর মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তাবৎ কালই—বাল্য, কৌমার, যৌবনাদি অবস্থায় উপনীত করিয়া রক্ষা করিয়া থাকে।

উত্তীর্ণ হইলাম, এখন অর্থার্জ্জন করিতেছি, আর ভাবিয়া দেখিতেছি, তাহার অন্তরে ওতপ্রোত ভাবে কাল, জড়িত—অনুস্যূত রহিয়াছে। কাল ভিন্ন কিছুই হইতেছে না, সময়ে আহার, সময়ে বিহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে নিদ্রা, ইত্যাদি সকলই কালেই হইতেছে। এখন কাল-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

"নাহো ন রাত্রি র্ন নভো ন ভূমি-
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদি-বুদ্ধ্যানু-পলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥ ১ ॥
অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ ! বিদ্যতে।
অবিচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ ॥ ২ ॥
গুণসাম্যে ততস্তস্মিন্ পৃথক্ পুংসি ব্যবস্থিতে।
কালস্বরূপং রূপং তদ্বিষ্ণোর্মৈত্রেয় ! বর্ত্ততে ॥ ৩ ॥"

—(বিষ্ণুপুরাণ, ১ । ২ । ২৩)

অর্থ—তখন দিন ছিল না। আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক কিংবা অন্য কিছুই ছিল না, কেবল জ্ঞানের অগম্য প্রকৃতিযুক্ত এক ব্রহ্ম-পুরুষ কালই ছিলেন ॥ ১ ॥

হে দ্বিজ ! মৈত্রেয় ! সেই ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন কালের আদি বা অন্ত নাই। সেই মহাকাল হইতেই অবিচ্ছিন্ন ভাবে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে ॥ ২ ॥

হে মৈত্রেয় ! সেই প্রলয়ের সময় প্রকৃতি হইতে পুরুষ, পৃথগ্ রূপে অবস্থিত ছিলেন। সেই পুরুষ, অন্য কেহই নহেন, পরন্তু ঈশ্বর-স্বরূপ কালই ॥ ৩ ॥

"পরস্য ব্রহ্মণোরূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজঃ !
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথা পরং ॥"

—(বিষ্ণুপুরাণ, ১ । ২ । ১৪ ॥)

অর্থ—হে দ্বিজ ! পুরুষ, প্রকৃতি, আকাশাদি ও কাল, পর-ব্রহ্মেরই রূপ জানিবে।

"যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারকাঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালো হি বলত্তরঃ।"

—(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও বিষ্ণুসংহিতা, ২০ । ২৭)

অর্থ—এই জগতে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতে সমর্থ,—তাঁহারাও, কাল কর্ত্তৃক লয় প্রাপ্ত হইবেন। অতএব কালই, সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল।

"অহমেব কালো নাহং কালস্য।"

—(কালমাব-ধৃত তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

অর্থ—ঈশ্বর কহিয়াছেন—আমিই কাল, কালের আমি নহি।

"কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ।
কালেহ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্ব্বিপশ্যতি ॥ ১ ॥
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতঃ।
কালেন সর্ব্বা নন্দন্ত্যাগতেন ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ২ ॥
কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং কালে ব্রহ্ম সমাহিতং।
কালোহ সর্ব্বস্যেশ্বরো যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৩ ॥
তেনেষিতং তেন জাতং তদুতস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং।
কালোহ ব্রহ্মা ভূত্বা বিভর্ত্তি পরমেষ্ঠিনং ॥ ৪ ॥
কালঃ প্রজা অসৃজত কালোঽগ্রে প্রজাপতিঃ।
স্বয়ম্ভুঃ কশ্যপঃ কালাৎ তপঃ কালাদজায়ত" ॥ ৫ ॥

—(অথর্ব্ব-বেদ, ১৯ । ৫৩ । ৫৪ ॥)

অর্থ—কাল, ভূমি সৃষ্টি করিয়াছে, কালেই সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন, কালেই প্রাণী জন্মিতেছে, এবং কালানুসারেই চক্ষুঃ, দেখিতে সমর্থ ; অকালে (রাত্রিতে) দেখিতে পায় না ॥ ১ ॥

কালেই মনঃপ্রাণ সমাহিত হয় এবং সময়, সমুপস্থিত হইলেই, প্রজাবর্গ, শস্যাদি-দর্শনে আনন্দিত হয় ॥ ২ ॥

কালে তপস্যা-সিদ্ধি হয়, কালে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারা যায়, কালে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় ; অতএব কালই, সকলের ঈশ্বর। কাল, প্রজাপতির পিতা ॥ ৩ ॥

কালের নিয়োগেই জগৎ, উৎপন্ন হইতেছে, কালেই জগৎ অবস্থিত। ব্রহ্ম-স্বরূপ কালই, চতুরানন ব্রহ্মাকে পোষণ করিতেছেন, কালই প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ৪ ॥

কাল, প্রজাপতিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ব্রহ্মা, কশ্যপ ও বেদ, কাল হইতেই উৎপন্ন ॥ ৫ ॥

"অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১ ॥
কালঃ কলয়তে লোকং কালঃ কলয়তে জগৎ।
কালঃ কলয়তে বিশ্বং তেন কালোঽভিধীয়তে ॥ ২ ॥
কালস্য বশগাঃ সর্ব্বে দেবর্ষি-সিদ্ধ-কিন্নরাঃ।
কালো হি ভগবান্ দেবঃ স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥
সর্গ-পালন-সংহর্ত্তা স কালঃ সর্ব্বতঃ সমঃ।
কালেন কল্যতে বিশ্বং তেন কালোঽভিধীয়তে ॥ ৪ ॥
যেন মৃত্যুবশং যাতি কৃতং যেন লয়ং ব্রজেৎ।
সংহর্ত্তা সোঽপি বিজ্ঞেয়ঃ কালঃ স্যাৎ কলনাপরঃ ॥ ৫ ॥
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালে দেবা বিনশ্যন্তি কালে চাসুর-পন্নগাঃ।
নরেন্দ্রাঃ সর্ব্বজীবাশ্চ কালে সর্ব্বং বিনশ্যতি ॥ ৬ ॥
—(হারীত-সংহিতা, ১ম স্থানে, ৪র্থ অধ্যায়)

অর্থ—কালের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। কালই, ভগবান্ রুদ্র, সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। সকল প্রাণীকে সঙ্কলন, উৎপাদন, পালন ও সংহরণ করেন বলিয়া, তাহার নাম "কাল" ॥ ১ ॥

কালই, জগতের স্রষ্টা। কালই, সৃষ্ট জগতের পালক; আবার কালই, পালিত জগতের বিনাশক। সেই জন্য তাহার নাম "কাল" ॥ ২ ॥

এ জগতে কি দেব, কি ঋষি, কি পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলই, কালের বশবর্ত্তী। অতএব কালই, সাক্ষাৎ ভগবান্ পরমেশ্বর ॥ ৩ ॥

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা কাল, সকলের উপরই সমান বিরাজিত; তিনি বিশ্বকে সঙ্কলন করেন বলিয়াই "কাল" নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥

কাল দ্বারা লোক, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কালেই লোক নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, আবার কালই সংহর্ত্তা, অতএব তিনি অনবরত কলনাই করিতেছেন ॥ ৫ ॥

কাল, নিজে জাগ্রৎ থাকিয়া নিদ্রিত লোককে রক্ষা করিতেছেন। কালকে কেহই, অতিক্রম করিতে পারে না। দেবগণ, অসুরগণ, পন্নগগণ, রাজগণ এবং অপরাপর সকল জীবই, কালে নষ্ট হইতেছে ॥ ৬ ॥

কালমাধব-ধৃত কূর্ম্মপুরাণে কাল, ব্রহ্মরূপে অভিহিত হইয়াছেন। যথা—

"অনাদিরেষ ভগবান্ কালোঽনন্তোঽজরঃ পরঃ।
সর্ব্বগশ্চ স্বতন্ত্রত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বান্মনোহরঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মাণো বহবো রুদ্রা অন্যে নারায়ণাদয়ঃ।
একো হি ভগবানীশঃ কালঃ কবিরিতি স্মৃতঃ ॥ ২ ॥
ব্রহ্ম-নারায়ণেশানাং ত্রয়াণাং প্রাকৃতো লয়ঃ।
প্রোচ্যতে কালযোগেন পুনরেব চ সম্ভবঃ ॥ ৩ ॥
পরং ব্রহ্ম চ ভূতানি বাসুদেবোঽপি শঙ্করঃ।
কালেনৈব চ সৃজ্যন্তে স এব গ্রসতে পুনঃ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ কালাত্মকং বিশ্বং স এব পরমেশ্বরঃ" ॥ ৫ ॥

অর্থ—ভগবান্ কাল—অনাদি, অনন্ত, অজেয়, সর্ব্বব্যাপী, স্বতন্ত্র ও সকলের আত্মা। এই হেতুতেই কাল, পরমেশ্বর। কালক্রমে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ উৎপন্ন হন; কালক্রমেই প্রলীন হন; একমাত্র কাল-রূপ ঈশ্বরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি-দেবরূপে ব্যপদিষ্ট হন। কালই পরব্রহ্ম। তিনি সমস্ত প্রাণী, বিষ্ণু ও শিবকে উৎপাদন করেন, এবং যথাকালে আবার গ্রাস করেন। অতএব কালস্বরূপই বিশ্ব, কালই পরমেশ্বর ॥১—৫॥

কালমাধব-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও কাল, ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
কর্ষণাৎ সর্ব্বভূতানাং স তু সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
সর্ব্বভূত সমিত্বা স রুদ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
অনাদিনিধনত্বেন স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ।"

অর্থ—কালের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, কাল রুদ্র। উহা সর্ব্ব প্রাণীকে মৃত্যুর

দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, সকলকে কলন, সংহরণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে "কাল" কহে। সর্ব্বভূতকে আকর্ষণ করেন বলিয়া কালের নাম সঙ্কর্ষণ, কাল সর্ব্ব-ভূতকে দমন করেন বলিয়া তাঁহাকে রুদ্র কহে। জন্ম মৃত্যু নাই বলিয়া, কালই পরমেশ্বর।

কাল, দুই প্রকার—নিত্য কাল ও অনিত্য কাল। নিত্যকালই পরমেশ্বর। তিনি বাক্য-মনের অগোচর হইলেও, ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত নানা-বিধ দেহ ধারণ করেন। এই বিবিধ দেহাকারে পরিণত কালই, অনিত্য-কাল।

এ কথা, কালমাধবীয়-গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। যথা—

"নিত্যো জন্যশ্চ কালো দ্বৌ তয়োরাদ্যঃ পরেশ্বরঃ।
সোঽবাঙ্মনসোঽগম্যোঽপি দেহী ভক্তানুকম্পয়া"॥ ইতি

গীতায় উক্ত আছে—

"অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥" ১০।৩৩॥

অর্থ—আমিই ঈশ্বর—অবিনশ্বর কাল; আমিই সর্ব্বতোভাবে জগৎপালন করিতেছি।

কালসম্বন্ধে বেদব্যাসের মত। যথা,—(শান্তি, রাজধর্ম্ম, ২৫।৫—১২)॥

"ন কর্ম্মণা লভ্যতে চেজ্যয়া বা, নাপ্যস্তি দাতা পুরুষস্য কশ্চিৎ।
পর্য্যায়যোগাদ্‌-বিহিতং বিধাত্রা, কালেন সর্ব্বং লভতে মনুষ্যঃ॥১॥
ন বুদ্ধিশাস্ত্রাধ্যয়নেন শক্যং প্রাপ্তুং বিশেষং মনুজৈরকালে।
মূর্খোঽপি চাপ্নোতি কদাচিদর্থান্, কালো হি কার্য্যং প্রতি নির্ব্বিশেষঃ॥২॥
নাভূতি-কালেষু ফলং দদন্তি, শিল্পানি মন্ত্রাণি তথৌষধানি।
তান্যেব কালেন সমাহিতানি, সিধ্যন্তি বর্দ্ধন্তি চ ভূতি-কালে॥৩॥
কালেন শীঘ্রাঃ প্রবহন্তি বাতাঃ, কালেন বৃষ্টি র্জলদানুপৈতি।
কালেন পদ্মোৎপলবজ্জলঞ্চ, কালেন পুষ্যন্তি বনেষু বৃক্ষাঃ॥৪॥
কালেন কৃষ্ণাশ্চ সিতাশ্চ রাত্র্যঃ কালেন চন্দ্রঃ পরিপূর্ণবিম্বঃ।
নাকালতঃ পুষ্পফলং দ্রুমাণাং, নাকালবেগাঃ সরিতো বহন্তি॥ ৫॥
নাকালমত্তাঃ খগ-পন্নগাশ্চ, মৃগদ্বিপাঃ শৈলমৃগাশ্চ লোকে।
নাকালতঃ স্ত্রীষু ভবন্তি গর্ভাঃ, নায়ান্ত্যকালে শিশিরোষ্ণবর্ষাঃ॥ ৬॥

নাকালতো ম্রিয়তে জায়তে বা, নাকালতো ব্যাহরতে চ বালঃ।
নাকালতো যৌবনমভ্যুপৈতি, নাকালতো রোহতি বীজমুপ্তং॥৭॥
নাকালতো ভানুরুপৈতি যোগং, নাকালতোঽস্তং গিরিমভ্যুপৈতি।
নাকালতো বর্দ্ধতে হীয়তে চ, চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি মহোর্ম্মিমালী॥৮॥

অর্থ—ব্যাস কহিলেন—হে যুধিষ্ঠির! এমন কোনও কর্ম্ম নাই বা যজ্ঞ নাই, যাহাতে পতিপুত্রহীনা বীরপত্নীগণ, এখন পতিপুত্র লাভ করিতে পারে। এমন কোনও পুরুষই নাই, যিনি ইহাদিগের মৃত পতি পুনর্ব্বার আনিয়া দিতে পারেন। পরন্তু ঈশ্বররূপী কাল দ্বারাই মনুষ্য, বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে॥১॥

মানব, অসময়ে নিজ নিজ বুদ্ধিবলে বা শাস্ত্রবলে প্রার্থনীয় পুত্র-বিত্তাদি লাভ করিতে পারে না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, মূর্খ লোকও, কোন সময়ে অভিপ্রেত বস্তু লাভ করিয়া থাকে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, কালই কার্য্য-মাত্রের অসাধারণ কারণ॥২॥

যে কালে যাহা হইবার নহে, সেই কালে শিল্পবিদ্যা, মন্ত্র এবং ঔষধ, ফল দেয় না, আবার সে সকলই, উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে, ফলপ্রদানে সমর্থ হয়॥৩॥

যথাকালে সমীরণ, ঝঞ্ঝারূপে প্রবাহিত হয়, যথাকালে বৃষ্টির উপযোগি জল, মেঘকে আশ্রয় করে, যথাকালে সলিল, কমল ও উৎপলে বিরাজিত হয়, যথাকালে কাননস্থ তরুনিকর, পরিপুষ্ট হয়॥ ৪ ॥

যথাকালে রজনী, কৃষ্ণবর্ণা ও শুভ্রবর্ণা হয়, যথাকালে চন্দ্রমা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। অসময়ে বৃক্ষের পুষ্প বা ফল জন্মে না, অসময়ে নদীর বেগ বৃদ্ধি হয় না॥৫॥

অসময়ে বিহঙ্গ, ভুজঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি মৃগকুল, মদমত্ত হয় না, অসময়ে কামিনীগণ গর্ভ ধারণ করে না, অসময়ে শিশির, গ্রীষ্ম বা বর্ষা উপস্থিত হয় না॥ ৬॥

প্রাণী, অকালে মরে না, বা জন্মে না, অসময়ে বালকের বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় না, অসময়ে যৌবন উদ্গত হয় না, অসময়ে উপ্ত বীজের অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয় না॥৭॥

অসময়ে সূর্য্য, উদিত বা অস্ত হন না, অসময়ে চন্দ্র বা তরঙ্গমালাকুলিত সমুদ্রের, প্রবৃদ্ধি বা ক্ষয় হয় না॥৮॥

"কালঃ সর্ব্বং সমাদত্তে কালঃ সর্ব্বং প্রযচ্ছতি।
কালেন বিহিতং সর্ব্বং মা কৃথাঃ শক্র! পৌরুষং॥"

অর্থ—বলিরাজ, ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—হে শক্র! কালই, সকল গ্রাস করিতেছে। আবার কালই, সকল প্রদান করিতেছে; সুতরাং যাহা কিছু আমার বিপদ্ দেখিতেছ, উহা কালকৃত। অতএব এ জন্য তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না।

"এবং নৈব নচেৎ কালো মামাক্রম্য স্থিতো ভবেৎ।
পাতয়েয়মহং ত্বাদ্য স বজ্রমপি মুষ্টিনা॥"

অর্থ—হে শক্র! তুমি জান, আমায় যদি এরূপে কাল আক্রমণ না করিত, তবে 'থাকুক না তোমার হাতে বজ্র' এখনই তোমাকে এক মুষ্টিপ্রহারে পাতিত করিতাম।

"ন তু বিক্রমকালোঽয়ং শান্তিকালোঽয়মাগতঃ।
কালঃ স্থাপয়তে সর্ব্বং কালঃ পচতি বৈ তথা॥"
—(মহাভারত—শান্তি, মোক্ষ, ২২৪।২৫,৩৮।৩৯।)

কালে নাহং ত্বামজয়ং কালে নাহং জিতস্ত্বয়া।
গন্তা গতিমতাং কালঃ কালঃ কলয়তি প্রজাঃ॥"
—শান্তি, মোক্ষ, ২২৭। ৩৫।

অর্থ—হে ইন্দ্র! আমি এক দিন কালের বলে তোমাকে পরাজয় করিয়াছিলাম, আবার অদ্য কালের বলে তুমি আমায় পরাজয় করিলে। পরিবর্ত্তনশীল জগতের সম্বন্ধে কাল, চলিয়া যাইবে, বসিয়া থাকিবে না। আহা! কালেই সকলকে কবলিত করিতেছে।

বহূনীন্দ্রসহস্রাপি, দৈবতানি যুগে যুগে।
অভ্যতীতানি কালেন, কালো হি দুরতিক্রমঃ॥"
—(ঐ, ২২৭।৪১।)

অর্থ—হে ইন্দ্র! তোমার মত সহস্র সহস্র ইন্দ্র ও সহস্র সহস্র দেবতাকে যুগে যুগে কাল, অতিক্রম করিয়া গেল; কিন্তু কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারিল না।

উক্ত প্রমাণসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইল, কালই—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, কালই ঈশ্বর, এক নিষ্ক্রিয়, নিত্য, অব্যয়, নিরঞ্জন, কূটস্থ ও বিভূ। এই পূর্ব্বোক্ত

অখণ্ড-দণ্ডায়মান সময়াত্মক মহাকালেরই অধিষ্ঠাতৃ দেব মহাকাল শিব। যিনি যাঁহার অধিষ্ঠাতৃ দেব, তাঁহাকে সেই নামে অভিহিত করা হয়। যেমন জলময়ী গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চতুর্ভুজা মকরবাহিনীর নাম "গঙ্গা"। হিমালয় পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃ-দেব—পার্ব্বতীর পিতার নাম "হিমালয়"। মণ্ডলাকার দৃশ্যমান সূর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ দেব চতুর্ভুজ সপ্তাশ্ববাহন অদিতি-পুত্রের নাম "সূর্য্য"। এই প্রকার মহাকালের অধিষ্ঠাতৃ দেব "মহাকাল"। ইঁহারই অন্যান্য নাম—শিব, মহাদেব, রুদ্র। মৃত্যুর পরে লোক, যমালয়ে যায়,—ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই "যমের" কতিপয় নাম এই—কাল, দণ্ডধর, শ্রাদ্ধদেব, বৈবস্বত, ছায়াসুত, অন্তক, শমন, যম। এই নাম কয়টীর ব্যুৎপত্তি-বিচারে কি অর্থ উপপন্ন হয়, তাহাই এখন বিচার্য্য। এই সকল নাম, কালেও প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা—যিনি প্রাণিগণকে কলন সংকলন সংহরণ করেন, তাঁহার নাম "কাল।" "দণ্ডধর"—অসৎ কর্ম্মের ফল-ভোগ, অবশ্য কালেই করিতে হয়। কালই, অসৎ কর্ম্মের দণ্ড প্রদান করেন; সেজন্য কালের নাম "দণ্ডধর।" "শ্রাদ্ধদেব"—শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মে কাল, বিশেষরূপে বিরাজিত বলিয়াই কালের নাম "শ্রাদ্ধদেব।" কেননা—

"পূর্ব্বাহ্নে বৈদিকং কার্য্যমপরাহ্নে তু পৈতৃকং।
একোদ্দিষ্টন্তু মধ্যাহ্নে প্রাতর্বৃদ্ধি-নিমিত্তকং॥"
—(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

এই বচন দ্বারা উপপন্ন হইতেছে যে, অপরাহ্ণ প্রভৃতি কালই, শ্রাদ্ধের মুখ্যকাল। সেই জন্যই কালের নাম "শ্রাদ্ধদেব।" বিবস্বান্ অর্থে সূর্য্য। বিবস্বানের পুত্র—বৈবস্বত। কাল, সূর্য্যপুত্র। যেহেতু, সূর্য্য হইতেই মুহূর্ত্তাদি কালের উৎপত্তি। আবার কালকে ছায়াসুত বলিয়াও শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। যেহেতু, জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে পাদচ্ছায়ার পরিমাণ করিয়া মুহূর্ত্তাদি কাল নির্ণয় করা যায়। প্রাণিগণের অন্ত (বিনাশ) করেন বলিয়াই, কালের নাম—'অন্তক'; প্রাণিগণকে প্রশমন (ইহলোক হইতে) অপহরণ করেন, বলিয়াই কালের নাম "শমন।"—প্রাণিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযত করেন বলিয়াই কালের নাম "যম" হইয়াছে।

কালের সৃষ্টি, স্থিতি এবং অপরাপর শক্তির কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই কালের সৃষ্টি-প্রলয়-শক্তি বা ক্ষমতাই "কালী।"

শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন। এই হেতু কালীকেও কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা যায়। এই কালশক্তি কালীই, পরা প্রকৃতি। ইনিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রলয়াবস্থা। মনু বলিয়াছেন—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষিতং।
অপ্রতর্ক্যমসংবেদ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই অন্ধকারময় ছিল। সেই অন্ধকার, প্রজ্ঞার অবিষয়; তাহার লক্ষণ করা যায় না। সেই অন্ধকারকে তর্কে বুঝান যায় না, যেন সমস্তই প্রসুপ্ত—নিস্তব্ধ।

এই কাল-শক্তিতে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এই অনির্ব্বচনীয় অন্ধকায়ময়ী প্রলয়াবস্থাই—"কালী।" ইনিই সাংখ্যমতে স্বরূপা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতেই আদি সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা যে, অভাব হইতেই, জগতের উৎপত্তি বলেন, সাংখ্যদর্শনমতে সেই বৌদ্ধের অভাব-পদার্থই প্রলয়াবস্থা,—স্বরূপা প্রকৃতি—সৃষ্টিকর্ত্রী "কালী"ই বুঝায়। সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি "ব্রাহ্মী।" পালনশক্তি-সম্পন্ন নারায়ণ, তাঁহার পালনী শক্তি "নারায়ণী।" প্রলয়শক্তিসম্পন্ন রুদ্র। মহাকাল-হৃদয়োপরি কালী বিরাজিতা, সেই মহাকাল বা কালের প্রলয় শক্তি "কালী।"* এই কালই নানা শাস্ত্রে ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী ও ঐন্দ্রী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধে কালী বলিয়াছিলেন—"যো মাং জয়তি সংগ্রামে, য়ো মে দর্পং ব্যপোহতি। যশ্চ প্রতিবলো লোকে স মে ভার্ত্তা ভবিষ্যতি"। (চণ্ডী) অর্থ—যে আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, যে আমার দর্প চূর্ণ করিতে পারে, যে আমার সমবল হয়, সে আমার ভর্ত্তা হইবে। কালী প্রকৃতি। প্রকৃতির সংগ্রামে তাহাকে পুরুষ অর্থাৎ সেই ঈশ্বর—শিব ছাড়া কে জয় করিতে পারে? শিব প্রাকৃতিক নিয়মকে দূর করিয়া শ্মশান, ভস্ম অস্থিমালা, বিষ প্রভৃতি বস্তু গ্রহণ করিলেন; প্রকৃতি, শিবের নিকট পরাজিতা হইলেন। তাই শিব, কালীর ভর্ত্তা। সেই

* কালের ভার্য্যা কালী, ভার্য্যার্থে ঈ প্রত্যয় দ্বারা কালী শব্দ সাধিত। এস্থলে ভার্য্যা অর্থ সহচারিণী, অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত। শক্তি, শক্তিমান ছাড়া থাকেন না।

প্রলয়াবস্থা তমোময়ী কালী—মহামেঘপ্রভা। যে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, আলোক প্রদান করিতেছেন, উহারা তিনটী, কালীর ত্রিনয়ন। চারি দিক্ই কালশক্তির করায়ত্ত; তাই কালী চতুর্ভুজা। কালশক্তির অভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। তাই কালী, জগদ্ব্যাপিনী, তাঁহাকে কিসে আবরণ করা যায়? তাই কালী দিগম্বরী, কালশক্তি কালী ব্রহ্মময়ী, তিনি কাহার নিকট লজ্জা করিবেন? তিনি জগজ্জননী। অনন্ত কোটী প্রাণী, তাঁহারই শিশু সন্তান, শিশু সন্তানের নিকট আবার মায়ের লজ্জা কি? কালশক্তি কালী, কালে কালে নিরন্তর ব্রহ্মাদি তৃণ-পর্য্যন্ত প্রসব করিতেছেন, তাঁহার বসন-পরিধানের সময় কখন? তাই মা দিগম্বরী।

কালী শবারূঢ়া। শব—নিষ্ক্রিয় মহাকাল মহাদেব। এই নিষ্ক্রিয় মহান্ কালের হৃদয়ের মধ্যে কালী অবস্থিতা, যে যাহার শক্তি, সে তাহার মধ্যেই থাকে। প্রদীপের দাহিকা শক্তি, প্রদীপের মধ্যেই বিরাজিতা, তাই কালশক্তি কালী, মহাকালের হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সমস্ত বস্তুই জড় শব;—নিষ্ক্রিয়; পরন্তু সেই সেই বস্তুর শক্তিই, ক্রিয়া করিতে থাকে। চুম্বক লৌহ স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তাহার আকর্ষণী শক্তিই, অন্য লৌহকে আকর্ষণ করে। কালী, কালের অন্তর্নিহিতা থাকিয়াই জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করিতেছেন। তাই কালী শবারূঢ়া। মহাপ্রলয়ে এই কালশক্তির করাল কবলে প্রাণিবর্গ প্রবিষ্ট হয়, করাল দংষ্ট্রাগ্রে কেহ বিচূর্ণিত হয়, কেহ বা দশনান্তরালে লাগিয়া থাকে। কালশক্তির প্রভাবেই প্রাণিগণ মরিয়া যায়, তাহাদের শীর্ষসমূহ ইতস্ততঃ গড়াগড়ি যায়,—তাই কালী শবমুণ্ডমালিনী। মানব মরিলে, তাহাকে আর বন্ধু বান্ধব গ্রহণ করিল না,—পূতি দুর্গন্ধে আর কেহ অগ্রসর হইল না, এমন কি, গর্ভধারিণীও, তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তাহার আর আশ্রয় কোথাও মিলিল না, তখন জগজ্জননী শ্মশানবাসিনী কালীই তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না,—তাই কালী, শ্মশানালয়-বাসিনী অস্থিমালাধারিণী, প্রজ্বলিত-চিতা-মধ্যগতা। কালশক্তি, সমধিক ভাবে বৈরাগ্য-হেতুক শ্মশানেই বিকাশ পান, তাই কালী শ্মশানবাসিনী।

কালী মহামেঘপ্রভা; কিন্তু মায়ের কাল রূপে দশ দিক্ আলোকিত; কালী সৌন্দর্য্যের খনি, তাঁহার রূপে ও শক্তিতে মহাকালও বিমুগ্ধ, অন্যের কথা

আর কি কহিব? এই হেতু সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিবসনা কালীকে সম্মুখে রাখিয়া মাতৃ-বুদ্ধিতে মনকে সুস্থির ও অবিকৃত করিয়া যদি সাধকগণ, চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করে, তবে অন্য কামিনীতে চিত্তের বিকৃতি কখনও জন্মিবে না, এই রূপ ক্রমে অভ্যাস-বশে মনের চাঞ্চল্য বিদূরিত হইবে। ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয়ও, সাধকের ধ্যান-পথে উপস্থিত হইবে, তখন সাধকের অপবর্গ-মার্গ, অর্গলচ্যুত হইবে, ইহাই কালীর উপাসকের অসাধারণ উপকার সন্দেহ নাই। যে সকল সাধক, সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ দ্বারা কালীর চরণ-কমল স্পর্শ করিতে পারে, তাহাদের আর ভববন্ধন থাকে না, তাহারা মুক্ত হইয়া যায়। ইহা দেখাইবার জন্যই তিনি মুক্তকেশী। এক হিসাবে বলা যাইতে পারে—ইংরাজ-জাতি, কালীর উপাসক। কেননা, ইহাঁরা কালের ক্রিয়া শক্তিকে এত মানেন, এত তাহার মাহাত্ম্য বুঝেন, এত তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করেন, এত অমূল্য রত্ন বলিয়া জানেন যে, এক মিনিট কালও ইহাঁরা কালশক্তির প্রতি উদাসীন নহেন। এই কালশক্তির সেবাতেই কালীর প্রসাদাৎ ইংরাজের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

জগতে যাহারা বাম, বিপরীত, প্রতিকূল আচরণ করিবে, তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য কালী, বাম পাণিতে কৃপাণ ধারণ করিয়াছেন। শুধু ভয় প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা নহে; আপনার বাম হস্তে একটী ছিন্নমুণ্ড ধারণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, যাহারা নিয়মের বিপরীত (বাম) আচরণ করে, তাহারাই অসুর। কালশক্তি তাহাদের শিরচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আর জগতে যাহারা দক্ষিণ—দাক্ষিণ্য সরলতা উদারতা ব্যবহার করে, "মা! করুণাময়ি! রক্ষা কর মা! প্রণত অধমকে দয়া কর!" এই বলিয়া যাহারা কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করে, কালশক্তিকালী তাহাদিগকে বলিতেছেন, "বাছা ভয় নাই, এই যে আমি অভয়দায়িনী, বাছা! কি প্রার্থনা কর? এই যে আমি বরদায়িনী, তাই কালী, দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বর মুদ্রা ধারণ করিয়াছেন।

শক্তি আর শক্তিমান্ অভিন্ন। অতএব কাল ব্রহ্ম। কালশক্তি, কালী ব্রাহ্মী, সেই কালশক্তি 'কালী'ই জগজ্জননী। কালী হইতে ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন। কালী হইতে বিষ্ণু জন্মিয়াছেন। কালী হইতে রুদ্র জন্মিয়াছেন। যাহা হইবে, যাহা হইতেছে, তাহা সকলই "কালী"। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত কালী, অহঙ্কার কালী, বুদ্ধি কালী, একাদশ ইন্দ্রিয় কালী, পঞ্চতন্মাত্র কালী, কালী চিন্ময়ী, আনন্দময়ী। যাহা দেখিতেছি, তাহা কালী, শুনিতেছি কালী, ঘ্রাণ করিতেছি কালী, স্পর্শ করিতেছি কালী, ভোজন করিতেছি কালী। কালী ছাড়া সৎ অসৎ কোন বস্তুই নাই। অতএব নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই আদ্যা প্রকৃতি কালশক্তি "কালী।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

'বেতালে' বহু রহস্য।

হিন্দী ভাষায় লিখিত 'বৈতাল পচীসী' নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালায় 'বেতালপঞ্চবিংশতি' লিখিয়াছিলেন। বেতাল-পঞ্চবিংশতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এক সময়ে উহা বিদ্যালয়েও পঠিত হইত। এখন উহা আর তত পঠিত হয় না। সহস্র লোকের মধ্যে এক জনও এখন উহা পড়েন কি না সন্দেহ। কিন্তু গ্রন্থখানি অল্প লোকের দ্বারা পঠিত হইলেও, উহার গল্পগুলি অনেকেই জানেন। লোক ও বংশ-পরম্পরা-কথিত হয় বলিয়া এত লোকে গল্পগুলি জানেন। কিন্তু সকল গল্পই যে, সমান প্রচলিত —তাহা নহে। দুই চারিটী গল্প, সর্ব্বজনবিদিত বলিলেই হয়, অপরগুলি সেরূপ নহে। ভোজনবিলাসী ও শয্যাবিলাসীর গল্প ঐ দুই চারিটির অন্যতম। বোধ হয়, সকলেই উহা জানেন। তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় উহা একবার বলা ভাল ঃ—

"ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে একজন ভোজনবিলাসী; অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী; অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ, এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তদীয় ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয়

কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন্ বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাতিশয় যত্ন সহকারে, চর্ব্ব্য, চূষ্য লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল। রাজা, ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে, আহার-স্থানে উপস্থিত হইল; এবং আসনে উপবেশন-মাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়াছ? সে কহিল, না মহারাজ! আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কেন! সে কহিল, মহারাজ! অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে; বোধ করি, শ্মশানসন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন; এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতি-গোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! অমুক গ্রামের শ্মশান-সন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী।

তদনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে; তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না।' রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; এবং শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তথন, তিনি যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন,

তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী। অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।"

দুই বিলাসীর মধ্যে একজনের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, অপরের ত্বগিন্দ্রিয়ের—তীক্ষ্ণতার কথায় বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।* ধর্ম্মপুরের রাজার ন্যায় হাসিয়া ফেলিতে হয়। রাজা ভোজন-বিলাসীর কথা 'উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত' মনে করিয়াছিলেন। আমরাও সেইরূপ মনে করি। কিন্তু অন্ন-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রাজা ঐ কথা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। আর সাত খানা গদির নীচে একগাছি ক্ষুদ্র চুল দেখিবার পর শয্যাবিলাসীর তদ্দ্বারা ক্লিষ্ট হওয়ার কথায় রাজা কিছুমাত্র বিস্ময় বা অবিশ্বাস প্রকাশ করেন নাই। আমাদের কিন্তু অবিশ্বাস হয়। ইন্দ্রিয়ের এরূপ তীক্ষ্ণতার প্রমাণ বা উদাহরণ, আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। অসভ্যাবস্থায় মানুষের কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধ্য-আসিয়ার অসভ্য যাযাবর তাতারদিগের দৃষ্টি, চিলের ন্যায় তীক্ষ্ণ—তাহারা যত দূর হইতে দেখিতে পায়, সভ্য মানুষে তত দূর হইতে দেখিতে পায় না। জল, দূরে থাকিলে উহার নিকটে গিয়া

---

* এই প্রসঙ্গে ইদানীন্তন কালের দুইটী কথা বলা ভাল। (১) কথিত আছে যে, অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত মৃত নবাব ওয়াজিদ আলি সাহ, অপরাহ্লে জলযোগের সময় চারিখানি জিলিপি ও চারিটী পান্তুয়া খাইতেন। তাঁহার আদেশানুসারে জিলিপি ভাজা হইলে পর ঘৃতপরিবর্ত্তন করা হইত এবং নূতন ঘৃতে পান্তুয়া পাক করা হইত। তাঁহার এক নূতন কার্য্যাধ্যক্ষ, ঘৃতের অনর্থক অপচয় হইতেছে মনে করিয়া, একই ঘৃতে জিলিপি এবং পান্তুয়া প্রস্তুত করিবার আদেশ দেন। যে দিবস ঐরূপ করা হয়, সে দিবস কিন্তু নবাব সাহেব একটী পান্তুয়ার কিঞ্চিন্মাত্র মুখে দিয়া, দুর্গন্ধ-বশতঃ আর খাইতে পারেন নাই। (২) নাটোর-রাজ-বংশের এক পূর্ব্বপুরুষ (আনন্দনাথ রায়), প্রতিদিন উত্তমরূপে তূলা ধুনাইয়া নূতন খোলে পুরিয়া তাহাতেই শয়ন করিতেন। নহিলে তাঁহার সাতিশয় কষ্ট হইত। এক বার তিনি স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে আসিয়া দিনকতক ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার নিজের দরজি আসিয়াছিল। স্বর্গীয় রাজা এই কথা জানিতে পারিয়া, একদিন দরজিকে অভয় দিয়া, তাহার প্রভুর লেপের খোল বদলাইতে ও তূলা ধুনিয়া দিতে নিষেধ করেন। দরজি পূর্ব্বদিনের লেপই পাতিয়া দেয়। সমস্ত রাত্রি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে প্রভু, দরজির অর্থদণ্ড করেন। রাধাকান্ত কিন্তু সকল কথা বলিয়া দরজির অর্থদণ্ড রহিত করাইয়া দেন।

না দেখিলে আমাদের উহার অস্তিত্বের অনুভূতি হয় না। একমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় আমাদের দূরস্থিত জলের উপলব্ধির উপায়। কিন্তু অসভ্যাবস্থায় মানুষ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাও কখন কখন জল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক হ্যাগার্ড মহোদয়, তাঁহার "King Solomon's Mines" নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"Meanwhile Ventvogel was lifting his snub nose and sniffing the hot air for all the world like the old Impala ram who scents danger.

Presently he spoke again.

'I smell water' he said.

Then we felt quite jubilant, for we knew what a wonderful instinct these wild bred men possess."

অর্থাৎ

'বিপদের ঘ্রাণ পাইলে বুড়া মেড়ায় যেমন নাক তুলিয়া চারি দিকের বাতাস তুলিয়া ফেলিয়া দিতে থাকে, বেনবিওগেলেও তেমনই ইতিমধ্যে তাহার থ্যাবড়া নাক উপর দিকে তুলিয়া চারি দিকের গরম বাতাস টানিয়া লইতেছিল। সে তখনই আবার কথা কহিল। বলিল—

"আমি জলের গন্ধ পাইতেছি।" আমরা জানিতাম, এই সকল অসভ্য লোকের অনুভব শক্তি স্বভাবতঃই অতি আশ্চর্য্য ও অসাধারণ। সুতরাং তাহার কথা শুনিয়া আমাদের উল্লাসের সীমা রহিল না।'

নানা কারণে জন্তু এবং অসভ্য মনুষ্য, অনেক বিষয়ে প্রায় সমান অবস্থাপন্ন। এই জন্য কথিত হইয়া থাকে যে, জন্তুর মধ্যে যেরূপে কোন কোন ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ তীক্ষ্ণতা হয়, অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের মধ্যেও সেইরূপে হয়। কিন্তু বেতাল-কথিত ভোজনবিলাসীর ন্যায় লোক, যে সমাজে থাকে, তাহা অসভ্য মানবসমাজ হইতে পারে না। সুতরাং উহাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, উহাদের সামাজিক অবস্থায় অসম্ভব,—একথা বলিলে বোধ হয় ভুল করা হয় না। ভোজনবিলাসীর কথা শুনিয়া রাজা যে একটু হাসিয়াছিলেন, তাহাতেও বোধ হয় যে, ইন্দ্রিয়ের ওরূপ তীক্ষ্ণতা তখনকার অবস্থায় লোকের অন্ততঃ সাধারণ গুণ বলিয়া লক্ষিত হইত না। দুই বিলাসীর কথায় ঐন্দ্রিয়িক

শক্তি যে, কিছু বেশী মাত্রায় চড়াইয়া বর্ণিত হইয়াছে, বেতালের আর একটী গল্পে তাহার যেন একটু প্রমাণই পাওয়া যায়। বেতালপঞ্চবিংশতির দশম উপাখ্যানে এই কথা আছে ঃ—

"কিয়ৎ দিন পরে ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে, রাজা ধর্ম্মধ্বজ, মহিষীত্রয়-সমভিব্যাহারে উপবন বিহারে গমন করিলেন। সেই উপবনে এক সরোবর ছিল। রাজা, তাহাতে কমল সকল প্রফুল্ল দেখিয়া, স্বয়ং জলে অবতরণ পূর্ব্বক, কতিপয় পুষ্প লইয়া, তীরে আসিয়া, এক মহিষীর হস্তে দিলেন। দৈবযোগে একটী পদ্ম, মহিষীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, তদীয় বামপদে পতিত হওয়াতে, উহার আঘাতে তাহার সেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজা হা হতোঽস্মি বলিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সুধাকরের উদয় হইবামাত্র, তদীয় অমৃতময় শীতল কিরণমালার স্পর্শে, দ্বিতীয় মহিষীর গাত্র, স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া গেল। আর তৎকালে, অকস্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে উদূখলের শব্দ হইল। সেই শব্দ, শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তৃতীয়া মহিষীর শিরোবেদনা ও মূর্চ্ছা হইল।"

উদূখলের শব্দে শিরঃপীড়া বা মূর্চ্ছা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়। স্নায়ুর অবস্থা-বিশেষে এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমার এক বন্ধুর ভ্রাতা যুবা পুরুষ, তানপূরা, সেতার প্রভৃতির সুমধুর শব্দেও মূর্চ্ছিত হইতেন, বোধ হয়, এখনও হন। আমার বন্ধু, ভ্রাতাকে কখনই সুস্থকায় বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু বোধ হয় যে, প্রকৃতার্থে অসুস্থ না হইয়াও, শারীরিক প্রকৃতির অতিরিক্ত কোমলতার ফলে কোমলতাময়ী রমণী, কখন কখন উদূখল প্রভৃতি যন্ত্রের উচ্চ ও উৎকট শব্দে শিরঃপীড়াগ্রস্তা, এমন কি, মূর্চ্ছিতাও হইতে পারেন। এরূপ শারীরিক প্রকৃতিকে বিজ্ঞানবিদেরা রোগ বা অসুস্থতা বলেন কি না, জানি না; কিন্তু লোকমধ্যে ইহা প্রকৃত রোগ বলিয়া গণ্য হয় না, বায়ুর বিচিত্র ক্রিয়া বলিয়া বিবেচিত হয়। স্নায়ুর বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উহার ক্রিয়া এইরূপ বিচিত্রতা প্রাপ্ত হয়। স্নায়ুর সেই বিশেষ অবস্থা নিতান্ত বিরল নহে। সেক্সপিয়র বলিয়াছেন ঃ—

"Some men there are, love not a gaping pig.
Some, that are mad, if behold a cat,

And others, when the bag-pipe sings i' the nose,
Can not contain their urine, For affection,
Mistress of passion, sways it to the mood
Of what it likes or loths."
(Merchant of Venice, Act IV, Sc. I.)

অর্থাৎ

'শূকরের মুখ ফাঁক হইয়া রহিয়াছে দেখিলে, কত লোকে জ্বলিয়া যায়; কত লোকে বিড়াল দেখিলে ক্ষেপিয়া উঠে; কত লোকে ব্যাগ-পাইপ নামক বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনিলে 'অসামাল' হইয়া পড়ে। কারণ, মনুষ্যের অন্তর্নিহিত অনুরাগ বা বিরাগ বশতঃ সে, কোন জিনিস দেখিলে আহ্লাদিত হয়, আবার কোন জিনিস দেখিলে চটিয়া উঠে।'

মহাকবির কথা পড়িলে বোধ হয় যে, এইরূপ ঘটনাগুলি শুধু শারীরিক প্রকৃতির ফলে ঘটে না; শারীরিক বা বাহ্য প্রকৃতির মূলে যে মানসিক বা অন্তঃপ্রকৃতি থাকে, অর্থাৎ শারীরিক প্রকৃতি, যে মানসিক বা অন্তঃপ্রকৃতির ফলস্বরূপ, তাহারই বিশেষত্বের ফলে প্রধানতঃ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ফুলের আঘাতে পা ভাঙ্গিয়া যাওয়া অথবা সুশীতল চন্দ্রকিরণে দেহের চর্ম্ম পুড়িয়া যাওয়া, উদূখলের শব্দে মূর্চ্ছিত হওয়া হইতে কিছু ভিন্ন রূপ ঘটনা। এই দুই ঘটনায় জ্ঞান বা চৈতন্যের বিলোপ বা বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় না; উদূখল-ঘটিত ঘটনায় শারীরিক প্রকৃতির যত প্রাধান্য আছে,শেষোক্ত ঘটনায় তত নাই। সে প্রাধান্যের অর্থ—শরীরের অসাধারণ, অলৌকিক ও অসম্ভব কোমলতা। ফুলের আঘাতে হাত পা ভাঙ্গিতে বা চাঁদের আলোতে দেহ পুড়িতে কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন দেখিবে কি না সন্দেহ। এরূপ যে হইতে পারে, কেহই তাহা বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে পারেন না। বোধ হয়, জড়-বিজ্ঞানও, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে অক্ষম। শারীরিক কোমলতা অসম্ভব মাত্রায় বাড়াইয়া দুইটী রাণীর উপর আরোপ করা হইয়াছে। এইরূপ বাড়াইয়া বলা, এই সমস্ত গল্পের রচয়িতার যেন স্বভাব প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। অতএব যদি বলা যায় যে, এই স্বভাব বা প্রকৃতির বশেই ভোজন-বিলাসীতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এবং শয্যাবিলাসীতে ত্বগিন্দ্রিয়ের অতি-তীক্ষ্ণতা

আরোপ করা হইয়াছে, তাহা হইলে বোধ হয় যে, নিতান্ত অন্যায় বা অসঙ্গত কার্য্য করা হয় না।

কিন্তু শরীরের অতি-কোমলতা বা ইন্দ্রিয়ের অতি-তীক্ষ্ণতা কল্পনা করা যে, কেবলমাত্র অলীকত্ব বা অসত্যপ্রিয়তার কার্য্য বা নিদর্শন, এরূপ বিবেচনা করাও বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়। অলীক বা অসত্যের কল্পনা, একেবারেই ভিত্তিশূন্য হয় না। "আরব্যোপন্যাসের" ন্যায় কল্পনাকাণ্ড, মানবপ্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত হয় এবং মানবের প্রকৃত অবস্থার আভাস-ইঙ্গিতও, উহাতে পরিলক্ষিত হয়। কল্পনা, যতই উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল হউক, প্রকৃতত্ত্বই উহার মূল বা ভিত্তি। প্রকৃতত্ব উহার অচ্ছেদ্য পাশস্বরূপ। এই জন্য মনে হয় যে, যেখানে কোমলতা বা তীক্ষ্ণতা থাকে না, সেখানে লোকে অতি-কোমলতা বা অতি-তীক্ষ্ণতার কথা কয়ও না। যখন বেতালের গল্প রচিত হইয়াছিল, তখন লোকমধ্যে দেহের কোমলতা এবং ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা, সম্ভবতঃ এক্ষণকার অপেক্ষা অধিক ছিল। আর, দেহের অতি-কোমলতা ও ইন্দ্রিয়ের অতি-তীক্ষ্ণতার কথা আমাদের মধ্যে নিতান্ত উপহাসযোগ্য হইয়াছে দেখিয়া মনে হয় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। কত কমিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। এরূপ বিষয়ে তুলনা করিয়া হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করিবার রীতিও নাই, উপায়ও নাই। উপায় না থাকিবার কারণ এই যে, আমাদের নিজের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা কিরূপ, তাহা আমরা নিজে নিজে কতকটা বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারি বটে; কিন্তু শত শত অথবা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ইন্দ্রিয়ের কত তীক্ষ্ণতা ছিল, তাহা আমরা জানি না। কারণ, তাঁহারা তাহা ঠিক্ করিয়া যান নাই। তবে পুরাণ প্রভৃতিতে তাঁহাদের কথা যে ভাবে লিখিত আছে, তাহাতে আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য অপেক্ষা তাঁহাদের শরীর ও স্বাস্থ্য যে,উৎকৃষ্ট ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তথাপি তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা করিব না। ওরূপ তুলনা না করিয়াও, আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। বক্তব্য এই যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা যেরূপ কমিয়াছে এবং এখনও কমিতেছে, তাহাতে আমাদের (বাঙ্গালি জাতির) প্রকৃত বিপদ্ ও বিষম ভয়-ভাবনার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষুঃ এবং শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণের অবস্থা যত সহজে বুঝিতে বা জানিতে পারা যায়, অন্য ইন্দ্রিয়ের অবস্থা তত সহজে বুঝিতে বা জানিতে পারা যায় না; এবং এই দুইটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণ অপেক্ষা চক্ষুর অবস্থা বেশী সহজে জানিতে পারা যায়। কেহ কালা অথবা কম শুনে কি না, তাহার কাণ দেখিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু চক্ষুঃ দেখিয়া অনেক স্থলে বুঝিতে পারা যায়, দর্শনশক্তি কম কি না। দর্শনশক্তির স্বল্পতা আর এক উপায়ে অর্থাৎ চস্‌মার ব্যবহার দেখিয়া অতি সহজেই জানা যায়। সেরূপ কোন উপায়ে শ্রবণশক্তির স্বল্পতা বুঝিবার উপায় এদেশে নাই বলিলেই হয়, বোধ হয়, সর্ব্বত্রই অতি অল্প। কারণ, ইয়ার্‌-ট্রম্পেট্ বা কর্ণভেরী থাকিলেও, উহার ব্যবহার বড় বিরল। চক্ষুর কেবল বর্ণ প্রভৃতি দেখিয়া দর্শনশক্তির অবস্থা অনুমান করিতে পারা গেলেও, ওরূপ অনুমান, বোধ হয়, অনেকস্থলে ঠিক্ হয় না। যাঁহারা শারীরতত্ত্ববিৎ নহেন, তাঁহাদের ওরূপ অনুমান না করাই ভাল। কিন্তু তাঁহারাও একটা মোটামুটি অনুমান করিলে যে, গুরুতর দোষ বা ভ্রম করেন, এরূপও বোধ হয় না। চস্‌মার ব্যবহার-সম্বন্ধেও অল্প একটু গোলের কথা আছে। চস্‌মার ব্যবহার, প্রাচীন ভারতে না থাকিলেও, ইদানীং অনেক দিন হইয়াছে। আমার পঠদ্দশার শেষাবস্থায় উহা হঠাৎ বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্মশ্রুও ব্যাপক হইয়াছিল। দুয়ের সংযোগ, সন্দেহজনক—বোধ হয়, অনেক স্থলে চস্‌মা, ঠিক্ চস্‌মারূপে ব্যবহৃত হয় নাই; বিজ্ঞতা বা গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইত। এখনও যে কেহ ঐ জন্য চস্‌মা ব্যবহার করেন না, এমন কথা বলিতে পারি না। বোধ হয়, অনেকে করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকার বা দৌর্ব্বল্যের জন্যই যে, অধিকতর-সংখ্যক লোকে, ক্রমে চস্‌মার সাহায্য লইতেছে, বোধ হয়, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ—সে বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না। আমার বাল্যে, কি সহর কি পল্লীগ্রাম, কোথায়ও বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের মধ্যেও চস্‌মার প্রচলন দেখি নাই, বলিলেই হয়—বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতীর সম্বন্ধে চস্‌মার কথা মনেও হইত না। কি পাঠশালা, কি ইস্কুল, কোথায়ও কোন সহপাঠী বা সম-সাময়িক ছাত্রের চক্ষে চস্‌মা দেখিয়াছিলাম, এরূপ মনে হয় না। এখন আর ইস্কুল কালেজে যাই না; কিন্তু দশ বার বৎসরের বালক হইতে

কুড়ি পঁচিশ বৎসরের যুবককে পর্য্যন্ত চস্‌মা পরিয়া ইস্কুল কালেজে যাইতে দেখি। অনেক বালক, চস্‌মা না পরিয়াও ইস্কুলে যায়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সকলেরই চক্ষুঃ যে নির্দ্দোষ, এখন আর মনে করিতে পারা যায় না। তিন বৎসর পূর্ব্বে মহীশূর প্রদেশের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এখানকার বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের দৃষ্টিশক্তির অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দু হেয়ার প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের চক্ষুঃ পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, এদেশের ছাত্রবর্গের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৬ জন, কোন না কোন প্রকার চক্ষূরোগগ্রস্ত। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ছাত্রবর্গের মধ্যে যে দৃষ্টিশক্তির ভয়ানক অবনতি ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক কথা আছে। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা, বিনা চস্‌মায় ভাল দেখিতে পায় না, ইহাও সম্প্রতি জানিয়াছি। আমার বাল্যে ও যৌবনে চস্‌মার কিঞ্চিৎ ব্যবহার ছিল—কিন্তু আমাদের গৃহিণীদিগের মধ্যে ছিল, তখন এরূপ জানিতাম না। পরে যখন একটী পরিণতবয়স্কার চক্ষে প্রথম চস্‌মা দেখিয়াছিলাম, তখন বেশ একটু চমকিয়া উঠিবার পরই একটু হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। এখন স্ত্রীলোকের চক্ষে চস্‌মা দেখিয়া চমকিয়াও উঠি না, হাসিয়াও ফেলি না। ও দৃশ্যে এখন কিছু অধিক মাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। পথে—আগেকার অপেক্ষা এখন অনেক বেশী চোখ-বাঁধা, অনেক বেশী চোখে সবুজ বর্ণের আবরণ, অনেক বেশী চোখের আশে পাশে উপরে নীচে নানা বর্ণের কাচখণ্ড দেখিতে পাই। এখন কাহারও কাহারও চক্ষে দুই যোড়া করিয়া চস্‌মাও দেখিতে পাই! আমাদের চোখ এখন যেমন প্রায়ই জ্বালা করে, কর্‌কর্ করে, টন্ টন্ ঝন্ ঝন্ করে, বোধ হয়, আগে তেমন করিত না; এখন যেমন প্রায়ই লাল হইয়া উঠে, বোধ হয় আগে তেমন উঠিত না; আমাদের চোখে এখন যেমন প্রায়ই জল হয়, বোধ হয়, আগে তেমন হইত না। আমাদের মধ্যে অনেকে দূর হইতে ভাল দেখিতে পান না, অনেকে নিকটে ভাল দেখিতে পান না এবং অনেকে, কি দূর হইতে, কি নিকটে, কোথাও ভাল দেখিতে পান না। পাঁচ সাত হাত দূরে বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে না পাইয়া, আমাদিগকে সর্ব্বদাই অপ্রতিভ হইতে হয়—আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে

এ কথা বোধ হয় অনেককে স্বীকার করিতে হয়। আমাদের গৃহে এখন সূচে সূতা পরাইতে যেন আগেকার অপেক্ষা গোল বাধে ; চাল দাল প্রভৃতির বাছনি আর যেন তেমন নিখুঁত হয় না ; সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে সাধারণতঃ আর যেন তেমন মনঃও নাই, পটুতাও যেন কমিয়াছে। পূর্ব্বে চিকিৎসককে সংযত হইয়া রোগীর আপাদমস্তক ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতে যেরূপ দেখিয়াছি, এখন আর প্রায় সেরূপ দেখি না। সে অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি, বোধ হয়, এখন কমিয়া গিয়াছে। যান্ত্রিক পরীক্ষার প্রচলনে চক্ষুঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হইতেছে। আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিতেছে যে, রোগনির্ণয়ে ও রোগের চিকিৎসায় ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে যন্ত্রের ব্যবহার যত বাড়িতেছে, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, তীক্ষ্ণতা, কার্য্যকারিতা এবং অন্তর্দৃষ্টি তত কমিতেছে ; ইন্দ্রিয়সকল তত স্থূল, অশিক্ষিত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে মানুষের মঙ্গল, কি অমঙ্গল, যথার্থ ই ভাবিয়া দেখিবার, যথার্থ ই বিহিত বিধানে নিরূপণ করিবার বিষয়।

আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের অবস্থাও ভাল নয়—বোধ হয়, বলিতে পারি, অতি শোচনীয় ও ভীতিজনক। আমরা ভোজের নামে নাচিয়া উঠি, ভোজ দেও বলিয়া, বন্ধুবান্ধবকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করি ; কিন্তু ভোজ পাইলে ভোজন করিতে পারি না। আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের পূর্ব্বের মত শক্তি, সামর্থ্য ও তীক্ষ্ণতা নাই। ব্রাহ্মণের ভোজে পূর্ব্বে লুচি ও মিষ্টান্ন ভিন্ন আর কিছুই দেখিতাম না ; অন্য বর্ণের ভোজেও অন্য কিছু দেখিতাম না। কিন্তু সকলকেই তখন মহানন্দে গণ্ডা গণ্ডা, কখন কখন দিস্তা দিস্তা লুচি উদরস্থ করিতে দেখিতাম। তখনকার ভোজে দধি থাকিত বটে; কিন্তু দধি, ভোজের শেষভাগে আসিত। এখন প্রায় সকলেই তখনকার অপেক্ষা কম খান, আর বোধ হয় যে, ফলাহার-ব্যবসায়ী ভিন্ন আর কেহই কেবল চিনি অথবা সন্দেশ দিয়া দুই খানা লুচিও খাইতে পারেন না। অম্ল-রোগের আধিক্যে মিষ্টান্ন, বিভীষিকাবৎ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ভোজে বহু সামগ্রীর—বিশেষতঃ, নানা চাটনির—আয়োজন করিতে হয়, নহিলে ভোক্তা বিরক্ত হন। এখনকার ভোজে ভোক্তাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মুখ বদলাইতে দেখা যায়। তখনকার ভোজে ভোক্তা কেবল খানিকটা চিনি ও গোটাকতক রস্‌করা উপলক্ষ করিয়া দিস্তা দিস্তা

লুচি ধ্বংস করিয়া ফেলিতেন। দেশে তখনও চাটনীর উপকরণ ছিল—তেঁতুল চাল্‌তা, আমড়া, কাঁচা আম, আনারস, লেবু, সকলই ছিল। কিন্তু ভোজে তখন ভোক্তার মুখ বদলাইবার প্রয়োজন হইত না। ভোজে ভোক্তার প্রকৃত ভক্তি, সত্য আসক্তি না থাকিলেই, ভোক্তা, ভোজে বিলাসী ও আড়ম্বরান্বেষী হইয়া পড়েন। আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা কমিতেছে, আমাদের জিহ্বায় আর পূর্ব্বের ন্যায় আস্বাদানুভব হয় না। পূর্ব্বে শুনিতাম যে, চল্লিশ টাকা মণের ও বিয়াল্লিশ টাকা মণের সন্দেশের আস্বাদে যে অতি সূক্ষ্ম অতি সামান্য প্রভেদ থাকে, অনেকে তাহাও অনুভব করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে যেমন সকল লোককেই শাক পাতা, ফল মূল, মিষ্টান্ন, পক্বান্ন সকল দ্রব্য খাইয়াই তৃপ্ত হইতে দেখিতাম, এখন আর সেরূপ দেখি না। লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, আমাদের পাপের দণ্ডস্বরূপ বসুন্ধরা এখন কম শস্যাদি দিতে এবং লোকের আহার্য্যের আস্বাদ অপহরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কথাটা যে একেবারেই মিথ্যা বা কুসংস্কারমূলক, এরূপ মনে হয় না। কৃষি প্রভৃতিতে আমাদের অবহেলা-অমনোযোগ-রূপ দুষ্কর্ম্মের ফলে আমাদের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে, ; সুতরাং বসুন্ধরা আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা কম শস্যাদি দিতেছেন, এবং যাহা দিতেছেন, পূর্ব্বের ন্যায় তাহা স্বাদু করিয়া দিতেছেন না। বিশিষ্ট এবং যথোপযুক্ত খাদ্য না পাইলে, কেবল জীব-জন্তুর কেন, উদ্ভিদ্‌ও পুষ্টিলাভ করে না ; এবং পুষ্টির অভাবে পশুমাংসও যেমন সুস্বাদু হয় না, উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিজ্জও তেমনই সুস্বাদু হয় না। অতএব আমাদের পাপের জন্য বসুন্ধরা সত্য সত্যই আমাদের আহার্য্যের পরিমাণ ও আস্বাদ অপহরণ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের আহার্য্যের আস্বাদ কমিবার ইহা অপেক্ষা একটী গুরুতর কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। ক্ষুধা না থাকিলে মুখে কিছুই ভাল লাগে না ; ক্ষুধা থাকিলে সকলই ভাল লাগে। কথায় বলে—'ক্ষিদে থাকলে নুন দিয়ে ভাত খাওয়া যায়।' কিন্তু আমাদের ক্ষুধা কমিয়াছে। বাল্যকালে লোককে যে পরিমাণে আহার করিতে দেখিতাম, এখন আর সেরূপ দেখি না। নব্য-সম্প্রদায়ের আহার নাই বলিলেই হয়। তখন একশত লোকের জন্য এক মণ ময়দার লুচি ভাজিবার নিয়ম ছিল, এখন নব্য সম্প্রদায়ের একশত ব্যক্তির

জন্য আধ মণের অধিক ময়দার প্রয়োজন হয় না। এখনকার ভোজে খাদ্য-দ্রব্যের সংখ্যা অনেক বেশী বলিয়া যে, ময়দার পরিমাণ এত কম হয়, তাহা নহে। এখনকার খাদ্য দ্রব্যের অধিকাংশই খুটিনাটির মধ্যে গণ্য—দুই একবার ছোঁয়া বা একটু আধটু চাকিয়া দেখা হয় মাত্র। আমার পরমারাধ্য আচার্য্য স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধ"-নামক মহাগ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"ভারতবাসীর খাদ্য-পরিমাণ ন্যূন হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে লোকে যত খাইতে পারিত, এখন তত খাইতে পারে না, সকল লোকেরই এইরূপ বিশ্বাস। এক্ষণকার দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে যে সকল ভোজ দেশে হইত, যাঁহারা তাহার দুই একটীর হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে লোক খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই পরিমাণ লোক খাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় না। প্রসিদ্ধ দেবসেবাগুলির পূর্ব্বকালের যেরূপ বরাদ্দ ছিল, তাহা দেখিলেও, অনুমিত হইতে পারে যে, এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা অল্প পরিমাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।"*

বড় বিষম,—বড় ভয়ানক কথা! আহারের অল্পতায় আমাদের স্নায়ু, পেশী, অস্থি, শোণিত প্রভৃতি শরীরের সমস্ত উপকরণের বিকৃতি ও অপকর্ষ ঘটিতেছে—আমাদের শরীরের সার পদার্থের অপচয় ও অভাব হইতেছে—আমাদের জীবনী শক্তি কমিয়া যাইতেছে। আমরা যথার্থই বড় বিপন্ন—আমাদের অবস্থা ঘোর আশঙ্কাজনক। শরীরের এরূপ অবস্থায় শুধু যে, দর্শনেন্দ্রিয় বা রসনেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে; সকল ইন্দ্রিয়ই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। অম্লাধিক্য, পিত্তাধিক্য, শ্লেষ্মাধিক্য বশতঃ আমাদের মধ্যে অনেকের শরীর, বিশেষতঃ হস্তপদ, অনেক সময় হয় অত্যধিক উত্তপ্ত, নয় অত্যধিক শীতল হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির জ্বর হইয়াছে কি না, তাহার গায়ে হাত দিয়া তাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহাদের ত্বগিন্দ্রিয় বিকৃত হইয়াছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবস্থা-

* "সামাজিক প্রবন্ধ" ২৫৪ পৃষ্ঠা।

সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা কোন কোন স্থলে খুবই সহজ, অর্থাৎ যে স্থলে কর্ণভেরী ব্যবহৃত হয় অথবা শ্রোতাকে শুনাইবার জন্য বেশী চেঁচাইতে হয়; কিন্তু অপরাপর স্থলে কঠিন। উহার পূর্ব্বাবস্থার তুলনা করিবার উপায় দেখিতে পাই না। অন্য কোন দেশে ঐরূপ তুলনা করিবার উপায় বা রীতি আছে কি না, জানি না। কিয়ৎ পরিমাণে থাকিতে পারে। কারণ, ইউরোপের অনেক স্থানের আদম-সুমারিতে বধিরের সংখ্যা নিরূপণ করা হয়। ইদানীং এদেশেও উহাদের সংখ্যা নিরূপণ করা হইতেছে। কিন্তু শুদ্ধ অন্ধের সংখ্যা দেখিয়া যেমন একটা সমগ্র জাতির দর্শনেন্দ্রিয়ের অবস্থা-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা বিহিত বোধ হয় না, তেমনই কেবল বধিরের সংখ্যা দেখিয়া একটা সমগ্র জাতির শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবস্থা-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা, সঙ্গত বিবেচনা করা যাইতে পারে না। এরূপ বিষয়ে ঠিক্ প্রণালীতে অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, বিশেষ বিদ্যা, বিশেষ অভিজ্ঞতা, বিশেষ বহুদর্শন প্রভৃতির প্রয়োজন। আমার সে সকল নাই। আমাদের বিজ্ঞানবিৎ চিকিৎসক মহাশয়দিগের সে সকল আছে। অতএব তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে এইরূপ অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। আমি এস্থলে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমাদের শরীরের সার পদার্থ যখন বিনষ্ট হইতেছে, আমাদের জীবনী শক্তির যখন হ্রাস হইতেছে, আমরা যখন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছি, তখন যে সকল ইন্দ্রিয়ের অবনতি, দর্শনেন্দ্রিয় বা রসনেন্দ্রিয়ের অবনতির ন্যায় সহজে বুঝিতে পারা যায় না, আমাদের সেই সকল ইন্দ্রিয়েরও অবনতি হইয়াছে ও হইতেছে।

ইন্দ্রিয়ের অবনতিতে সমস্ত দেহের অবনতি বুঝায়। প্রত্যুত, সমস্ত দেহের অবনতি না হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবনতি হয় না। আমাদের শরীরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইতেছে। আমাদের জীবনী শক্তির বিলোপ হইতেছে, আমরা নির্জীব নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের দেহযন্ত্র বড় নীচু সুরে বাজিতেছে, ঘুণে আমাদের কাঠাম জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের সুরও নামিয়া পড়িয়াছে, মনের কাঠামও আল্‌গা হইয়াছে। আমাদের সেই পূর্ব্বের সাহস, স্ফূর্ত্তি, সামাজিকতা প্রভৃতি আর নাই। আমাদের বালকেরা পর্য্যন্ত যেন বৃদ্ধের ন্যায় গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে।

আমরা সকল কাজেই ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছি। যে ব্যক্তি—ভীরু, নির্জীব, বিকলাঙ্গবৎ—সে আপনাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না, অপরকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। এই জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্পাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে সকল কাজে উৎসাহ উত্তম অধ্যবসায় সাহস বিক্রম এবং পরস্পরে বিশ্বাসের প্রয়োজন, সে সকল কাজে আমরা অগ্রসর হই না, হাত দিতে ভরসা করি না। আমরা আমাদের মনকে বুঝাই, অপরকেও বলি, আমাদের টাকা নাই, আমরা কেমন করিয়া এ সকল কাজ করিব? কিন্তু টাকা যে আমাদের নাই, তাহা নহে; টাকার অভাব আমাদের প্রকৃত অভাব নহে। জীবনী শক্তির অভাবই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম অভাব। ঐ অভাব, যত দিন থাকিবে, অসীম অগণিত অর্থ থাকিলেও, আমরা ব্যবসায়-বাণিজ্যাদিতে অগ্রসর হইতে পারিব না। ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি করি না বলিয়া আমরা আপনাআপনি তিরস্কার করিয়া থাকি, উচ্চৈঃস্বরে উত্তপ্ত ভাষায় পরস্পরকে ব্যবসায়াদিতে নিযুক্ত হইবার জন্য উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করি, আর বোধ হয়, মনে করি যে, এইবার আর ভয় নাই, এইবার আমরা জাগিলাম। কিন্তু মনে যাহাই করি, কাজে ত আমরা কিছুই করি না—কাজে আমরা পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় পড়িয়া আছি। আমাদের দেহের পক্ষাঘাতে আমাদের মনঃও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদের টাকাই থাকুক, আর রাজা আমাদের অনুকূলই হউন, এই পক্ষাঘাত থাকিতে আমাদের সাধ্য কি যে একটু নড়ি চড়ি, একটু চলি ফিরি, একটু আয়োজন অনুষ্ঠান করি, একটু বিদ্যা বুদ্ধি খাটাই। আমরা এখনও জানি না, আমরা এখনও বুঝি না, আমাদের প্রকৃত অভাব কি! আমাদের দুঃখ, দুর্দ্দশা দুর্গতি কি জন্য, আমাদের কষ্ট-যন্ত্রণার মূল কোথায়। তাই আমরা সভা-সমিতি করি, কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স বসাই, শিল্পাদির প্রদর্শনী লইয়া পাগল হই, ক্রিকেট ফুটবল খেলি, আর বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাহিরে জিম্‌ন্যাষ্টিক চর্চ্চা করি। আমরা মনে করি, এই সকল করিলেই আমরা সজীব, সতেজ, শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিব। আমাদের কুদিন, সুদিনে পরিণত হইবে। কিন্তু তাহা কি সম্ভব মনে করিতে পারা যায়? আমার জীবনী শক্তির লোপ হইতেছে, আমি দুই পা হাঁটিতে পারি না, দশ হাত দূরের বস্তু দেখিতে পাই না, দুই মুঠার বেশী অন্ন ভোজন করিয়া পরিপাক

করিতে পারি না, ক্ষয়-রোগীর ন্যায় আমার সমস্ত দেহ যেন দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে—ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সভ্য হইলে অথবা শাসকের হাত হইতে বিচারকের কাজ তুলিয়া লওয়া হইলে আমার যে সাংঘাতিক অবস্থা, তাহার প্রতিকার হইবে কি? আমার পক্ষাঘাত, আমার ক্ষয়রোগের উপশম হইবে কি? যদি না হয়, তাহা হইলে রাজশাসনের সমূহ সংস্কার ও পরিবর্ত্তনও তো আমাকে মানুষ করিতে পারিবে না। মানুষই যদি না হইতে পারিলাম, তবে আর রাজার নিকট হইতে দুই চারিটা অধিকার লাভ করিয়া ফল কি? রাজা আমাদের সুবোধ ও সুসভ্য। ভক্তিভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, তিনি যাহা দিতে পারেন, অবশ্যই আমাদিগকে দিবেন।

আমাদের এখন একমাত্র কাজ কি, আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না; বোধ হয়, কখন কখন দেখিয়াও দেখি না। আমরা যাহাতে পূর্ণ জীবনীশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হই এবং পূর্ণ জীবনীশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিবার উপযুক্ত হই, সকলে মিলিয়া এক মনে ধীর স্থির ভাবে সেই চেষ্টা করাই আমাদের এক্ষণকার একমাত্র অন্ততঃ সর্ব্বপ্রধান কাজ। আমরা যে সাংঘাতিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা নানা কারণে ঘটিয়াছে। আমরা ম্যালেরিয়া-বিষে জর্জ্জরিত; তৃষ্ণায় আমরা জলপান না করিয়া বিষপান করি। আমরা বিকৃত অবিশুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করি। দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি আমাদের সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরই শোচনীয় অভাব ঘটিয়াছে; আমরা ভাত পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। অথচ বিলাসিতায় আমরা বিহ্বল, ব্যতিব্যস্ত। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় আমরা অভিভূত; আমাদের মধ্যে দেহনাশক মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া যাইতেছে; আমরা স্ত্রী পুরুষ মুটে মজুর শিশু পর্য্যন্ত চা চুরুটে মজিয়া উঠিতেছি। শুনিয়াছি, চা বেশী পান করিলে স্নায়ু দুর্ব্বল হয়, বড় বেশী পান করিলে পক্ষাঘাতাক্রান্তও হইতে হয়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অনেক চা-পায়ীর লিখিতে, হাত কাঁপে, লেখা তেড়া বাঁকা হইয়া যায়। সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি অতি গুরুতর কার্য্যে আমরা শাস্ত্রের সমস্ত সুনিয়ম ভঙ্গ করিতেছি। এইরূপ নানা কারণ ঘটিতেছে। সেই সকল কারণ, যত দূর সম্ভব নিরূপণ করিতে হইবে। নিরূপণে অধীরতা, অস্থিরতা, বাগ্‌বিতণ্ডা

যেন না ঘটে। নিরূপণে বিস্তর সময় নষ্ট হইবে—ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নোদ্যম, বিরক্ত বা নিরাশ হইলে চলিবে না। বিশ্বে কারণ-রহস্যের ন্যায় রহস্য, আর আছে কি না, জানি না। সকল কারণই যে, নিরূপিত হইতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না। কোন কোন কারণ নিরূপিত হইলেও, প্রতীকার আমাদের দ্বারা নাও হইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রতীকার আমাদের সাধ্যায়ত্ত হইবে, রাজার সাহায্য অসম্ভব ও অযৌক্তিক হইবে। আমরা জীবন-মরণের সমস্যায় আসিয়া পড়িয়াছি। গুরুত্বে এ সমস্যার তুল্য সমস্যা আমাদের আর নাই। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য সমস্যায় হাত দিলে এ সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না, আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারে। বড় দুঃখ ও ভয়ের কথা, আমাদের এই জীবন-মরণের সমস্যার বিষয় না ভাবিয়া, ইহার সহিত তুলনায় যাহা অতি তুচ্ছ, তাহা লইয়াই আমরা উন্মত্ত। তাহাতেই আমাদের যৎসামান্য শক্তিসামর্থ্যের নিয়োগ ও বিনাশ সাধন করিতেছি। কায়স্থদের যে সকল শ্রেণী আছে, তাহা ভাঙ্গিয়া না ফেলিলে আমাদের জীবন-মরণের কথার যে কোন মীমাংসা হইতে পারিবে না, তাহা নহে। বৈদ্যের উপর কায়স্থের অথবা কায়স্থের উপর বৈদ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন না করিলে, আমাদের জাতির অস্তিত্বের উপায় বিধান যে হইবে, তাহাও নহে। ও সকল কাজ যদি ভালই হয়, তাহা হইলেও পরে উহাতে হাত দিলে কোন অনিষ্টই হইবে না—পরে উহাতে হাত দেওয়াই কর্ত্তব্য। আমাদের জীবন-মরণের সমস্যার সমাধান, আমাদের সকল কাজের মধ্যে প্রধান ও অগ্রগণ্য। এ সমস্যার সমাধানে বিস্তর সময় আবশ্যক হইবে, হয় ত, দুই একটা শতাব্দীই কাটিয়া যাইবে। জীবন-মরণের সমস্যায় সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। সেজন্য ভাবিলে চলিবে না। ভাবিবার প্রয়োজনও নাই। আমরা অতি উচ্চ, পবিত্র কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বহু কালের বহু সংরক্ষিণী শক্তি আমাদের সেই কুল-ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। আমাদের জাতির এই কঠিন সমস্যার সুসমাধানে বিধাতা বোধ হয় আমাদের সহায় হইবেন।

দুই বিলাসীর কথায় আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ভোজন-বিলাসী 'শ্মশান-সন্নিহিত ক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুলের' ভাতে শবদেহের দুর্গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন এবং সাত খানা গদির নীচে একগাছি ক্ষুদ্র চুল ছিল

বলিয়া শয্যাবিলাসীর ক্লেশ হইয়াছিল। এই হিসাবে ইহা হাসিয়া উড়াইবার দিবার কথাই বটে। কিন্তু আর এক হিসাবে ইহা বড় গুরুতর মহারহস্যময় কথা—এত গুরুতর, এত দুরূহ. এত রহস্যময় যে, ইহাতে প্রবেশ করিতে ভয় হয় এবং প্রবেশ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। শয্যাবিলাসী, 'সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয়' শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ অনুভব করিলেন; অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, সাত খানা গদির নীচে একগাছি ক্ষুদ্র চুল তাঁহার ক্লেশের কারণ। কারণ-রহস্য এইরূপই হইয়া থাকে। আমরা সকলেই জানি যে প্রপিতামহের ব্যাধি পিতামহ ও পিতায় দেখা যায় না, কিন্তু পুত্রে দেখা যায়। আমি নিজে এক ব্যক্তির ব্যাধি তাঁহার পুত্রে দেখি নাই, পৌত্রে দেখিয়াছি। পাঁচ সাত পুরুষের পরবর্ত্তী পুরুষে রোগের পুনরাবির্ভাবের কথা, লোকমুখেও শুনা যায়, পুস্তকেও লিখিত আছে। ফরাসী পণ্ডিত রিবো তাঁহার "Heredity" নামক গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"Idiocy appears to be transmitted rather in the collateral form ; or if in the direct line then it disappears for a generation or two. Haller was the first to note this in the case of two noble families in which idiocy had appeared one hundred years before, and it was found to re-appear in the fourth or fifth generation."

বিচিত্ততা বা মস্তিষ্কহীনতা, বংশে সোজাসুজি নীচের দিক্ অপেক্ষা বংশের ভিতর পার্শ্বের দিকেই বেশী যায়। আর সোজা নীচের দিকে গেলে চারি পাঁচ পুরুষ অন্তর দেখা দেয়। যে রোগ বহু পুরুষ অন্তর দেখা দেয়, তাহা সাত খানা গদির নীচের চুল' নহে ত আর কি? ডাক্তার রিবো এ কথাও বলিয়াছেন ঃ—

"In our own time, Dr. Seguin, who is a good authority on the question, remarks :

"I have not, to my knowledge, ever had to attend an idiotic son of an idiot or even the son of a man of weak

intellect; but I have found in the family of one of my pupils an aunt, an uncle, or oftener a grandfather afflicted with idiocy, alienation, or, at least, imbecility."

ডাক্তার সেগুইন্, মস্তিষ্কহীন পিতার পুত্রকে মস্তিষ্কহীন হইতে দেখেন নাই, কিন্তু মস্তিষ্কহীন খুড়া খুড়ী অনেক দেখিয়াছেন। ইহা যেন সেই শ্মশানের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রোৎপন্ন ধান্যের তণ্ডুলের অন্নে শবদেহের দুর্গন্ধ। জগদ্বিখ্যাত জর্ম্মণ কবি ও দার্শনিক গুইঠে বলিয়াছেন ঃ—

"From my father I inherit my frame and the steady guidance of my life; from dear little mother my happy disposition and love of story-telling. My ancestor was a 'ladies' man' and that haunts me now and then. My ancestress loved finery and show, which also runs in the blood."

অর্থাৎ, আমার দেহের গঠন এবং সুদৃঢ় জীবনপ্রণালী আমার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছি। আমার মায়ের জন্যই আমার স্বভাব এত মিষ্ট এবং গল্প বলিতে আমি এত ভালবাসি। আমার এক পূর্ব্বপুরুষ, স্ত্রীলোকের মন ভুলাইতে পারিতেন, আমারও সে ইচ্ছাটা মধ্যে মধ্যে হয়। আমার পূর্ব্বপুরুষের পত্নী জাঁকজমক ও সৌখীনতা ভালবাসিতেন। সে ভাবটা আমাতেও আছে।

দুই বিলাসীর কথায় যথার্থই কারণের দূরত্ব জটিলতার বিষয় মনে পড়ে। ব্যক্তি বা বংশ-বিশেষ ছাড়িয়া মানব-সমাজে প্রবেশ করিলে কারণের দূরত্ব ও জটিলতা কত যে বাড়িতে দেখা যায়, অর্থাৎ, কারণরহস্য কত যে গূঢ়তর ও কঠিনতর হইয়া উঠে, তাহা ঠিক্ করা এক রকম অসম্ভব বোধ হয়। নিতান্ত অসভ্য বা আদিম অবস্থায় মানুষ একলা একলা থাকে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে নানা কারণে দশ জন মানুষ একত্র হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। তখন মানুষের সমাজ গঠিত হয়। জগতের অপর সকল সামগ্রীর ন্যায় মানবসমাজও পরিবর্ত্তনশীল। কোন সমাজের কোন পরিবর্ত্তনই অকারণে হয় না;—অতি স্বাভাবিক, অতি অনিবার্য্য কারণেই হয়। সমাজের দুইটি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয়টী প্রথমটীর ফলস্বরূপ; অতএব প্রথমটীর সহিত সম্বন্ধহীন

হইতে পারে না। এইরূপে সমাজের কোন একটি অবস্থা উহার পরবর্ত্তী সমস্ত অবস্থার ফল বা পরিণাম—অতএব উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন অবস্থার সহিত সম্বন্ধশূন্য নহে। হিন্দু-সমাজের অবস্থার শত শত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহার বর্ত্তমান অবস্থা, সেই শত শত পরিবর্ত্তনের ফল। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, উহার বর্ত্তমান অবস্থার বহু কারণ, বহু দূর কালে উপস্থিত হইয়াছিল। আবার সমাজের যত অবস্থান্তর ঘটিতে থাকে, কতকগুলা কারণের সহিত অপর কতকগুলা কারণ তত জড়িত বা মিশ্রিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কারণের দূরত্ব ও জটিলতা এক রকম অসীম হইয়া পড়িয়াছে। কারণের এই দূরত্ব ও জটিলতা বশতঃ উহার অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেকগুলি বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের প্রচলিত ধর্ম্ম—দেব-দেবীর পূজা—ইহাও আমরা বুঝি কি না সন্দেহ। কেমন করিয়া বুঝিব? উহার ভিত্তিস্থলে, ইহার কারণরূপে বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র সকলই থাকা সম্ভব; আছে বলিয়া একটু একটু অনুভূতও হয়। কিন্তু ও সকলের সহিত আমরা এক রকম অপরিচিত। যেখানেই কারণের দূরত্ব ও জটিলতা, সেই খানেই এইরূপ অজ্ঞতা। আমরা আমাদিগকেই ঠিক্ জানি না, ঠিক্ বুঝি না।

আবার, কোন সমাজের কারণ, কেবল যে, সেই সমাজেই উৎপন্ন হয়, তাহা নহে; অন্য সমাজ হইতেও আইসে। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক ফ্রীমান্ বলেন—

(ক) "The history of the Aryan nations of Europe, their languages, their institutions, their dealings with one another, all from one long series of cause and effect, no part of which can be rightly understood if it be dealt with as something wholly cut off from, and alien to, any other part. There is really nothing in certain arbitrarily chosen centuries of the history of Greece and Italy which ought to cut them off, either for reverence or for contempt, from any other portion of the kindred nations."

(খ) "We are learning that Greek and Roman history do not stand alone, bound together by some special tie, but isolated from the histoty of the rest of the world, even from the history of the kindred nations. We are learning that European history, from its first glimmerings to our own day, is one unbroken drama, no part of which can be rightly understood without rcfereace to other parts which come before and after it.

প্রকৃত পক্ষে কোন একটী সমাজের কোন একটী অবস্থা, যেমন উহার, অন্য কোন অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না, তেমনই কোন একটী সমাজ, অন্য সমস্ত সমাজের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইতে পারে না। সম্বন্ধশূন্য হওয়া দূরে থাকুক, বহুসমাজের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, এত অধিক এবং এত জটিল যে, তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব। বৃহৎ স্রোতস্বতীতে যখন প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া ভীম বেগে ছুটিতে থাকে, তখন দেখা যায়, এক এক স্থানে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিক্ হইতেই তরঙ্গ আসিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। কোন্ তরঙ্গটা কোন দিকের, আর ঠিক করিতে পারা যাইতেছে না; সমস্ত তরঙ্গভাঙ্গা সমস্ত জল এমনই মিশ্রিত হইয়া পড়িতেছে যে কোন্ জলটুকু কোন্ তরঙ্গভাঙ্গা, তাহার আর কোন ঠিকানাই হইতে পরিতেছে না। বহুসমাজের সম্বন্ধের প্রকৃতিও প্রায় এইরূপ। সুতরাং মানবের ইতিহাসে মানবকে বুঝা বড়ই কঠিন। ফিনিসিয়া, আসিরিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশবাসীদিগকে ঠিক জানা হইয়াছে, ঠিক বুঝা হইয়াছে কি না, সন্দেহ; এবং আধুনিক ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ, ইতালীয় প্রভৃতিকেও ঠিক জানা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ফলতঃ, মানুষ, মানুষকে ভাল বুঝিতে পারে নাই, বোধ হয়, কখন পারিবেও না। বড় বড় ঐতিহাসিক-দিগের একই বিষয়ের ব্যাখ্যা বা বর্ণনায় যেরূপ অনৈক্য দেখা যায়, তাহাতেও এই রূপই মনে হয়।

কিন্তু ব্যক্তি বা বংশ-বিশেষের কারণ-রহস্য অথবা মানবজাতির কারণ-রহস্য, সমস্ত জগতের কারণ-রহস্যের সহিত তুলনায় রহস্যই নয়। ইংরাজ

কবি টেনিসনের একটী সন্তান জন্মিলে, তিনি তাহার উদ্দেশে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

(I)

"Out of the deep, my child, out of the deep,
Where all that was to be, in all that was,
Whirl'd for a million æons thro' the vast
Waste dawn of multitudinous-eddying light—
Out of the deep, my child, out of the deep,
Thro' all this changing world of changeless law,
And every phase of ever-heightening life,
And nine long months of antenatal gloom,
With this last moon, this crescent—her dark orb,
Touch'd with earth's light—thou comest, darling boy."

(II)

"Out of the deep, my child, out of the deep,
From that great deep, before our world begins,
Whereon the Spirit of God moves as he will—
Out of the deep, my child, out of the deep,
From that true world within the world we see,
Where-of our world is but the bounding shore—
Out of the deep, Spirit, out of the deep,
With this ninth moon that sends the hidden sun,
Down yon dark sea, thou comest, darling boy."

কবি রবীন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন :—

(১)

অগণ্য আবর্ত্তমান আলোকের আদিম-উষায়
যে মহাসমুদ্র-মাঝে ভবিতব্য-ভূত গর্ভ তলে

হ’তেছিল ভ্রাম্যমাণ প্রাণিশূন্য লক্ষ যুগ ধরি’—
সেই মহাসিন্ধু হ’তে, বৎস মোর, সেই সিন্ধু হ’তে,—
নিত্য-বিধানেতে বাঁধা অনিত্য বিশ্বের মধ্য দিয়া
ক্রমে প্রাণ-বিকাশের পর্ব্বে পর্ব্বে করিয়া নির্ভর,
যাপি’ দীর্ঘ নয় মাস জন্মপূর্ব্ব গর্ভ-অন্ধকারে
গত রাত্রে চন্দ্রোদয়ে—যে চন্দ্রের মণ্ডলার্দ্ধ-খানি
হ’য়েছিল আলিখিত ধরিত্রীর আলোক-ছায়ায়—
আসিয়াছ, প্রিয় বৎস, আমাদের আপনার ধন।

(২)

যে মহাসমূদ্র-মাঝে বিশ্ব-বিকাশের পূর্ব্বকালে
পরমাত্মা ক’রেছেন স্বেচ্ছায় আনন্দে সঞ্চরণ,
সেথা রাজে সত্যলোক, অসৎ-জগৎ-অন্তরালে—
এ জগৎ, সে লোকের দৃষ্টিগম্য সীমা-তট শুধু—
সে মহাসমুদ্র হ’তে, হে আত্মন্, সেই সিন্ধু হ’তে
আসিয়াছ, প্রিয় বৎস, নবমীর চন্দ্রোদয়-সনে
রবিরে বিদায় করি’ ওই অস্ত-সমুদ্র-তিমিরে।

এই কাব্যে টেনিসন্‌কে খৃষ্টান কবি বলিয়া মনে হয় না। তিনি ভবিতব্যতায় বিশ্বাস করেন—‘all that was to be, in all that was’ ইহার যেন সেই অর্থ। ‘All that was to be, in all that was’—ইহাকে ইংরাজীতে *fate* বা *predestination* বলে। কিন্তু ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান খৃষ্টান কবি মিল্টন্ predestination বা ভবিতব্যতা মানিতেন না; উহা তাঁহার ঈশ্বর-তত্ত্বের বিরোধী। তাঁহার মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

* * * "In discourse more sweet
(For Elopuence the Soul, Song charms the Sense)
Others apart sat on a hill retired,
In thoughts more elevate, and reasoned high
Of Providence, Fore-knowledge, Will and Fate—

Fixed fate, free will, fore-knowlge absolute—
And found no end, in wandering mazes lost.
Of good and evil much they argued then,
Of happiness and final misery
Passion and apathy, and glory and shame :
Vain wisdom all and false philosophy !"

‘All that was to be. in all that was’—টেনিসনের এ কথার অর্থ, যাহা কিছু হইবার তাহা, যাহা কিছু ছিল, তাহারই মধ্যে ছিল। যাহা কিছু হইবার, অর্থাৎ, যখন কিছুই হয় নাই, তখন হইবে বলিয়া, যাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা যখন প্রকাশিত হয় নাই, তখন সত্যলোক বা ইংরাজ কবির ‘true world’ ছিল। সে সত্যলোক বা true world পরিদৃশ্যমান নহে। যাহা পরিদৃশ্যমান, আমরা তাহাকে অসত্যলোক বলি। যাহা অসত্য বা পরিদৃশ্যমান, তাহা সত্য বা অপরিদৃশ্যমানেই ছিল। কিরূপে ছিল, তাহা জানিবার বিষয় নয়। বোধ হয় কেবল যোগসিদ্ধ নির্ব্বাণমুক্তিপ্রাপ্তের উপলব্ধির বিষয়। অতএব তত দূরের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। কিন্তু তত দূরের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যাহা পাড়িয়া থাকে, তাহার বিশালত্ব, বিরাটত্ব, অনন্তত্বের কথা ভাবিলে হতজ্ঞান হইতে হয়! অসত্য-বিকাশপ্রাপ্তেরই বা আরম্ভ কোথায়, শেষ কোথায়? আদি-বিকাশে আর এক্ষণকার বিকাশে প্রভেদই বা কত, সাদৃশ্যই বা কোথায়? অথচ আজিকার বিকাশ, সেই আদি বিকাশ হইতেই উদ্ভূত, তাহারই পরিণতি। সে পরিণতি, মানববুদ্ধির একান্ত অতীত ও অনায়ত্ত। কোটি কোটি অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনের ফলে আদিবিকাশ এক্ষণকার বিকাশে দাঁড়াইয়াছে। আবার কোটি কোটি পরিবর্ত্তনের ফলে এক্ষণকার বিকাশ, ভবিষ্য বিকাশে দাঁড়াইবে। অর্থাৎ, আদি বিকাশ এক্ষণকার বিকাশের কারণ; এক্ষণকার বিকাশ, ভবিষ্য বিকাশের কারণ। কিন্তু আদিবিকাশ ও বর্ত্তমান বিকাশের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নাই—এখন মৃত্তিকা আছে, প্রস্তর আছে, উদ্ভিদ্ আছে, জীবজন্তু আছে, আদিতে এ সব ছিল না। যাহা ছিল, তাহা হইতেই এ সব হইয়াছে বটে। কিন্তু যাহা ছিল, কেমন করিয়া তাহা হইতে এ সব হইল—কাহারও সাধ্য—নাই বলিয়া দেয়, কেহ তাহা কখন

জানে নাই। ভয় হয়, কেহ তাহা কখনও জানিবেও না। এখন যে পদার্থটী দেখিতেছি, সেটীকে জানিতে হইলে কোটি কোটি পরিবর্ত্তনরূপ কোটি কোটি কারণ ভেদ করিয়া পরিদৃশ্যমান জগতের প্রারম্ভে যাইতে হয়। এই যে ভীষণ পেলেগ (plague) ব্যাধি, আজ ভারতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী নাশ করিতেছে, ইহাও সেই আদিবিকাশে ছিল, এবং ইহাও কোটি কোটি পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। পেলেগ ব্যাধি কি, কে বুঝিবে? ইহার চিকিৎসা কি, কে বলিয়া দিবে? একটী মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুরকুল, তাহার পিতামাতা, তাহার জন্ম, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা, বার্দ্ধক্য, বিষয়-কর্ম্ম, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় বুঝিতে হয়। কিন্তু মানুষটী আমাদের সমসাময়িক অথবা নিকটবর্ত্তী হইলেও, এ সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায় না; সুতরাং মানুষটীকেও সম্পূর্ণ বুঝা হয় না। আবার মানুষকে জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় একটী পদার্থ বলিয়া ধরিলে, তাহাকে বুঝা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, জগতের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় এক একটী মানুষও কোটি কোটি পরিবর্ত্তনরূপ কোটি কোটি কারণের ফল। অত কারণ ভেদ করে, এমন মানুষ তো এ পর্য্যন্ত হইল না। লোকে বলে, সেক্সপীয়র্, মানবপ্রকৃতি বড় বুঝিতেন। ঠিক্ কথা। কোন্ অবস্থায় কিরূপ মনের ক্রিয়া, কি প্রকারে হয়, তিনি তাহা যেমন বুঝিতেন, অল্প লোকেই তেমন বুঝিয়াছে। কিন্তু একটী মনঃ, কেন একরূপ হয়, আর একটী মনঃ, কেন অন্যরূপ হয়, তাহা তিনিও বুঝিতেন না। বাঘের ও হরিণের মধ্যে প্রভেদ কি, প্রাণিতত্ত্ববিৎ তাহা বেশ বলিয়া দিতে পারেন। হরিণের শৃঙ্গ আছে, বাঘের শৃঙ্গ নাই, ইত্যাদি। কিন্তু আদি বস্তুর ক্রম-বিকাশের ফলে বাঘই বা কেমন করিয়া হইল এবং হরিণই বা কেমন করিয়া হইল, কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ তাহা কখনও বুঝেন নাই, কখন বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশাও হয় না। উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ, বৃক্ষলতাদি-সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু আদি বস্তুর ক্রমবিকাশের ফলে তাল তিতিড়ী বৃক্ষই বা কেমন করিয়া হইল এবং লতাগুল্মই বা কেমন করিয়া হইল, তিনি তাহা কখন বুঝিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি, কখন বুঝিবেন বলিয়া আশাও করিতে পারি না। মানব-মধ্যে অলোক-সামান্য প্রতিভা ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা

পদার্থাদির ক্রিয়ার কিছু কিছু নিয়ম নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু পদার্থাদি কেমন করিয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহারাও কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। স্যর্ আইজাক্ নিউটন্-সম্বন্ধে ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন—

Nature and Nature's laws lay hid in night,
God said, let Newton be and all was light.

মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত ও অবধারিত করিয়া নিউটন্, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থের গতি প্রভৃতির নিয়ম, লোক-চক্ষে ফুটাইয়া দিয়াছেন বটে; কিন্তু গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি পদার্থ কেমন করিয়া হইয়াছে, এ সকল তিনিও বুঝেন নাই, সুতরাং বুঝাইতেও পারেন নাই। তিনি Nature বা প্রকৃতির দুই একটা নিয়ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেখিতে পান নাই। তাঁহার অলৌকিক-প্রতিভা-সত্ত্বেও Nature বা প্রকৃতি, আজ 'যে তিমিরে সে তিমিরে'। বোধ হয়, অনন্তকাল 'যে তিমিরে সে তিমিরে' থাকিয়া যাইবে। তাঁহার ন্যায় মহ-পুরুষেরা সময়ে সময়ে পদার্থাদি ক্রিয়ার দুই এক একটা নিয়ম নির্ণয় করেন বটে, আর সেই জন্য যৎকিঞ্চিৎ আলোক পাইয়া আমরা অতি অল্পমাত্র দেখিতে পাই এবং অতি অল্পমাত্র কার্য্য করি। যে টুকু দেখিতে পাই, তাহাও যেন পরিষ্কার দেখিতে পাই না, যে কার্য্য টুকু করি, তাহাতে যেন অতি অল্পই সিদ্ধিলাভ করি। বস্তুতঃ আমাদের আলোকের অতি শোচনীয় অভাব। চৈত্র মাস, কৃষ্ণ পক্ষ, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আকাশ ও পৃথিবী, অন্ধকারে আবৃত। ভাগীরথী-তীরে বসিয়া আছি। ভাগীরথী দেখিতে পাইতেছি না। কেবল ভাগীরথী-বক্ষে অতি দূরে, অনতিদূরে, নিকটে, অতি নিকটে এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষীণ দীপালোক দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিছুই আলোকিত হইতেছে না। তাহা যেখানে, সেই খানেই যেন স্তিমিতবৎ। তাহাতে দুঃখী মাঝিমাল্লা মোটা চালের, মোটা ভাতও ভাল করিয়া দেখিয়া খাইতে পারে না। মনে হইল, ঐ আলোকটী থেলিস্, ঐ আলোকটী আরিস্ততেল্, ঐ আলোকটী আর্কিমিদিস্, ঐ আলোকটী নিউটন্, ঐ আলোকটী লিনীয়স্, ঐ আলোকটী দারবিণ, ইত্যাদি ইত্যাদি—যেখানে জ্বলিতেছে, সেই খানেই একটু ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোক, তাহাতে সেই ক্ষীণ, অস্পষ্ট আলোকটুকুমাত্র দেখা যায়, আর কিছুই দেখা যায় না। ফল কথা, আমরা পৃথিবীর

কিছুই জানি না বলিলেই হয়। পৃথিবীর উপর উপর দুই চারিটা স্থূল কথা জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু পৃথিবীর সাত খানা গদির নীচে কি আছে, তাহা জানিও না, ব্রহ্মে পরিণত না হইলে কখন যে জানিব, তাহাও বোধ হয় না। কিন্তু পৃথিবীর ভিতরে বা সাতখানা গদির নীচে যাইতে না পারিলে, উহার উপরিভাগও প্রায় অজ্ঞাতই থাকে। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান বিজ্ঞানবিৎ লর্ড কেল্‌বিন্‌, ১৮৯৬ সালে তাঁহারই সম্বর্দ্ধনার্থ একটা ভোজে বলিয়াছিলেন :—

"One word characterises the most strenuous of the efforts for the advancement of science that I have made perseveringly for fifty-five years : that word is failure. I know no more of electric or magnetic force, or of the relation between ether, electricity, and ponderable matter, or of chemical affinity, than I knew and tried to teach to my students of natural philosophy fifty years ago in my first session as Professor."

মানুষ, জানে অতি অল্প, জানিতে পারে অতি অল্প। তাই লর্ড কেল্‌বিন এত নম্র, এত বিনীত, এত নিরহঙ্কার। বিশ্বনাথের বিশ্বের কারণ-রহস্য এবং বস্তু-রহস্যের বিশালতা ও দুর্জ্ঞেয়তার কথা ভাবিলে সকলেরই লর্ড কেল্‌বিনের ন্যায় নিরহঙ্কার, নম্র, বিনীত হওয়া কর্ত্তব্য। বড় দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর সাহিত্যে এখন উগ্রতা, ঔদ্ধত্য, স্পর্দ্ধা, অহঙ্কার বাড়িতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে এই সকল লক্ষণের যেন অতি-প্রাবল্য হইতেছে। বোধ হয়, যেন আমরা প্রত্যেকেই এইরূপ মনে করি—একমাত্র আমিই অভ্রান্ত—অপর সকলে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত; বিষয় সহজই হউক, কঠিনই হউক, বুঝিবার ক্ষমতা আমার ভিন্ন আর কাহারও নাই; সার কথা কেবল আমি বলিতে পারি, আর কাহারও বলিবার সাধ্য নাই; শুনিবে তো আমার কথা শুন, আর কাহারও কথা শুনিয়া ইহকাল পরকাল হারাইও না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জন্য আমাদের কাহারও সহিত কাহারও মিল হয় না, আমরা সকলেই প্রাধান্যপ্রয়াসী। প্রাধান্য না পাইলে আমরা কাহারও সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারি না, পরস্পরের প্রতি আমাদের বিষম ঘৃণা ও বিদ্বেষ, আমাদের মধ্যে সদ্ভাবের একান্ত অভাব। এই জন্য আমাদের সাহিত্যে আর সৌন্দর্য্য নাই, আমাদের সমাজে

এ কারণেও ঐক্য নাই, দশ জনে মিলিত হইবার অপ্রবৃত্তিই বেশী; শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। বোধ হয় যে, আমরা বিশ্বনাথকে ভুলিতেছি বলিয়া, বিশ্বের কারণ-রহস্য ও বস্তু-রহস্যের বিশালতা ও দুর্জ্ঞেয়তার প্রতি আর লক্ষ্য করি না বলিয়া আমাদের সাহিত্য ও সমাজ—দুইই—বিপন্ন। আমাদের সাহিত্যকে পরিষ্কৃত ও উন্নত করিতে হইবে; আমাদের সমাজ বা হিন্দুজাতিকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। দুই কার্য্যই কঠিন। দ্বিতীয় কার্য্য, প্রথম কার্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণে কঠিন। কিন্তু বিশ্বনাথের ভক্ত হইয়া তাঁহার বিশাল বিশ্বরহস্যে মুগ্ধ হইলে আমাদের অহঙ্কার, আত্মাভিমান এবং তজ্জনিত কলহপ্রিয়তা, বিদ্বেষবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই চলিয়া যাইবে এবং উভয় কাজেই আমাদের মতি, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মিবে। আমরা নিতান্তই করুণার পাত্র হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পাপেই আমরা এমন হইয়াছি বটে। কিন্তু আমরা বড় পবিত্র ঘরের সন্তান। আমাদের পিতৃপুরুষেরা বিশ্বনাথকে লইয়াই বিভোর হইয়া থাকিতেন। বিলাস-বৈভবে তাঁহাদের মনঃ ছিল না; তাঁহাদের রাজ্যলালসা ছিল না; তাঁহারা দিগ্বিজয় করিতেন বটে, কিন্তু বিজিতের নিকট হইতে করমাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদিগকেই দিয়া আসিতেন; তাঁহারা নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত, বসুন্ধরা রঞ্জিত করিয়া বেড়াইতেন না; তাঁহারা পরস্বাপহরণ করিতেন না; লুণ্ঠন লাঞ্ছনা করিতেন না, তাঁহারা কখনও কাহারও মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেন না। তাই তাঁহারা বিশ্বনাথের বিশেষ কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন—পুণ্যে ও পবিত্রতায় পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন আবার পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইতেছেন,—আজিকার ইউরোপ ও আমেরিকা, তাঁহাদের জ্ঞানালোক লাভ করিবার জন্য লালায়িত। ইহাতে বুঝিতে হয়, তাঁহাদের পুণ্যফল ফুরায় নাই। প্রকৃত পক্ষে, তেমন পুণ্যফল কখন ফুরায়ও না। আমরা পতিত, কিন্তু তাঁহাদেরই পুত্র। পিতার পুণ্যফলে পুত্রের প্রথম ও অবিসংবাদী অধিকার। তাই মনে বড় আশা যে, বিশ্বনাথের নিকট ভক্তিভরে অবনত শিরে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই অধিকার প্রার্থনা করিলে, কৃপা করিয়া তিনি আমাদিগের সেই পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত পুরী রক্ষা করিবেন। *

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

* প্রবন্ধটী, ৩য় বাৎসরিক ১০ম অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

মহা সমাধি।

ওই মহা শূন্যপরে, অগণিত বিশ্ব ঘোরে,
সূর্য্য চন্দ্র অগণিত,. গ্রহ তারা আর কত,
অনন্তের পানে ধায় কিবা চমৎকার !
কে জানে কি মহামন্ত্রে, কি অদৃশ্য দেব যন্ত্রে,
ঘুরি ফিরি দিশি দিশি, হয় নাক মেশা মিসি,
ছুঠেছে অনন্তে, মহাশূন্য অদ্ভূত আধার !
রূপ হতে রূপান্তর, কভু সূক্ষ্ম স্থূলতর,
কভু বা ভাতিছে জ্যোতি, কভু বা বিচিত্র গতি,
প্রলয়, উদ্ভব, স্থিতি, চলিয়াছে অবিশ্রাম।
এই আছে এই নাই, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বঠাঁই,
আসিতেছে থরে থরে, মিশিতেছে বারে বারে,
মহা শূন্য নিরাকারে সাকার বিধান।
ভীষণ পাপাত্মা কিম্বা দেব অবতারে,
ছিল যারা পরিচিত জগৎ সংসারে,
পার্থিব মৃত্যুর শেষে, সঁকলে হেথায় আসে,
মিসে যায়, কোথা যায়, কিবা তার হবে হায়,
কে জানে উত্তর তার, এই কিনা পরিচ্ছেদ ?
অসীম অনন্ত ভাব, কোথায় ইহার ভেদ !
কে জানে ইহার তত্ত্ব, কোথা আছে লুকায়িত,
দৃষ্টি হেথা দিসে হারা, জ্ঞান নাহি দেয় সাড়া,
তর্ক, যুক্তি, মতামত মূক, কেবা কিবা কবে,
পরাভূত সর্ব্বশক্তি মহা সমাধি নীরবে।

শ্রীআশুতোষ দেব।

পুরী যাইবার পথে। *

মুখবন্ধ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া পুরী ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। উড়িষ্যার নানা স্থানে প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির বহুল স্মৃতি-চিহ্ন, অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে আমি কিয়দংশমাত্র দর্শন করিবার অবসর পাইয়াছিলাম ; তাহারই ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অদ্য আপনাদিগের নিকট পাঠ করিতে সাহসী হইয়াছি। এক দিনে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করা বহু-সময়-সাপেক্ষ এবং আমার বিশ্বাস যে, তাহাতে আপনাদের ধৈর্য্য চ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য প্রবন্ধটীকে দুই অংশে ভাগ করিয়াছি। অদ্য যে অংশ, সভায় পঠিত হইবে, তাহাতে পুরী যাইবার পথে যাহা কিছু দর্শনযোগ্য আছে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যদি এই প্রবন্ধ আপনাদিগের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বারান্তরে পুরী সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্য-সভায়" ভ্রমণবৃত্তান্ত-বিষয়ক কোনরূপ প্রবন্ধ কেহ পাঠ,করেন নাই ; সুতরাং এরূপ নূতন বিষয়ের অবতারণা সকলের প্রীতি-প্রদ হইবে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।

প্রবন্ধে নূতন কথা কিছুই নাই। যাহা যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে, যাহা এ দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হইয়া নানা গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে নূতন কথা বলিবার কি আছে ? যাঁহারা এই সকল বিষয়, বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যর্ উইলিয়ম্ হণ্টার্ ও "এসিয়াটিক্ সোসাইটী" দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিয়া স্বচক্ষে এই সকল স্মৃতি-চিহ্ন দেখিতে গমন করেন।

আর একটি কথা এই যে, উড়িষ্যাবাসীদিগকে আমরা কিঞ্চিৎ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি। যাহারা প্রায় সার্দ্ধ-দ্বি-সহস্র বৎসর,কাল আমাদিগের প্রাতঃ-

---

* "সাহিত্য-সভার" ৩য় বার্ষিক ১১শ অধিবেশনে (১৯০৩; ১০ই মে রবিবারে) ডাক্তার রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর দ্বারা পঠিত।

স্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি চিহ্ন সবিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এই প্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও মনে তাহাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবার অভিলাষ জন্মে, তাহা হইলে আমি আমার সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

(১)

তীর্থ-সূত্রে পুরীর বিশেষত্ব।

পুরী, হিন্দুদিগের একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ইহা শ্রীক্ষেত্র, জগন্নাথ-ক্ষেত্র, নীলাচল, পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামে হিন্দুমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। বারাণসীর ন্যায় প্রাচীন না হইলেও পবিত্রতা ও গৌরবে ইহা অদ্বিতীয়, এবং অসাম্প্রদায়িকত্ব-সূত্রে ইহা হিন্দু-তীর্থ-কুলের চূড়ামণিস্বরূপ। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব এই তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

তীর্থমাহাত্ম্যে পুরী, যেরূপ পবিত্র,—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও সেইরূপ গৌরবান্বিত। বোধ হয়, যেন এই তীর্থে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করিয়া একের উপর অন্যের আধিপত্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। নীলোর্ম্মি-চঞ্চল অনন্ত-বিস্তৃত মহোদধি, এই তীর্থের পাদ-প্রক্ষালনে নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছে। অমল-ধবল সৈকতময় বেলা-ভূমি, এই তীর্থের পবিত্রতার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। এই তীর্থের পবিত্র উরঃ-শোভিত শ্রীমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া, যেন গোলোক ও ভূলোকের ব্যবধান অন্তর্হিত করিয়া ভক্ত জনের মানসে অপার আশা ও অব্যক্ত আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। এই তীর্থের ক্রোড়ে সমাসিত অগণিত কণ্ঠের অবিরাম উচ্চারিত জগন্নাথের পবিত্র নাম, সংসার-ক্লিষ্ট দুঃখ-ভারে অবসন্ন মানবের প্রাণে নূতন জীবনী-শক্তি প্রদান করিতেছে। পুরী, পৃথিবীতে একটী অদ্বিতীয় তীর্থ।

এরূপ আকাঙ্ক্ষিত স্থান হইলেও, পুরী, এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে সুগম ছিল না।

রেল্ হইবার পূর্ব্বে পুরী যাই-বার পথকষ্ট।

কলিকাতা হইতে পুরী যাইতে হইলে কতক দূর জাহাজে, কতক দূর নৌকায় এবং কতক দূর স্থলপথে যাইয়া পুরী পঁহুছিতে হইত। জলপথে পুরী যাইবার জন্য দুইটী রাস্তা ছিল। কলিকাতা হইতে গেঁওখালি যাইয়া খালের মধ্য দিয়া ছোট ষ্টীমার বা নৌকা-যোগে কটক পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত। সমুদ্র-পথে যাইতে হইলে

কলিকাতা হইতে জাহাজে চাঁদবালি পৌছিয়া তথা হইতে খালের মধ্য দিয়া কটকে গমন করিতে হইত, অথবা বঙ্গোপসাগর দিয়া জাহাজ একেবারে পুরীতে উপনীত হইত। কটক হইতে যাত্রীরা সুপ্রসিদ্ধ "জগন্নাথ-সড়ক্" দিয়া গো-যান বা পাল্কী সাহায্যে অথবা পদব্রজে পুরী গমন করিত। কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত রাজপথ আছে, তাহা মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, মোগলমারী, জলেশ্বর, বালেশ্বর, ভদ্রক ও জাজ্‌পুরের মধ্য দিয়া কটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কটক হইতে পুরী ৫৩ মাইল ব্যবধান। জগন্নাথ, সড়ক্-নামক একটি শাখা-পথ, কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্বে সামান্য অবস্থার যাত্রিগণ অনেকেই এই স্থল পথ দিয়া পুরী গমন করিত। জগন্নাথ-সড়ক্ বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার রাস্তা; ইহাতে ৩ হইতে ৫ মাইল অন্তর এক একটি করিয়া সরাই আছে। স্থল-পথে পুরী যাইতে হইলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী পার হইতে হয়। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই সকল নদী সহজেই হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। পূর্ব্বে বর্ষাকালে নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইত। অধুনা উহাদিগের উপর রেলওয়ে-সেতু নির্ম্মিত হওয়াতে পারাপারের কষ্ট নিবারিত হইয়াছে।

জাহাজে পুরী যাইতে হইলে অসুবিধার সীমা ছিল না। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু নর-নারী-মাত্রেই জাহাজে এক প্রকার অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। স্থলপথেও যে কষ্টের কিছু অভাব ছিল, তাহা নহে। অভ্যস্ত খাদ্য সামগ্রীর অসদ্ভাব, পথ-ক্লান্তি-নিবারণ ও রাত্রি-যাপনের জন্য উপযুক্ত বিশ্রাম স্থানের অভাব, পরিষ্কৃত পানীয় জলের অনাটন, পথি মধ্যে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা, এই সকল গুলিই যাত্রীদিগের সবিশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিত। মধ্যে মধ্যে ভীষণ বিসূচিকা-রোগ, প্রবল হইয়া শত শত যাত্রীকে দারুণ পথকষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত করিত। যাহারা রোগাক্রান্ত হইত, জীবিতাবস্থাতেই সহ-যাত্রীদিগের দ্বারা তাহারা পথের ধারে পরিত্যক্ত হইত এবং এরূপ অসহায় অবস্থা দেখিয়া রোগ, যাহা সাধন করিতে মমতা ও বিলম্ব প্রকাশ করিত, মাংসলোলুপ হিংস্র শৃগাল কুকুর দ্বারা তৎকার্য্য অনতিবিলম্বে সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বে হাঁটা পথে ডাকাইতির বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। সে দিনকার

"ভারতীতে" কটকের পথে ডাকাইতির একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা এ সম্বন্ধে ভয় করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই; কিন্তু স্থলপথে যাইতে আর একটী বিপদ্ আছে। এখনও পশ্চিমদেশবাসীরা অনেকে স্থলপথে পুরী গমন করিয়া থাকে। পথিমধ্যে চটিতে বিশ্রাম করিবার সময় কখন কখন দুষ্ট লোক আসিয়া তাহাদের খাদ্যের সহিত ধুতুরার বীজ মিশ্রিত করিয়া দেয় ও অজ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। অধিক দিনের কথা নহে, গত নভেম্বর মাসে ছয় জন যাত্রী, জগন্নাথ-সড়ক্ দিয়া পদব্রজে পুরী যাইতেছিল। ভদ্রকের নিকট দুই জন অপরিচিত ব্যক্তি, তাহারাও পুরী যাইতেছে বলিয়া, উহাদিগের নিকট পরিচয় প্রদান করে এবং বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাদের খাদ্য পাক করে। সেই খাদ্য-ভক্ষণে উক্ত ছয় জন যাত্রী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই অবসরে ঐ দুই ব্যক্তি তাহাদের নিকট যাহা কিছু ছিল, লইয়া পলায়ন করে। পুলিশ ৫ জনকে পথের ধারে অজ্ঞানাবস্থায় পতিত দেখিয়া ভদ্রকের হাঁসপাতালে লইয়া যায়; তথায় শুশ্রূষা দ্বারা তাহারা আরোগ্য লাভ করে। তখন তাহারা বলে যে, তাহাদের সঙ্গে আর এক জন যাত্রী ছিল; সেও ঐ খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিল। পুলিশ অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ ব্যক্তির মৃত দেহ একটি ধান্য-ক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছে দেখিতে পায়। উহার পাকাশয়াদি এবং খাদ্য দ্রব্যাদির পরিত্যক্তাংশও বমি, আমাদিগের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। মৃত ব্যক্তির পাকাশয়ে, খাদ্য দ্রব্যে ও বমিতে যথেষ্ট পরিমাণ ধুতুরা ছিল। এইরূপে বিষ প্রয়োগ দ্বারা অসন্দিগ্ধ যাত্রীদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ ও নিধন-সাধনের দৃষ্টান্ত, নিতান্ত বিরল নহে।

বর্ত্তমান রেল্-পথ।

এক্ষণে রেল হইয়া পুরী যাইবার দুঃখ ঘুচিয়া গিয়াছে। রেলপথে পুরী, বার ঘণ্টার রাস্তা মাত্র। রাত্রি ১০৷৷০ টার সময় হাবড়ায় "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের" মান্দ্রাজ মেল গাড়িতে উঠিলে তৎপর দিন বেলা ৯ টার সময় খুরদা রোড জংশন ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দেয় এবং গাড়ী বদল করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে পুরীতে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যাসেঞ্জার্ ট্রেণে যাইলে খুরদা রোড জংশনে গাড়ী বদল করিবার আবশ্যকতা হয় না, তবে পুরী পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হয়। বেলা ১০৷৷০ টার সময় হাবড়ায় উঠিলে পর দিন প্রত্যূষে পুরী পৌঁছান যায়।

রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুরী যাইতে হইলে অনেক গুলি নদ ও নদী পার হইতে হয়। সকল নদীর কলেবর সমান নহে। বিশাল-দেহ রূপনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্বঙ্গী ভার্গবী পার হইলে পুরী-যাত্রার জলপথের অবসান হইয়া থাকে। রূপনারায়ণ পার হইয়া সুবর্ণরেখা। ইহার উপর জলেশ্বর সহর অবস্থিত।

বালেশ্বর।

সুবর্ণরেখা পার হইয়া বলং নদী; সুপ্রসিদ্ধ বালেশ্বর নগর ইহার তট-দেশের শোভা সম্পাদন করিতেছে। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা উড়িষ্যার মুসলমান-শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে বাণিজ্যার্থে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরে কটকের নিকট হরিহরপুরে ও বালেশ্বরে তাঁহারা কুঠী নির্ম্মাণ করেন। বঙ্গ-দেশের সন্নিকটে ইংরাজদিগের বাণিজ্যোপনিবেশ-সংস্থাপনের ইহাই প্রথম চেষ্টা। এখানে প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তির কোনরূপ স্মৃতি-চিহ্ন, দৃষ্টিগোচর হয় না। ষ্টেসন হইতে ৩।৪ মাইল দূরে নীলগিরি-পর্ব্বতমালার সানুদেশে তৎপ্রদেশের রাজার ভবন অবস্থিত। বালেশ্বরে হিন্দু-দেবতার মন্দিরের মধ্যে জড়েশ্বর, মহাদেব ও চোরা গোপীনাথের মন্দিরই উল্লেখযোগ্য। চোরা গোপীনাথ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত দণ্ডায়মান-গোপাল-মূর্ত্তি। বালেশ্বরের নিকট সোরে নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কাংস্য ও পিত্তল-নির্ম্মিত বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভদ্রক।

বলং পার হইলে সালন্দী। ভদ্রক সহর এই নদীর তীরে অবস্থিত। ভদ্রকালী দেবীর, নাম হইতে এই সহরের নামকরণ হইয়াছে। ভদ্রকের জল-বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর; এজন্য উড়িষ্যাবাসিগণ, বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এই স্থানে অবস্থান করেন। এই নগরে অতি সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেব-স্থানের মধ্যে ভদ্রকালীর মন্দির ও গোপালজিউর মঠ প্রসিদ্ধ।

বৈতরণী ও যাজপুর।

সালন্দী পার হইলে পর মর্ত্ত্যলোক ও প্রেতলোকের সন্ধি-স্থলে অবস্থিতা স্বনাম-খ্যাতা বৈতরণী নদী। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যাজপুর-নগর, বৈতরণীর তটে অবস্থিত। ঐই স্থান—গদাক্ষেত্র, যজ্ঞ-ক্ষেত্র বা যজ্ঞপুর, বিরজাক্ষেত্র, নাভিক্ষেত্র, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরের মস্তক অবস্থিত। এইরূপ প্রবাদ যে,

যাজপুরে তাহার নাভি, সংস্থিত রহিয়াছে। অপর মতে ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সুদর্শনচক্র দ্বারা সতী দেহ বিচ্ছিন্ন হইবার সময় তাঁহার নাভিদেশ এই স্থানে পতিত হইয়াছে; এইজন্য যাজপুর, নাভিক্ষেত্র-নামেও অভিহিত।

যযাতিকেশরি নামক কেশরিবংশীয় নৃপতি ৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয় করিবার পর যাজপুরে প্রথমতঃ রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের সহিত উড়িষ্যাবাসীদিগের যাজপুরের সন্নিকটে একটি ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে উড়িষ্যার তৎকালীন রাজা মুকুন্দদেব নিহত হইয়াছিলেন এবং উড়িষ্যাবাসিগণ পরাজিত হইয়া মুসলমান-দিগের অধীনতা স্বীকার করে। যাজপুরে যে সকল হিন্দুমন্দির ছিল, কালা-পাহাড়ের অত্যাচারে সে গুলি চূর্ণ-বিচূর্ণীকৃত এবং তন্মধ্যে অবস্থিত দেব-মূর্ত্তিসমূহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া বৈতরণীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; সেই অবধি যাজপুরে শ্রীভ্রষ্ট।

কালাপাহাড়ের পাঠান সেনাপতি সৈয়দ আলি বুখারির সমাধিস্থান যাজপুরে অবস্থিত। একটি হিন্দু-দেব-মন্দিরের ধ্বংস সাধন করিয়া মুসলমান-সেনাপতির গোর-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যাজপুরে বিস্তর দেবপূজক ব্রাহ্মণের বাস। কথিত আছে যে, আদিশূরের ন্যায় রাজা যযাতিকেশরীও যজ্ঞার্থে বহু বেদজ্ঞ সুব্রাহ্মণ কনোজ হইতে আনয়ন করিয়া যথাযোগ্য বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করাইয়া-ছিলেন।

প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে বৈতরণীর তীরে বরাহনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধ-ঘাট, অষ্ট-মাতৃকার মণ্ডপ, এবং বিরজা দেবীর মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বরাহনাথের মন্দির

রাজা পুরুষোত্তম দেবের পুত্র প্রতাপরুদ্র দ্বারা খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বরাহনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে গো-দান করিলে গো-পুচ্ছ ধারণ করিয়া তপ্ত বৈতরণী পার হইবার অধিকার লাভ হয়। গো-পরিবর্ত্তে মূল্য-স্বরূপ ৫ টাকা দান করিলেই, গো-দানের ফললাভ হয়।

বরাহনাথের মন্দিরের সম্মুখে বৈতরণীর উপর যে ঘাট অবস্থিত, তাহার

দশাশ্বমেধ-ঘাট।

নাম দশাশ্বমেধ-ঘাট। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এই স্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, রাজা যযাতিকেশরীর দ্বারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই জন্য তিনি কনোজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

বরাহনাথের মন্দিরের পশ্চাতে জগন্নাথ দেবের একটী মন্দির আছে।

বিরজার মন্দির।

এই স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বিরজাদেবীর মন্দির। ইহা একটী পীঠস্থান। মন্দির-মধ্যে ক্ষুদ্রকায়া পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অবস্থিত আছে; ইহাকে ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড কহে। এস্থানে আর একটী কূপও আছে। তাহা নাভিগয়া-নামে প্রসিদ্ধ।

অষ্ট মাতৃকার মণ্ডপ।

বৈতরণীর অপর পারে অষ্ট মাতৃকার মণ্ডপ। আটটী পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ঐরাবত-সমাশ্রিতা সুবেশা, সালঙ্কারা, বজ্রহস্তা ইন্দ্রাণী; গরুড়াসনা, শান্তমূর্ত্তি বৈষ্ণবী; বৃষারূঢ়া, ত্রিশূলবরধারিণী, চন্দ্ররেখা-বিভূষণা, মাহেশ্বরী; শিখিবাহনা, কান্তবপুঃ কৌমারী; হংসপৃষ্ঠ-সমারূঢ়া, সর্ব্বাভরণভূষিতা ব্রহ্মাণী; মহিষাসনা, বরাহবদনা বারাহী; নগ্নদেহা, সর্পভূষিত-কবরী, মুণ্ডমালিনী, ভীষণা চামুণ্ডা; এবং তারাপ্রপীড়িতা বিশুষ্কদেহা, যমপ্রভৃতি ছায়া—পুরাণোক্ত এই অষ্টমাতৃকার মূর্ত্তি, মণ্ডপ-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সাধারণ মনুষ্যাকৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ; নীল-প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং চতুর্ভুজ, ইহাদিগের নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকে অষ্টমাতৃকার পরিবর্ত্তে সপ্ত মাতৃকার উল্লেখ আছে।

শুভ-স্তম্ভ।

যাজপুর হইতে অনতিদূরে "শুভস্তম্ভ"-নামক ৩৭ ফিট্ উচ্চ অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী স্তম্ভ অবস্থিত আছে। ইহার উপর পূর্ব্বে একটী গরুড়-মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল; কালাপাহাড় তাহা নষ্ট করে। মুসলমানেরা এই স্তম্ভ ধ্বংস করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহা কেশরিবংশীয় রাজাদিগের জয়-স্তম্ভরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

শান্তমাধব।

পূর্ব্বে এইস্থানে শান্তমাধব-নামে একটী বৃহৎ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অবস্থিত ছিল; মূর্ত্তির নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভূমির উপরে অবস্থিত এবং অধোভাগ ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল। এক্ষণে এই মূর্ত্তি অপর কয়েকটী মূর্ত্তির সহিত ভগ্নাবস্থায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে রক্ষিত রহিয়াছে।

এগার-নালা।

পূরীর আঠার নালার ন্যায় যাজপুরের অনতিদূরে "এগার-নালা" নামক একটী জলপথ ও তদুপরি একটী সেতু আছে।

অগ্নীশ্বর।

যাজপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে; তাঁহার নাম অগ্নীশ্বর। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই যে. প্রতিদিন তাঁহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

মহানদী ও কাঠজুড়ি। কটক।

বৈতরণী পার হইয়া ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণীর পর মহানদী এবং কাঠজুড়ি। এই শেষোক্ত নদী দুইটীর সঙ্গমস্থলে সুপ্রসিদ্ধ কটক সহর অবস্থিত।

আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল নদীর উপর রেল যাইবার জন্য সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকাংশ সেতুই, অতিশয় বিস্তৃত এবং দেখিতে সুদৃশ্য। সেতুর উপর রেলগাড়ী উঠিলে নিম্নদেশে বহুবিস্তৃত বালুকাময় নদীগর্ভ এবং দুই পার্শ্বে শ্যামল-বিটপি-মণ্ডিত ও হরিদ্বর্ণ-শস্যক্ষেত্র-পূর্ণ তটরাজি, আরোহীর নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করে। আমি বর্ষার পূর্ব্বে পুরী গমন করিয়াছিলাম। সে সময় মহানদী প্রায় জলশূন্য; নদীগর্ভ বস্তুবিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল—মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্বচ্ছ নীর-ধারা, বালুকারাশি ভেদ করিয়া মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। বোধ হইতেছিল, সরিৎরাণী যেন প্রাবৃট্‌কালের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া অভিমানে বালুকামধ্যে ক্ষীণতনু লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। বালুকাময় নদীগর্ভের উপর দিয়া মনুষ্য ও গবাদি পশুসকল স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিতেছে; যে যে স্থানে ক্ষীণ-ধারা প্রবাহিত, তাহা নিতান্ত স্বল্প-গভীর ও মন্দগতি। মহানদীর সেতু, দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল; রেলগাড়ী পার হইতে প্রায় ৪ মিনিট সময় লাগে। মহানদীর স্থানে স্থানে সুবৃহৎ "চর" পড়িয়াছে দেখিলাম। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে নানা

জাতীয় শস্য এই সকল চরে উৎপন্ন হয় এবং ইহারা গো-চারণের স্থান-রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঠজুড়ির বাঁধ।

কেশরি-বংশীয় রাজা নৃপতি কেশরী, ৯৪০ হইতে ৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভুবনেশ্বর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া কটকে সংস্থাপিত হয়। প্রতিবৎসর কটক, মহানদী ও কাঠজুড়ির বন্যা দ্বারা প্লাবিত হইয়া সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত। ৯৫৫।৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা মকরকেশরী, জলপ্লাবন-নিবারণের নিমিত্ত কাঠজুড়ির প্রসিদ্ধ বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত; দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল এবং উচ্চতায় ২৫ ফিট; দৃঢ়তা ও নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে ইহা সবিশেষ প্রশংসনীয়। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, আজিও ইহা অক্ষুণ্ণ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কটক নগরীকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিতেছে।

কটকের কাছারী ও অনেকগুলি সরকারি আপিস্, কাঠজুড়ির বাঁধের উপর অবস্থিত। এই স্থানে ভদ্র লোকেরা, দৈনিক কার্য্যাবসানে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে আগমন করেন।

কটকের দুর্গ, কলেজ ও ভজনালয়।

কটক একটী বৃহৎ সহর; ইহাতে বিস্তর বৃহৎ অট্টালিকা আছে। রাস্তাগুলি প্রশস্ত এবং বহুলোক এই নগরে বাস করে। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ, কটকের পুরাতন দুর্গের নিকট মহানদীর তীরে বাস করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এক্ষণে এই দুর্গে ইংরাজ-সেনা-নিবাস অবস্থিত। দুর্গের চতুঃপার্শ্বে বারবাটী নামক বহু বিস্তৃত প্রান্তর। কটকে তিনটী গির্জ্জা, মুসলমানদিগের একটী বৃহৎ মসজিদ্ এবং অনাথ খৃষ্টান বালক-বালিকাদিগের থাকিবার একটী আশ্রম আছে। ইউরোপীয় বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে; সম্ভ্রান্তবংশীয় দেশীয় বালকগণের এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার নিষেধ নাই। উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত কটকে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। রাভেন্স নামক ভূতপূর্ব্ব একজন ইংরাজ কমিশনারের নামে এই কলেজটী অভিহিত। এখানে এম্, এ, পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। সমগ্র উড়িষ্যাদেশের মধ্যে এই একটী মাত্র কলেজ থাকিলেও,

কলেজ-গৃহ, যথোপযুক্ত প্রশস্ত বা সৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে। কলেজের পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্রায়তন জরীপ্ বিদ্যালয় (Survey school) অবস্থিত।

কটক মেডিক্যাল্ স্কুল।

কটকের সাধারণ চিকিৎসালয় অতি বৃহৎ এবং বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। চিকিৎসালয়ের সংস্রবে একটী মেডিক্যাল্ স্কুল আছে। কলিকাতার ক্যাম্বেল্ মেডিক্যাল্ স্কুলের যাহা নির্দ্ধারিত পাঠ্য, কটক মেডিক্যাল্ স্কুলেও ঠিক তাহাই। কটক হাঁসপাতালের বাঙ্গালী ডাক্তারগণ, মেডিক্যাল্ স্কুলের শিক্ষক এবং কটকের সিভিল্ সার্জ্জন্ ইহার তত্ত্বাবধায়ক। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদিগের বেতন ও পদমর্য্যাদা, ক্যাম্বেল্ মেডিক্যাল্ স্কুলের ছাত্রদিগের সহিত সমান। শিক্ষার উপাদান-সম্বন্ধে কটক মেডিক্যাল্ স্কুলে এখনও অনেক অভাব রহিয়াছে। এজন্য ক্যাম্বেল্ মেডিক্যাল্ স্কুলের ছাত্রদিগের কটকের ছাত্রগণ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা আছে। এই সকল অভাব মোচন করিবার ক্রমশঃ চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি কনিকার রাজা স্ত্রীচিকিৎসার নিমিত্ত একটী হাসপাতাল করিবার জন্য ২৫,০০০ টাকা দিয়াছেন।

লৌহের কারখানা।

হাঁসপাতাল হইতে কিঞ্চিদ্দূরে একটী বৃহৎ লৌহের কারখানা (Workshop) অবস্থিত। স্থানীয় রেলওয়ের এবং গভর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগের কার্য্যে যে সকল লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রয়োজন বা পুরাতন দ্রব্যের সংস্কারের আবশ্যকতা হয়, তাহা এই কারখানায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলের সাহায্যে অত্যন্ত মোটা লৌহ, যেরূপ সহজে কর্ত্তিত হইতেছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আনিকট্।

এই কারখানার নিকটেই বিখ্যাত "আনিকট্" (Annicut)। ইহা একটী বাঁধ ; এই বাঁধ দ্বারা মহানদীর একস্থানে প্রচুর পরিমাণে জল বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আবদ্ধ জলভাগ একটী প্রশস্ত হ্রদের ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। বাঁধের উপরিভাগ বেড়াইবার একটী সুরম্যস্থান। গ্রীষ্মকালে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এই স্থানে অনেকেই সুশীতল সমীর-সেবনার্থে আগমন করিয়া থাকেন। বাঁধের অপর পার্শ্বে মহানদী শুষ্ক প্রায় ; দুই এক স্থানে ক্ষীণধারা মৃদুগতিতে কিয়দ্দূর প্রবাহিত হইয়া বালুকার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই স্থান, জলে পরিপূর্ণ থাকে।

তুলসীপুর।

তুলসীপুর কটকের একটী স্বাস্থ্যকর পল্লী। এই স্থানে অনেক ইংরাজ, রাজা ও জমিদারেরা বাস করেন। উড়িষ্যার বর্ত্তমান কমিশনার মাননীয় কে, জি, গুপ্ত মহাশয়, কাঠজুড়ীর উপর লালবাগ-নামক স্থানে বাস করেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের অশ্বশালা।

উড়িষ্যা যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন ছিল, তখন তাহারা কটকে একটি দুর্গ ও একটি অতিবিস্তৃত অশ্ব-শালা নির্ম্মাণ করিয়াছিল ; সেই দুর্গ ও অশ্বশালা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অশ্ব-শালার ছাদগুলি খিলান করা এবং স্তম্ভের উপর সংস্থিত, কড়ি বা বরগার সম্পর্ক নাই। এই স্থানে এক্ষণে রিজার্ভ্ পুলিশ অবস্থিত।

বাজার।

কটকে অনেকগুলি বাজার আছে ; একটী প্রচলিত কথা মতে কটকে ৫২টি বাজার ও ৫৩টি গলি থাকিবার কথা। এত গুলি বাজার আছে কি না, আমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান লই নাই ; তবে বাজারগুলির মধ্যে চৌধুরীবাজার, বালুবাজার, নয়া-সড়ক্-বাজার, বক্সি-বাজার, চাঁদনিচক্, তৈলঙ্গবাজার, বাখরাবাদ এবং মঙ্গলা বাগের নামই উল্লেখের যোগ্য।

দেবমন্দির ও মঠ।

কটকের প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরের মধ্যে গোপালজী ও রঘুনাথজীর মন্দিরই উল্লেখ-যোগ্য। কটক-চণ্ডী, কটকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইঁহার মন্দির কটকের দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত। শুনিলাম, ইঁহার পূজার নিমিত্ত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি নিয়োজিত আছে। ইনি মহারাষ্ট্রদিগের দেবতা ; মহারাষ্ট্রীয় শাসনকালে ইনি দুর্গের মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বালু বাজারে শঙ্করাচার্য্যের একটি মঠ আছে ; এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন। ইহা ব্যতীত শিখদিগের একটি মঠ, একটি জৈন-মন্দির ও বৈষ্ণবদিগের অনেকগুলি মঠ, কটকে অবস্থিত আছে। যেখানে শিখ-মঠ অবস্থিত, প্রবাদ এই যে, তথায় বাবা নানক তাঁহার দুই অনুচর বালা ও মর্দ্দানার সহিত কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন ; শিখদিগের দশম গুরু গুরুগোবিন্দের সময়ে এই মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের মঠে প্রত্যহ অতিথি সেবা হইয়া থাকে ; প্রত্যেক মঠে এক বা ততোধিক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

কটকের শিল্পকার্য্য।

কটক, স্বর্ণ ও রৌপ্যের শিল্প-কার্য্যের নিমিত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এখানে হস্তিদন্ত ও শৃঙ্গনির্ম্মিত বিবিধ সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতি উৎকৃষ্ট রেশমপাড় ধুতি, উড়ানি ও সাটি এবং মানিয়াবন্দী নামক বস্ত্র, কটক হইতে কিছু দূরে বড়াম্বা ও তিগরিয়া নামক স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং কটকে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। কটকের চটি জুতার আদর কলিকাতায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কাঠের উপর নক্সার কাজও কটকে সুন্দর হইয়া থাকে। মাননীয় মধুসূদন দাস মহাশয়ের ব্যবসায়স্থানে গমন করিলে উড়িষ্যাজাত নানাবিধ শিল্পকার্য্যের উৎকৃষ্ট নমুনা একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২)

ভুবনেশ্বর-ষ্টেশন।

কটক ও খুর্‌দা জংশনের মধ্যস্থলে ভুবনেশ্বর-ষ্টেশন। এই স্থানে নামিয়া বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গমন করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে মন্দির, প্রায় দুই মাইল পথ। এই পথ বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার; তবে পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া সর্ব্বত্র সমতল নহে। কেহ পদব্রজে, কেহ বা গরুর গাড়ীতে এই পথ দিয়া গমন করেন। গরুর গাড়ীর ভাড়া দুই আনা মাত্র। ট্রেনের সময় গরুর গাড়ী, ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে। এখানকার ষ্টেশনমাষ্টার ও রেলওয়ের অপরাপর কর্ম্মচারিগণ মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী। ইঁহারা সকলেই ইংরাজী জানেন।

ভুবনেশ্বরের প্রাচীন ইতিহাস।

দূর হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অভ্রভেদী চূড়া, কত যুগ-যুগান্তরের শীতাতপ সহ্য করিয়া, কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন লক্ষ্য করিয়া, কত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও বিলয় এবং কত জাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব অবিচলিতভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অবিনশ্বরত্বের স্মৃতিস্তম্ভ-স্বরূপ গগন-পথে বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কেশরিবংশীয় রাজা যযাতিকেশরী, উড়িষ্যা অধিকার করিয়া প্রথমতঃ যাজপুরে রাজধানী সংস্থাপন করেন। তিনি ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫২ বৎসর কাল উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে রাজধানী যাজপুর হইতে ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হয়। কথিত আছে যে, তিনি যবনদিগের হস্ত

হইতে উড়িষ্যা উদ্ধার করেন। সুবিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধগণই এস্থলে যবন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং যযাতিকেশরী, বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিয়া উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। যযাতিকেশরীর পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মগধ হইতে আগমন করিয়া উড়িষ্যা জয় করেন। যযাতিকেশরীর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকট এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

যযাতিকেশরী, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যের কল্পনা ও আয়োজন করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধস্তন চতুর্বিংশতি পুরুষ ভুবনেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার প্রপৌত্র বিখ্যাত ললাটেন্দু কেশরীর রাজত্বকালে ভুবনেশ্বর-মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়।

ভুবনেশ্বর বহুকাল পর্য্যন্ত একাম্রকানন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কপিল-সংহিতায় এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এই স্থানে অতি প্রকাণ্ড উচ্চশির একটি-মাত্র আম্র-বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইত। বারাণসী, পাপে পূর্ণ হওয়াতে নারদের পরামর্শে মহাদেব, ত্রেতাযুগের কোন সময়ে কাশী পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। একাম্র-পুরাণ ও একাম্রচন্দ্রিকা-নামক গ্রন্থদ্বয়ে ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, পুরীর মন্দিরের বিবরণীর মধ্যে এবং উদয়গিরির শিলালিপিসমূহে যে ঐশ্বর্য্যশালিনী কলিঙ্গ-নগরী এবং প্রবলপ্রতাপান্বিত কলিঙ্গ-নৃপতিদিগের উল্লেখ আছে,—তাহা এই ভুবনেশ্বর-সম্বন্ধেই লিখিত। তাঁহার মতে ভুবনেশ্বরই প্রাচীন কলিঙ্গ নগরী। এই নগর অশোকের শাসনাধীন ছিল। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী ধৌলি পর্ব্বতে অশোকের একখানি অনুশাসনলিপি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীর মন্দির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব; কিন্তু পরিধিতে অধিক বিস্তৃত। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী পুরীর মন্দিরের ন্যায় চারি অংশে বিভক্ত। যথা—ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির জগমোহন ও দেউল। ভোগমণ্ডপে ভোগের সামগ্রী সজ্জিত করা হয়। নাটমন্দিরে নৃত্য, গীত ও অন্যান্য উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মন্দিরের যে অংশে ভুবনেশ্বর অবস্থিত, তাহার নাম দেউল এবং নাটমন্দির হইতে দেউলে প্রবেশ করিবার যে বিস্তীর্ণ পথ, আছে তাহা মোহন বা জগমোহন নামে প্রসিদ্ধ। দেউল ও জগমোহন, নাটমন্দির এবং ভোগমণ্ডপের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মন্দিরের মধ্যে ভুবনেশ্বর-নামধেয় প্রস্তরময় লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ণ নাম ত্রিভুবনেশ্বর; ইনি কৃত্তিবাস এবং লিঙ্গরাজ নামেও অভিহিত। কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের ন্যায় ইঁহার প্রস্তরময় দেহ, ভূমির মধ্যেই প্রোথিত; স্বল্পাংশমাত্র ভূমি হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে অবস্থিত। দেহের ব্যাস প্রায় ছয় হস্ত; চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণমর্ম্মর প্রস্তরের বৃত্তাকার নাতিপ্রশস্ত বেদী; একস্থানে ইহা প্রদীপের মুখের ন্যায় সরু হইয়া গিয়াছে। লিঙ্গের চারি ধার স্বর্ণপত্রের দ্বারা মণ্ডিত। পাণ্ডাদিগের মতে ইনি শুদ্ধ হর নহেন, হরির সহিত মিলিত হইয়া এস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত লিঙ্গরাজের শিরোদেশে যে একটী শ্বেত রেখার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, পাণ্ডাদিগের মতে উহা শ্যামতনু বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজতশুভ্র কৈলাসনাথের মিলন প্রতিপন্ন করিতেছে। ইঁহার গাত্রে কয়েকটি ধূসররেখা, গঙ্গা ও যমুনার সিত ও অসিত প্রবাহ-ধারারূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। পাণ্ডাদিগের এরূপ কল্পনার ভিত্তি কি, তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা সত্য যে, ভুবনেশ্বরের ন্যায় শৈব-প্রধান স্থানেও বিষ্ণুর বাসুদেব-মূর্ত্তির পূজা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, যাত্রিগণকে প্রথমে অনন্ত বাসুদেবের পূজা সমাপন করিয়া ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে যাইতে হয়। কোন কোন গ্রন্থে উক্ত আছে যে, এই বাসুদেবের অনুরোধে ভুবনেশ্বর, এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সকল কারণেই পাণ্ডাগণ, দেবতার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তই একাধারে হরি হর মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া থাকে।

অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের অভ্যন্তরের ন্যায় ইহাও গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় উজ্জ্বল আলোক ব্যতীত মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গঙ্গাজল, দুগ্ধ এবং সিদ্ধিই ভুবনেশ্বরের পূজার প্রধান উপকরণ এবং বিল্বপত্র, পুষ্প ও মাল্য দ্বারা ইঁহার পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। গৃহের তলদেশে রাশি রাশি বিল্বপত্র সঞ্চিত রহিয়াছে। পূজা

শেষ হইলে ভক্তগণ, তালপত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরকে ব্যজন করিয়া থাকেন। দেবপূজকগণ যখন ভুবনেশ্বরের সম্মুখে বিল্বপত্রপূর্ণ বদ্ধাঞ্জলি ভক্তকে পাপক্ষালনের মন্ত্র পাঠ করান, তখন হৃদয়-মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের উদয় হয়। ভুবনেশ্বরের পূজার পদ্ধতি, পুরীর জগন্নাথ দেবের পূজার পদ্ধতির ন্যায়। মঙ্গলারতি, স্নান, বস্ত্র-পরিধান, বাল্যভোগ, মধ্যাহ্নভোগ, বিশ্রাম, সন্ধ্যা, ভোগ-আরতি, শয়ন প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রাত্যহিক কার্য্য আচরণ করিয়া সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে। জগন্নাথ দেবের সেবা বর্ণনার সময় এ বিষয়ের সবিস্তর উল্লেখ করা যাইবে।

জগন্নাথদেবের ন্যায় ভুবনেশ্বরেরও সময়ে সময়ে যে সকল উৎসব হইয়া থাকে, তাহাদিগকে "যাত্রা" কহে। যাত্রার সময়ে ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি চন্দ্রশেখরের পিত্তলময়ী মূর্ত্তি, মন্দির হইতে মহাসমারোহের সহিত বাহির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীত হইয়া থাকেন। শিবরাত্রিতে এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়। আষাঢ় ব্যতীত চৈত্র বা বৈশাখ মাসে অশোকাষ্টমীর দিনে এস্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে। পুরীর ন্যায় এখানেও বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা হয়। বিন্দুসরোবরের মধ্যস্থলে যে দেবালয় অবস্থিত, তন্মধ্যে প্রতিনিধি চন্দ্রশেখর দ্বাবিংশতি দিবস অবস্থিতি করেন এবং তথায় মহাসমারোহে তাঁহার পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বর, মহাদেবের প্রতিরূপ হইলেও তাঁহার যাত্রাগুলি বৈষ্ণবযাত্রার সম্পূর্ণ অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের সেবা ও উৎসব, জগন্নাথ দেবের সহিত প্রায় একরূপ। অন্যান্য যে সকল স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা হয়, তথায় প্রায় এই সমস্ত উৎসবই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের খোদাই কার্য্য যেরূপ, পুরীর মন্দিরের সর্ব্বাংশে সেরূপ নহে। পুরীর দেউলের প্রাচীরে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি চূণ ও বালির দ্বারা গঠিত; পুরীর নাটমন্দিরের প্রতিমূর্ত্তিগুলি প্রস্তর হইতে খোদিত। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সমস্ত প্রতিমূর্ত্তিই প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। কত দেবদেবীর মূর্ত্তি, কত পৌরাণিক ঘটনার ধারাবাহিক চিত্র, কত সামাজিক জীবনের বৈচিত্রপূর্ণ ঘটনাবলী, মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে সুন্দররূপে খোদিত হইয়া প্রাচীন ভারতের দয়া, ধর্ম্ম, নীতি, শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের এক প্রান্তে একটি গৃহ-মধ্যে এক প্রকাণ্ড বৃষভ-মূর্ত্তি অবস্থিত আছে; ইনিই ভুবনেশ্বরের বাহন। পার্শ্বে নীল-প্রস্তর-খোদিত লক্ষ্মী-নারায়ণ-মুর্ত্তি। অনতিদূরে অপর একটি মন্দিরের মধ্যে গোপালিনী মূর্ত্তি। ইনি ভগবতী; ছদ্মবেশে একাম্র কাননে গোচারণ করিতেন এবং এই বেশে তথায় মহাদেবের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অপর একটি মন্দিরে কার্ত্তিকেয় ও গণপতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

পার্ব্বতীর মন্দির।

ভুবনেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গন; মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির অবস্থিত; তন্মধ্যে কতকগুলির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। পার্ব্বতীর মন্দির, অধিক উচ্চ না হইলেও, কারুকার্য্যে ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মানব ও ইতর প্রাণীদিগের যে সকল মূর্ত্তি এই মন্দিরের গাত্রে খোদিত রহিয়াছে, তাহাদের নির্ম্মাণের শিল্পচাতুর্য্য ও সৌষ্ঠবের পারিপাট্য দেখিলে, আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এরূপ সুন্দর-প্রস্তরখোদিত নর-নারীর প্রতিমূর্ত্তি, প্রাচীন শিল্পকার্য্যে অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারা যায় না। বঙ্কিম বাবু ললিতগিরির খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি-সমূহ দর্শন করিয়া যে কয়েকটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা বলিয়া গিয়াছেন, পার্ব্বতীর মন্দিরের শিল্পকার্য্য দর্শন করিয়া তাহা আমার স্মরণপথে উদিত হইল। তিনি বলিয়াছেন—"সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মানে থাকিবে; চারি পাশে মৃত মহাত্মাদিগের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত চেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত্‌-রত্ন-হারা, পীবরযৌবনভারাবনত-দেহা

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল—উপনিষদ্‌, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি, এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম,—হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

পার্ব্বতীর মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে যে সকল মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, কালের অপ্রতিহত প্রতাপে ও ধর্ম্মবিপ্লব হেতু তাহারা বিরূপ ও ভগ্ন হইলেও, তাহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি, সত্যপ্রিয়তা ও কার্য্যকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাচীন ভারতরমণীগণের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যেরূপ সূক্ষ্মভাবে খোদিত করা হইয়াছে, অশ্বারোহী যোদ্ধৃবর্গের বেশভুষার পারিপাট্য ও গতিবিধি যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত করা হইয়াছে, বহু আড়ম্বরে সজ্জিত হস্তীগুলিকে যেরূপ স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে,—স্তম্ভ, কার্ণিস্, গবাক্ষ প্রভৃতির গঠনে যেরূপ সূক্ষ্ম রচনাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে প্রাচীন ভারতে শিল্পবিজ্ঞান যে, অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

বিন্দুসরোবর।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বহির্ভাগে বহু বিস্তৃত বিন্দু-সরোবর অবস্থিত। ভক্তগণ বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গমন করেন। উড়িষ্যার দেবস্থানের পুষ্করিণীগুলি বড়ই সুন্দর; প্রায় সকলগুলিই বহুবিস্তৃত এবং চতুঃপার্শ্বেই প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত; প্রায় সকল গুলিরই মধ্যস্থলে এক একটী ক্ষুদ্র দেবালয় অবস্থিত। প্রবাদ এই যে, জগতে যতগুলি পবিত্র তীর্থ আছে, তাহাদিগের বিন্দু লইয়াই বিন্দুসরোবর নির্ম্মিত হইয়াছিল। পার্ব্বতী এই স্থানে গোপকন্যার বেশে গোচারণ করিতেন এবং গো-দুগ্ধ দ্বারা লিঙ্গাকার মহাদেবকে স্নান করাইতেন। বিন্দুসরোবরে তাঁহার গো-কুল স্নান করিত ও উহার জল পান করিত। বিন্দু-সরোবর যে, অতিশয় প্রাচীন—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে বিন্দুসরোবরের চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল, এক্ষণে উত্তর দিকের গাঁথনি একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের সোপানাবলীর অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিন্দুসরোবরের নীচে কয়েকটী প্রস্রবণ আছে, সেই সকল প্রস্রবণ হইতে ইহাতে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাত্রিগণ,

বিন্দুসরোবরে শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বিন্দুসরোবরের জল দেখিতে পরিষ্কৃত। তীরে দুই এক খানি নৌকা বাঁধা থাকিতে দেখা যায়।

পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে পাণ্ডাদিগের ঘর, পূর্ব্ব দিকে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপর তীর্থেশ্বর ও অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির অবস্থিত। অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরে কৃষ্ণবলরামের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বলরামের মস্তকের উপরে অনন্তের বহুশিরোমণ্ডিত ফণা, ছত্ররূপে বিরাজ করিতেছে। বাসুদেবের কৃষ্ণমূর্ত্তি; কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে এই বাসুদেবই, মহাদেবকে বারাণসী হইতে ভুবনেশ্বরে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যাত্রিগণ, বিন্দুসরোবরে স্নান ও তর্পণ করিয়া প্রথমতঃ অনন্ত বাসুদেবকে দর্শন করেন; পরে ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গমন করেন।

অনন্তবাসুদেবের মন্দির।

ভুবনেশ্বরে খাদ্য সামগ্রীর বড়ই অসুবিধা; যাহা পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগের (বাঙ্গালীদিগের) পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে; এখানে যাত্রীরা প্রসাদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এখানকার উৎকৃষ্ট প্রসাদকে পকাল কহে। ইহা অন্ন, দধি ও মিষ্টান্ন-মিশ্রণে উৎপন্ন এবং ইহা আস্বাদনে মন্দ নহে। ভুবনেশ্বরে ভাল রসকরা পাওয়া যায়। ইহাকে কোরা কহে, ইহা দেখিতে অতি শুভ্রবর্ণ এবং আস্বাদনে উত্তম।

ভুবনেশ্বরের "প্রসাদ"।

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির। ইহার কারুকার্য্য অতি বিচিত্র। প্রবাদ এই যে, ভুবনেশ্বরের আদেশক্রমে ব্রহ্মার বাসের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাণ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, এই মন্দির খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেশরিবংশীয় রাজা উদয়তকের মাতা রাণী কলাবতী ইহা নির্ম্মাণ করেন। এখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত; এখানে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির।

ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরের কিছু দূরে ভাস্করেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এই যে—সূর্য্যদেব, বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং ইহার মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁহার

ভাস্করেশ্বরের মন্দির।

পূজা করিয়াছিলেন। ইহার গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতেও অধিকতর প্রাচীন এবং ইহা পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের একটী মঠ ছিল। ইহার মধ্যে যে শিবলিঙ্গ আছে, তাহা, তাঁহাদিগের মতে একটি বৌদ্ধস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

ভাস্করেশ্বর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে রাজরাণীর মন্দির। ইহা রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত এবং এক সময়ে অতিশয় সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। এই মন্দির-মধ্যে কোন দেবমূর্ত্তি নাই; সুতরাং ইহা তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত নহে। কেশরিবংশীয় কোন রাজমহিষীর কর্ত্তৃত্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজরাণীর মন্দির।

রাজরাণীর মন্দিরের অনতিদূরে মুক্তেশ্বরের রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির অবস্থিত। এই স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে একটী আম্রকানন ছিল এবং অনেক সাধু সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন। এখানে কয়েকটি প্রস্রবণ আছে।

মুক্তেশ্বরের মন্দির।

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে কেদারেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির অবস্থিত এবং অনতিদূরে পরশুরামেশ্বরের মন্দির বিরাজ করিতেছে। মুক্তেশ্বরের মন্দির অপর সকলগুলি অপেক্ষা আকারে ও উচ্চতায় ক্ষুদ্র হইলেও শিল্পকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক মুক্তেশ্বরের মন্দিরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া উহার স্তম্ভ, খিলান, কার্ণিশ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পৌরাণিক নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি; হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুগণের মূর্ত্তি; নর্ত্তকী ও বাদয়িত্রীগণের আকৃতি, অতি সুন্দরভাবে মন্দিরের গাত্রে খোদিত করা হইয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ছাদের শিল্পকার্য্য অতীব সুন্দর।

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের নিকট গৌরীকুণ্ড-নামক পুষ্করিণী। ইহার জল অতি স্বচ্ছ এবং, ইহার চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। একটী প্রস্রবণের জল নিয়ত পুষ্করিণীর মধ্যে পতিত হইতেছে। পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে সোপানাবলীর মধ্যে একটি ছিদ্র আছে। জল অধিক হইলে ঐ ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইয়া দূরস্থিত নদীর সহিত মিলিত হয়। গৌরীকুণ্ডের সহিত সংযুক্ত আর একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নাম মরীচকুণ্ড। ইহার জল পান করিলে বন্ধ্যা-দোষ নষ্ট হয়, এইরূপ লোকের

গৌরীকুণ্ড ও মরীচকুণ্ড।

বিশ্বাস। পূর্ব্বে এই কারণে পাণ্ডারা এই জল বিক্রয় করিত। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের আদেশে জল বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে।

কপিলেশ্বর।

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে কপিলেশ্বর গ্রাম। এই স্থানে, কপিলেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এক সময়ে এই গ্রাম অতিশয় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ভুবনেশ্বর হইতে কপিলেশ্বর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহার দুই পার্শ্বে অনেক দোকান ছিল এবং অনেকগুলি মন্দিরও রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল; তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। কপিলেশ্বর গ্রামে অনেক লোক বাস করে; গৃহগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, দেওয়ালগুলি চুণকাম করা এবং তদুপরি নানাবিধ চিত্র, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। উড়িষ্যার অধিকাংশ বাটীর বাহিরের দেওয়ালে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, কপিলেশ্বরের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতেও প্রাচীন। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে; ইহার জল, গঙ্গাজল অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভুবনেশ্বরে আরও যে, কত দেবমন্দির আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। একাম্রপুরাণে উক্ত আছে যে, এই স্থানে এক লক্ষ মন্দির এবং এক কোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সংখ্যায় এরূপ অধিক না হইলেও, এস্থানে যে বহুসংখ্যক দেব-মন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(৪)

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি বৌদ্ধযুগের দুইটী কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ভুবনেশ্বর হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক দুইটি ক্ষুদ্র শৈল, প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। কটকের দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগ হইতে মহানদীর তীর দিয়া চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক অনুচ্চ শৈলখণ্ড বিরাজ করিতেছে। ইহারা দক্ষিণে পূর্ব্বঘাট-পর্ব্বত-মালার সহিত সংযুক্ত। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি এই শৈল-শ্রেণীর একাংশ মাত্র। ধবলাগিরি ও নীলগিরি নামক অপর দুইটী ক্ষুদ্র শৈল, ইহাদিগের সহিত সংযুক্ত আছে। ধবলাগিরি সাধারণতঃ ধৌলি নামে পরিচিত। ইহার একাংশে অশোকের একটী শিলালিপি খোদিত আছে।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল, জগৎ-পূজ্য বুদ্ধদেব তিরোহিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত পবিত্র নৈতিক ধর্ম্ম, কালমাহাত্ম্যবশে হতশ্রী ও ক্ষীণতেজ হইয়া জগতের স্থানে স্থানে ম্লান জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে। স্বার্থ ও নীচ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় ভারতবাসী সেই রাজসন্ন্যাসীর প্রদর্শিত মহোচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতনের নিম্নগ সরল পথে সবেগে প্রধাবিত হইতেছে। অপরিহার্য্য কর্ম্মফলের চিত্র তাহাদিগের আত্মসর্ব্বস্ব চিন্তার আবিলময় স্রোতে প্রতিফলিত হইতে সমর্থ হইতেছে না। আজি এই দুর্দ্দশার দিনেও খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির পাষাণময় মূর্ত্তি যেন কালের প্রতাপ অবহেলা করিয়া প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা, আত্মসংযম, পরহিতৈষণা ও বৈরাগ্যের অমর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থলে একটি অপ্রশস্ত পথ, পশ্চিমে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্ব্বতের দুই পার্শ্ব, ঘন অরণ্যানী দ্বারা পরিবেষ্টিত। উচ্চশিরঃ ঘনপল্লব-বেষ্টিত তরুরাজি, দূর হইতে দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া দিগন্তে অবস্থিত নীল শৈলমালার পাদমূলে মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে অত্যুন্নত ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়া, দৃষ্টিপথে বিরাজ করিতেছে; মধ্যে অনুর্ব্বর ও অসমতল ভূমি; এক পার্শ্বে নয়নাভিরাম সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদুমারুত-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া দর্শকের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে। এক অপূর্ব্ব গভীর নিস্তব্ধতা ও বিমল শান্তি সেই পবিত্র স্থানে বিরাজ করিতেছে; কেবল সুকণ্ঠ বিহঙ্গমের কলধ্বনি, মধ্যে মধ্যে সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্য জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এরূপ শান্তিপূর্ণ স্থান, আত্মচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচনা করিয়া বৌদ্ধমনীষিগণ, ধর্ম্ম-প্রচাররূপ জীবনের গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই পবিত্র স্থানে বাস করিয়া আত্মসংযম ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন। এইরূপ কঠোর অভ্যাসের ফলেই তাঁহারা অমানুষিক ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রের মহত্ত্ব, ত্যাগের পরাকাষ্ঠা এবং ধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে এবং চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মধ্য-এসিয়া ও পারস্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মধ্যে কি প্রভেদই দৃষ্টিগোচর হয়! আমরা যে সেই প্রাচীন

ভারতবাসীর বংশাবলী, তাহা এক্ষণে কেবল কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদিগের যেরূপ শিক্ষা হইতেছে, তাহার ফল—ক্লেশে অসহিষ্ণুতা, সংকল্পের শিথিলতা, চরিত্রের হীনতা, ত্যাগে পরাঙ্মুখতা এবং ধর্ম্মে অনাস্থা ব্যতীত আর অধিক কিছু আশা করা যাইতে পারে না। এক একটী মানুষ লইয়াই জাতি। এরূপ হীনচরিত্র লোক লইয়া যে জাতি সংগঠিত, জগতে সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থান, তাহার দ্বারা অধিকৃত হওয়া অসম্ভব। জাতি প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার উপাদান-মনুষ্য এক একটী করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এখনও সময় আছে, এখনও সুবিধা আছে। বস্তু চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ছায়া এখনও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় নাই; সঙ্গীত নীরব হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতিধ্বনির মধুর নিক্কণ এখনও কর্ণকুহর হইতে অপসৃত হয় নাই; অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু উত্তাপ এখনও অনুভূত হইতেছে; সূর্য্য পশ্চিম গগনের প্রান্তে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু এখনও রবিকরপ্রদীপ্ত লোহিতশীর্ষ মেঘ-মালা অস্তমিত দিবাকরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; দৃষ্টান্ত অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার স্মৃতি, মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। যদি আমরা প্রাচীন ভারতের সেই জগন্মান্য মনীষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন, নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করি, যদি আমরা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মে হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়া বর্ত্তমান ভারতে এক একটি করিয়া মানুষ প্রস্তুত করি, তবেই এই শৌর্য্য-বীর্য্য প্রতিষ্ঠাবিহীন দুর্ব্বল জাতি, প্রাচীন ভারতের বংশাবলী বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে। আমার বিশ্বাস যে, সভা সমিতি দ্বারা, সংবাদ-পত্র বা পুস্তক-প্রচারের সাহায্যে স্বায়ত্তশাসন বা উচ্চশিক্ষার বিস্তারে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। ইহা কার্য্যে পরিণত করা প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের নিজের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শাস্ত্রোক্ত সদ্দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ দ্বারা নিজ নিজ চরিত্র গঠন হইবে, আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হইবে, পরার্থ-পরতা শিক্ষা করিতে হইবে, সত্যপ্রিয়তা জীবনের মূল মন্ত্র করিতে হইবে। যখন এইরূপ লোক লইয়া এই দুর্ব্বল উপেক্ষিত হিন্দুজাতি পুনর্গঠিত হইবে, তখন ঐশ্বর্য্য বল, ক্ষমতা বল, বিদ্যা বল, উচ্চশিক্ষা বল, স্বায়ত্তশাসন বল, সকলই আপনা হইতে আসিয়া আমাদিগের করতলগত হইবে। অতএব আমাদিগের

যে শক্তিটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, কাল্পনিক আশার প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া তাহা যেন বৃথা কার্য্যে অপব্যয় না করি; উহা সদ্বিবেচনার সহিত আত্মোন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইলে অধ্যবসায়শীল ও দূরদর্শী বণিকের মূলধনের ন্যায় ক্রমশঃ পরিসর প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ও জাতিকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবে। আমরা যেন ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া মহৎ কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি।

বৈরাগীর মঠ

খণ্ডগিরির পাদদেশে একখানি ডাক-বাঙ্গালা ও একটি মঠ আছে। ইহা "বৈরাগীর মঠ" নামে পরিচিত। এ স্থানে এক জন সন্ন্যাসিনী বাস করেন। মঠের মধ্যে একটী গৃহে বহুসংখ্যক খড়ম সঞ্চিত রহিয়াছে; জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হইলাম যে, ইহার মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী—এমন কি, চৈতন্যদেব ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক-গণেরও খড়ম রক্ষিত হইয়াছে। মঠধারিণী এই সকল খড়ম প্রদর্শন করিয়া দর্শকদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

ডাক-বাঙ্লো

ডাক-বাঙ্লোতে দর্শকগণ, আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এখানে কোনরূপ আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ডাক-বাঙ্লোতে একজন রক্ষক নিযুক্ত আছে, তাহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিলেই সঙ্গে লইয়া সে ব্যক্তি, "গুম্ফা" সকল দেখাইয়া দেয়।

গুম্ফা—উদ্দেশ্যভেদে গঠনের তারতম্য।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি উভয় পর্ব্বতই বহুসংখ্যক গুম্ফা দ্বারা পরিবেষ্টিত:—পর্ব্বতের কঠিন গাত্র ভেদ করিয়া এই সকল গুম্ফা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এক একটী গুম্ফা নির্ম্মাণ করিতে যে, কত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। গুম্ফাগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিলে, বোধ হয় যে, শুদ্ধ বাটালি ও হাতুড়ির দ্বারাই এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। গুম্ফাগুলি আকারে ও গঠনে সমান নহে। কতকগুলি গুম্ফা নিতান্ত অনুচ্চ ও অনতিপরিসর। এমন কি, তন্মধ্যে এক জন মানুষেরও পা ছড়াইয়া শয়ন করিবার স্থান নাই। বসিয়া থাকিলে মস্তক ও গুম্ফার ছাদের মধ্যে অধিক ব্যবধান থাকে না। এই সকল গুম্ফার মধ্যে শিল্পকার্য্যের কোনরূপ পারি-পাট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে, কোনরূপে

বাতাতপ হইতে দেহ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এই সকল গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছিল; যেন সে গুম্ফাবাসিগণ কঠোর শাসন দ্বারা শরীর ও মনকে সংযত করিবার জন্য এইরূপ বাসগৃহের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বৃহদায়তন শিল্পকার্য্যসমন্বিত সৌষ্ঠবসম্পন্ন অপর গুম্ফাগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র গুম্ফাগুলি কঠোর বৈরাগ্যব্রতধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দ্বারা বৌদ্ধ-যুগের প্রথমাবস্থায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম, দৃঢ়ভাবে ভারত-ভূমিতে সংস্থাপিত হইল, সন্ন্যাসীদিগের মণ্ডলী গঠিত হইল, ধর্ম্মপিপাসুগণ নানাবিধ লৌকিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মীমাংসার নিমিত্ত সন্ন্যাসি-মণ্ডলীর নিকট সর্ব্বদা আগমন করিতে লাগিলেন, শাস্ত্রালোচনা ও প্রচার-কার্য্যের প্রণালী উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীদিগের একত্র বাস অথবা সর্ব্বদা সম্মিলিত হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, তখন যে সকল গুম্ফা প্রস্তুত হইতে লাগিল, তাহারা পরিসরে বিস্তৃতি ও সচ্ছন্দতায় সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিল। এই গুম্ফাগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উচ্চ; ভিতরে দাঁড়াইলে অধি-কাংশ স্থলে মস্তক, ছাদ স্পর্শ করে না এবং এক একটী গুম্ফার মধ্যে আট দশ জন লোক একত্র বাস করিতে পারে। ইহাদিগের প্রায় সকলগুলিরই সম্মুখে একটী করিয়া দালান বিরাজিত এবং প্রত্যেক গুম্ফার ২।৩টী প্রবেশ-দ্বার আছে। দরজার চৌকাট্‌গুলি প্রস্তরময়—কোনটীতেই কবাট নাই, পূর্ব্বে ছিল কি না, তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই।

অশোকের রাজত্বকালের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুম্ফা-মধ্যে বাস করিতেন। অধিকাংশ গুম্ফাই, উদয়গিরির গাত্রে খোদিত; এগুলি খণ্ডগিরির গুম্ফা অপেক্ষা সমধিক বৃহৎ ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন। উদয়গিরিতে অনেকগুলি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়; খণ্ডগিরিতে দুইটীমাত্র শিলালিপি আছে।

প্রবাদ আছে যে, খণ্ডগিরি পূর্ব্বে হিমালয়-পর্ব্বতের একটী প্রত্যঙ্গ ছিল এবং উহার গুহামধ্যে প্রাচীন ঋষিগণ বাস করিতেন। সীতা-উদ্ধারের সময় সেতুবন্ধনের নিমিত্ত হনুমান্, এই পর্ব্বত-খণ্ড উৎপাটন করিয়া এই স্থানে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহা একটী গল্পমাত্র।

উদয়গিরির মধ্যে যে সকল গুম্ফা অবস্থিত, তন্মধ্যে রাণীগুম্ফাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

রাণী-গুম্ফা।

কথিত আছে যে, একজন হিন্দুরাজমহিষী, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে এই-স্থানে বাস করিয়াছিলেন, এজন্য ইহা রাণী-গুম্ফা নামে অভিহিত। রাণী-গুম্ফা দ্বিতল, গৃহগুলি একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণের তিনপার্শ্বে অবস্থিত, প্রাঙ্গণের এক দিক্ সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রাঙ্গণটি পর্ব্বতের গাত্রে সমতল ও বিস্তৃত একখণ্ড ভূমিমাত্র।

গৃহগুলি দ্বিতলবৎ প্রতীয়মান হইলেও, একটী অপরটীর উপর অবস্থিত নহে। ঐ গৃহগুলি নিম্নতলের গৃহের কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে পর্ব্বতের উচ্চাংশে অবস্থিত,—এজন্য দূর হইতে এই গুম্ফাটী দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়। নিম্ন-তলের মধ্যভাগে তিনটী এবং দুইপার্শ্বে পাঁচটী গৃহ অবস্থিত; উপরিতলের মধ্যভাগে চারিটী এবং উভয় পার্শ্বে একটী করিয়া গৃহ সংস্থিত। গৃহগুলির সম্মুখে একটী করিয়া বারাণ্ডা, কতকগুলি স্তম্ভের উপর বিরাজ করিতেছে; বারাণ্ডার ছাদ, গৃহের ছাদ অপেক্ষা অধিক উচ্চ। প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিবার ২।৩টী দরজা আছে, দরজার চৌকাটগুলি প্রস্তর হইতে সুন্দররূপে খোদিত করিয়া বাহির করা হইয়াছে। প্রবেশ-দ্বারগুলির শীর্ষদেশ, গোল খিলান দ্বারা শোভিত, চৌকাটের মস্তকে এবং খিলানের উপরে বিবিধ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এই-সকল মূর্ত্তির মধ্যে সিংহ, হস্তী বা নর-নারীর মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। অধি-কাংশ নর-নারীর মূর্ত্তিগুলি, উপাসনার ভাবে সংস্থিত। এতদ্ব্যতীত কোন একটী বিশেষ ঘটনার ধারাবাহিক চিত্র, খিলানগুলির উপর খোদিত রহিয়াছে; গণেশ-গুম্ফা-বর্ণনার সময়ে এবিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে। নিম্নতলের বারাণ্ডার দুইপার্শ্বে দুইটী প্রস্তরময় বৃহৎ দৌবারিক মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে; ইহাদিগের মধ্যে একটীর অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অপরটীর অবস্থা মন্দ নহে। বারাণ্ডার অপর স্থানে আর দুইটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদিগের মধ্যে একটীর যোদ্ধৃবেশ। কিঞ্চিৎ দূরে একটী বৃহৎ সিংহের উপর একটী নারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

নিম্নতলের বারাণ্ডা, উপরের বারাণ্ডা অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। উপরের বারাণ্ডা, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪২ হাত; উহার ছাদ, ১১টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। স্তম্ভগুলির মধ্যে অধিকাংশই এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন কোন গৃহের তিন পার্শ্বে বেদীর ন্যায় উচ্চ-প্রস্তরময় বসিবার আসন দৃষ্ট হয়।

গণেশ-গুম্ফা।

উদয়গিরির শিখরপ্রদেশে এবং রাণীগুম্ফার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে আর একটি গুম্ফা অবস্থিত; ইহার নাম গণেশ-গুম্ফা। ইহা রাণী-গুম্ফার ন্যায় দ্বিতল নহে। ইহাতে দুইটি গৃহ ও সম্মুখে একটি বারাণ্ডা আছে; বারাণ্ডার ছাদ, ৫টী স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। স্তম্ভগুলি ভগ্নপ্রায়। স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশে কতকগুলি নারীমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। গুম্ফায় উঠিবার সোপানাবলীর দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহদাকার প্রস্তরের হস্তিমূর্ত্তি সংস্থাপিত; প্রত্যেকটি শুণ্ড দ্বারা একটি নাল-সমেত পদ্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হস্তীগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গর অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমি যে সময় উদয়গিরিতে গিয়াছিলাম, তখন গবর্ণমেণ্টের আদেশে গুম্ফা ও তন্মধ্যস্থিত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিগুলির সংস্কার সাধিত হইতেছিল।

গণেশগুম্ফার মধ্যে গণেশের প্রতিমূর্ত্তি নাই, কিন্তু তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তরময় হস্তি-মুণ্ড সংস্থিত রহিয়াছে। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, এতগুলি হস্তি-মূর্ত্তি থাকিবার জন্যই এই গুম্ফা, গণেশের নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই গুম্ফার প্রবেশ-দ্বারের গোল খিলানের উপর কোন বীর পুরুষ দ্বারা একটী রমণী-হরণ-ব্যাপারের ধারাবাহিক চিত্র খোদিত রহিয়াছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, রাক্ষসাধিপতি রাবণের সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্যার্ উইলিয়ম্ হণ্টরের মতে এ অনুমান একেবারেই ভিত্তি-হীন। বাস্তবিক রাবণের সীতা-হরণ-সম্বন্ধে আমরা যে চিত্র, রামায়ণে দেখিতে পাই,—তাহার সহিত কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে কতকগুলি যোদ্ধৃবেশধারী পুরুষের সহিত একটী যুদ্ধের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যুদ্ধাবসানে পূর্ব্বোক্ত বীরপুরুষ, বিহ্বলা রমণীকে একটী হস্তীর উপরে উত্তোলিত করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। এরূপ ঘটনার চিত্র, রামায়ণে নাই। সীতা-হরণের সময় পথে দশমুণ্ড রাবণের সহিত পক্ষিরাজ জটায়ুর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং যুদ্ধাবসানে সীতাদেবী, পুষ্পক-রথে উত্তোলিত হইয়া লঙ্কায় নীত হইয়াছিলেন—সুতরাং উক্ত ঘটনার সহিত এই চিত্রের কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, চিত্রের শেষাংশ দেখিলে ইহা যে সীতা-হরণের চিত্র নহে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। চিত্রের

শেষ ভাগে অপহারকের সহিত অপহৃতা রমণীর বিবাহ বা মিলন, স্পষ্টরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে; সুতরাং ইহা যে, রামায়ণঘটিত চিত্র নহে—সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার একবার মনে হইয়াছিল যে, হয় তো ইহা রুক্মিণীহরণ বা সুভদ্রাহরণের চিত্র হইলেও হইতে পারে; উভয় ব্যাপারেই স্বয়ম্বরে সমবেত রাজন্য-বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং বিবাহোৎসবে এই উভয় অভিনয়ই সমাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যান্য প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ, চিত্রের ভাব দেখিয়া রমণীকে পরিণীতা বলিয়া অনুমান করেন। বিশেষতঃ, পুরাণোক্ত উভয় ব্যাপারেই অশ্বযুক্ত রথ, যান-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল; সুতরাং এই চিত্র উপরিলিখিত কোন ঘটনারই প্রতিফলন বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেব, কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া আনেন এবং পরে তাঁহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন—এই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ, গণেশ-গুম্ফার খিলানের উপরি খোদিত হইয়াছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই এই অনুমান ভ্রমাত্মক বলিয়া সপ্রমাণ হইবে। পুরুষোত্তম দেব, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু গণেশগুম্ফার চিত্র, খৃষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাণীগুম্ফাতেও ঠিক এইরূপ একটী চিত্র খোদিত আছে। বোধ হয়, উভয় চিত্রই, তাৎকালিক কোন একটী প্রসিদ্ধ সামাজিক ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খোদিত হইয়াছিল। কারণ, দুইটী চিত্রের মধ্যে কোন কোন অংশে কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়।

স্বর্গপুরী-গুম্ফা।

রাণী-গুম্ফার পশ্চিমে আর একটী দ্বিতল গুম্ফা অবস্থিত আছে, ইহার নাম স্বর্গপুরী। ইহা রাণী-গুম্ফা অপেক্ষা পরিসরে অনেক ক্ষুদ্র এবং সৌষ্ঠবেও নিকৃষ্ট। ইহার উপর ও নীচের তলে দুইটী করিয়া গৃহ ও সম্মুখে একটী বারাণ্ডা আছে; বারাণ্ডার স্তম্ভগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কয়েকটী হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি, অতি সুন্দর ভাবে এই গুম্ফার মধ্যে খোদিত রহিয়াছে।

স্বর্গপুরীর বামে জয়া-বিজয়া-গুম্ফা; ইহার মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র গৃহ ও একটি

জয়া-বিজয়া-গুম্ফা। বারাণ্ডা আছে। এই গুম্ফায় একটি বোধিবৃক্ষ ও তাহার দুই পার্শ্বে উপাসনায় অবস্থিত দুইটি মনুষ্যের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

স্বর্গপুরীর নিকটে দ্বারকাপুর, মর্ত্ত্যলোক, মাণিকপুর, বৈকুণ্ঠ, পাতালপুর, যমপুর প্রভৃতি অপর অনেক গুলি গুম্ফা অবস্থিত।

বৈকুণ্ঠ ও যমপুর-গুম্ফা। বৈকুণ্ঠ, রাণী-গুম্ফার ন্যায় দ্বিতল; কিন্তু পরিসরে ক্ষুদ্র। ইহার নিম্ন-তল-ভাগ, পাতালপুর নামে অভিহিত। পাতালপুরের পশ্চিমে যমপুর-নামক গুম্ফার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। দৌবারিক-বেশধারী একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি যমপুরের দ্বার রক্ষা করিতেছে। বৈকুণ্ঠ গুম্ফায় পালি ভাষায় কতকগুলি কথা খোদিত আছে। পৃন্সেপ্ (Princep) সাহেব তাহার এইরূপ অর্থ করেন। যথা—

"কলিঙ্গ-রাজগণ, অর্হৎগণের আশীর্ব্বাদে এই সকল গুম্ফা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

বৈকুণ্ঠের উত্তর-পশ্চিমে এবং পর্ব্বতের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধপ্রদেশে হস্তিগুম্ফা-নামে আর একটী বৃহৎ গুম্ফা অবস্থিত আছে। কেহ কেহ

হস্তি-গুম্ফা। অনুমান করেন যে, একটী স্বাভাবিক গুহাকে কাটিয়া বিস্তৃত করিয়া ইহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই গুম্ফায় ৩টী গৃহ এবং গৃহের সম্মুখে একটী বারাণ্ডা আছে; ইহাতে শিল্পকার্য্য-সম্বন্ধে প্রশংসাযোগ্য কিছুই নাই। ইহার শীর্ষ দেশে প্রাচীন অক্ষরে একটী বৃহৎ শিলালিপি খোদিত রহিয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, ইহাই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শিলালিপি। এক্ষণে এই শিলালিপির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থানেই ইহা নিতান্ত অস্পষ্ট। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লেফ্টেন্যাণ্ট্ কিটো ইহার একটী প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই ইহা ইতিহাসের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই লিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐর-নামক অতিপরাক্রান্ত কলিঙ্গদেশের নরপতি দ্বারা এই গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহামেঘ-নামক প্রকাণ্ড হস্তি, তাঁহার বাহন ছিল; তিনি বারাণসীতে প্রচুর স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতা—অসীম। তিনি অসংখ্য সৈন্য, অশ্ব, বারণ, গো, মেষ,

মহিষাদি দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে পর্ব্বতরাজের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মমণ্ডলীর নিমিত্ত মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্তম্ভ-শোভিত চৈত্য ও সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি মগধের অধিপতি নন্দরাজকে পরাভূত করিয়া মগধের সিংহাসনে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এই লিপি দ্বারা অনুমান করেন যে, ঐর নরপতি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১৬ হইতে ২১৬ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কলিঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সময়ে এই হস্তি-গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

হস্তি-গুম্ফার সন্নিকটে পাবন-গুম্ফা, সর্প-গুম্ফা, ভজন-গুম্ফা, অলকপুর-গুম্ফা, ব্যাঘ্র-গুম্ফা, উর্দ্ধবাহু-গুম্ফা প্রভৃতি অপর কয়েকটী ক্ষুদ্র

সর্প-গুম্ফা ও ব্যাঘ্র-গুম্ফা। ক্ষুদ্র গুম্ফা অবস্থিত আছে। সর্প-গুম্ফার শীর্ষদেশে একটী ত্রিশিরাঃ অজগর সর্পের মস্তক খোদিত রহিয়াছে। ব্যাঘ্র-গুম্ফা-প্রবেশদ্বারে একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র-মস্তক মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

খণ্ডগিরিতে যে সকল গুম্ফা আছে, তন্মধ্যে অনন্ত-গুম্ফা, জৈন-গুম্ফা এবং ললাটেন্দুকেশরী-গুম্ফাই সর্ব্বপ্রধান। এতদ্ব্যতীত এই পর্ব্বতের শীর্ষ দেশে একটী জৈন দেবমন্দির, প্রতিষ্ঠিত আছে। খণ্ডগিরির উপর দেবসভা ও আকাশগঙ্গা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনন্ত-গুম্ফায় দুইটী গৃহ ও সম্মুখে একটী বারাণ্ডা আছে। ৩টী স্তম্ভের উপর বারাণ্ডার ছাদ অবস্থিত। গৃহের মধ্যে দেওয়ালে

অনন্ত-গুম্ফা। একটী বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি এবং খিলানগুলির উপর কতকগুলি নর-নারীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। খিলানগুলির মধ্যস্থলে একটী মহালক্ষ্মী-মূর্ত্তি বিরাজমান। পদ্মবনে কমলা অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, দুই পার্শ্বে দুইটী হস্তী, শুণ্ড উত্তোলন করিয়া যেন তাঁহার মস্তকে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। বৌদ্ধ-গুম্ফার মধ্যে এই হিন্দুদেবীমূর্ত্তি খোদিত দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির সূচক, এই জন্য ইনি উপাসিতা না হইয়াও বৌদ্ধরচিত গুম্ফার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈনেরা মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তির প্রতি যে, সাতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন, নানা স্থানে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্ত-গুম্ফা হইতে কিছু দূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র গুম্ফা অবস্থিত আছে। এই স্থানে নাগরী অক্ষরে লিখিত একটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়। লিপি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, এই সকল গুম্ফার মধ্যে আচার্য্য কলচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্য বেল্ল-চন্দ্র বাস করিতেন।

জৈন-গুম্ফা।

খণ্ডগিরির পূর্ব্ব প্রান্তে জৈন-গুম্ফা অবস্থিত। দুইটী বৃহৎ গৃহ ও স্তম্ভ-শোভিত একটী বারাণ্ডা লইয়া এই গুম্ফা গঠিত। গৃহের পশ্চাদ্ভাগের দেওয়ালে কতকগুলি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি এবং নগ্ন "মহাবীরের" দণ্ডায়মান মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

জৈন-মন্দির।

খণ্ডগিরির শিখর-দেশে অবস্থিত জৈন-মন্দির শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল; পর্ব্বতের শিখর-প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া এই মন্দিরের চূড়া, অনেক দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার মধ্যে মহাবীরের নগ্ন দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখের পর্ব্বতাংশ, সমতল ভাবে কর্ত্তিত হইয়া প্রাঙ্গণে পরিণত হইয়াছে। জৈনেরা এই স্থানে বসিয়া উপাসনা করিতেন। এক্ষণে মন্দিরে রীতিমত পূজা হয় না; মধ্যে মধ্যে জৈন-দর্শকেরা এ স্থানে আগমন করিয়া পূজা ও উৎসব করিয়া থাকেন।

দেব-সভা।

জৈন-মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্ব্বতাংশের ভূমি, সমতল ও বহুবিস্তৃত। এই স্থানে দেব-সভা অবস্থিত রহিয়াছে। বহুসংখ্যক অনুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ লইয়া দেব-সভা গঠিত। মধ্য স্থানের স্তম্ভটী অধিক উচ্চ ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই স্থানে বৌদ্ধমণ্ডলী একত্র সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

আকাশ-গঙ্গা।

দেবসভার পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ প্রস্তরগ্রথিত পুষ্করিণী অবস্থিত রহিয়াছে; ইহার নাম আকাশগঙ্গা। একটি প্রস্রবণের সহিত ইহার সংযোগ আছে। অবতরণের নিমিত্ত প্রস্তর-ময় সোপানাবলী আছে; সংস্কারাভাবে ইহার জল, নিতান্ত অপরিষ্কৃত রহিয়াছে দেখিলাম।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ললাটেন্দু-কেশরী-গুম্ফার মধ্যে ঐ নামধেয় নৃপতির সমাধি হইয়াছিল।

(৪)

খুর্‌দা।

ভুবনেশ্বর পার হইয়া খুর্‌দা রোড্ জংশন্ ষ্টেশন্। মান্দ্রাজ মেল গাড়ীতে উঠিলে এই স্থানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া পুরী গমন করিতে হয়। পুরী-প্যাসেঞ্জারে আসিলে গাড়ী বদল করিবার আবশ্যকতা হয় না। মান্দ্রাজ মেল গাড়ী এই ষ্টেশন্ হইতে দক্ষিণ মুখে চিল্কা হ্রদ ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল বাহিয়া মান্দ্রাজাভিমুখে গমন করে। পুরীর রাজাই খুর্‌দার রাজা নামে সকলের নিকট পরিচিত। ইহা পুরীর একটী সব্ডিভিসন্। বিচারালয়, ষ্টেশন্ হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

মুকুন্দদেবের বংশাবলী, মুসলমানদিগের অধীন করদ-রাজ-রূপে এই স্থানে বাস করিতেন এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পুরীর মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই অবধি খুর্‌দার রাজা, জগন্নাথ দেবের প্রধান সেবায়েৎ। জগন্নাথ দেবের উৎসবাদির সময় ইঁহার স্বহস্তে গোময় ছিটাইয়া সম্মার্জ্জনী দ্বারা জগন্নাথ দেবের গমনের পথ পরিষ্কার করিবার কথা। স্থানীয় ভাষায় এই কার্য্যকে "ছেরাপোরা" কহে। এই কার্য্য-সম্বন্ধে উড়িষ্যা দেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কটকাধিরাজ বিখ্যাত পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীপুরাধিপতির কন্যা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইয়া তথায় দূত প্রেরণ করিলে কাঞ্চীপুরাধিপতি "ছেরাপোরা"-রূপ নীচ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকে কন্যাদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া দূতের অবমাননা করিয়াছিলেন। ইহাতে পুরুষোত্তম দেব সসৈন্যে কাঞ্চীপুর গমন করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন এবং রাজাকে হত্যা করিয়া তদীয় কন্যা পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। কাঞ্চীপুরাধিপের অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তিনি পদ্মাবতীকে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কোন ঝাড়ুবর্‌দারের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিতে মন্ত্রীকে আদেশ প্রদান করেন। মন্ত্রী "যথাজ্ঞা" বলিয়া পদ্মাবতীকে নিজ বাস ভবনে তৎকালে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ দূরদর্শী মন্ত্রী সহসা রাজার আদেশ পালন না করিয়া রাজকন্যা যাহাতে বংশ ও মর্য্যাদা অনুযায়ী উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিতা হয়েন, তাঁহারই সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে জগন্নাথ দেবের রথ-যাত্রার দিন সমাগত হইল। রাজা পুরুষোত্তম দেব, চিরন্তন প্রথানুসারে রথগমনের পথ গোময় ও সম্মার্জ্জনী

দ্বারা পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী, রাজকন্যা পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং করযোড়ে রাজ সমীপে নিবেদন করিলেন—"মহারাজ! আপনার আদেশ মত যিনি এক্ষণে জগন্নাথ দেবের ঝাড়ুবর্দারের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন—তাঁহারই হস্তে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পণ করিলাম।" রাজা, মন্ত্রীর বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন।

খুর্দার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন কিছু মাত্র নাই। বারুণী দেবীর একটী ক্ষুদ্র মন্দির এখানে অবস্থিত আছে। এই স্থানটী চতুর্দ্দিকে শৈলমালায় পরিবেষ্টিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। এই স্থানের জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর।

সত্যবাদী ও সাক্ষী গোপাল।

খুর্দ্দা রোড্ জংশন্ পার হইয়া পুরী হইতে প্রায় দশ মাইল উত্তরে সত্যবাদি-নামক গ্রামে সাক্ষী গোপালের মন্দির অবস্থিত। সাক্ষী গোপাল-নামক ষ্টেশনে নামিয়া এই মন্দির দর্শন করিতে যাইতে হয়। মন্দিরটী ষ্টেশন্ হইতে অধিক দূরে নহে, সহজেই পদব্রজে যাইতে পারা যায়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য গো-যানের বন্দোবস্ত হইতে পারে।

সাক্ষী গোপাল-সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। এক সময়ে কাঞ্চী প্রদেশে বিদ্যানগরে দুই জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এক জন বয়োবৃদ্ধ এবং কুল, মর্য্যাদা ও বিদ্যায় অপরের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অপরটী যুবা পুরুষ। দুই জনে একত্র হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটনের পর বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সেই সময় যুবা ব্রাহ্মণ প্রাণপণে বৃদ্ধের শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে রোগ মুক্ত করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আরোগ্য লাভ করিয়া গোপালজীর সম্মুখে সেবাকারী ব্রাহ্মণকে পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার কন্যা দান করিতে প্রতি-শ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পর তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ, উক্ত ব্রাহ্মণ যুবকের কুল, শীল, ও বিভবের হীনতা হেতু এই বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালনে অস্বীকৃত হইলেন। তখন সেবাকারী ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনাঃ হইয়া "গোপালজীর সাক্ষাতে

এই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল"—বলাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার আত্মীয়গণ, উপ-হাস করিয়া কহিলেন যে, যদি গোপালজী স্বয়ং আসিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবে তোমার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিব। যুবকের গোপালজীর উপর অবিচলিত ভক্তি ছিল। তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক বৃন্দাবনে পুনরাগমন করিলেন। গোপাল তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহার সহিত দক্ষিণাপথে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিবেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না; যদি ফিরিয়া দেখেন, তাহা হইলে গোপাল সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন, আর অধিক অগ্রসর হইবেন না। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কিরূপে জানিতে পারিবেন যে, গোপাল তাঁহার পশ্চাদ্গামন করিতেছেন; তাহাতে গোপাল উত্তর করেন যে, ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণের নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইবেন। এইরূপে বহু পথ অতিক্রম করিয়া দুই জনে কাঞ্চীপুরের নিকট এক বালুকাময় প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে প্রান্তরের বালুকা, গোপালের নূপুরের মধ্যে প্রবেশ করাতে নূপুর-ধ্বনি নীরব হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ব্যস্ত ও ভীত হইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিবামাত্র, গোপাল, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামত সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন, আর এক পদও অগ্রসর হইলেন না। এই অদ্ভুত ব্যাপার, নাগরিকদিগের কর্ণগোচর হইলে, পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য লোকেরা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং গোপালকে সাক্ষিরূপে উপস্থিত দেখিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নিতান্ত লজ্জিত হইয়া যুবক ব্রাহ্মণের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলেন। কাঞ্চী প্রদেশের রাজা, সেই স্থানে গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি সেবার বন্দোবস্ত করিলেন।

যখন পুরুষোত্তম দেব, কাঞ্চীপুর জয় করেন, তখন তিনি গোপালকে আনয়ন করিয়া পুরীর নিকট স্থাপন করেন এবং বোধ হয়, সেই সময়ে রাধিকা-মূর্ত্তি, গোপালের পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দুই ব্রাহ্মণ, বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্র নামে প্রসিদ্ধ এবং যে ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে সাক্ষীগোপালের সেবার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দুই ব্রাহ্মণের বংশাবলী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

এই ঘটনা হইতে সাক্ষীগোপালের অপর নাম সত্যবাদী গোপাল এবং যে

গ্রামে মন্দির অবস্থিত, তাহার নাম সত্যবাদী। গুপ্তবৃন্দাবন নামক এক অতি মনোরম বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে সাক্ষীগোপালের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে উচ্চ অখণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত একটী স্তম্ভ বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দেবমন্দির আছে; এখানে সাক্ষীগোপালের চন্দনযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। জগন্নাথের ন্যায় গোপালের সিদ্ধান্ন ভোগ নাই; ভোগের নিমিত্ত মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে। খই-চূর্ণ চিনিতে পাক করিয়া গোপালের ভোগের জন্য প্রদত্ত হয়। সাক্ষীগোপালে অতি সুন্দর কলা পাওয়া যায়।

যাত্রীরা পুরী হইতে প্রত্যাগমনের সময় সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে গমন করে। তাহারা যে, পুরী গমন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ পাণ্ডাদিগের হস্তলিখিত এক খণ্ড লিপি লইয়া সত্যবাদী গোপালকে অর্পণ করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এইরূপ করিলে সত্যবাদী গোপাল, তাহাদিগের পুরী-গমনের যথার্থতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

আঠার নালা।

সাক্ষীগোপাল পার হইয়া মালতীপুর ষ্টেশন্ এবং তৎপরে আঠার নালার সেতু। এই সেতু পার হইলেই পুরী সহরের উপকণ্ঠে উপনীত হওয়া যায়। আঠার নালার সেতু, মধুপুর বা মুটিয়া নদীর উপর অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ শত হস্ত এবং ১৮টী বিস্তৃত খিলানের উপর সংস্থিত। রক্ত-প্রস্তর-নির্ম্মিত ১৯টী সুবৃহৎ স্তম্ভ, খিলানগুলির ভার বহন করিতেছে। ১৮টী "ফোকর" আছে বলিয়া এই সেতু, আঠারনালা নামে অভিহিত। ইহা একটী প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তি। ১০৩৪ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা মৎস্যকেশরী, এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও আজি পর্য্যন্ত ইহা সুদৃঢ় ও অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এই সেতুর উপর দিয়া ঘোড়ার ও গরুর গাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে। ইহা 'জগন্নাথ-সড়কের' উপর অবস্থিত; সুতরাং যাহারা পদব্রজে পুরী গমন করে, তাহাদিগকে এই সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। রেলওয়ে কোম্পানী এই সেতুর অনতিদূরে আর একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহারই উপর দিয়া রেলগাড়ী গমনাগমন করে। ১৮ নালার নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে দুইটী গল্প প্রচলিত আছে। একটী গল্প এই যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন---যিনি পুরীতে দারুব্রহ্ম সংস্থাপন

করিয়াছিলেন---এই খরস্রোতা নদীর উপর সেতু বন্ধন করিতে বারংবার বিফল-মনোরথ হইলে, নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সন্তোষের নিমিত্ত একে একে নিজের অষ্টাদশ পুত্রকে বলি প্রদান করিয়া আঠারটা খিলান প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপর গল্প এই যে, যখন চৈতন্য দেব, পুরুষোত্তমে গমন করেন—তখন তিনি খরস্রোতা মধুপুর নদী পার হইতে উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা তীরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জগন্নাথ দেব তাঁহার আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন এবং বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া রাত্রির মধ্যেই নদীর উপর সেতু-নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। রাত্রি প্রভাতে চৈতন্যদেব এই সেতু পার হইয়া প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই সকল গল্পের মূলে কোন সত্য নাই, তবে আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে নরবলি না হইলে, সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, এই কুসংস্কার, অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়।

আঠারনালা হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা, স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে পাণ্ডারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে ধ্বজা-দর্শনী-রূপে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিত। শ্রীমন্দিরের শুদ্ধ ধ্বজা দেখিয়াই যাত্রীরা যে, কি অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। অনাহার, অনিদ্রা, অভাব, দারুণ পথকষ্ট, রোগ, শোক, ভয়, ভাবনা—এ সকলই মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিস্মৃত হইয়া তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমেষ লোচনে আত্মহারা হইয়া ধ্বজার দিকে চাহিয়া থাকে এবং ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কার করিতে থাকে। যে ঈপ্সিতের দর্শনাভিলাষের বাসনা, আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, আজি তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয়, আশা ও আনন্দের তরঙ্গে কিরূপে উদ্বেলিত হইতে থাকে, তাহা ভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার বা বুঝাইবার শক্তি নাই।

আমরাও অন্য মানসিক নেত্রে ভক্তিভাবে শ্রীমন্দিরের পবিত্র ধ্বজা দর্শন করিয়া দেব-দর্শনের পূর্ব্বে যথারীতি সংযম পালন করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থানে অবকাশ গ্রহণ করিলাম।

ইতি পূর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মালাবিকাগ্নিমিত্র।

পঞ্চম অঙ্ক।

(উদ্যান-পালিকার প্রবেশ)

উদ্যা। সৎকার-বিধি-অনুসারে স্বর্ণাশোকের ভিত্তিবেদীবন্ধ রচিয়াছি। যাই, দেবীকে জানাই। আমার নিয়োগ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।—(পরিক্রমণ)। বুঝিতেছি, মালবিকা, বিধাতার কৃপা-পাত্রী। কোপান্বিতা দেবী, এই অশোক-হর্ষদোহদ-বৃত্তান্ত-হেতু তাহার উপর প্রসাদোন্মুখী হইবেন। দেবীর এখন কোথায় থাকা সম্ভব? (সম্মুখে দেখিয়া) ঐ যে দেবীর পরিজন-বিশেষ কুব্জ, কি এক জতুমুদ্রালাঞ্ছিত পেটিকা লইয়া, চতুঃশাল হইতে বাহির হইতেছে। উহাকে জিজ্ঞাসা করি।

(যথা-নির্দ্দিষ্ট-হস্ত কুব্জের প্রবেশ)।

সারস, কোথায় চলিয়াছ?

সার। মধুকরিকে, বিদ্যানুশীলক ব্রাহ্মণদিগের এই মাসিকী নিত্যদক্ষিণা, পুরোহিত ঠাকুরের হস্তে পঁহুছাইয়া দিতে যাইতেছি।

মধু। বলি, ইহা কি নিমিত্ত?

সার। যে অবধি শোনা গিয়াছে, রাজকুমারকে সেনাপতি, যজ্ঞ-তুরঙ্গ-রক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে অবধি তাঁহার আয়ুঃ-কামনায় অষ্ট শত সুবর্ণ-পরিমিত দক্ষিণা দ্বারা প্রতিজ্ঞা হইতেছে।

মধু। বল দেখি, এখন দেবী কোথায়? কিই বা তিনি করিতেছেন?

সার। মঙ্গল-গৃহে আসীন হইয়া বিদর্ভ-বিষয় হইতে ভ্রাতা বীরসেনের প্রেরিত লিপি, লিপিকর দ্বারা পাঠ করাইয়া শুনিতেছেন।

মধু। ভাল, বিদর্ভরাজ-বৃত্তান্ত কি শোনা যাইতেছে?

সার। বীরসেনের অধীন দণ্ডচক্রের দ্বারা বিদর্ভনাথকে প্রভুর বশীভূত করা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞাতি মাধবসেন, মোচিত হইয়াছেন। সেনাপতি, বহুমূল্য রত্নাধার-সমূহ এবং বিস্তর শিল্পি-কন্যা-সমেত পরিজন উপঢৌকন করিয়া প্রভুর সকাশে দূত পাঠাইয়াছেন। সে, আজ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

মধু। যাও, আপন নিয়োগ অনুষ্ঠান কর; আমিও দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করি গিয়া।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(প্রবেশক-শেষ)।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। অশোক, সৎকারে ব্যাপৃতা দেবী "আমায় আজ্ঞা করিলেন, আর্য্য-পুত্রকে জানাইয়া আইস; তাঁহার সহিত অশোক তরুর প্রসূন-লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি।" দেখিতেছি, মহারাজ এখন ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট। আপাততঃ তবে তাঁহার অপেক্ষা করি। (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে। কি প্রতাপ! শাসনেই মহারাজ, শত্রুগণের মস্তকোপরি বিরাজমান্! জয় জয় মহারাজ!

বৈতালিক।—লভিয়াছ পত্নী রতি শরীরী অনঙ্গ তুমি
বিদিশার তীরস্থ উদ্যানে;
পরভৃত-কল-ভাষে মধুর-বসন্ত-ঋতু
আন তুমি কে না তাহা জানে;
জয়-হস্তি সকলের বন্ধন-সাধন-চয়ে
বরদার তট-তরু-সাথে,
রিপু তব অবনত, অতুল প্রতাপ তব
পার তুমি অভীষ্ট পূরাতে।

২য় বৈতালিক।—অর্গল সুদৃঢ় ভুজে রুক্মিণীরে নারায়ণ
করিলেন সবলে হরণ,
দণ্ডধারী সৈন্য-চয়ে বিদর্ভের রাজলক্ষ্মী
করিয়াছ তুমিও গ্রহণ।
সুরোপম সুধীবৃন্দ বীর-প্রীতি-ভরে আহা!
তোমাদের উভয় চরিত,
বৈদর্ভ-কথার সাথে করেছেন সংস্থাপন
রচি' গান অতি সুললিত!

প্রতি। জয়-শব্দে বুঝা যাইতেছে,—মহারাজ, ধর্ম্মাসন ত্যজিয়া উঠিয়া-

ছেন। (সম্মুখে দেখিয়া) অই যে প্রভু, এ দিকেই আসিতেছেন! আমিও তা হ'লে ইহার সম্মুখ হইতে সরিয়া পার্শ্বস্থ অলিন্দ-তোরণ আশ্রয় লইয়া দণ্ডায়মান হই।

(একান্তে অবস্থান)

(বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ)

রা। প্রিয়া-সাথে সম্মিলন দুর্লভ ভাবিয়া,
শুনিয়া বিদর্ভপতি সৈন্য-বলে নত,—
দুঃখিত—তথাপি কিন্তু সুখিত এ হিয়া,
আতপে সরোজ যেন বৃষ্টি-অভিহত।

বিদূ। আমি তো দেখিতেছি,—মহারাজ, একান্ত সুখী হইবেন।

রা। কেমনে বুঝিলে?

বিদূ। আজ পণ্ডিত কৌশিকীকে দেবী ধারিণী বলিয়াছেন,—"ভগবতি! আপনি যদি যথার্থই সাজাইবার পর্ব্ব ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে 'মালবিকার' শরীরে বিবাহ-সজ্জা রচনা করুন দেখি"। তাহাতে তিনি বিশেষ কৌতুহলের সহিত মালবিকাকে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন। বোধ করি, আপনার মনোরথ পূরিত হইবে।

রা। সখে! আমার আকাঙ্ক্ষার অনুবর্ত্তী হইয়া, রাজ্ঞী ধারিণী যে, এরূপ করিবেন, তাঁহার পূর্ব্বচরিত দেখিলে, তাহা সম্ভবই বোধ হয়।

প্রতি। (নিকটে আসিয়া) জয় হোক মহারাজ! দেবী, নিবেদন করিলেন—"স্বর্ণাশোকের কুসুমোদ্গম-শোভা, আর্য্যপুত্রের সহিত প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করি"।

রা। দেবী, সেই খানেই তো?

প্রতি। হাঁ মহারাজ! আপনার সম্মান-সুখ সেইখানে। মহারাণী, অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া মালবিকাকে অগ্রে লইয়া, স্বীয় পরিজনবর্গ ও পণ্ডিত-কৌশিকীর সহিত আপনার অপেক্ষা করিতেছেন।

রা। (সহর্ষে বিদূষকের দিকে চাহিয়া) জয়সেন, আগে চল।

প্রতি। আসুন আসুন দেব! (পরিক্রমণ)

বিদূ। (চারি দিক্ দেখিয়া) মহারাজ! দেখাতেছে যেন প্রমোদ-বনে বসন্তের যৌবন কতকটা আবার ফিরিয়াছে!

রা। যাহা বলিলে মিত্রবর! বাস্তবিক—
সম্মুখে বিকীর্ণ অই কুরুবক-চয়ে,
বিদ্যমান সহকারে সুশোভিত হ'য়ে,
পরিণামোন্মুখ এই ঋতুর যৌবন
সমুৎসুক করে সখে! মানবের মন!

বিদূ। মহারাজ! ঐ সে উণকাশোক; আহা! কুসুমস্তবকে শোভিত হইয়া যেন বেশভূষা ধারণ করিয়াছে! দেখুন দেখুন দেব!—

রা। অশোক যে, কুসুম-প্রসবে বিলম্ব করিতেছিল, সে এক প্রকার হইয়াছে ভাল; সেই জন্যই তো সম্প্রতি এটি এমন অসামান্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে! দেখ—
বসন্ত-বিভব যারা করে সুপ্রকাশ,
মনে হয় সে সমস্ত অশোক-লতার
সমগ্র মুকুলগুলি—পরশে প্রিয়ার—
নিবৃত্ত-দোহদ এই পাদপে বিকাশ!

বিদূ। আর ভয় নাই, আশ্বস্ত হউন। ইহার প্রতি আপনি নিতান্ত আসক্ত জানিয়াও রাণী ধারিণী, পার্শ্বচারিণী মালবিকাকে সম্মুখে থাকিতে দিয়াছেন।

রা। (সহর্ষে) দেখ দেখ সখে,—
দেবী-সাথে বিকচ-কমল-কর প্রিয়া!
বিনয়ে সে রহে পাছে, দেবী আগুয়ান—
যেন আহা! বসুমতী রাজশ্রী লইয়া
আমারে সম্মান-তরে করে অভ্যুথান!

(ধারিণী, মালবিকা, পরিব্রাজিকা, পরিজনবর্গের প্রবেশ)

মাল। (স্বগত) আমার এই কৌতুকালঙ্কারের কারণ আমি জানি। তবু পদ্মপত্রগত সলিল-বৎ হৃদয় কাঁপিতেছে। কিন্তু বাম নয়নও, বার বার বিস্ফুরিত হইতেছে।

বিদূ। মহারাজ! বিবাহ-সাজ-সজ্জায় মালবিকা ঠাকুরাণী, বিশেষরূপ শোভা পাইতেছেন

রা। সুন্দরীকে দেখিতেছি ; ঐ—

অনতি-লম্বিত চারু দুকুল-বাসিনী
স্বল্প আভরণে আহা! কি সুন্দর ভায়!
উন্মুখ-চন্দ্রিকা যেন মাধবী যামিনী,
বিভূষিত হিম-হীন নক্ষত্র-মালায়!

ধারি। (নিকটে আসিয়া) জয় হউক আর্য্যপুত্র!

বিদূ। দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হউক।

পরি। দেবের বিজয় হউক।

রা। ভগবতি! অভিবাদন করি।

পরি। অভীষ্টসিদ্ধি হউক।

দেবী। (স্মিতমুখে) আর্য্যপুত্র! তরুণীজন-সহায় তুমি। এই অশোকতল। আমরা তোমার সঙ্কেত-গৃহ নিরূপিত করিয়াছি।

বিদূ। মহারাজ! দেবী আপনার পরিতোষ সাধন করিতেছেন।

রা। (লজ্জায় অশোকের চারি পার্শ্ব পরিক্রম পূর্ব্বক)

দেবী মোর করিবেন এই তরুবরে
এরূপ সৎকার-পাত্র—ইহা তো শোভন ;
উপেক্ষি' বসন্ত-শ্রীর আদেশ এ জন,
দেবীর প্রয়াসে পুষ্পে প্রকাশে সাদরে!

বিদূ। মহারাজ! বিশ্বস্ত হইয়া এখন যৌবনবতীকে সন্দর্শন করুন।

ধারি। কাহাকে?

বিদূ। কণকাশোকের কুসুম-শোভাকে।

(সকলের উপবেশন)

রা। (মালবিকাকে দেখিয়া স্বগত) নিকটে থাকিয়া বিচ্ছেদ কি কষ্টকর!

আমি চক্রবাক ; প্রিয়া—সহচরী মোর ;
ধারিণী রজনী যেন—অন্তরায় ঘোর!

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। জয় হউক দেব। অমাত্য, নিবেদন করিতেছেন, সে সময়ে

বিদর্ভরাজ-উপঢৌকন-গ্রহণকালে দুইটী শিল্পকন্যা, পথ-পরিশ্রমে অবসন্ন-দেহা ছিল বলিয়া, আপনার নিকট উপস্থিত করা হয় নাই। সম্প্রতি তাহারা মহারাজের সম্মুখে আসিবার জন্য প্রস্তুত ; অতএব মহারাজ! যাহা ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা করুন।

রা। তাহাদিগকে হাজির কর।

কঞ্চু। যে আদেশ দেব।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাদের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

এই দিকে আসুন আপনারা।

প্রথমা। (জনান্তিকে) ওলো রমণীয়ে, অপূর্ব্ব এই রাজভবন! প্রবেশ করিতে করিতে আমার অন্তরের অন্তর প্রসন্ন হইতেছে।

দ্বিতীয়া। জ্যোৎস্নিকে, আমারও তাই। লোকপ্রবাদ আছে,—"হৃদয়ের সমাবস্থা, আগামি সুখদুঃখ সূচিত করে।"

প্রথমা। এখন তাহাই সত্য হউক।

কঞ্চু। এই মহারাণীর সহিত মহারাজ, বিরাজ করিতেছেন ; আপানারা অগ্রসর হউন। (উভয়ে অগ্রসর)।

(মালবিকা ও পরিব্রাজিকাকে দেখিয়া পরস্পর অবলোকন।)

উভয়ে। (প্রণিপাত করিয়া) জয় হোক মহারাজ! জয় মহারাণী!

রা। উপবেশন কর। (রাজাজ্ঞায় উভয়ের উপবেশন)

রা। কোন্ কলা-বিদ্যায় তোমরা সুশিক্ষিতা?

উভয়ে। প্রভু, সঙ্গীত-বিষয়ক বিদ্যায়।

রা। দেবি, ইহাদের এক জনকে লও।

ধারি। মালবিকে, ইহাদের ভিতর দক্ষতরা সঙ্গীত-সহায়িনী হইবে বলিয়া কাহাকে তোমার পছন্দ হয়?

উভয়ে। (মালবিকাকে দেখিয়া) ও মা এ কি! প্রভু-কুমারী? জয় হোক, জয় হোক প্রভুকুমারি!

(প্রণিপাত করিয়া তাহার সহিত বাষ্পবিসর্জ্জন)।

(সকলের সবিস্ময়ে অবলোকন)

রা। কে তোমরা? ইনিই বা কে?

প্রথমা। ইনি আমাদের প্রভুকুমারী।

রা। সে কি!

উভয়ে। শুনুন প্রভু! বিজয়দণ্ডে বিদর্ভনাথকে বশীভূত করিয়া, মহারাজ, যাঁহাকে বন্ধন হইতে মোচন করিয়াছেন, তিনি কুমার মাধবসেন,—ইনি তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী মালবিকা।

ধারি। কি! ইনি রাজকন্যা! চন্দনকে আমি পাদুকা-ব্যবহারে দূষিত করিয়াছি!

রা। তাই তো! ইনি কি প্রকারে এরূপ হইলেন?

মাল। (সশ্বাসে স্বগত) বিধিনিয়োগে।

দ্বিতীয়া। প্রভু! শুনুন আমাদের প্রভুকুমার মাধবসেন, আত্মীয়হস্তে বন্দী হইয়া পড়িলে, তাঁহার অমাত্য আর্য্যসুমতি, আমাদের মত পরিজন সকলকে ত্যাগ করিয়া, গোপনে ইঁহাকে স্থানান্তরিত করেন।

রা। ইহা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি বটে; তার পর?

দ্বিতীয়া। প্রভু, ইহার পর আমরা আর কিছু জানি না।

পরি। ইহার পর মন্দভাগিনী আমি সমস্ত বলিব।

উভয়ে। প্রভুকুমারি, এ তো আর্য্যা কৌশিকীর মত কণ্ঠ; ইনি কি তিনি?

মাল। হাঁ।

উভয়ে। যতিবেশধারিণী আর্য্যা কৌশিকীকে এখন কষ্টে চেনা যায়। ভগবতি! নমস্কার।

পরি। তোমাদের মঙ্গল হউক।

রা। ইহারা কি ভগবতীর আপ্ত জন?

পরি। হাঁ মহারাজ।

বিদূ। তবে এখন ভগবতী, এই আর্য্যার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন।

পরি। (সকাতরে) সমস্তই শুনুন। জানিবেন, মাধবসেনের সচিব সুমতি, আমার অগ্রজ।

রা। বটে? তার পর?

পরি। তিনি ইহার ভ্রাতাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, ইঁহাকে আমার

সহিত সরাইয়া, আপনার সম্বন্ধ অপেক্ষায়, বিদিশাগামি পথিকগণের দলভুক্ত হইয়া পড়েন।

রা। তার পর?

পরি। অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলে, যাত্রি বণিক্‌গণের মত তিনিও পথ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন।

রা। তার পর, তার পর?

পরি। তার পর আর কি—

সজ্জিত তূণীর-পট্টে ভুজ-অন্তরাল,
শোভিত আপার্ষ্ণি-লম্বি শিখি-বর্হজাল,
ধনুর্দ্ধারী দস্যুদল, অতীব কিম্ভূত,
শ্রবণবিদারী রবে হ'ল আবির্ভূত!

(মালবিকার ভয়প্রকাশ।)

বিদূ। আর্য্যে, ভয় কি? ইনি অতীত বিষয়ের কথা বলিতেছেন।

রা। তার পর?

পরি। তার পর ধৃতাস্ত্র বণিক্ যোদ্ধার দল, মুহূর্ত্তমধ্যে তস্করগণের দ্বারা পরাজিত হইল।

রা। ভগবতি! বোধ করি, ইহার পর কষ্টকর কিছু শুনিতে হইবে।—

পরি। তার পর, আমার সেই ভ্রাতা—

দুর্জ্জন হইতে শেষে অপমানভয়ে
কাতরা এ বালিকায় উদ্ধারিতে তিনি,
প্রভু-প্রিয় প্রিয়-প্রাণে মায়া-শূন্য হ'য়ে
প্রভু-পাশে একেবারে হইলা অঋণী।

প্রথমা। হায়—হায়! আর্য্য সুমতি, নিহত হইয়াছেন!

দ্বিতীয়া। তাহাতেই প্রভুকুমারীর এমন দশা!

(পরিব্রাজিকার বাষ্প-বিসর্জ্জন)

রা। ভগবতি! জন্মিলে মরণ তো আছেই; সাহসী পুরুষের ভাগ্যে এই-রূপই ঘটিয়া থাকে; শোক করিতে নাই। উদারমনাঃ তিনি, প্রভুর অন্নভোজন, সার্থক করিয়াছেন।

পরি। তখন আমি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন চেতনা আসিল, এই বালিকাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

রা। আর্য্যাকে মহাকষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছে!

পরি। তার পর ভ্রাতার দেহ, অগ্নিসাৎ করিয়া, শোক, পুনরায় নবীন বোধ হওয়াতে, আপনার দেশে আসিয়া কাষায় গ্রহণ করিলাম।

রা। সজ্জনের এই পন্থা উপযুক্ত।

পরি। এ বালিকা, দস্যুদিগের নিকট হইতে বীরসেনের হস্তে, বীরসেন হইতে দেবীর হস্তে আইসে। দেবীর শুদ্ধান্তঃপুরে আমি প্রবেশ লাভ করিলে পর, ইহাকে দেখিতে পাই। এই আমার কথা শেষ হইল।

মাল। (স্বগত) না জানি—প্রভু এখন কি বলিবেন।

রা। অহো, পরিভবোথাপক দৈবের কি সংঘটন! দেখ দেখি,—

"দেবী"-নাম-যোগ্য ইনি, দাস্যে নিয়োজিত!
স্নান-বস্ত্র-কার্য্য হায়! দুকুলে সাধিত!

ধারি। ভগবতি! উচ্চকুলোদ্ভবা মালবিকা, ইঁহার পরিচয় না বলিয়া আপনি বড় অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছেন।

পরি। ছি ছি, এরূপ বলিও না দেবি! কোন কারণবশতঃ আমি নৈর্ঘ্ণ্য অবলম্বন করিয়াছিলাম।

ধারি। সে কি কারণ?

পরি। ইঁহার পিতৃ-বর্ত্তমানে, কোন দেবযাত্রাগত দৈবজ্ঞ সাধু, আমার সমক্ষে আদেশ করেন,—"এ বালিকা, বৎসরমাত্র দাসত্ব ভোগ করিয়া, তৎপরে সদৃশ-পতি-গামিনী হইবে"। আপনার পরিজন-পদে থাকিয়া ইঁহার বিষয়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী, নিশ্চয় সফল হইতেছে দেখিয়া, আমি উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। বোধ হয়, ন্যায্য কার্য্যই করিয়াছি।

রা। অপেক্ষা করা আপনার উচিত হইয়াছে।

কঞ্চু। মহারাজ! অমাত্যবর, আর এক কথা নিবেদন করিয়াছেন; অন্য ঘটনা আসিয়া পড়িল বলিয়া, এত ক্ষণ তাহা আমার বলা হয় নাই। তিনি বলিলেন—"বিদর্ভ-বিষয়ে যাহা করা উচিত, তাহা স্থির হইয়াছে; এখন মহারাজের অভিপ্রায় শুনিতে ইচ্ছা করি"।

রা। মৌদ্গল্য, ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয় যজ্ঞসেন ও মাধবসেন। সেই রাজ্য ভাগ করিয়া উভয়ের হস্তে স্থাপিত করিতে অভিলাষ করি।

তাহারা বরদা কূলে উত্তর দক্ষিণে
ভাগ করি' দুই রাজ্য করুক শাসন;
দিবাকর নিশাকর উভয়ে যেমন
লয়েন বিভাগ করি' নিশায় ও দিনে।

কঞ্চু। যথাজ্ঞা দেব, অমাত্য-সভায় এইরূপ নিবেদন করি।

(অঙ্গুলিসঙ্কেতে রাজার অনুমতিদান)।

(কঞ্চুকী নিষ্ক্রান্ত)।

প্রথমা। (জনান্তিকে) প্রভুকুমারি, কি সৌভাগ্য! প্রভুকুমার, অর্দ্ধরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

মাল। ইহা আরও সৌভাগ্যের বিষয় যে, তিনি জীবন-সংশয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

(কঞ্চুকীর পুনঃপ্রবেশ)

কঞ্চু। মহারাজের জয় হউক। মহারাজকে অমাত্য, নিবেদন করিতেছেন, "মহারাজের কল্যাণকরী বুদ্ধি! মন্ত্রি-সভাও ইহাই স্থির করিয়াছেন;—

এক রথে দুই অশ্ব বহি' নিজ-ভার
চালকের আজ্ঞাধীন রহে যে প্রকার,
দ্বিধায় বিভক্ত-রাজ্য করিয়া বহন
মাধব ও যজ্ঞসেন রহুক এখন;—
হইয়া উভয়ে তব আদেশ-অধীন,
পরস্পর-আক্রমণ-বিদ্বেষ-বিহীন।

রা। অতএব মন্ত্রি-সভাকে জ্ঞাপন কর—সেনাপতি বীরসেনকে এইরূপ পত্র লিখিয়া প্রেরণ করে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা দেব।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপঢৌকন সহ পত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

প্রভুর আজ্ঞা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আর প্রভু, সেনাপতি পুষ্পমিত্রের নিকট

হইতে এই উত্তরীয়, উপহারসহ পত্র আসিয়াছে। দেব, ইহা প্রত্যক্ষ করুন। (রাজার উঠিয়া সসমাদরে উপঢৌকন-গ্রহণ)।

পরিজনহস্তে পত্র অর্পণ, পরিজনের পত্রোন্মোচন)

ধারি। আহা! তাই তো! আমার চিত্ত, অভিমুখেই আছে। গুরু-জনের কুশলানন্তর বসুমিত্রের বৃত্তান্ত শুনিব। অতি কষ্টকর কার্য্যে পুত্র, আমার সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছে।

রা। (উপবেশন করিয়া পাঠ) "মঙ্গল হউক। যজ্ঞগৃহ হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র, বৈদিশস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহ-ভরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জানাইতেছেন;—তুমি অবগত হও, রাজযজ্ঞে দীক্ষিত আমি, রাজ-পুত্র-শত-পরিবৃত বসুমিত্রকে রক্ষক-পদে আদেশ করিয়া বৎসর-মধ্যে নিবর্ত্তনীয় অবাধ তুরঙ্গ ছাড়িয়াছিলাম। সেই যজ্ঞীয় অশ্ব, সিন্ধুর দক্ষিণ তটে বিচরণ করিতে করিতে, অশ্বসৈন্যপতি যবনরাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়; তাহাতে উভয় সেনায় মহান্ সংগ্রাম বাধে।

(ধারিণীর বিষাদ-ভাব-প্রকাশ)

কি এরূপ ঘটিল! (পাঠ)

ধনুর্দ্ধারী বসুমিত্র পরাজিয়া অরি,
সবলে ফিরায়ে নৈল হ্রিয়মাণ হরি।

ধারি। আঃ, এ কথা শুনিয়া আমার হৃদয় আশ্বস্ত।

রা। (পত্রশেষাংশ পাঠ) "অংশুমান্ যেমন সগরের অশ্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ পৌত্র, আমার যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আমি যজ্ঞশেষ করিব; অতএব ইদানীং অকাল ত্যজিয়া সুপ্রসন্নমনে তুমি বধূজন-সমভিব্যারে যজ্ঞ-সেবনে এখানে আগমন করিবে। ইতি।"

অনুগৃহীত হইলাম।

পরি। সৌভাগ্য! পুত্র-বিজয়ে দম্পতীর শ্রীবৃদ্ধি হউক।

দেবি,

পতি হ'তে "বীরজায়া-শ্রেষ্ঠ" পদে স্থিতা;
পুত্র হতে "বীরমাতা" হ'লে অভিহিতা।

ধারি। ভগবতি! পরিতুষ্ট হইয়াছি। বাছা, পিতৃ-অনুরূপ হইয়াছে।

রা। মৌদ্গল্য! হস্তি-শিশু যূথপতির অনুকারী হইয়াছে না?

কঞ্চু। বালকের হেন বীর-চেষ্টিত যে এই—
নাহি করে আমাদের বিস্ময়-জনন;
বাড়বানলের যথা ঊর্ব্ব ঋষি সেই,
তুমি এই অজেয়ের প্রভব যখন।

রা। মৌদ্গল্য! যজ্ঞসেন-শ্যালক প্রভৃতি সকল বন্দীকে মুক্ত করিয়া দাও।

কঞ্চু। যথাজ্ঞা মহারাজ। (নিষ্ক্রান্ত)

ধারি। জয়সেনে! যাও, মেলক প্রমুখী অন্তঃপুরিকাদিগকে পুত্রের বৃত্তান্ত নিবেদন কর।

(প্রতিহারী গমনোদ্যত)

আর শুন।

প্রতি। (ফিরিয়া) উপস্থিত আমি দেবি!

ধারি। (জনান্তিকে) অশোক-দোহদ-নিয়োগে আমি মালবিকার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা এবং ইহার উচ্চ বংশ নিবেদন করিয়া, আমার বচনানুসারে ইরাবতীকে অনুনয় পূর্ব্বক বলিবে,—"তুমি ও বিষয়ে অমত করিও না"।

প্রতি। যে আজ্ঞা দেবি!

(নিষ্ক্রান্ত পুনঃপ্রবিষ্ট)

মহারাণী, পুত্র-বিজয়-সংবাদে পরিতুষ্ট করিয়া আমি অন্তঃপুরিকাগণের আভরণ-পেটিকা হইয়া পড়িয়াছি।

ধারি। ইহা আর আশ্চর্য্য কি? এ শুভ সংবাদ, সকলের নিকট সমান আদরণীয়।

প্রতি। (জনান্তিকে) দেবি! ইরাবতী নিবেদন করিলেন,—"ধরিত্রীর মত প্রভাব-শালিনী আপনি। আপনার ইহা অনুরূপ বাক্য বটে। সঙ্কল্পিত বিষয়ে অন্যথা করা উচিত নহে।"

ধারি। ভগবতি! আপনার অনুমতি হইলে, আর্য্য সুমতি, প্রথমে যাহাকে আর্য্যপুত্রের করিয়াছেন, সেই মালবিকাকে আর্য্যপুত্র-করে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।

পরি। পূর্ব্বমত এখনও ইহার উপর তোমারই প্রভুত্ব।

ধারি। (মালবিকাকে হস্তে ধরিয়া) আর্য্যপুত্র, তোমার প্রিয় নিবেদনানুরূপ পারিতোষিক এই; ইহাকে গ্রহণ কর।

(রাজার লজ্জাভাবপ্রকাশ)

(স্মিতমুখে) আর্য্যপুত্র, কি স্থির করিয়াছেন?

বিদূ। মহারাণি! এইরূপ লোক প্রবাদই আছে,—সকলেই, নূতন বর হইলে লজ্জাতুর হয়।"

(রাজার বিদূষকের প্রতি দৃষ্টি)

দেখিতেছি,—দেবী! আপনি আত্ম-নির্ব্বিশেষ করিয়া "দেবী"-সংজ্ঞা দিয়া দিলে, তবে মালবিকাকে মহারাজ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

ধারি। এ তো রাজকন্যা; ইহার উচ্চ বংশই, "দেবী"-উপাধি দিয়া দিয়াছে; পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

পরি। তা তো নয়;—

এ বালা উৎসব-মণি আমাদের, রাণি!
মণি-রূপ আভিজাত্যে রহে সুভূষিত,
তথাপি ইহাও স্থির, জানিও কল্যাণি!
স্বর্ণ-সাথে সমাগম অতীব বাঞ্ছিত।

ধারি। ভগবতি! মার্জ্জনা করুন; সুমঙ্গল-কথা-প্রসঙ্গে এত ক্ষণ অবগুণ্ঠন-বসনের বিষয় মনে আসে নাই। জয়সেনে! যাও, কৌশেয় গুণ্ঠন আনয়ন কর।

প্রতি। যে আজ্ঞা দেবি!

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তরীয় লইয়া প্রবেশ)

দেবি! এই।

ধারি। (মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া) আর্য্যপুত্র! ইহাকে গ্রহণ কর।

রা। তোমার আদেশের প্রতি আমার অসীম অনুরাগ। (জনান্তিকে) সৌভাগ্য আমার! আমি তো আগে হইতেই লইয়াছি।

বিদূ। আহা দেবী ধারিণীর কি অনুকূল ভাব!

(পরিজনগণকে অবলোকন)

পরিজনবর্গ। (মালবিকার নিকট আসিয়া) জয় হোক স্বামিনি!

(ধারিণীর পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টি)

পরি। দেবি! তোমাতে এ আর বিচিত্র কি?

পতি-প্রণয়িনী সাধ্বী রমণী সকল,
প্রতিপক্ষ-সাথেও তো পতি-সেবা-রত;
বহে' ল'য়ে যায় অন্য সরিতের(ও) জল
সমুদ্র-গামিনী নদী সমুদ্রে নিয়ত!

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু। জয় হোক মহারাজ! ইরাবতী, নিবেদন করিতেছেন,—"উপচার-লঙ্ঘন-হেতু আমি প্রভুর নিকট অপরাধিনী; তিনি আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ জন; সেই জন্য অপরাধ করিতে সাহস করিয়াছি। পদে পদে আমি প্রভুর অভিলাষানুরূপ আচরণই করিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি প্রভু পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন; অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, ইহাই প্রার্থনা; তাহাতেই আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করা হইবে।"

ধারি। নিপুণিকে, তাহাকে বল গিয়া—আর্য্যপুত্র, তোমা কর্ত্তৃক আরাধিত, অবশ্য এইরূপ বুঝিবেন।

নিপু। বাধিত হইলাম। (নিষ্ক্রান্ত)

পরি। মহারাজ! আপনার সম্পর্ক-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া চরিতার্থ মাধবসেন,—অনুমতি হইলে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি।

ধারি। ভগবতি! আমাদিগকে ত্যাগ করা আপনার কি উচিত?

রা। ভগবতি! আমার পত্রেই তাঁহাকে আপনার নাম করিয়া কুশল সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিব।

পরি। আপনাদের উভয়ের স্নেহে আমি বশীভূত।

ধারি। আজ্ঞা কর আর্য্যপুত্র, আর কি তোমার প্রিয় অনুষ্ঠান করিব?

প্রিয়ে! ইহাই আমার প্রিয়—

হে দেবি! হে চণ্ডি! তুমি প্রসাদ-উন্মুখী রও
আমার উপর।

প্রতিপক্ষ-হেতু প্রিয়ে! এই মাত্র যাচি আমি
তোমার গোচর।

আর—

অগ্নিমিত্র, যত কাল ধরায় মানব-কুলে
করিবে রক্ষণ।

এই মাত্র বাঞ্ছনীয়, অনাবৃষ্টি-আদি দুঃখ
না ঘটে কখন।

সমাপ্ত।

সাহিত্য-সভার কার্য্যবিবরণ।

তৃতীয় বর্ষ (১৩০৯ সাল)

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

১। বিগত ৪ঠা শ্রাবণ (১৯০২।২০শে জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০ (সাড়ে পাঁচ) ঘটিকার সময় ১০৬।১নং গ্রে-ষ্ট্রীটস্থ ভবনে (সভার কার্য্যালয়ে) "সাহিত্যসভার" ১৩০৯ সালের ২য় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ৯০ (নব্বুই) জন সভ্য ও অন্য ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইয়াছিলেন।

২। গত-মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, পঠিত ও অনুমোদিত হইল। ইহার পরে গত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের নাম পঠিত হইল।

৩। অনন্তর প্রবন্ধলেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় অসুস্থতা-নিবন্ধন প্রবন্ধপাঠে অশক্ত হওয়ায় সভার অন্যতম সভ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৪। পরে আধ্যাত্মিক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভটাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, বক্তা অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তৎপরে তিনি বেদব্যাস ও তৎশিষ্যাদি কর্ত্তৃক বেদ-বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

৫। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় বলিলেন, অদ্যকার পঠিত প্রবন্ধ, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও ভক্তিভাবে লিখিত হইয়াছে। তিনি বেদের প্রতিপাদ্য ও প্রমাণ্যবর্ণনা করিয়া বলিলেন, বেদ—কৃষকের গান নহে। যাগযজ্ঞাদি ও প্রাচীন আর্য্যদিগের সৌভাগ্যসম্পত্তি সমস্তই বেদে বর্ণিত হইয়াছে। ইরাণ দেশে যে প্রাচীন আর্য্যজাতির আদিম নিবাস-স্থান, তাহাও বেদ হইতে প্রতিপন্ন হয়। ঋগ্বেদেও ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বক্তার মতে ইরাণ, আর্য্যদিগের আদিম নিবাস। তন্মতে ঋগ্বেদে যে "পণি" শব্দের

উল্লেখ দেখা যায়, উহা বোধ হয় ফিনিসীয় (Phaenicean) জাতিই হইবে। বেদের কালনিরূপণ করা দুরূহ। ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস যে, ঋগাদিতে উল্লিখিত ঋষিরা, তত্তৎ মন্ত্রের কর্ত্তা; বক্তারও ঐ মত। পরে তিনি বেদের প্রশংসাকীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিলেন—“ভাষাবিজ্ঞান” বেদমূলক। বেদ-প্রকাশের পর হইতেই ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছে। বেদের আলোচনা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। প্রবন্ধলেখক মহাশয়, আরও বৈদিক প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যসভার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, এই রূপ আশা প্রকাশ করিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিলেন।

৬। পরে শ্রীযুক্ত জ্ঞানজীবন চক্রবর্ত্তী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়, প্রবন্ধসম্বন্ধে কিছু সমালোচনা করিলেন ও প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৭। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকার কাব্যবিশারদ মহাশয়, সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন; সুস্থ থাকিলে আরও বলিতে পারিতেন। যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। বেদ যে চাষার গান, এ কথা নূতন নহে। গোতমোক্ত শাস্ত্রাদিতেও সেইরূপ ভাবে পূর্ব্বপক্ষরূপে বেদনিন্দা আছে। কপিল, বেদকে অসার বলেন নাই। জ্ঞান-কাণ্ডের অধিকারীদিগের পক্ষেই কেবল কর্ম্মকাণ্ড দূষ্য—নতুবা বেদ, দুষ্য— এ কথা তিনি বলেন নাই। বেদের পৌরুষেয়বাদী ও অপৌরুষেয়-বাদীদিগের মধ্যে বস্তুগত কোন ভেদ নাই। পৌরুষেয়বাদীরা বলেন যে, কল্পাদিতে পূর্ব্ববেদের স্মৃতি-অনুসারে ব্রহ্মা, বেদে রচনা করেন। অপৌরুষেয়-বাদীরাও শব্দের নিত্যতা স্থাপন করিয়া বলেন যে, বেদ নিত্য।

৮। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদপ্রদানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীযাদবকিশোর গোস্বামী
সভাপতি।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
সম্পাদক।

১৩০৯।১৪ই ভাদ্র (১৯০২।৩১শে আগষ্ট)।